স্মরণীয় বন্ধু
আবু সয়ীদ আইয়ুবের
স্মরণে

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতি

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতি

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজদর্শন

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্মৃতি

সপ্তম অধ্যায়

হে মহাজীবন ! হে মহামরণ !!

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—১

পরিশিষ্ট—২

পরিশিষ্ট—৩

সম্পাদনার কথা

অম্লান দত্ত এ কালের একজন অগ্রণী চিন্তক, বিনা তর্কেই এটা মেনে নেওয়া যায়। চিন্তার প্রকাশ ঘটে ভাষাকে আশ্রয় করে। অম্লান তাঁর ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করেন ইংরাজি এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে। উভয় ভাষাতেই তাঁর সমান দখল। আমরা অম্লানের বাংলা রচনা, এপর্যন্ত তিনি যা লিখেছেন, তার একটা সুষ্ঠু পরিচয় এ কালের পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে এই প্রবন্ধ সংগ্রহ সংকলন করার প্রয়াস করেছি। অম্লান তিন দশকের অধিককাল তাঁর ভাবনা-চিন্তা বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে অক্লান্তভাবে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থবদ্ধও হয়েছে। কিছু রচনা এখনও পত্রপত্রিকাতেই ছড়ান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা যাঁদের বয়স হল ত্রিশ, তাঁদের চেষ্টা থাকলেও অম্লান কি বলেছিলেন তিন দশক কি দুই দশক আগে, সেটা তাঁদের পক্ষে জানবার কোনও উপায় নেই।

কারণ অম্লানের কম গ্রন্থই এখন বাজারে পাওয়া যায়। যেহেতু অম্লানের রচনাদির প্রাসঙ্গিকতা সব সময়েই বর্তমান, কারণ তাঁর ভাবনা-চিন্তার ভিত্তিতে আছে আবেগবিহীন মৌল বিচার, অম্লানের রচনাদির সঙ্গে বাংলা ভাষার পাঠকদের পরিচয় না থাকাটা সেই হেতুই এক বড় ক্ষতি, এমন একটি অনুভবই আমাকে এবং আরতি সেনকে অম্লানের প্রবন্ধ সংকলনের কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে। স্বীকার করে নেওয়া ভাল অম্লান আমাদের দুজনেরই বন্ধু। কিন্তু এই প্রবন্ধ সংগ্রহ যে নিছক বন্ধুকৃত্য নয়, সেটা ছাপিয়ে আরও কিছু, সে সংবাদ এই সংগ্রহ থেকেই পাঠক পেয়ে যাবেন।

অম্লান যুক্তির সীমা কোথায় তা জানেন। তা সত্ত্বেও মানুষ সমাজ এবং জগৎকে বিচার করতে অম্লান যুক্তির বাইরে পা বাড়ান না। অম্লান মনে করেন, 'মমতা ও মননের বৈপরীত্যে মানুষের বিশিষ্ট পরিচয়। এ দুইয়ের মিশ্রণে ও ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের চৈতন্যের বিবর্তন।' অম্লান জানেন যে, 'যুক্তি কখনও শ্রেণী ও সংঘবদ্ধ স্বার্থের সহায়ক, আবার কখনও সে এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার পরামর্শদাতা। মানবতাবাদের দিকে প্রসারিত এই যে যাত্রা, যুক্তি তাতে পথপ্রদর্শক।'

অম্লান এক সময় অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, তিনি অচিরেই অর্থনীতির যান্ত্রিক অভ্যাসের দাসত্ব থেকে নিজের ভাবনা-চিন্তাকে মুক্ত করে নিতে পেরেছিলেন। এই গ্রন্থটিতে সংকলিত অম্লানের যে সকল রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে, সেগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, সেগুলি মুক্তচিন্তার ফসল। অম্লানের বিচার বিশ্লেষণ কোনও মত থেকে কোনও মতবাদে পৌঁছুবার ছক-কষা

কোনও মানচিত্র নয়। অম্লান জানেন, মানুষের সমাজ এবং মানুষ যখন কোনও সমস্যায় পীড়িত হয় বা সংকটে পড়ে, তার থেকে উত্তীর্ণ হবার কোনও একটা নির্দিষ্ট পথ নেই। সমস্যায় যাঁরা পীড়িত অথবা সংকটে যাঁরা পতিত হয়েছেন, নিজ নিজ অভিজ্ঞতা এবং চেতনা সম্বল করে সমস্যা বা সংকট থেকে বেরিয়ে যাবার পথ তাঁদেরই আবিষ্কার করে নিতে হয়। এই ভাবেই মানুষ সৃষ্টির উষাকালের প্রাকৃত সরল জীবন থেকে আজকের জটিলতম সমাজ সংগঠনে এসে পৌঁচেছে। পথে আসতে আসতে মানুষ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়, সংকট থেকে ত্রাণের বিভিন্নমুখী পথ আবিষ্কার করতে করতে এগিয়ে এসেছে। এ বোধটি অম্লানের মৌল বোধ। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই মানুষের উত্তরণ ঘটে, এই সত্য মেনে নেওয়ার সুবিধা এই যে, মানুষ বিপরীত মত ও পথকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। পরস্পর-বিরোধী মত ও পথকে শ্রদ্ধা জানাবার পূর্বশর্ত হল, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলির অন্তর্নিহিত সত্যকে যত্ন সহকারে খুঁজে বার করা। যে মানুষ এই প্রচেষ্টায় রত, সে দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু বৈরিতাকে অস্বীকার করে। কারণ দ্বন্দ্ব ও বৈরিতার যোগ বিভ্রম মাত্র। দ্বন্দ্বের মধ্যে বৈরিতা নেই, যাঁরা স্বমতে নিধনং শ্রেয় বিবেচনা করেন, তাঁদের অহং প্রবল, অহং প্রবল হয়ে উঠলেই বৈরিতার জন্ম হয়। দ্বন্দ্ব উত্তরণের উপায়, বৈরিতা ধ্বংস ডেকে আনে। অম্লান এই সত্যের প্রতি বারে বারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি আর আরতি অম্লানের রচনাগুলিকে এই গ্রন্থে বিন্যস্ত করেছি। এর আগে অম্লানের একই বিষয়ের রচনা বিভিন্ন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ছিল। এই প্রবন্ধ সংগ্রহে আমরা অম্লানের রচনাবলীকে বিষয় অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করেছি। যথা: ১) রাজনীতি, ২) অর্থনীতি, ৩) সমাজদর্শন, ৪) শিক্ষা, ৫) ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন, ৬) স্মৃতি এবং ৭) হে মহাজীবন হে মহামরণ।

এবারে কিছু কৈফিয়ৎ। বলেছিলাম, অম্লানের বিভিন্ন ধরনের রচনা, এ পর্যন্ত যা প্রকাশিত হয়েছে, সে সমুদয় এই সংগ্রহভুক্ত হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একখানা গ্রন্থকে সংগ্রহভুক্ত করা গেল না। গ্রন্থটির নাম 'শতাব্দীর প্রেক্ষিতে ভারতের আর্থিক বিকাশ।' এই গ্রন্থটি যেহেতু 'অর্থনীতি গ্রন্থমালা'র অন্তর্ভুক্ত সেই হেতু এটিকে ছাড় দেওয়া হল।

'কমলা বক্তৃতা ও অন্যান্য ভাষণ' গ্রন্থটির মধ্যে আহরিত 'তৃতীয় চরণ' শীর্ষক বক্তৃতাটি অম্লান দিয়েছিলেন ইংরাজি ভাষায়। ওইটিই 'কমলা বক্তৃতা'। মানসী দাশগুপ্ত ওটির বাংলা তর্জমা করেছেন। তর্জমাটি সুলিখিত হলেও অম্লানের নিজস্ব বাংলা শৈলীর সঙ্গে মিশ খায় না। পাঠক পাছে বিভ্রান্ত বোধ করেন, সেই কারণে মানসীর তর্জমাটি এই সংগ্রহের পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হল। এই গ্রন্থভুক্ত অন্যান্য ভাষণগুলি যেহেতু অম্লানের নিজেরই রচনা, তাই সেগুলিকে মূল গ্রন্থের ভিতরে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। অম্লানের কয়েকটি রচনা এক গ্রন্থে মুদ্রিত হবার পরে পরবর্তী সময়ে কিঞ্চিৎ সংশোধিত কখনও বা কিছুটা পরিবর্ধিত হয়ে অন্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা পরবর্তী পাঠকেই এই সংগ্রহে স্থান দিয়েছি। কারণ সেটাকেই আমরা লেখকের পরিণত মনের প্রকাশ বলে ধরে নিয়েছি।

একটি সতর্কতা। অম্লানের ভাষা অতুলনীয়। তাঁর শৈলী স্বকীয়। গভীর ভাবকে এবং চিন্তাকে এক আশ্চর্য প্রাঞ্জলতায় অম্লান মনোযোগী পাঠকের মনে অনায়াসে প্রবিষ্ট করে দিতে পারেন। তাঁর ভাষা ভাবালুতা এবং অলঙ্কার বর্জিত এবং উদ্ধৃতি কন্টকিত নয়। এই ভাষা মেদহীন, ঋজু এবং যথার্থ অর্থবহ। অথচ নিরস নয়। বয়সে যতই তিনি

পরিণত হয়েছেন, ততই তাঁর ভাব গাঢ় এবং ভাষা যথাযথ হয়েছে। এত কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে, অন্নদার রচনাকে বিষয়ানুযায়ী সাজাবার সময় রচনাকালের ক্রম মেনে চলা সম্ভব হয়নি। বিষয়গুলিতে যাতে ভাবগত ঐক্য বজায় থাকে সম্পাদকদ্বয় সেদিকেই নজর রেখেছিলেন। আশা করি পাঠক সম্পাদকদ্বয়ের সমস্যা হৃদয়ঙ্গম করবেন।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার কালে মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সারদারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অক্লান্ত সাহায্য করেছেন। তাদের ধন্যবাদ জানাই।

গৌরকিশোর ঘোষ

ভূমিকা

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ১৯৪১ সালে, তাঁর আশি বছরের জন্মদিনে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। সেই প্রবন্ধে- তিনি মানবপীড়নকারী সাম্রাজ্যবাদের নখদন্তের বিস্তার দেখেছিলেন। তারপরে পঞ্চাশ বছর পার হল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে কবেই, কিন্তু শেষ হয়নি ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্বেগ আর গরম লড়াই-এর আতঙ্ক। উদাহরণ—অতি সাম্প্রতিক গালফ্-ওয়ার। ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ, শক্তিশালী মারণাস্ত্রের সহযোগে যা ভয়াবহ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতিব্যবহার, অপব্যবহার আর অব্যবহার, রাজনৈতিক শক্তির অতিকেন্দ্রিকতা, সম্পদ আর দারিদ্র্যের অরুচিকর বৈপরীত্য, প্রাকৃতিক সম্পদ আর মানব সম্বন্ধের দ্রুত অবক্ষয়, নেশাসক্তি ও উন্মার্গগামিতা—এসব মিলে গত পঞ্চাশ বছর ধরে মানবসমাজকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে, যেখানে শুধু সভ্যতার নয়, অস্তিত্বেরই সংকট। সমস্ত সামাজিক রোগ ও সামাজিক অন্যায়ের প্রতিকারের পন্থা বলে নিজেকে দাবি করে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে অভ্যুদয় হয়েছিল মার্ক্সবাদের। ভূমণ্ডলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বৃহৎসংখ্যক মানুষের মনে জাগিয়েছিল মুক্তির স্বপ্ন। গড়ে উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজ দেখা যাচ্ছে যে সে স্বপ্নও ধূলিসাৎ হতে চলেছে। হিংসাশ্রয়ী শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আর্থিক ব্যবস্থায় সামান্য সুরাহা করলেও মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারেনি মানুষকে, বরং আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে বাক্‌রোধকারী নির্যাতনের শৃংখলে। তা থেকে মুক্ত হবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে সেসব দেশের মানুষ। এই যেমন একদিকে, তেমনি অতিসাম্প্রতিককালের আর এক উদ্বেগজনক ঘটনা হল এই যে, নানা দেশে মানুষ যুক্তিবর্জিত মধ্যযুগীয় ধর্মোন্মাদনায় ফিরে যেতে চাইছে। রাজনৈতিক বলে বলীয়ান সাম্প্রদায়িক ধর্মের দাম্ভিক আত্মঘোষণা আজ পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তবুদ্ধি কল্যাণকামী মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এইরকম জাগতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে যখন বিভ্রান্ত কিম্বা উদ্‌ভ্রান্ত লাগে, যখন মনে হয় 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা', তখন কিছু অনুত্তেজিত স্থিরবুদ্ধি মানুষের সুচিন্তিত বাক্য কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। যাঁরা জাগতিক ঘটনাপারম্পর্যের নৈর্ব্যক্তিক পরিচ্ছন্ন যুক্তিধর্মী বিশ্লেষণ করতে শিখেছেন, যাঁরা কল্যাণবুদ্ধিকে বাণিজ্যবুদ্ধির উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন এবং যাঁদের বোধশক্তি সূক্ষ্ম আর জাগ্রত, অম্লান দত্ত নিঃসন্দেহে সেই দু-চারজন লেখকের মধ্যে প্রধান একজন। তাঁর চিন্তা আমাদের ভাবনাচিন্তার জট ছাড়াতে, কর্মপন্থা নির্বাচন করতে সাহায্য করে।

ধাপে ধাপে তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। স্পষ্ট চিন্তা, স্বচ্ছ ভাষা, গাঢ়

উপলব্ধি, দৃঢ় প্রত্যয় এইসব নিয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি আক্ষরিক অর্থেই প্র-বন্ধ। ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের মূল্যায়ন, নতুন তত্ত্ব গঠন, ঘটনা পারম্পর্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রয়োগ, পরস্পর বিরোধী তত্ত্বকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে সমন্বয়সাধন এবং অবশেষে কল্যাণমুখী কর্মসূচীর খসড়া রচনা—প্রবন্ধলেখক হিসেবে এইটাই তাঁর স্বাভাবিক চলন শৈলী। বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে অম্লান যা দেখেন, বোঝেন এবং অনুভব করেন, সবই তাঁর তত্ত্বগঠন প্রণালীর অন্তর্গত হয়ে যায়। এইভাবে জীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলি গাঁথা হয় তাঁর ব্যক্তিসত্তার সুতোয়, রচনা হয় একটি ক্রমবিকাশশীল জীবনদর্শন।

অর্থনীতির বিজ্ঞানী হিসেবে অম্লানের রচনায় আর্থনীতিক চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা গুরুত্ব পেয়েছে, সবচেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে এমন বলা যায় না বোধহয়। তাঁর চিন্তায় রাজনীতি অর্থনীতির হাত ধরে চলে। সর্বদাই তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি অর্থনীতির সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করেন। আর্থসামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য সমাজে যে মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখা দেয়, পরিবর্তনশীল সেই মূল্যবোধের সঙ্গে চিরন্তন মূল্যবোধের বিরোধ ও বিরোধজাত দ্বন্দ্ব-বেদনা, এগুলি তাঁর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযোগিতা আর বিপদ—এই দুইই তাঁর চিন্তাকে আলোড়িত করে। আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা এবং ভারতবর্ষে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে প্রচুর ভেবেছেন তিনি। শিল্প সাহিত্যের অধ্যয়ন, আস্বাদন ও উপলব্ধি এবং জীবনে শিল্পের ভূমিকা সম্বন্ধে যে সৃজনী চিন্তার প্রকাশ দেখি তাঁর লেখায়, তা বিস্ময়কর। নরনারী সম্পর্ক ও সে বিষয়ে সমাজের প্রতিক্রিয়া, স্ত্রী-পুরুষে সাম্য, নারীমুক্তি প্রভৃতি একালের বিতর্কিত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে তাঁর ভাবনায়। সংস্কারমুক্ত কল্যাণবুদ্ধি নিয়ে, সংবেদনশীল মন নিয়ে, তিনি বিষয়গুলি বুঝেছেন আর সমাধানের পথ খুঁজেছেন।

অম্লান দত্ত প্রধানত যুক্তিবাদী। কিন্তু যুক্তিবিরোধী নয় অথচ যুক্তির ঊর্ধ্বে মানুষের যেসব সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধি, সেগুলি সম্পর্কে তাঁর মন অসাড় তো নয়ই, বরং তাদের অস্তিত্ব ও অপরিহার্যতা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয়। মানবসংস্কৃতিতে ধর্মের স্থান ও প্রভাব নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে ভাবনা চিন্তা করেছেন ও লিখেছেন। একটা মানব-ঐক্যের আদর্শ নিয়ে অম্লান মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বুঝতে চেয়েছেন। যেসব বিদ্যার মধ্যে মানুষের চিন্তা ও কর্মের বিচিত্র প্রকাশ, সেই সবের প্রতিই তাঁর গভীর আগ্রহ। মানুষের কর্ম ও অবসর, মমতা ও নির্মমতা, স্বার্থ ও স্বার্থত্যাগ নিয়ে যে দ্বন্দ্বাত্মক কাহিনী বিশ্বইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা হয়ে চলেছে, তাইতেই জীবনভর মগ্ন হয়ে আছেন তিনি, ঘটনা পরম্পরা অনুসরণ করে মানুষের আত্মপ্রকাশের ধারাটির প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র জানা এবং বোঝাই তাঁর লক্ষ্য নয়। এই ধারাটির শুভনিয়ন্ত্রণে বিবেকী মানুষের সজাগ ও সক্রিয় ভূমিকাটিও চিনে নেওয়া এবং পালন করার উপায় সম্বন্ধে ভেবেছেন। এটাই তাঁর জীবনের কাজ, লেখার মধ্য দিয়ে এটাই তিনি করতে চেয়েছেন। তাঁর লেখা বিশ্লেষণে তীক্ষ্ণ, বেদনায় কোমল। লেখার মধ্যে অতিবিস্তার নেই, আধিক্য নেই, ততটাই লেখেন যতটা না লিখলে হয় না। নিবিড় অধ্যয়নের আভাস একটা মৃদু সৌরভের মত অন্তরালে থেকে তাঁর প্রকাশকে সমৃদ্ধ করে। যুক্তিবাদী হিসেবে একটা প্রাথমিক অবিশ্বাসপ্রবণতাই তাঁর মনের ধর্ম, কিন্তু এহ বাহ্য। গভীর নৈরাশ্যের পরিস্থিতিতেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং নৈরাশ্য-উত্তীর্ণ আশাবাদের

মানসিকতাই তিনি জাগিয়ে রাখেন শেষ পর্যন্ত, যার ফলে তিক্ততা প্রায় কখনোই দেখা যায় না লেখায়।

অন্নান দত্তের রাজনীতিবিষয়ক লেখায় যে চিন্তাগুলি প্রাধান্য পেয়েছে তা হল: সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র, হিংসাশ্রয়ী ও অহিংস রাজনীতি, রাজনীতিতে অতিকেন্দ্রন ও বিকেন্দ্রন, সংখ্যালঘু সমস্যা, জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ও বিশ্ববাদ, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি। প্রথম থেকেই গণতন্ত্রের প্রতি অম্লানের একনিষ্ঠ প্রেম, কেবল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে নয়, জীবনদর্শন হিসেবে। ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে সামনে রেখে নিজের কথা বলবার স্বাধীনতা ও অপরের কথা শোনবার সহিষ্ণুতা—এই দুটি জরুরী মূল্যবোধকে লালন করা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই কিছুটা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। অম্লান দেখেছেন যে একনায়কতন্ত্র অথবা প্রশাসনের অতিকেন্দ্রিকতাই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রধান শত্রু। সেদিক থেকে ফ্যাসীবাদ-নাৎসীবাদ-সাম্যবাদ সবই একগোত্রের। অম্লান দত্তকে সাম্যবাদ-বিরোধী বলে মনে করাটা নিতান্তই ভুল। সাম্যে তিনি বিশ্বাসী, প্রীতি ও সহযোগিতার সূত্রে বাঁধা এক অখণ্ড মানবজাতি তাঁর স্বপ্ন। বর্ণ বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, নারী পুরুষে অসাম্য, জাতিভেদ, সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যে অসঙ্গতি—এসবের বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠভাবে সোচ্চার। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে একনায়কতন্ত্রের, তা এমন কি সর্বহারা একনায়কতন্ত্র হলেও, তিনি ঘোর বিরোধী। সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রে আর্থিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের তুলনায় অধিক হিতকর—এটা প্রমাণ করবার জন্য কমিউনিস্টরা যেসব যুক্তি ব্যবহার করেন, তার গলদ তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট। একদলশাসিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অতিকেন্দ্রিত আমলাতন্ত্রের বিপদ সম্বন্ধে অম্লান দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে যেসব কথা অক্লান্তভাবে বলে আসছেন, তা এদেশের বাম বুদ্ধিজীবী মহলে যথেষ্ট বিরূপতা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আজ সাম্যবাদী দুনিয়ার ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলন ও তার সফলতা প্রমাণ করছে যে অম্লান দত্তের বক্তব্যের মূলে সত্যদৃষ্টি ছিল। ব্যক্তিগত মালিকানা ঘুচিয়ে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণের উপর সমাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে সাম্যবাদী আদর্শ একদা বহু মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছিল, সে আদর্শের প্রতি তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ফিরে পাবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে অন্নবস্ত্রের চাহিদার মতনই ব্যক্তিস্বাধীনতাও মানুষের মৌল চাহিদা।

মার্ক্সবাদ ও জাতীয়তাবাদ-এর অভ্যুত্থানের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে অম্লান দেখিয়েছেন কীভাবে প্রাথমিক বিরোধিতা অতিক্রম করে পরবর্তী পর্যায়ে মার্ক্সবাদ জাতীয়তাবাদের কাছাকাছি এসে গেছে। যেমন মার্ক্সবাদের বিপদ, তেমনি জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্বন্ধেও তিনি পূর্ণ সচেতন, বিশেষত ভারতের রাজনীতিতে। একাধিক প্রবন্ধে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যদিও দেশের স্বাধীনতার জন্য, পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে ঐক্যের ভিত্তি আক্রমণধর্মী জাতীয়তাবাদের ওপর নয়, বরং সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের দ্বারা বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠায়। এই গ্রহণশীল উদারতার পথটি পরিত্যাগ করা ভারতবর্ষের সংহতির পক্ষে মারাত্মক হবে এই তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। উদ্বেগের সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন কীভাবে ধর্মীয় ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ও এদেশের রাজনীতিকে এক হিংসাশ্রয়ী অসহিষ্ণুতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, বিকৃতি ও বিপদ সম্বন্ধে অম্লান পূর্ণ সচেতন। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যেও যে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা, দলসর্বস্বতা এবং ব্যাপক দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, তাতে একে তিনি ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য উপযোগী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে মেনে নিতে রাজী নন। মানবেন্দ্র বা জয়প্রকাশ কথিত নির্দলীয় গণতন্ত্রের পথে হয়তো ভবিষ্যৎ সমাজের মুক্তির যাত্রা, এইরকম ভেবেছেন তিনি।

অর্থনীতি বিষয়ক লেখাগুলিতে অম্লান আর্থিক উন্নয়নের শর্তগুলি খুঁজে বার করতে চেয়েছেন ; গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও মিশ্র আর্থিকব্যবস্থার ভাল মন্দ দিকগুলি আলোচনা করেছেন। ভারতের আর্থিক বিকাশের ইতিহাস চর্চা করেছেন। এবং ভারতের ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নের কিছু পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আর্থিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা, অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস—আর্থিক উন্নয়নের এই যুগ্ম ভিত্তির উপর জোর দিয়েছেন। খেতে, খামারে, কলকারখানায়, চাষী-মজুরের ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের প্রবেশ চেয়েছেন। আর্থিক উন্নয়নের জন্য মূলধন গঠনও একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। মূলধন ও তৎসংক্রান্ত সমস্যাগুলির প্রসঙ্গে স্বভাবতই ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার কথা এসে গেছে। এই দুই ব্যবস্থার সব সুবিধা, সব ত্রুটি গলদ নিয়ে অম্লান পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে মূলধন গঠন, উদ্বৃত্ত, শোষণতত্ত্ব, শ্রেণী সংঘাত, বাজার অর্থনীতি, শিল্পের ব্যক্তিগত অথবা রাষ্ট্রীয় মালিকানা যৌথ অথবা পারিবারিক অথবা মিশ্র চাষ প্রথা—এইসব বিষয়গুলির চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন। এখানেও আমলাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান দাপট, অতিকেন্দ্রিকতা ও বিকেন্দ্রীকরণ—এইসব বিষয়গুলি উপস্থাপিত করেছেন। সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির আর্থিক অব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ প্রসঙ্গে যেসব বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন তার কয়েকটি হল : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার, উন্নততর প্রযুক্তি, যথাযথ প্রযুক্তি, যন্ত্রশক্তি ও শ্রমশক্তি, গ্রাম ও নগরের পারস্পরিক সম্পর্ক, বেকার সমস্যা, দুর্নীতি, ভোগবাদিতা, সাম্য ও অসাম্য ইত্যাদি। তাঁর আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মানবাধিকারের সাম্য, পরিমিত ভোগ, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা ও অহিংসাভিত্তিক জীবনযাপনের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ নৈতিক সমর্থন। যদিও তিনি মানেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাভিত্তিক উচ্চাভিলাষ ও ধনাকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না, তবুও সমাজজীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সন্তোষের সমন্বয়সাধনের পক্ষপাতী তিনি। সেদিক থেকে কোনমতেই তাঁকে সাবেকী ধনতন্ত্রের সমর্থক বলা যাবে না বরং ওঁর জীবনদর্শনকে অনেকটা সমাজতন্ত্রের দ্বারাই প্রভাবিত বলা যাবে। কিন্তু তিনি মনে করেন না যে, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতা অপহরণের পথে কোনোমতেই সমাজতন্ত্রের মতো একটি মহৎ মূল্যবোধ মানুষের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। মার্ক্সবাদকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করলেও তিনি মনে করেন যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় পদ্ধতি কিছুটা বৈজ্ঞানিক এবং এক্ষেত্রে মার্ক্সের চিন্তা মূল্যবান। কিন্তু বহু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার বিশ্লেষণে মার্ক্সবাদীদের অন্ধতা ও গোঁড়ামীকে বৈজ্ঞানিক মননের পরিপন্থী বলে মনে করেন তিনি।

ভারতের আর্থিক সমস্যা প্রসঙ্গে অম্লান দত্ত গ্রাম ও শহরের অসম-সম্পর্কের ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে গ্রাম এবং শহরকে নিয়ে একটা সামগ্রিক চিন্তার

প্রতিফলন আমাদের পরিকল্পনায় থাকা দরকার। কুটীর শিল্পের মাধ্যমে গ্রামপুনর্গঠন ও গ্রামের স্বয়ম্ভরতাকে নীতিগতভাবে মেনে নিলেও ওঁর মতে এটাই যথেষ্ট নয়। গ্রাম, মাঝারি শহর এবং কেন্দ্রীয় শহর এই তিনের পারস্পরিক নির্ভরতার কথা আলোচনা করেছেন। আর্থিক উন্নয়নের পরিপন্থী শক্তিগুলিকে চিহ্নিত করেছেন তিনি এবং এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর শিক্ষাচিন্তা ও পল্লীসংগঠন চিন্তাকে উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে।

সবশেষে, অম্লান দত্তের আর্থিক চিন্তা সম্বন্ধে একটা কথা না বললে কিছুই বলা হয় না। সেটা এই যে অর্থবিজ্ঞানকে আলাদাভাবে দেখলে হবে না, একে জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। তিনি দেখিয়েছেন যে ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি আর সমাজতন্ত্র—এই দুটোই মানুষের সমাজকে সঙ্কটের মুখোমুখি এনে দিয়েছে—ঐ দুটোর কোনোটা থেকেই আর মুক্তির আশা নেই। ভবিষ্যৎ সমাজগঠন সম্পর্কে যে কল্পনা ও দূবদৃষ্টি দরকার তার পরিচয় মিলবে তাঁর বর্ণিত ভবিষ্যৎ সমাজের ছবিতে।

ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন অপরিহার্য, তেমনি অপরিহার্য ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের নিত্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে এটাই অম্লান দত্তের প্রত্যয়। মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় যেমন তার চেতনাবিকাশের স্তরে স্তরে, তেমনি সমান্তরালভাবে চলেছে তার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন। ব্যক্তিকে বুঝতে গেলে ঐ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে অম্লান মানুষের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করেছেন, আর চেষ্টা করেছেন এমন একটি সমাজদর্শন গড়ে তুলতে, যা এ যুগের নৈতিক বিভ্রান্তির লক্ষণাক্রান্ত সমাজে মানুষকে খানিকটা আত্মস্থ হতে ও কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝে নিতে সাহায্য করবে।

সমাজদর্শন চিন্তার প্রতিটি পর্যায়ে অম্লান আজকের মানুষের সমাজজীবনের গভীরতর আকাঙ্ক্ষাগুলি উপলব্ধি করেছেন, সেই প্রসঙ্গে আজকের মানুষের সঙ্কটের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন ও সেই সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন। তাঁর সমাজসম্পর্কিত রচনাগুলিতে একদিকে যেমন ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ, অন্যদিকে আদর্শ সমাজ গঠনের পথের অনুসন্ধান। সমাজ বিবর্তন ও সমাজবিপ্লব সম্পর্কিত সুপরিচিত তত্ত্বগুলি পর্যালোচনা করে তিনি একটা সমন্বয়ভিত্তিক সৃজনধর্মী তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন।

অম্লানের সমাজসম্পর্কিত রচনাগুলির কয়েকটি পর্যায় আছে। উনি শুরু করেছিলেন ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যা নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক সংগঠনের সমস্যাগুলির পর্যালোচনা করেছেন, আবার বিজ্ঞানবিমুখতা, অন্ধ কুসংস্কার, শ্রমবিমুখতা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ প্রভৃতি প্রগতি ও উন্নয়নের পরিপন্থী সামাজিক অভ্যাস ও মনোভঙ্গিগুলিও চিহ্নিত করেছেন।

সামাজিক সমস্যার কারণ খুঁজতে খুঁজতে ক্রমে তিনি সমাজবিজ্ঞানের সুপ্রচলিত তত্ত্বে চলে এসেছেন, ঘটনার সঙ্গে তত্ত্ব মিলিয়ে তার ভ্রান্তি বা যাথার্থ্য বিচার করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আসে স্যাঁ সিঁম বা বেকনের কথা, মিল এবং বেন্থামের কথা, ফিরে ফিরে আসে মার্ক্সবাদের কথা। এদেশে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ, জয়প্রকাশের সমাজচিন্তাও এসেছে আলোচনা প্রসঙ্গে। এদেশের সামাজিক সমস্যার ব্যাখ্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে অম্লান দত্তের বেশ কিছু মৌলিক চিন্তার সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই।

ভারতবর্ষের সমাজে ধর্মসম্প্রদায়গত অনৈক্য, হিন্দু সমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, উপজাতীয় সমাজ ও তার সমস্যা—এইসব নিয়ে ইতিহাস-অর্থনীতি-সমাজতত্ত্ব-আশ্রিত বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর স্বকীয় রীতিতে। নারীমুক্তি ও স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক প্রসঙ্গে পুরুষ ও নারীর অসাম্য, বিরোধ ও দ্বন্দ্বের ভিত্তি, সহযোগিতার সূত্র, বিবাহবিচ্ছেদ, মাতৃত্ব, একগামিতা ও বহুগামিতা, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভিত্তি—এইসব বিতর্কিত ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে সংস্কারমুক্ত সহানুভূতিশীল ও কল্যাণবুদ্ধি-আশ্রিত আলোচনা করেছেন।

স্বদেশের সামাজিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করতে করতে অম্লান ক্রমে চলে গেছেন সমাজতত্ত্বের মূল বিষয়গুলির আলোচনায়। ব্যক্তিচেতনা ও প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। একদিকে তিনি মানুষের চেতনাবিকাশের সমান্তরাল সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও বিবর্তন লক্ষ করেছেন। সমাজবিবর্তনের দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বকে সাধারণভাবে স্বীকার করে নিলেও দ্বন্দ্বের আরো যে নানা চেহারা আছে সেগুলিকেও গৌণভাবে দেখতে তিনি রাজি নন। যেমন, এ প্রসঙ্গে ধর্মভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, স্বাদেশিক ঐক্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলির দীর্ঘ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে দ্বন্দ্বের উৎস কত বিচিত্র।

দেশে আর বিদেশে যেসব মহান ব্যক্তির চিন্তাধারা আর কর্ম অম্লান দত্তের চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের ওপর যথেষ্ট ছাপ ফেলেছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি তাঁদের কয়েকজনের মূল্যায়ন করেছেন। এই আলোচনা অনেক সময়েই করা হয়েছে তুলনামূলকভাবে এবং যুগের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রেখে। এঁরা হলেন রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, রাসেল, মানবেন্দ্রনাথ ও বিনয়কুমার সরকার ও আম্বেদকর। এঁদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি তরুণ বয়স থেকে শুধু চিন্তাগতভাবে নয় ব্যক্তিগতভাবেও ঘনিষ্ঠ, আর বিনয়কুমার সরকারের তো তিনি স্নেহাস্পদ ছাত্র।

যেসব ভাবনাচিন্তা প্রসঙ্গে এইসব মনস্বীদের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা হল স্বাধীনতা ও সাম্য, গণতন্ত্র ও মানবতাবাদ, বিশ্ববোধ প্রেম ও নিয়ম, দ্বন্দ্ব ও অহিংসা, যুক্তি ও ধর্ম, সবকিছু নিয়ে সামাজিক প্রগতি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক মুক্তি।

রামমোহনকে দিয়ে শুরু করে দেখিয়েছেন যে এ দেশে নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহন কিভাবে প্রথম জীবনে যুক্তিনিষ্ঠভাবে সব ধর্মকে বাইরে রেখে বিচার করেছেন ও পরবর্তী জীবনে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি আবিষ্কার করে তারই আলোয় হিন্দুধর্মকে সংস্কারের প্রয়াসী হয়েছেন। যুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার যে সমন্বয় রামমোহনের চিন্তায় প্রকাশিত হয়েছিল, অম্লান দত্তকে তা কতটা প্রভাবিত করেছিল তার কিছুটা পরিচয় পাই ওঁর পরবর্তী কালের লেখা 'ধর্ম ও যুক্তি' নামে গ্রন্থটিতে।

রামমোহনের পরেই রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ হলেন রামমোহন এবং নবজাগরণের সোজাসুজি উত্তরাধিকারী। রবীন্দ্রনাথের কাছে অম্লান যা পেয়েছেন তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার মিলবে তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, স্বাধীনতা ও স্ব-নির্ভরতা, বিশ্ববোধ ও মানবতা, পল্লী পুনর্গঠন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন সবতাতেই অতি স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা এসে গেছে। সেই সঙ্গে গান্ধীর। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণের মানুষ, কিন্তু গান্ধীকে সাধারণভাবে বাঙালী নানা

কারণে কখনোই প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি। অম্লান দত্ত একজন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী যাঁকে সমানভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে এ দেশে জাতীয় জীবনের ও জাতীয় চরিত্রের উন্নয়নে দেশের এই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের ভূমিকা পরস্পরের পরিপূরক। এঁদের চিন্তার মধ্যে মিল যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি অমিলের দিকটাও বিশ্লেষণ করেছেন অম্লান। এই অমিল হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার, বৃহৎ যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্পের ব্যবহার, পল্লীর সঙ্গে নগরের সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা যদিও এই দুজনেরই আত্মিক শক্তির একটা প্রধান উৎস ছিল, কিন্তু জীবনের মূল সুর ও মূল ঝোঁকের ব্যাপারে দুজনের অনেকখানি অমিল ছিল। এই মিল ও অমিল অম্লানের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ—কারণ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঠিকমত অনুধাবন করতে পারলে তবেই আমরা জাতীয় জীবনে এঁদের বাণীকে সফল করে তুলতে পারবো। বাঙালী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে যুগপৎ গ্রহণ করার মধ্যে অম্লানের চিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তারও চেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে গান্ধীর সঙ্গে রাসেলকেও, তিনি নিজের জীবনদর্শন গড়ার কাজে তুল্যভাবে গ্রহণ করেছেন।

রাসেলের কথা লেখা হয়েছে যে প্রবন্ধে তার নাম "আনন্দের সন্ধানে রাসেল"। আনন্দের কথা উঠলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে। অথচ রাসেল ও রবীন্দ্রনাথ দুজনের ব্যক্তিত্বের ও জীবনদর্শনের কত তফাত! আনন্দের একটা সহজ ও নিত্য আনাগোনা ছিল রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, যা সব সংশয়, সব বেদনার মধ্যেও তাঁকে নিয়ত রক্ষা করত, স্নিগ্ধ করত। রাসেলের যাত্রাপথ আরও দুর্গম, কারণ তাঁর যাত্রা শুরু সংশয়, অস্থিরতা আর নৈরাশ্য থেকে। গভীর চিন্তার পর রাসেল জীবন সম্পর্কে কয়েকটি প্রত্যয়ে পৌঁছেছিলেন যেগুলি এত মৌলিক, প্রচলিত সংস্কার ও নৈতিক বিশ্বাস থেকে এত স্বতন্ত্র যে তা সমকালে সাধারণ মানুষকে অনেক সময় বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ করেছে। রাসেলের জীবন-প্রত্যয়ের সঙ্গে অম্লানের নিজের জীবন-প্রত্যয়ের অনেক জায়গাতেই গভীর মিল আছে। অম্লান নিজেও একজন মৌলিক চিন্তার মানুষ। তিনি নিজেও সংশয় থেকে আনন্দের উপলব্ধিতে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। তাই অনেক সময়ই রাসেলের সঙ্গে তিনি একাত্মতা বোধ করেছেন। রাসেলের জীবনে যন্ত্রণা থেকে আনন্দের দিকে যাত্রার অভিজ্ঞতা যেন তাঁর নিজের অনুভবে মিলেমিশে গেছে।

কার্ল মার্ক্স এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর লক্ষ্য সম্বন্ধে অম্লানের অগাধ শ্রদ্ধা, যাঁর ব্যাপক প্রভাব ও অবদান সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ; যাঁর মতকে তিনি গ্রহণ করেছেন আংশিকভাবে ; এবং যাঁর পথকে কখনোই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেননি। তিনি জানেন যে এযুগের রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক রূপান্তর, ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চেহারা—এসব বুঝতে গেলে মার্ক্সকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকা চলবে না বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না। মার্ক্সবাদের শুভ-অশুভ কোন অবদানকেই উপেক্ষা করলে চলবে না। কীভাবে মার্ক্স-এর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব তার বিশদ আলোচনা আছে তাঁর লেখায়।

মানবেন্দ্রনাথ তরুণ অম্লান দত্তের ওপরে অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিলেন, যদিও বিশ্লেষণের কয়েকটি ত্রুটি তিনি লক্ষ করেছেন এবং মানবেন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকেও তিনি সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। ভোগবাদ-বিরোধী-দর্শন সম্বন্ধে বা ধর্ম সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তা এবং অম্লান দত্তের চিন্তায় হয়ত পার্থক্য থাকবে। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় যে লক্ষণগুলি তাঁকে সবচেয়ে আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাশীল করেছে তা হল এর গভীরতা, এর বিবর্তন, এর ধারাবাহিকতা। একদা সহিংস জাতীয়তাবাদী

মানবেন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করেও যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাকে পরিত্যাগ করলেন, শ্রেণীসংঘাত তত্ত্বের ঊর্ধ্বে উঠে নবমানবতাবাদে পৌঁছলেন, সমষ্টিশক্তির ঊর্ধ্বে ব্যক্তিমানুষের পূর্ণতাকে অধিকতর মূল্যবান বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন, দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে নির্দলীয় গণতন্ত্রের চিন্তায় গিয়ে পৌঁছলেন এবং যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তাকে সর্বাধিক মূল্যবান বলে গ্রহণ করলেন, সেই বিবর্তনের সুনিপুণ সশ্রদ্ধ বিশ্লেষণ রয়েছে অম্লান দত্তের মানবেন্দ্রনাথ বিষয়ে প্রবন্ধটির মধ্যে।

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার সমস্যা, এই প্রসঙ্গে বি. আর. আম্বেডকরের আন্দোলন, ভারতের রাজনীতিতে ও সামাজিক পরিবর্তনে সেই আন্দোলনের ভূমিকা—এসব নিয়ে অম্লান দীর্ঘকাল ধরে ভাবনাচিন্তা করেছেন। আম্বেডকরের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সাম্প্রতিকতম লেখাটিতে এই শক্তিশালী, বিদ্রোহী ও বিতর্কিত মানুষটিকে ও তাঁর আন্দোলনকে একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। লাঞ্ছনা-অপমান ও তজ্জনিত দুঃখবেদনার মধ্যে বলিষ্ঠভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো এই আপোষহীন অহিংস-সংগ্রামী মানুষটিকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সমর্থনের সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিনি, দেখিয়েছেন যে বিভক্ত ভারত নয়, সমান অধিকারের ভিত্তিতে স্থাপিত ঐক্যবদ্ধ ভারতই ছিল তাঁর কাম্য।

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ করে এদেশের উচ্চশিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে অম্লান দত্ত বহু বছর ধরে ভাবনা চিন্তা করছেন। তিনি দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন, উপাচার্য হিসাবে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন, গবেষণা সংস্থার পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন। ফলে দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর ব্যাপক ও গভীর অভিজ্ঞতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। শিক্ষা বিষয়ে অম্লানের ধারণাগুলি এ দেশের জনপ্রিয় শিক্ষাধারণা থেকে অনেকটাই পৃথক। কিন্তু যা তিনি যুক্তিযুক্ত ও সঠিক বলে জেনেছেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা বা সংকোচ করেননি। উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা, ইংরেজী ভাষা ও হিন্দীভাষা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত যথেষ্ট বিতর্কিত। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যতদূর সম্ভব প্রসার ও সার্বজনীনতা তাঁর কাম্য। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসারের চেয়ে গুণগত মান উন্নয়নকে তিনি অধিক জরুরি বলে মনে করেন। প্রসার ও গুণগত মানোন্নয়ন এই দুই এর আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামত বিতর্কিত। তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সক্রিয় রাজনীতি ও দলীয় রাজনীতির চর্চা সম্পর্কে তাঁর মতামতও হয়তো ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেরই মনোমত না হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বশাসন এবং দায়বদ্ধতা তাঁর অভিপ্রেত। এইসব সমস্যাগুলি নিয়েই আলোচনা করেছেন তাঁর শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে।

সমসাময়িক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা ছাড়াও সমসাময়িক কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও ভবিষ্যৎকালের চাহিদার কথা ভেবে শিক্ষার লক্ষ্য পাঠক্রম প্রণালী ও পরিচালনা সম্বন্ধে মৌলিক অনেক চিন্তা পাই তাঁর লেখা থেকে। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রভাব অনেকটাই দেখা যাবে। শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অম্লান গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে, অর্থাৎ প্রধানত অসংগঠিত অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষার সপর্কস্থাপনের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীর শিক্ষাদর্শের মূল সূত্রগুলিকে বর্তমান অবস্থায় এদেশের জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন তিনি।

শিক্ষার আরো যে দুটি গুরুতর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার একটি হল ব্রেনড্রেনের সমস্যা। অন্য যে সমস্যাটি তিনি লক্ষ করেছেন এবং উদ্বিগ্ন হয়েছেন তা হল আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তার বিকাশ সম্বন্ধে অবহেলা। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও, তাঁর অন্যান্য আলোচনার মধ্যেও নানা প্রসঙ্গে শিক্ষার কথা ও শিক্ষাগত তাৎপর্যের কথা এসে গেছে, এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের জন্য যার মূল্য অপরিসীম।

যে প্রবন্ধগুলিকে এই সংকলন গ্রন্থে 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' শীর্ষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলিতে মননের সঙ্গে উপলব্ধির এক অসাধারণ রাসায়নিক সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ জীবনবোধ। মানুষ সম্পর্কে, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে, প্রেম সম্বন্ধে, জীবনের মহত্তর মূল্যবোধ সম্বন্ধে এই রচনাগুলি। এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একদিকে সাধনালব্ধ নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত দৃষ্টি, অন্য দিকে সহানুভব ও স্বার্থহীন প্রীতি। সব মিলিয়ে এক ব্যাপক বিশ্বদৃষ্টি ও নিগূঢ় জীবনবোধ।

প্রচলিত অর্থে ধর্মবিশ্বাসী না হয়েও ধর্মচিন্তা বা ধর্মবোধের প্রসঙ্গটা অম্লান কখনও এড়িয়ে চলেননি। সমাজের এবং ব্যক্তির বিকাশে ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে বলেই তিনি মনে করেন। ধর্মের শুভ-অশুভ দুই প্রভাব সম্পর্কেই পূর্ণ সজাগ হয়ে তিনি শ্রদ্ধা ও সতর্কতার সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। অন্যের চিন্তাকে বিশ্লেষণ করেই নয়, বরং প্রধানত নিজের চিন্তা ও উপলব্ধির উপর ভিত্তি করেই অম্লান ধর্ম-সম্পর্কে এমন কিছু মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যা ধার্মিক ও অধার্মিক উভয় শ্রেণীর মানুষের কাছেই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ওঁর নানা রচনার মধ্যেই প্রসঙ্গক্রমে ধর্মের উল্লেখ আছে। 'পল্লী ও নগর' গ্রন্থে ধর্ম বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। কিন্তু 'ধর্ম ও যুক্তি' নামে অতিসাম্প্রতিক গ্রন্থটিতে আছে এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। এই গ্রন্থ অম্লান উৎসর্গ করেছেন তাঁর দুই বন্ধুকে, যাঁদের একজন হলেন ঘোষিতভাবে নাস্তিক যুক্তিবাদী, অন্যজন উদার মতাবলম্বী ধার্মিক সন্ন্যাসী। সম্ভবত লেখকের বাসনা এই যে, দুই প্রত্যন্তবাদী দুই সৎ মানুষের তথা সৎচিন্তার মধ্যে এই গ্রন্থ এক ডায়ালগের সেতু তৈরী করুক।

ধর্ম ও অধ্যাত্মবোধ বিষয়ক রচনাগুলিতে অম্লান নিজে বুঝেছেন এবং পাঠকদের বোঝাতে চেয়েছেন যে জীবনধারণের অসংখ্য গ্লানি, তুচ্ছতা, ব্যর্থতা, মৃত্যু ও শোক এসবকে সহনীয় করে তোলার জন্য এবং এ থেকে উর্ধ্বে ওঠার জন্য মানুষের জীবনে অন্য এক উপলব্ধি দরকার। যে বিশ্ববোধ, অহেতুকী প্রীতি, অপার বিস্ময়বোধ ও আনন্দবোধ এবং অভয়বোধের সমাবেশকে অম্লান অধ্যাত্মবোধ বলে চিহ্নিত করেছেন, প্রার্থনায় বিশ্বাসী সাবেকী ধার্মিকেরা তাতে সন্তুষ্ট হবেন কিনা সন্দেহ। যুক্তিবাদীরাও ঐ ধরনের মানসিক অবস্থাটিকে একধরনের নৈতিক এবং শৈল্পিক অনুভূতির অধিক কিছু মনে করবেন কিনা জানি না। অধ্যাত্ম উপলব্ধির খুব কাছাকাছি যে শিল্প-উপলব্ধি, তার স্বরূপ এবং তার সঙ্গে অধ্যাত্ম উপলব্ধির মিল-অমিল নিয়েও আলোচনা করেছেন অম্লান। ঐসব আলোচনা থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, শুধু তত্ত্বকে মস্তিষ্কজাত করা নয়, উপলব্ধিরও গভীরে গিয়ে পৌঁছেছেন তিনি 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ' নামে ছোটো রচনাটিতে তাঁর বিশ্ববোধ ও জীবনবোধের গাঢ়তম প্রকাশ দেখে বিস্মিত হতে হয়।

এই গভীর উপলব্ধির পরেও আবার তিনি সংসারের ছোটো বড়ো সমস্যার মধ্যে অবতরণ করবেন, লিখবেন ভারতের জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে, চীনের

ছাত্র-আন্দোলন, পূর্ব ইয়োরোপের কালান্তর বা আর্থিক উন্নয়নের সমস্যা নিয়ে। কিন্তু অনুমান করি যে, যে জীবনবোধ ও বিশ্ববোধে তিনি পৌঁছেছেন এবার থেকে তার সুর কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও পরিস্ফুটভাবে তাঁর সব রচনার মধ্যেই অবিরাম বাজতে থাকবে, বাজতেই থাকবে।

১

রাজনীতি

গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি

১

যে-শাশ্বত ধর্মে পিতামহদের আস্থা ছিল সেই নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস এ-যুগে দুর্লভ। এই বিশ্বাসভঙ্গের সামাজিক পটভূমিকার প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টি আকর্ষণ করা বর্তমান প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের পক্ষে প্রয়োজন।

মধ্যযুগীয় ধর্ম শুধু কয়েকটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সীমায়িত ছিল না; সামাজিক আচার বিচার, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীর রীতিনীতিতে পার্থক্য যদিও প্রাচীনকাল থেকেই সুস্পষ্ট এবং ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে ও পর্যটকদের বিবরণে এই পার্থক্যের প্রতি যদিও তৎকালীন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, তবু কোনো বিশেষ সমাজের রীতিনীতিতে যতদিন পরিবর্তন প্রকট হয়ে ওঠেনি ততদিন সেই সমাজের মানুষের পক্ষে নিজস্ব আচার বিচারের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন হয়নি। বরং বিশেষ ব্যক্তি বা বংশের আয়ুস্বল্পতার তুলনায় প্রাচীন বিধিনিষেধের স্মরণাতীত যুগে উৎপত্তি ও অব্যাহত প্রতিষ্ঠায় সেদিন এমনই একটা অবিনশ্বরতার অঙ্গীকার ছিল যে, শাস্ত্রীয় সত্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ আকাশের গায়ে থুতু দেবার মতই হাস্যকর প্রয়াস মনে হয়েছে।

একই সমাজের বিভিন্ন স্তরে রীতিনীতির পার্থক্য প্রাচীন যুগেও চোখে পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভিতর সম্পর্ক সামাজিক অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে নির্ণীত ছিল; আর একই মানুষের পক্ষে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ সহজ ছিল না। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্থান অথবা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই ছিল। আধুনিক যুগে সামাজিক পরিবেশে যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতর যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিশেষত মধ্যযুগে গড়ে উঠেছিল আজ সে ব্যবধান ভেঙ্গে যাচ্ছে। একই লোকের পক্ষে সমাজের এক স্তরে জীবন শুরু করে বিভিন্ন স্তরে অতিক্রান্ত হওয়া আধুনিক সমাজে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় একই লোক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন আচারে অভ্যস্ত ও বিভিন্ন বিচারে বিশ্বাসী হবার প্রয়োজনের সম্মুখীন। সামাজিক ভাঙ্গাগড়ার যুগে আচার বিচারের সনাতনত্বের চেয়ে তার আপেক্ষিকতাই যদি ব্যক্তির চেতনায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আধুনিক বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য এ-দিক থেকে লক্ষণীয়। পণ্ডিত মহলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নানা তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে, মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ঐতিহ্যের বাহক ছিলেন। শাস্ত্রের শ্রদ্ধান্বিত ব্যাখ্যা, প্রচলিত সমাজনীতির

স্বপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা, এবং পাণ্ডিত্যের সহায়তায় সাধারণ মানুষের মনে এই নীতিগুলি সম্বন্ধে একটা ভীতিমিশ্রিত ভক্তির ভাব সৃষ্টি করা মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীর প্রধান কর্তব্য ছিল। মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই সমাজের একই স্তরের বাসিন্দা ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ এদেশের ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-যুগের বুদ্ধিজীবীরা সমাজের নানা স্তর থেকে এসেছেন। এঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যগত পটভূমিকা এক নয়। এ-বিষয়ে আধুনিক সমাজ-তাত্ত্বিকদের এবং বিশেষত সুপণ্ডিত মানহাইমের চিন্তাধারা অনুধাবনযোগ্য। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিকোণের দ্বন্দ্ব আধুনিক বুদ্ধিজীবী মহলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগে জ্ঞানার্জনের রাজপথ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, শ্রদ্ধা ; আর আধুনিক যুগে, সন্দেহ।

এ-যুগের সন্দেহপ্রবণতা শুধু আচার বিচারের বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়। সত্য, ন্যায় ইত্যাদি মৌল আদর্শ সম্বন্ধেও এ-যুগের মনে অবিশ্বাস প্রবল। অর্থাৎ, নৈর্ব্যক্তিক সত্য এবং নিরপেক্ষ ন্যায়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও অনেকে সন্দিহান। নিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনাকে সন্দেহ করেই আধুনিক দর্শনের একটি প্রধান ধারা শুরু হয়েছে। আরও লক্ষণীয় আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিশেষ ঝোঁক। এ-যুগের মনস্তাত্ত্বিক বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তির বিশ্বাস ও ব্যবহার অনিবার্যভাবে তার অবদমিত বাসনা দ্বারা নানা জটিলপথে নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির চিন্তায় অবচেতন কামনার প্রভাব এমনই ওতপ্রোত যে তাতে কোনো নিরপেক্ষ সত্যের প্রতিফলন আশা করা বাতুলতা। নিরপেক্ষ ন্যায় সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। ফাশিবাদী বিশ্বাস করেন যে, মানুষের ইতিহাসে প্রধান ঘটনা জাতির সঙ্গে জাতির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যখন প্রত্যক্ষ নয়, আপাতদৃষ্টিতে যখন আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষিত, তখনও ভিতরে ভিতরে যুদ্ধেরই আয়োজন চলে। আর যুদ্ধই যদি ইতিহাসের মূল উপাদান হয় তো ন্যায়ের কোনো নিরপেক্ষ আদর্শের কথা বলা হাস্যকর। জাতীয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য কোনো উপায়ই অন্যায় নয়। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতেও মানুষের ইতিহাস সংগ্রামেরই ইতিহাস, শ্রেণীসংগ্রামের। প্রতিটি শ্রেণী সেই নীতির দ্বারাই চালিত হয়ে থাকে যাতে তার স্বার্থ রক্ষিত হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ন্যায়ের কোনো শাশ্বত আদর্শের কথা বলা ভাবালুতা। সত্য সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দর্শনে একটা দ্বিধা লক্ষ করা যায়। কার্যক্ষেত্রে যে-মতটির প্রভাব বেশি তা এই যে, প্রতিটি শ্রেণী সত্য হিসাবে তাই গ্রহণ করে থাকে যাতে তার স্বার্থ সিদ্ধ হয় ; এবং এই দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে কোনো নিঃশ্রেণীয় সত্যের কল্পনা, বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ছলনা মাত্র।

২

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সত্যের যে-রূপ ব্যক্তিবিশেষের কাছে প্রত্যক্ষ তা সেই ব্যক্তির মানসিক গড়ন ও সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে। আর যদিও একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা বিভিন্ন তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, ব্যক্তির বৈষয়িক স্বার্থ বহু পরিমাণে শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্যক্তির দৃষ্টিকোণে শ্রেণীয় দৃষ্টিকোণের প্রভাব প্রায়শ লক্ষণীয়।

কিন্তু "শ্রেণীসত্য" বলে কোনো সত্য নেই। এ-বিষয়ে সিডনি হুকের মন্তব্য স্মরণীয়। শ্রেণীসত্য বলে কোনো বস্তু নেই ; শ্রেণীগত স্বার্থে সত্যের বিকৃতি বা অপলাপ আছে মাত্র। যেমন সত্যের শ্রেণীগত বিকৃতি আছে, ন্যায়েরও তেমনই। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের

এই শ্রেণীগত বিকৃতি স্বীকার করতে হলেও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে সত্য ও ন্যায়ের একটি আদর্শগত প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা প্রয়োজন। ফাশিবাদ অথবা উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যেমন শ্রেণীস্বার্থে তেমনই জাতীয় স্বার্থেও সত্য ও ন্যায়ের অপলাপ সম্ভব, কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে। হিটলারের অস্ট্রিয়া দখলে জাতীয় ন্যায়ের কোনো নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি ; ন্যায়ের আদর্শ জাতীয় স্বার্থ দ্বারা অপমানিত হয়েছে মাত্র। স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচারিতায় ন্যায়ের অপলাপ ঘটে মাত্র, ব্যক্তিগত ন্যায়ের কোনো নূতন উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষ হিসাবে প্রতি মানুষের আত্মোন্নতির সমানাধিকারের যে-নীতি যুগ-যুগ ধরে দুর্বলের দুর্বলতা ও ক্ষমতাবানের ক্ষমতা দ্বারা খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগের আদর্শবাদীদের চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছে, সেই সর্বমানবিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের পরিমাপেই কোনো বিশেষ স্থান-কাল নিবদ্ধ বা রাজশক্তি নির্ধারিত বিধির নৈতিক মূল্যায়ন সম্ভব।

ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সংস্কার অথবা স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে সত্য ও ন্যায়ের একটা শাশ্বত প্রতিষ্ঠা আছে, এ-বিশ্বাস যে-সমাজে চূর্ণ হয়ে যায় সে-সমাজ ক্রমশ চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অথবা রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের দিকে এগিয়ে যায়। যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো সত্য না থাকে প্রতিটি ব্যক্তিই তবে অভিজ্ঞতার এমন একটি দ্বীপ যার সঙ্গে অন্য কোনো দ্বীপের কোনো সেতুবন্ধন নেই। এমনই একটা ধারণার বশে আধুনিক শিল্পসাহিত্যের কোনো কোনো মহলে একটা অহংকেন্দ্রিক দুর্বোধ্যতার দিকে দুর্নিবার ঝোঁক লক্ষণীয়। শিল্পের ক্ষেত্রে এই ঝোঁক যে-যে সমাজে বেশীদূর ব্যাপ্ত হয়েছে সাধারণত সেই সেই সমাজে আবার এক ধরনের "বোহেমীয়" বিশৃঙ্খলার দিকেও ঝোঁক দেখা গেছে।

সমস্যা অবশ্য এখানেও শেষ হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক স্থাপন শুধু ব্যবহারিক স্বার্থের খাতিরে নয়, মনের স্বাস্থ্য ও সমগ্রতার জন্যই একান্ত প্রয়োজন। সমাজে পারস্পরিক সাহিত্যের ভিত্তি যখন চূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন আদিম বন্য সংহতির ভিতর আশ্রয়হীন মানুষের মনকে আহ্বান করা সহজ হয়। এমনই একটা হিংস্র সংহতির অভিব্যক্তি হিসাবেই জার্মানীতে নাৎসীবাদের আবির্ভাব। আধুনিক একনায়কতন্ত্র শুধু শাসনব্যবস্থার একটা বিশেষ রূপ নয়। সত্য ও ন্যায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণার উপর আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে ন্যায়ের প্রতি আনুগত্যকেই তিনি উচ্চতর কর্তব্য বলে বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রের বিশেষ বিধিকে অতিক্রম করেও সত্য, ন্যায় ইত্যাদির একটা স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠা আছে বলেই অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রকে অমান্য করবার নৈতিক অধিকারও আমাদের আছে। আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায়ের এই আদ্য প্রতিষ্ঠা অস্বীকৃত। অবশ্য আইন অমান্য করবার অধিকার আত্মরক্ষার খাতিরে কি সার্বিক, কি গণতান্ত্রিক কোনো রাষ্ট্রই স্বীকার করে নিতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিবেকভিত্তিক আপত্তি বা অসহযোগ ("conscientious objection") গ্রাহ্য করবার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ অপরাধীদের তুলনায় একটা বিশেষ মর্যাদা দেবার দিকে যে ঝোঁক আছে, আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রে তার বিপরীত ঝোঁকই প্রকট। রাজনৈতিক বন্দীরাই সার্বিক রাষ্ট্রে ধিকৃততম অপরাধী। এবং বিরোধীদের সকল নৈতিক মর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাঁদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার সযত্ন চক্রান্ত আধুনিক সার্বিক আন্দোলনের নীতিবিশেষ। বলা বাহুল্য যে, বহু তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আজ সার্বিক আন্দোলনের এই ঘৃণ্য নীতির প্রভাবে আক্রান্ত।

এ-প্রসঙ্গে আরও লক্ষ করা যায় যে, সার্বিক রাষ্ট্রের অধিনেতারা নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী "সত্য" উদ্ভাবন করতে দ্বিধা করেন না। নাৎসী জার্মনীর অন্যতম অধিনেতা হিমলারের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হবে না। হিমলার বলেছিলেন :

"We don't care a hoot whether this or something else was the real truth....science proceeds from hypotheses that change every year or two. So there is no earthly reason why the party should not lay down a particular hypothesis as the starting point, even if it runs counter to current scientific opinion. The one and the only thing that matters is to have ideas of history....that strengthen the people in their necessary national pride."

হিমলার এখানে সত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে আধুনিক অবিশ্বাসকেই সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করছেন। বৈজ্ঞানিকেরাও যখন সত্যজ্ঞানে পৌঁছতে পারেন না, তাঁদের পূর্বকল্পিত ধারণার যখন কিছুদিন পর পরই পরিবর্তন ঘটে, তখন বিজ্ঞানবিরোধী একটা তত্ত্বকে, অর্থাৎ মিথ্যা বলে প্রমাণিত একটা তত্ত্বকেও, জাতীয় স্বার্থে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে ক্ষতি কি ! কম্যুনিস্ট শাসিত সোভিয়েত দেশেও একই দুর্লক্ষণ বার বার দেখা গেছে। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ইতিবৃত্তকে মিথ্যা ভাষণে পরিণত করতে কম্যুনিস্ট নেতারা ইতস্তত করেননি। উপরে উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে national' শব্দের স্থানে 'class' শব্দটি বসালে বহু কম্যুনিস্ট নেতারই ঐ বাক্যটিতে কার্যত গভীর আপত্তি থাকবে না।

পোলানীর একটি স্মরণীয় উক্তি দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা যেতে পারে।

"the totalitarian form of the State arises logically from the denial of reality of this realm of transcendent ideas. When the spiritual foundations of all freely dedicated human activities—of the cultivation of science and scholarship, of the vindication of justice, of the profession of religion, of the pursuit of free art and free political discussion—when the transcendent grounds of all these free activities are summarily denied, then the State becomes, of necessity, inheritor to all ultimate devotion of men. For if truth is not real and absolute, then it may seem proper that the public authorities should decide what should be called the truth." (Michael Polanyi, The Logic of Liberty), অর্থাৎ যদি রাষ্ট্রের উর্ধ্বে এমন কোনো আদর্শ না থাকে যে-আদর্শের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা যায়, তা হ'লে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের শরণার্থী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর সত্যের যদি কোনো তৎপ্রতিষ্ঠা না থাকে, তা হলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "সত্য" নির্ধারিত করা অযৌক্তিক বিবেচিত নাও হ'তে পারে।

৩

সত্যের সাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস এক জিনিস ; আর সেই সত্য কোনো শাস্ত্রবিশেষে সীমায়িত অথবা কোনো বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় সিংহাসনারূঢ়, এ-সিদ্ধান্ত ভিন্ন জিনিস। এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া আজ না-প্রয়োজনীয়, না-বাঞ্ছনীয়।

এ-কথা স্বীকার করে নিতে বাধা নেই, বরং স্বীকার করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় যে, সত্যের

প্রকাশ বিচিত্র এবং তার আংশিক উপলব্ধিও মিথ্যার প্রলেপে আচ্ছন্ন হবার নিয়ত সম্ভাবনা। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ-দিক থেকেই আমাদের আত্মজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান বাড়াবার পথে সহায়ক। যে-কোনো ব্যক্তির সত্যোপলব্ধিতে সত্যানৃতের মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী বলেই স্বাধীন মতপ্রকাশ ও আলোচনার গণতান্ত্রিক অধিকার সত্যের পথে সহায়ক। অর্থাৎ, যে-হেতু কোনো সাময়িক সিদ্ধান্তেই সমগ্র সত্য বিধৃত হতে পারে না, অতএব বিভিন্ন, এমনকি পরস্পরবিরোধী, নানা সিদ্ধান্তের সহসত্তা এবং ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর সত্যের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টাই সুস্থ সমাজে প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছনীয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজেও যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজেও তেমনই মিথ্যাকে রোধ করবার নামে স্বাধীন আলোচনার পথ রুদ্ধ করলে তাতে সত্যকেই রোধ করা হবে। অনুন্নত উপজাতীয় (tribal) সমাজব্যবস্থায় একটা স্বতস্ফূর্ত সামাজিক ঐক্যবোধ লক্ষ করা যায়। এই উপজাতীয় একতাবোধের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানে আবারও আমরা দ্বন্দ্বমুক্ত সেই সহজ ঐক্যভাবে বা তার কোনো বিকল্পরূপে ফিরে যেতে পারব। কিন্তু সামাজিক ও মানসিক দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে মানুষ আজ কর্মে ও চিন্তায়, সাধ্যে ও অনুশীলনে এতো বিভক্তীকৃত যে, উপজাতীয় ঐক্যের আদর্শে প্রত্যাবর্তন আজ অসম্ভব। আধুনিক সমাজে তাই শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি এবং জীবনচর্চার অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী প্রকাশ স্বাভাবিক। বিভিন্ন বৃত্তি, পরিস্থিতি অথবা চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরে যাঁদের অবস্থান তাঁদের ভিতর মত ও নীতির মৌলিক দ্বন্দ্ব আজকের জটিল সমাজে অস্বাস্থ্যের নয়, বরং স্বাভাবিক স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। ভয়ে, সাময়িক উত্তেজনায়, অথবা আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাবে যখন মানুষ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখনই শুধু এই দ্বন্দ্বের সাময়িক নিবর্তন সম্ভব। যদি গণতান্ত্রিক অধিকার বাহ্যত স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও কোনো সমাজে আজ নীতির ক্ষেত্রে মতৈক্য ও বিচারের ক্ষেত্রে মৌলিক দ্বন্দ্ব উচ্চারিত না হয়, তা হ'লে সে সমাজ অসুস্থ সমাজ ; আর যে-রাষ্ট্র মতের মৌলিক দ্বন্দ্ব উচ্চারণ করবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে সে-রাষ্ট্র সমাজের নৈতিক ভিত্তিকেই বিপন্ন করেছে।

দ্বন্দ্বের অধিকার মৌলিক ; কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাসেরও স্থান আছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি হিসাবে ঐক্য বাঞ্ছনীয় এই একটি বিশ্বাসে যে, সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্নমুখী অন্বেষণের লক্ষ্য হিসাবে এমন একটি সত্য বস্তু আছে যা অনন্তরূপী হয়েও স্বপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, এ বিশ্বাস যদি না থাকে তা হলে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদই শুধু নিরর্থক কোলাহল ; এবং এমন একটা নিরর্থক ব্যাপার যদি কোনো রাষ্ট্র সাময়িক স্বার্থের প্ররোচনায় অত্যন্ত উপেক্ষার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করতে উদ্যত হয় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

বস্তুত আধুনিক একদলীয় বা অধিনায়কতান্ত্রিক সমাজে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শের প্রতি দু'টি বিপরীত ধারণার যুগ্ম প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। সাধারণ কর্মীকে এই প্রাচীন উপজাতীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করা হয় যে, গোষ্ঠীর নেতা অথবা নেতৃস্থানীয় শাসকমণ্ডলী অভ্রান্ত, সত্যদ্রষ্টাস্বরূপ ; আর নেতৃস্থানীয়েরা বিশ্বাস করেন যে সত্য বলে কোনো বস্তু নেই, রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী সত্য-মিথ্যার নির্ধারণই সঙ্গত রাজনীতি। গণতান্ত্রিকের কর্তব্য এই দুই ভ্রান্তির অবিরাম বিরোধিতা। সত্যের ভিত্তি সাময়িক স্বার্থে নয় ; আবার সত্য কোনো নেতৃবিশেষে মূর্তিমান বা শাস্ত্রবিশেষে সীমায়িতও নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের

স্বাজাত্যবোধের যে-প্রেরণা মানুষের প্রকৃতিগত, সেই এষণা আজ পরিতৃপ্ত হতে পারে শুধু এমন কোনো সাম্যবাদী সমাজে যেখানে মানুষের ঐক্যের প্রতিষ্ঠা-ভূমি কোনো প্রত্যক্ষ শাস্ত্রে অথবা সর্বস্বীকৃত নেতৃত্বে নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতিতে এবং এই মৌল উপলব্ধিতে যে, যে সত্যকে বহু মানুষ বহুভাবে অন্বেষণ করছে সেই সত্যই মানুষকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী অথবা জাতি হিসাবে বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করে একটি বৃহৎ সামান্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

গণযুগ ও গণতন্ত্র (১৯৬৭)

সত্যাসত্য

প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের একটা বড় পার্থক্য এই যে, সে যুগে পরিবর্তনের ধারা ছিল সাধারণত মন্থর ; এ যুগে সব কিছু দ্রুত বদলে চলেছে। ফলে সত্য সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীও পালটে গেছে। সে যুগেও অবশ্য ইতিহাস নিশ্চল ছিল না। কিন্তু যাঁরা প্রাচীন ও অভিজ্ঞ তাঁদের দৃষ্টিতে প্রায়শ ইতিহাসের গতি ছিল চক্রবৎ, যার বৈশিষ্ট্য পুনরাবৃত্তি। একটির পর একটি পরিবর্তনের ধারা ধরে মানুষ এক প্রত্যাবর্তনহীন যাত্রায় চলেছে, এমন ধারণা মধ্যযুগীয় মানসে প্রাধান্য লাভ করেনি।

অতএব সে যুগে সনাতন ধর্মে বিশ্বাস সহজ ছিল।যে-সমাজব্যবস্থা এবং যে-সব আচার শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে এসেছে তার স্রষ্টা নয় মরণশীল মানুষ। তার মূলে আছে কোনো অমর সত্য। সেই সত্যেরই ব্যাখ্যা মেলে শাস্ত্রে ; ব্রাহ্মণ তার ব্যাখ্যাতা। ধর্ম অনুযায়ী প্রজাপালন ও দণ্ডবিধান রাজার কর্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সবাই সনাতন ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ। এই নিয়ে সমাজ।

এটা শুধু প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কথাই নয়। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজেও যাজকশ্রেণী ও রাজন্যবর্গের প্রাধান্য ছিল, আর শাস্ত্রের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। সম্রাট ও ধর্মগুরুর ভিতর হয়তো মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিত। কিন্তু ইয়োরোপের চিন্তার জগতে সেদিন ধর্মের প্রভাব ছিল প্রশ্নাতীত। আচার-বিচার, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুর ওপরই এই প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল।

ইয়োরোপে আধুনিক যুগের শুরু ও বাণিজ্যের প্রসার একই সঙ্গে দেখা দিল। এই যোগাযোগ কাকতালীয় নয়, বরং এর ভিতর একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। মধ্যযুগের জগৎ ছিল ছোট ছোট গ্রামীণ সমাজে বিভক্ত। এইসব ক্ষুদ্র ও স্বয়ংভর সমাজের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ ছিল নগণ্য। এই পরিবেশেই আঞ্চলিক আচার-বিচার সনাতন নিয়মের মর্যাদা লাভ করে। বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের হাওয়া দেশের ভিতর বইতে লাগল। পৃথিবী যে বিপুলা, তার বৈচিত্র্য যে অপার, এই বোধ চেতনাকে নাড়া দিতে লাগল। বণিক শ্রেণীর সেই ক্ষমতা ছিল, আর্থিক স্বাধীনতা ছিল, যাতে সে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার বন্ধনের বাইরে এক নতুন জীবনধারার সূত্রপাত করতে

পারে।

একই সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন দুয়েকটি সত্য আবিষ্কৃত হল যাতে প্রাচীন বিশ্বদর্শনকে আর রক্ষা করা গেল না। পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে নয়, সূর্য তাকে প্রদক্ষিণ করছে না, বরং এর বিপরীত কথাই সত্য, এই ধারণা আজ আমাদের স্তম্ভিত করে না। কিন্তু সেদিন এই আবিষ্কার বিপ্লবাত্মক ছিল। কল্পনা করা কঠিন নয় যে, বিরাট বিশ্বের একটি পরিচিত নক্‌শা যেদিন হঠাৎ ভুল প্রমাণিত হল সেদিন ইয়োরোপের বহু চিন্তাশীল মানুষ কত দিগ্‌ভ্রান্ত বোধ করেছিলেন।

ধীরে ধীরে সত্য সম্বন্ধে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট হয়ে উঠল। শেষ সত্য অথবা সমগ্র সত্য কোনো মানুষের কাছেই জ্ঞাত নয়। মানুষ সত্যকে শুধু আংশিকভাবে, অসম্পূর্ণভাবে জানে। অতএব গৃহীত সমস্ত ধ্যানধারণাকেই কিছুটা সংশয়ের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন। এই সংশয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপূরক হিসাবে আরও একটি ধারণা চিন্তাশীল মানুষের মনে ক্রমে প্রবেশ লাভ করে। কোনো মানুষই যখন পরম জ্ঞানী নন, সত্যাসত্য নির্ধারণের শেষ দায়িত্ব যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না, তখন বিচারকে মুক্ত করাই শ্রেয়। মতামতের দ্বন্দ্ব যথাসম্ভব নির্বাধ হোক, সময়ের হাতেই সত্য নির্ধারণের ভার ছেড়ে দেওয়া যাক। বেকন বললেন, "Truth is the daughter not of authority but of time." সমালোচনার স্বাধীনতা সত্য সন্ধানের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হল।

দুই

এই উদার চিন্তা ইয়োরোপের সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে, অথবা কোনো দেশে সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছে, এমন কথা বললে অবশ্য ভুল হবে। রেনেসাঁসের ঢেউ সর্বত্র সমানভাবে গিয়ে ধাক্কা দিতে পারেনি। ধর্মীয় গোঁড়ামি চলেছে। পরমতঅসহিষ্ণুতা নব নব বেশে দেখা দিয়েছে বর্তমান শতাব্দীতেও। এমন কি বৈজ্ঞানিকতার ছদ্মবেশেও তাকে দেখা গেছে। এ যুগের একজন নেতা বলেছেন, "সমালোচনার স্বাধীনতা, কথা খুব গালভরা বটে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তায় যাঁরা বিশ্বাসী, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে চিন্তাকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁরা চাইবেন না নতুন ও পুরনো চিন্তার স্বাধীন সহাবস্থান, বরং চাইবেন পুরনো চিন্তার নির্বাসন।" দু'টি ভিন্ন মত একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না ; যদি একটি হয় সত্য, তবে অন্যটি মিথ্যা। মিথ্যাকে স্থান ছেড়ে দেওয়া যায় না ; আর যেহেতু আমার মতটাই সত্য (এটা তো আমাকে ধরে নিতেই হবে!), অতএব পরমত দমনে দোষ নেই। এই হল অসহিষ্ণুতার সপক্ষে সরল যুক্তি। এর প্রভাব আজও দুর্বল নয়।

দু'টি ভিন্নমত অবশ্য একই সঙ্গে সর্বাংশে সত্য হতে পারে না। তবে দু'টি মত একই সঙ্গে আংশিকভাবে সত্য হতে পারে। সমালোচনার অধিকার আমার আছে ; কিন্তু অপরের মত প্রকাশের সুযোগ কেড়ে নেবার অধিকার আমার নেই। যা মিথ্যা, আশা রাখতে হবে যে, সময়ে তা পরিত্যক্ত হবে। সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, এ মত আইন করে বন্ধ করবার প্রয়োজন হয়নি ; আপনিই পরিত্যক্ত হয়েছে। যদি দু'টি মতেই কিছু সত্য থাকে, আশা রাখতে হবে যে সমালোচনার ভিতর দিয়ে দু'য়েরই সত্যাংশ ক্রমে একটি মহত্তর সমন্বয়ে পৌঁছবে। মার্ক্সবাদ ও ফ্রয়েডীয় মতবাদের দ্বন্দ্বে এই রকম একটা সমন্বয়ের কথা কেউ কেউ আজ চিন্তা করছেন। আমরা যে যত বৈজ্ঞানিকই হই না কেন, আমাদের

কারোই এমন শক্তি নেই যে সময়ের উর্ধ্বে উঠে সমন্বয়ের শেষ রূপরেখা আগে থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারি।

তবু প্রশ্ন উঠবে, মতবাদ যখন স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়, তখন? তখনও একই কথা। স্বার্থের দ্বন্দ্বের একটা দিক থাকে যাকে বলে শক্তির পরীক্ষা। আপাতত সেটা আমাদের আলোচনার বস্তু নয়। আমাদের আলোচনার বিষয় হল মতের দ্বন্দ্ব। অধিকাংশ মতামতের পিছনেই অল্পবেশী স্বার্থবুদ্ধি থাকে, বিশেষত সমাজবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তবু মনে রাখা ভালো যে, স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা প্রভাবিত মতবাদও আংশিকভাবে সত্য হতে পারে; আবার নিঃস্বার্থ মতামতেও ভুল থেকে যেতে পারে। প্লাটো অথবা মার্ক্স, গান্ধী অথবা লেনিন কি নিঃস্বার্থ ছিলেন? এ ধরনের প্রশ্ন বেশী না তোলাই ভালো। যদি এঁদের কারোও চিন্তায় কোনো ভুল থাকে তো যুক্তির সাহায্যেই সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব। সে চেষ্টাই করা উচিত। অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন তুলে কিছু প্রমাণ করা যায় না, বরং তাতে সমালোচনার মান নেমে যায়। আমরা স্বভাবতই নিজেকে এবং স্বপক্ষের নেতাকে অপেক্ষাকৃত নিঃস্বার্থ এবং অপরকে স্বার্থান্বেষী মনে করে থাকি। কিন্তু এ নিয়ে বিবাদ করা বৃথা। মতবাদের আলোচনাকে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত করতে পারলেই সত্য নির্ধারণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

মতবাদের ঘাতপ্রতিঘাতের পাশে পাশে আন্দোলন এবং সাংগঠনিক কাজেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। প্রতিদিনের ঘটনায় শক্তির সংঘর্ষই সাধারণত বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে এই মুহূর্তের অনেক বড় ঘটনাও ছোট হয়ে যায়, আর চিন্তার প্রগতির ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে।

মধ্যযুগীয় সমাজে আচার ছিল কঠিন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে তর্কের অন্ত ছিল না। এদেশে প্রাচীন যুগে ভগবানের স্বরূপ নিয়ে কত সূক্ষ্ম বিচারই না হয়েছে! এসব বিচার যে একেবারে নিরর্থক ছিল এমন নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরু থেকেই চিন্তার মোড় ঘুরল। বেকন বললেন, চিন্তাকে 'ফলবান' করতে হবে। যে চিন্তার প্রয়োগ নেই তা নিস্ফল। চিন্তার ইতিহাসে এটা যুগান্তকারী কথা সন্দেহ নেই। মধ্যযুগে পণ্ডিতেরা সত্যাসত্য নির্ধারণ করতেন শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে। আজও কেউ কেউ তাঁদের বক্তব্যের চারদিকে রাশি রাশি আপ্তবাক্যের দেয়াল গেঁথে নিরাপদ বোধ করেন। কিন্তু এটা আধুনিক মনের পরিচায়ক নয়।

চিন্তা কর্মের সহায়ক। অন্তত ঐহিক বিষয় নিয়ে আমাদের যে চিন্তা, কার্যকারিতার দ্বারাই তার সার্থক বিচার। এই রকম একটা কথা আমরা শুনেছি আধুনিক যুগের আদিপর্ব থেকে, বেকন প্রভৃতি চিন্তাশীল লোকদের মুখে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এটা সহায়ক হয়েছে। মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এই মতবাদ একটি নতুন বিজয় পতাকার মতো উত্তোলিত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি নতুন বিপত্তিও ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠল।

মধ্যযুগীয় সমাজে উচ্চ-নীচ বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর একটা ভারসাম্য দীর্ঘদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রাচীনত্বের গুণে যাকে সেদিন প্রশ্নাতীত বলে মনে হয়েছিল। বণিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়ল। শক্তির দ্বন্দ্বকে আর অভ্যস্ত আচার দিয়ে প্রচ্ছন্ন রাখা গেল না। সমাজের বিবর্তনে যে স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতের একটা ভূমিকা আছে, এই বোধ ক্রমশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের কথা অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই কাব্যে ও মহাকাব্যে কীর্তিত হয়েছে। আধুনিক যুগে আমরা বিভিন্ন

শ্রেণীর ভিতর সংঘাতকে নতুন চোখে দেখতে শিখলাম। কেউ কেউ এমন কথাও বললেন যে, শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের মূল কথা।

মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ দাখিল করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক যুগের কোনো কোনো পণ্ডিত বললেন যে, ভগবান সম্বন্ধে ধারণাটা কোন্ কাজে লাগে সেটাই দেখা দরকার ; অবশেষে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ঐ ধারণাটা শোষণের কাজে সহায়ক বলেই শোষক শ্রেণীর কাছে আদরণীয়। একই কারণে শোষিত শ্রেণীর সংগ্রামে হাতিয়ার হিসেবে নাস্তিক্যই গ্রহণযোগ্য। যদি সত্যের বিচার হয় কার্যকারিতা দ্বারা, আর বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী অথবা শ্রেণীর ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব হয় মৌলিক, যদি এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সমাজের কোনো বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ হিতের চিন্তা হয় অলীক, তবে খণ্ড ও বিরোধী তত্ত্বের উর্ধ্বে কোনো এক অদ্বিতীয় সত্যের চিন্তাকে ভ্রান্ত মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না। সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদ যদি আমরা গ্রহণ করি তো সমালোচনার স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। পারস্পরিক সমালোচনার ভিতর দিয়ে কোনো বৃহত্তর সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, কারণ বৃহত্তর সত্য বলে কিছু নেই। শাস্ত্রের বন্ধনের চেয়েও জোরালো এক নতুন অসহিষ্ণুতার বন্ধন এইভাবে চিন্তাকে আবদ্ধ করে ফেলে।

এই সংকট থেকে কি উদ্ধারের কোনো পথ নেই? স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করা যায় না। স্বার্থের দ্বারা আমাদের মতামত প্রভাবিত হয় একথাও স্বীকার্য। কিন্তু বিরোধী স্বার্থ থেকে বিরোধী সত্যের জন্ম হয় এমন নয় ; বরং লোভে, ভয়ে এবং দলীয় বুদ্ধির প্রভাবে সত্যের নানাবিধ বিকৃতির উদ্ভব হয়, একথাটাই মেনে নেওয়া ভালো। যা সত্য তার বিভিন্ন প্রকাশের ভিতর পার্থক্য এবং স্তরভেদ থাকলেও বৈপরীত্য থাকে না। বিরোধী মিথ্যার ভিতরই সমন্বয় অসম্ভব। অতএব 'শ্রেণীসত্য' অথবা দলীয় সত্য বলে কিছু মেনে নেওয়া যায় না। দলীয় অথবা শ্রেণী স্বার্থের প্রভাবে সত্যের বিকৃতি সম্ভব এইটুকুই স্বীকার্য। এই বিকারের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েই একে দূর করবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যে সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন প্রবল, সেখানে সত্যের ঐক্যমুখী ধারণাও সহজ ছিল। আধুনিক যুগে সমালোচনার মূল্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়েছি। এটাকে অগ্রগতি বলেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু দ্বন্দ্ব-প্রবণতা যখন এমন একটা প্রত্যয়ের দিকে আমাদের ঠেলে নিয়ে যায়, যেখানে বিরোধের উর্ধ্বে সত্যের কোনো পরম প্রতিষ্ঠাভূমিকেই আমরা আর স্বীকার করতে চাই না, তখন সত্যানুসন্ধান ও সমালোচনার স্বাধীনতা দুই-ই বিপন্ন হয়। যে সৃষ্টিশীল বৈচিত্র্যগ্রাহিতা রেনেসাঁসের যুগের মহত্তর প্রবণতা ছিল, এইভাবে আমরা তার এক বিপরীত মেরুতে এসে উপস্থিত হই। ব্যক্তিগত ও দলীয় বিচ্ছিন্নতার উর্ধ্বে একটি সাধারণ সত্যের সম্ভাবনামাত্রকে অস্বীকার করবার পরিণতি এই ; এর পর মতের দ্বন্দ্ব, এমন কি ভাব বিনিময়ের চেষ্টাকেও, নিরর্থক মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না। সত্য সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় মনোভাবের সঙ্গে আধুনিক নাগরিক সংশয়বাদিতার একটা নতুন সামঞ্জস্যের তাই প্রয়োজন আছে।

তিন

সত্যের প্রকাশ যে বিচিত্র, আর এই বৈচিত্র্যের পিছনেও যে এক পরম সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন, একথা এদেশে এতই পুরাতন যে, এর পুনরাবৃত্তিতে আমাদের মনে আজ আর কোনো বিশেষ চিন্তা জাগ্রত হয় না। এদেশে বিপদ দেখা দিয়েছে বিপরীত পথে। তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে আমাদের বাস। আমরা একই সঙ্গে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করি, যিনি নাকি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; আবার কুসংস্কারকে সযত্নে পোষণ করে ভয়ে ভয়ে মনসাদেবীর পূজাতেও চাঁদা দিই। এদেশে অহিংসার বাণী এবং পশুবলি, এমন কি নরবলিও, পাশাপাশি চলে আজও। আমাদের ব্রাহ্মণেরা নিরাকার ব্রহ্মের তত্ত্ব জানেন ; জীবমাত্রে দেবদর্শন করেন ; এবং কোটি কোটি মানুষের অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন।

গান্ধী আমাদের শিখিয়েছিলেন যে, অহিংসার অর্থ অন্যায়ের অপ্রতিবাদ নয় ; অহিংসাও যুদ্ধেরই এক ধরন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একমাত্র সভ্য পথ। মতের উদারতার অর্থও এই নয় যে, যাকে আমরা অযৌক্তিক মনে করি তার কঠিন সমালোচনা করব না। মনে রাখতে হবে যে, পরমতসহিষ্ণুতা ও সমালোচনার স্বাধীনতা পরস্পর পরিপূরক। বিজ্ঞান ও কুসংস্কারকে সব দেশেই অল্পাধিক পাশাপাশি পাওয়া যায়। এদেশে এদের দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থানই নিয়ম। এই দ্বন্দ্বহীনতাকে আমরা সহিষ্ণুতা জ্ঞান করি। কিন্তু সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে এই স্থবির ধারণা ভুল। যে-মতবাদকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি তাকে গায়ের জোরে দমন করা যেমন সভ্যতার বিরোধী, তাকে বিনা প্রতিবাদে ক্রমাগত সহ্য করাও তেমনই প্রগতির পরিপন্থী। মতামতের স্বাধীন দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না চলে তবে সমাজ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে। অবশেষে প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো কোনো অন্ধ অসহিষ্ণু আন্দোলন একদিন দেশকে গ্রাস করে। মতামতের স্বাধীন দ্বন্দ্বকে ত্যাগ করে সহিষ্ণুতা গ্রহণীয় নয় ; সেই সংগ্রাম পরিচালনার সভ্য নিয়ম হিসেবেই সহিষ্ণুতা শ্রদ্ধেয়। ব্রহ্মজ্ঞান ও অস্পৃশ্যতার দ্বন্দ্বহীন সহাবস্থানকে সহিষ্ণুতা বললে ঐ শব্দটিকে বিদ্রূপ করা হয় মাত্র।

ভিন্ন মতবাদেও সত্যের অসম্পূর্ণ অংশ আছে। এ কথাটা একটা শুদ্ধ সম্ভাবনা হিসেবে জানাই যথেষ্ট নয়। বিভিন্ন মতবাদের কোনটিতে কতটা সত্য আছে, সেটা নির্ধারণ করবার উপায় হিসেবে মতামতের অবিরত দ্বন্দ্ব প্রয়োজন। সব মতেই কিছুটা সত্য আছে, এ কথা তত্ত্ব হিসেবে মেনে নিয়ে বিচার থেকে ক্ষান্ত হওয়া সত্যের প্রতি অবহেলারই একটি বিশেষ রূপ। আমাদের দেশে আজও এরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এ ব্যাপারে আমাদের জড়তা কাটবে এমন একটা সম্ভাবনা উনিশ শতকে দেখা দিয়েছিল। সেই সম্ভাবনাও আজ বিলীয়মান।

আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দিকে তাকালেই ব্যাপারটা চোখে পড়ে। একই ব্যক্তি বিভিন্ন সভায় নিজেকে রামকৃষ্ণ, গান্ধী, মার্ক্স ও লেনিনের ভক্ত বলে বর্ণনা করেন ; এতে কারও হাস্যোদ্রেক হয় না। আমরা সুবিধা অনুযায়ী পুনঃপুনঃ দল ও মত পরিবর্তন করি। সকল মতকে মনে মনে সমভাবে সত্য, অর্থাৎ সমান অকিঞ্চিৎকর, জেনে নিয়ে আমরা ক্ষমতাবানকে অক্লেশে সত্যের ওপর স্থাপন করেছি।

দার্শনিক তর্কের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য অবশ্য এ দেশে ছিল। কিন্তু সেই তর্ক ছিল বহু পরিমাণে শব্দনির্ভর। এগারো শতকে হিন্দুদের সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর আলবেরুনী

লিখেছিলেন, ভগবৎতত্ত্ব নিয়ে বিবাদ ওঁদের ভিতর বিশেষ দেখা যায় না ; বড় জোর ওঁরা শব্দ নিয়ে কলহ করেন। ("On the whole, there is very little disputing about theological topics among themselves; at the utmost, they fight with words.") এ জাতীয় তর্কের নিরর্থকতা থেকেই বোধ করি অনেকে এই বিশ্বাসে এসেছিলেন যে, তর্কে নয়, ভক্তিতেই সত্যলাভ হয়। যে ফলপ্রসূ সমালোচনার ইঙ্গিত আমরা বেকনের লেখাতে পাই, আমাদের এ যুগের ঐতিহ্যে তা জীবন্ত হয়ে ওঠেনি। এর পর এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, সমালোচনার স্বাধীনতা নামক বস্তুটির মূল্য আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। যদিও একে আমরা ভদ্র নমস্কার জানাতে অভ্যস্ত, তবু সেটা দুর্বল নমস্কার। আজ যদি কোনো ক্ষমতাবান নায়ক সমালোচনার স্বাধীনতাকে দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন তবুও আমরা সম্ভবত একটি অক্ষম নমস্কার জানিয়েই কর্তব্য সমাপ্ত করব।

সত্যাসত্য সন্ধানের দুই মেরুতে দুই সংকট : অহিষ্ণুতা ও অনীহা। যে-রূপে সত্য আমার কাছে উদ্ভাসিত তারই সপক্ষে আমাকে দাঁড়াতে হবে। তবু জানব যে, বৃহত্তর সত্যের একটি ভগ্নাংশ মাত্র আমার দৃষ্টির অধিগম্য। ভ্রান্তি দেখা দেয় দুই প্রান্ত থেকে। কোথাও দল অথবা গোষ্ঠীবিশেষ সমগ্র সত্যের অধিকার দাবী করে মতামতের দ্বন্দ্বকে আপত্তিকর, অতএব সংহারযোগ্য, বিবেচনা করেন। আবার কোথাও ভিন্ন, এমন কি বিরোধী, সমস্ত মতই সত্য হতে পারে এই অভ্যস্ত বিশ্বাসে আমরা মতামতের যুক্তিনিষ্ঠ বিচারকে নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এ দুয়ের মাঝখানে পথ বেছে নেওয়া কঠিন। তাই সত্য যদি-বা সহজ, সত্যের সন্ধান সহজ নয়।

চার

যে জড় প্রকৃতিকে নিয়ে পদার্থবিদ্যা অথবা জ্যোতির্বিদ্যায় গবেষণা চলে, সেই প্রকৃতি যে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার বশবর্তী নয়, এইসব ইচ্ছাঅনিচ্ছার বাইরে যে তার একটা সত্য প্রতিষ্ঠা আছে একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এক্ষেত্রেও অবশ্য গবেষণা ও সত্যানুসন্ধান সামাজিক প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু পরমাণুতত্ত্ব অথবা চাঁদের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞানবিজ্ঞান দেশের সীমানা মেনে চলে না, যদিও পরমাণু শক্তির ব্যবহার এবং চাঁদে যাত্রা নিয়ে জাতিতে জাতিতে সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে অবস্থা ভিন্ন। প্রশ্নটা আগেই একবার উঠেছিল ; কিন্তু আরও খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমান এমনকি অতীত সমাজ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দিয়ে প্রভাবিত। কাজেই আদর্শ অথবা কল্পিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতের সাম্য না থাকলে বর্তমান সম্বন্ধেও দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য হওয়া কঠিন। এই জটিলতা সমাজবিদ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও সমাজবিজ্ঞানীদের ভিতর অম্লমধুর সহযোগিতা সম্ভব ; এখানেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাবের আদানপ্রদান চলছে।

আদর্শের পার্থক্য দুই ধরনের হয়। আমরা ভিন্ন মার্গে বিশ্বাসী হয়েও পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে পারি ; যেমন শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক পরস্পরকে শ্রদ্ধা করেন। আদর্শের এই পার্থক্য দ্বন্দ্বমূলক নয়। কিন্তু যদি কেউ যুদ্ধের ভক্ত হন, যেমন ছিলেন মুসোলিনী ও তাঁর দল, আর অন্য কেউ শান্তিকে আদর্শ বলে জানেন, তবে এ দুয়ের ভিতর বিরোধ মৌলিক। তেমনি মানবতাবাদ বর্ণবিদ্বেষকে শ্রদ্ধা করতে পারে না।

জাতীয়তাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, জাতীয় আদর্শ ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী ও শ্রেণীর দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদের বিশেষ ভূমিকা ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকার্য। কিন্তু এই সংগ্রামী আদর্শে যতটা উচ্ছলতা থাকে, উন্মাদনা থাকে, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে ততটা স্পষ্ট ধারণা থাকে না। আমাদের জাতীয় সংগ্রামে পরিচিত ও অপরিচিত বহু মানুষ অকাতরে জীবনদান করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের অভিভূত করে।

"একলা চল রে" গানটি গান্ধীর প্রিয় ছিল। অগণিত মানুষের যৌথ প্রেরণা ও আত্মদানের সঙ্গে একক মানুষের সত্যানুভূতির একটা মৌল পার্থক্য আছে। যে সহস্র মানুষ নির্ভয়ে বিদেশী শাসকের লাঠি ও বুলেটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁদের ভিতর সামান্য কয়েকজনই গান্ধীর মতো স্বজাতির ক্রুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সর্ববিষয়ে সহমত হতে পারেননি ; প্রয়োজনবোধে তিনি জনগণমনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়কের বিরুদ্ধেও সমালোচনা উচ্চারণ করতে সাহসী হয়েছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামতের সত্যাসত্য বিচার করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। যে সাহসে ব্যক্তি তাঁর সত্যানুভূতিকে আশ্রয় করে জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন, সেই অদ্বিতীয় নির্ভয়তার কথাই এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা হচ্ছে। যৌথ উত্তেজনা যে-নামেই আসুক না কেন, সে যদি ব্যক্তিকে পিষ্ট করে সমষ্টির সঙ্গে একাকার করে দিতে চায়, তবে সেটা নিন্দার যোগ্য।

আমাদের যুগ গণতন্ত্রের যুগ। আমরা আভিজাত্যের স্পর্ধায় বিশ্বাসী নই। মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি ও অধিকার সমস্ত মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই আমরা আগ্রহী। কিন্তু সকল তন্ত্রের মতো গণতন্ত্রেরও বিকার আছে। সেই বিকারের বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করা কর্তব্য। গণতন্ত্রের যুগে যাঁর পক্ষে ভোট বেশী অথবা জনসমর্থন বেশী, তিনি শাসন করবেন এটাই স্বীকৃত বিধি। তার অর্থ এই নয় যে, জনমত অভ্রান্ত, অথবা জনমতের গুণে শাসক অভ্রান্ত। যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী, তিনিও ভ্রান্তির সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে নন। অতএব সংখ্যায় যিনি আজ গৌরবের অধিকারী নন, তাঁরও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমানভাবে রক্ষার যোগ্য। এই স্বাধীনতা প্রকৃত গণতান্ত্রিকের কাছে পরম মূল্যবান। মনে রাখা আবশ্যক যে, নতুন সত্য সংখ্যালঘিষ্ঠের সত্য হিসেবেই প্রথম প্রবেশ লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন করবেন ; সংখ্যালঘিষ্ঠের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে ; এই দুই 'বিপরীতে'র সাযুজ্যেই গণতন্ত্র।

কোনো এক যুগে রাজার অহংকার ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ। এ যুগে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে—জনতা। আজকের নেতা জনতার প্রতিনিধি। সে-যুগের ইয়োরোপে 'অবিশ্বাসী'র শাস্তি হতো, তিনি শয়তানের প্রভাবাধীন এই অভিযোগে। এ যুগে ভিন্ন মতাবলম্বীর বিরুদ্ধে দারুণতম অভিযোগ, তিনি জনতার শত্রু। জনতা অথবা জনগণের নেতা ঈশ্বরের মতোই অভ্রান্ত, শেষ সত্যের অধিকারী, এই মূঢ় ধারণা থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে না পারলে তার বিকৃতি অপ্রতিরোধ্য।

জাতীয়তাবাদীর ভাষায় জাতির অন্য নাম জনতা। সাম্যবাদীরা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে জনতাকে সমার্থকভাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু মানবতাবাদীর পরিভাষাতে মানবজাতির অন্য নাম কখনও জনতা নয়। এর কারণ চিন্তার যোগ্য। জনতা বলতে মানুষের যে-চেহারা সহজেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তা বহু মানুষের ভিড়, প্রায়শ একটি ক্রুদ্ধ সংহতি। কিন্তু মানুষ বলতে আমরা সেই জীবটিকে বুঝি, যে অপরাপর জীব থেকে তার

স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন ; যে সংশয়ের ভিতর দিয়ে সত্যের দিকে অগ্রসর হতে চায় ; যার শেষ পরিচয় কোনো ক্ষুদ্র যৌথ আনুগত্য দিয়ে পরিসমাপ্ত নয়। মানবতাবাদী এই মানুষকে জনতার চেয়ে বড় বলে জানে।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদের একটি দিক নিয়েও সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। মার্ক্সবাদীদের ভিতর অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর আদর্শের একটা দ্বন্দ্বমূলক পার্থক্য আছে। ধনিক শ্রেণী শোষণের নীতিতে আস্থাবান। 'শ্রেণীচ্যুত' হয়ে তবেই ধনিকের পক্ষে শ্রমিকের সঙ্গে আদর্শগত ঐক্যে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব।

এই ধারণাটাকে তথ্য এবং যুক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার। বস্তুতপক্ষে শ্রমিক তাঁর আশা ভরসা অথবা জীবনের লক্ষ্য বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করতে পারেন। প্রথমত তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তারই ভিতর শ্রমিক আন্দোলনের সাহায্যে নিজ অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য অনেক দেশেই শ্রমিক সংস্থাগুলির মূল প্রচেষ্টা এই। আবার তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে থেকেও চিন্তার দ্বারা উচ্চতর একটি সমাজব্যবস্থার ধারণায় পৌঁছতে পারেন এবং সেই আদর্শের জন্য সংগ্রাম করতে পারেন। শ্রমিক তাঁর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ফলে অনিবার্যভাবে ঐ আদর্শের অধিকারী হন একথা তথ্য হিসেবেও ঠিক নয়। এবিষয়ে অন্তত লেনিনের মনে কোনো ভ্রান্ত ধারণাও ছিল না। কথাটি অন্যভাবে বলা যেতে পারে। শ্রমিক তাঁর বিশুদ্ধ শ্রেণীগত চরিত্র থেকে মজুরী বাড়াবার জন্যই সংগ্রাম করে থাকেন ; এর চেয়ে বড় কোনো উদ্দেশ্য তাঁর জীবনকে তখনও চালিত করে না। যে-মুহূর্তে তিনি সাম্যবাদী আদর্শকে কল্পনায় লাভ করেছেন, সে মুহূর্তে তিনি শ্রেণীগত চরিত্রের ঊর্ধ্বে উঠে একটি বৃহত্তর মানবিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

এই অর্থে কি-ধনিক, কি-শ্রমিক উভয়েই 'শ্রেণীচ্যুত' হয়েই, অর্থাৎ শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠে তবেই সাম্যবাদী হন। কেউ হয়তো বা বলবেন যে, এই 'শ্রেণীচ্যুতি' শ্রমিকের স্বার্থে, ধনিকের স্বার্থের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেও দু'টি কথা মনে রাখা ভালো। শোষক ও শোষিতের পারস্পরিক সম্পর্ক উভয়ের জন্যই পরিপূর্ণ মুক্তিলাভের পথে অন্তরায়। এইরকম একটা বোধ থেকেই সাম্যের আদর্শের উদ্ভব। সাম্যবাদী আন্দোলনের চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব বহু পরিমাণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর থেকেই এসেছে। শুধু শ্রেণীগত পরিচয়ে ধনিক অথবা শ্রমিক কোনো শ্রেণীই নমস্য নয়। মানুষ হিসাবে শ্রেণীর ঊর্ধ্বে উঠবার শক্তিতেই ব্যক্তিবিশেষ শ্রদ্ধেয়। অন্তত মানবতাবাদী একথাই বলবেন। সমাজকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার একটিকে দেবতা এবং অপরটিকে দানব কল্পনা করলে তার ফলে অসহিষ্ণুতার এক নতুন শাস্ত্র ও মন্ত্র রচিত হয়।

কিন্তু এসব তর্কও আজ অবস্থার পরিবর্তনে অনেক পরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক। সাম্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ একদিন বিরোধী তত্ত্ব ছিল। মার্ক্স ও বিসমার্কের ভিতর সেতুবন্ধন ছিল না। কিন্তু বিসমার্ক থেকে স্তালিনের দূরত্ব দুরতিক্রম্য নয়। সমাজে রাষ্ট্রের ভূমিকা গত অর্ধ শতাব্দীতেই ক্রমশই বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্বই আজ ক্ষমতার মূল উৎস। এই কর্তৃত্বলাভের জন্য প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং জনতার সমর্থনে যে-লড়াই চলেছে, আজকের সাম্যবাদী আন্দোলন তারই অন্যতম রূপ। ক্ষমতালাভের পর 'সাম্যবাদী' রাষ্ট্রের পরিচালনায় ও শাসকদলের শাখা-প্রশাখায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী নব কলেবর ও নতুন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চাশা আজ পুরনো শ্রেণীস্বার্থ দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগের প্রশ্নও তাই পুরনো অর্থ বহন করে

না। ইতিহাসের পথ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে নতুন সম্ভাবনা আর নতুন মোহিনী ছলনা। সত্যাসত্য আবারও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দিয়ে খণ্ডিত। কিন্তু আজকের ছলনার ভাষা ভিন্ন।

জাতিভেদ ও শ্রেণীবিভাগের পুরনো চিহ্নগুলো অক্ষয় নয়। কিন্তু ক্ষমতার লড়াই দুর্মর। যেহেতু এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে মানুষের সমস্যার শেষ সমাধান পাওয়া যাবে না, অতএব এর প্রকোপ থেকে সত্যকে কি করে বাঁচানো যায়, এর ঊর্ধ্বে সত্যের একটি প্রতিষ্ঠা কি করে রক্ষা করা যায়, সে প্রশ্ন সমস্ত কল্যাণকামী মানুষের জন্য এ যুগের একটি প্রধান প্রশ্ন হয়ে আছে।

গণযুগ ও গণতন্ত্র

স্বাধীনতা লাভের বিশ বৎসর পরে আমাদের রাজনীতিক ইতিহাসে যে নতুন যুগ শুরু হল তার নাম দেওয়া যেতে পারে গণযুগ।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসবিরোধী নেতাদের কেউ কেউ বলেছেন, এই আমাদের দেশে প্রথম সৎ ও স্বাধীন নির্বাচন। কথাটা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। ১৯৬৭ সালে হঠাৎ নির্বাচন পরিচালনায় আমাদের সততার মান উন্নীত হয়েছে এমন নয়। অতীতের সঙ্গে এবারকার অভিজ্ঞতার মূল পার্থক্যটা নির্বাচন পরিচালনার বহিরঙ্গে নয়, বরং গণমনের অন্তরঙ্গে। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা ধূমায়িত অসন্তোষ ভোটদাতাদের মনে অনেক দিন ধরেই প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু পুরনো নেতাদের বিদায় দিতে একটা দ্বিধাও এতদিন এই অসন্তোষের সঙ্গে মিশে ছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে যে জিনিসটা নতুন, তা হল গণমনে একটা অভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয়, স্বাধীন ইচ্ছায় নতুন নেতাকে ডেকে আনবার সাহস। জনগণের মনে এই সাহস ও আত্মবিশ্বাস গণতন্ত্রের পক্ষে একটা বড় সম্পদ।

কিন্তু গণতন্ত্রের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে ভবিষ্যতের কয়েকটি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

জনগণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয় যে শাসনব্যবস্থার নানা ত্রুটি ও দুর্নীতি ভোটদাতাদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। কথাটা সত্য বটে ; কিন্তু এই অনুমানটুকু আশ্রয় করে ভারতময় ভোটের ফলাফলের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব কি ? মাদ্রাজে কংগ্রেস সম্পূর্ণ পরাজিত ; মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস জয়ী। শাসনব্যবস্থায় ত্রুটি ও দুর্নীতি কি মাদ্রাজেই বেশি ছিল মধ্যপ্রদেশের তুলনায় ? এর বিপরীতই যে সত্য এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে ভোট কিসের বিপক্ষে ?

সাধারণ নির্বাচনে কেরলে কম্যুনিস্টদের জয় হয়েছে, উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র দলের। কংগ্রেসের ভিতর একদিকে সাম্যবাদী নামে খ্যাত সুভদ্রা যোশী ও মালব্যের পরাজয় ঘটেছে, আবার অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী দুর্ধর্ষ নেতা পাতিলও জিততে পারেননি। ভোট তবে কিসের পক্ষে ?

অতঃপর রাজনীতির পর্যবেক্ষকদের অনেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এবারকার

ভোটাভুটিতে গণমনের কোনো সদর্থক ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়নি। শিশুর মত আক্রোশে গণমন নিতান্ত বেহিসাবীভাবে পুতুল আছড়ে ভেঙেছে মাত্র। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তটা টেকসই নয়। আসলে দেশের মানুষের অভিপ্রায় নির্ধারণের জন্য আমরা যে প্রশ্নগুলি তুলি অথবা যে-মানদণ্ডের আশ্রয় নিই (দক্ষিণপন্থী ? বামপন্থী ?) ওগুলোই আমাদের বিভ্রান্ত করে এবং নির্বাচনের ফলাফলের প্রকৃত অর্থ আমাদের দৃষ্টি থেকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

ভোট পড়েছে একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতির বিপক্ষে, অন্যদিকে প্রাদেশিকতার সপক্ষে।

প্রাদেশিকতার সপক্ষে—এ কথাটার সামান্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এদেশে উপরের দিকে এমন একটা মত ও নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল যেটা বহু পরিমাণে সর্বভারতীয়। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে অসংখ্য মানুষ বাস করেন তারা অঞ্চল ও ভাষার গণ্ডির বাইরে তাঁদের ধারণাকে বড় বিস্তৃত করতে পারেননি। প্রশ্নোত্তরে কিছুদিন আগে এই আশ্চর্য তথ্যটি প্রকাশ পেয়েছে যে, "ভারত" নামক দেশটি কোথায়, গ্রামের বহুলোক এখনও সেটা জানেন না। গণমনের জাগরণ তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রাদেশিকতারও জাগরণ।

মাদ্রাজে নির্বাচনের ফলাফল ভাষা-ভিত্তিক আঞ্চলিকতারই জয়। এমনকি কেরলেও কংগ্রেসের পরাজয়ের মূলে আছে কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ ততটা নয়, যতটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ও বহুবিস্তৃত বিক্ষোভ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোনো কেরলপুত্র তেমন পদমর্যাদা অর্জন করতে পারেননি, শিল্পপ্রসারে কেরলকে অবহেলা করা হয়েছে, খাদ্যের ব্যাপারে ওঁদের দাবি উপেক্ষিত হয়েছে, এই সব নানা অভিযোগ ওখানে বারবারই শোনা গিয়েছে। উত্তর ভারতে হিন্দীপ্রধান অঞ্চলে জনসঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধিতেও প্রাদেশিকতার প্রকাশ। জাতীয়তাবোধ সম্ভবত আজ মহারাষ্ট্রেই বলিষ্ঠতম, কারণ মারাঠা নিজেকে ভারতের আগামী দিনের নেতা হিসাবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। সেখানে কংগ্রেসের জয় আশ্চর্য নয়।

গণশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতার শক্তি বৃদ্ধির উদাহরণ ইতিহাসে এই নতুন নয়। আকারে ও বৈচিত্র্যে পশ্চিম ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের তুলনা করা চলে। ইয়োরোপের ইতিহাসে গণতান্ত্রিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে বহু ছোট বড় রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান আধুনিক যুগের একটি বড় ঘটনা। এদেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর এক দিক থেকে বিশেষভাবে তুলনীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উনিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাস। স্বাধীনতা লাভের পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম যাঁরা রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেন, তাঁরা আমাদের প্রথমপর্বের নেতাদের মতই ছিলেন খ্যাতি ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে সাধারণের বহু উর্ধ্বে। ১৮২৮ সালে জ্যাকসনের রাষ্ট্রপতি পদে-নির্বাচনে এক নতুন গণযুগের সূচনা হল। এরপর তিরিশ বছর ধরে ঝোঁকটা স্পষ্টত প্রাদেশিকতার পক্ষে। কেন্দ্রীয় শক্তি খর্ব করবার দিকে মার্কিন দেশ তখন যতটা এগিয়েছে, এ-দেশে সেটা প্রায় অকল্পনীয়। একটি উদাহরণই যথেষ্ট। রাষ্ট্রপতি হবার পর জ্যাকসন দেশ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তুলে দিলেন, কেন্দ্রগত নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করবার জন্য! বহুদিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না।

এদেশে আমাদের এই নতুন যুগে বিভিন্ন রাজ্য নানা ব্যাপারে আগের চেয়ে বেশি করে স্বাতন্ত্র্য চাইবে। এই স্বাতন্ত্র্যের দাবি অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া উচিত হবে। মার্কিন দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিবাহ সংক্রান্ত আইন ভিন্ন ; আমাদের দেশে তা নয়। কিন্তু বিবাহ সংক্রান্ত আইন বাংলা ও রাজস্থানে এক না-হ'লেও মহাভারত অশুদ্ধ হত না, যদিও

আইনের জটিলতা তাতে খানিকটা বাড়ত। তেমনি কৃষি ও ভূমিস্বত্বব্যবস্থা কেরলে ও মধ্যপ্রদেশে এক হবার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার বৈচিত্র্য স্বীকার করে নেওয়া ভাল।

কিন্তু সেই সঙ্গে ঐক্যের দাবিটাও উপেক্ষণীয় নয়। বহুত্বের মাঝে দেশের একত্বের প্রতিষ্ঠা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেটা দেখা দরকার। ইয়োরোপ একদিন বহু খণ্ডে খণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু আজ সে ধীরে ধীরে ঐক্য সংগঠনে সচেষ্ট। আমাদের দেশকে আবারও আমরা খণ্ড খণ্ড হতে দিলে তাতে দেশের বিষম ক্ষতি। আর্থিক পরিকল্পনার প্রয়োজনটাও একেবারে ভুললে চলবে না ; উনিশ শতকের প্রথম ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন তুলে দেওয়া হয় দেশময় তখন আর্থিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় ; তবে সেদিনের অবস্থায় সেটাও সহনীয় ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তুলে দেবার কথা এদেশে কেউ বলছেন না। তবে বিভিন্ন রাজ্য আর্থিক ব্যাপারে আরও বেশি স্বাধীনতা চাইছেন। এ-দাবি সর্বতোভাবে অযৌক্তিক নয়। কিন্তু কোথাও সীমা টানা প্রয়োজন। বিভিন্ন রাজ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে যাবে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ডিঙিয়ে, এটা হতে দেওয়া যায় না ; কারণ এতে মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থের অপব্যবহারের সমূহ সম্ভাবনা।

জাতীয় ঐক্য ও ভাষাসমস্যা নিয়েও আজ নতুন করে আলোচনা আবশ্যক। বিভিন্ন রাজ্যে সেই সেই রাজ্যের ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার বাড়বে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসনযন্ত্রের যোগ সহজ হবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার ব্যবহার চাই। সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এই দাবি অমান্য করা চলবে না ; শিক্ষানীতির দিক থেকেও এটা শ্রদ্ধেয়।

কিন্তু উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার পাশে সযত্নে স্থান দেওয়া প্রয়োজন আরও একটি ভাষাকে, সারা ভারতের বিদ্বৎসমাজে অবাধ ভাব বিনিময়ের যেটি বাহন হবে। ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের চিন্তার যোগের কথা এখানে বলছি না। সেটা তো প্রয়োজন বটেই। কিন্তু আপাতত দেশের আভ্যন্তরীন ভাব বিনিময়ের কথাটাই বলছি। ওই ভাব বিনিময় চলে দুটো ভিন্ন স্তরে, ভিন্ন প্রয়োজনে। এক আছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবসা ও হৃদ্যতার বিনিময়। এজন্য কোনো আইন প্রয়োজন হয় না, প্রকৃতির গোপন অথচ অমোঘ নিয়মেই বিবর্তিত হয় প্রাকৃত ভাষা। কিন্তু বহুভাষী দেশে উচ্চচিন্তার সাধারণ বাহন হিসাবে একটি বিশেষ ভাষারও আবশ্যক আছে। এজন্য চর্চা প্রয়োজন। এই অর্থে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাহন একদিন ছিল সংস্কৃত। আজও আমাদের সমাজ সংগঠনের নতুন যুগে দেশব্যাপী বিজ্ঞান দর্শন ও সমাজনীতির আলোচনার মাধ্যম হিসাবে এমন একটি ভাষা চাই যেটি প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে। হিন্দী সে ভাষা হতে পারে না ; দক্ষিণের দ্রাবিড় আন্দোলন আমাদের দ্ব্যর্থহীন ভঙ্গীতে জানিয়ে দিয়েছে যে, হিন্দীও কার্যত ভারতের একটি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা মাত্র। সাধারণ নির্বাচনে জনসঙ্ঘের শুদ্ধ আঞ্চলিক সাফল্যে এই সিদ্ধান্তটাই পুনরায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ভারতময় বিদ্বজ্জন সমাজের চিন্তা বিনিময়ের সাধারণ ভাষা হিসাবে মাতৃভাষার পাশে আমাদের সযত্নে রক্ষা করতে হবে ইংরেজীকে।

কথাটা আবারও বলি। মার্কিন দেশে প্রাদেশিকতার অভ্যুত্থানের ভিতরও জাতীয় সংহতি অটুট থেকেছে অদ্বিতীয় একটি ভাষার সহজ ঐক্যবন্ধনে। সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন একটি দল সারা দেশের ঐক্য বিনষ্ট হতে দেয়নি। আমরা বহু ভাষা ও বহু দল নিয়ে দেশকে যদি এক সূত্রে আবদ্ধ রাখতে চাই তো সেজন্য ঐক্যের সূত্রটি বিশেষ

চেষ্টায় রক্ষা করতে হবে। অবহেলায় ঐক্য রক্ষা পাবে না। মাতৃভাষার সঙ্গে একটি সর্বভারতীয় ভাষাকে উচ্চশিক্ষার জন্য আবশ্যিক করা না হলে প্রথমে দেশের মন ও বুদ্ধি এবং পরে দেশের দেহ খণ্ড খণ্ড হবে।

জাতীয় ঐক্যের জন্য আরও প্রয়োজন দলনির্বিশেষে সংবিধানের প্রতি গভীর আনুগত্য। আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধান জাতিকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যের আকর্ষণে সংহত করছে। এই সংবিধানের সর্বজনস্বীকৃত সীমারেখার ভিতরই আবদ্ধ দলীয় ও প্রাদেশিক দ্বন্দ্ব। এই সীমারেখাটি একবার মুছে দিলে বহির্মুখী শক্তিকে কোথাও আর রোখা যাবে না। নির্বাচনোত্তর গণযুগে তাই সংবিধান আমাদের পরম সম্পদ।

সর্বশেষে আর একটি কথা সংক্ষেপে বলব।

গণশক্তির নবজাগরণ, জনগণের নতুন আত্মপ্রত্যয় ও নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতনতা—এ-সবই বলিষ্ঠ গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু গণযুগের একটি সম্ভাব্য বিপদের প্রতিও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এমন দেখা গেছে যে একদিকে নবজাগ্রত গণশক্তি নিয়মের বন্ধন মানতে চায় না, অন্য দিকে যা-কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট, সাধারণের ব্যতিক্রম, তাকেই সে সন্দেহের চোখে দেখে। এই অসহিষ্ণুতার ফাঁক দিয়েই স্বৈরতন্ত্রের প্রবেশ ; সাময়িক আতিশয্য বলে একে উপেক্ষা করা নিরাপদ নয়। যে দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য সম্বন্ধে মানুষ সজাগ নয়, সেখানে গণজাগরণের প্রথম যুগে যে-একটা বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে, সে-বিষয়ে বহুদিন আগে বিখ্যাত দার্শনিক অরটেগা ই গাসেট স্মরণীয় ভাষায় আমাদের সাবধান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "Today we are witnessing the triumphs of hyperdemocracy....The mass crushes beneath it everything that is excellent, individual, qualified and select. Anyone who is not like everybody runs the risk of being eliminated." দশের থেকে যিনি স্বতন্ত্র দশ তাঁকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখে। এই অন্ধ, অসহিষ্ণু গণশক্তি গণতন্ত্রের শত্রু, কারণ ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর চাকায় পিষ্ট করে স্বাধীন সমাজ গড়া যায় না। গাসেটের ঐ উক্তির কিছুদিনের ভিতরই ইয়োরোপের এক বড় অংশ জুড়ে সামষ্টিক শাসনের চাপে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে।

স্বাধীনতা ও ঐক্য এদেশের দুটি বড় সম্পদ। একদিকে বৃহৎ অথচ একদলীয় শাসনে পিষ্ট চীন আর অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরস্পর বিবদমান ছোট ছোট দেশগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা সহজ হয় যে, ভারতের ঐক্য ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আমাদের কত বড় সৌভাগ্য। এদেশের নতুন গণযুগে এই স্বাধীনতা ও ঐক্যকে সতর্ক দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করে চলতে হয়।

শ্রমিক ও গণতন্ত্র

সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিতে যখন আমরা আস্থা স্থাপন করেছি তখন শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্তশাসনের আদর্শকেও অস্বীকার করা যাবে না। সাম্যবাদের পক্ষে যে-সব যুক্তি বিস্তার করা হয় তার সবই সমান গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকের অধিকারকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করেছেন শুধু মার্ক্সই নয়। এর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে জন স্টুয়ার্ট মিলের চিন্তায়, সকল গণতান্ত্রিকের পক্ষেই যা শ্রদ্ধেয়। আবার মিলের চিন্তায় এই স্বীকৃতির মূলে আছে পূর্ববর্তী সাম্যবাদীদের ধ্যানধারণা। মিলের বার বৎসর পরে মার্ক্সের জন্ম। সাম্যবাদী আন্দোলন তারপর প্রচণ্ড তাত্ত্বিক তর্কে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু এইসব তর্কের ঊর্দ্ধে যে সব আদর্শের প্রতিষ্ঠা শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকের অধিকার তাদেরই একটি।

তর্ক চলবে। পৃথিবীর শ্রমিক এক হোক, এটা মহৎ আদর্শ। কিন্তু পৃথিবীর শ্রমিকের স্বার্থ এক ও অভিন্ন এমন কথা যদি কেউ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে রাখতে চান তো তর্ক অবশ্যম্ভাবী। সাম্রাজ্য থেকে ইংল্যাণ্ড যদি কোনো আর্থিক ফল লাভ করে থাকে তো ইংরেজ শ্রমিকও তার অংশীদার হয়েছেন। ম্যানচেষ্টর ও আমেদাবাদের শ্রমিকের ভিতর স্বার্থের কোনো বাস্তব ঐক্য নেই। যে-সব কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিক আজ দলে দলে ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করছেন তাঁদের সঙ্গে ইংরেজ শ্রমিক স্বার্থের কোনো কল্পিত ঐক্যও বোধ করেন না।

শুধু বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের ভিতরেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্ভব নয়; একই দেশে সকল শ্রমিকের স্বার্থও অভিন্ন নয়। রুশ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিন পরই এই সত্যটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবের পর লেনিন মন্ত্রী থেকে শ্রমিক পর্যন্ত সকলেরই আয় প্রায় সমান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ-ব্যবস্থা বেশীদিন টেকেনি। শ্রমিকদের ভিতরও স্তরভেদ আছে। কেউ অভিজ্ঞ, কেউ বা অনভিজ্ঞ; কারও কর্মে দক্ষতা বেশী, কেউ বা দক্ষ নন। এঁদের ভিতর পারিশ্রমিকের পার্থক্য কতটা হবে? এক ধরনের কর্মী অপেক্ষাকৃত বেশী পেলে অন্যেরা তুলনায় কম পাবেন, এটা তো সহজ কথা। যেহেতু শ্রমিকেরা বিভিন্ন গুণ ও কর্মে বিভক্ত, অতএব তাঁদের ভিতর বাস্তব স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্ভব। আবার ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিতর যেমন স্বার্থের সংঘাত থাকে, কৃষক ও শ্রমিকের ভিতরও তেমনই আছে; কারণ যে-খাদ্য কৃষক উৎপন্ন করেন, শ্রমিক তার ক্রেতা। খাদ্যশস্যের দাম তুলনামূলকভাবে বেশী হলে কৃষক খুশি, কিন্তু শ্রমিক অসন্তুষ্ট। এসব নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশেও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।

কাজেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, একথাটা তথ্যের বিশ্লেষণে দাঁড়ায় না। এটাকে বিশ্বাস হিসাবে ধরে নিলে মজুরশ্রেণীর ভিতর সংগ্রামী ঐক্য সৃষ্টি করা সহজ হয় এটা অন্য কথা। কিন্তু একে 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা দেওয়া বিপজ্জনক। যুদ্ধের সময় জাতীয় স্বার্থের ঐক্যটাকে বড় করে ধরা হয়; তাতে জাতীয় সংগ্রাম প্রচেষ্টা শক্তিশালী হয়। কিন্তু জাতীয় ঐক্যের উত্তেজনাপূর্ণ ধারণাকে আবার গণতন্ত্রের শত্রুরা ব্যবহার করেছেন সকল বিরোধী শক্তিকে সংহার করবার জন্য। এরই নির্মম প্রকাশ আমরা দেখেছি হিটলার মুসোলিনির দেশে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য সম্বন্ধে উত্তেজিত ধারণাকেও তেমনই গণতন্ত্রের সংহারের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সাম্যবাদী দেশে। বাস্তব জীবনে স্বার্থের ঐক্য ও সংঘাত দুই-ই পরস্পর জড়িয়ে থাকে। প্রয়োজনে কখনও একটিকে একমাত্র সত্য ও

সম্পূর্ণ সত্য বলে চালাতে চাইলে শুধু যে সত্যের অপলাপ হয় তাই নয়, সমাজের বুকে নতুন স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার বিপদও দেখা দেয়।

কিন্তু এ তর্ক মুলতুবী থাক। গোড়ার সেই আদর্শের প্রশ্নেই ফিরে আসা যাক। শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্তশাসন সাম্যবাদী আদর্শের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতীয় অথবা শ্রেণীগত স্বার্থের ঐক্যের ধারণা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ধনিকের মুনাফা ও শ্রমিকের মজুরী ঐতিহাসিক সূত্রে পরস্পর বিরোধী, এই তত্ত্বেরও প্রয়োজন নেই। অস্বীকার করে লাভ নেই যে, শিল্পপতি যেখানেই উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতিতে সহায়ক সেখানেই ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ একই সঙ্গে হ্রস্বদৃষ্টিতে বিরোধী এবং দীর্ঘদৃষ্টিতে পরিপূরক। যে-বণিকগণ ও শিল্পনায়কেরা পৃথিবীময় বাণিজ্যবিস্তারে সহায়তা করেছেন ও উৎপাদনপদ্ধতির যুগান্তকারী উন্নতি ঘটিয়েছেন তাঁরা সমগ্র সমাজকেই আর্থিক উন্নতির একটা উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছেন। একথা অন্তত মার্ক্স অস্বীকার করেননি। এসব মেনে নিয়েও আমরা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইতে পারি, অথবা বলতে পারি যে বৃহৎ শিল্পে স্বল্পসংখ্যক লোকের মালিকানা চিরকালের ব্যবস্থাও নয়, আদর্শ হিসাবে মান্যও নয়।

শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে যুক্তিটা ঐসব তাত্ত্বিক তর্কের বাইরে সহজেই স্থাপন করা যায়। মূল কথাটি সহজ। এমন একটা যুগ ছিল যখন সমাজের যাঁরা কর্তা তাঁদের কথা তলাকার মানুষেরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিত। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে শূদ্রের মনে সন্দেহ ছিল না। পুত্র পিতার, ভৃত্য প্রভুর, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ ছিল। সেযুগের সমাজে পরিবর্তনের চেয়ে ঐতিহ্যের প্রভাবই বড় ছিল। আজকের সমাজ গতিশীল। এই গতিশীলতার ফলে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে প্রশ্ন ও সংশয় প্রবল হয়েছে। সে যুগের পুরাতন ভৃত্যের আজ্ঞাবহতা আর আশা করা যায় না। আজকের বৃহৎ শিল্পে শ্রমিক ও পরিচালকের ভিতর সম্পর্কনির্ণয়ের প্রশ্নে সমাজের মানসিক পরিমণ্ডলের এই পরিবর্তন উপেক্ষা করা যায় না। যে-সব নিয়ম শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য তার যৌক্তিকতা শ্রমিকের কাছে স্পষ্ট না হলে নিয়ম কার্যকর করা প্রায়ই অসম্ভব। কাজেই শ্রমিক ও পরিচালকগোষ্ঠীর ভিতর চিন্তার একটা সেতুবন্ধ প্রয়োজন। এরই পরিণতি হিসাবে শিল্পের উপর শ্রমিকের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক। আর্থিক উন্নতির ইতিহাসে ধনতন্ত্রের অবদান যাই হোক না কেন, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য।

এই সঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। শিল্পে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই শিল্পপরিচালনায় শ্রমিকের অধিকার কায়েম হয় এমন নয়। বরং রাষ্ট্রীয়করণের ফলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ধনতন্ত্রের উত্তরাধিকারী হিসাবে আজ দেখা দিয়েছে আমলাতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা। ধনতন্ত্রের মতোই এটাও কোনো ব্যক্তিবিশেষের দুরভিসন্ধির ফল নয়। আধুনিক সমাজ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গঠন ও প্রকৃতিই এমন যে এর ভিতর ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ রোধ করা কঠিন।

অনুন্নত দেশগুলিতে এই বিপদ আরও গুরুতর। আমলাতন্ত্র শিল্পপরিচালনায় দক্ষ না হবার সম্ভাবনা ; বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে দক্ষতার মান বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও নীচু। আবার যে-দেশে স্বৈরাচারের প্রতিরোধী ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি সেখানে একই দোষ আমলাতন্ত্রের আশ্রয়ে সর্বময় হয়ে উঠেছে। সরকারি মালিকানা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন। কিন্তু শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের ফলে যদি অকর্মণ্যতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই আরও সুদৃঢ় হয়ে বসে তবে সেই দুর্দশাকে সমাজতন্ত্রের নামে বরণ করা

অর্থহীন দুর্ভাগ্য। এই বিপদের কথা মনে রেখে আমাদের অগ্রসর হবার পথ নির্ধারণ করতে হবে।

শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে কয়েকটি শর্ত পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

প্রথম প্রয়োজন শ্রমিক সমিতিকে সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী করে তোলা। শিল্পপ্রতিষ্ঠান সরকারী হোক অথবা বেসরকারী হোক, শ্রমিক সমিতি যদি শক্তিমান হয় তো পরিচালকগণ শ্রমিকের কথায় কান পাততে বাধ্য। লাভের একটি অংশ শ্রমিকের প্রাপ্য হবে এই প্রস্তাবটিও সমর্থনযোগ্য। এর ফলে শিল্পের সঙ্গে শ্রমিকের মনের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হবে আশা করা যায়। শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে একটা আপত্তি শোনা যায়। তাঁরা বলেন, ব্যবসায়ে ক্ষতি হলে তার কোনো অংশ কি শ্রমিকেরা বহন করতে রাজী হবেন ? তা যদি না হয় তো লাভের অংশই বা তাঁদের দিতে হবে কেন ? একথা ঠিক যে মজুরী কেটে ক্ষতির বোঝা শ্রমিকদের ওপর চাপানো যাবে না। তবে এক্ষেত্রে একটা বিকল্প ব্যবস্থা শিল্পপতিরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন। বাৎসরিক হিসাবের পরিবর্তে প্রতি বৎসরে পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের লাভক্ষতির গড়পড়তা হিসাবে শ্রমিকের লভ্যাংশ নির্ণয় করা যেতে পারে। এ সবই শুধু প্রথম পদক্ষেপ। এরপর শ্রমিকের প্রতিনিধিকে পরিচালক সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় হবে। আর শেষ লক্ষ্য হিসাবে থাকবে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাঠামোর ভিতর সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্পের পরিচালনা।

কিন্তু এর কিছু শর্ত আছে। আধুনিক শিল্পে যে-শৃঙ্খলাবোধ আবশ্যক, অনুন্নত দেশে তার খুবই অভাব। অথচ এছাড়া কোনো দেশই আজকের পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে না। জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশের দ্রুত উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ শৃঙ্খলাবোধ ও কঠিন পরিশ্রমের অভ্যাস। ধনতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের ভিতর এইসব গুণ একভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সোভিয়েত দেশে স্তালিনী শাসনে এটা সম্ভব হয়েছে অন্যভাবে। আমাদেরও যে-কোনো ভাবে এটা করতে হবে, নয় তো জাতি হিসাবে আমরা পরাজিত হব। শিল্পে স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে কর্মে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের যদি সংযোগ স্থাপন করা যায় তবেই সেই স্বায়ত্ত শাসন সফল হবে, নয় তো সেটা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তৃতীয় প্রয়োজন দেশময় বিজ্ঞানবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার।

বৃহত্তর সমাজে গণতন্ত্র অব্যাহত না থাকলে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও গণতন্ত্রের প্রয়োগ দুর্বল হতে বাধ্য। শিল্পের পরিচালনা আমরা যেভাবেই সংগঠন করি না কেন, শ্রমিক ও পরিচালকের দৃষ্টি অভিন্ন হয় না। এমন কি পরিচালক যদি শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত হন তবু নির্বাচনের পর দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের সম্ভাবনা দূর হয় না ; কারণ দায়িত্বের যেখানে বিভেদ আছে দৃষ্টিকোণের সেখানে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। এই অবস্থায় শ্রমিক ও পরিচালকের ভিতর বিরোধ নিষ্পত্তির একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি একান্ত প্রয়োজন। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, সাধারণ কতগুলি ব্যাপারে পরিচালকের কিছু বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। তার অতিরিক্ত কোনো প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিলে তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতাই গণতন্ত্রের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণীয়। এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো হয় যে, মধ্যস্থ সব সময় নিরপেক্ষ হন না। কিন্তু গায়ের জোরকে মধ্যস্থ করলেও গণতন্ত্র বাঁচে না। কাজেই প্রশ্নটা এই নয় যে, আদর্শ বিচারক আছেন কিনা ? হিংসার চেয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বিচারক যদি পাওয়া যায় তবে তাঁর

বিচারই শ্রেয়। বৃহত্তর সমাজে গণতান্ত্রিক চেতনা যদি জীবিত থাকে তো এমন বিচারক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না। নয় তো শেষ সম্বল অহিংস অসহযোগের পথ তো আছেই।

গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে যোগ করা আবশ্যক বিজ্ঞানবোধ। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেখানে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই সেখানে অনেক বাদবিসম্বাদেরই যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ছাড়া আধুনিক শিল্পনীতির রূপায়ণে কোনো উদ্দেশ্যচেতনা অথবা দিগ্‌বোধ রক্ষা করাই সম্ভব নয়। এযুগে সাম্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক যদি-না সাম্যবাদকে সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর স্থাপিত করা যায়। সেজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের প্রয়োগ। সাম্যের জন্য সংগ্রামে বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের মতো নির্ভরযোগ্য সহায় আর নেই।

যে-কথাটা দিয়ে শুরু করা যেতো তাই দিয়ে শেষ করছি। শ্রমের মর্যাদায় শ্রমিকের মর্যাদা। আমাদের সমাজে বিশ্বকর্মার আসন নীচু। কর্মের সংস্থানও আজ দেশে যথেষ্ট নয়। পঞ্জাবী ও গুজরাতীরা এদিক থেকে ভাগ্যবান। তাঁরা কর্মের সংস্থান করে নিয়েছেন। আর আমরা অভিমান করছি ; হাত-পা ছুঁড়ছি। কিন্তু এটা এগোবার উপায় নয়। শ্রমনিষ্ঠা ও সংগঠনের গুণেই কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। মানুষের বিভিন্ন গুণের ভিতর কোনটাকে আমরা কত উঁচু আসন দেব এ নিয়ে যুগে যুগে দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটেছে। যে-হেতু মানুষ অসম্পূর্ণ এবং সবগুণ কারো ভিতর সমপরিমাণে আশা করা যায় না, অতএব এর ভিতর কয়েকটি গুণকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে ও বাড়িয়ে তুলে যুগের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। এদেশে শ্রমনিষ্ঠাকে আজ একটা বিশেষ সম্মানের আসন দেওয়া প্রয়োজন। গান্ধী ছোট কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে তাকে বড় করতে চেয়েছিলেন ; নিরলস পরিশ্রমের আদর্শ দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক ঝোঁকটা আজও ভিন্নমুখী। আলস্যকে আমরা আজও বড় দোষ বলে মানি না। কর্মের চেয়ে এদেশে বংশের আভিজাত্য বড়। এই আভিজাত্যের দর্পকে নত ক'রে শ্রমিক আন্দোলন যদি শ্রমের মর্যাদাকে উন্নত করতে পারে তো সারা দেশেরই তাতে উন্নতি হবে।

কিন্তু আমাদের ভিতর যাঁরা বৈপ্লবিক ধ্বনি কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন তাঁরা এবিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। আমার একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলছি। যে-প্রতিষ্ঠানে আমি কাজ করি সেখানে একবার এমন একজন তরুণ শিক্ষককে ঘেরাও করা হল, যাঁর তুল্য কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দেশে অথবা বিদেশে বড় চোখে পড়ে না। এঁর কর্তব্যনিষ্ঠার ভগ্নাংশও ঘেরাওকারীদের ভিতর ছিল না ; তাঁদের সম্বল ছিল কিছু বৈপ্লবিক আওয়াজ। বন্ধুবর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী "উলঙ্গ রাজা" নামে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন। এদেশের রাজা ফাঁকিবাজ। বর্ণাঢ্য ধ্বনি দিয়ে তাঁকে আবৃত করার চেষ্টা বৃথা, যদিও এই হাস্যকর আড়ম্বরে করতালি দেবার লোকের অভাব হয় না।

শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টির কাজে সামান্য দানেও অসীম গৌরব। শ্রমের সাহায্যে মানুষ সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়। যে-শ্রমিক আন্দোলন এই মহৎ ধারণায় বিন্দুমাত্র উদ্বুদ্ধ নয়, সে তার ক্ষুদ্রতায় একদিন খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ; ইতিহাসে তার কোনো বড় পরিচয় থাকে না।

সাধারণ নির্বাচন ও গণতন্ত্র

১৯৫০ সালে আমরা ভারতের মানুষেরা, গণতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করেছিলাম। তারপর বারবারই সময় এসেছে নতুন করে নিজেকে দুটি প্রশ্ন করবার। আমরা গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়ে ঠিক করেছি তো ? যদি ঠিক করে থাকি তবে গণতন্ত্রকে ভবিষ্যতে বিপদ থেকে মুক্ত রাখবার জন্য আজ আমাদের কী করণীয় ? চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই দুটি প্রশ্নই আবার আমাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের উদ্যত তর্জনীর মত উপস্থিত।

এই সাধারণ নির্বাচনে বহু স্থানে বিশ বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন কংগ্রেসী রাজত্বের অবসান ঘটেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতারা পরাস্ত হয়েছেন, বহু মুখ্যমন্ত্রী আসনচ্যুত। ভোটের অধিকার শুধুই একটা মামুলী অধিকার, ভোটের সাহায্যে ক্ষমতাবানকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না, অর্থবলের কাছে ভোটদাতার স্বাধীনতা সর্বদাই পরাস্ত, এমন একটা হতাশ ভাবনা গত কয়েক বৎসর ধরে গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে ক্রমশ দুর্বল করে আনছিল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলে গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন ঘটল।

কথাটা আরও একটু তলিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। এমন কোনো আর্থিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই যাতে জীবন থেকে সব অভাব-অভিযোগ অন্তর্হিত হয়। বাস্তববাদী মানুষের এই কথাটা মনে মনে ধরে রাখাই ভাল। বিক্ষোভ সমাজে থাকবেই ; কিন্তু এই বিক্ষোভকে সভ্যভাবে প্রকাশ করবার উপায় থাকা চাই। ক্ষমতার প্রভাবে শাসক অবিনীত এবং অত্যাচারী হয়ে উঠবেন এ-ভয় সব দেশেই থাকবে ; তবে সেই শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করবার একটা শান্তিপূর্ণ পথ খোলা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের প্রতিবেশী নানা দেশে, যেমন ইন্দোনেশিয়া ও চীনে, আমরা ইদানীং গণবিক্ষোভের অন্য এক চেহারা দেখেছি। অত্যাচারী শাসককে সরাবার নামে সেখানে গণশক্তি উন্মত্ত তাণ্ডবে মেতেছে। সেই তুলনায় ভারতের গণতান্ত্রিক নির্বাচন সংযত সুসভ্য। গণতান্ত্রিক হিসাবে এজন্য আমরা গর্বিত।

নির্বাচনের পর কেন্দ্রে কংগ্রেসী দলের গরিষ্ঠতা এখনও অব্যাহত আছে, কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক এর ফলে একটা নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে। এখানে সংকট দেখা দিলে দেশময় তোলপাড়ে গণতন্ত্র বিপন্ন হতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কে সুবিচার ও বন্ধুভাব অক্ষুণ্ণ রাখা তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন।

নতুন পরিস্থিতিতে কোনো কোনো ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করতে চাইতে পারে। কোনো রাজ্য হয়ত মাদকতা নিবারণ নীতি রাখতে চাইবেন, কোনো রাজ্য চাইবেন না। কোথাও ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া হবে, কোথাও হবে না। এই ধরনের কিছু পার্থক্য আগেও ছিল ; এখন সম্ভবত আরও বেশী করে দেখা দেবে। ভারতের মতো বড় দেশে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে নীতি ও কার্যক্রমের কিছুটা বিভিন্নতা ঘটাই স্বাভাবিক। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একই শাসন যখন অটুট ছিল তখন কর্মসূচীর যতটা সাম্য লক্ষিত হত আজ যদি ততটা না হয় তাতে ক্ষতি নেই ; বরং কোনো কোনো ব্যাপারে আর একটু বৈচিত্র্যই ভাল।

তাই বলে রাজ্য সরকারের সকল দাবিই যে ন্যায়সঙ্গত হবে এমন অবশ্য নয়। রাজ্য

সরকার নিজের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য কোনো অসঙ্গত দাবি তুলে কেন্দ্রের উপর সব দোষ চাপাতে চেষ্টা করবেন, এটা একেবারে অসম্ভব নয় ; সারা দেশের দিক থেকে, গণতন্ত্রে সাফল্যের দিক থেকে, এটা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাজেই কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনো রাজ্য সরকার যখন কিছু দাবি করেন তখন সেই দাবি সঙ্গত কি না দেশহিতৈষীমাত্রেরই সেটা দায়িত্বশীল মন নিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে বিচার করবার সাধারণ নীতি হল এই যে, কোনো রাজ্য কেন্দ্রের কাছে যে-অধিকার দাবি করছেন অনুরূপ অধিকার সব রাজ্যকে দিলে তাতে সারা দেশের মঙ্গল কি না। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক। কেরল সরকার দাবি করছেন যে, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার একটি অংশ আলাদা করে কেরলকে দিয়ে দিতে হবে, কারণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ব্যাপারে ঐ রাজ্যের বিশেষ অবদান আছে। এখন বিচার্য হল যে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা যদি এইভাবে বিভিন্ন রাজ্যের ভিতর ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিক থেকে সেটা ভাল কি মন্দ।

সর্বোপরি যে-কথাটা মনে রাখা দরকার তা হল এই : এ দেশে বিভিন্ন রাজ্যে সরকারী মত ও কার্যক্রমের খানিকটা পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক ; কিন্তু সমস্ত দেশের হয়ে যে-গণতান্ত্রিক সংবিধান আমরা গ্রহণ করেছি, নাগরিকের যে-সব মৌল অধিকার তাতে স্বীকৃত আছে, কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রতিটি রাজ্য সরকারকেই সেই সংবিধান ও মৌল অধিকারগুলি মান্য করে চলতে হবে। এক অর্থে এই সংবিধান-স্বীকৃত অধিকারগুলির প্রতিষ্ঠা সাময়িক জনমতের ঊর্ধ্বে। কথাটা কারও অদ্ভুত মনে হতে পারে ; কাজেই সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে রাজাই ছিলেন সব কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু সেই শাসকের স্বেচ্ছাচার যখন চরমে উঠত তখন তাঁকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে রাজার ইচ্ছারও ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা ধর্মের। গণতন্ত্রে জনগণকে বসানো হয়েছে রাজার আসনে। কিন্তু গণতন্ত্রেরও একটা ধর্ম আছে ; বিরুদ্ধ মত শান্তিপূর্ণভাবে প্রকাশের ও সংগঠনের অধিকার, আইন অনুযায়ী বিচার এই সব মৌল নীতি সেই গণতান্ত্রিক ধর্মেরই অংশ। জনগণের চঞ্চল, উন্মত্ত ইচ্ছা যদি কখনও এই মৌলিক অধিকারগুলিকে আঘাত করে তো স্বৈরাচারী রাজার মতোই নিন্দনীয় হয় বিপথগামী গণপ্রবৃত্তি। জনগণের প্রতিনিধিদের অবশ্য অধিকার আছে ঐসব মৌল নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আবশ্যকমতো আইনের পরিবর্তন সাধন করার। তবু আইন অনুযায়ী বিচারই চাই ; 'গণ-আদালতে'র স্বৈরাচার গণতন্ত্রের প্রহসন মাত্র।

এ সব কথা শুধু নীতিগতভাবেই সত্য নয়, আজকের পরিস্থিতিতে এর একটা অত্যন্ত জরুরী ব্যবহারিক তাৎপর্যও আছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে, বিভিন্ন দলের একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরও একাধিক রাজ্যে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। সংবিধানের শর্ত পালন করেই এই সব সরকারকে টিকে থাকতে হবে। এ দেশের সকল দল গণতন্ত্রে সমান বিশ্বাসী নয়। কিন্তু কয়েকটা বাস্তব সত্য সকলেরই মনে রাখা ভালো। কোনো রাজ্যে আইন ও নিরাপত্তা বিপন্ন হলে অনিবার্যভাবেই শিল্প ও মূলধন সে-স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় খুঁজবে— এবং আশ্রয় জুটবেও। পুরনো শিল্প যদি স্থান ত্যাগ নাও করে তবু নতুন মূলধন সুস্থান খুঁজবে। যে-রাজ্য রাজনীতিক দুর্যোগে ক্লিষ্ট সেখানে বেকার ও আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। কোনো বৈপ্লবিক আওয়াজেই এই

সংকট আটকানো যাবে না। যেমন শহরে তেমনই গ্রামে। গ্রামে গ্রামে গৃহযুদ্ধের বীজ ছড়িয়ে সংকট ডেকে আনা কঠিন নয় ; কিন্তু সংকট থেকে মুক্তির পথ তাতে উন্মুক্ত হবে না। সংবিধানকে অচল করা যাবে ; কিন্তু সেই অচল সংবিধানও আমাদের বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসবে।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলে আমাদের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে। কংগ্রেসের অবিসংবাদী দক্ষতার অবসান হয়েছে। এখন প্রয়োজন দায়িত্বশীল, গণতান্ত্রিক বিকল্প দল সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার আমরা পেয়েছি। বহু দলের ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত এই নতুন সরকারের মাধ্যমে কংগ্রেসের সমকক্ষ ঐক্যবদ্ধ, গণতান্ত্রিক, বিকল্প দল গঠনের কাজ যদি সহজ হয় তবেই ভাল। কোন উপদল এই বাঞ্ছিত বিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে দায়িত্বশীল গণমতের তিরস্কার তার প্রাপ্য। প্রধান কথা, গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক প্রচেষ্টা এ দেশে ব্যর্থ হলে তার ফলাফল হবে ভয়াবহ।

গত কয়েক বছরে দেশ নানা দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে গিয়েছে। এর জন্য দলবিশেষকে সম্পূর্ণ দোষী করাটা ভুল। কংগ্রেসের পরাজয়ের প্রয়োজন ছিল, কারণ ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল নয়। কিন্তু কোনো বিকল্প সরকারের কাছ থেকেই আমাদের অত্যন্ত কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয়। দেশের সামনে আরও দুঃখকষ্ট আছে, এর ভিতর দিয়েই আমাদের সাবধানে নিজ নিজ কর্তব্যে রত থেকে এগোতে হবে। প্রতিশ্রুতি অথবা প্রত্যাশার আতিশয্যে বিপদ আছে, কারণ এই আতিশয্যকে আশ্রয় করেই মানুষ সামান্য ভালোটাকে হারায়—কল্পিত অতিভালোর দুরাশায়।

আটষট্টির সন্ধিক্ষণে

গত দু' তিন বছরের আর্থিক সংকট সত্ত্বেও আজ স্বীকার করা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার পর এদেশ এগিয়ে গেছে। গত পনেরো বিশ বছরে খাদ্যোৎপাদন দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ; এদেশের মানুষের আয়ু বেড়েছে দেড় গুণ ; কলেজে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয়েছে চার গুণ। এই উন্নতি দেশের সর্বত্র সমান প্রসারিত হয়নি এবং দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ সমভাবে এর ফল ভোগ করতে পারেনি। যা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী অসমাপ্ত আছে। তবু একথাটা আজ স্মরণ করা ভালো যে, দেশ এগিয়ে চলেছে। আয়ু বেড়েছে সারা জাতির, শুধু ওপরের এক-শতাংশ পরিবারের নয় ; বর্ধিত ছাত্রসংখ্যার একটি ক্রমবর্ধমান অংশ আসছে সেই সব অঞ্চল থেকে, যেখানে শিক্ষা পূর্বে প্রবেশ করেনি ; এবং নতুন একটা অধিকারবোধ ছড়িয়ে পড়েছে স্বাধীন ভারতের সাধারণ মানুষের ভিতর। দেশ বিভাগের রক্তক্ষয়, সীমান্তে দুটি যুদ্ধ, এবং মহান নেতাদের মহাপ্রয়াণ সত্ত্বেও দেশ এগিয়ে চলেছে। গত বিশ বছরের সামাজিক আলোড়নের ভিতর থেকে, পরিচিত জীবনচর্যার দ্রুত অবক্ষয়ের ফলে, আমাদের মনে যে ক্লেশ ও তিক্ততা নিঃসন্দেহে জমে উঠেছে তার ঊর্ধ্বে উঠে দেশের দিকে একবার তাকালেই সন্দেহ থাকে না যে, আমরা

আজ উপস্থিত মহৎ সম্ভাবনার সন্ধিক্ষণে।

অথচ দেশে এমন একটা বিলাপের সুর প্রায়ই শোনা যায় যেন গত বিশ বছর আমাদের শুধু ক্ষয়-ক্ষতিতেই কেটেছে, যেন সকল দিক থেকে আমরা শুধুই তলিয়ে যাচ্ছি, যেন স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের কোনো লাভই হয়নি। গত পনেরো বছরে চীনে খাদ্যোৎপাদন শতকরা যত ভাগ বেড়েছে, ভারতে তার চেয়ে কিছু কম বাড়েনি। একথা বলবার মতো তথ্য আছে। অথচ যাঁরা এবিষয়ে কিছুই জানেন না, তাঁরাও প্রায়ই অত্যন্ত প্রবলবেগে বলতে শুরু করেন যে, চীনে কৃষির আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে এবং ভারতে কিছুই হয়নি। তথ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা দ্বারা এই মিথ্যা স্তুতি ও মিথ্যা বিলাপ কিছুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ; অতএব আমরা নিজ দেশের সমালোচনায় মুখর। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অবশ্য মূল্যবান। সমালোচনার সাহায্যে আমরা যখন আমাদের দোষত্রুটি সম্বন্ধে আরও সজাগ হই, এগিয়ে যাবার পথ আরও পরিষ্কারভাবে চিনে নিতে পারি, তখন সমালোচনার মূল্য অশেষ। কিন্তু মতামতের স্বাধীনতা যখন আত্মধিক্কার ও বিলাপে পর্যবসিত হয়, আমাদের আত্মবিশ্বাসের মূলে আমরা যখন নিজেরাই ক্রমাগত কুঠারাঘাত করতে থাকি, নৈরাশ্যকেই যখন আমরা অতি বড় জ্ঞান বলে প্রচার করি তখন পরিণামে স্বাধীনতারই অপমৃত্যু আসন্ন হয়ে আসে।

আমাদের মনের একটি কোণে আমরা যেন বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে, গণতন্ত্রে আমাদের প্রয়োজন নেই, সংবিধানপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকারে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা যেন মনে মনে এই প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছি যে, এবার কোনো ডিক্টেটর বা ত্রাণকর্তা এসে আমাদের রক্ষা করুন।

অথচ কোনো একনায়কতন্ত্রই এ দেশকে বাঁচাতে পারবে না। দ্য গল, নাসের অথবা আয়ুব খাঁর মতো নেতাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সেই দেশেই বেশী যেখানে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাভাবিক ঐক্যবোধ নেতা-বিশেষকে সহজে গ্রহণীয় করে তোলে। পশ্চিম পাকিস্তান যদি একটি রাষ্ট্র স্বতন্ত্র হতো, তা হলে আয়ুব খাঁর একনায়কতন্ত্র যতটা সুদৃঢ় হতে পারত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভেদের ফলে ততটা হতে পারছে না। ভারত আয়তনে এবং ভাষা ও ধর্মগত বৈচিত্র্যে পাকিস্তানের চেয়ে আরও বৃহৎ ও বিভক্ত বলেই এদেশে কোনো স্থায়ী ও সুদৃঢ় একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে কম।

এদেশের বিশেষ অবস্থায় নিরঙ্কুশ একদলীয়তন্ত্রের সাফল্যও আশা করা যায় না। ভারতের কোথাও জনসংঘ প্রবল, কোথায় দ্রাবিড় দল, কোথাও কংগ্রেস, আবার কোথাও কম্যুনিস্ট দল। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, সুদৃঢ় শাসন স্থাপন করাবার মতো শক্তিশালী কোনো দল এদেশে নেই। মাদ্রাজে জনসংঘ শক্তিশালী হবে অথবা মধ্যপ্রদেশে কম্যুনিস্ট দল প্রাধান্য লাভ করবে এমন সম্ভাবনা কষ্টকল্পনা।

গণতন্ত্র এদেশে বাঁচবে কি না আমরা জানি না। শুধু জানি যে, গণতন্ত্র ছাড়া আমাদের গতি নেই। এই জানাটা যখন আমাদের অধিকাংশের মনে গভীর ও সত্য হয়ে উঠবে, তখন গণতন্ত্রকে বাঁচাবার পথও আমরা অনায়াসে চিনে নিতে পারব।

যে-মানুষ কিছু সাধন করতে চায় সে জানে যে, নিয়ম ছাড়া কিছুই সাধন করা যায় না। আমরাও যেদিন মনেপ্রাণে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চাইব, আমাদের নেতা ও অধিনেতারা, আচার্য ও উপাচার্যেরা যেদিন কতিপয় লোকের হাততালি কুড়োতে কুড়োতে দেশকে রসাতলে নামাতে ব্যস্ত হবেন না, সেদিন একথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হবে যে,

নিয়মের রাজত্ব ছাড়া গণতন্ত্র রক্ষা পায় না। যেহেতু এ দেশে কোনো সর্বাধিনায়ক অথবা দলেরই নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না অতএব এখানে নেতাবিশেষের ঊর্ধ্বে স্থান আবশ্যক নিয়মতন্ত্রের ; অনিয়মের রাজত্বকে ডেকে আনলে দেশের হবে তাতে সর্বনাশ। অরাজকতার পথ আমাদের মুক্তির পথ হতে পারে না।

এই দৃষ্টি নিয়ে তাকালে বহু অবান্তর বচসার সহজে মীমাংসা হয়। ছাত্র ও রাজনীতি নিয়ে একটা কূট তর্ক আজকাল প্রায়ই কানে আসে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার চেয়ে প্রধান আর কিছু হতে পারে না। বিদ্যায়তনের ভিতর ছাত্রদের কোনো "রাজনীতিক অধিকার"ই বিদ্যার্থী হিসাবে তাদের কর্তব্যের ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে না। অতএব মূল প্রশ্ন এই যে, রাজনীতি যে-ভাবে আমাদের ছাত্রদের একাংশের ভিতর আবর্তিত হয়ে উঠেছে, তাতে কি শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে ? শতাব্দীর সাধনায় গড়া কলকাতার একটি শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যালয়কে আমরা কি ইদানীং "ছাত্র রাজনীতি"র আঘাতে জীর্ণ হতে দেখিনি ? শিক্ষার শুচিতাতেই শিক্ষায়তনের শুচিতা। এই শুচিতা যদি শিক্ষকের অবহেলা অথবা ভীরুতায় ক্ষুণ্ন হয় তো শিক্ষক নিন্দার যোগ্য ; যদি কতিপয় ছাত্রের গুণ্ডামিতে বা অসদাচরণে শিক্ষা লণ্ডভণ্ড হয় তো ছাত্র নিন্দনীয় ; যদি সরকার অথবা পুলিশের স্বৈরাচারে একই ফলপ্রাপ্তি ঘটে তো সরকার সমভাবে অপরাধী। শুধু অন্যের প্রতি উচ্চকণ্ঠে দোষারোপে শিক্ষা রক্ষা পাবে না ; নিজের দায়িত্বের কথাটাই প্রথমে চিন্তা করা ভালো।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-কথা সত্য বৃহত্তর রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে ইদানীং বহু আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনও আছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে আর্থিক আনুকূল্য লাভের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নিজের ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে কোনো রাজ্যেরই সমস্যার সমাধান হবে না। যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের সামনে দেশকে গড়বার কাজটাই প্রধান, সেখানে বহু মতের সংঘাতও কাম্য। কিন্তু যে আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কেন্দ্র ও রাজ্যের ভিতর সম্পর্ক বিষিয়ে তোলা, তাতে দেশের ঐক্যের বিনাশ ছাড়া সদর্থক আর কিছুই আশা করা যায় না।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যা মুখ্য তাকে আমাদের মুখ্য বলে মানা চাই, যা গৌণ তাকে গৌণ বলে চেনা চাই। যদি প্রয়োজন হয় তো গণতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য তাঁদের যুক্তভাবে দাঁড়াতে হবে, যেমন দাঁড়ায় একটা জাতি সংকটের মুহূর্তে। সেই জন্য চাই গঠনমূলক কর্মসূচী। দেশ গঠনের জন্য এই মুহূর্তে আমাদের-সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি এবং দেশের ঐক্য রক্ষা। গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতর আগামী দশ বছরে এইটুকু যদি আমরা সাধন করতে পারি তো অন্যান্য সকল বাধা-বিপত্তিও অতিক্রম করা সম্ভব হবে সন্দেহ নেই। এজন্য চাই দেশের ভাষা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান, অন্তত সমস্যাটাকে নিরর্থক আরও জটিল করে না-তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ; বর্গাদারী ব্যবস্থার বিলোপ, গ্রামে গ্রামে শিক্ষার বিস্তার, পঞ্চায়েতী স্বায়ত্তশাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, কৃষির উন্নতির জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার ; শিক্ষাকে বৃত্তি ও বিজ্ঞানের বিবিধ ধারায় চালনা, বিদ্যা ও ব্যবহারের ভিতর পারস্পরিক যোগ স্থাপন, পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন। কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের উন্নতির জন্য শিল্পকে প্রসারিত করা আবশ্যক মহানগরী থেকে দূরে পশ্চিমবঙ্গের উপেক্ষিত জেলায় জেলায়। আগামী দশ বছরের জন্য এই কার্যক্রম দুঃসাধ্য নয় ;

প্রয়োজন শুধু দেশ গড়বার মন ও দৃষ্টি।

এই সহজ কথাগুলি যে আমাদের কাছে সহজ নয়, ধ্বংসের চিন্তাটা যে আমাদের কাছে এতো অনায়াসে আকর্ষণীয়, তার কারণ ভবিষ্যতের পথ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা স্পষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতে আমাদের বিশ্বাস নেই। এই অবিশ্বাসই আজ আমাদের প্রধান শত্রু। আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করি না তাই দেশকে অন্ধ উত্তেজনায় বিনাশের দিকে ঠেলে দিই, আর কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় সেই বিনাশ থেকে শেষ রক্ষা হবে এই অসম্ভব দুরাশাটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরি। অথচ এই নৈরাশ্য ভিত্তিহীন। আমরা জয়ী হতে পারি যদি জয়ী হতে চাই ; আমাদের পরাজিত হবার কারণ নেই যদি না পরাজয়কে আমরা গোড়াতেই অনিবার্য বলে মেনে নিই। গত বিশ বছরে আমরা যতটা এগিয়েছি, আগামী দশ বছরে তার চেয়ে বেশী এগুনো সম্ভব—যদি এই বিশ্বাসে কাজ করি।

গণতন্ত্র ও সমাজবিবর্তন

এক

সমাজবিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে শিক্ষণীয় বস্তু আছে। এ-বিষয়ে পরস্পর বিরোধী নানা তত্ত্ব বা থিওরী এই অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সত্য নির্ধারণে সুবিধা হবে, একথা সন্দেহাতীত।

এই অর্ধশতাব্দীতে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশ বৎসর আগের ব্রিটেন বা আমেরিকা বা সুইডেনের সঙ্গে আজকের ব্রিটেন-আমেরিকা-সুইডেনের পার্থক্য সামান্য নয়। পঞ্চাশ বৎসর আগে আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি ছিল নগণ্য, আজ মার্কিন শ্রমিকের সাংগঠনিক শক্তি অসামান্য।

শ্রমিক আন্দোলনের সংঘবদ্ধ শক্তিকে গণনার মধ্যে না-নিয়ে যাঁরা মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিচার করতে বসেন তাঁরা আজকের মার্কিন সমাজকে চেনেন না। সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ব্রিটেন সুইডেনের দেশব্যাপী সমবায় সংগঠন এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই বিশেষ অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য বহু বিচিত্র আয়োজনও এই আন্দোলনের আর একটি দিক। সাধারণ মানুষকে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে পরিচিত করবার ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজন সাধনে সরকারী নীতিকে প্রয়োগ করবার প্রয়াস ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।

সামাজিক সাম্য এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা এখনও বলা চলে না। বহুক্ষেত্রে অসাম্য প্রকট। মার্কিন দেশে নিগ্রোদের সমস্যা সুবিদিত। আর শ্রমিক-দলের শাসন সত্ত্বেও ব্রিটেনে সম্পত্তির বণ্টনে অসাম্য প্রবল। কিন্তু এসব দেশে গত অর্ধশতাব্দীতে সামাজিক সাম্যের দিকে অগ্রগতি অনস্বীকার্য। সম্পত্তির বণ্টনে গভীর অসাম্য আছে

বটে ; কিন্তু সম্পত্তি থেকে আয়লাভের পথ সঙ্কুচিত হয়েছে। পারিবারিক আয় বণ্টনের এক হিসাবে প্রকাশ যে, ব্রিটেনের শতকরা যে পাঁচভাগ পরিবারের আয় সর্বোচ্চ, দেশের মোট পারিবারিক আয়ে তাদের অংশ ছিল ১৯১৩ সালে শতকরা ৪৩ ভাগ, আর ১৯৪৭ সালে শতকরা ২৪ ভাগ। আয়কর বাবদ দেয় অংশ আয় থেকে বিয়োগ না করেই এই হিসাব।[১] অর্ধশতাব্দী আগে ব্রিটেন-আমেরিকায় উচ্চবিত্তদের আয়ের উপর যে-হারে কর ধার্য হতো নিম্ন-মধ্যবিত্তদের আয়ের উপরও প্রায় সেই হারই ধার্য ছিল। আজ ক্রমে সর্বোচ্চ আয়ের উপর করের হার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পর্যন্ত পৌঁচেছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং ক্ষেত্র-বিশেষে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে ; বেকার-ভাতা এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্রমশ উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের সমস্ত দাবী পূর্ণ না-হলেও দাবী পূরণের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হচ্ছে।

জনসাধারণের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এই অগ্রগতি সম্ভব হতো না। কিন্তু ব্রিটেন-আমেরিকা-সুইডেনে গণতন্ত্রের এই অগ্রগতি বিপ্লবের পথে ঘটেনি, বরং সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের পথেই ঘটেছে।[২]

শাস্ত্রশাসিত ও পরিবর্তন অসহিষ্ণু সমাজে নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমপরিবর্তন সম্ভব হয় না ; এ-দুয়ের ভিতর বিরোধ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজে নূতন চিন্তা ও সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বিত সংস্কার ঘটে ; ফলে পুঞ্জীভূত অসামঞ্জস্যের শোধনের জন্য বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

বিপ্লববাদী তর্ক তুলবেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, আর এই ভিত্তির আমূল পরিবর্তন যে-দিন প্রয়োজন হবে সে-দিন কি সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করে বিপ্লবের পথ অনিবার্য হবে না ! কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যেমন ক্রমপরিবর্তন সম্ভব, সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারেরও তেমনিই। সম্পত্তির উপর কর, বা সম্পত্তির একাংশে মৃত্যুর পর সরকারী অধিকার প্রবর্তন, আজ সংস্কারপন্থী কার্যক্রমের অঙ্গবিশেষ ; অথচ উনিশ শতকী দৃষ্টিতে এধরনের কার্যক্রম ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৌল অধিকারে অসহ্য হস্তক্ষেপ। সম্পত্তির অধিকার বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী সুচিহ্নিত কোনো সম্পদের নিয়োগ অথবা ব্যবহারের অধিকার। এই অধিকারকে অন্যান্য বহু অধিকারের মতোই সামাজিক নানা শর্ত ও দায়িত্ব দিয়ে বেষ্টন করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে সমাজের অধিকারকে সম্পত্তির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত করা সংস্কারপন্থিতার বিরোধী নয়। শিল্প থেকে অংশীদারদের লভ্য আয় সীমায়িত করে দেওয়া কোনো সংস্কারবাদী সরকার নিজের অধিকারবহির্ভূত মনে করেন না ; বিশেষ কোনো শিল্প নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরকার পূর্বতন অংশীদারদের একটা বার্ষিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দিলে, অবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে না ; আর বর্তমান অংশীদারদের মৃত্যুর পর এই বার্ষিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া, অথবা মৃত্যুকালীন শুল্ক হিসাবে সম্পত্তির একটা বড় অংশ সরকারী তহবিলে হস্তান্তরিত করা, কিছু বৈপ্লবিক ব্যাপার নয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় বৈপ্লবিক পদ্ধতি ছাড়াও ধাপে ধাপে ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব।

দুই

অপরপক্ষে যে-সব দেশ এক ধাক্কায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে তাদের বৈপ্লবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এর উদাহরণও অর্ধশতাব্দীতে কম নেই।

অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯২১ সালের আরম্ভ পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবার এক বৈপ্লবিক সাধনা চলেছিল। পুঁজিপতিদের সমাজে অর্থনৈতিক কাজকারবার চলে বাজারে লেনদেনের সাহায্যে, টাকার মাধ্যমে। নূতন কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে এসব কিছুই থাকবে না, টাকার ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে মালমশলা ও উৎপাদন-দ্রব্যের গতি নির্ধারিত হবে, এমন একটা ভাবনা বৈপ্লবিক উৎসাহের সঙ্গে কার্যে পরিণত করবার প্রয়াস চলছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা চালানো সম্ভব হলো না। তৎকালীন অর্থনৈতিক দুর্গতি অংশত গৃহযুদ্ধের অনিবার্য ফল, আর অংশত এই বৈপ্লবিক অসাধ্যসাধনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরিণতি। অল্পকালের ভিতর মোট উৎপন্নের পরিমাণ ভয়ঙ্করভাবে কমে গেল। সেই সঙ্গে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব, যাতে নাকি পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। দেশময় সাধারণ মানুষের বিরোধিতার ফলে এই বৈপ্লবিক সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হলো।[৩]

১৯২১ সালে নূতন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হলো। টাকার প্রচলন, বাজারে লেনদেন, কাজকারবারের পরিচালনায় কারবারী হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির প্রবর্তনের ফলে সোভিয়েত অর্থনৈতিক পুনরভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। বৈপ্লবিক কল্পনাবিলাস পরিহার করে আজ হয়তো স্বীকার করা সহজ যে, বিভিন্ন দেশে টাকার প্রবর্তন এবং বাজারে লেনদেনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শুধু কয়েকজন পুঁজিপতির স্বার্থে নয় বরং সমাজের প্রয়োজনে, অর্থাৎ, সামাজিক সম্পদের বিনিয়োগে হিসাব রেখে ও কার্যের সঙ্গে সরঞ্জামের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবার প্রয়োজনে। বাজারে কোনো দ্রব্যের মূল্য কখনও ন্যায্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায় ; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও কোনো জটিল সমাজে লেনদেনের যন্ত্র হিসাবে বাজারের উপযোগিতা সাধারণভাবে স্বীকার্য। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা শিল্পের জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজন লুপ্ত হয় না। সোভিয়েত দেশে অবশ্য স্ট্যালিনী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে টাকার ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদন পরিকল্পনা বাজারের মাধ্যমে, অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে, নির্ণয় করবার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকেনি। কিন্তু পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে আজ শিল্পের জাতীয়করণ সত্ত্বেও বাজারের ভিত্তিতে অর্থনীতি চালু করবার ব্যবস্থা বহুদূর অগ্রসর ; এবং সোভিয়েত দেশেও ভবিষ্যতে সেদিকে ঝোঁক দেখা দেওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।[৪]

বাজারের অর্থনীতি থেকে একটি মূল শিক্ষা গ্রহণীয়। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় বহু শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যে-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে, নূতন যুগে, অর্থাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের ত্রুটি চোখে পড়ে। যেসব প্রয়োজন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও বিনা আড়ম্বরে সিদ্ধ করে চলে সাময়িকভাবে সেসব প্রয়োজন থেকে দৃষ্টি ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেদিকে ত্রুটি সে দিকটাই হয়তো সমগ্র চেতনাকে অধিকার করে বসে। এ অবস্থায় মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়

পরিবর্তনই সংস্কারপন্থিতা। রক্ষণশীলতা এখানে নিরর্থক, কারণ পরিবর্তন আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লববাদও প্রায়শ নিরর্থক ; কারণ অহেতুক ক্ষয়ের পথে, নানা আতিশয্য অতিক্রম করে বিপ্লবী প্রয়াসও সেখানেই ফিরে আসে—সার্থক সংস্কারপন্থিতার ঝোঁক যেদিকে।

সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করে কেউ হয়তো বলবেন যে, আতিশয্য অতিক্রম করেও ঐ ব্যবস্থা যেখানে পৌঁচেছে, বা পৌঁছবার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে সংস্কারপন্থী সমাজবাদীদের সাধনার মৌলিক প্রভেদ আছে। সোভিয়েত দেশে কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ চাষপ্রথা ও শিল্পের ক্ষেত্রে সামগ্রিক জাতীয়করণ পাশ্চাত্ত্য সমাজবাদীদের কার্যক্রমে স্থান পায়নি।

কিন্তু সোভিয়েত যৌথ চাষপ্রথা এবং শিল্পের সামগ্রিক জাতীয়করণ সমাজবাদী আদর্শের দিক থেকে প্রয়োজন অথবা বাঞ্ছনীয় কি না, এটাও বিচার্য। পূর্ব ইয়োরোপের যে-দেশেই যৌথ খামার থেকে চাষীদের বেরিয়ে আসবার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেখানেই চাষীরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। কম্যুনিস্ট যৌথ চাষপ্রথা শুধু-যে জোরজুলুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, বাধ্যতার ভিত্তিতেই সাধারণত এ-ব্যবস্থা চালু রাখা যায়। বাধ্যতামূলক যৌথ চাষপ্রথায় উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে একথাও আজ যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের কম্যুনিস্ট নেতারা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করছেন। চাষের ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের স্থান আছে নিঃসন্দেহে ; কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক চাষের যে-সমন্বয়ের কথা যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটো কিছুদিন আগে বলেছেন সেই বাঞ্ছিত সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে সোভিয়েত দেশে নয়, বরং সংস্কারপন্থী হল্যাণ্ড-ডেনমার্কে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেকটা অনুরূপ কথাই বলা চলে। স্ট্যালিনী ব্যবস্থায় শিল্প-পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়করণ অতিরিক্তভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, একথা অনেকেই আজ স্বীকার করছেন। এ-প্রসঙ্গে পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে যে নূতন চিন্তাধারা সরকারী দমনরীতি সত্ত্বেও আশান্বিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই নূতন চিন্তাধারার প্রধান প্রস্তাব এই যে : মূল শিল্পগুলিতে রাষ্ট্রের অব্যাহত কর্তৃত্ব থাকবে ; কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ চাষপ্রথার অবসান ঘটবে ; ছোট শিল্পে ব্যক্তিগত পরিচালনা গ্রাহ্য হবে ; শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিকদের, এবং রাষ্ট্রের উপর জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ; আর দেশময় চিন্তার দ্বন্দ্ব এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে। রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সাধারণ কাঠামোর ভিতর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের ভিত্তিতে ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নূতন সমাজব্যবস্থা গঠনের এই আদর্শ আজ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর যতই মৌলিক সমর্থন লাভ করবে ততই এই আন্দোলনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সংস্কারপন্থী সাম্যবাদীদের সহযোগিতা ও ঐক্যের ভিত্তি প্রশস্ত হবে। পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদী ও পূর্ব ইয়োরোপের কম্যুনিস্ট আন্দোলন বিভিন্ন পথে হয়তো অনুরূপ আদর্শের দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে।

তিন

ঘটনার পর প্রায় যে-কোনো ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গেই উক্ত ঘটনার সামঞ্জস্য দেখানো কৌশলী তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ঘটনার পূর্বে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞের যে-প্রত্যাশা তার সঙ্গে পরবর্তী তথ্যের তুলনাতেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের যথার্থ পরীক্ষা ; এবং এই পরীক্ষায় যদি কোনো অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে তা হলে তদনুযায়ী আদিতত্ত্বের সংশোধন বিবেচক বুদ্ধিজীবী সত্যান্বেষীর কর্তব্য।

ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্ভাবনামাত্র নেই, মার্ক্সের আদি চিন্তায় এই ধারণা একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত স্বরূপ। গণতন্ত্রের অভাবে সাম্যবাদী আন্দোলন বিপ্লবমুখী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধনতন্ত্রের যে-যুগে মার্ক্সীয় বিশ্বদর্শনের উৎপত্তি, সে-যুগ, অন্তত মার্ক্সের জন্মভূমিতে, গণতন্ত্রের যুগ নয়। মার্ক্সের চিন্তায় বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা তাই তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তত্ত্বকে পিছনে ফেলেই জীবন এগিয়ে চলে। মার্ক্সের যৌবনের ইয়োরোপের সঙ্গে তাঁর বার্ধক্যের ইয়োরোপের পার্থক্য বিস্তর। আর এই প্রভেদের মূলে আছে তৎকালীন পশ্চিম ইয়োরোপীয় সমাজে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিস্তার।

১৮৪৮ সালের বিখ্যাত ইস্তাহারে মার্ক্স লিখেছিলেন :

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social relations."

অর্থাৎ, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক উচ্ছেদের ফলে। অথচ ১৮৭২ সালে আমস্টারডামে এক বক্তৃতায় মার্ক্সকে বলতে হলো :

"We must take account of the institutions, customs and traditions of various countries, such as the United States and Great Britain—and if I knew your institutions better I should perhaps add Holland—where the workers will be able to achieve their aims by peaceful means. But this will not be the case in all countries."

অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ড, হল্যান্ড, আমেরিকায় শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ পথেই তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। আরও প্রায় বিশ বৎসর পর এঙ্গেলস্ লিখেছিলেন :

"With (the) successful utilisation of universal suffrage, an entirely new method of proletarian struggle came into operation." (The Class Struggles in France, 1848-50, ভূমিকা)।

অর্থাৎ, গণভোটের প্রবর্তনের ফলে সর্বহারা মজুর শ্রেণীর সংগ্রামের একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ খুলে গেছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে শুধু গণভোটের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়নি ; এ-যুগেই ইয়োরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে শৈশব অতিক্রম করে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে বলা চলে। পরবর্তী যুগের ক্রমবর্ধমান সমাজ-সংস্কারের দিক্‌নির্দেশও পাওয়া যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই। উদাহরণত, ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯১৩ সালের ভিতর জার্মানী ও ব্রিটেনে সামাজিক বীমা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তনে রাষ্ট্রের তৎপরতা লক্ষণীয়।

গত অর্ধশতাব্দীতে সংস্কারপন্থী আন্দোলন পশ্চিম ইয়োরোপে যে-আকৃতি ধারণ করেছে উনিশ শতকের শেষভাগে বা বর্তমান শতকের গোড়াতেই তার মূল লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে-সাংগঠনিক শক্তির ফলে এই আন্দোলন তার লক্ষ্যের দিকে এগুতে পেরেছে তার ভিত্তিও এ-যুগেই স্থাপিত হয়েছে। একথা কখনও কখনও শোনা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আধুনিক সংস্কারপন্থী প্রগতি সম্ভব হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায়। কিন্তু সংস্কারপন্থিতার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ক্ষীণ, বহুক্ষেত্রে কাল্পনিক। আমেরিকায় অর্থনৈতিক সংস্কারের স্মরণীয় যুগ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের শাসনকাল। রুজভেল্টের আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী বলা চলে না। নরওয়ে-সুইডেন-নিউজিল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার সংস্কারপন্থী নীতি উল্লেখযোগ্য ; এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুপস্থিত। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও সমাজ সংস্কারে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এটলীর নেতৃত্বে, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগে নয়, বরং সংকোচনের যুগে। আমেরিকা-ব্রিটেন-নরওয়ে-সুইডেন-নিউজিল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকল দেশেই সংস্কারপন্থী নীতির মূলে যদি কোনো একটি শক্তি কার্যকরী হয়ে থাকে তবে তা ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

গণতান্ত্রিক পথে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে সংস্কারপন্থী একটি নতুন যুগের আবির্ভাবকেই মার্ক্স পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন। তবু একথা বললে সম্ভবত ভুলই করা হবে যে, মার্ক্স জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপ্লববাদ ত্যাগ করেছিলেন। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক দর্শনের সঙ্গে বিপ্লববাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে-নূতন যুগের আবির্ভাব মার্ক্সের শেষবয়সের উক্তিবিশেষে প্রচ্ছন্ন সেই যুগের বৈশিষ্ট্য তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করলেও দর্শনচিন্তার ভিত্তিতে স্থান পায়নি। মার্ক্সীয় দর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি ধনতন্ত্রের আদিপর্বের বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমায়িত। মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের ক্রম অবনতি, বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা, ধনতন্ত্রের আশু বিনাশ ইত্যাদি মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণী ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধগম্য। একই কারণে হিংসাত্মক বিপ্লবের নানা বিচিত্র প্রস্তাব ও পরিকল্পনা মার্ক্সীয় দর্শনের ভূমি থেকে বার বার উদ্ভূত হয়েছে ; এবং এই সব প্রস্তাবের তুলনায় "শোধনবাদী"দের বক্তব্য মার্ক্সবাদের মূলভাবের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়েছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই জাতীয় বৈপ্লবিক প্রত্যাশা অবশ্য বার বারই ব্যর্থ হয়েছে এবং মার্ক্সবাদীদের যুক্তিচাতুর্য নিয়োগ করতে হয়েছে বিরোধী ঘটনার সঙ্গে থিওরীর সামঞ্জস্য প্রদর্শনের বক্র চেষ্টায়।

শুধু পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি ; বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গেও মার্ক্সীয় প্রত্যাশার সঙ্গতি নেই। সোভিয়েত ব্যবস্থার যে স্বৈরাচারী অধঃপতন আজ খ্রুশ্চেভের প্রচারগুণে কম্যুনিস্ট মহলেও স্বীকৃত সে-অধঃপতন কি মার্ক্সবাদীরা আশা করেছিলেন ? ধনতন্ত্র সম্বন্ধে "বুর্জোয়া" থিওরীর অলস প্রত্যয় যেমন ঘটনাদ্বারা খণ্ডিত হয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও মার্ক্সবাদী প্রত্যাশা কি তেমনই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি ? এ বিষয়েও তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের অসামঞ্জস্য চিন্তনীয়, এবং আদি তত্ত্বের সংশোধন প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় তত্ত্বের একটি দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব। মার্ক্সীয় চিন্তায় শ্রেণীর সংজ্ঞা সম্পত্তির মালিকানা দ্বারা নির্ধারিত : সম্পত্তিবানের সঙ্গে সম্পত্তিহীনের সংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রাম। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের সঙ্গে আমলাতন্ত্র (bureaucracy) অথবা অত্যাচারপরায়ণ অন্য কোনো গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব

শ্রেণীসংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত নয়, কারণ আমলাগোষ্ঠীর ক্ষমতা মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে কয়েকটি কথা ভেবে দেখবার আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, মালিকানা বলতে সম্পত্তি সংক্রান্ত কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি বোঝায়, এবং এই অধিকারগুলি প্রয়োজনমতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে সঙ্কুচিত করা যায় বা নানা শর্ত দ্বারা বেষ্টিত করা যায়। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাও শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমলাতন্ত্র যেখানে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের একটি যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়েছে সেখানে প্রয়োজন জনসাধারণের স্বার্থে আমলাগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারগুলিকে গণস্বার্থরক্ষী শর্ত দ্বারা কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার লোপ পেলে আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার আর কোনো "বাস্তব" ভিত্তি থাকে না, সোভিয়েত দেশের অভিজ্ঞতার পর এ-ধরনের অলীক থিওরীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে আশা করি অনেকেই আজ ইতস্তত করবেন। যে-কথাটা এখনও পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন তা হলো এই যে, সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে আমলাগোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য এমন কোনো সাধারণ তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে দুই-ই সাধ্যায়ত্ত এবং শান্তিপূর্ণ সংস্কারের পথে সাধনীয় ; যে-সমাজে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংগঠন দুর্বল, সেখানে দুই-ই দুঃসাধ্য এবং বিপ্লবের আশঙ্কা বাস্তব।

চীনদেশের কম্যুনিস্ট নেতা মাও সে-তুং-এর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাও বলেছেন যে, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (contradictions) থেকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থাই মুক্ত নয় ; তবে ধনতান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক (antagonistic)—অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিলোপ ছাড়া এই দ্বন্দ্বের অবসান নেই—আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৈরিতাহীন (non-antagonistic)—অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতরই শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাদ-প্রতিবাদের সমন্বয় সাধন সম্ভব, যদি-না প্রতিপক্ষ 'প্রতি-বিপ্লবী' হন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উদাহরণ হিসাবে মাও গণতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার (centralism) এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারী আমলাগোষ্ঠীর বিরোধিতার উল্লেখ করেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ইতিহাসে বৈরিতাভিত্তিক উৎপাদনপ্রথার অন্তিম পর্যায়।[৫] অথচ সোভিয়েত ও অন্যান্য কম্যুনিস্টদেশে নেতৃস্থানীয়দের ভিতরে বৈরভাব এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনগণের বিরোধ সন্দেহাতীতভাবে প্রকট। মার্ক্সীয় আদি তত্ত্বের সঙ্গে এইসব তথ্যের সামঞ্জস্য প্রদর্শনের চেষ্টা মাও সে-তুং-এর বিবৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৬]

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, বা পূর্ববর্তী কোনো সমাজব্যবস্থায় অনুরূপ দ্বন্দ্ব ছিল, একথা তথ্য হিসাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব ; কিন্তু ইতিহাসে ধনতন্ত্রই অন্তর্বিরোধসম্পন্ন সমাজব্যবস্থার শেষ উদাহরণ, এ ধরনের সিদ্ধান্ত বা ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো তথ্যগত বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, থাকা সম্ভবও নয়। এক প্রকার শূন্যগর্ভ বাক্যের মারপ্যাঁচে মার্ক্সীয়তার্কিক এই বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং একে "বিজ্ঞানসম্মত' বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু এ ধরনের চিন্তায় ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন ও সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না, মোহই বাড়ে। অতীতের মতো ভবিষ্যৎ সমাজেও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তন দুই-ই থাকবে। সমাজতন্ত্র বলতে যদি আমরা কোনো রূপরেখাহীন নিরাকার আদর্শ না-বুঝে বাস্তব একটি সমাজব্যবস্থাই বুঝি তবে এই নূতন সমাজব্যবস্থাও একদিন পরিবর্তনের

স্রোতে অন্তর্হিত হবে। কি ধনতান্ত্রিক কি সমাজতান্ত্রিক—কোনো সমাজব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের অভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান আশা করা যায় না। "সাম্যবাদী" সমাজে নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আমলাগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্রের অভাবে "বৈরিতামূলক" আকার ধারণ করাই স্বাভাবিক। ১৯৫৬ সালে "সমাজতান্ত্রিক" হাঙ্গেরীতে জনসাধারণ ও শাসকগোষ্ঠীর ভিতর দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক আকার ধারণ করবার প্রধান কারণ এই যে, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ সেখানে খোলা ছিল না—আজও নেই। অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

সমাজতান্ত্রিক দেশেও গণতন্ত্রের প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ ও সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অধিকার প্রয়োজন ; এবং এই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হয়। বর্তমান ইতিহাসের এই সাক্ষ্য।

ব্যক্তি ও গণসমাজ

শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগে সামাজিক ভাঙ্গাগড়ার মাঝখানে যে-সব আদর্শ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তারই একটিকে নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। আমরা ভাবতে ভালবাসি যে, ভবিষ্যতের আদর্শ সমাজ হবে একটি ছোট সুখী পরিবারের বর্ধিত সংস্করণ। পরিবারে যেমন সহানুভূতির একটি সহজ ঐক্যে সবাই যুক্ত হয় বৃহত্তর সমাজেও তেমনই একসূত্রে আবদ্ধ হবে সহস্রটি প্রাণ। পরিবারে আমরা ভাইয়ে-ভাইয়ে কলহ চাই না ; আদর্শ সমাজেও তেমনি সবাই হবে একমন, একাত্ম। পারস্পরিক দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি হবে প্রীতির-ভিত্তিতে, অন্ত হবে ক্ষুদ্র স্বার্থের আর ভুল বোঝাবুঝির।

এই আদর্শে এমন একটি আদিম ও মৌল সত্য আছে যে একে শ্রদ্ধা করতে হয়। তবু এর আপাত সরলতা মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতে সমাজকে দারুণ আশাভঙ্গের সংকটে টেনে নামাতে পারে। তাই এর সম্বন্ধে সাবধান হওয়াও প্রয়োজন।

সব মানুষ এক মন এবং প্রাণ, এমন কখনও ছিল কি না জানি না। যদি থেকেও থাকে সে সমাজ আমরা পিছনে ফেলে এসেছি এবং তাতে প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়। মতের অনৈক্য আধুনিক সমাজে অনিবার্য। এ কথাটাই আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। যে-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত পরিবর্তন চলছে সেখানে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অল্পবেশী অবিশ্বাস নিয়ে যুক্তিবাদী মানুষ তাঁর নিজের চিন্তা শুরু করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর সন্দেহ থেকে যেখানে চিন্তা শুরু সেখানে পরিপূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছানোটা আশ্চর্য। এই আশ্চর্য যোগাযোগ তবু আমরা নিয়তই আকাঙ্ক্ষা করি। যুক্তি যদি সত্যে উপনীত হবারই পথ হয় তো যুক্তিবাদী মানুষমাত্রই অবশেষে একমতে পৌঁছবেন কারণ সত্য এক—এমন একটা সরল আশার কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু এই আশাটা অবাস্তব। শেষ সত্যে যখন সমাজ পৌঁছবে তখন সমস্ত পরিবর্তনেরও অন্ত ঘটবে। সেই পরিবর্তনহীন সমাজ তো সৃষ্টির শেষ অঙ্ক ; তার কথা আজ আর

চিন্তাও করা যায় না। যে সমাজে আমরা আছি ও থাকব তাতে পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য ; অতএব মতের অনৈক্যও অনিবার্য।

একথা শুধু আধুনিক মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য চিন্তার ক্ষেত্রেই সত্য নয়, তার সমগ্র উপলব্ধি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। আধুনিক মনের অনেকখানি যন্ত্রণার শুরু এখানেই। ভালো ও মন্দ সম্বন্ধে আমরা যেখানে একমত নই সেখানে পরস্পরকে ভালোবাসাও কঠিন হয়ে ওঠে। যে জগৎকে আমি ভালোবেসে কাছে টানতে পারছি না সে আমার ভালোবাসার ব্যর্থতার সাক্ষী হিসাবে তার কঠিন অস্তিত্ব নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা সহ্য করা সহজ নয়। এই অসহ্য অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয় সেই নাস্তিবাদী পাগলামি যা সব কিছুকে ধ্বংস করতে চায়।

অথবা আমরা সমস্যা সমাধানের কোনো সহজ উপায় খুঁজি। আমাদের সঞ্চিত বিক্ষোভ চালিত করি কোনো স্থূল শত্রুর বিরুদ্ধে। এরই এক উদাহরণ ক্রুদ্ধ জাতীয়তাবোধ। হিটলারের দেশ একদিন চেয়েছিল, এমনই একটা সামষ্টিক ক্রোধে দেশের আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসংবাদকে ডুবিয়ে দিতে। শুধু জাতি নয়, ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আশ্রয় করেও অসহিষ্ণু সংহতিবোধ জেগে ওঠে মাঝে মাঝে। সেই হিংস্র সংহতির উত্তেজনায় সাময়িকভাবে মনে হতে পারে যে, ভাঙ্গা পরিবার তার হারানো ঐক্য বুঝি আবার খুঁজে পেল। নেশার মতই ক্ষণস্থায়ী এই ঐক্য, আর হিংসার মত ধ্বংসাত্মক।

অথবা আমরা মুক্তি খুঁজি নতুন কোনো মোহে। বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসানে সমাজ আবার মনে-প্রাণে এক হবে ; বহু মানুষের এই বৃহৎ সমাজ আবার সহজ পারিবারিক প্রীতিতে আবদ্ধ হবে। এই সরল বিশ্বাসকে আশ্রয় করে আমরা আজকের সমাজকে প্রাণপণে ঘৃণা করি। বিশুদ্ধ নাস্তিবাদীর চিন্তায় একটা অসহ্য আশাহীনতা আছে ; তার চেয়ে ভালো শ্রেণী সংগ্রামের প্রবক্তা যিনি ধর্মযোদ্ধার মতই একটি দূরের আশায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

কিন্তু সেই দূরের আশাও দুরাশা। রুশ বিপ্লবের পর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে। নতুন ক'রে সোভিয়েত সমাজের তরুণেরা জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন বাঁচব ? আবারও তাঁরা আবিষ্কার করছেন একের মনের অন্তরতম যন্ত্রণা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া কত কঠিন। আবারও পিতা ও পুত্রের ভিতর সহোপলব্ধির সেতু ভেঙ্গে যাচ্ছে। নেশা ও নাস্তিবাদের আকর্ষণ আবারও সেখানে প্রবল। চীনের বৈপ্লবিক উচ্ছ্বাস যখন ক্লান্ত হয়ে আসবে তখন একই প্রশ্ন একই সমস্যা সেখানে কি দেখা দেবে না ? আর্থিক ব্যবস্থার বিচার এখানে করছি না ; মানুষের আত্মার যোগের কথাই বলছি। ধনোৎপাদনের যন্ত্র রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই সমাজ সুখী পরিবারে রূপান্তরিত হয় না, মানুষের মনের গভীরতম সমস্যারও কোনো সরল সমাধান দেখা দেয় না। এ কথাটা যাঁরা বোঝেননি তাঁরা এ ব্যাপারে এখনও বুদ্ধিতে বালক।

নাস্তিবাদ (nihilism) অবশ্য অর্থহীন। নাস্তিবাদীও সমাজের শ্রমে উৎপন্ন অন্ন গ্রহণ করছেন, বহু মানুষের সাধনায় সৃষ্ট সাহিত্য থেকে বচন উদ্ধার করে নিজের মত অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। নিজের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা না থাকলে এ-সব নঙর্থক কার্যেরও কিছুই অর্থ হয় না। সমাজের বাইরে কোনো অর্থহীন একাকিত্বে নিজেকে সংহার করাই তাহলে কর্তব্য। এমনতর একটি মতকে আমরা নৈরাশ্যের অন্ধতম মুহূর্তের আর্তধ্বনি হিসাবে সহানুভূতির সঙ্গে শুনতে পারি। কিন্তু যিনি বাঁচতে চান তাঁকে জীবনের প্রতি, অর্থাৎ নিজের ও অপরের প্রতি, শ্রদ্ধার একটি ভিত্তি খুঁজে বের করতে হবে।

পরিবর্তনশীল জটিল বৃহৎ সমাজে অপর ব্যক্তি আমার কাছে চিরকালের মতোই অংশত অজ্ঞেয় থাকবে, মানুষে মানুষে মতান্তর কখনও দূর হবে না। এরই ভিতর কি করে দুর্জ্ঞেয় এবং মতান্তরিত অপরের প্রতি খানিকটা প্রীতি ও সহিষ্ণুতা রক্ষা করা যায় এটাই আধুনিক সমাজের একটা মূল সমস্যা। সহজ ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এ-অবস্থায় আপদ ঘটাতে পারে, কারণ ভাইয়ের কাছেও আজ নির্বিরোধ ঐক্য দাবি করলে গোড়াতেই দ্বন্দ্বের আশংকা ; আর ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধের মত তিক্ত বিরোধ বুঝি নেই। অথবা বলা যায় যে, ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে বাঁচাতে হলে আজ তার রূপান্তর প্রয়োজন। এই রূপান্তরিত আদর্শের জোরেই আমরা বলি : আপনার মত মানি না, কিন্তু আপনার মত প্রকাশ করবার স্বাধীনতাকে আমি শ্রদ্ধা করি যেন সে আমারই স্বাধীনতা ! গণতান্ত্রিকের কাছে এই মৌল শ্রদ্ধার অভাবই একমাত্র অশ্রদ্ধেয়।

আরও গোড়ার কথাটা সম্ভবত এই। তোমাকে আমার কখনও সম্পূর্ণ জানা হবে না ; কিন্তু নিজেকেই কি জানা হবে ! না জানার বেদনা থাকবে ; তবু এই দুর্জ্ঞেয় তোমাকেই দুর্জ্ঞেয় আমার দোসর জানব। এমন ক'রে আমরা পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনেও সম্প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ হই এবং সমপ্রয়োজনের ভিত্তিতে যতদূর সম্ভব সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলি। সহজ কাজ নয়। তার চেয়ে সহজ ক্রোধে অথবা মোহে নিজেকে ভুলিয়ে রাখা ; পরকালে আস্থা স্থাপন করা ; অথবা বিপ্লবের ওপারে দেহ ও আত্মার ক্ষুধার অন্ন আছে বিশ্বাসটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরা। কিন্তু এই মোহও সাময়িক। এই আত্মপ্রবঞ্চনাকে অতিক্রম করেই পরিণত বুদ্ধির মানুষকে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার সপক্ষে অনেক সহজ যুক্তি আছে। মধ্যযুগীয় ছোট ছোট সম্প্রদায়ের প্রাচীর ভেঙ্গে বৃহত্তর সমাজ গড়ার সময় যখন আসে তখন ব্যক্তিকে সেই সচল সমাজে নিজ স্থান খুঁজে নেবার অধিকার দেওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে ওঠে। খণ্ডিত সত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই বৃহত্তর সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তাই ব্যক্তির আংশিক সত্যবোধও সমাজের পক্ষে মূল্যবান। এসব যুক্তির পরও একটি কথা অবশিষ্ট থাকে। সেটা অন্তরের কথা ; সেটাই এখানে বলতে চেয়েছি। আজকের আত্মসচেতন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করা যাবে, কিন্তু গায়ের জোরে তাকে চিরকালের মতো গণসমাজের সঙ্গে একাকার করে দেওয়া যাবে না। সে তার স্বাতন্ত্র্যের গর্ব ও একাকিত্বের যন্ত্রণা নিয়ে নানা বিপরীত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সমাজ ও বিশ্বের সঙ্গে যোগসাধনের নিজের বিশেষ পথটি নিজেই খুঁজে নেবে। এই মৌল অধিকারই ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তিম ভিত্তি।

সাম্যবাদ ও প্রগতির পথ

পূর্বতন সাম্যবাদীদের মার্ক্স স্বপ্নবিলাসী আখ্যা দিয়েছিলেন। ওঁদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল এই যে, ওঁরা আদর্শ সমাজের চিত্তাকর্ষক ছবি এঁকে গেছেন, কিন্তু সে-সমাজে পৌঁছবার পথ দেখাননি। মার্ক্স চেয়েছিলেন ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের

সাহায্যে পথের সন্ধান দিতে। মার্ক্সের পর দেখা দিলেন লেনিন। বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার কলাকৌশল তিনি ব্যাখ্যা করলেন আশ্চর্য প্রতিভার সঙ্গে। রুশ বিপ্লবের অর্ধ শতাব্দী পরে খানিকটা অচঞ্চল মনে আজ তার লাভক্ষতির হিসাব করা সম্ভব।

উনিশ শতকের শেষ ভাগেই রুশ দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বলা প্রয়োজন যে, প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়া ছিল ব্রিটিশ আমলের ভারতের সমান দরিদ্র দেশ, এই বহুকথিত ধারণাটা তথ্যগতভাবে ভুল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতালাভের সময় ভারতে মাথাপিছু শস্যোৎপাদন যত ছিল ১৯১৩ সালের রুশ দেশে তার তিন গুণেরও বেশী ; ইস্পাতের উৎপাদনেও তারতম্যটা একই ধরনের। পাশ্চাত্য অনেক দেশের তুলনায় রুশ দেশ অবশ্য সেদিন পিছিয়ে ; তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী তিরিশ বছরে তার শিল্পোন্নতির তাল ছিল প্রতিবেশী দেশ জার্মানীর মতোই দ্রুত। যুদ্ধের পর জার্মানী এগিয়ে চলেছে এক পথে, আর রুশ দেশে বিপ্লবের ফলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে উন্নতির একটা ভিন্ন পথ।

গত অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কম্যুনিজম বলতে আজ আমরা কার্যত দুটি স্বতন্ত্র বস্তু বুঝি। একদিকে কম্যুনিজম অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার একটা বৈপ্লবিক পথ। অন্যদিকে উপস্থিত শিল্পোন্নয়নের একটা বিকল্প পদ্ধতি। অর্থনীতিজ্ঞের চোখে এই দ্বিতীয় কথাটাই প্রধান।

সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু আর্থিক উন্নয়নের ধনতান্ত্রিক পথের তুলনায় সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য যে সব যুক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয় সেগুলি প্রায়ই অভ্রান্ত নয়। এ-শতাব্দীতে দ্রুত আর্থিক উন্নতির নানা উদাহরণই চোখে পড়ে ; যেমন জার্মানী, জাপান, সুইডেন, ক্যানাডা, মেক্সিকো ও সোভিয়েত দেশের আর্থিক উন্নতি হয়েছে বিভিন্নভাবে। এই বিভিন্ন পথের তুলনামূলক বিচার থেকে আমাদের শিক্ষালাভ করতে হবে। একটা গোড়ার কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত মুনাফা ও স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হয়, অতএব ওটা মন্দ ; সমাজতন্ত্রী নেতারা সমাজের হিত চান, অতএব সাম্যবাদ ভালো—এই নীতিসর্বস্ব চিন্তার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে কোনো আর্থিক ব্যবস্থারই যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা বেশিদূর সম্ভব নয়। আদর্শ চিন্তা ভালো ; কিন্তু আর্থিক জীবনে স্বার্থবুদ্ধির গুরুত্ব অস্বীকার করা ভুল। আদর্শবোধে রঞ্জিত কয়েকটি বিরল ও অবিস্মরণীয় মুহূর্তে জীবনকে আমরা সার্থকজ্ঞান করি। কিন্তু বৈষয়িক বিত্ত উৎপন্ন হয় তিলে তিলে প্রাত্যহিকতার স্পর্শে ম্লান কর্মময় সাধারণ দিনে। অতএব মানুষের মহত্তম আদর্শনিষ্ঠাকে নয় বরং দৈনন্দিন জীবনের প্রবলতম প্রবৃত্তিকে, অর্থাৎ স্বার্থবোধকে, ধনোৎপাদনের কাজে কিভাবে নিযুক্ত করা যায় সেটা আর্থিক উন্নতির আলোচনায় বিশেষভাবে বিবেচ্য। এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা আবশ্যক। এই বাস্তববাদী আলোচনায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিতর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য একই সঙ্গে চোখে পড়ে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অর্থনীতির বিশেষ সুবিধাগুলি স্পষ্ট ; যেমন বেকার সমস্যার সমাধানে। প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অবশ্য এ সমস্যাটা এখন আর আগের মতো তীব্র নেই। আংশিক পরিকল্পনার সাহায্যে ওঁরা ব্যবসায়ের পতন-উত্থানের চক্রটাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে অবস্থা জটিল। এর পূর্ণাঙ্গ

আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর বেকার সমস্যার প্রাদুর্ভাবের একটা প্রধান কারণ শিক্ষার অব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র আমরা গ্রহণ করি বা না-করি, শিক্ষার সংস্কার আবশ্যক। জাপান, জার্মানী, মার্কিন ও সোভিয়েত দেশে যদিও বিভিন্ন পথে শিল্পোন্নতি ঘটেছে তবু এ কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার সব দেশেরই আর্থিক উন্নতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিক্ষার অব্যবস্থা ছাড়াও শিল্পোন্নয়নের গোড়ার যুগে বেকার সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে আরও একটা বিশেষ কারণে। এ সময়ে গ্রাম ভেঙে দলে দলে লোক শহরে আসে ; বেকারের সংখ্যা তাতে বৃদ্ধি পায়। এর বিহিত করা কোনো ব্যবস্থাতেই সহজ নয়। গণতান্ত্রিক দেশে তো বিশেষভাবেই কঠিন ; বাধ্যতামূলক উপায় ছাড়া এ সমস্যার সমাধানে বিলম্ব ঘটা স্বাভাবিক।

আর্থিক উন্নতির জন্য কিন্তু শুধু চাকুরীর সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়াই প্রয়োজন নয় ; সেই সঙ্গে শ্রমিককে নতুন নিয়মানুবর্তিতায় অভ্যস্ত ও কলাকৌশলে শিক্ষিত করে তোলাও শিল্পোন্নয়নে প্রথম যুগের একটা আবশ্যিক কাজ। এ কাজটা ধনতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী কোনো দেশেই সহজে সাধিত হয় না। কিছুদিন আগে পূর্ব ইয়োরোপের একজন বিশিষ্ট সাম্যবাদী অর্থনীতিজ্ঞ এ দেশে এসেছিলেন ; কথায় কথায় তিনি বললেন, 'আপনাদের দেশের মতোই রুশ দেশের লোকেরা ছিল অলস আর শৃঙ্খলায় অনভ্যস্ত। স্তালিন মারধোর করে ওদের কাজ শেখান।' কথাটা অসত্য নয়। কাজে শৃঙ্খলা আনবার জন্য যে সব বিশেষ নিয়ম স্তালিন যুগে প্রবর্তিত হয় তা থেকেই ব্যাপারটা খানিকটা আঁচ করা যাবে। ১৯২২ সালে ওদেশে নিয়ম ছিল যে, কোনো শ্রমিক উপযুক্ত কারণ ছাড়া পরপর তিনদিন অথবা মাসে ছ'দিন অনুপস্থিত থাকলে তাঁকে বরখাস্ত করা চলবে। তারপর নিয়মটাকে ক্রমশ কঠিন করে তোলা হয়। ১৯৩২-এর শেষে নিয়ম দাঁড়াল যে, ভালো কারণ ছাড়া এক দিনের অনুপস্থিতিই চাকুরী থেকে বিতাড়নের পক্ষে যথেষ্ট। পরে আরও ব্যাখ্যা করা হল যে, কোনো শ্রমিক বিশ মিনিটের বেশী দেরি করে কাজে এলে তাঁকে অনুপস্থিত বলে ধরতে হবে।

কম্যুনিস্ট প্রচারে অনেক সময় মনে হতে পারে যে, সাম্যবাদী দেশের সমস্ত সম্পদ মজুর শ্রেণীরই সম্পত্তি এই জানার আনন্দে দেশের শ্রমিক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কঠোর পরিশ্রম করে থাকেন। তাই যদি হত তো সোভিয়েত দেশে স্তালিনী আমলে শ্রমিকদের জন্য এমন কঠিন আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হত না। আর আইনভঙ্গের শাস্তিও এমন ক্রমশ কঠোর করে তুলতে হত না। সকল শিল্পপ্রধান দেশেই শ্রমিকেরা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ; আর এই অভ্যাস আয়ত্ত করবার প্রাথমিক পর্বটা সাম্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক সব দেশেই কষ্টের ভিতর দিয়ে কেটেছে। শুধু বাধ্যবাধকতায় অবশ্য কোনো দেশেই ভালো কাজ হয় না। উন্নতিশীল দেশমাত্রেই কাজের নিয়ম এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হয় যে, নিজের স্বার্থের মুখ চেয়েই শ্রমিক কাজে দক্ষতা অর্জন করতে আগ্রহী হন। এদিক থেকে সোভিয়েত ও মার্কিনী ব্যবস্থার ভিতর একটা মৌলিক মিল আছে। পক্ষপাতমুক্ত দৃষ্টি নিয়ে যাঁরা বিষয়টি অনুধাবন করেছেন তাঁরাই এই মিলটাও লক্ষ করেছেন।

মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে অবশ্য বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার ভিতর যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ করা যায়। ধনতান্ত্রিক দেশে মূলধন কখনও কখনও এমনভাবে নিযুক্ত হয় যাতে ব্যক্তির লাভ হলেও দেশের তাতে ক্ষতি। সাধারণ অবস্থাতেও এটা দেখা যায় ; আর অনুন্নত দেশগুলিতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময়ে সমস্যাটা আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। অবশ্য হিসাবের

অন্য দিকটাও এই সঙ্গে একটু লক্ষ করা ভালো। শিল্পপরিচালনার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি না থাকলে কাজে অনেক সময় শৈথিল্য আসে। আমাদের দেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর এর উদাহরণের অভাব নেই।

আরও একটা কথা এখানে যোগ করা দরকার। সমাজতন্ত্রী দেশে শিল্পের মালিকানা জাতির অথবা রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, শিল্পপরিচালকেরা সাধ্যমত সরকারের নীতি ও নির্দেশ মান্য করে চলেন ; অর্থাৎ জাতির স্বার্থের সঙ্গে শিল্পবিশেষের স্বার্থের দ্বন্দ্বটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। এই অনুমানটা কিন্তু নির্ভুল নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশেও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিজের স্বার্থের খাতিরে দশের স্বার্থ উপেক্ষা করেন। এর উদাহরণের অভাব নেই। যে সমস্যাটা সোভিয়েত আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্তাদের ইদানীং বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে তা হল এই : জাতীয় পরিকল্পনার কর্তারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্পে কতটা উৎপাদন করতে হবে তার একটা লক্ষ্য স্থির করে দেন। আর শিল্পের পরিচালক ও শ্রমিকেরা পরিমাণে বেশী উৎপাদন দেখিয়ে বিশেষ পুরস্কার দাবি করেন ; কিন্তু জাতে জিনিসটাকে করেন নিকৃষ্ট। দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ যতটা সহজ, গুণ নিয়ন্ত্রণ মোটেই ততটা সহজ নয়।

ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী উভয় ব্যবস্থাতেই দোষত্রুটি আছে। উভয় ব্যবস্থাতেই ভিতর থেকে সংশোধনের ফলে এইসব দোষত্রুটি দূর করবার চেষ্টাও চলেছে। সাম্যবাদী দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে খরচ কমাবার দিকে মনোযোগ দিতে বলা হচ্ছে এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন নির্ধারণ করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটছে। পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদন সাধারণত বাজারের চাহিদা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় ; এটাই এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ ও দোষ। এটার অসুবিধার দিকটা একটু চিন্তা করলেই মোটামুটি বোঝা যায়। অনুন্নত অর্থনীতির পঙ্গু অবস্থায় চাহিদা-না-বাড়লে উৎপাদন বাড়বে না এই নিয়ম মেনে চললে অনেক সময় পঙ্গুত্ব স্থায়ী হবার সম্ভাবনা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক ক্ষতি স্বীকার করেও ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে চাহিদার আগেই উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সীমার ভিতর ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিও হয়তো এটা কখনও কখনও করেন কিন্তু এ ব্যাপারে বাজারের হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। অতএব আর্থিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আর্থিক পরিকল্পনাও কিন্তু আজ আর সাম্যবাদী ব্যবস্থার একান্ত সংরক্ষিত বৈশিষ্ট্য নয়। উদাহরণ হিসাবে ফরাসী দেশের কথা ধরা যাক। ফরাসী আর্থিক ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক বললে অন্যায় হয় না। তবু ওদেশের আর্থিক উন্নতিতে জাতীয় পরিকল্পনার প্রভাব স্পষ্ট। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিকল্পনাহীন 'আর্থিক অরাজকতার' উপর প্রতিষ্ঠিত এই অভিযোগকে পিছনে ফেলেই জগৎ আজ এগিয়ে চলেছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের তুলনায় এ কথাটা উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

ধনতান্ত্রিক দেশে অবশ্য মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা এখনও অব্যাহত। সম্পত্তির বণ্টনে ঐসব দেশে এখনও বিরাট অসাম্য। এই অসাম্যের দাপটে মানুষে-মানুষে একটা সহজ ঐক্যবোধ অহরহ ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের বিবেককে এটা পীড়া দেয় ; এই পীড়াবোধেই আমাদের মনুষ্যত্বের প্রমাণ। তবু এই প্রসঙ্গে আলোচনায় খানিকটা মাত্রাজ্ঞানও রক্ষা করা ভালো। এ দেশে যাঁরা সাম্যের কথা বলেন তাঁরা প্রায়ই নিজেকে 'মধ্য'বিত্ত ধরে নিয়ে উপরের সবার আয় হ্রাসের চিন্তা করেন। যেমন মাসিক আয় যাঁর এক হাজার টাকা তিনি সাম্য বলতে বোঝেন যে, কারও আয় যেন দেড় হাজারের বেশী না

হয় ; আবার যাঁর আয় পাঁচ শ' তিনি হয়তো চান সকলের আয় হাজারে সীমাবদ্ধ রাখতে। কিন্তু এ দেশে যাঁদের মাথাপিছু মাসিক আয় পাঁচ শ' টাকার কম নয় তাঁরা জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগও হবেন না। আমরা 'মধ্যবিত্তে'রা সবাই এ দেশের শতকরা নব্বুই ভাগ লোকের তুলনায় উচ্চবিত্ত। যে দেশে অধিকাংশ পরিবারে মাথাপিছু আয় দৈনিক এক টাকারও কম সেখানে জনগণের দৃষ্টিতে যাকে সাম্য বলা যেতে পারে সেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতির কথা ভাববার ও বলবার মত লোক বড় অবশিষ্ট থাকবেন না। অতএব জাতীয় আয় আরও অনেকটা বৃদ্ধি পেলে তবেই সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যের কথা বলা সঙ্গত। ইতিমধ্যে বিত্তবানেরা যদি বিত্তের বড়াইটা কমান তো ভালো হয়। আরও প্রয়োজন যথাসম্ভব শীঘ্র, যথাসম্ভব বেশী লোকের জন্য খাদ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যূনতম ব্যবস্থা করা। এর বেশী সাম্যের চেষ্টায় আপাতত সুফল আশা করা যায় না ; মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দারিদ্র্যে টেনে নামাবার চেষ্টায় দেশে আত্মনিপীড়নে ও পরপীড়নে অভ্যস্ত এক ধরনের অসহিষ্ণু নেতৃত্ব সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অসাম্য দূর হয়নি। সেই অসাম্য শুধু আর্থিক নয়। ক্ষমতার অসাম্যও যে কত দুঃসহ হতে পারে, এর ফলে মানুষের কাছে মানুষ কত বিষমভাবে বাঁধা পড়তে পারে, আজকে আমলাতন্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকালে তা বুঝতে দেরী হয় না। সাম্যবাদী দেশে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের দ্বন্দ্বটা সোভিয়েত নেতাদের চেয়েও স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন চীনের নেতা মাও। তিনি অবশ্য তাঁর ১৯৫৭ সালের ভাষ্যে এটাকে "বৈরবিহীন" দ্বন্দ্ব (non-antagonistic contradiction) আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এই বৈরবিহীন দ্বন্দ্ব ইদানীং চীনে যে প্রচণ্ড বৈরিতার সৃষ্টি করেছে তাতে সমস্যাটাকে আর শব্দের মারপ্যাঁচে খাটো করা যাচ্ছে না। যুগোস্লাভ নেতা জিলাসের স্পষ্টোক্তি এখানে স্মরণীয়।

চীনা-সমালোচকেরা বলছেন যে, সোভিয়েত দেশ সাম্যবাদী আদর্শকে ছেড়ে 'ধনতান্ত্রিক' পথ গ্রহণ করেছে। মার্ক্সীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক আখ্যা দেবার কোনো কারণ আজও দেখা দেয়নি। তবু স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে, সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক পরিচালনার ক্ষমতা বহু পরিমাণে একটি আমলাগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। মাওপন্থীরা আরও বলেছেন যে, চীন দেশেও এই ধরনের একটা ঝোঁক দলীয় নেতৃত্বের একাংশের ভিতর দেখা দিয়েছে। এইসব অভিযোগ থেকে একটা কথা স্পষ্ট : কলকারখানায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করলেই অসাম্য লোপ পায় না।

আরও একটা কথা এই সঙ্গে পরিষ্কার করা আবশ্যক। সমাজতান্ত্রিক দেশে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের কারণ খুঁজতে গিয়ে কয়েকজন মন্দ লোকের ষড়যন্ত্রকে দায়ী করা অথবা পুরনো ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উপর দোষ চাপানো বাস্তববিরোধী, ভ্রান্ত বিশ্লেষণ। মার্ক্সবাদীরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জোর দিয়ে থাকেন ; এটাই মার্ক্সীয় "জড়বাদী" ব্যাখ্যার ভিত্তি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোচনায় কিন্তু ওঁরা ইতিহাসের এই বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ত্যাগ করে চতুর্দিকে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসঘাতকতা আর দলীয় শত্রুর ষড়যন্ত্র খুঁজতে শুরু করেন। মার্ক্সবাদের প্রতি একান্ত আনুগত্য যেমন ভুল তেমনই ইতিহাসের মাঝপথে মার্ক্সবাদকে ওভাবে সম্পূর্ণ ত্যাগ করাও অবৈজ্ঞানিক। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই ক্ষমতার অসাম্যের কারণ খুঁজতে হবে সমাজের অন্তঃপ্রকৃতিতে, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিন্যাসে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশেষ ভূমিকায়। বিষয়টা আরও একটু তলিয়ে বিচার করা প্রয়োজন।

একালে সমাজ যতই বৃহৎ ও জটিল হয়ে উঠছে রাষ্ট্রের ভূমিকাও ততোই সম্প্রসারিত হচ্ছে। মধ্যযুগের সমাজে নিয়মতন্ত্রটা বড় কথা ছিল না। রাজার শাসনে বা কাজীর বিচারে শাস্ত্রের বিধানের একটা প্রশ্ন ছিল বটে ; কিন্তু ক্ষমতাবানের ব্যক্তিগত মর্জিটাই তবু নানাভাবে বড় হয়ে উঠত। আধুনিক রাষ্ট্রের ঝোঁক নিয়মতন্ত্রের দিকে। যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির শাসনের স্থানে নিয়মের শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলেছে। এটা বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু বিশুদ্ধ অর্থে আধুনিক আমলাতন্ত্রের ভিত্তিও এখানেই। নিয়মশাসিত জটিল ও বৃহৎ রাষ্ট্রযন্ত্রে আমলাতন্ত্র অনিবার্য। শুধু সরকারী শাসনে নয়, আধুনিক সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ধরনের একটা ঝোঁক অল্পবেশী চোখে পড়ে। মধ্যযুগের কুটিরশিল্পে শিল্পসামগ্রী সৃষ্টি হত চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী। এই ঐতিহ্যটা শিল্পীর বাইরের বস্তু মনে হত না। আধুনিক বড় কলকারখানায় শ্রমিককে পদে পদে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হয়। সে নিয়মটা যান্ত্রিক, সেটার সঙ্গে শ্রমিকের অন্তরের যোগ অসম্পূর্ণ। কর্মটা এমনি করে কর্মীর উপর একটা বাইরের বন্ধন হয়ে ওঠে। এটা আধুনিক জটিল শিল্পপ্রধান সমাজমাত্রেরই সমস্যা। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন রচনায় শ্রমিক সংগঠনকে অংশগ্রহণ করতে ডাকা সম্ভব ; কিন্তু তাতেও এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় না। বহু মানুষ মিলে যেখানে একটা যান্ত্রিক ব্যাপারকে চালু রাখতে হয় সেখানে নিয়মগুলি হয়ে ওঠে 'রুটিন' ; ব্যক্তি মানুষকে তার দাসত্ব স্বীকার করেই কাজ করতে হয়। আরও একটা কথা আছে। আধুনিক শিল্পসমাজের জটিল কর্মকাণ্ডে এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশ নানাভাবে জড়িত। অফিসে বা কারখানায় যিনি কর্মে নিযুক্ত তাঁকে কাজের নিয়ম নির্ধারণ করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া যায় না, কারণ কাজের শেষ লক্ষ্যের সঙ্গে তাঁর নিজেরই পরিচয় অস্পষ্ট। মূলধনের স্বত্ব সংক্রান্ত আইন বদলে এ সমস্যার সমাধান হয় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালক গোষ্ঠী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত ; এঁদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঐক্যবন্ধন দুই-ই অসম্পূর্ণ। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পেলে এই বিভক্ত পরিচালক গোষ্ঠীর পরিবর্তে সর্বত্র একটা অপেক্ষাকৃত ঐক্যবদ্ধ আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক সমাজ সংগঠনের এই মূল সমস্যাটি গত দু'শো বছরে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির লেখায় নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির ক্রমবিকাশ ঘটে। কিন্তু আধুনিক সমাজ সংগঠন যদি সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক হত তবুও ব্যক্তিমানুষ ঐ নৈর্ব্যক্তিক নিয়মের রাজত্বে নিজেকে প্রবাসী বোধ করত। বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থাটা অবশ্য আরও জটিল হয়ে ওঠে। নিয়ম ও প্রশাসন চালু রাখবার জন্য যে-আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয় তার ক্ষমতা ও জটিলতা বাড়বার দিকেই একটা দুর্নিবার ঝোঁক দেখা দেয়। পশ্চাৎপদ ধনতান্ত্রিক দেশে হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অধিকার করবার উপায় লেনিন ও মাওবাদীরা উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু কম্যুনিস্ট দলের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলেই মূল সমস্যার অবসান হয় না। মূলধনে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা যত সহজ আমলাতন্ত্রের অবসান ঘটানো মোটেই তেমন সহজ নয়। হিংসাত্মক বিপ্লবের অনিবার্য ফলস্বরূপ বিপ্লবের পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটি নতুন শাসকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং আমলাতন্ত্রের প্রভাব আবারও বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে আর্থিক ক্ষমতার সম্পর্কটাও এই সূত্রে বিচার্য। ধনতান্ত্রিক সমাজে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিপতিদের একটা পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মার্ক্সীয় বিচারে একথা বলা হয়েছে। কথাটা ভুল নয়। কিন্তু শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান জুড়ে বিশাল

আমলাতন্ত্রের আধিপত্য আরও বিপুল ও সংহত আকার ধারণ করে। এই বিপুল ক্ষমতা আসলে শ্রমিক শ্রেণীর বা সর্বসাধারণের ক্ষমতারই কেন্দ্রগত সাংগঠনিক প্রকাশ, এই কল্পনাবিলাসী থিওরীর সঙ্গে বাস্তব ঘটনার বিরোধ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমস্যাটা কম্যুনিস্ট দেশে সবচেয়ে গুরুতর আকারে দেখা গেছে কৃষির ক্ষেত্রে। এ যাবৎ শিল্পে অনুন্নত যেসব দেশে কম্যুনিস্ট বিপ্লব ঘটেছে সর্বত্রই বিপ্লবের আগে কৃষকদের ভিতর ভূমির স্বত্ব নিয়ে প্রবল অশান্তি ও বিক্ষোভ ব্যাপ্ত ছিল। এ অবস্থায় কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। জমি বণ্টনের যে সব দাবী নিয়ে কম্যুনিস্টরা প্রথমে এগিয়ে আসেন সে-সব দাবী বহু ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতা দখল করবার পর জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পায়। তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃহদাকার যৌথ ক্ষেতখামার ; আর তারই পরিচালনাসূত্রে এক অভূতপূর্ব আমলাতন্ত্রের শাসন চেপে বসে গ্রামে গ্রামে। যুগোস্লাভিয়ার মতো যে দু'য়েকটি কম্যুনিস্ট দেশে কৃষককে এ ব্যাপারে স্বাধীন সিদ্ধান্তের অধিকার দেওয়া হয়েছে সেখানে অধিকাংশ কৃষক এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু যুগোস্লাভিয়া এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম।

সোভিয়েত দেশের নেতারা বলেন যে, ধনতন্ত্রের পুনরভ্যুত্থানের ভয়ে ওঁরা দেশে বিরোধী দল গঠনের অধিকার দিতে পারেন না। কিন্তু ওদেশ থেকে ধনিক শ্রেণী বিদায় নিয়েছেন বহু বৎসর আগে। ধনিকদের বিরুদ্ধে নয়, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেই আজ গণমনে ব্যাপক অসন্তোষ। কম্যুনিস্ট দেশের মূল সমস্যা বুঝতে হলে এই কথাটাই প্রথমে মোহমুক্ত মন নিয়ে বোঝা দরকার। আমলাতন্ত্র বিরোধীদলকে ভয় করে ; বিরোধী প্রতিষ্ঠানের অভাবে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

আঠার উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের প্রবক্তারা সাম্য-স্বাধীনতার বাণী কণ্ঠে নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই ইস্তাহারে কিছুটা ছিল সত্য, কিছুটা ভণ্ডামি। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় আইনের চোখে নাগরিকের সাম্য স্বীকৃত হল, ব্যক্তিস্বাধীনতার আরও নানা শর্ত গৃহীত হল ; কৃষক মজুরও ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকার লাভ করলেন। তবু স্বাধীনতার ঐ সব শর্ত সত্ত্বেও অগণিত দরিদ্র মানুষকে পদে পদে নানা অন্যায় সহ্য করতে হয়েছে। ধনতন্ত্রের বিবর্তনে যাঁরা পুরোভাগে ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সোচ্চার হয়েছে। এটাই অনিবার্য ছিল। কম্যুনিস্ট দেশে আর্থিক উন্নতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্র তথা কম্যুনিস্ট দল। এখানেও অন্যায় কম ঘটেনি। কম্যুনিস্ট দল সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চারণ করেছেন আত্মসমর্থনে। এই নতুন ইস্তাহারেও আছে খানিকটা সত্য আর খানিকটা সত্যের অপলাপ।

মনে রাখা ভালো যে, কোনো ব্যবস্থাই নির্দোষ নয় আর বিশেষ কোনো একটা পথই সব দেশের পক্ষে সমান উপযোগী নয়। সাম্য ও স্বাধীনতার দিকে এগোবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। এদেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবার জন্য যেসব শর্ত আজ পালন করা প্রয়োজন তার একটি হল, সুপরিকল্পিত কৃষি সংস্কার। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের বুনিয়াদী সংস্থাগুলিকে গ্রামে ও শহরে ক্রমশ সুদৃঢ় করা আবশ্যক। এই সংস্থাগুলির কাজ হবে দ্বিবিধ : গঠনমূলক ও প্রতিরোধাত্মক। এদেশের মানুষের ভিতর আত্মনির্ভরতা দুর্বল। দুর্ভাগ্যের কথা সমাজতন্ত্রের নামে আমরা আরও বেশী করে সরকারের উপর সব ব্যাপারে নির্ভরশীল হতে শিখেছি। পরিণামে আমলাতন্ত্রকেই এতে

জোরালো করা হয়। স্বাধীন সমাজ গড়বার পক্ষে এটা সহায়ক নয়। বরং প্রয়োজন পরিপার্শ্বকে বাসযোগ্য করে তুলবার ব্যাপারে আরও বেশী ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ এবং গোষ্ঠীগতভাবে গঠনমূলক চিন্তা ও কর্মের প্রতি ঝোঁক। একই সঙ্গে চাই অন্যায়ের প্রতিকারে গণতান্ত্রিক অথচ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। এদেশে সমাজে যাঁরা ছোট বড় হর্তাকর্তা তাঁদের নানা ব্যাপারে ঔদাসীন্য এমনই অনড়, কোনো কথা তাঁদের কানে তোলা অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর আদায় করা এতোই কঠিন যে, মাঝে মাঝে খানিকটা ঘা দিয়ে তাঁদের চৈতন্যোদয়ের চেষ্টাকে এক কথায় অন্যায় বলা যায় না। কিন্তু যুক্তিবিচার ও সহিষ্ণু প্রতিবাদকেই তবু অগ্রাধিকার দিতে হবে ; কারণ আঘাত দেওয়াটাই অভ্যাসে পরিণত হলে তাতে অন্যায়ের অবসান ঘটে না, বরং সেই নির্বিচার হিংসা থেকে আরও কঠিন অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। স্বাধীন সমাজে সম্পত্তির স্থান নিয়ে বিতর্ক চলবেই। ফরাসী দার্শনিক প্রুঁদ সম্পত্তিকে চৌর্যের সমান বলেও অবশেষে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তুলে দিতে চাননি, পাছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা শ্বাসরোধকারী হয়ে ওঠে এই ভয়ে। যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁরা রাষ্ট্রের অধীনে আনতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই চেষ্টাও হওয়া প্রয়োজন গণতান্ত্রিক উপায়ে। হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে মানুষ এমন কোনো অতুলনীয় আনন্দের অধিকারী হয় না যাতে গৃহযুদ্ধের অপরিসীম ক্ষয় ও তিক্ততা পূরণ হয়ে যায়। বরং পারস্পরিক সন্দেহের ভিতর দিয়ে অত্যাচারের এক অতিকায় যন্ত্র সমাজের বুক জুড়ে চেপে বসে। গণতন্ত্রের পথ যতদিন খোলা আছে ততদিন সেই পথই শ্রেয়।

জীবনে এমন কিছু কাম্যবস্তু আছে যা অপরকে যত বেশী করে দেওয়া যায় ততোই আমরা নিজে বেশী করে পাই ; যেমন প্রেম অথবা জ্ঞান। ধন অথবা ক্ষমতা সে জাতীয় বস্তু নয়। এইসব সীমাবদ্ধ কাম্যবস্তু নিয়ে দ্বন্দ্বকলহ ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই আছে, যদিও দ্বন্দ্বের রূপটা অবস্থা অনুসারে খানিকটা বদলায়। একথা মনে মনে জেনে রাখাই ভালো যে, ধনতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী কোনো উপায়েই সমাজ অনিন্দ্যসুন্দর হবে না। স্বর্গের কল্পনা কল্পনা হিসাবেই ভালো। বিজ্ঞান আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ; কিন্তু কোনো "বৈজ্ঞানিক" পন্থাতেই পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপনা করা যাবে না। এই জেনে তারপর আমরা মানুষের দুঃখ যদি খানিকটা কমাতে পারি তবেই মঙ্গল !

গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে যে, লেনিন ও মাও সে-তুং-এর প্রদর্শিত পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব, অন্তত কখনও কখনও। প্রমাণিত হয়নি যে, ঐ পথে আদর্শ সমাজে পৌঁছানো কখনও সম্ভব। অথচ আদর্শ সমাজে পৌঁছাবার পথের নির্দেশই মার্ক্স দিতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতাই যাঁদের আদর্শ, ক্ষমতা ও আদর্শের ভিতর ভেদ উপলব্ধি করবার বোধও যাঁদের লুপ্ত, গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসকে তাঁরাই বিনাদ্বিধায় মার্ক্সবাদের সপক্ষে দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করবেন। এ কথা শুনে মার্ক্সবাদী কি রুষ্ট হবেন ? তা হলে বলি, দোহাই আপনাদের, মার্ক্সের একটি কথা অন্ততঃ রাখুন, ওঁকে ভগবান বানাবেন না। এ আশা কি দুরাশা যে, এদেশের সাম্যবাদীরা মার্ক্স অথবা গান্ধী কাউকেই সত্যের একমাত্র অধিকারী বলে দাবী করবেন না ? উভয়ই অবশ্য শ্রদ্ধেয়।

জাতীয় সংহতি

জাতীয় সংহতি নিয়ে ইদানীং বহু আলোচনা হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। আমাদের ইতিহাসে এক এক সময়ে এক একটি সমস্যা বড় হয়ে ওঠে, আমাদের মনের অনেকখানি জায়গা দখল করে বসে। দেশ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন পরাধীনতার সমস্যাটাই বড় ছিল, দেশকে কী করে স্বাধীন করা যায় এই প্রশ্নটাই আমাদের মনকে অধিকার করে ছিল। আজ দেশ স্বাধীন। এখন দেশের ঐক্য কী করে রক্ষা করা যায় সেটা বড় প্রশ্ন হয়ে উঠছে। স্বাধীনতা লাভের সময়ে দেশ একবার খণ্ডিত হয়েছে। সেটা আমাদের কাছে একটা বেদনার কাহিনী। কিন্তু দেশ আবারও খণ্ডিত হতে পারে এই রকম আশংকা অন্তত কিছুকাল আমাদের আলোড়িত করেনি। ঘটনা অবশ্য মাঝে মাঝেই অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। স্বাধীনতালাভের পর পঁচিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই পাকিস্তান আবার দুই খণ্ড হল। এখন পাকিস্তান বলতে শুধু পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের জন্মান্তর হয়েছে, নতুন জন্মে সে বাংলাদেশ। অবশিষ্ট পাকিস্তানের ভিতরও ঐক্য রক্ষা করা সহজ হচ্ছে না। সেখানে নানা ভাষা, নানা সম্প্রদায়। ভাষা, ধর্ম এইসব নিয়ে ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্য আরো বেশি। বস্তুত এটাই এদেশীয় সমাজের একটা মৌল বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য বৃহৎ সমাজ মাত্রেরই একটা বৈশিষ্ট্য তার বৈচিত্র্য। কিন্তু ভারতে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চীনের সমাজও এক বৃহৎ সমাজ। কিন্তু সে দেশে এতো বিভিন্ন ভাষা নেই। সোভিয়েত দেশে নানা ভাষা আছে, কিন্তু ভারতের মতো এতো বিভিন্ন ধর্ম নেই। ভাষা ধর্ম সব মিলিয়ে ভারত যেন অতুলনীয়। ভারতের তুলনা চলে শুধু সারা পৃথিবীর সঙ্গে। ভারত একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের পৃথিবী। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের ভিতর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সমস্যার কথা আমরা শুনেছি। একই সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরে। এখানে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ যদি আমরা দেখাতে পারি তবে সারা বিশ্বের সামনে একটা উদাহরণ তুলে ধরা হবে।

এদেশের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠি. সম্প্রদায়ের ভিতর সহযোগিতা ও সংঘাত সারাক্ষণই চলছে। খবরের কাগজ খুললেই সংঘর্ষের খবর চোখে পড়ে, কারণ সংঘর্ষটাই নাটকীয়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ব্যতিক্রম। আর যেটা ব্যতিক্রমী ও নাটকীয় সেটাই তো খবর। খবয়ের ইংরেজি প্রতিশব্দটি লক্ষ করলেই এটা স্পষ্ট হয়, যাতে নতুনত্ব আছে তারই নাম খবর। অতএব খবরের কাগজে আমরা বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি, গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের ভিতর সংঘাতের কথা বড় করে প্রত্যহ পাই। কিন্তু সে সবই হল সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যতিক্রমী ঘটনা। এরই পাশে পাশে চলছে নিঃশব্দ সহযোগিতা।

তবু এই ব্যতিক্রমী ঘটনাগুলিকেও ভালোভাবে বুঝতে হবে। সংঘাতের চরিত্র যদি আমাদের অজানা থাকে তবে সংহতির পথও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। সমাজের গঠন এবং সংঘাতের স্বরূপ নিয়ে তাত্ত্বিকেরা নানা কথা বলেছেন। কারো কারো মতে সমাজের আসল দ্বন্দ্বটা হল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে, শাসকশ্রেণীর সঙ্গে শোষিত শ্রেণীর। শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রবক্তারা সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : একদিকে আছে সম্পত্তির মালিক, অন্যদিকে সর্বহারা। আধুনিক সমাজে দ্বন্দ্বটা মূলত ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের,

মূলধন অথবা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানার প্রশ্নটা প্রধান প্রশ্ন। সমাজের গঠন এবং সামাজিক সংঘাতের চরিত্র বুঝতে হলে এইখানে দৃষ্টিপাত করাটাই সবচেয়ে জরুরী। অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা আগেই বলেছি। সেই দৃষ্টিতে দেখলে, বহুজাতি ও সম্প্রদায় নিয়ে ভারত এক মহাজাতি। প্রতিটি বৃহৎ সমাজ যেন একটি যুক্তরাজ্য, যার ভিত্তিতে আছে স্থানীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে বিবিধ লোকসমাজ। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীকে মেলানো যায় কিছুদূর পর্যন্ত, দুয়েতেই কিছু সত্য আছে। জাতিতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত আমাদের এই সমাজ ; আবার সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বও আছে।

কিন্তু এদের মেলাবার আগে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর চরিত্রগত গভীর পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া ভালো। কোনো এককালে সমাজ বলতে প্রধান ছিল গ্রামসমাজ। সেখানে জাতি ধর্ম এইসব ভিত্তি করেই ছিল মানুষের পরিচয়। বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল অন্য এক জগৎ। তার কেন্দ্রে আছে নাগরিক সমাজ। নগরের অজানা বহু লোকের ভিড়ে মানুষের পরিচয় কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। ক্রেতা অথবা বিক্রেতা, মালিক কি মজুর হিসেবে সে চিহ্নিত হয়। মানুষের শ্রেণীপরিচয়ে তার জাতি অথবা ধর্ম প্রধান কথা নয়, আর্থিক সম্পর্কটাই প্রধান। নিছক শ্রেণীভিত্তিক বিশ্লেষণে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গী পাই সেটা মূলত নাগরিক। জাতি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তির পরিচয় খোঁজাটা গ্রামীণ সংস্কৃতির চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। নাগরিক সভ্যতার কিছুটা দাপট সত্ত্বেও এ দেশের সংস্কৃতি আজও গভীরভাবে গ্রামীণ। আমাদের সমাজে তাই সহযোগিতা অথবা সংঘর্ষের কাহিনী লেখা যায় না সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চা' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন, "আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতিসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতিসম্প্রদায়ের।" কথাটা আজও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। বস্তুত শুধু ভারতই নয়, পৃথিবীর অন্যত্রও একই কথা অল্প বেশি সত্য। আরব-ইহুদী সংঘর্ষ, শ্বেতবর্ণ কৃষ্ণবর্ণের ভিতর বিদ্বেষ, ইংরেজ ও আইরিশের কলহ, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, এইসবের ভিতর মানুষের সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিচয় অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর কোথাও মানুষের চৈতন্য শুদ্ধ নাগরিকতার ছাঁচে গঠিত নয়।

অসামঞ্জস্যটা আমরা যেভাবে দেখি সামঞ্জস্য স্থাপনের উপায়টাও সেইভাবেই বুঝি। এদিক থেকেও দুই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। যদি বলি যে, সমাজ সংগঠনের মূল কথাটা হল এই যে, সমাজ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, শোষক শ্রেণী আর শোষিত শ্রেণী, তবে শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করাটাই সমাজে সামঞ্জস্য স্থাপনের পথ হিসেবে দেখা যায়। যদি ভাবি যে, এই বৃহৎ সমাজ বহু জাতিসম্প্রদায়ের এক যুক্তরাজ্য, তবে সাম্প্রদায়িক কলহের ভিতরও দায়িত্বশীল মানুষের চোখে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের কথাটাই বড় হয়ে ওঠে। যুধ্যমান দুই সম্প্রদায়ের ভিতর একটিকে উৎখাত করে শান্তি স্থাপনের চিন্তাটা একটা অমানুষিক চিন্তা। রবীন্দ্রনাথের কাছে তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষাই শান্তির বাণী।

যাঁরা শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা অন্তত তাত্ত্বিকভাবে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্বের শক্তি বিপথগামী হয়। মানুষের সংগ্রামী শক্তিকে চালিত করতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের পথে, নান্য পন্থা। কিন্তু এটা মূলত রণকৌশলের কথা। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে আমরা মূল্য দিই কি না, এটা হল মূল্যবোধের প্রশ্ন। মানবতাবাদের তত্ত্বের সঙ্গেও একে স্বতঃসিদ্ধভাবে একাকার করে দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সব স্থানীয় সংস্কৃতিকে একাকার করে তিনি মানবসংস্কৃতি স্থাপন করতে চাননি। বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে তিনি ঐক্য চেয়েছেন।

আমাদের মেনে নিতে হয় যে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আছে ; সামাজিক সংগঠনে এর একটা স্থান আছে ; এর নিজস্ব মূল্য আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু একটিকে অন্যটির অন্তর্গত করা যায় না। এর যে-কোনোটিই এককভাবে অসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ শোষণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এতে রাবীন্দ্রিক বাণী সম্পূর্ণ হয় না। তিনি বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্যের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, একথাটা যোগ করতে হয় তার নিজস্ব মূল্যে।

ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে আধুনিককালে যে সংঘর্ষ দেখা গেছে তার কিছুটা কারণ ধর্মান্ধতা, অনেকটার মূলেই আছে ক্ষমতা অথবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইতিহাসের এই পর্বের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। এদেশের ইংরেজ বণিকের কর্তৃত্ব স্থাপনের পর নতুন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এই প্রশাসনযন্ত্রে প্রবেশ লাভের জন্য ভারতীয় মধ্যবিত্তের ভিতর একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। এই প্রবেশ লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল ইংরেজিভিত্তিক কলেজী শিক্ষা। হিন্দু, বিশেষত বাঙ্গালী উচ্চবর্ণের মানুষ, সর্বপ্রথম এই নতুন শিক্ষালাভের জন্য এগিয়ে যায়। পরে মুসলমানেরাও এই শিক্ষায় আগ্রহী হয়। ততদিনে হিন্দু উচ্চবর্ণ সরকারী শাসনতন্ত্রে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এইভাবে শুরু হল হিন্দু এবং মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের নতুন মধ্যবিত্তের ভিতর সংঘাত।

স্বাধীনতালাভের পর কলেজী শিক্ষার আরো সম্প্রসারণ ঘটেছে। এখন সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে হিন্দু উচ্চবর্ণের সঙ্গে হিন্দু নিম্নবর্ণের। বর্ণ না বলে জাতি অথবা জাত বলাটাই সঙ্গত, এ দুয়ের ভিতর অর্থভেদ আছে। যাই হোক, একটা কথা এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে। কলহটা যখন ছিল প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের ভিতর তখনও সেটা দুই সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আকার ধারণ করে, সেভাবেই ইতিহাসে তার প্রভাব আঁকা হয়ে গেছে। আজকের জাতিতে জাতিতে যে সংঘর্ষ সেখানেও ব্যাপারটা ঐ ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা নতুন কলেজী শিক্ষা লাভ করেছেন, হিন্দুসমাজের পিছিয়ে পড়া জাতির ভিতর তাঁরা সংখ্যায় স্বল্প। তবু কলহটা হয়ে উঠেছে জাতিতে জাতিতে কলহ। এটাকে শুধু উচ্চশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী কৌশল বললে ঠিকভাবে বলা হয় না। আসলে সাধারণ মানুষের আত্মপরিচয় স্বাভাবিকভাবে জাতিভিত্তিক ও সম্প্রদায়সংলগ্ন, এ কথাটা অস্বীকার করে আমাদের সমাজকে বোঝা যাবে না।

এই গোড়ার কথাটা মেনে নিয়ে আমাদের আইনে ও সংবিধানে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অনুসূচিত জাতি এবং পিছিয়ে পড়া জাতিকে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই আইনকানুনের ধারায় এবং প্রয়োগে কিছু ক্রটি আছে, সে কথা ভিন্ন। কিন্তু আমরা, বিশেষত অগ্রসর জাতের অনেকে, গোড়াতেই একটা আপত্তি তুলি। আমরা বলি, জাতের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়াটাই ভুল, দিতে হবে ব্যক্তি কিংবা পরিবারের আর্থিক আয়ের অর্থাৎ দারিদ্র্যের বিচারে। অর্থাৎ, আমরা ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বুঝি, জাতের পার্থক্যটা লক্ষ করতে চাই না। কিন্তু আমাদের বৃহৎ সমাজে জাতিতে জাতিতে পার্থক্যটা উপেক্ষা করবার মতো নয়। সমগ্র মানবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলেও একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। দেশ তো একটা সমষ্টিগত ব্যাপার, প্রতি দেশের ভিতর ধনী দরিদ্রের পার্থক্য আছে, গরীব দেশেও কিছু ধনী আছে। দেশের ভিতরকার অসাম্য দূর করবার চেষ্টা আবশ্যক, কিন্তু উন্নত দেশ ও অনুন্নত দেশের ভিতর যে আর্থিক দূরত্ব সেটাও কমাবার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেশের ভিতর জাতিতে

জাতিতে যে আর্থিক বৈষম্য তার বেলায় একই কথা বলতে হবে। অনুসূচিত জাতির ভিতর যারা অর্থবান ও সম্পত্তিবান তাদের জন্য বিশেষ অর্থসাহায্য দেওয়া ঠিক হবে না, এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের ভিতর যেখানে উন্নতির মানে দূরত্ব আছে সেখানে সেই দূরত্ব কমাবার জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে, তা নইলে সমন্বয় সাধনের কোনো স্থায়ী ভিত্তিই প্রস্তুত হবে না।

অবশ্য চাকরীর ক্ষেত্রে সরকারী সংরক্ষণ নীতিও যথেষ্ট নয়। অন্তত দুদিক থেকে এর গুরুতর অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে। এই সংরক্ষণ নীতিকে আশ্রয় করে অনুন্নত জাতের ভিতর থেকে যাঁরা শিক্ষিত এবং সুবিধাভোগী হয়ে বেরিয়ে আসছেন তাঁদের অনেক সময়ই একটা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় গিয়ে পড়তে হচ্ছে। তাঁরা নিজেদের জাত থেকেও বিচ্ছিন্ন আবার শিক্ষা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁদের সুষ্ঠু কোনো সমন্বয় ঘটেনি। শুধু সরকারী আইন দিয়ে সমাজ সমন্বয়ের কাজ কখনও সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য প্রয়োজন হয় বৃহত্তর এক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলন। এই হল প্রথম কথা।

এরপর আসে দ্বিতীয় কথা। আমাদের কলেজী শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। গ্রামের সমাজ থেকে আগে মুষ্টিমেয় ছেলেই কলেজে প্রবেশ করত। আজ তাদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আরো বাড়বে। এরা সবাই যদি সরকারী চাকরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে তবে সাধারণ গাণিতিক নিয়মেই একটা অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হতে বাধ্য, হচ্ছেও। এই অবস্থায় পিছিয়ে পড়া জাতের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদেরও চাকরী দেওয়া যাবে না, অগ্রসর জাতের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল। এ পথে সামাজিক সংঘর্ষ বাড়বে, কমবে না। গ্রামীর্ন অর্থনীতি এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার রূপান্তর অতএব আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একদিকে গ্রামের সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবা ব্যবস্থার অভাব। আর অন্যদিকে গ্রামের শিক্ষিত ছেলেরা বেকার। এই অসঙ্গতি থাকতে দেবার অর্থ হয় না। আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এমন হওয়া সম্ভব যে গ্রাম থেকে ছেলে বেছে নিয়ে তাদেরই তৈরি করা যায় গ্রামে নিরক্ষতা দূরীকরণের কাজের জন্য, অথবা গ্রামের স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় নিযুক্তির জন্য, অথবা গ্রামীণ ব্যাংকে কর্মনির্বাহের উদ্দেশ্যে। আরো গোড়ার কথা এই যে অনুন্নত জাতি ও উপজাতির উন্নতি এবং গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকারী তহবিল থেকে যে টাকা আসে তার অনেকটাই আজকাল অর্ধপথে অন্তর্হিত হয় অনেক শহরবাসী মধ্যস্থের পকেটে। গ্রামীণ সংগঠনের কাজে গ্রামে মানুষদের যাতে প্রধান ভূমিকা থাকে, তারাই যাতে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে অগ্রসর হতে পারে, এই রকমই করতে হবে। নয় তো আমাদের সমাজ ও অর্থনীতি তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেই বিধ্বস্ত হবে। গ্রামের সমাজে ব্যাধি জমে উঠবে আর শহরের হাসপাতালে তার সুষ্ঠু আরোগ্যের ব্যবস্থা হবে, এটা সম্ভব নয়। বহু জাতিতে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত এই বৃহৎ সমাজে গ্রামের দিকে চোখ রেখেই সামাজিক নানা ব্যাধির আরোগ্যের আয়োজন করতে হবে।

জাতীয় সংহতির জন্য নানা পথে একই সঙ্গে চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। আর্থিক আয়োজনই যথেষ্ট নয়। প্রথমত আর্থিক উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। দ্বিতীয় একটা কথাও আছে। সম্প্রতি যে সব দিক থেকে জাতীয় সংহতির উপর আক্রমণ এসেছে সেগুলি বিবেচনা করে দেখলে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে সব রাজ্য অথবা সম্প্রদায় আর্থিক বিচারে সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত তারাই যে সংহতিবিরোধী কাজে সবচেয়ে

সক্রিয় হয়েছে এমন মোটেই নয়। ভারতের দরিদ্রতম প্রধান রাজ্য বিহার, পঞ্জাব নয়। প্রত্যেকটি রাজ্য ও সম্প্রদায়েরই নিজস্ব সমস্যা অথবা অসন্তোষের কিছু কারণ থাকে একথা ঠিক, কিন্তু জাতীয় সংহতির বিরোধী শক্তিগুলিকে যে সব সময়েই কিছু ন্যায্য আর্থিক সহায়তা দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায় এমন ধরে নেওয়া ঠিক নয়। অতঃপর কী করা যায়?

জাতীয় সংহতির ওপর যখন আঘাত আসে তখন সরকার অনেক সময়েই সামরিক উপায়ে তাকে আটকাতে চেষ্টা করেন। তারই চরম দৃষ্টান্ত সামরিক ডিক্টেটরশিপ। নানা কারণে সামরিক শাসনে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির দিকে তাকালেই সেটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামরিক শাসন জাতীয় সংহতিবিরোধী শক্তিগুলিকে নির্মূল করতে পারে না, তাদের কিছুকালের জন্য আত্মগোপন করতে বাধ্য করে মাত্র। বহুজাতিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত বৃহৎ দেশকে বেশিদিন সামরিক স্বেচ্ছাচারিতায় ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় না। অবশেষে কোনো একপ্রকার ঐকমত্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়। বিভিন্ন জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অনেকটা মেনে নিতে হয়। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নয়, সমাধান খুঁজতে হয় বিকেন্দ্রীকরণের পথে।

তবে এখানেও সমস্যার অতি সরলীকরণের একটা ভয় আছে। রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে তাকে ক্ষমতার একপ্রকার বিকেন্দ্রীকরণ বলা যেতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণের শেষ লক্ষ্য কিন্তু গ্রামসমাজ। দলীয় রাজনীতি যেহেতু ক্ষমতা নিয়ে লড়াই, রাজ্যগুলি যদি এই লড়াইয়ে মত্ত হয়ে ওঠে তবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হতে পারে রাজ্যের স্তরে। তাতেই জাতীয় সংহতি নিরাপদ হবে এমন নয়। জঙ্গী শিখেরা রাজ্যের হাতে কতটা ক্ষমতা চাইবে? কিছু পাবার পর আরো ক্ষমতা পাবার তৃষ্ণা বেড়ে যাবারই সম্ভাবনা। কোনো এক রাজ্য বেশি পেলে অন্যান্য রাজ্য কি অল্পে সন্তুষ্ট থাকবে? আরো বেশি পাবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি সব রাজ্য জড়িয়ে পড়ে তবে এর শেষ কোথায়? এই রকম কিছু প্রশ্ন একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

কেউ কেউ সোবিয়েত দেশের উদাহরণ তুলে ধরেন। দেশ ভাগের ঠিক আগে মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে একটা বিতর্ক শুরু হয়েছিল। আমাদের কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের মুখে আমরা তখন শুনেছিলাম যে, সোবিয়েত যুক্তরাজ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। কিন্তু ঐ অধিকার সত্ত্বেও সোবিয়েত দেশ যে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়নি তার কারণ সারা দেশে ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে আছে একটিমাত্র দল। সেই দলের শক্তিতে সংহতি রক্ষা হচ্ছে। সংবিধানে কী বলা আছে সেটা প্রধান কথা নয়, বাস্তব অবস্থাটা বিবেচ্য। সত্যি কি কোনো অঙ্গরাজ্যকে সোবিয়েত সরকারের ক্ষমতার নাগালের বাইরে যেতে দেওয়া হবে, যদি সে যেতে চায়? প্রশ্নটা আরো একটু বিস্তৃত করে জিজ্ঞেস করা যাক। পূর্ব ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রকেই কি মস্কোর কর্তৃত্বের বাইরে যেতে দেওয়া হবে? এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মস্কো যথাশক্তি এটা হতে দেবে না। এর সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধিই সিদ্ধ হবে যদি সোবিয়েত দেশ অথবা পূর্ব ইউরোপ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমাদেরও সতর্ক হয়ে চলা প্রয়োজন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে দেশ যদি খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় তবে পূব এবং পশ্চিমের বৃহৎ শক্তির যুদ্ধক্ষেত্র হবে না কি সেই বহুবিভক্ত ভারত?

ভারতে একদলীয় শাসনতন্ত্র নেই। আমাদের গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে ওটা মেলে না। কিন্তু আমরা জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে চাই। কী ভাবে সেটা সম্ভব? এটাই মূল প্রশ্ন।

সঠিক আর্থিক নীতি যদিও জরুরী তবু কোনো আর্থিক কার্যক্রম দিয়েই জাতীয় সংহতিকে নিশ্চিত করে তোলা যাবে না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয়, অথচ সেটাও যথেষ্ট নয়। জাতীয় সংহতির জন্য আরো যা চাই কোথায় তাকে পাব ? প্রশ্নটা যদি আমাদের ধাক্কা দেয় তাতেও কিছু কাজ হয়।

সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে এমন কিছু আদর্শের কথা মানুষের চেতনায় জাগ্রত রাখতে হবে যার ফলে সংহতি রক্ষা পায়। কিন্তু কোন্ আদর্শের কথা ? অনেকেরই আসলে মনে আছে জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা। অনেকেই ভাবছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যের প্রতি নতুন প্রজন্মকে অনুরক্ত করে তোলা আবশ্যক। এখানেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। জাতীয়তাবাদের আদর্শও দেখা দিয়েছে একাধিকরূপে। হিন্দু মহাসভারও একটা জাতীয়তাবাদ ছিল, যেটাকে আমরা অনেকেই গ্রহণ করি না। স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাখ্যা নিয়ে আছে নানা বিবাদ।

জাতীয়তাবাদের কথা অনেকে বলবেন নিজের মতো করে। কিন্তু মতবাদের চেয়েও বড়, কিছু মূল্যবোধ। বহু আশা ও নৈরাশ্যের ইতিহাস, বহু মতবাদের ধ্বংসস্তূপ অতিক্রম করেও থেকে যায় কিছু মূল্যবোধ। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের কাছে আমরা পাই সেই মূল্যের পরিচয়। জাতীয় সংহতি রক্ষার কোনো অনায়াসসিদ্ধ এবং সুনিশ্চিত পথ নেই। কিন্তু অন্য সব উপায়ের সঙ্গে যোগ করতে হবে মূল্যবোধেরও শিক্ষা। সে শিক্ষার একটি প্রধান কথা এই : আমরা যে কোনো জাতি অথবা সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হই না কেন, তাকে উন্নত করে তোলা যাবে না আত্মসংকোচনের পথে। বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সম্ভব তাব বৃদ্ধি ও বিকাশ, তবেই তার সার্থকতা, শেষ অবধি, সব অর্থেই।

এটা একটা সহজ সত্য, বাস্তববুদ্ধি এবং আদর্শবাদ যেখানে একবিন্দুতে এসে মিলেছে। এদেশের বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পিছনে এটাকেই মূল যুক্তি বলে আজ গ্রহণ করা যায়। সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বলে দুটি শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি। কোনো সম্প্রদায়েরই স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয় যদি সে নিজের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে রাখে। এতে তার আর্থিক উপার্জনের সুযোগ সংকীর্ণ হয়, বুদ্ধির মুক্তি ঘটে না, নীতিরও দুর্গতি ঘটে। সাম্প্রদায়িক জীবনের এই আবদ্ধ অবস্থাকেই আমরা বলব সাম্প্রদায়িকতা। আর যখন কোনো সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা জানিয়ে সহযোগিতার উন্মুক্ত পথে এগিয়ে যেতে আগ্রহী হয় তাকেই আমরা বলি ধর্মনিরপেক্ষতা। অন্তত ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার এটাই প্রায়োগিক অর্থ। সব ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা দেখাবার যুক্তি এখানে সরল। বৃহত্তর সহযোগিতার জন্য যে সব নৈতিক নিয়ম প্রয়োজন তাদের খুঁজে পাওয়া সম্ভব সব ধর্মের ভিতর। ধর্মবিশেষের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কাজটা প্রধানত সেই ধর্মাবলম্বীর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কোন ধর্ম বড় কোনটা ছোট, এই তর্কে শুধু সহযোগিতার পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক মমতা থাকে। তাতে দোষ নেই। প্রতিবেশীকে নিয়েই তো স্বাভাবিক নিয়মে সহযোগিতার শুরু। অন্যায় প্রতিবন্ধক থেকে নিজের সম্প্রদায়কে মুক্ত করবার চেষ্টাও সঙ্গত। কিন্তু শেষ লক্ষ্য হবে সহযোগিতার সম্প্রসারণ। প্রকৃত দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখলে এতেই স্বজাতিরও কল্যাণ।

এসব কিছুই নতুন কথা নয়। এ সবই বোঝা সহজ, বোঝানো যায়। শিক্ষিত উপজাতীয় যুবক একথাগুলি সহজেই বোঝে, এটা আমি নিজেই দেখেছি। সর্বভারতীয়

কোনো দলের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি নন এমন উপজাতীয় নেতার সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি, তিনি সোৎসাহে সহমত জানিয়েছেন।

আপত্তি তোলেন কিছু বিজ্ঞ সংশয়বাদী : কিন্তু নীতিকথায় কি কাজ হয় ? না, হয় না। শুধু রাজনীতির কৌশলেও কিন্তু বেশী কিছু হয় না। সবই চাই : আর্থিক পরিকল্পনা, বিজ্ঞ রাজনীতি, মূল্যবোধ।

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে

যদিও জাতীয়তাবাদ আধুনিক ইতিহাসের একটি বিরাট শক্তি তবুও এর স্থায়ী মূল্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন এ-যুগের একাধিক মহৎ চিন্তানায়ক। 'ভূদান' পত্রিকার পৃষ্ঠায় (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২) বিনোবা ভাবে মত প্রকাশ করেছিলেন : একদিকে পল্লী অন্যদিকে বিশ্ব, এই নিয়ে হবে ভবিষ্যতের পৃথিবী ("In the future set-up we shall have only two things, the village and the world")। এই কথাটির তাৎপর্য সহজ। আত্মীয়তাবোধের দু'টি স্বাভাবিক বৃত্ত আছে। মানুষ হিসাবে মনুষ্যজাতির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করা যায়। আবার প্রতিদিনের জীবনে যারা সুখদুঃখের নিত্য সাথী, যাদের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব আমাদের চেতনার ওপর বার বার দাগ ফেলে যায়, তাদের নিয়ে অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী হিসাবে পল্লীর একটি বিশেষ স্থান আছে ব্যক্তির জীবনে। পল্লী মানুষের স্বাভাবিক নীড় ; মানবজাতি তার আকাশ ; এ দু'য়ের মাঝখানে কোনো স্থায়ী অথবা স্বাভাবিক আশ্রয় নেই।

'Nationalism' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন : "Even though from childhood I had been taught that the idolatry of Nation is almost better than reverence for God and humanity I believe I have outgrown that teaching, and it is my conviction that my countrymen will gain truly their India by fighting against the education which teaches them that a country is greater than the ideals of humanity."

অর্থাৎ, যদিও বাল্যাবধি একথাই তিনি বার বার শুনে এসেছেন যে, সব পূজার ঊর্ধ্বে দেশ পূজা, তবু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মানুষের চেয়ে দেশ বড় এই কুশিক্ষাকে ত্যাগ করে তবেই ভারতবর্ষকে আমরা গভীরতর অর্থে গ্রহণ করতে পারব।

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমাদের ভিতর যার শেষ সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে ও চিন্তার প্রয়োজন আছে এ কথাটা ধরে নিয়েই আলোচনা শুরু করা ভালো।

জাতীয়তাবাদের একটা সদর্থক দিক আছে, আবার নঙর্থক দিকও আছে। এর পরিপূর্ণ মূল্যায়নে এই দু'য়েরই বিশ্লেষণ আবশ্যক।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে হাতিয়ার হিসাবে জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার্য। সে কথা বিশেষত আমাদের দেশে বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতালাভের পর অন্য

এক দিক থেকে আলোচনা আবশ্যক। সমাজগঠনের মৌল ও সদর্থক নীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদের মূল্যায়ন এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য।

জাতীয়তাবাদের সদর্থক দিকটা কী ? এই প্রশ্নের একটি প্রচলিত উত্তরের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার দিকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অর্থাৎ, মানবতাবোধ অথবা বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাই আমাদের পরম উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হবার পথে জাতীয়তাবাদ একটি অপরিহার্য সোপান। গান্ধী, নেহরু প্রমুখ এদেশের মহান নেতারা জাতীয়তাবাদের এই সদর্থক সংজ্ঞাটি বার বারই তুলে ধরেছেন।

তত্ত্বের সঙ্গে জীবনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখা এবং এ দু'য়ের ভিতর বিরোধকে মুক্ত মন নিয়ে স্বীকার করা আবশ্যক। জর্মানি একদিন বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদ জর্মানিকে একটি বৃহত্তর আনুগত্যে সংবদ্ধ করেছে। ইয়োরোপের যে-ইতিহাস আমরা উদ্ঘাটিত হতে দেখেছি তাতে কিন্তু জর্মান জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার পথে পদক্ষেপ মনে করা সহজ হয়নি। লেনিন প্রমুখ নেতারা আন্তর্জাতিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। বিপ্লবের পর ক্রমশ রুশ দেশে জাতীয়তাবোধ আবার শক্তিশালী হয়েছে। এতে আন্তর্জাতিকতার পথ প্রশস্ত হয়েছে কিনা সে কথা তর্কসাপেক্ষ।

যদি বলা হয় যে, জাতীয়তাবোধ স্বাভাবিক, তবে সে কথাটা হয়তো মেনে নেওয়া যায়। যাঁরা আপত্তি করেন তাঁরাও দেখেছি অনেক সময় স্বদেশের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে আবার অন্য কোনো দেশের সঙ্গে অন্ধ মমত্বে আবদ্ধ হন, অর্থাৎ একপ্রকার বিপরীত জাতীয়তাবোধে ধরা পড়েন। এতে বোঝা যায় যে, নিরপেক্ষ মানবতাবোধে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়। কিন্তু জাতীয়তাবোধকে স্বাভাবিক বললেই তার মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। উপজাতীয় আনুগত্য কি আরও 'স্বাভাবিক' নয় ?

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, উপজাতীয় সমাজে মানুষের প্রকৃতির একটা সহজ প্রকাশ আছে। সেখানে মানুষে মানুষে পারস্পারিক সম্পর্কের জৈবিক ভিত্তি সরল ও সুস্পষ্ট। উপজাতীয় সমাজের নিয়মগুলি পালিত হয় দুটি প্রধান কারণে : পারস্পরিক স্নেহ ও নির্ভরতাবোধ থেকে এবং নানাপ্রকার অতিপ্রাকৃতিক ভয়ের শাসনে। উপজাতীয়দের ভিতর যে-সততা ও সত্যবাদিতা লক্ষিত হয় তার পিছনে কোনো যুক্তিধৃত বিবেকের প্রাধান্য নেই। তাদের সারল্যই আমাদের মুগ্ধ করে।

সামাজিক বিবতনের একটি উচ্চতর স্তরে বিভিন্ন উপজাতি নিয়ে গঠিত হয় মহাজাতি। এই বৃহত্তর সমাজের নিয়মগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল। আদি আত্মীয়তাবোধের কাছে এইসব নিয়মের অর্থ অস্পষ্ট, আবেদন দুর্বল। বৃহৎ সমাজের অভ্যন্তরে উপজাতীয় কলহ গুপ্ত থাকে অথবা তারই আধুনিক প্রকারভেদ প্রকাশ পায়। এ অবস্থায় সামাজিক সংহতি রক্ষা করাও একটা সমস্যা হয়ে ওঠে। এই সমস্যার কোনো সরল সমাধান নেই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে সম্পত্তির মালিকানাই দ্বন্দ্বের মূল কারণ। বস্তুত ব্যাপারটা এত সহজ নয়। সাম্যবাদী সমাজেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর ক্ষমতার অতএব স্বার্থের দ্বন্দ্ব যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস জুড়ে তার রক্তাক্ত সাক্ষ্য উপেক্ষা করা যায় না। বৃহৎ সমাজে বিভিন্ন স্বার্থের এমন কোনো সমন্বয় সম্ভব নয় যেটা উপজাতীয় সংহতির মতোই অনায়াসে সকলের অন্তরে স্বীকৃত।

কোনো আর্থিক বিন্যাসের দ্বারাই ব্যক্তি ও বৃহৎ সমাজের ভিতর সেই তাৎক্ষণিক একাত্মবোধ সৃষ্টি করা যায় না, ব্যক্তি ও আত্মীয়গোষ্ঠীর ভিতর যে ঐক্যানুভূতি স্বাভাবিক।

আজকের জটিল সমাজে যদি এমন কোনো নিয়মতন্ত্র কল্পনা করা যায় যাতে সকলের স্বার্থের ভিতর সামঞ্জস্য সুরক্ষিত, তবু সেই নিয়মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃপ্রকাশিত নয় বরং শুধু একটি ব্যাপ্ত দৃষ্টিতেই তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেও যদি কেউ চুরি করে এবং ধরা না পড়ে, তবে ব্যক্তিগতভাবে সেটা তার লাভ, যদিও সমাজের পক্ষে সেটা ক্ষতি। চোর সমাজের অংশ, অতএব সমাজের ক্ষতিতে সেও অংশীদার, এই যুক্তিতে কাজ হয় না ; কারণ চোরের লাভটা এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও সামগ্রিক, ক্ষতিটা তেমন নয়। সোভিয়েত দেশে যৌথ খামারের সম্পত্তি চুরির দায়ে অপরাধীকে কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ অন্যান্য সমাজের মতোই সাম্যবাদী দেশেও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ আছে এবং তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থাও প্রচলিত। দণ্ডের প্রয়োজন স্বীকার্য হলেও শুধু দণ্ডের উপর কোনো সমাজব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। নীতির অপর ভিত্তি যুক্তি ও বিবেক। অথচ নিরাসক্ত যুক্তির প্রভাবও সীমাবদ্ধ। অতএব বৃহৎ সমাজের সংহতি ও স্থায়িত্বের জন্য নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত আনুগত্যের একটা বন্ধন প্রয়োজন।

আধুনিক যুগে সামাজিক উন্নয়নের জন্য কতগুলি বিশেষ গুণ ও নিয়মের প্রয়োজন হয়, যেমন, নাগরিক কর্তব্যবোধ এবং জাতীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির প্রতি যত্ন। দৈনন্দিন কাজকর্ম যেখানে পরিবারের পরিধির ভিতর সম্পন্ন হয় সেখানে আত্মীয়তাবোধের জোরেই কিছু নিয়ম ও দায়িত্ব আমরা সহজে পালন করি। কিন্তু আধুনিক সংগঠনে যাঁরা নানা কর্মে নিযুক্ত তাঁদের ভিতর কোনো আদিম বন্ধন নেই। এই অবস্থায়, বিশেষত আধুনিক যুগধর্মে আরোহণের প্রথম পর্বে, বৃহৎ সমাজে কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি হিসাবে জাতীয়তাবাদের একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার্য। যে সমাজে জাতীয়তাবাদ ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করেনি, অথচ উপজাতীয় সংকীর্ণতার ওপর আন্তর্জাতিকতার একটা প্রলেপ পড়েছে, সেখানে গ্রাম্য সংস্কারের সঙ্গে একপ্রকার বিশ্বমানবতার বাণীর সংযোগ দেখা যায় মাত্র, কিন্তু নাগরিক কর্তব্যবোধের বিশেষ উন্মেষ ঘটে না।

আঠার শতকের শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি জার্মান পণ্ডিতেরা আকৃষ্ট বোধ করেন। কালিদাসের শকুন্তলায় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে-ললিত সম্পর্ক বর্ণিত আছে তাতে বহু জর্মান মনীষী তখন মুগ্ধ বোধ করেছিলেন। ভারতের ধর্ম ও দর্শন, পুরাণ ও মহাকাব্য আস্বাদন করে অনেকে বিহ্বল হয়েছিলেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হেগেলের পরিণত বয়সের লেখায় কিন্তু এই বিহ্বলতার ভিতরও একটা সমালোচনার সুর লক্ষ করা যায়। হেগেলের সেদিন মনে হয়েছিল যে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানসে কোথাও একটা দুবলতা আছে, যে জন্য রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সংহতি এদেশে দুর্বল। প্রকৃতির সান্নিধ্যে ও আদিম গোষ্ঠীজীবনকে আশ্রয় করে যে-লালিত্য ও নীতিবোধ ভারতীয় সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, আধুনিক যুগে সামাজিক বিবর্তনের আঘাতে তার ভঙ্গুরতা ধরা পড়বে এই সন্দেহ তিনি গোপন করেননি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে হেগেলেব নিজ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপদের দিকটা দেখা গেছে। কিন্তু জর্মান চরিত্রে আধুনিক যুগে যে-সব গুণ প্রশংসা লাভ করেছে তাও বহুপরিমাণে জাতীয়তাবোধেই বিধৃত, এ কথা স্বীকার্য।

জাতীয়তাবোধ যুক্তির মতো নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্ত নয়, আবার উপজাতীয় আনুগত্যের মতো সংকীর্ণ নয়। প্রাচীন সমাজে কে মান্য আর কে অধীন এ বিষয়ে সন্দেহের তেমন

অবকাশ ছিল না। কিন্তু আধুনিক যুগে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমালোচনাধর্মিতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন নীতিবোধ দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধের চেয়ে সমাজের কাছে আমাদের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে। জাপানে উনিশ শতকের শেষ দিকে এই রকম একটা যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় সংহতির ভিত্তি হিসাবে শিন্টো ও কনফিউসীয় ধর্মের, কিংবা জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক কর্তব্যবোধের, সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা গুরুত্ব লাভ করে। জাতীয়তাবাদের উগ্রতা জাপানের আধুনিক ইতিহাসে লক্ষণীয়। কিন্তু ঐ দেশের বিস্ময়কর উন্নতির মূলে যে জাপানী জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ, সমান বিস্ময়জনক একটা কর্তব্যনিষ্ঠা আছে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের সুফল ও তার আতিশয্যের বিপদ দুই-ই জাপানের সাম্প্রতিক ইতিহাসে সমান প্রত্যক্ষ।

জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক আধারে গঠিত স্বদেশপ্রীতি এবং তারই সমবৃত্তিক কর্তব্যবোধ ছাড়া আরও একটি বস্তু আছে, সেটি জাতীয় শক্তির সাধনা। এই শক্তির সাধনা কর্তব্যনিষ্ঠায় একপ্রকার দার্ঢ্যের সংযোজন করে, আবার তার বিকারেরও কারণ হয়। যে-পরিমাণে জাতীয়তাবাদ ব্যবহারিক নীতিকে বৃহত্তর সামাজিক সহানুভূতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করে, সেই পরিমাণে তার পরিচয় সদর্থক। যেখানে জাতীয়তাবাদ নীতিবোধের মানবিক বিস্তৃতির পথে বাধা, সেখানে তার সংজ্ঞাও নঙর্থক। ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করেই এর বিচার সম্ভব। কারণ একই বস্তু ইতিহাসের বিবর্তনের কোনো এক পর্যায়ে বৃহত্তর লক্ষ্যের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, আবার অন্য কোনো পর্যায়ে অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়।

মাতৃভাষা, ইংরেজী ও হিন্দী

এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ কম যে, শিক্ষার প্রধান বাহন হওয়া উচিত মাতৃভাষা। শুধু বিদ্যালয়ে নয়, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থাই যথাসম্ভব শীঘ্র চালু হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে-ভাষায় আমাদের মনে অভিজ্ঞতা প্রথমে আকার গ্রহণ করে, জীবনের বিচিত্র সমস্যা যে-ভাষায় আমাদের চেতনায় স্বভাবত উদিত হয়, যে-ভাষা আমাদের কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ, সে ভাষায় বিগলিত হয়ে যে-শিক্ষা আমাদের মনে প্রবাহিত হয় সেই শিক্ষারই উপলব্ধির গভীরতম স্তরে সঞ্চার সম্ভব।

উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এদেশে মাতৃভাষার পাশে, দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে, ইংরেজীরও একটি স্থান থাকা বাঞ্ছনীয়। কারো কারো মতে অহিন্দীভাষী অঞ্চলে মাতৃভাষার পাশে এই দ্বিতীয় স্থান হিন্দীরই প্রাপ্য, ইংরেজীর নয়। এ মত গ্রহণের অযোগ্য। হিন্দীর সাহায্যে যা পাওয়া সম্ভব মাতৃভাষার সাহায্যে তা সবই পাওয়া যায়। উপরন্তু যা-কিছু জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজীর মাধ্যমে পেতে পারি হিন্দীর কাছ থেকে তা পেতে পারি না। বিশ্বের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু হতে পারে ইংরেজী, হিন্দী নয়। এই সেতুটিকে সযত্নে রক্ষা করা আমাদের চিন্তা ও কর্মের প্রসারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী আমাদের একটি উচ্চতর মানের

নির্দেশ দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর একাধিপত্য হানিকর এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব সাধু। কিন্তু আধিপত্য নয়, ইংরেজীর সাহচর্য আমাদের মাতৃভাষারই উন্নতিতে সহায়ক।

জাপানে শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার পরই দ্বিতীয় স্থান ইংরেজীর। এমন কি রুশ দেশ সম্বন্ধেও একথাই সত্য। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এসব দেশে ইংরেজী একটি বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছে। জাপান অথবা রুশদেশের চেয়েও আমাদের দেশে ইংরেজীর প্রয়োজন আরও বেশী। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসেবেই নয়, ভারতের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের অন্যতম ভাষা হিসাবেও এদেশে ইংরেজীকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

আন্তর্ভারতীয় যোগাযোগের একমাত্র ভাষা হিসাবে হিন্দীকে নির্বাচন করবার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

এদেশের বিদ্বজ্জনসমাজে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের চিন্তার আদান-প্রদান চলে আজ প্রধানত ইংরেজীর মাধ্যমে। একটি উদাহরণ ধরা যাক। পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা সারা ভারতের পরিকল্পনা। দেশজোড়া অর্থনীতিবিদ্‌দের এ বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং চলা প্রয়োজন। যে সমস্ত সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক কাগজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনীতিজ্ঞদের উচ্চাঙ্গ আলোচনা চলছে সে-কাগজগুলির ভাষা প্রধানত ইংরেজী। শুধু অর্থনীতি বিষয়ে নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি বিষয়েই এ-ধরনের সর্ব-ভারতীয় পত্রিকার প্রয়োজন আছে, যাতে কলকাতার বিদ্বজ্জন, মাদ্রাজ বা দিল্লীর সমধর্মীর প্রবন্ধ পড়তে পারবেন ও সরাসরিভাবে পাল্টা বক্তব্য জ্ঞাপন করতে পারবেন। এখন ধরা যাক যে, আন্তর্ভারতীয় চিন্তার আদান-প্রদানে ইংরেজীর স্থলে হিন্দী প্রতিষ্ঠিত হলো। বাংলার বিদ্বজ্জন সর্বভারতের জন্য এবার লিখতে বাধ্য হবেন হিন্দী ভাষায়। অবশ্য বাংলা বা অন্য যে-কোনো ভাষা থেকে হিন্দীতে অনুবাদ সম্ভব। কিন্তু আলোচনা এবং উত্তর প্রত্যুত্তরের যে সচল ধারা অবিরাম চলছে তার জন্য একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভাষা অপরিহার্য। যদি এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একমাত্র ভাষা হিসাবে হিন্দী গৃহীত হয় তবে অহিন্দী ভাষীর পক্ষে হিন্দী ভাষার সঙ্গে শুধু সাধারণ পরিচয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যথেষ্ট হবে না ; হিন্দী ভাষায় নিজের চিন্তাকে নিপুণভাবে প্রকাশ করে হিন্দীভাষী পণ্ডিতদের সঙ্গে সমপর্যায়ে তর্ক চালিয়ে যাবার যোগ্য হিন্দী জ্ঞান তাঁকে লাভ করতে হবে। তিনটি ভাষার সঙ্গে সাধারণ পরিচয় লাভ খুব কঠিন নয় ; কিন্তু তিনটি ভাষায় নিপুণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেও প্রায়ই অসম্ভব। যদি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য অহিন্দীভাষী বিদ্বান ব্যক্তি হিন্দীর প্রয়োগে পাণ্ডিত্য ও কৌশল অর্জন করতে বাধ্য হন তা হলে মাতৃভাষা অথবা ইংরেজী অথবা দুই-ই অবহেলিত হতে বাধ্য এবং যেহেতু মাতৃভাষা অথবা ইংরেজীকে সর্বাংশে অবহেলা করা সহজ হবে না, অতএব মাতৃভাষা যাঁদের হিন্দী তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অহিন্দীভাষী অসুবিধা এড়াতে পারবেন না।

যদি হিন্দী ভারতবর্ষের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয় তা হলে এই বিপদ বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর হিন্দীভাষীদের কর্তৃত্ব স্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এ আশঙ্কা বিশেষভাবে প্রবল এই কারণে যে, হিন্দীভাষীরা ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী। এই বিশেষ গোষ্ঠীর ভাষাই যদি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তবে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের উপর এদের আধিপত্য অপ্রতিরোধ্য হবে।

এই আশঙ্কার উত্তরে কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষায় চোদ্দটি ভারতীয় ভাষার সমান ব্যবহার এবং কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে কর্মচারী নিয়োগে এক ধরনের প্রাদেশিক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার প্রস্তাব তুলেছেন। এ-ব্যবস্থার নানা অসুবিধা আছে; কিন্তু অন্যান্য অসুবিধার কথা ছেড়ে দিয়েও এ-ব্যবস্থার দ্বারা শাসনযন্ত্রের উপর হিন্দী ভাষাভাষীদের কর্তৃত্ব রোধ করার চিন্তা অবাস্তব। সরকারী পরীক্ষা ও নিয়োগপ্রতিদ্বন্দ্বিতার শুরু মাত্র। আসল প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর্মজীবনে। যদি হিন্দী একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহীত হয় তবে সারা কর্মজীবনেই হিন্দী ভাষাভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষার সৌভাগ্যে একটি বিশেষ সুবিধার অধিকারী হবেন। অহিন্দীভাষীদের অসুবিধা প্রাদেশিক বিদ্বেষ ও তিক্ততার সৃষ্টি করবে। এই বিদ্বেষের পরিমণ্ডলে প্রাদেশিক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থা দেশবিভাগের চিন্তার দিকেই আবার আমাদের ঠেলে নিয়ে যাবে।

কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান চোদ্দটি ভাষাকেই কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার কথা বলে থাকেন। এ প্রস্তাবও সম্পূর্ণ কার্যকরী নয়। কেন্দ্রীয় দপ্তরে যদি প্রতিদিন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিভিন্ন ভাষায় চিঠিপত্র, রিপোর্ট ইত্যাদি আসতে থাকে তো চোদ্দটি ভাষা থেকে ক্রমাগত একটি দু'টি ভাষায় এই চিঠিপত্রাদির অনুবাদ প্রয়োজন হবে, কারণ কোনো মন্ত্রী বা অধস্তন কর্মচারী চোদ্দটি ভাষা বুঝতে পারবেন আশা করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে-সব বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের অবগতির জন্য পাঠানো হয় সেগুলি অবশ্য সেই সেই অঞ্চলের প্রধান ভাষাসমূহে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনুবাদের কাজে একটা সীমা থাকাও প্রয়োজন। প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভিতর নিত্যনৈমিত্তিক পত্রাদি বিনিময়ে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ কাজে যে বিপুল বহরের লিখন-পঠন প্রতিনিয়ত চলছে তাতে চোদ্দটি ভাষাকে এক সঙ্গে ব্যবহার করা কোনো কার্যকরী ব্যবস্থাই নয়। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় দপ্তর একটি অতিকায় অনুবাদের যন্ত্রে পরিণত হতে চলবে। এতে যে পরিমাণে অর্থ এবং সময় ক্ষয় হবে তা যুক্তিযুক্ত নয়।

সমস্যা তা হলে এই : কেন্দ্রীয় শাসনকার্যে চোদ্দটি ভাষার সমান ব্যবহার সম্ভব নয়; অথচ একমাত্র হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার ফলাফল গুরুতর। ভারতের অন্যান্য সকল ভাষার মতো হিন্দীরও সমৃদ্ধি আমাদের কাম্য। হিন্দী বিদ্বেষ সমর্থনযোগ্য নয়; কিন্তু হিন্দীকে যদি সর্বভারতীয় রাজাসনে অধিষ্ঠিত করতে হয় তো তার ফলাফল সম্বন্ধে নির্মোহ ধারণা রাখাই শ্রেয়। হিন্দীকে ভারতের একমাত্র যোগাযোগের ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার ফলে বাংলা, গুজরাতী ইত্যাদি অহিন্দী অথচ হিন্দীর নিকটবর্তী ভাষাগুলি আগামী পঞ্চাশ বছরে ক্রমশ ক্ষয় পাবে, এবং খড়ীবোলী হিন্দীর তুলনায় আজ মৈথিলীর যে অবস্থা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দীর তুলনায় বাংলা ইত্যাদি অন্যান্য ভাষাও প্রায় সেই অবস্থাতেই প্রাপ্ত হবার পথে ক্রমে অগ্রসর হবে।

কারও মনে হতে পারে যে, বাংলা-গুজরাতী-পাঞ্জাবী-মারাঠী ইত্যাদি ভাষার ভবিষ্যৎ অবলুপ্ত করেও হিন্দীর ভিত্তিতে এক জাতি, এক প্রাণ, একতার বনিয়াদ সুদৃঢ় করা দূরদর্শিতা। কিন্তু এ চিন্তা যাঁদের মনে স্থান পেয়েছে তাঁদেরও একটি কথা বিচার করে দেখতে বলি। হিন্দীকে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার ফলে সত্যি কি ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে? ঐক্যের স্থলে অনৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনাই কি বেশী নয়? হিন্দী অঞ্চলের সঙ্গে অহিন্দী অঞ্চলের—উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের—অনৈক্য কি এই ব্যবস্থার ফলে অনিবার্য হয়ে উঠবে না? এ বিষয়ে শ্রীরাজাগোপালাচারির

সতর্কবাণী উপেক্ষণীয় নয়। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ একবার বিভক্ত হয়েছে; ভাষার ভিত্তিতে আবারও বিভেদ ডেকে না আনাই মঙ্গল।

ভারতীয় ঐক্যের জন্যে প্রয়োজন এমন একটি ভাষাকে কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের প্রধান ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা যে-ভাষা কোনো অঞ্চলবিশেষের ভাষা নয়। ভারতবর্ষে এমন ভাষা আজ দু'টিই আছে; ইংরেজী ও সংস্কৃত। সংস্কৃতের স্থান গৌরবময়; কিন্তু নানা কারণে আজ সংস্কৃতের মাধ্যমে এই বিরাট দেশের শাসনকার্য চালানো অসম্ভবপ্রায়। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসনকার্যের ভাষা হিসাবে ইংরেজীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য চালু রাখাই সমীচীন মনে হয়।

বলা হয়েছে যে, ইংরেজী এদেশের অধিকাংশের পক্ষে অবোধ্য। তথ্য হিসাবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইংরেজীকে কেন্দ্রীয় দপ্তরের ভাষা হিসাবে বহাল রাখবার ব্যাপারে এই তথ্যটি কতখানি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ তাও বিচার করে দেখা দরকার।

কেন্দ্রীয় দপ্তরে অথবা শাসনযন্ত্রে যাঁরা নিযুক্ত হবেন তাঁরা কিছু পরিমাণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করেই আসবেন। যে-হেতু উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয় এবং সর্বস্বীকৃত নীতি, অতএব কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত কর্মচারীদের এতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

প্রতি প্রদেশে সেই প্রদেশের প্রধান ভাষায় শাসনকার্য চলবে এ প্রস্তাব আজ স্বীকৃতি লাভের পথে। জনসাধারণের সঙ্গে শাসন ব্যবস্থার সাক্ষাৎ যোগাযোগ প্রধানত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ক্ষেত্রে। কেন্দ্রীয় দপ্তরে যে-ভাষাই গৃহীত হোক না কেন, প্রদেশে-প্রদেশে শাসনকার্যের ভাষা হবে জনসাধারণের বোধগম্য। কেন্দ্রীয় সরকারের যে-সব বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচারিত সে-সব বিজ্ঞপ্তি দেবনগরী লিপিতে এবং হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হলে অহিন্দীভাষী অঞ্চলে জনসাধারণের অবোধগম্যই থেকে যাবে। কাজেই এ ধরনের বিজ্ঞপ্তিগুলি যে যে অঞ্চলে প্রেরিত হবে, যথাসম্ভব সেই সেই অঞ্চলের প্রধান ভাষাতে লিপিবদ্ধ হওয়াই সমীচীন। লোকসভায় সভাপতির অনুমতি সহ যে-কোনো ভাষায় বক্তৃতা দেবার অধিকার তো থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, বহুর ভিতর সমন্বয়ের স্থাপনা ভারতের আদর্শ, এমন একটি কথা বহুবার বলা হয়েছে। ভাষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটিই নূতন করে ভেবে দেখা আবশ্যক। এদেশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিন্দু ধর্মের পাশে মুসলমান ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছে। খৃষ্টধর্মকেও আমরা বিজাতীয় জ্ঞানে বিতাড়িত করিনি। এই গ্রহণধর্মিতাই ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরবের দিক। ভাষার ক্ষেত্রেও এই উদার গ্রহণধর্মিতাই আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। বহুধর্মের মতো বহু ভাষাকেও আমাদের অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি দিতে হবে। এ-দেশে যুগের পর যুগ নূতন নূতন সভ্যতার স্রোত বয়ে গেছে। দ্রাবিড় সভ্যতার উপর আর্যসভ্যতার পলিমাটি পড়েছে। তারপর মুসলমান এসেছে, ইংরেজ এসেছে। বহু সভ্যতার বিবিধ উপাদান নিয়ে এদেশের বিচিত্র সভ্যতা। এর কোনো একটি উপাদানকে বর্জন করতে গেলে অবশিষ্ট উপাদানগুলির ভিতর ভারসাম্য ভঙ্গ হয়ে নূতন সংঘর্ষ সৃষ্টির আশঙ্কা। যে মনোবৃত্তি আজও ইংরেজীকে "বিদেশী" ভাষা বলে বর্জন করবে, সেই মনোবৃত্তিই হয়তো কাল খৃষ্টান এবং মুসলমান ধর্মকেও বিজাতীয় আখ্যা দেবে। এই বর্জনধর্মী, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য হলো এক হিন্দুধর্ম এবং হিন্দী ভাষার উপর হিন্দুস্থানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা। উত্তর ভারতের এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দক্ষিণী প্রতিধ্বনি আর্যবিরোধী উগ্র দ্রাবিড়

আন্দোলনে। এই সাম্প্রদায়িকতা ভারতবর্ষকে শুধু আভ্যন্তরীণ হানাহানি এবং মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। এদেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমন্বয়ধর্মিতা সৌখিনতা নয়, অথবা শুধু ঔদার্য বলেই আদরণীয় নয়, বরং সুস্থ জীবনযাত্রার অতি প্রয়োজনীয় পাথেয়।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

আমার এক অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি নিজে জনসঙ্ঘের সমর্থক ; জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কেন ওঁদের নীতি সমর্থন করি না। মতের পার্থক্য সত্ত্বেও আলোচনা করবার সদিচ্ছা ওঁর আছে, এই দেখে আনন্দিত হয়েছিলাম। সংক্ষেপে আমার জবাব লিখছি।

জনসঙ্ঘ ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যে বিশ্বাসী। ভারতীয় সংস্কৃতি এক ও অবিভাজ্য এবং এর একটা মূল ধারা আছে। এই ধারা থেকে যিনি বিচ্যুৎ তিনি প্রকৃত ভারতীয় নন। সংস্কৃতির এই মৌল ঐক্য হবে আমাদের রাজনীতির ধারক ও নিয়ন্তা। এই ঐক্যকে খণ্ডিত করে পাকিস্তানের জন্ম কাজেই ভারত বিভাগ মেনে নেওয়া চলে না। জনসংঘের চিন্তার এটাই মূল কথা।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও ঐক্য সম্বন্ধে আমার ধারণা ভিন্ন। আর রাজনীতি ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে জনসঙ্ঘের চিন্তাটাও ভ্রান্তিপূর্ণ।

ভারতীয় সংস্কৃতির দু'টি ভিন্ন ধারণা আছে ; একটি বৃহৎ ও গ্রহণধর্মী অপরটি ক্ষুদ্র এবং ছোট ছোট নিষেধের বেড়ায় খণ্ডিত। ভারতে দীর্ঘ ইতিহাস ধরে বার বারই দেখি যে বাইরে থেকে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, শিল্প, চিন্তাধারা এদেশে প্রবেশ করেছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐক্যকে সাময়িকভাবে খণ্ডিত করে ; তারপর দেশের বৃহৎ ঐতিহ্য এই বিদেশাগত, বিচিত্র উপাদানকে ধীরে ধীরে নিজের অংশ করে নিয়েছে। আমাদের মন যতদিন সৃষ্টিশীল ছিল, যে পরিমাণে সৃষ্টিশীল ছিল, ততদিন সে-পরিমাণে সমন্বয়ধর্মী কালের এই প্রক্রিয়ায় আমাদের ঐতিহ্য বিত্তবান হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতিতে কার স্থান হবে অথবা হবে না, প্রতি পদে পদে তার নিয়ন্ত্রণের ভার যদি না থাকত কালের হাতে, যদি থাকত কোনো শক্তিমান রাজপুরুষ অথবা ভারত সম্রাটের হাতে, তাহলে এদেশ মহামানবের সাগরতীরের পরিবর্তে হয়ে উঠত এক অতি প্রাচীন, অনড়, আত্মসঙ্কুচিত এবং অবশেষে আত্মরক্ষারও শক্তিরহিত, বন্ধ্যা সংস্কৃতির বাসভূমি। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও অবশ্য সংস্কৃতির এই অবক্ষয় সম্ভব যখন আমরা নিজের মনে নিজেই ভয় এবং অহমিকার মিশ্রণে গঠিত একটা অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে তুলি, যার উদাহরণও আমাদের দেশে আছে। কিন্তু সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রের কড়া শাসনে যখন ভিতরের এই নিষেধটাই সমর্থন খোঁজে তখন বিপদটা হয়ে ওঠে আরও বিষম।

রাষ্ট্রনেতাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সাময়িক ঘটনার চাপে, ক্ষুদ্রকালের সীমায়। সুস্থ সংস্কৃতির দৃষ্টি বৃহৎকালে বিস্তৃত, তার আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞাতকে জ্ঞানের ভিতর ডাকা,

অনাত্মীয়কে আত্মার বন্ধনে বাঁধা। যাঁরা রাজনীতিকে সংস্কৃতির মাপে কাটতে চান, ভয় হয় যে, তাঁরা সংস্কৃতিকেই অবশেষে কাটবেন রাজনীতির ছোট মাপে। দেশের মান এতে সংকীর্ণ হবে। সংস্কৃতিকে আমি যথাসম্ভব মুক্তি দেবারই পক্ষপাতী ; রাজনীতির সীমানা টেনে তাকে খণ্ডিত করা ভুল।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক সম্বন্ধেও আমার একই কথা। গায়ের জোরে রাষ্ট্রের সীমানা বাড়ানো যদি-বা সম্ভব, সংস্কৃতির সীমা তাতে বদলায় না ; জোরজবরদস্তিতে ওটা আরও সঙ্কুচিত হয়। ভারত এবং পাকিস্তানের ভিতর যদি হৃদয়ের যোগ ক্রমশ দৃঢ় হয়, নানা কাজে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা যদি আমরা ধীরে ধীরে বাড়াতে পারি, তারই শেষ পরিণতি হিসাবে কোনো এক দূর ভবিষ্যতে যদি এই উপমহাদেশের মানুষেরা রাজনীতিক সীমানা মুছে দিতে চায় তো সেটাই হবে রাজনীতির উপর সংস্কৃতির জয়। শুধু বাহুবলে আর যাই প্রমাণ করা যাক, সম্প্রীতিভ্রষ্ট দুই দলের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রমাণ করা যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বক্তৃতায় যতটা গ্রহণধর্মী দৈনন্দিন জীবনের আচারে বিচারে ততটা নই। এই জাতীয় দুর্বলতাটাই জনসঙ্ঘেরও দুর্বলতা। হিন্দুধর্মের জায়গায় ভারতীয় সংস্কৃতি শব্দটা বসালেই তাতে ধর্ম অথবা সংস্কৃতি কোনোটাই প্রশস্ত হয় না। দ্বন্দ্ব তো শব্দ নিয়ে নয় ; বিস্তৃত করতে হবে বুদ্ধি এবং হৃদয়। পাকিস্তান অথবা অন্য যে-কোনো দেশ যদি ভারত আক্রমণ করে তো সে আক্রমণ সর্বশক্তি দিয়ে ঠেকানোই আমাদের কর্তব্য ; কারণ দুর্বলতা দিয়ে প্রতিবেশীকে প্রলুব্ধ করাটা অপরাধ নিজের প্রতিও অপরের প্রতিও। কিন্তু অবিভাজ্য সংস্কৃতির অহমিকার পতাকা তুলে হিংসা এবং অসহিষ্ণুতার আঘাতে সংস্কৃতিকে খণ্ড খণ্ড করাটা শোচনীয় হঠকারিতা।

জনসঙ্ঘের রাজনীতি ছেড়ে এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। আমাদের আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন দেশে বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার। তথ্যকে তত্ত্ব দিয়ে বাঁধবার আর তত্ত্বকে তথ্য দিয়ে যাচাই করবার অভ্যাস আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে যে, তত্ত্ব শুধু শব্দসর্বস্ব মন্ত্রবিশেষ নয়, বরং ব্যবহারে তার পরীক্ষা। এই নতুন দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরনো চিন্তাকে বিচার করতে হবে—সেই চিন্তায় যেটুকু ভুল সেটুকু ছাড়তে হবে, যেটুকু সত্য তা নতুন করে ধরতে হবে।

চিন্তার এই দিকপরিবর্তনের যুগে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে অবহেলা করা প্রয়োজন একথা বলছি না। নতুনকে যদি আমরা গভীরভাবে পেতে চাই তো ঐতিহ্যের সূত্রে প্রাপ্ত পুরাতন চিন্তার প্রতি আমাদের নতুন করে মনোযোগী হতে হবে। প্রাচীনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নতুনকে তেমন গভীরভাবে পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় প্রাচীনের নিষ্ঠাপূর্ণ সমালোচনার ভিতর দিয়ে।

কোনো দেশই তার পুরনো ঐতিহ্যকে সহসা সামগ্রিকভাবে ত্যাগ করে না ; আমরাও করব না। ঐতিহ্যের বিচারে কতটুকু রাখা অথবা ছাড়া আবশ্যক, সে বিষয়েও আমাদের ভিতর ক্রমাগতই নানা মত দেখা দেবে। এটাই স্বাভাবিক ; এটাই সুস্থ মনের প্রমাণ। বহু মতের এই দ্বন্দ্বটাই প্রয়োজন। ভারতীয়ত্বের একটা মূল সংজ্ঞা ধরে নিয়ে দেশের উপর সেটা চাপাবার চেষ্টা করাটা শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, বিপজ্জনক। কোনো রাজনৈতিক দল অথবা সরকার যদি একাজ করতে উদ্যোগী হন, তাতে আমাদের গণতন্ত্র এবং প্রগতি দুই-ই বিপন্ন হবে। যে কোনো নতুন চিন্তা সাধারণ্যে গৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত সেটাকে বিজাতীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। অভারতীয় চিন্তা ও বাক্য দমন করবার তোড়জোড় শুরু হলে সেই উৎপীড়নে আমাদের চেতনা সংকুচিত হবে এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন নিয়ে আমরা

বিশ্ব-বিজ্ঞানের প্রসারিত ধারা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।

কথাটা আর এক দিক থেকে রাখি। আমাদের একটা অশিক্ষিত অভ্যাস—আমরা ব্যক্তিগত চরিত্রের মহত্ত্ব অথবা কলঙ্কের আলোচনায় অত্যধিক উৎসাহী। অভ্যাসটা জাতীয়, দলবিশেষের নয়। কিন্তু এটা দূর করা দরকার। মধ্যযুগের প্রধান চিন্তা ছিল ভগবচ্চিন্তা ; সেখানে ধ্যান-ধারণার মূল্য চরিত্রের মূল্যে নিরূপণ করাটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক আলোচনায় বিচারের একটা ভিন্ন মান প্রয়োজন। সেই মান এদেশে এখনও সৃষ্টি হয়নি। আমাদের চিন্তায় এই উপলব্ধিটা এখনও ভালভাবে প্রবেশ করেনি যে, কোনো মত ভ্রান্ত হলে ব্যক্তিগত চরিত্রপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু যুক্তির সাহায্যেই সে-মতের ভ্রান্তি প্রমাণ করা সম্ভব এবং সেটাই প্রয়োজন। আধুনিক চিন্তার প্রবক্তারা সবাই ব্যক্তিগত চরিত্রে মহৎ নন। ফ্রান্সিস বেকনের কাছে আধুনিক যুগ অশেষ ঋণী ; নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিশেষ চরিত্রটি তিনি সতের শতকের প্রারম্ভে স্মরণীয় ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে বেকন সম্ভবত পূজনীয় পুরুষ ছিলেন না। আবার নতুন চিন্তার প্রবক্তা যেখানে প্রকৃতপক্ষে মানুষ হিসাবে মন্দ নন, সেখানেও তাঁর মতকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করবার জন্য তাঁর চরিত্রে মিথ্যা কালিমা আরোপ করা প্রাচীন সমাজের নেতাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। শুদ্ধ হিন্দুয়ানীর প্রচারে এই প্রবৃত্তিটা প্রশ্রয় পায়।

আধুনিক বামপন্থীরাও অবশ্য এ বিদ্যায় আজ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। অপর মতের যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনার চেয়ে সেই মতাবলম্বীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে ইতর কুৎসা রটনায় এদের উৎসাহ বেশী। দক্ষিণপন্থী গোঁড়ামির সঙ্গে উগ্র বামপন্থীদের সাদৃশ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। এর একটা মৌলিক কারণ সহজেই অনুমেয়। সব রকম গোঁড়ামির চোখেই নিজ নিজ মতের সত্যতা প্রশ্নাতীত, কাজেই মতবিরোধ ঘটলেই সত্যের তন্নিষ্ঠ আলোচনা ছেড়ে বিপক্ষের অভিসন্ধির প্রতি ক্রুদ্ধ আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। আমাদের এই কলঙ্কপিপাসু দেশে খানিকটা কলঙ্ক-কাহিনীর অবতারণা করে বিচারকে যুক্তিভ্রষ্ট করা মারাত্মক রকম সহজ। এই গ্রাম্য কুৎসাপ্রিয়তা থেকে দেশের মনকে উদ্ধার করে বিচারনিষ্ঠায় তাকে প্রতিষ্ঠিত না-করা পর্যন্ত এদেশে স্বাধীন চিন্তার ভদ্র ঐতিহ্য সৃষ্টি করা যাবে না।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উদার যুক্তিবাদী, মানবপ্রেমিক একটি চিন্তার স্রোত দেশের উপর দিককার শিক্ষিত মানুষের মনে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়েছিল। দেশের তলের দিকে সাধারণ মানুষের মনকে এই নতুন ধারা বড় স্পর্শ করতে পারেনি ; শতাব্দীসঞ্চিত সংস্কার অক্ষুণ্ণ মহিমায় সেখানে বিরাজ করে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর গণতন্ত্রের বর্তমান যুগে যুক্তি ও মানবতাবাদী চিন্তা ধারাকে কী করে রক্ষা করা যায় ও প্রসারিত করা যায়, এটাই আজকের এক প্রধান সমস্যা। জনসাধারণের সংস্কারকে উপেক্ষা করে গণপ্রতিনিধিত্ব করা কঠিন। শুধু রাজনীতি দিয়ে দেশের মনকে মুক্ত করা যাবে না। নতুন চিন্তার ধারাকে প্রসারিত করা, তাকে গণমানসে প্রবাহিত করা রাজনীতিক চালাকি দ্বারা সম্ভব নয়। এদেশে গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে গণনির্বাচন ও দলীয় রাজনীতির পাশাপাশি চাই শিক্ষার প্রসার ও পুনর্গঠন, আর দেশব্যাপী নতুন চিন্তা ও বিচারের আলোড়ন। ভারতীয়ত্ব নিয়ে যাঁরা ভাবিত তাঁদের কাছে অতএব আমার আবেদন এই যে, ভারতীয়ত্বের সংজ্ঞাটা অন্তত এতটা প্রশস্ত রাখুন যাতে নতুন বিচারের ধারা স্বচ্ছন্দে বইবার পথ পায়।

সীমান্ত চিন্তা

(ক)

ভারতের পূর্বসীমান্তের কথা বলছি। বহু জাতি উপজাতি, নদনদী, পর্বত উপত্যকা নিয়ে গঠিত সেই ভূমি। বৈচিত্র্যের শেষ নেই সেখানে। যেন অন্য এক ভারত অল্প পরিসরের ভিতর। সৌন্দর্যে সমস্যায় ভরা। দ্রুত বদলে চলেছে দৃশ্যপট। তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমার অসাধ্য। সে চেষ্টাও করব না। যোগ্যতর কারও জন্য রইল সে কাজ। বিচিত্র দৃশ্যপটের দুয়েকটি অংশ বেছে নিয়ে আমি অল্প কিছু বলবার চেষ্টা করব। উদাহরণ হিসেবে শুধু মেঘালয় আর নাগাল্যাণ্ডের উল্লেখ থাকবে।

খাসি জয়ন্তিয়া গারো পাহাড় নিয়ে মেঘালয়। রাজধানী শিলঙের সঙ্গে বাঙালিরা পরিচিত। সেখানে প্রথম গিয়েছিলাম ১৯৩২ সালে, আমি তখন ছেলেমানুষ। তারপর সামান্য সময়ের জন্য দুয়েকবার গেছি। ওখানে কিছুদিন থাকবার সুযোগ হয়েছিল ১৯৮৫ সালের বসন্তে।

মেঘালয় নামটি নতুন। ঐ অঞ্চলের সঙ্গে বাইরের, বিশেষত আসাম ও শ্রীহট্টের, যোগাযোগ কিন্তু অনেকদিনের। সেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ব্যবসা চাকরি আর পর্যটনের ভিতর দিয়ে। এসব কিছু নতুন কথা নয়, সকলেরই জানা আছে। সমতল ভূমির বাঙালির সঙ্গে খাসি পাহাড়ের ভাবের আদানপ্রদানের কথা কিন্তু আমরা অনেকেই তেমন জানি না। অথচ জানবার যোগ্য বিষয় সেটা।

এবার শিলঙে দেখা হয়েছিল শ্রীহিপশন রায়ের সঙ্গে। তিনি 'সেঙ খাসি' আন্দোলনের এক নেতা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। এটি একটি ধর্মীয় আন্দোলন।

এর পটভূমি হিসেবে দুয়েকটি কথা বলে নেওয়া যাক। ১৮৪১ সালে টমাস জোন্স নামে একজন প্রেসবিটেরিয়ান মিশনারি চেরাপুঞ্জিতে আসেন। শুধু খৃস্টধর্মের প্রচারেই নয়, ঐ অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার গঠনেও তাঁর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। সেখানকার মানুষের জন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন খৃস্টধর্মকে অবলম্বন করে রোমান লিপিতে। এইভাবে সেখানে রোমানলিপির প্রতিষ্ঠা হ'ল। তার আগে বাংলা লিপির কিছু ব্যবহার লক্ষ করা গেছে কাগজপত্রে।

মিশনারিদের কাজকর্মের ফলে খাসি পাহাড়ের সবাই ইংরেজ আমলে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়। অনেকেই করেননি। প্রতিরোধী শক্তিও ছিল; বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেঙ খাসি আন্দোলন। এর উদ্ভব উনিশ শতকের শেষদিকে। ১৮৯৯ সালে সেঙ খাসির প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মসমাজের একটি গৃহে।

সে যুগে সেঙ খাসি আন্দোলনের উপর ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই আন্দোলনের প্রথম যুগে নেতাদের ভিতর ছিলেন জীবন রায়, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী। তাঁর ছেলে শিবচরণ রায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। ইনি সংস্কৃত ও বাংলা শেখেন, ভগবদ্গীতা খাসি ভাষায় অনুবাদ করেন। খাসির সঙ্গে হিন্দুধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এঁরা স্বীকার করতেন অনায়াসে।

আজ কিন্তু অবস্থার কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। খৃস্টধর্মের সঙ্গে সেঙ খাসির পার্থক্য তো জন্মসূত্রেই আছে। হিন্দুধর্মের সঙ্গেও খাসি ধর্ম অভিন্ন নয়, বরং তার স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার্য,

এ যুগের খাসি নেতাদের বক্তব্যে এই সুরটাই প্রাধান্য পেয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক। বুঝতে অসুবিধা হয় না, সামাজিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির সঙ্গে এর কোথাও মিল আছে। এ বিষয়ে আপত্তি করবার অধিকার অর্জন করেননি হিন্দুরা। খাসি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে কতটা যোগ তাঁরা রেখেছেন ?

খাসিদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় এবার নাগাদের কথায় আসা যাক। কোহিমায় যাবার সুযোগ হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথ্যে এক বক্তৃতা উপলক্ষে।

খাসি ও গারো পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বহুদিনের, কিন্তু নাগাদের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের দূরত্বটাই প্রধান। সভ্য লোকালয়ের অনেক দূরে এঁদের বাস, নরমুণ্ড শিকারে এঁরা পারদর্শী, অনেকেই আবার নগ্নতায় অভ্যস্ত, এইরকম কিছু অস্পষ্ট ধারণা নাগা নামটির সঙ্গে যুক্ত।

নাগাদের ভিতর আও, আঙ্গামি, সেমা ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতি আছে। এইসব উপজাতির মধ্যে ভাষাগত ও অন্যান্য পার্থক্য লক্ষণীয়। উনিশ শতকে বিদেশী মিশনারি এবং ইংরেজ সৈন্য ও প্রশাসকদের সঙ্গে নাগাদের যোগাযোগ ঘটে, সেই সূত্রে বিভিন্ন উপজাতি সম্বন্ধে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। তারপর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। নাগাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সেই পুরনো বিবরণ থেকে পাওয়া, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কল্পনা। ঐসব বিবরণ একেবারে মিথ্যা ছিল এমন নয়। তবে নাগাদের চরিত্র সম্বন্ধে তা থেকে কোনও অর্ন্তদৃষ্টি আমরা লাভ করিনি।

যেমন ধরা যাক, নগ্নতা। নাগাদের কোনও কোনও উপজাতি সম্বন্ধে বিবরণে এটা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের কল্পনায় দৃশ্যটাকে আমরা ক্লেদাক্ত করে দেখি। নাগাদের ভিতর নগ্নতা যদি বা ছিল, সৌন্দর্যবোধের অভাব কখনও ছিল না। সেটা আমরা খেয়াল করি না। তা ছাড়া তাঁদের চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সত্যভাষণ, কাপট্যের অভাব। সে যুগের পর্যবেক্ষকেরা আরও লক্ষ করেছিলেন, বহিরাগতদের অনুকরণে বস্ত্র পরিধানের ফলে নাগাদের মধ্যে ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। তার কারণও বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। এটা ভেবে দেখবার মতো বিষয়।

নরমুণ্ড শিকার সমর্থনযোগ্য নয়। নাগাদের ভিতর এককালে এটা প্রচলিত ছিল। তবে ইউরোপীয় সভ্য মানুষ যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে যত নরহত্যা করেছে, নাগাদের ভিতর অনুপাতে তার চেয়ে বেশি কিছু ঘটেনি। কথাটা বলেছেন পশ্চিমী এক সমাজতত্ত্ববিদ। নিরপেক্ষ বিচারে এটা একেবারে তুচ্ছ কথা নয়।

যাই হোক, পুরনো বিবরণ থাক, এসব আজ প্রধান প্রশ্ন নয়। নাগাভূমির সমাজে আমাদের চোখের সামনে যে পরিবর্তন ঘটছে, যে সব সমস্যা দেখা দিচ্ছে, সে দিকেই এখন বিশেষভাবে মন দেওয়া দরকার।

ছোট একটা ঘটনা দিয়ে কথা শুরু করি। কোহিমা যাবার পথে একজন অধ্যাপকের মুখে ঘটনাটি শোনা গেল। মনে রাখা দরকার যে, ওখানকার ছাত্রছাত্রীরা প্রধানত স্থানীয় নাগা, আর অধ্যাপকেরা অধিকাংশই বহিরাগত। ঘটনাটি এই রকম। একটি নাগা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের ভিতর ঢুকে দুয়েকটি ছাত্রকে মারধোর করে গেছে! আক্রমণকারী ছেলেটি নিজে ছাত্র নয়, তবে ছাত্রদের কাছে সে অপরিচিত নয়। এই ঘটনার পর স্বভাবতই উত্তেজনা দেখা দেয়। ছাত্র এবং অধ্যাপকদের এক মিলিত সভায় ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়। অধ্যাপকেরা বলেন, পুলিসকে ঘটনাটা জানানো দরকার।

এ পর্যন্ত কাহিনীতে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এই রকম আরও

ঘটতে দেখেছি, এমনকি শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনেও। সুরুলের ছেলে শ্রীনিকেতনের ছাত্রদের, কিংবা বোলপুরের ছেলে শান্তিনিকেতনে, মারপিট করে যায়। ছাত্ররা তখন দল বেঁধে এসে দাবি জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে পুলিসকে বলতে হবে বাইরের গুণ্ডা ছেলেকে যেন অবশ্য শায়েস্তা করা হয়। অধ্যাপকেরা কেউ কেউ হয়তো নিচু গলায় মত প্রকাশ করেন যে, ছেলেদের নিজেদের ভিতর একটা মিটমাট হওয়া দরকার, শুধু পুলিসী হস্তক্ষেপে কাজ হবে না। কিন্তু থানায় নালিশ জানাবার পক্ষেই অধিকাংশের দৃঢ় অভিমত মেনে নিতে হয়। কাগজে অনেক সময় তিক্ত অভিযোগ শোনা যায় যে, পুলিসকে জানাতে দেরি হয়েছিল বলেই ব্যাপারটা এতদূর গড়াল।

এইখানে এসেই কোহিমার ঘটনায় বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিসে খবর পাঠাতে রাজি। কিন্তু নাগা ছাত্রদের অভিমত অন্যরকম। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে হবে সমাজের ভিতরেই। পুলিস তো বাইরের প্রতিষ্ঠান। নাগা ছেলেদের ধারণায় ব্যক্তিমাত্রই কোনও গ্রাম ও উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, এমনকি অধীনে। গ্রামসমিতির সামনে আক্রমণকারী ছেলেটিও মিথ্যা বলবে না। বিচারের ব্যবস্থাও আছে সেখানেই। স্থির হ'ল, অভিযোগ জানানো হবে গ্রাম সমিতির কাছে।

নাগাভূমিতে গ্রামসমিতি এখনও মৃত নয়। সেখানে যৌথ জীবন, উপজাতীয় সংহতি ও সততা এখনও ভেঙে যায়নি। কিন্তু এসবই ভাঙবার মুখে। সেই ভাঙনের দৃশ্যটা নাগাল্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যায়, চোখের ওপর ঘটছে।

ওখানে গত কয়েক বছরে পাহাড়ের গা ধরে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে, মাইলের পর মাইল, সরকারি অর্থে। কোটি কোটি টাকা ঢালা হয়েছে নাগাভূমির উন্নয়নের নামে। এর ফলে বেড়ে উঠেছে নতুন ঠিকাদার গোষ্ঠী। নাগাল্যাণ্ডে এই রীতি, ঠিকা দিতে হবে স্থানীয় মানুষকে। অথচ নাগারা মজুর খাটাবার কাজে অভ্যস্ত নন। তাই ঠিকা নিয়েও তাঁরা কাজটা তুলে দেন অন্য কোনও ঠিকাদারকে যিনি সমতলবাসী। টাকা ভাগ হয়ে যায় এই দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে। এখন অবশ্য কিছু কিছু নাগা নিজেরাই ঠিকা ব্যবসায়ে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। নাগা সমাজের ভিতর প্রবল হয়ে উঠেছে এক নতুন বৈষম্য।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দলীয় রাজনীতি। পুরনো সমাজে এ ব্যাপারটা ছিল না। কিন্তু অনভ্যস্ত নির্বাচন ব্যবস্থায় নাগারাও আজ অভ্যস্ত। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজনীতির নেতাদের যোগ ঘটেছে। সমতলভূমিতে আমরা যে দুর্নীতি দেখি চারদিকে তার প্রবেশ ঘটেছে নাগাভূমিতেও। এই সবের চাপে ভেঙে পড়ছে পুরনো উপজাতীয় সমাজ। দিনে দিনে দুর্বল ও বিকৃত হচ্ছে গ্রাম সমিতি। আজকের নাগা যুবক একই সঙ্গে এই নতুন শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট এবং এর দৌরাত্ম্যে বিক্ষুব্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় একটি নাগা যুবক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, নাগাদের স্বাধীন রাষ্ট্রস্থাপনের অধিকারের সপক্ষে। শ্রোতাদের ভিতর ভিন্ন অঞ্চলের মানুষও অনেক ছিলেন। নানারকম প্রশ্ন হচ্ছিল। একজন বললেন, 'আপনারা তো ভারতীয় সংবিধান মেনে নিয়েই নির্বাচনে যোগ দিয়েছিলেন। সংবিধানে ভারত থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার নেই। সেই অধিকার এখন আপনি চাইছেন কী করে?' নাগা যুবকটি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা নির্বাচনে যোগ দিয়েছি বটে, তবে সেটা টাকার খেলার টানে।'

নাগারা অধিকাংশই খৃস্টান। সেঙ খাসি ধরনের আন্দোলন সেখানে চোখে পড়ে না। কিন্তু বৃটিশ শাসকদের প্রতি তাঁদের একটা খণ্ডিত মনোভাব ছিল। সমতলভূমির মানুষদের নাগারা অবিশ্বাসের চোখে দেখতেন। বিদেশী শাসনকে অনেকে মন্দের ভালো বলে মেনে

নিয়েছিলেন। তাতে আন্তরিক সমর্থন ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল ফিজোর সহানুভূতি ইংরেজের দিকে নয়, বরং নেতাজীর আই এন এ অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে। যুদ্ধের পর এই ফিজোই আবার ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে পা বাড়ালেন। এতেও খুব আশ্চর্য হবার কিছু কি আছে?

সম্প্রতি সেঙ খাসির প্রতিনিধি গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলনে। তাঁদেরও মনে আছে উপজাতীয় ধর্মকে উদার মানবিকতার সঙ্গে মেলাবার আকাঙ্ক্ষা। অথচ প্রতিবেশী সমতলবাসীর সঙ্গে পার্বত্য সমাজের সম্পর্ক বিরোধ-সহযোগের বৈপরীত্যে অশান্ত। এগিয়ে থাকা মধ্যবিত্তের সঙ্গে উঠতি মধ্যবিত্তের সংঘর্ষ আমরা আরও দেখেছি। কিন্তু সীমান্তে পরিস্থিতি আরও জটিল। উপজাতীয় যুবকেরা ক্রমে শিক্ষিত হয়ে উঠছেন। ভারতের বৃহত্তর জীবনে তাঁরা ধীরে ধীরে স্থান করে নেবেন। সেই সুযোগ তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় হবারই কথা। কিন্তু এই আকর্ষণের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন আছে একটা উদ্বেগ। নতুন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীন উপজাতীয় অস্তিত্বের বিপন্নতাবোধ।

সীমান্তের কঠিন সমস্যা। কোনও সহজ সমাধান নেই। ধৈর্য সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টি চাই। সীমান্ত আমাদের শিক্ষা দেয় সারা দেশের সমস্যাকেই নতুন চোখে দেখতে, নতুন সমন্বয়ের ভাবনা ভাবতে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের জাতীয় সংহতি এখনও অসম্পূর্ণ।

(খ)

এ প্রবন্ধের উপলক্ষ উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত। কিন্তু মূল প্রশ্ন সেখানে আবদ্ধ নয়।

আমাদের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য কয়েকটি মৌল অধিকারের কথা বলা আছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি জীবিকা সংক্রান্ত কিছু সমান অধিকারের কথাও সংবিধানে স্থান পেয়েছে। চাকরি, ব্যবসায়, সম্পত্তির লেনদেন—এই সবকিছুতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি আছে। অবশ্য পরমুহূর্তেই আবার এইসব ব্যাপারে, বিশেষ উদ্দেশ্যে, বাধা-নিষেধ আরোপ করবার অধিকারও রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে!

উপজাতি-অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমতলবাসীদের জমি কিনবার অধিকার এবং ব্যবসায়ের সুযোগ সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। চাকরির ব্যাপারে আঞ্চলিক উপজাতির বিশেষ অধিকার স্বীকৃত। অর্থাৎ ঐসব অঞ্চলে বাইরের ভারতীয়দের জীবিকা ও বসবাসের অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে আইনের দ্বারা। বাধা পাচ্ছে কেবল সমতলবাসীই নয়, নেপালিদের বিরুদ্ধেও কোনো কোনো অঞ্চলে বিরূপতা দেখা গেছে। বাধানিষেধের বেড়া উঠছে দিকে দিকে। প্রতিবন্ধ স্থাপিত হচ্ছে দেশময় অবাধ গতিবিধির পথে। মনে হতে পারে যে, সংবিধানের শব্দার্থের না হোক, ভাবার্থের সঙ্গে বিরোধ আছে এইসব প্রতিবন্ধের।

উপজাতিদের দৃষ্টিতে কিন্তু এইসব বাধানিষেধ আবশ্যক। নিজ-নিজ বাসভূমিতে উপজাতিরা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আশা করে। সমতলবাসী মানুষ দলে দলে পার্বত্যাঞ্চলে বসতিস্থাপন করলে তারাই সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। উপজাতিদের নিজস্ব অঞ্চল বলে তবে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। ভারতে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেদের বক্তব্যের সপক্ষে আমাদের উপজাতীয় বন্ধুরা ত্রিপুরার

উদাহরণ তুলে ধরেন। সমতলের মানুষ বড়ো সংখ্যায় ত্রিপুরায় প্রবেশ করার পর সেখানকার উপজাতি নানাভাবে বঞ্চিত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যত্র প্রধান উপজাতিরা এবার সতর্ক।

উপজাতীয় বন্ধুদের মনে যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেটা একেবারে অবাস্তব নয়। তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। তাঁরা কী চান ? তাঁরা কি তাঁদের ঐতিহ্য, তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে চান ? সমতলবাসীদের ঠেকাতে পারলেই কি সেই বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাবে ? অথবা শ্রদ্ধা দেখানো হবে সেই ঐতিহ্যকে ? এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' বইটির কথা মনে পড়ে। গান্ধী এইরকম একটা মৌল প্রশ্নই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমরা কি শুধু ইংরেজ তাড়াতে চাই ? ইংরেজকে তাড়িয়ে সরকারি ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে এল, আর ইংরেজের সমাজ ও সংস্কৃতির অনুকরণে আমরা গড়ে তুললাম আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি, সেটাই কি হবে স্বাধীনতা ?

গান্ধীজী যা-যা ভয় করেছিলেন, ভারত এগিয়ে গেছে সেই পথেই। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক এক মহাসমাজ যেখানে নগরেরও স্থান থাকবে, কিন্তু আধিপত্য থাকবে না। তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমন হয় নি। এ প্রজন্মেই গড়ে উঠেছে এমন এক ভারত, আমলাদের সঙ্গে যেখানে ব্যবসায়ীদের বৈধ ও অবৈধ বন্ধন, রাজনীতি যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত, সংস্কৃতি যেখানে পশ্চিমের এক প্রবল এবং অগভীর অনুকরণ। আমাদের গ্রামও আজ এই নগরকেন্দ্রিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত।

এদেশে গ্রামের অবক্ষয় আরম্ভ হয়েছে বহুদিন আগেই। এই অবক্ষয়ে উদ্বিগ্ন হয়েই গান্ধীজী লিখেছিলেন তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ'। উপজাতীয় অঞ্চলে কিন্তু গ্রামীণ অথবা আঞ্চলিক সমাজ এতটা ভেঙে পড়েনি বহুদিন পর্যন্ত। এটাকে স্বীকার করে নিয়েই ভারতীয় সংবিধানে যোগ করা হয়েছে কিছু সংশোধনী ধারা। উপজাতীয় প্রদেশে গ্রামসমিতি আর জিলাসমিতিকে দেওয়া হয়েছে এমন কিছু অধিকার, ভারতের অন্যত্র যেটা নেই। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম অথবা মেঘালয়ে গ্রাম ও জিলা সমিতিকে ভিত্তি করে বৃহত্তর সমাজ গড়ে তুলবার অন্তত একটা কল্পনা উঁকিঝুঁকি মারে সংবিধানের নতুন সংযোজনে।

অথচ অস্বীকার করা যায় না একথা, গ্রাম ও জিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে উপজাতীয় রাজ্যেও। মেঘালয় থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক।

শিলং-এ এক আলোচনাসভায় মিলিত হয়েছিলাম। সেখানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক। ইনি নিজে খাসি, রাজনীতি করেন, একসময় মন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হলাম। তিনি বললেন, জিলাসমিতি ক্ষমতা হারাচ্ছে, রাজ্যসরকারের ক্ষমতা বাড়ছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া আছে জিলাসমিতির হাতে। কিন্তু সে দায়িত্ব বহন করবার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই সমিতির। কাজেই রাজ্যসরকারের হাতে গিয়ে পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়মকানুন নির্ধারণ করবার ক্ষমতা সংবিধান অনুযায়ী দেওয়া আছে জিলার স্তরে। কিন্তু এরই মধ্যে একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। জটিলতাটা এইরকম। মেঘালয়ে উপজাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে ছেলে নয়, মেয়ে। বিয়ের পর মেয়ে যায় না মাকে ছেড়ে স্বামীর বাড়িতে সংসার করতে, ছেলে আসে মেয়ের বাড়িতে। উত্তরাধিকারসূত্রে যদিও সম্পত্তি লাভ করে না ছেলে, তবু একটা প্রশ্ন থাকে। ছেলে যদি নিজে চাকরি করে অথবা

ব্যবসায়ে টাকা জমায় তবে সেই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী কে হবে ? আর তার উত্তরাধিকারীই বা কে ? স্বোপার্জিত অর্থের অধিকারী হবেন যিনি উপার্জন করেছেন তিনি নিজে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছেলে। এটাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনকানুন তাহলে পুরনো উপজাতীয় ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হবে না। এক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করবে রাজ্যের বিধানসভা। এইরকম একটা চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। বাস্তব ঘটনার ঝোঁক এই দিকে, জিলাসমিতি ক্ষমতা হারাচ্ছে।

আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী পরস্পরকে আশ্রয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলেও। রাজ্যসরকারের ক্ষমতা বাড়ছে। রাজনীতিতে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে একই সঙ্গে। মেঘালয়ের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী নিজেই আমাকে সরলভাবে বললেন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি অর্থ এবং অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করেছেন, এ ছাড়া রাজনীতিতে টিকে থাকা যায় না। সমতলভূমির সঙ্গে উপজাতীয় সমাজের মৌল পার্থক্য কমে আসছে ক্রমে-ক্রমে।

নাগাল্যাণ্ড দাবি জানাচ্ছে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় চাই। দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে খাসি, মিজো অথবা নাগা শিক্ষিত যুবকের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিশেষ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। সর্বত্রই ডিগ্রীধারী যুবক চাইছেন একটি সরকারি চাকরি অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অফিসারের কাজ। অনুমান করা যায়, উপজাতীয় ছেলেরাও আমলাতন্ত্রের সেবায় নিযুক্ত হবেন—ক্রমবর্ধমান সংখ্যায়। সমতলবাসীকে হয়তো ঠেকানো কঠিন হবে না, কিন্তু উপজাতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাবে না তাতে। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি ও ব্যবসায়—এই সবই এগিয়ে আসছে ভারতের সীমান্ত সমাজেও।

একথা কেউ হয়তো বলবেন, এটাই এযুগের ধারা, এর বিরুদ্ধে কাজ করা এক অবাস্তব চিন্তা। যেটা অনিবার্য তাকে মেনে নেওয়াই ভালো। বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়েই আজকের উপজাতীয় যুবক বৃহত্তর সমাজে এবং ইতিহাসে তাঁর স্থান করে নেবেন।

বাস্তবের দাবি মান্য। কিন্তু কাকে বলব বাস্তব ? কী সম্ভব আর কী নয়, সেটা নির্ভর করে আমাদের দৃষ্টির প্রসারের ওপর। কালের অতিনিকট সীমানার ভিতর যেটা সম্ভব নয়, দূরতর সময়ের সীমার মধ্যে সেটাও সম্ভব। দুর্ভিক্ষ যখন দেখা দেয়, তখন লঙ্গরখানা খোলাই হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তের কাজ ; কিন্তু খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াবার দিকে মনোযোগ দেওয়াটাই ভবিষ্যতের কর্তব্য। উপস্থিত মুহূর্তকে উপেক্ষা করলে তাকে বলি কল্পনাবিলাস। কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকেও যদি সমান সত্য বলে না জানি তবে উপস্থিতটাই বড়ো হয়ে উঠে আমাদের একেবারে গ্রাস করে। কাজেই উপস্থিত বাস্তবকে অবহেলা না করেও মানুষের চিন্তার সীমান্তকে বিস্তৃত করতে হয় দূর থেকে দূরতর ভবিষ্যতের দিকে। আমাদের পরিকল্পনার পরিধির ভিতর সাজিয়ে নিতে হয় সময়ের একাধিক বৃত্ত। বাস্তববোধের সঙ্গে আদর্শের বিরোধচিন্তায় আছে শুধু চিন্তার দারিদ্র।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা বলে গেছেন, সুস্থ সমাজের ভিত্তিতে থাকা চাই সৎ প্রতিবেশী ভাবনা। এখানে পাই পল্লীর আদর্শ রূপ। প্রতিবেশীকে নিয়ে পল্লী। এই অর্থেই পল্লীসংগঠন দিয়ে শুরু করতে হয় সুস্থ সমাজগঠন। এই চিন্তা নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতন। এরই সঙ্গে এসে যায় আরেকটি কথা। গান্ধী ঠিকই বুঝেছিলেন, পল্লীর এই আদর্শ রূপ রক্ষা করা যাবে না আর্থিক পুনর্গঠন ছাড়া, আর সেই পুনর্গঠনের একটা মূল কথা বিকেন্দ্রীকরণ।

প্রত্যক্ষ বাস্তবের ঝোঁক বিপরীত দিকে। তাই আমাদের কাছে এসব মনে হয় অবাস্তব কথা। অথচ আমাদের চোখের সামনেই ভেঙে পড়ছে সমাজ— শুধু পুরনো সমাজ নয়, বর্তমান সমাজও—এই প্রত্যক্ষ বাস্তবের আঘাতে। এটাকেই যদি একমাত্র বাস্তব বলে জানি তবে মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনকে বেশিদিন রক্ষা করবার আশাটাই অবাস্তব।

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, এই শতাব্দীতে বড়ো করে এটাই চোখে পড়ে। কিন্তু এরই পাশে ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করছে এক নতুন প্রযুক্তি। তাতে নিহিত আছে অন্য এক সম্ভাবনা, বিকেন্দ্রিত সমাজের সম্ভাবনা। সেই দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চাইছেন কিছু দূরদ্রষ্টা সমাজবিজ্ঞানী। কে জানে, তাঁরাই হয়তো হবেন ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। সেই দূরের ভবিষ্যতে আমরা হঠাৎ গিয়ে পৌঁছোতে পারব না। তবু তাকেও আমদের চিন্তার পরিধির ভিতর রাখতে হবে।

দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি আজকের রূঢ় বাস্তব। তাই বলে কি আমরা তাকেই স্থায়ী সত্য বলে মেনে নেব ? বরং এই বিশ্বাসই রাখতে হবে যে, রাজনীতিরও পুনর্গঠন সম্ভব। দ্বিদলীয় অথবা বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা ত্যাগ করে একদলীয়তার আশ্রয় নিলেই দুর্নীতি দূর হয় না। এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক তথা রাষ্ট্রতান্ত্রিক দেশগুলিতে। একদলীয় শাসনব্যবস্থায় পাই কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার এক চরম প্রকাশ। গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ সহ কিছু প্রকৃষ্ট চিন্তানায়ক বলেছেন নির্দলীয় গণতন্ত্রের কথা। সেটা এই মুহূর্তে অবাস্তব চিন্তা বলে অনেকের কাছে গণ্য। অথচ এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সমাজের ভিত্তিতে যে আদর্শ পল্লীর কথা চিন্তা করা হয়েছে, তার সঙ্গে দলীয়তার কোনো রকমেই শেষ অবধি সামঞ্জস্য হয় না। বন্ধু সমাজেও মতের পার্থক্যের স্থান থাকবে, কিন্তু দলীয়তা হতে পারে না কোনো আদর্শপল্লী অথবা প্রতিবেশীগোষ্ঠীর ভিত্তি। শেষ অবধি শ্রেয় সমাজসংগঠনের ভিত্তিতে থাকবে নির্দলীয় গণতন্ত্র।

এই সব কথাই বোঝা সম্ভব অনুত্তেজিত যুক্তির আলোতে। আমাদের সীমান্তবাসী বন্ধুরা জানেন, উপজাতীয় অতীতে প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়। তবুও সেই অতীত থেকেও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। সীমান্তের বন্ধুদের কাছে সেই অতীত কিছু দূরস্মৃতি নয়। তারই সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের নতুন চিত্র। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন, আঞ্চলিক স্বয়ম্ভরতার প্রতি মনোযোগ, পল্লীসংগঠন—এই সবই অপেক্ষাকৃত সহজে হতে পারে সীমান্ত অঞ্চলে। এই মুহূর্তের বাস্তবকে মেনে নিয়েই উপজাতীয় যুবকেরা অবশ্য স্থান করে নেবেন ভারতের বৃহত্তর সমাজে। কিন্তু তাঁদের ঐতিহ্যই তাঁদের প্রস্তুত করেছে আরো সার্থক এক ভূমিকার জন্য। সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন হলেই সকলের পক্ষে মঙ্গল।

সীমান্তচিন্তাই হয়ে উঠতে পারে আমাদের সমাজচিন্তার নবসীমান্ত।

বাংলাদেশ দেখে এলাম

২৫শে বৈশাখ, ৯ই মে তারিখে, বাংলাদেশে পৌঁছই। রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সেদিন বিকেলে বাংলা একাডেমীর প্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেই সভায় বক্তা ছিলেন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত। আমিও বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হই। বিশাল জনসমাবেশ ; অতি সুশৃঙ্খল সভা। পরে একাডেমীর মহাপরিচালক আবু হেনা মোস্তাফা কামাল সাহেবের আমন্ত্রণে আরো একদিন বক্তৃতা দিই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ বিষয়ে। মহাপরিচালক মহাশয়কে এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি সভার আয়োজন হয়, একটি ডঃ আনিসুজ্জামানের উদ্যোগে, অন্যটির উদ্যোক্তা বন্ধুবর মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ। চট্টগ্রামে সভার ব্যবস্থা করে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমিতি।

বাংলাদেশে এর আগেও একাধিকবার গিয়েছি। কিন্তু এবার শহরে ও গ্রামে ঘুরে দেখবার যতটা সময় ও সুযোগ ছিল অন্যবার ততটা ছিল না। ঢাকা শহরে অনেকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন কাজী নূর-উজ্জামান এবং তাঁর বিদূষী স্ত্রী সুলতানা জামান। এঁদের বাড়ীতেই উঠেছিলাম। চট্টগ্রামে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের গৃহে স্থান পেয়েছিলাম, ইনি গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সুদূর পটুয়াখালীর দশমিনা গ্রামে আতিথ্যদান করেছিলেন কৃষকনেতা আবদুস সাত্তার খান। কুমিল্লার পথে ও অন্যত্র অযাচিতভাবে অজস্র রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছেন বিশ্বভারতীর ছাত্রী জাহানারা নিশি। আরো বহু বন্ধু, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ, সেবাব্রতী, ব্যবসায়ী, জাহাজের সারেঙ, মাঠের চাষী, গ্রামের স্কুলের শিক্ষক, পরিচিত ও অপরিচিত কতো মানুষ, সকলের কাছ থেকে যে সহায়তা ও হৃদয়ের উষ্ণতা লাভ করেছি তা ভুলবার নয়।

নতুন ঢাকা জাকজমকে কলকাতা নয় বরং দিল্লীর সঙ্গে অনেকটা তুলনীয়। এমন প্রশস্ত রাস্তা, এত রকমারি বিদেশী গাড়ী, সুদৃশ্য পার্ক ও স্মৃতিস্তম্ভ, কলকাতায় চোখে পড়ে না। নতুন ও পুরনো ঢাকার ভিতরে প্রচণ্ড পার্থক্য, নতুন ও পুরনো দিল্লীর মতোই। নাগরিক উন্নয়নের দুটি মডেল ভারতে চোখে পড়ে ; পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে কলকাতা মহানগরীর একাধিপত্য, আর পাঞ্জাব অথবা হরিয়ানা, যেখানে একাধিক মাঝারি ধরনের পৌরকেন্দ্র পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেড়ে উঠেছে। কলকাতার বিষম কর্তৃত্ব ওপার বাংলায় যখন শিথিল হল তখন সেখানে নাগরিক উন্নয়নের দুটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেখানেও এককেন্দ্রিকতাই বিজয়ী হয়েছে।

কলকাতা মহানগরী পশ্চিমবঙ্গকে শুষে নিচ্ছে এই রকম আমাদের অভিযোগ। আরো প্রকটভাবেই বাংলাদেশকে শুষে নিচ্ছে নতুন ঢাকা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা শুনছিলাম ; ভালো অধ্যাপকদের সেখানে ধরে রাখা যায় না, তাঁরা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন ঢাকার দিকে। কিন্তু এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েরই সমস্যা নয়। সমগ্র বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের ভারসাম্য খণ্ডন করে দাঁড়িয়ে আছে রাজধানী ঢাকা।

সেখানকার নতুন উচ্চমধ্যবিত্তের বিলাসী নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গ্রামের চাষীর দারিদ্র্যের ব্যবধান বেদনাদায়ক। এই অসামঞ্জস্য বর্তমান দুই বাংলাতেই। বাংলাদেশে সেটা যেন আরো বেশি করে চোখে পড়ে। ভারত স্বয়ম্ভরতার দিকে যতটা এগিয়েছে বাংলাদেশ এখনো তা পারে নি। ওদেশের অর্থনীতি প্রচণ্ড নির্ভরশীল মার্কিনী সাহায্যের

ওপর। এদেশের সমাজে যেসব দোষ দুর্বলতা উপস্থিত ওদেশে পাই তারই পুনরাবৃত্তি। ভালো ভালো ছাত্রছাত্রীরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দুর্নীতিতে ছেয়ে যাচ্ছে প্রশাসন রাজনীতি ও ব্যবসায়।

আমরা যখন ঢাকায় পৌঁছাই তখন নির্বাচন প্রায় শেষ, ভোট গণনা চলছে, ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। কাজেই আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় তখন নির্বাচন। কদিনের ভিতরই জানা গেল, এরশাদের জাতীয় পার্টি পেয়েছে তিনশর ভিতর দেড়শর কিছু বেশি আসন, আওয়ামি লীগ পঁচাত্তর। ধর্মীয় দল জাময়েত-এ-ইসলামী পেয়েছে দশটি আসন। কম্যুনিস্ট দল পাঁচটি। নির্দল প্রার্থীদের জুটেছে বেশ কিছু আসন। তাঁদের ভিতর কজন মনে মনে কোনদিকে, অন্তত আমার কাছে সেটা অজ্ঞাত ; সুযোগ বুঝে অনেকেই এদিকে ওদিকে যাবেন এইরকম শোনা যাচ্ছিল। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন নি বেগম জিয়ার দল। হাসিনা নিজেই জিতেছেন একাধিক কেন্দ্র থেকে। বামপন্থী প্রগতিশীল অনেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণেরই বিরোধী। আগে সামরিক শাসন তুলে নিতে হবে তারপর নির্বাচন, এই দাবি থেকে এঁরা নড়তে রাজী নন।

নির্বাচন সঠিকভাবে হয়নি, ভোটগ্রহণে বহু অন্যায় কারচুপি ও বলপ্রয়োগের ঘটনা ছিল, সকলের মুখেই একথা শুনেছি। এ অবস্থায় এরশাদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এটা কিছু আশ্চর্য নয়, আওয়ামি লীগ তবু পঁচাত্তরটি আসন পেল কী করে সেটাই প্রশ্ন। কেউ কেউ বলছেন যে, এরশাদের দল যেমন বহু ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে জয়ী হয়েছে, আওয়ামি লীগও তেমনি কোথাও কোথাও একই পদ্ধতিতে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। আবার অনেকে বলছেন, আওয়ামি লীগের প্রতি সারাদেশে জনসমর্থনের ঢেউ এত জোরালো ছিল যে নানা রকমের অন্যায় বাধা সত্ত্বেও কিছু আসন এই দল অনিবার্যভাবে পেয়েছে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের একটা ঠাট বজায় রাখবার জন্য এরশাদ নিজেই হাসিনার দলকে কিছু পাইয়ে দিয়েছেন, এই রকম মন্তব্যও শোনা যাচ্ছে। যাই হোক, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ভালোভাবে নির্বাচন হলে ফলাফল অন্যরকম দাঁড়াতো। আওয়ামি লীগই সম্ভবত একমাত্র দল সারা বাংলাদেশে যার সংগঠন আছে, ব্যাপক জনসমর্থন আছে। বামপন্থী শক্তি আজ বহু ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত ও দুর্বল। দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় দল সুসংবদ্ধ, কিন্তু তাদের প্রতি জনসমর্থন সীমাবদ্ধ।

ঢাকায় মধ্যবিত্তের ভিতর বামপন্থী মার্কসবাদী কিংবা আধা-মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী সংখ্যায় কম নন। এঁদের অনেকেই বলছেন, এই নির্বাচন থেকে জনগণ একটা শিক্ষাই পেতে পারে, সে হল নির্বাচনের ব্যর্থতা! নির্বাচনের পথে আজ দেশের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এটাই নির্বাচনের শিক্ষা। এর পর স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তবে পথ কোনটা? বামপন্থীদের কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই। একটা উত্তেজক কল্পনা তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সেটাই পরিচ্ছন্ন চিন্তার পথে বাধা। মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। তারপর দেশে শৃঙ্খলাস্থাপন সহজ কাজ ছিল না। বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে সামরিকশাসনের দুষ্টচক্র দেশের উপর চেপে বসেছে। বিপ্লববাদীরা অপেক্ষা করছেন জনগণের আরেক মুক্তিযুদ্ধের জন্য। তারই ভিতর দিয়ে ঘটবে সামরিক শাসনের অবসান, প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের প্রকৃত মুক্তি। এই দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধ কোন পথে আসবে, তার নেতৃত্ব ও সংগঠন কেমন হবে, ঢাকার বুদ্ধিজীবীরা তা জানেন না। তবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নসন্তান এই দ্বিতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কল্পনা বাংলাদেশের বামপন্থী চেতনাকে যেন একটা মুগ্ধতায় গ্রাস করে আছে।

আর্থিক ও সামাজিক সংকট আরো তীব্র হয়ে উঠলে বাংলাদেশে জনগণের একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটা সম্ভব। এজন্য যে অস্ত্রশস্ত্র দরকার সেটা হয়তো এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে অথবা কোনো কোনো ভাবে এসে যাবে। এই সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ পথে বাংলাদেশে মুক্তসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা এবিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ আছে। বিপ্লবের প্রত্যুত্তরে দেখা দেয় প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা। একটা কথা পরিষ্কারভাবে মনে রাখা দরকার। বাংলাদেশে এমন কোনো দেশব্যাপী সংগঠিত বামপন্থী দল নেই যেদল ক্ষমতা হাতে নিয়ে বিপ্লবের অরাজকতা অতিক্রম করে দেশে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিশ্রুতি বহন করতে পারে। তুলনায় বেশি সংগঠিত দক্ষিণপন্থী শক্তি। কিন্তু তাদের দ্বারাও দেশের সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। বিপ্লব হয়তো সাময়িকভাবে ডেকে আনবে প্রতিবিপ্লবের বিভীষিকা। তাতে দেশের দুর্দশা দূর হবে না।

সামরিক শাসন থেকে দেশকে কীভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতির সেটাই প্রধান প্রশ্ন। এমন কি সামরিক শাসনকর্তাদের পক্ষেও আজকের অবস্থা সন্তোষজনক নয়, বরং ভয়াবহ অনিশ্চয়তায় কণ্টকিত পরিস্থিতি। আজ যিনি দেশের মাথায় বসে আছেন কাল তাঁরই মুণ্ডপাত হতে পারে। দেশকে একটা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দিকে নিয়ে যেতে পারলে সকলের পক্ষেই সেটা মঙ্গল। দেশের বুকের উপর যে ভয়ের শাসন চেপে বসে আছে সেটাকে কিছুতেই চিরকালের মতো মেনে নেওয়া যায় না। তাকে সরাবার পথ তৈরি করতে হবে। হয়তো পরিবর্তন ঘটবে বিভিন্ন পর্যায়ে। কামাল হোসেন প্রমুখ আওয়ামি লীগের চিন্তাবিদেরা এই পরিস্থিতিটা মনে রেখে পথ খুঁজছেন। সামরিক শাসকেরা পরিবর্তন চাইলেও তাঁরা সতর্ক, এমন কি মনে মনে ভীত। মুখে তাঁরা যাই বলুন না কেন, এ চিন্তা তাঁদের মনে নিশ্চয়ই ঢুকেছে যে জনসমর্থন আসলে জাতীয় পার্টির পক্ষে নেই। সতর্কভাবে গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়াটা জরুরী, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য সামরিক শাসন বজায় রাখা যায় না এটাই দেয়ালের লিখন। এ কথাটা এরশাদ সম্ভবত বোঝেন না। সামনের পথটা দুর্গম সন্দেহ নেই। তবু আশা রক্ষা করে ধীর স্থির ভাবে এগোতে হবে। এই রকম একটা চিন্তা থেকেই আওয়ামি লীগ নির্বাচনে যোগ দিয়েছিল।

পরিষদীয় গণতন্ত্র অবশ্য যথেষ্ট নয়। ওপরের দিকে কাজ করলেই চলবে না। তলার দিকে গঠনমূলক কাজও প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় গান্ধী দেশব্যাপী অসহযোগের সঙ্গে যোগ করেছিলেন গঠনমূলক কাজ, বিশেষত গ্রামে গ্রামে। অনুকরণে কাজ হবে না, পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন গঠনমূলক কাজ। এ পথে কি নেতৃত্ব দিতে পারবে আওয়ামি লীগ? না কি রাজধানীই শুষে নেবে দলীয় রাজনীতির সমস্ত শক্তি?

এরশাদের আমলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রতিশ্রুতিতে গঠিত হয়েছে উপজিলা পরিষদ। উপজিলা পরিষদের জন্য আছে নির্বাচিত সভাপতি। কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে এক একটি উপজিলা। ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতিরাও সদস্য হিসেবে থাকবেন উপজিলা পরিষদে। এই সব নির্বাচনে আওয়ামি লীগ অংশ নেয়নি। ফলে বর্তমান উপজিলা পরিষদগুলি জনপ্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারে না। সামরিক শাসকদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের একটা বাহ্যিক ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। একে কাজে লাগানো দরকার। দশমিনায় দেখে এলাম উপজিলা পরিষদের ভিতর দিয়ে কিছু কাজ

শুরু হয়েছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে টাকার অপব্যয়ও চলছে। এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় মানুষদের কর্তৃত্ব। গ্রামের মানুষদের সংগঠিত করা প্রয়োজন। কঠিন সে কাজ তবু বাংলাদেশে সেটা সম্ভব নয় এমন নৈরাশ্যবাদের কারণ দেখি না।

বাংলাদেশ স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়েই সে এগিয়ে চলেছে। বেগম সুফিয়া কামালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, চারদিকে নৈরাশ্যজনক কত কিছু ঘটছে, কিন্তু এর ভিতরও আশার আলো চোখে পড়ে নারীজাগরণে। কথাটা সত্যি। বাংলাদেশের মুসলমান নারী জেগে উঠছে।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় একবার গিয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে। উঠেছিলাম আমারই এক পুরনো বন্ধুর বাড়ীতে, প্রেসিডেন্সি কলেজে এককালে তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। কয়েকদিন তাঁর বাড়ীতে উদার আতিথ্য লাভ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর দর্শনলাভ করিনি, যদিও তিনি বাড়ীতেই ছিলেন। বন্ধুবর বললেন যে, মুসলমান সমাজের এটাই রীতি।

সত্তরের দশকে সেই বন্ধুর বাড়ীতেই যখন আবার যাই তখন তাঁর স্ত্রী দর্শন দেন, ততদিনে তিনি অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সেবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে বুঝতে পারি যে, অনেক কিছুই বদলে গেছে, অন্তত নাগরিক সমাজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর সঙ্গে ঢাকার পার্থক্য চোখে পড়ে না।

এবার নারীজাগরণ গ্রামেও প্রত্যক্ষ করা গেল। পান্নালাল বাবু আর আমি দশমিনা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হই। শহর থেকে বহু দূরে দশমিনা। গ্রামের স্কুল তবু ছাত্রীরা সভায় উপস্থিত ছিল ভালো সংখ্যায়। তাদের ভঙ্গিতে আড়ষ্টতা ছিল না, মাথায় ছিল না অবগুণ্ঠন। আমাদের কথা তারা মন দিয়ে শুনেছে। গরীব চাষীর ঘরে যখন গেছি মহিলারা অনায়াসে বেরিয়ে এসেছেন, নিজেদের কথা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। এই এক নতুন শক্তি দেখে এলাম বাংলাদেশে। নারীর অধিকার ক্রমে স্বীকৃতি লাভ করছে, আইনকানুনেও তার প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী আইনত দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন না। ইসলামী ঐতিহ্যের পরিবর্তন ঘটছে। বাংলাদেশের সমাজে সাম্য ও সামঞ্জস্য বিধানের কাজে নারীশক্তির ভূমিকা হবে অগ্রণী, বেগম সুফিয়া কামালের এই আশা। শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবার যোগ্য কথা এটা।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রাদুর্ভাব আমি দেখিনি। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে মুক্ত সাধারণ মানুষের মন। হিন্দুদের ভিতর ভয়সংশয় যথেষ্টই আছে। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সেজন্য দায়ী এমন আমার মনে হয়নি। অপরিচিতা এক হিন্দু মহিলা আমাকে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি বললেন, কিছুদিন আগে তাঁর বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে, তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করবার কথা ভাবছেন। পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু ডাকাতি হয়, আমরা সেজন্য দেশত্যাগ করবার কথা ভাবি না। বাংলাদেশের অস্থির অবস্থায় এসব ঘটনা বিরল নয়, হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলেই তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেয় দুর্বৃত্তেরা। এটা দুঃখজনক, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানকে বিচার করা যাবে না অল্প কিছু অপরাধীর আচরণ দিয়ে।

সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার অভাব স্বাভাবিকভাবেই আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে একটা বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার্য। বাংলাদেশের একটি অপরিচিত মুসলমান ছেলে আমাকে অভিমানের সুরে বলল, আপনারা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কেন? তার

কথায় কোনো কপটতা আমি লক্ষ করিনি। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম কি পথ দেখাতে পারবে? সংখ্যালঘুদেরও কিছু কর্তব্য আছে। 'বাংলাদেশে হিন্দুরা যে যে-বৃত্তিতে আছে তাকে সেই বৃত্তিতে যথার্থ যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যাতে প্রতিবেশীর চোখে তার কাজ মূল্যবান হয়ে ওঠে', দশমিনায় একথা বললেন সমাদ্দার। আত্মরক্ষার এটাই শ্রেষ্ঠ উপায়; এটাই সেবা ও সমন্বয়ের পথ।

সাম্প্রদায়িকতা নয়, তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রতি বাংলাদেশে একটা সন্দেহের মনোভাব আছে। নেপালেও সম্ভবত ভারতের প্রতি ঐ ধরনের মনোভাব অনুপস্থিত নয়। ফরাক্কার জল আর ভারতের বস্ত্রব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য বাংলাদেশে হামেশাই শোনা যায়। এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জল নিয়ে কোন্দল আছে পাঞ্জাব আর হরিয়ানার ভিতরও। বিদেশী বস্ত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করছে প্রচুর পরিমাণে। ভারতকে আলাদাভাবে দোষ দিয়ে আজ লাভ নেই। একটা সুখবর, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পোশাক রপ্তানি বাড়ছে। বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখতে হবে নিজের চেষ্টায়। তবে সেই সঙ্গে ভারতেরও একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে কারণ সে অপেক্ষাকৃত শক্তিমান প্রতিবেশী। দুই দেশের ভিতর সহযোগিতার অনেক সুযোগ আছে। সন্দেহের আতিশয্যে সহযোগিতার এই সুযোগগুলি দৃষ্টির বাইরে চলে না গেলেই ভালো। সতর্কভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

বৈদেশিক অর্থের প্রশ্নটা সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। দুবাই থেকে অনেক টাকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছচ্ছে। চট্টগ্রামের কাছাকাছি অঞ্চলে তার প্রভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ল। ছাত্রদের একাংশের উপর ধর্মীয় গোঁড়ামিতে আশ্রিত রাজনীতির প্রভাব লক্ষণীয়। এরা বেশ সংগঠিত। আমার বাংলাদেশের বন্ধুদের কেউ কেউ বলেন, এসব হচ্ছে বিদেশী টাকার প্রভাবে। বিদেশী টাকা আছে ঠিকই, কিন্তু তাই দিয়ে সবটা ব্যাখ্যা করা ঠিক হবে না। ধর্মীয় গোঁড়ামির কবলে যে ছেলেরা পড়েছে তাদের অনেকেই অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। উচ্চবিত্তদের ভিতর যে বিলাসব্যসন বাড়ছে তারই প্রতিক্রিয়ায় কিছু স্বল্পবিত্ত পরিবারের ছেলে ইসলামী গোঁড়ামির দিকে ঝুঁকছে। এটাও একটা কারণ। তাছাড়া শাসক দল ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে অল্পবেশি প্রশ্রয় দিতে অভ্যস্ত। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এই কৌশল লাভজনক মনে করা হয়। দেশের পক্ষে এটা ক্ষতিকর বিপজ্জনক চিন্তা। হিন্দু মুসলমানের ভিতর সদ্ভাব দুই বাংলাতেই হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দীর্ঘকালীন স্বার্থেই প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িকতায় গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজের ভিতর শুভবুদ্ধির অভাব নেই। এ আশা হয় তো দুরাশা নয় যে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁদের সাহসী সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন থাকে বারুদের গন্ধ বাংলাদেশে রাজনীতিতে তেমনি আছে সর্বব্যাপী সন্দেহের ধোঁয়া আর চক্রান্তের গন্ধ। কেউ কোনো ভাল কাজ করলে লোকে সন্দেহ করে, এর পিছনে কুমতলব আছে। এই পরিবেশে ভালো কাজ করা সহজ নয়। তবু কিন্তু কাজ হচ্ছে। গত কয়েক বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে। নতুন শিল্প দেখা যাচ্ছে যদিও সীমাবদ্ধ আকারে। জাতীয় সঞ্চয়ের হার বড়ই নিম্নস্তরে। ভূমিসংস্কার আটকে আছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পরিচালনায় দক্ষতার অভাব। তবু বাংলাদেশ ঝিমিয়ে পড়েনি ওপার বাংলার মানুষের সর্বোপরি আছে একটা উচ্ছ্বাসময় প্রাণশক্তি। ধারাবাহিকতার বাইরে নতুন চিন্তার স্পন্দনও শুনেছি কিছু মানুষের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে ঐ প্রাণশক্তিকেই বিশেষভাবে স্বাগত জানাতে ইচ্ছা যায়। রবীন্দ্রনাথ তো সমানভাবে দুই বাংলারই। তাঁকে প্রয়োজন দুই বাংলাতেই। যেমন সঙ্গীতে সাহিত্যে তেমনি শিক্ষায়, পল্লীসংগঠনে আর সর্বোপরি সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও খর্বতাকে অতিক্রম করবার ব্রতে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ দেখাতে পারেন সেই ভাষায় যে ভাষা আমরা ভালোবাসি।

ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলবে। তারই পাশাপাশি চাই গঠনমূলক কাজ আর কিছু মুক্তবুদ্ধি মানুষ। আশা করা যায় গঠনমূলক কাজে বাংলাদেশের নবজাগ্রত নারীশক্তি সামিল হবে বর্ধিত সংখ্যায় শহরে ও গ্রামে, সমাজের সর্বস্তরে। আর বুদ্ধিমুক্তির যে আন্দোলন পূর্ববঙ্গে বিশের দশকে জন্মলাভ করেও বারবার পথভ্রষ্ট হয়েছে, আজ রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিন্তার প্রেরণা সঙ্গে নিয়ে সেই আন্দোলন যদি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তবেই মঙ্গল।

গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের সংকট

কম্যুনিস্ট দুনিয়া আজ একটা বড় রকমের ওলটপালটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। বিপর্যয়ের চেহারা একেক দেশে একেক রকম। ১৯৮৯ সালের মে-জুন মাসের চিত্রটা মনে করা যাক। পোল্যান্ডের নির্বাচনের ফলাফলে কম্যুনিস্ট দলের শঙ্কিত বোধ করবার যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ওদেশের পার্লামেন্টে এখনও অধিকাংশ আসন কম্যুনিস্ট দলের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু যে ক'টি আসনে কম্যুনিস্ট প্রার্থীর সঙ্গে বিরোধী 'সলিডারিটি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ ছিল তার ভিতর শতকরা নব্বুইভাগেরও বেশি আসনে 'সলিডারিটি' জয়ী হয়েছে। চীনের ছাত্রআন্দোলন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও জনতার ভিতর অভূতপূর্ব সমর্থন লাভ করেছে। অন্যকোনোভাবে আন্দোলনকে দমাতে না পেরে চীন সরকার সৈন্য ডেকে রক্তাক্ত ছাত্রনিধনযজ্ঞ সম্পন্ন করেছে। সোভিয়েত দেশে গর্বাচভের নেতৃত্বের গুণে ঐরকম কোনো অমানুষিক কাণ্ড এখনও ঘটেনি। ওখানে বাক্‌স্বাধীনতা প্রসারিত হয়েছে। বহুবছর পর এই প্রথম ওদেশের পার্লামেন্টে বেসরকারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মাঝামাঝি পথে গর্বাচভকে সাবধানে চলতে হচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

ঘটনার এই বৈচিত্র্যের ভিতরও একটা জায়গায় মিল চোখে পড়ে। সবদেশেই গণতন্ত্রের সপক্ষে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ঐ একটি দাবি কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় রক্ষণশীল নেতা ও শাসকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। গণতন্ত্রের দাবির ভিতর রক্ষণশীল শাসকদল পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রভাব দেখতে পাচ্ছেন। বিষয়টি আরো একটু গভীরভাবে ভেবে দেখবার নিশ্চয়ই সময় এসেছে।

পশ্চিমী প্রভাব কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে ক্রমেই বেশি করে এসে পৌঁচচ্ছে, এ কথাটা অস্বীকার করা যাবে না। তৃতীয় বিশ্বেও একই ব্যাপার ঘটছে। তবে আপাতত আমাদের আলোচনার বিষয় কম্যুনিস্ট দুনিয়া। পশ্চিমের সঙ্গে কম্যুনিস্ট দেশের যোগাযোগ বেড়ে চলেছে। ব্যাপারটা অনিচ্ছায় ঘটছে এমনও নয়। কম্যুনিস্ট দেশগুলি স্বেচ্ছায় যোগাযোগ

বাড়িয়েছে। পশ্চিমী প্রযুক্তি তারা আগ্রহ করে চাইছে। মানুষ ও মালপত্রের যাতায়াত বাড়ছে। কয়েক বছরের ভিতর সংবাদবহনের আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে। টেলিভিশনের গুণে একদেশের ঘটনা ও জীবনযাত্রা অবিলম্বে ছবি হয়ে অন্যদেশের দর্শকদের সামনে পৌঁছে যাচ্ছে। এ-সব আজ ঠেকানো মুশকিল।

চীনের সাম্প্রতিক ছাত্রআন্দোলন নিয়ে যাঁরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা এর পিছনে পশ্চিমী প্রভাব দেখছেন। এখন প্রশ্নটা এই। তবে কি এইরকমের "অশান্তি" ঠেকাবার জন্য পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে? সেটা কি আজ সম্ভব? প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এমন একটা অবস্থায় কি আমরা পৌঁছে যাইনি যে নতুন করে দেয়াল তুলে পৃথিবীটাকে আর স্থায়ীভাবে খণ্ড খণ্ড করা যাবে না? আরো একটা প্রশ্ন আছে। চীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চল্লিশ বছর আগে। সোভিয়েত দেশে তো সত্তর বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে। এই সময়ে সমগ্র জনতাকে ও বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে মার্ক্সবাদে, সরকারী মতবাদে, দীক্ষিত করবার চেষ্টা চলেছে অবিরত, সর্বউপায়ে। তবু কেন ছাত্রছাত্রীদের ভিতর "পশ্চিমী" প্রভাব এত দ্রুত, এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে? কম্যুনিস্ট মতবাদে দীক্ষাদানের প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়? পশ্চিমী প্রভাবের দোষত্রুটি অস্বীকার না করেও প্রশ্ন থেকে যায়, আন্দোলন বন্দুক দিয়ে দমন করেই কি শেষ পর্যন্ত ঐ প্রভাব আটকানো যাবে? এতে কি অনিবার্য পরিবর্তনকে অযথা আরো হিংসাত্মক করে তোলা হবে না?

প্রতিটি দেশের সমস্যা ও ঘটনাবলির পিছনে থাকে কিছুটা সেই দেশের বিশেষ পরিস্থিতির ঘাতপ্রতিঘাত আর কিছু যুগের সামান্য ধর্ম বা সাধারণ গতির প্রভাব। যেমন ধরা যাক চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাচক্র। এর পিছনে উঁকিঝুঁকি মারে একটা ক্ষমতার লড়াই, যার একদিকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লি পেং আর অন্যদিকে দলের সাধারণ সম্পাদক চাও জিয়াং। চাও ভরসা রেখেছিলেন ছাত্রআন্দোলনের ওপর; লি পেং নির্ভর করলেন সেনাবাহিনীর ওপর। প্রবীণ নেতা তেং শিয়াওপিং এবং রাষ্ট্রপতি ইয়াং শাংকুন ছাত্রআন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে চাও জিয়াং পরাজিত হলেন। সেনাবাহিনীর ভিতর বিভেদ ছিল। তবে তেং শিয়াওপিং কেন্দ্রীয় মিলিটারি কমিশনের চেয়ারম্যান, তাঁর কর্তৃত্ব কার্যকর হল। এইসব চীনের বিশেষ পরিস্থিতির কথা, চীনবিশেষজ্ঞদের কাছে এইরকম নানা তথ্য পাওয়া যাবে।

এইসব অনুপুঙ্খ যত আকর্ষক হোক না কেন, যুগের বৃহত্তর পটভূমিকার সঙ্গে যুক্ত না করে তাদের তাৎপর্য সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। সেই পটভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবার বলা যাক। সাময়িক ঘটনার গতি মাঝেমাঝেই চমকপ্রদ মোড় নেয়, কিন্তু মানুষের ইতিহাসের প্রশস্ত ধারায় দিক পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে।

(২)

এ যুগের আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিকার একটা প্রধান অঙ্গ হল শিল্পায়ন, অর্থাৎ বৃহৎ শিল্প ও তৎসংক্রান্ত প্রযুক্তির অভ্যুত্থান ও প্রসার। কৃষিতেও এসে পড়ে শিল্পবাণিজ্যের প্রভাব গ্রামপ্রধান সমাজ ক্রমে হয়ে ওঠে শিল্পপ্রধান।

শিল্পায়নের ধারার সঙ্গে সঙ্গে চেতনারও পরিবর্তন ঘটে। এটা কোনো সরল প্রক্রিয়ায় হয়ে ওঠে না, পদে পদে দেখা দেয় বিরোধ ও আত্মখণ্ডন। তবু পিছন ফিরে তাকিয়ে

প্রক্রিয়াটা মোটামুটি বুঝে নেওয়া আজ আর তেমন কঠিন নয়। একদিকে চেতনার ভিতর বিভিন্ন উপাদানের সংঘাত দেখা যায়, অন্যদিকে মানুষের এই নতুন মনের সঙ্গে বিরোধ ঘটে প্রতিষ্ঠিত সমাজসংগঠনের। এই থেকে উদ্ভব হয় সংকটের।

শিল্পায়নের যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি। এ দুয়ের ভিতর যোগাযোগ আছে।

সেই যোগাযোগটা নানা দিক থেকে বোঝা যায়। শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিচ্ছিন্ন বাজারকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠল দেশব্যাপী পরস্পর সংযুক্ত বৃহৎ বাজার। আর বিভিন্ন দেশের ভিতর বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা জোরালো হতে লাগল। আধুনিক জাতীয়তাবাদের আর্থিক বনিয়াদ এইভাবে তৈরি হল।

এরপর আসে সাংস্কৃতিক বনিয়াদের কথা। এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব শুধু একটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রতি। শিল্পের প্রসার ও নাগরিক সংস্কৃতির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন দেখা দিল। পল্লীসমাজে গোড়ার কথা পরিবার, নগরে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সৃজনশীল সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। আবার এর অন্যতম ফল বিচ্ছিন্নতাবোধ। অনেকের কাছে এটা ক্লান্তিকর, রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবাদের সংহতি ও উত্তেজনা আকর্ষণীয়। সেই সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি মানুষকে দেয় অন্য এক ক্ষমতার স্বাদ। সার্বিক রাষ্ট্রের ভিত্তি ক্রমে প্রস্তুত হয়। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্ত্রশক্তি লাভ করে প্রচণ্ড রাজনীতিক গুরুত্ব। আধুনিক জাতীয়তাবাদে এইসব মিলেমিশে যায়, সামূহিক ঐক্যবোধ আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

আধুনিক শিল্পের অভ্যুত্থানের সঙ্গে যোগ আছে শুধু জাতীয়তাবাদের নয়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বও এইখান থেকেই পুষ্ট হয়েছে। একদিকে ধনিকশ্রেণী প্রবল হয়ে উঠেছে মূলধনের শক্তিতে। অন্যদিকে বৃহৎ শিল্পের আশ্রয়েই শ্রমিকশ্রেণী এমন একটা সংহতি ও সাংগঠনিক শক্তি লাভ করেছে যার সঙ্গে অতীতের কোনো তুলনা হয় না। এইখানেই পাওয়া যাচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি।

কোনো একসময় মার্ক্সবাদের সঙ্গে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বিবাদ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয়তাবাদের প্রভাবমুক্ত করতে চেয়েছিলেন বিখ্যাত মার্ক্সবাদী নেতারা। তারপর অবস্থা দ্রুত পালটে গেছে। মার্ক্সবাদ যেসব দেশে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেসব দেশে জাতীয়তাবাদ উল্লেখযোগ্য ভাবেই উপস্থিত। উদাহরণত বলা যায় যে, কম্যুনিস্ট চীন জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রভাবমুক্ত নয়। আবার চীন সরকার সোভিয়েত দেশকে একদিন সোশ্যাল ইম্পিরিয়ালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী বলে গাল দিয়েছে। অর্থাৎ, চীনের দৃষ্টিতে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিকে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের দোষে পুষ্ট বলে মনে হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের মতোই শ্রমিকশ্রেণীর তত্ত্বেও ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টি বড় হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বটা জাতির নামেই হোক আর শ্রেণীর নামেই হোক, ব্যাপারটা এই রকমই ঘটে। দুই বিরোধী শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীর ভিতর যুদ্ধং দেহি ভাব জেগে উঠলে সমষ্টিগত সংহতিটাই মহত্ত্ব পায়। ধনতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সম্পর্কটা এতকাল অনিবার্য দ্বন্দ্বের সম্পর্ক বলেই ধরা হয়েছে। সেই দ্বন্দ্ব শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, বরং যে-কোনো সময়ে সেটা সশস্ত্র যুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে এইরকমই মনে করা হয়েছে। এই রণচণ্ডী অবস্থায় জঙ্গীজাতীয়তাবাদের মতোই মার্ক্সীয় শ্রেণীতত্ত্বও অসহিষ্ণুতাকে স্বধর্ম করে তুলেছে। গণতন্ত্রের পক্ষে এটা কোনোমতেই সহায়ক অবস্থা নয়।

অর্থাৎ, আধুনিক জাতীয়তাবাদ ও মার্ক্সবাদী শ্রেণীতত্ত্ব উভয়েই শিল্পবিপ্লবের সন্তান। আর দুয়েতেই পাওয়া যাবে একদিকে 'প্রগতি'র সহায়ক শক্তি, অন্যদিকে সামূহিক উত্তেজনার উপাদান। শিল্পায়নের মধ্যেই আবার এমন কিছু প্রবণতা আছে যাতে যূথবদ্ধ অসহিষ্ণুতা দুর্বল হয়ে আসে এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি মজবুত হয়। এইসব প্রবণতাও দোষমুক্ত নয়। বরং ভালোমন্দ মেশানো। সংক্ষেপে এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

শিল্পায়নের আগের যুগে একটা অনড় কর্মবিভাগ বৃহত্তর সমাজে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় সমাজে বর্ণভেদরূপে যেটা অত্যন্ত প্রকট, অন্যান্য দেশেও সেটা নিতান্ত অনুপস্থিত নয়। স্মরণ করা যেতে পারে, প্রাচীন সমাজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও শিক্ষাদানের কাজটা ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিতবর্গের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন বর্গের ভিতর উচ্চনীচবিভেদ স্পষ্ট ছিল। পশ্চিমী সমাজেও একদিন এই বর্গভেদ প্রচলিত ছিল। দীর্ঘ ঐতিহ্যের প্রভাবে সমাজ মেনে নিয়েছিল যে, মানুষের ভিতর অধিকার ও যোগ্যতার একটা স্বাভাবিক ভেদ ও অসাম্য আছে।

শিল্পায়নের ফলে এই স্বাভাবিক অসাম্যের তত্ত্ব একটা বড় রকমের নাড়া খেল। ধনীদরিদ্রের প্রভেদ দূর হল না, তবু একটা বড় পরিবর্তন এসে গেল। শাস্ত্রের গুহ্যজ্ঞান নয়, যন্ত্রবিদ্যা ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের মর্যাদার বৃদ্ধি হল। এর পরিণাম সুদূরপ্রসারী। বর্গভেদের দেয়ালগুলি সুরক্ষিত রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠল। যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চার অধিকার কোনো বর্গবিশেষে আবদ্ধ রইল না। এমন উদাহরণ ক্রমেই বাড়তে লাগল যেখানে সাধারণ মানুষ সমাজের একস্তর থেকে যাত্রা শুরু করে ধাপে ধাপে উচ্চতর স্তরে এসে পৌঁচেছে। এইভাবে মানুষের অনির্দিষ্ট সম্ভাবনার স্বীকৃতি এবং ঐহিক জীবনে সব মানুষের সমান অধিকারের তত্ত্ব যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল।

একই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে শিল্পায়ত সমাজের অন্য এক বৈশিষ্ট্য। কোনো এককালে সমাজে প্রাধান্য ছিল আচারের। নতুন সমাজে জোর পড়ল পরীক্ষানিরীক্ষা আর প্রয়োগের ওপর, প্রয়োজনীয় বিদ্যা ও কৌশলের ওপর। বৈজ্ঞানিক জানেন যে, বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটে সবই পরস্পর সম্পৃক্ত। বৈজ্ঞানিকের চরম অভীপ্সা বিশ্বব্যাপী সমস্ত ঘটনাকেই সামান্য সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা। এইরকম কোনো পরম তত্ত্ব শেষ অবধি লভ্য কি না সে-বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। প্রয়োগ জিনিসটার ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে মানসিকতা প্রবল ও প্রধান হয়ে ওঠে তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে কার্যসিদ্ধিবাদ বা উপযোগবাদ। বিশ্বদৃষ্টির জন্য তৃষ্ণা সেটা নয়। অপরিপক্ক অথবা কল্পিত বিশ্বদৃষ্টি মানুষকে একরকম ধর্মোন্মাদ করে তুলতে পারে। আধুনিক মন এ বিষয়ে সতর্ক। যাতে বাস্তব প্রয়োজন মেটে সেটাই জরুরী।

শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আরো যেটা বৃদ্ধি পায় সেটা হল ভোগবাদ। ধর্ম ও মতাদর্শ নিয়ে উন্মাদনা যখন কমে তখন ভোগবাদের দিকে ঝোঁক বাড়া তেমন আশ্চর্য নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে তুলেছে। প্রযুক্তিরই গুণে আবার একদেশের ভোগের আয়োজন অন্যদেশের দৃষ্টির সামনে সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। এইসবের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। যুদ্ধের সময় দেশের স্বার্থে ভোগ্যবস্তুর ওপর নানারকম নিয়ন্ত্রণ সবাই মেনে নেয় সহজে। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর সেইসব নিয়ন্ত্রণ বেশিদিন লোকে মানতে চায় না। প্রশাসনেও যখন দুর্নীতি বড় আকারে চোখে পড়ে তখন বিশেষ কোনো মতাদর্শের নামে সংযমের বিধানকে অনেকের কাছেই আর গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। মোট কথা, আধুনিক প্রযুক্তি ভোগের উপকরণকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কার্যসিদ্ধিবাদের

প্রভাবে সেই আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। আধুনিক শিল্পপ্রধান সমাজের এই অভিজ্ঞতা।

এই যে সংস্কৃতি, যাতে মানুষের সমান অধিকারের দাবি, প্রয়োগবাদী দৃষ্টি আর ভোগবাদের প্রবণতা মিলেমিশে আছে, আর আধুনিক শিল্পায়নের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এ থেকে মানুষ শেষ অবধি শান্তি পাবে এমন নয়। এ পথে সমস্যার অন্ত নেই। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তবেই একে অতিক্রম করা যাবে। অতিক্রমণের চিহ্ন ধীরে ধীরে এরই ভিতর দেখা যাচ্ছে। সেই বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া চাই। সাবধানতা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে এ পথে হিংসা নয়, নবরচনার কাজটাই প্রধান। শিল্পাশ্রিত সমাজের "পশ্চিমী" সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাকে অতিক্রম করতে গেলে পূর্ববর্তী যুগের অসহিষ্ণুতা ও তামসিকতায় প্রত্যাবর্তনের বিপদ আছে। দিকে দিকে বীভৎস "মৌলবাদ" সেই বিপদের বিষয়ে আমাদের সতর্ক করছে।

(৩)

সাম্যবাদী দেশগুলির সংকটজনক পরিস্থিতির দিকে এইবার দৃষ্টিপাত করা যাক।

সোভিয়েত দেশে কম্যুনিস্ট দল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর নামে ক্ষমতা দখল করেছিল। উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজের কর্তৃত্ব, এইরকম ছিল লক্ষ্য। সাম্যবাদের এই আদর্শ বহু মানুষকে সেদিন অনুপ্রাণিত করেছিল।

অচিরেই সেদেশে প্রতিষ্ঠিত হল রাষ্ট্রের মালিকানা, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর সুরক্ষিত কম্যুনিস্ট দলের কর্তৃত্ব। দ্রুত গড়ে উঠল এক অতিকেন্দ্রিক অর্থনীতি। মূলত সেটা এক জঙ্গী অর্থনীতি, যার প্রধান লক্ষ্য দেশকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা। স্তালিনের নেতৃত্বের প্রধান কৃতিত্ব এই ; ইউরোপ এশিয়া জুড়ে বিশাল পশ্চাৎপদ দেশে সাম্যবাদী এক সামরিক অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়াল। তাঁর অন্যান্য সুকৃতি ও অপকীর্তি নিয়ে বিতর্ক চলবে, কিন্তু স্তালিনের মহামান্যতার প্রধান স্তম্ভ ঐ জঙ্গী অর্থনীতি।

স্তালিনভক্তরা বিশ্বাস করেন যে, স্তালিনের নেতৃত্ব ও নীতির গুণেই রুশদেশকে হিটলারী সেনাবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করা গেছে। এই যুক্তি দাঁড়ায় না। যেমন পরাক্রান্ত মার্কিন সেনাবাহিনী ভিয়েতনাম জয় করে নিতে পারেনি, যেমন সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিপুল রণসম্ভার সত্ত্বেও আফগানিস্তান থেকে হটে আসতে বাধ্য হয়েছে, তেমনি জার্মান সেনাবাহিনীর পক্ষেও কোনোক্রমেই রুশদেশ অধিকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সোভিয়েত দেশের বিশাল আয়তন আর সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেমিক প্রতিরোধের জন্যই সেটা অসম্ভব ছিল। এজন্য স্তালিনমহত্ত্বের দ্বারস্থ হওয়া ভুল। এরকম ব্যক্তিপুজোর সঙ্গে মার্ক্সবাদের সামঞ্জস্য নেই।

এইসব বিতর্কের বাইরে থেকে স্তালিনী জঙ্গী অর্থনীতির কিছু পরিণাম স্পষ্টভাবে লক্ষ করা সম্ভব। এ যাবৎ পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কেন্দ্রের প্রাধান্য দেখা গেছে। সামরিক পরিবেশে যখন পরিকল্পনা রূপলাভ করে তখন এই অতিকেন্দ্রীয় ঝোঁক আরো প্রবল হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে চললে আমলাতন্ত্রের শক্তি অত্যধিক বেড়ে যায়। সোভিয়েত ব্যবস্থায় তাই ঘটেছে। উৎপাদনের যন্ত্রের ওপর সামাজিক কর্তৃত্বের নামে আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একদলীয় শাসকগোষ্ঠীর ও আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা। জঙ্গী

অর্থনীতির অন্য এক পরিণাম এই যে, ভারিশিল্প ক্রমাগত অগ্রাধিকার পেয়ে গেছে, ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন অবহেলিত থেকেছে। গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রেও যুদ্ধের প্রয়োজন বিপুলভাবে সমর্থন পেয়েছে। যুদ্ধের অস্ত্রে তাই সোভিয়েত দেশ পশ্চিমী অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে নেই। কিন্তু ভোগ্যবস্তুর মান অনুন্নত থেকে গেছে।

একদলীয় অতিকেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিক এই সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে মার্ক্সীয় মতাদর্শ। মার্ক্স কখনো বলেছিলেন, সবকিছুকে সংশয়ের চোখে দেখা চাই। কিন্তু রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট মার্ক্সবাদ ভিন্ন জিনিস। ইসলামি রাষ্ট্রে যেমন ইসলামের সমালোচনা অবৈধ, সাম্যবাদী দেশগুলিতে তেমনি মার্ক্সবাদ সমালোচনার উর্ধ্বে। শুধু তাই নয়, শাসকদল ও দলের নেতাও এতকাল ঐরকমই একটা স্থান অধিকার করেছিলেন। স্তালিনের যুগে তাঁকে সমালোচনা করাটা ছিল মহা অপরাধ। এখনও লেনিনের স্থান সমালোচনার উর্ধ্বে। "দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি। সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?" এ এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা যেখানে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয়ের উচ্চারণই কার্যত নিষিদ্ধ।

অল্পস্বল্প অদলবদলসহ অন্যান্য সাম্যবাদী দেশগুলিতেও একই অবস্থা। শিল্পায়নের পথে সোভিয়েত দেশের তুলনায় চীন পিছিয়ে আছে। তেং শিয়াও পিং চান আধুনিকীকরণ, শিল্প ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং সেই উদ্দেশ্যে পশ্চিমী জগতের সঙ্গে সহযোগিতা। কিন্তু দলীয় একাধিপত্যের প্রশ্নে তিনি কঠোরভাবে রক্ষণশীল। দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছাত্রআন্দোলন তাঁর কাছে অসহ্য। তাঁর বিচারে পেরেস্ত্রইকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু গ্লাসনস্ত সম্বন্ধে তিনি সাবধান। আসলে গর্বাচভ এ দুয়ের সম্পর্ক যেভাবে বুঝেছেন চীনের বৃদ্ধ নেতার কাছে সেটা অগ্রাহ্য। মার্ক্সবাদকে তেং ব্যবহার করছেন পশ্চিমী প্রযুক্তির সপক্ষে, পশ্চিমী সংস্কৃতির বিপক্ষে। ইতিমধ্যে চীনদেশে বেকারি, মূল্যস্ফীতি আর প্রশাসনে দুর্নীতি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্যবাদী দুনিয়ায় এই অবস্থার ভিতর থেকেই উঠে আসছে আজকের প্রতিবাদী আন্দোলন ও পরিবর্তনের জন্য ক্রমবর্ধমান দাবি। এইসব দাবি অনেকটাই সরল ও সহজবোধ্য। মানুষ আর চাইছে না যুদ্ধের পরিমণ্ডল ও বাধ্যতার ভিতর বাস করতে, চাইছে শান্তির পরিবেশ। চাইছে আরো স্বচ্ছন্দ জীবন, পরিমাণে বেশি ও গুণগত মানে আরো উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু। চাইছে বাক্‌স্বাধীনতা, নির্ভয়ে সমালোচনা করবার অধিকার। চাইছে না আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব, দলের কর্তাদের স্বজনপোষণ। এইসবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এদের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন।

মার্ক্সবাদীর প্রশ্ন, এরা কারা? অর্থাৎ, কোন শ্রেণীভুক্ত? মার্ক্সবাদীর প্রত্যয়, সব ঐতিহাসিক দাবি ও আন্দোলনের পিছনেই থাকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব; অতএব প্রশ্ন, সাম্যবাদী সমাজে আজ নতুন দাবি নিয়ে এগিয়ে আসছে কারা? উত্তরে এইটুকুই বলা যায়, এইসব দাবির সঙ্গে বাস্তব অবস্থার যোগ আছে, সাধারণ মানুষেরই দাবি এইসব। আন্দোলনের চেহারা বিভিন্ন সাম্যবাদী দেশে বিভিন্ন, আন্দোলনের পুরোভাগে বিভিন্ন স্থানে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন রকমের মানুষ। পোল্যান্ডে বিরোধী শ্রমিকসংগঠন, 'সলিডারিটি', প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকায়; চীনে ছাত্রসংগঠন। 'সলিডারিটি' সাধারণ মানুষের দাবিকেই ভাষা দিয়েছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে তাদের বিপুল জয়লাভের ভিতর দিয়ে এটাই প্রমাণিত হয়েছে। চীনে ছাত্রআন্দোলনের প্রতি শহরে শহরে অগণিত মানুষের সমর্থন ছিল উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েতদেশে পরিবর্তনের দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন স্বয়ং

গর্বাচভ, তাঁর জনপ্রিয়তা প্রমাণ করছে যে এইসব দাবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের যোগ আছে। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক সংগ্রামকেই সুনির্দিষ্ট শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নিতে হবে এই প্রত্যাশা মান্য নয়। এরপরও অনিবার্যভাবে প্রশ্ন ওঠে, দাবি যদি সাধারণ মানুষেরই তবে বাধা দিচ্ছে কারা ? এর একটা সহজ উত্তর আছে। বাধা দিচ্ছে তারাই যারা পুরনো ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী। একদলীয় ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসকদলের, আমলাতন্ত্রের ও সেনাবাহিনীর অনেকেই সুবিধাভোগী। তাছাড়া যারা একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থা ও মতবাদে বহুকাল অবধি অভ্যস্ত তাদের পক্ষে অন্য কোনো ব্যবস্থাকে মনের ভিতর গ্রহণ করা কঠিন হয়। যেমন স্বার্থের বশে তেমনি মনের গঠনেও কিছু লোক রক্ষণশীল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার নিশ্চয়তাকে ত্যাগ করে অনিশ্চিত অবস্থার দিকে পা বাড়াতে সবাই চায় না। পরিবর্তন প্রয়োজন হলেও সেটা প্রায়ই কষ্টসাধ্য হয়।

সাম্যবাদী ব্যবস্থার ভিতর সংকট জমে উঠছে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই পরিবর্তন শেষ পর্যন্ত একদলীয় শাসনের কাঠামোর ভিতর আবদ্ধ থাকবে এমন বলা যায় না। সেই পরিবর্তন কোনো বিশেষ মতাদর্শের সীমারেখাকে মান্য করে চলবে এমনও মনে হয় না। কেউ হয়তো বলবেন, মার্ক্সবাদ তো যুক্তি ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, তবে তাকে অতিক্রম করবার কথা ওঠে কেন ? প্রশ্নটা ঐভাবে তোলা ঠিক নয়। মানুষের ধ্যানধারণার সীমা যে-কোনো বিশেষ মতবাদের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই অধিক প্রশস্ত। যেমন ধরা যাক আবারও পোল্যান্ডের কথা। সেখানে কিছু লোক মার্ক্সীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী, নিরীশ্বরবাদী। আবার অনেক মানুষ খ্রীষ্টান, অর্থাৎ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী। একই সমাজে এই দু'রকমের বিশ্বাসীরই স্থান হওয়া প্রয়োজন, যদিও একটি মতাদর্শের পরিধির ভিতর ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের একই সঙ্গে স্থান হওয়া কঠিন। কার্যত সাম্যবাদী সমাজ এই অবস্থাটাকে মেনে নিচ্ছে। তবে মার্ক্সবাদই সেখানে রাষ্ট্রের নিজস্ব মতাদর্শ বলে স্বীকৃত। নতুন প্রজন্ম কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষপাতপুষ্ট ঐ মতাদর্শে ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারাচ্ছে। পুরনো মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিতে এটা এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি, যেমন পুরনো ধর্মবিশ্বাসীদের চোখে নতুন প্রজন্মের সংশয়বাদী মনোভাব বিপজ্জনক। জুনের ছাত্রহত্যার পর চীনের নেতারা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মার্ক্সবাদী শিক্ষাকে আরো জোরালো করা দরকার। এর ফলে কিন্তু ছাত্রদের মনে মার্ক্সবাদী প্রচার সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা বেড়ে যাবার আশংকা আছে। ছাত্রদের আন্দোলন ছিল মূলত অহিংস। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রনিযুক্ত হিংসার এই প্রয়োগ কি মার্ক্সবাদের নামেই সমর্থনযোগ্য ?

আজ থেকে বছর ষাটেক আগে যখন ধনতন্ত্রের ভিতর আর্থিক সংকট ভয়ংকর হয়ে দেখা দেয় তখন প্রশ্ন উঠেছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজ কি শান্তিপূর্ণ পথে আবশ্যক পরিবর্তন ঘটতে দেবে ? না কি আত্মরক্ষার জন্য সে সামরিক নিপীড়নের বর্বর ফাশিস্ত উপায় বেছে নেবে ? চীনের সাম্প্রতিক ছাত্রনিধনপর্বের পর একই প্রশ্ন ফিরে আসছে নতুন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। সাম্যবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন কি সংঘটিত হবে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে ? চীনের ছাত্রেরা সেনাবাহিনীর আক্রমণে সাম্যবাদের ফাশিস্ত চেহারাই দেখেছে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই মর্মে ধিক্কার উচ্চারণ করেছে।

মার্ক্স বলেছিলেন, উৎপাদনের জন্য বিশেষ যুগের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত যেসব সম্পর্ক স্থাপিত হয়, প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তার সঙ্গে নতুন উৎপাদিকা শক্তির যখন বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে তখনই বুঝতে হবে যে, সংকট সমাগত আর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত। এইরকমই একটা বিরোধ সাম্যবাদী সমাজের ভিতর আজ আকার গ্রহণ করেছে।

পুরনো আর্থিক কাঠামোর ভিতর বিবর্তিত হয়ে উঠেছে নতুন বাস্তব পরিস্থিতি এবং নতুন চেতনা। শুধু উচ্চতর প্রযুক্তি নয়, চেতনার গতিকেও নতুন উৎপাদিকা শক্তি বলে চিনে নিতে হবে। এর সঙ্গে পুরনো রাষ্ট্রতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য আজ ভেঙে পড়েছে। বন্দুকের নল দিয়ে এই ভাঙ্গন আর জোড়া দেওয়া যাবে না।

অতএব বাকি পৃথিবীর মতোই সাম্যবাদী দুনিয়াও এসে দাঁড়িয়েছে এক যুগান্তকারী সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের মুখে। মনে হয় তার গতি হবে কেন্দ্রীয়তা থেকে বিকেন্দ্রীকরণের অভিমুখে, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ও দলীয় শাসন থেকে ছোটো ছোটো মানবগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের দিকে, সমাজসংগঠনে একান্ত মতাদর্শের প্রচণ্ডতা থেকে অনেকান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর মান্যতায়, হিংসা থেকে অহিংসায়। এইসব পরিবর্তনের সঠিক রূপরেখা আমরা জানি না। কিন্তু মানুষের প্রতি যাঁদের সদিচ্ছা অটুট তাঁরা চাইবেন যে, পরিবর্তনের পথ নির্ধারিত হোক গণতান্ত্রিক উপায়ে, সভ্যতার কিছু মৌল মূল্যবোধের প্রতি আস্থা রক্ষা করে। অনেকে বলছেন, সমাজতান্ত্রিক জগৎ আজ ফিরে যাচ্ছে ধনতন্ত্রের পথে। এভাবে বললে পুরনো বিবাদটাকেই দীর্ঘায়ু করা হয়। আসলে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বলতে আমরা এতদিন যা বুঝেছি বা দেখে অভ্যস্ত হয়েছি, মানুষের সভ্যতা আজ সেই দুই ব্যবস্থাকেই অতিক্রম করে যেতে চলেছে।

চীনের ছাত্র আন্দোলন

১৯৮১ সালে চীন দেশে এক অমায়িক দোভাষী আমাকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন ওঁদের জাতীয় সঙ্গীতের কথা। গানের ভাষা বদলেছে। পুরনো গানের ভাবটা ছিল এইরকম, দাসত্ব যারা মানবে না ওঠো তারা, আমাদেরই দেহের রক্তে ও অস্থিতে তৈরি হোক চীনের নতুন প্রাচীর। নতুন গানে বলা হল, এগিয়ে চল কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে, মাওয়ের নেতৃত্বে। মনে প্রশ্ন উঠেছিল, দলবিশেষ ও ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতকে এইভাবে বেঁধে দেওয়া কি সুবিবেচনার কাজ হল ? অন্তত এদেশে আমরা সেটা করিনি। ঐ প্রশ্নটাই আবার ফিরে আসছে এবছরের ছাত্র আন্দোলনের বৃত্তান্ত শুনে।

কমিউনিস্ট দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ঠিক চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার মুখে, চীনের রাজধানীতে যে ছাত্র আন্দোলনের আবির্ভাব হল সেটা ইতিহাসে এক বিশেষ ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই আন্দোলন থেকে হাতে হাতে কতটা ফল পাওয়া গেছে তাই দিয়ে এর বিচার করতে যাওয়া ভুল। এর মহত্ত্ব বুঝতে হলে মনোযোগ দিতে হবে ছাত্রদের এই সংগ্রামের কয়েকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি।

প্রথম বৈশিষ্ট্য, সংগ্রামের ব্যাপকতা। যদিও পেইচিং মহানগরে ছাত্রদের এই আন্দোলন আরম্ভ হয় তবু সেটা চীনের রাজধানীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভিতর আবদ্ধ থাকেনি। কোনও সংগঠিত রাজনীতিক দলের সমর্থন ছাড়াই একটা প্রবল ভাবধারার মত ছাত্রদের দাবি প্রতিধ্বনিত হয়েছে দূর থেকে আরও দূরে। চীনের নানা প্রান্ত থেকে ছোট বড় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সমর্থন এসে পৌঁছেছে রাজধানীর সেই ঐতিহাসিক

তিয়েনআনমেন চত্বরে, যেখানে দাঁড়িয়ে ১৯৪৯ সালে এক বিশাল জনসভায় মাও ঘোষণা করেছিলেন কমিউনিস্ট শাসনপ্রতিষ্ঠার বার্তা। ছাত্র সংগ্রাম শুরু হবার একমাস পরে, মে মাসের ১৬ তারিখে, অনিবার্যভাবে পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে উদ্‌ভাসিত হল আন্দোলনের আরও বড় এক আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত। সেদিন ঐ চত্বরেরই একাংশে যখন ছাত্রদের দাবির সপক্ষে সম্মিলিত হয়েছে হাজার হাজার যুবক-যুবতী তখন তারই অতি নিকটে বৃহৎ সভাকক্ষে মিলিত হলেন, ঐতিহাসিক এক শীর্ষ সম্মেলনে, চীনের নেতা তং শিয়াওফিং এবং সোভিয়েত নেতা গর্বাচভ। আর সেই মুহূর্তেই আমাদের দৃষ্টির সীমানাটা হঠাৎ বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম যে, গণতন্ত্র ও বাক্‌স্বাধীনতার সপক্ষে চীনের ছাত্রদের ঐ আন্দোলন একটি দেশেই সীমাবদ্ধ নয়। চীনের ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি বৃহত্তর এক আন্দোলনের অংশ, চীন, সোভিয়েত দেশ, পোল্যান্ড সব দেশের ভিতর দিয়েই বয়ে চলেছে একই তরঙ্গ।

সমান তাৎপর্যময় চীনের আন্দোলনের অন্য এক বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি ভবানী সেনগুপ্ত এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চীনের এই আন্দোলনের 'কৌশল' অথবা পদ্ধতি লেনিনবাদী বা মাওবাদী চিন্তাভাবনার সঙ্গে মেলে না, বরং এর তুলনা গান্ধীবাদের সঙ্গে। আন্দোলনের নেতারা সযত্নে অহিংসার পথে চলেছেন। অনশনকে সংগ্রামী পদ্ধতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাজধানীতে যখন সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হল, সেই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেও ছাত্রছাত্রীরা এক আশ্চর্য অনুত্তেজিত সাহসের সঙ্গে সৈন্যদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, গ্রহণ করেনি হিংসার পথ অথবা পলায়নের পথ। এই যুবক-যুবতীরা গান্ধীজীর চিন্তার সঙ্গে পরিচিত কি না আমরা জানি না। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ভিতর খুঁজে পেয়েছে এরা এমন এক সংগ্রামী পথ, যা গান্ধীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চীনের এই আন্দোলনের আরও এক বৈশিষ্ট্য, এর নেতৃত্ব কোনও বিশেষ শ্রেণীর হাতে আবদ্ধ নয়। সংগ্রামের পুরোভাগে নেই কোনও শ্রমিক সঙ্ঘ বা কৃষক সমিতি, আছে সেই ছাত্রছাত্রীরা যাদের শ্রেণীর সংজ্ঞায় বাঁধা যায় না। অথচ এই আন্দোলনের আবেদন ছোট ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। একে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন চীনের চিন্তাশীল মানুষেরা। রাজধানীতে সামরিক ব্যবস্থা জারি করবার পর দেখা গেল অন্য এক দৃশ্য। সেনাবাহিনীর ভিতরও এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির অভাব নেই।

শুধু নেতৃত্বের গঠনে নয়, আন্দোলনের ভাষাতেও একই বৈশিষ্ট্য। এই ছাত্রছাত্রীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণে মার্ক্সবাদের নাম নেই। চল্লিশ বছর ধরে চীনদেশ কমিউনিস্ট শাসিত। সেই চীনে এই ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। আশৈশব এদের মাওবাদ বা মার্ক্সবাদে দীক্ষিত করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলেছে এক সুসংবদ্ধ ক্ষমতাশালী দলের পক্ষ থেকে। অথচ আজকের ছাত্রছাত্রীদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের সঙ্কল্পে ও ভাষায় তার কোনও প্রভাব চোখে পড়ে না।

স্বভাবতই মার্ক্সবাদী নেতাদের অনেকেই এই আন্দোলনকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। কেউ কেউ এর পিছনে বিদেশী হাত খুঁজছেন। কিন্তু ঐভাবে দেখে আন্দোলনের প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে না। মনে রাখতে হবে এর বিরাট ব্যাপ্তি ; কিছু বিদেশীর কি এমন সাধ্য আছে অথবা থাকা সম্ভব যে, চীন, সোভিয়েত দেশ, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি অবধি এই বিশাল তরঙ্গ তারা সৃষ্টি করতে পারে ? মনে রাখতে হবে এর আশ্চর্য সংযম। বিদেশী ঘাতকদের কি সেই শক্তি আছে যাতে হাজার হাজার তরুণ তরুণীকে

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অহিংস পথে পরিচালনা করা যায় ? একটা আদর্শের শক্তি ছাড়া এসব কিছুরই কি ব্যাখ্যা হয় ? স্থায়ী সংগঠনের অভাবে হয়ত এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে না, হয়ত সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে যাবে। শেষ পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসার প্রবেশও একেবারে অসম্ভব নয়। তবু বিষয়টাকে বুঝে দেখা দরকার।

শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘটলেই তাতে বিদেশী চক্রান্তের গন্ধ পাওয়া কিছু নতুন ব্যাপার নয়। শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনকেও এইরকম সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে। আর পৃথিবীটা আজ এমনই ছোট হয়ে গেছে যে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে "বিদেশী" প্রভাব ছড়িয়ে পড়েও ঠিকই। তবু দেশের ভিতরের অবস্থাতেই নিহিত থাকে আন্দোলনের প্রধান কারণগুলি। তাকে উপেক্ষা করে বিদেশী চক্রান্তের রব তুললে তাতে বিভ্রম সৃষ্ট হয়, সমস্যার সমাধান অযথা কঠিন হয়ে ওঠে।

একটা ব্যাপার চীনে বারবারই ঘটছে। ছাত্র-আন্দোলন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসছে। রাজনীতির নেতারা সেই আন্দোলনকে প্রথমে কিছুটা সহানুভূতির চোখে দেখছেন, কিন্তু সেটা নিতান্তই সাময়িকভাবে আর ছোট সীমার ভিতর। আন্দোলন ব্যাপক হয়ে উঠলেই শাসকদল ভয় পাচ্ছে, জারি হচ্ছে সরকারি বিধিনিষেধ। ১৯৭৬ সালে চৌ এন লাইয়ের মৃত্যুর পর গণতন্ত্রের দাবিতে এইরকমই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আবার ১৯৮৬-৮৭ সালে। আবারও হু ইয়াও বাং-এর মৃত্যুর পর এই ১৯৮৯ সালে। শাসকদল প্রতিবারই রাশ টেনে ধরেছে। চীনদেশে একদলীয় শাসনতন্ত্র এখনও যথেষ্ট মজবুত, সেটাকে ভাঙবার মত শক্তি ছাত্রদের নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ করতে হবে যে, পদে পদে বাধা পেয়েও গণতন্ত্রের সপক্ষে আন্দোলন বার বার নতুন করে জেগে উঠছে। বোঝা যাচ্ছে, চীনের সমাজদেহের অভ্যন্তরে এমন কোনও পরিবর্তনের শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে যার স্বাভাবিক প্রকাশ গণতন্ত্রের দাবিতে।

মার্ক্স বলেছিলেন, প্রতিষ্ঠিত আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরই এমন অবস্থার ক্রমে সৃষ্টি হয় যাতে সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। শাসকশ্রেণী সেই পরিবর্তনকে ভয় করে, কারণ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সঙ্গেই তার স্বার্থ জড়িত। কিন্তু শেষ অবধি পুরনো ব্যবস্থাকে রক্ষা করা যায় না। যাকে রক্ষা করা যাবে না তাকেও আমরা ছাড়তে চাই না, মানুষের ইতিহাসে এই দুঃখকর পরিস্থিতি বার বার দেখা দেয়।

এই রকমই একটা পরিস্থিতি আজ দেখা দিয়েছে চীনসহ সারা সাম্যবাদী জগতে। কমিউনিস্ট শাসনের কাঠামোর ভিতরই শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের বাস্তব অবস্থা ক্রমে বদলে গেছে, বেড়ে উঠেছে এক নতুন প্রজন্ম, রূপগ্রহণ করেছে নব আশা আকাঙ্ক্ষা, নতুন দাবি যার সঙ্গে পুরনো ব্যবস্থা ও মতবাদের আর সামঞ্জস্য নেই। একই সঙ্গে আকার গ্রহণ করছে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অন্য এক রূপরেখা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার মধ্যে যাকে আর আঁটা যাচ্ছে না।

এই সত্যটার মুখোমুখি দাঁড়ানো কমিউনিস্ট দলের পক্ষে কঠিন। এ কথাটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, নতুন প্রজন্ম যা চাইছে, বাস্তবের যা দাবি, তাকে পুরোপুরি মেনে নিতে গেলে শেষ অবধি বিদায় নিতে হয় কমিউনিস্ট দলকেই, অন্তত তার একাধিপত্যকে। চীনের নেতারা ছাত্র আন্দোলনকে কুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়েছেন, কারণ তাঁরা বাস্তববাদী। তবু যে ছাত্রদের দাবিকে তাঁরা ভয়ের চোখে দেখেন তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। একটি দল ও বিশেষ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা নিজেদের স্বার্থকে

একান্তভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন তাঁদের পক্ষে ইতিহাসের এই অধ্যায়টিকে শান্তভাবে মেনে নেওয়া বড় কঠিন। অথচ পরিবর্তন অনিবার্য। শান্তিপূর্ণ পথে সেই পরিবর্তন ঘটবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। এই রকমের প্রশ্ন আজ তীক্ষ্ণভাবে প্রাসঙ্গিক শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক দেশেই নয়, সাম্যবাদী সমাজেও।

চীন ও সোভিয়েত দেশের মানুষ ভিতরে ভিতরে নতুন এক বিপ্লবের জন্য তৈরি হচ্ছে। সেই বিপ্লবের অগ্রদূত যুব সম্প্রদায়। শাস্ত্রের দোহাই অথবা দলীয় ফতোয়া দিয়ে বেশিদিন এদের পথ আটকানো যাবে না। মুক্ত সমাজ সম্বন্ধে আজকের এই যুবকদের ধারণাটাও শেষ কথা নয়। তবে এটা এগিয়ে যাবার পথে একটি ধাপ। আরও দূরে যেতে হবে। আগামী দিনের বিপ্লব শান্তিপূর্ণ হলেই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল।

পূর্ব ইউরোপ মার্ক্সবাদ সাম্যবাদ

পূর্ব ইউরোপে নতুন যুগের জন্ম হল। ঐতিহাসিক একটি বছরকে আমরা সদ্য পেরিয়ে এসেছি। শুধু দুই জার্মানি নয়, খণ্ডিত ইউরোপ আজ নতুন করে ঐক্যের স্বপ্ন দেখছে। সাম্যবাদী দুনিয়া বিরাট পরিবর্তনের সম্মুখীন। কেউ আশান্বিত, কেউ-বা শংকিত। আধুনিক যুগের ইতিহাসে ১৭৮৯ সাল যেমন এক স্মরণীয় সন্ধিক্ষণ ফরাসী বিপ্লবের গুণে, ১৯৮৯ তেমনি যুগান্তকারী বছর বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে সাম্যবাদী জগতে অভূতপূর্ব তোলপাড়ের কারণে। এমন একটি দেয়াল হঠাৎ ভেঙে পড়েছে যেটিকে আমরা অভঙ্গুর বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। যদিও কম্যুনিস্ট ব্যবস্থার আমি সমালোচক তবু স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, ১৯৮৯ সালের নাটকীয় পরিবর্তন আমার কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল, ১৯৮৬ সালের অশোককুমার সরকার স্মারক বক্তৃতায় এর পূর্বাভাস দিতে পারি নি।

মহাচীন নিয়ে 'দেশ'-এর পাতায় লিখেছিলাম গত বছরে। এবারের আলোচনায় প্রাধান্য পাবে পূর্ব ইউরোপ। বিশেষ স্থান ও কাল নিয়ে যদিও আমাদের কথা শুরু তবু ধাপে ধাপে বিশেষকে অতিক্রম করে বৃহত্তর কিছু প্রশ্নে গিয়ে পৌঁছনোতেই আমাদের আগ্রহ। ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলির এইরকমই একটা আকর্ষণ আছে। তারা এক একটি দ্বার খুলে দেয়, দুয়ার পেরিয়ে মানুষ বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের বিস্তৃত বিশ্বে গিয়ে দাঁড়ায়, নিজের অবস্থানটা নতুন করে বুঝবার চেষ্টা করে।

১

পূর্ব ইউরোপের ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক।

গত কয়েক বছরে আমাদের পরিচিত বহু দেশে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায়, প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটেছে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে। ভারতের প্রতিবেশী কয়েকটি দেশে তো এ ঘটনা বার বারই দেখা গেছে। পূর্ব ইউরোপে কিন্তু কম্যুনিস্ট সরকারের পতন

ঘটেছে কোনো সামরিক চক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে নয়। গণঅভ্যুত্থানই পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তনের পথস্রষ্টা। এইসব আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন ছাত্র ও যুবশক্তি, শ্রমিক, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী মানুষ। কোথাও শ্রমিকেরা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন, যেমন পোল্যান্ডে। কোথাও ছাত্র ও যুবশক্তি আন্দোলন শুরু করেন, যেমন চেকোস্লোভাকিয়ায়। কিন্তু যেভাবেই আন্দোলন আরম্ভ হোক না কেন, অতি দ্রুত সেটা বহু মানুষের সমর্থন লাভ করেছে।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, কম্যুনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী আন্দোলন একটি দুটি দেশে আবদ্ধ থাকেনি, বরং পূর্ব ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম, ছোটো দেশ আলবেনিয়া। কেউ কেউ আবার বলবার চেষ্টা করেছেন যে, ১৯৮৯ সালের এই আন্দোলন কিছু অযোগ্য শাসকের বিরুদ্ধে, ক্ষমতালোভী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, কম্যুনিস্ট শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হত যদি প্রতিবাদী আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকত একটি দুটি দেশে। কিন্তু তা তো থাকেনি। তবে কি কম্যুনিস্টশাসিত পূর্ব ইউরোপে প্রতিটি দেশেই নেতারা অযোগ্য ও ক্ষমতালোভী ? এমন সর্বব্যাপী অযোগ্যতার অন্য কোনো বৃহত্তর ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। যে-শাসনব্যবস্থার ভিতর থেকে এই নেতারা উঠে এসেছিলেন সেই ব্যবস্থা নিয়েই আবারও প্রশ্ন এসে যায়।

১৯৮৯ সালের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতিটি দেশেই গণআন্দোলন ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে শান্তিপূর্ণ, বিশাল তবু সংযত, যথাসম্ভব অহিংস। ব্যতিক্রম, রোমানিয়া। অন্যান্য দেশে তেমন কোনো রক্তপাত হয়নি। বিভিন্ন দেশে গণআন্দোলনের মুখে শাসকদলের প্রতিক্রিয়া যদিও বিভিন্ন ছিল তবুও সাধারণভাবে একটা কথা বলা যায়। এবার অধিকাংশ দেশেই শাসকদল অল্পসময়ের ভিতরই বুঝে নিয়েছে যে, এই আন্দোলনকে ঠেকানো যাবে না। এই সুবুদ্ধির ফলে শেষ অবধি ব্যাপারটা গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি দেশের কথা বলা যাক।

পোল্যান্ডে প্রতিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল শ্রমিক সংগঠন, সলিডারিটি। ১৯৮০ সালে ওয়ালেসার নেতত্বে শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৯৮১ সালে পোল্যান্ডে সামরিক শাসন জারি করা হয়। সলিডারিটি নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এটাকে স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। বলপ্রয়োগের নীতি ধাপে ধাপে প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচভ ক্ষমতায় আসেন। তারপর সোভিয়েত দেশসহ সারা পূর্ব ইউবোপেই কমবেশি দ্রুত গতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডে দেশব্যাপী নির্বাচন মোট ৪৬০ আসনের ভিতর ১৬১ আসনে সলিডারিটির প্রার্থীদের অংশগ্রহণ করবার সুযোগ দেওয়া হয়, এর ভিতর একটি ছাড়া আর প্রতিটি আসনেই সলিডারিটি জয়যুক্ত হয়। ফলে জনমত কোন্ দিকে এবিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এইভাবে পোল্যান্ডে অকম্যুনিস্ট সরকার গঠনের পথ উন্মুক্ত হয়।

চেকোস্লোভাকিয়াতে কম্যুনিস্ট স্বৈরতন্ত্রের হিম শাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রতিবাদী আন্দোলন ঘটে ১৯৬৮ সালের বসন্ত ঋতুতে। রাজধানী প্রাগ নগরে ডুবচেকের নেতৃত্বে সেই আন্দোলন, যাকে আজও "প্রাগ বসন্ত" বলে উল্লেখ করা হয়, দ্রুত নিস্পিষ্ট হয়ে যায় সোভিয়েত ট্যাঙ্কসহ নিষ্ঠুর সামরিক হস্তক্ষেপে। এরপর গণবিক্ষোভ আবারও অন্তত আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে দীর্ঘকালের জন্য। ঐতিহাসিক মুহূর্ত ফিরে এলো ১৯৮৯-এর নভেম্বরে। পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৩৯ সালের ১৭ই নভেম্বরে অত্যাচারী

নাৎসীরা ন'টি ছাত্রকে হত্যা করেছিল। সেই দিনটিকে আন্তর্জাতিক ছাত্রদিবস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯৮৯-এর নভেম্বরে প্রাগের ছাত্রসমাজ ঐ দিবসটি উদ্‌যাপন করবার জন্য সম্মিলিত হয়, আসলে ১৯৩৯-কে স্মরণ করে সব রকমের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোই উদ্দেশ্য। প্রাগে ছাত্রদের মিছিল যখন পুলিশের মুখোমুখি হল তখন কোনো সংঘর্ষের আশংকা করেনি আন্দোলনকারীরা, এমনকি কিছু ছাত্রী ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল পুলিশের দিকে সৌহার্দের প্রতীক হিসেবে। অপ্রত্যাশিত ভাবে পুলিশ কিন্তু মিছিলের ওপর সেদিন আক্রমণ চালালো ব্যাটন ও কাঁদানে গ্যাস সহ্।

এর ফলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। অত্যাচারের প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকা হল। কিছুদিনের ভিতরই শাসক গোষ্ঠীর ভিতর সুবুদ্ধির উদয় হল, কম্যুনিস্ট সরকার নতিস্বীকার করল। মন্ত্রীসভায় কিছু অ-কম্যুনিস্ট সদস্য নেওয়া হল। কম্যুনিস্ট দলই সারা দেশে একমাত্র নেতৃস্থানীয় দল এই পুরনো নীতি পরিত্যক্ত হল।

যে-বিশাল আন্দোলনের চাপে এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটল তার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ চরিত্র। মস্কোর নিউ টাইমস কাগজে প্রকাশিত সমসাময়িক প্রতিবেদনে এই রকম বলা হয়েছে : "Over two weeks of massive manifestations and rallies, for all their verbal violence, not one lamppost or shopwindow was broken, not a single car was burnt down. What's going on in Czechoslovakia is now commonly referred to as a 'tender revolution'." বিক্ষোভকারীরা একটি দোকানেও ভাঙচুরের চেষ্টা করেননি, একটি গাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করেননি। ভয়ংকর কিছুই ঘটেনি, ১৯৮৯-এ চেকোস্লোভাকিয়ার ঐতিহাসিক আন্দোলনকে তাই নাম দেওয়া হয়েছে "নম্র বিপ্লব"।

পূর্ব জার্মানিতে শেষ স্বৈরতন্ত্রী কম্যুনিস্ট নেতা এরিখ হোনেকের। গর্বাচভের উদারনীতি তিনি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। পূর্ব জার্মানিতে পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের প্রয়োজন নেই, এই ছিল তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত। প্রতিবাদে অনেকেই দেশত্যাগ করতে শুরু করলেন। পূর্ব জার্মানি থেকে সোজা পথে পশ্চিমে যাওয়া তখনও সম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রতিবেশী কম্যুনিস্ট দেশ হাঙ্গারিতে যাবার পথ খোলা ছিল। ঐ পথেই অনেকে পূর্ব ইউরোপ ত্যাগ করে পশ্চিম যাত্রা করলেন। এসব কথা আজ এতোই পরিচিত যে বড় করে বলবারও প্রয়োজন নেই। হোনেকেরকেও শেষ অবধি পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। পূর্ব জার্মানির জনমতকে বেশিদিন উপেক্ষা করা যায়নি। ১৯৮৯-এর নভেম্বর মাসেই বার্লিন দেয়াল ভেঙে ফেলবার কাজ শুরু হল। কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট দুনিয়ার ভিতর বিরোধের অতি শক্ত প্রতীক ছিল ঐ বার্লিন দেয়াল। এক বছর আগেও এটা কল্পনা করা যায়নি যে ঐ প্রাচীর এভাবে ভেঙে পড়বে। সেই অসম্ভব যখন সম্ভব হল তখন দুই জার্মানির মানুষই জানল যে একটা যুগ শেষ হয়েছে, এবার নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

পূর্ব জার্মানির কম্যুনিস্ট দল তার নাম পালটে ফেলেছে। ১৯৯০-এর মার্চ মাসে বহুকাল পর স্বাধীন নির্বাচন হল। পুরনো কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। এবার তাঁরা দলের নাম দিয়েছেন গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক দল (Party of Democratic Socialism)। পূর্ব জার্মানিতে প্রতি ছ'জন ভোটদাতার ভিতর একজন এই দলকে ভোট দিয়েছেন। রক্ষণশীল খ্রীষ্টান ডেমোক্র্যাটরা সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন ; পশ্চিমী ধাঁচের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরাও কম্যুনিস্টদের তুলনায় বেশি গণসমর্থন লাভ করেছেন। সাধারণ মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষার একটা ছবি এই থেকে পাওয়া যায়।

দুই জার্মানির মানুষের মনেই ঐক্যের একটা স্বপ্ন আছে। কিছু মানুষ সেদিকে এগিয়ে যেতে চাইছেন দ্রুত, কিছু মানুষ আরো সতর্ক পদক্ষেপে। দুই জার্মানিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কীভাবে কতটা ঐক্যবদ্ধ করা যায় সেটাই আজকের ভাবনা।

উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। প্রতিটি দেশের নিজস্ব সমস্যা আছে। পোল্যান্ডে আর্থিক অবস্থা যতটা কঠিন চেকোস্লোভাকিয়ায় তেমন নয়। দেশ বিভাগের জটিলতা পূর্ব জার্মানির বৈশিষ্ট্য। এই দেশগুলির ভিতর আরো নানা ধরনের ভিন্নতা আছে। কেবল একটি বিষয়ে এরা অভিন্ন। গত চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতার পর পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশেই অধিকাংশ মানুষ কম্যুনিস্ট শাসন আর চাইছেন না। অধিকাংশ মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই যে এসব দেশে কম্যুনিস্ট শাসন চলছিল একথাটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আমাদের নিজ নিজ রাজনীতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, ঘটনাটাকে আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এবার দুয়েকটি মূল প্রশ্ন তোলা যাক।

পূর্ব ইউরোপের সাধারণ মানুষ কম্যুনিস্ট শাসন চাইছিলেন না কেন? এই অবাঞ্ছিত শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ১৯৮৯ সালে এত দ্রুতগতিতে সব ক'টি দেশে ফেটে পড়ল কেন?

এইসব প্রশ্নের উত্তর আসলে জটিল নয়। তবু-যে জটিল মনে হয় তার একটা বিশেষ কারণ আছে। কম্যুনিস্ট প্রচারের গুণে এদেশে অনেকে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন যে কম্যুনিস্ট শাসন হল এক উচ্চতর গণতন্ত্র, যেখানে ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হাতে, ধনিক শ্রেণীর হাতে নয়। এই মিথ্যা বিশ্বাসটা মন থেকে সরানোই কঠিন। এটা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে ঘটনার দিকে তাকাতে পারলে ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত লাল ফৌজ পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে ঢুকে পড়ে। কম্যুনিস্ট শাসন ঐসব দেশে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ব্যতিক্রম, যুগোস্লাভিয়া; সেখানে কম্যুনিস্ট শাসন স্থাপনে স্তালিনী সৈন্যবাহিনীর তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না।

প্রথম দিকে অন্য যেসব দল ছিল কিছুকালের ভিতরই সেই সব দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলতে বিশেষ কিছু রইল না। কার্যত কম্যুনিস্ট দলেরই একদলীয় শাসন সব দেশে পাকা হয়ে গেল। অনেক দেশের সংবিধানেও একথাটা লেখা হয়ে গেল যে, দেশের নেতৃত্ব থাকছে কম্যুনিস্ট দলের হাতে। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট দলকে নেতৃত্ব থেকে সরাবার চেষ্টামাত্রই সংবিধানবিরোধী! এইরকম বিধানই ছিল এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে। পূর্ব ইউরোপে সেই স্তালিনী একদলীয় শাসনের মডেলটাই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চাপিয়ে দিয়েই লাল ফৌজ বিদায় নেয়নি, ঐ চাপানো ব্যবস্থাটাকে রক্ষা করবার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত থেকেছে।

কোনো দেশের মানুষই এই রকমের ব্যবস্থা পছন্দ করে না। পূর্ব ইউরোপের সাধারণ মানুষের ভিতরও অন্য দেশের মতোই জাতীয়তাবোধ আছে। বাইরের শক্তি এসে গায়ের জোরে কিছু চাপিয়ে দিলে সেটাকে পরাধীনতা মনে হয়। যদি স্তালিনী শাসনব্যবস্থার অন্য কোনো ত্রুটি না থাকত, তবু কেবল এই কারণেই কম্যুনিস্ট শাসন পূর্ব ইউরোপে সহজে জনপ্রিয় হত না। আসলে ঐ শাসনব্যবস্থার ভিতর আরো নানা দোষত্রুটি ছিল, বিকৃতি এসে গিয়েছিল। সেকথা পরে বলা যাবে। একই দল বেশিদিন ক্ষমতা হাতে নিয়ে বসে

থাকলে তার ভিতর বিকৃতি এসে যায়, পূর্ব ইউরোপে তাই ঘটেছিল।

এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেষ্টা বার বারই হয়েছে, ১৯৮৯ সালের অনেক আগেই। শুধু অল্পকিছু মুক্তচিন্তকের প্রতিবাদ নয়, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষও বিক্ষোভ জানিয়েছেন, তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী। ১৯৫৩ সালে পূর্ব জার্মানিতে, ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরিতে, ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ায় কম্যুনিস্ট শাসকদলের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়, সেসব কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু প্রতিবারই জনতার এই প্রতিবাদ অন্তত আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল হয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় বিরোধী আন্দোলনকে রক্তাক্ত অবসানের দিকে ঠেলে দেয়। কম্যুনিস্ট শাসনের পিছনে যথেষ্ট জনসমর্থন নেই, একথাটা নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে বহুদিন থেকেই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এ থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

এরই ভিতর গর্বাচভ এলেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অপ্রত্যাশিত একটা আশার আলো দেখা দিল। গর্বাচভ স্বদেশে স্তালিনী শাসনব্যবস্থার কঠোর সমালোচক, পরিবর্তন আনতে তিনি বদ্ধসংকল্প। পূর্ব ইউরোপে স্তালিনী ব্যবস্থার যাঁরা অবসান চান তিনি কি তাঁদের বাধা দেবেন ? দেবার তো কথা নয়। তবু একটু সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ব ইউরোপে আবারও গণআন্দোলন যদি দেখা দেয় তবে শুধু ব্যবস্থাটার পরিবর্তনই দাবি করা হবে না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় কম্যুনিস্ট দলের একচেটিয়া অধিকারও জনতা মানতে চাইবে না। অথচ কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতাচ্যুত হলে পূর্ব ইউরোপের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণও টিকবে না। সোভিয়েত সরকার কি এত বড় একটা পরিবর্তন বরদাস্ত করবেন ? এ নিয়ে একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল।

সেই সন্দেহটা অনেক পরিমাণে দূর হল ১৯৮৯ সালের জুন মাসে। ওয়ালেসার নেতৃত্বে সলিডারিটিকে কম্যুনিস্ট দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বার সুযোগ দেওয়া হল। পোল্যান্ডে একদলীয় শাসন শেষ হবে, এই সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার পূর্ব ইউরোপের বিক্ষুব্ধ ছাত্র শ্রমিক জনতার মনে নতুন আশার সঞ্চার হল। এবার আন্দোলন হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ট্যাংকসহ সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হবে না পুরনো শাসকদলকে উদ্ধার করবার জন্য। অথচ সৈন্যবাহিনীর সমর্থন ছাড়া শাসকদলের রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই। এই কথাটা যখন ১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি স্পষ্ট হয়ে উঠল তারপর দ্রুত গতিতে পূর্ব ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশে গণবিক্ষোভ উত্তাল হয়ে উঠল। গর্বাচভ কোনো চেষ্টা করলেন না ঐসব দেশের পুরনো নেতৃত্বকে রক্ষা করবার জন্য। নেতৃত্ব রক্ষা পেল না। সাধারণভাবে এই হল ঘটনাপরম্পরা। এটা বুঝবার জন্য কোনো কষ্টকৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীতে বন্দী মার্ক্সবাদী কিছু তাত্ত্বিকের মুখ থেকে অন্য এক ধরনের ব্যাখ্যা শোনা যাচ্ছে। সেটা একবার উল্লেখ করে রাখা যাক। মার্ক্সবাদে সমাজের আর্থিক "ভিত্তি" আর সাংস্কৃতিক "পরিকাঠামো"র ভিতর একটা পার্থক্য করা হয়। কিছু কিছু মার্ক্সবাদী বলতে চাইছেন যে, কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পেয়েছে, অতএব সেখানে আর্থিক ভিত্তিটা যথার্থই প্রগতিশীল। নেতৃত্বে কিছু দোষ দেখা দিয়েছিল, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা হয়নি, আর এইজন্যই যত গোলমাল। এই ব্যাখ্যাটা নানা দিক থেকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। পুরনো কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় দোষ ঢুকেছে কেবল পরিকাঠামোতে নয়, ভিত্তিতেও। এ বিষয়ে পরে আরো কিছু বলা যাবে। আপাতত আমাদের এতাবৎ

আলোচনার সূত্র ধরে এগিয়ে যাওয়া যাক।

২

গর্বাচভ স্তালিনী ব্যবস্থাকে স্বদেশে ভাঙতে চেয়েছেন, আর তারই ফলে পূর্ব ইউরোপে কম্যুনিস্ট শাসন ভেঙে পড়েছে। অন্তত গর্বাচভের ঐ যুগান্তকারী প্রয়াসের ফলেই পূর্ব ইউরোপে পরিবর্তনের পথ সহজ হয়েছে, এই কথাটা একটু আগে আমরা বলতে চেষ্টা করেছি। এরপর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, গর্বাচভ স্বদেশে কী ধরনের পরিবর্তন চাইছেন আর কেনই বা সেটা চাইছেন ? এই প্রশ্নেরও একটা সহজবোধ্য উত্তর সম্ভব।

গর্বাচভের নবকার্যক্রমের সঙ্গে দুটি শব্দ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে, পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত। বেশ কয়েক বছর যাবৎই সোভিয়েত দেশের অর্থনীতিতে নানা রকমের সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠছিল, কেমন একটা জড়তা ও দুর্নীতি যেন তাকে অধিকার করে বসছিল, উৎপাদনবৃদ্ধির হারও ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় স্তালিন উৎসাহের সঙ্গে বলছিলেন, সোভিয়েত অর্থনীতি প্রধান প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে দেশের উৎপাদিকা শক্তি পশ্চিমী দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যাবে। স্তালিনের মৃত্যুর পর যখন ত্রিশ বছরের বেশি কেটে গেছে তখন গর্বাচভ নেতৃত্বে এলেন। তিনি দেখলেন, সোভিয়েত অর্থনীতির উন্নতি একেবারেই আশানুরূপ হচ্ছে না। আমাদের দেশের কোনো কোনো মার্ক্সবাদী বলছেন, সোভিয়েত দেশের আর্থিক অবস্থা তো দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের তুলনায় ভালো। এই তুলনাটা কিন্তু গর্বাচভের এবং সে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে অর্থহীন। তাঁরা দেখছেন, সোভিয়েত দেশ যুদ্ধের সজ্জায় পশ্চিমী জগতের সমকক্ষ, সে দেশের সৈন্যবাহিনী পশ্চিমী সৈন্যবাহিনীর চেয়ে অনেক বড়। তাঁদের মনে আশা ছিল, জীবনযাত্রার মানের দিক থেকেও তাঁরা পশ্চিমের সমকক্ষ হয়ে উঠবেন। তাঁরা দেখছেন তাঁদের দেশ ক্রমেই যেন পিছিয়ে পড়ছে, গায়ের সাবানের মতো সাধারণ ভোগ্যবস্তুও সাধারণ মানুষের পক্ষে আজও সেদেশে সংগ্রহ করা কঠিন। গর্বাচভ নতুন প্রজন্মের মানুষ, এই প্রজন্মের ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে তিনি পরিচিত। তিনি প্রথমেই তাঁর নবকার্যক্রমে যে শব্দটিকে তুলে ধরলেন সেটা হল, উস্করেনিয়ে, মানে দ্রুতীকরণ। এগিয়ে যাবার গতিটা দ্রুত করে তুলতে হবে।

কিন্তু একটা কথা থেকে অনিবার্যভাবে আরেক কথা এসে গেল। গর্বাচভ বুঝতে পারলেন, এগিয়ে যাবার গতি দ্রুত করতে হলে সোভিয়েত অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার একটা বড় রকমের পুনর্গঠন প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে সবাইকে, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ মানুষকে, তাঁদের অভাবঅভিযোগের কথা স্পষ্ট করে বলতে দিতে হবে। প্রকাশ্য সমালোচনার অভাবে সোভিয়েত শাসকবর্গ ও শাসনব্যবস্থা প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তনের শক্তি দুর্বল হচ্ছে। এই থেকে এল ঐ দুটি শব্দ, পেরেস্ত্রোইকা আর গ্লাসনস্ত। 'স্ত্রোইকা' শব্দাংশটি একটি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত (স্ত্রোইৎ) যার মানে হচ্ছে গঠন করা, আর প্রথমোক্ত উপসর্গের সঙ্গে জুড়ে পুরো শব্দটার মানে দাঁড়ায়, পুনর্গঠন। 'গলাস' মানে হচ্ছে কণ্ঠস্বর। 'নস্ত' একটি প্রত্যয়, যা দিয়ে ভাবার্থক শব্দ গঠন করা যায়, যেমন আমাদের ভাষায় 'ত্ব' বা 'তা' দিয়ে হয়, মানব থেকে মানবতা। 'গলাস' আর 'নস্ত' দুয়ে মিলে 'গ্লাসনস্ত'। এর অর্থের ব্যঞ্জনা হচ্ছে রুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করা। মতপ্রকাশের ও সমালোচনার স্বাধীনতাই গ্লাসনস্তের মূল কথা। গর্বাচভ জানেন যে, পুনর্গঠন ও

বাক্স্বাধীনতার নীতি নিয়ে এগোতে গেলে সোভিয়েত সমাজে একটা তোলপাড় হবে, রক্ষণশীল শক্তি বিপন্ন হবে আর তারই ফলে গর্বাচভের নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর দেশে এগিয়ে যাবার এটাই পথ, আর কোনো পথ নেই এবং এগিয়ে যাওয়াটা বড়ই জরুরী।

কেন জরুরী সেটা বুঝতে হলে, স্তালিনী অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার ভিতরের সমস্যা নিয়ে আরো দু'চারটা কথা যত সংক্ষেপেই হোক বলা দরকার।

ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পথে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কার্ল মার্ক্স 'ডিক্টেটরশিপ অব দ্য প্রোলেটারিয়াট' বা শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কতন্ত্র বা সার্বিকশাসনের কথা বলেছিলেন। লেনিন ও স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত দেশে সেটা কম্যুনিস্ট দলের সর্বগ্রাসী শাসনের রূপ নেয়। লেনিন কি এইরকম চেয়েছিলেন ? সেই তর্কে আমরা যাচ্ছি না। এইরকমই হয়ে উঠেছিল, এইটুকুই আপাতত মনে রাখা প্রয়োজন।

সোভিয়েত দেশে এই একদলীয় শাসন মজবুত হল একটা যুদ্ধযুদ্ধ পরিস্থিতির ভিতর। আর সেইসঙ্গে বৃদ্ধিলাভ করল একটা জঙ্গী অর্থনীতি। রুশ বিপ্লবের পরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, ধনতান্ত্রিক কিছু দেশের হস্তক্ষেপের ফলে যেটা আরো বেড়ে ওঠে। তারপর আরম্ভ হয় অন্য এক গৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী, স্তালিনী নীতিরই ভয়ংকর পরিণাম, যাতে প্রাণ হারিয়েছে নানাভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সোভিয়েত দেশের বহু পরিবারের স্মৃতিতে যেটা আজও একটা বিভীষিকার মতো জেগে আছে। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি হিটলারী যুদ্ধের আয়োজন শুরু হয়ে গেল, যার ধাক্কা এসে পৌঁছল স্তালিনের দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নারকীয় অভিজ্ঞতা সইতে হয়েছে সোভিয়েত দেশকে, কমবেশি সারা ইউরোপকেই। ১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধের অবসান, আজ ১৯৯০। এটাও কিন্তু হয়ে উঠল প্রধানত "ঠাণ্ডা লড়াই"-এর যুগ। সব মিলে অতিদীর্ঘ এক বিচিত্র ও ভয়ংকর যুদ্ধপর্ব।

এর ভিতর দিয়ে যে শাসনব্যবস্থা সোভিয়েত দেশে গড়ে উঠেছে নানা কারণে সেটা আজ ওদেশের মানুষের কাছে অসহনীয়।

যে-কোনো দেশেই একদলীয় শাসন দীর্ঘকাল চললে শাসকদলের ও শাসনব্যবস্থার কিছু বিকৃতি দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধমুখী অবস্থায় সমস্যা আরো গভীর হয়। মার্কিন দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিরক্ষার আয়োজন করতে গিয়ে সোভিয়েত সরকারকে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের একটা সিংহভাগ যুদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত করতে হয়েছে। মার্কিন দেশের হাতে সম্পদ বেশি, যুদ্ধের আয়োজনের পরেও ভোগ্যবস্তুর যথেষ্ট আয়োজন সম্ভব হয়। সোভিয়েত দেশে অবস্থা অন্যরকম, প্রতিরক্ষার জন্য বড় রকমের বরাদ্দ করতে গিয়ে ভোগ্যবস্তুর ক্রমাগত অনটন মেনে নিতেই হয়। ওদেশের আর্থিক ব্যবস্থাও কিছু গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সামরিক কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধের অস্ত্রের মানের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হয়। কিন্তু ভোগ্যবস্তুর মানের প্রতি দৃষ্টি রাখার কোনো ভাল ব্যবস্থা নেই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় হয় তো বলা হল এত কোটি জোড়া জুতো তৈরি করতে হবে। কারখানা থেকে জুতো বেরিয়ে আসবার পর গুণে দেখা হল যে লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয়েছে কিনা। কিন্তু জুতোগুলি ভাল হল কি মন্দ হল, ব্যবহারের যোগ্য হল কতটা, এটা দেখবার মতো যথেষ্ট ব্যবস্থা সেখানে নেই। ফলে ওদেশে অনেক ভোগ্যবস্তুই গুণগত মানের দিক থেকে একেবারেই সন্তোষজনক নয়।

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন কম, ব্যবস্থাপনার অভাবে যা তৈরি হয় সেটা নিম্নমানের, রাষ্ট্রপরিচালিত গবেষণার ধারাটা যুদ্ধমুখী বলে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনকৌশলে

তেমন উন্নতির লক্ষণ নেই। কিন্তু সমস্যা এখানেই শেষ নয়। সীমাবদ্ধ ভোগ্যবস্তুর ভিতর যতটা অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় বা উচ্চমানের সেটাও সাধারণ মানুষের হাতে গিয়ে সহজে পৌঁছয় না। সোভিয়েত সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী একটা শ্রেণী গড়ে উঠছে, ভালোমন্দ জিনিস তাঁদের হাতেই আগে গিয়ে পৌঁছয়। সাধারণ মানুষকে যতই বলা হোক না কেন, আপনারা দেশরক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করুন, তাঁরা বিশেষ সুবিধার এই অপব্যবহার ভুলতে পারেন না। কম্যুনিস্ট দেশে সকলের সমান অধিকার এটাই প্রচার, কিন্তু যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁরা এই প্রচারকে মিথ্যা বলেই জানেন।

আসল ব্যাপারটা বুঝবার জন্য শুধু একটু নির্মোহ দৃষ্টিতে কম্যুনিস্ট শাসনকে দেখবার ও বুঝবার অভ্যাস প্রয়োজন হয়। বাকিটা কারোই বোধশক্তির বাইরে নয়। কম্যুনিস্ট সরকারের অধীনে কর্মে নিয়োগে ও উন্নতির ব্যাপারে দলের কিছু লোক বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। এই কথাটা বুঝতে পেরে সুযোগসন্ধানীরা যথাসম্ভব দলের ভিতর ঢুকে পড়ে। ফলে দলেরও গুণগত অবনতি ঘটে। সুযোগসন্ধানীরা ক্রমেই সর্বক্ষেত্রে নানা রকমের সুবিধা করে নেয়। সাধারণ মানুষের ভিতর বিরক্তি বাড়তে থাকে। শাসকশ্রেণীর কাছে এটাই আবার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। অসন্তোষ যাতে দানা বাঁধতে না পারে সেজন্য গুপ্ত পুলিসের ওপর নির্ভর করা হয়। সাধারণ মানুষ স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করতে সাহস পায় না। এইভাবে কম্যুনিস্ট শাসনে গুপ্ত পুলিশই হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের চোখে একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রতীক, ভয়ের ও ঘৃণার বস্তু। গত কয়েক মাসে পূর্ব ইউরোপের গণআন্দোলনেব ভিতর দিয়ে এই ঘৃণা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

এই সব মিলে সৃষ্টি হয়েছে শ্বাসরোধকারী এক অবস্থা, গর্বাচভ যেটাকে আর অবহেলা করতে চাননি। অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন না ঘটলে সোভিয়েত সমাজে ভিতর থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরণের আশংকা আছে, যার পরিণাম কারোই নিয়ন্ত্রণের ভিতর থাকবে না। পরিবর্তন ঘটাবার চেষ্টাতেও ঝুঁকি আছে, পরিবর্তন ঠেকাবার চেষ্টাতেও। গর্বাচভ পরিবর্তন ঘটাবার ঝুঁকিটাই নিতে দৃঢ়সংকল্প। তাঁর নবরূপায়ণ কার্যক্রমে এটাই উদ্দেশ্য।

৩

একদলীয় অতিকেন্দ্রিক সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্ট শাসনের ভিতর যেসব সমস্যা জমে উঠেছে, গর্বাচভ যার সমাধান খুঁজছেন পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের মাধ্যমে, তাই নিয়ে খানিকটা আলোচনা হল। এরই সূত্র ধরে এসে যায় অন্য এক প্রশ্ন, আজকাল যেটা অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে। প্রশ্নটা এই : মার্ক্সবাদ কি অভ্রান্ত ? নাকি কম্যুনিস্ট শাসনের যেসব সমস্যা আজ আর কিছুতেই উপেক্ষা করা যাচ্ছে না, তার ভিতর দিয়ে মার্ক্সবাদেরও কিছু ভ্রান্তির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ?

যাঁরা গোঁড়া মার্কবাদী তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা কঠিন। যেমন অনেকে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করেন তেমনি কিছু মানুষ মার্ক্সবাদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। শ্রুতি অভ্রান্ত কারণ সেটা ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত ; মার্ক্সবাদ অভ্রান্ত কারণ সেটা "বৈজ্ঞানিক"। কোনো মতবাদকে আগে থেকেই অভ্রান্ত ধরে নেওয়াটা নিছকই বিশ্বাসের কথা। কোনো বিশেষ মানুষের নামের সঙ্গে যুক্ত মতবাদ চিরকালের মতো অভ্রান্ত হতে পারে না। মানুষ ভ্রান্তিশীল, মার্ক্সও মানুষই ছিলেন। মার্ক্সবাদকে অভ্রান্ত বললে মার্ক্সকে ঈশ্বরের তুল্য বানানো হয়।

সবদিক থেকে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার পর্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কম্যুনিস্ট জগতে গত কয়েক বছরের কিছু ঘটনা। এইসব ঘটনা থেকেই আবার উঠে আসে কয়েকটি মূল প্রশ্ন। তাই নিয়ে অতঃপর আমাদের আলোচনা।

আদর্শ সমাজের একটা ধারণা মার্ক্সের লেখাতে পাওয়া যায়, সেটা আকর্ষণীয়। কিন্তু সেটা মার্ক্সের চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি শুধু একটা সুন্দর সাম্যবাদী সমাজের চিত্র আমাদের উপহার দিতে চাননি। সেই সমাজে কীভাবে পৌঁছানো যাবে সেকথাই তিনি বিশেষভাবে বলে যেতে চেয়েছিলেন। পূর্ববর্তী ইউটোপিয়ান সোশ্যালিস্ট বা কল্পসাম্যবাদীরা কেবল আদর্শের কথাই বলে গেছেন, সেখানে পৌঁছবার পথের সন্ধান দেননি, এটাই ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে মার্ক্সের প্রধান সমালোচনা। মার্ক্স পথের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন এইখানেই তাঁর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, মানুষের ভাবনাচিন্তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। শ্রেষ্ঠ মানুষদের চিন্তায় কখনো কখনো এমন একটা মহৎ আদর্শের পরিচয় অবশ্য পাওয়া যায় যেটা স্থানকালের আবদ্ধতা থেকে অনেকখানি মুক্ত। কিন্তু সেই আদর্শকে কিছু পরিমাণে মূর্ত করে তুলতে গেলেই তাকেও স্থানকালে স্থাপিত করতে হয়। মার্ক্সের ঝোঁক ছিল প্রায়োগিক তত্ত্বের দিকে। মানুষের ভাবনাচিন্তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে, এটাকেই যদি আমরা নিয়ম বলে মেনে নিই, তবে মার্ক্সের চিন্তারও নিশ্চয়ই স্থানকালে আবদ্ধ একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল। তিনি অবশ্য মানুষের সমাজের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাঁর তত্ত্বে এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু একটা বিশেষ স্থানকালে দাঁড়িয়েই তাঁকে ইতিহাসপর্যালোচনা করতে হয়েছে। সেই বাস্তব অবস্থানের ছাপ তাঁর চিন্তাতেও নিশ্চয়ই পড়েছিল।

উনিশ শতকের চল্লিশের দশক থেকে আশির দশকের শুরু অবধি মার্ক্স তাঁর মূল্যবান কাজ করে গেছেন। তাঁর কর্মস্থান ছিল পশ্চিম ইউরোপের এমন কয়েকটি দেশে যেখানে তখন "শিল্পবিপ্লব" কমবেশি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিল। পুরনো একটা উৎপাদনব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল, বড় বড় নতুন শিল্পে শ্রমিকেরা সংগঠিত হচ্ছিল, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব চলছিল, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর ধনিক ও অভিজাতশ্রেণীর কর্তৃত্ব কঠোর ছিল।

এইখানে দাঁড়িয়ে মার্ক্স শ্রেণীদ্বন্দ্বের একটা চিত্র প্রত্যক্ষ করেন। আর এরই সূত্র ধরে সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস তাঁর চিন্তাভাবনায় একটা বিশেষ রূপ ধারণ করে। মানুষের ইতিহাসে অবশ্য নানা ধরনের দ্বন্দ্বই আছে, যেমন পরিবারে পরিবারে (মহাভারত স্মরণীয়), জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ। কিন্তু মার্ক্সের চিন্তায় শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্বটাই প্রধান ঘটনা। তিনি বিশ্বাস করতেন এরই ভিতর দিয়ে সমাজের মূল চরিত্র ও পরিবর্তনের ধারা বোঝা যায়, অগ্রসর হবার পথ চিনে নেওয়া যায়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণের তথা মূলধনের মালিকানা ধনিকশ্রেণীর হাতে। শ্রমিকের হাতে আছে শুধু তাঁর শ্রম। এটাই ধনতান্ত্রিক সমাজে অসাম্যের মূল কারণ। সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন করতে হলে মুষ্টিমেয় ধনিকের হাত থেকে মূলধনের মালিকানা কেড়ে নিতে হবে, উৎপাদনব্যবস্থার ওপর স্থাপন করতে হবে শ্রমিকের কর্তৃত্ব। বিপ্লব হল এই সাম্যবাদী ব্যবস্থায় পৌঁছবার পথ।

মার্ক্সীয় বিপ্লবের পথে ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে আবশ্যক। এ বিষয়ে মার্ক্সের প্রথম জীবনের চিন্তা

শেষ জীবনে কিছুটা নমনীয় হয়ে এসেছিল। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে, তাঁর সামগ্রিক চিন্তার সঙ্গে এই সাময়িক ডিক্টেটরশিপের ধারণার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। মার্ক্স ও লেনিনের চিন্তায় রাষ্ট্র হল একটা শাসন ও শোষণের যন্ত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে। বিপ্লবের পর রাতারাতি ধনতান্ত্রিক সমাজ রূপান্তরিত হয় না সাম্যবাদী সমাজে। সেজন্য সময়ের প্রয়োজন। ধনিকশ্রেণী বেশ কিছুকাল ধরে ষড়যন্ত্র চালাবে ক্ষমতায় ফিরে আসবার জন্য। এই সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী কর্তব্য হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে এমনভাবে পুনরায় সংগঠিত করা যাতে সেটা ধনিকশ্রেণীকে চূড়ান্তভাবে দমন ও উচ্ছেদ করবার কাজে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে আবারও শাসন ও দমনের কাজেই নিযুক্ত করা হবে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, ধনিকের স্বার্থে নয়। এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ।

"গোথা প্রোগ্রাম" আলোচনা করতে গিয়ে মার্ক্স লিখেছিলেন : "Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation of the one to the other. There corresponds to this also a political transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat." এখানে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর এক বৈপ্লবিক ডিক্টেটরশিপ মার্ক্সের মতে সাম্যবাদী মুক্ত সমাজে পৌঁছবার জন্য একান্ত আবশ্যক। যেহেতু শ্রমিকশ্রেণীই সমাজের বৃহত্তর অংশ অতএব এই ডিক্টেটরশিপকে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে উচ্চতর গণতন্ত্রও বলা হয়েছে। ধনিকশ্রেণী যখন সম্পূর্ণ নির্মূল হবে তখন রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকবে না। এইভাবে অবশেষে রাষ্ট্র লোপ পেয়ে যাবে। এইরকমই ছিল মার্ক্সের ও মার্ক্সবাদীদের বিশ্বাস।

জীবনের শেষ দিকে মার্ক্স বলেছিলেন, কোথাও কোথাও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু মোটের ওপর হিংসাত্মক বিপ্লবের কথাই মার্ক্স-লেনিনের তত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। রাষ্ট্র যদি মূলত দমন ও নিপীড়নের অস্ত্রই হয় আব সেই অস্ত্রটি শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করাই যদি ধনিকশ্রেণীর স্বধর্ম হয়, তবে ধনিকের হাত থেকে ঐ অস্ত্রটি কেড়ে নিতে হিংসাত্মক উপায়ের প্রয়োজন হবে এটাই তো সহজ কথা। অন্যরকমের চিন্তাও মার্ক্সবাদীদের ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়, তবে সেটা মূলধারা নয়। সেটাকে প্রাধান্য দিতে গেলে মার্ক্স-লেনিনের মূল প্রত্যয়গুলিরই সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কতটা সংশোধনের পর মার্ক্সবাদ তবু মার্ক্সবাদই থেকে যায় তা নিয়ে তর্ক আছে। আমরা সে তর্কে যাচ্ছি না।

বিপ্লবের পর সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছবার পথে ডিক্টেটরশিপ কেন প্রয়োজন এবিষয়ে মার্ক্স-লেনিনের চিন্তা যথেষ্ট বস্তুনিষ্ঠ। হিংসার দ্বারা যে ক্ষমতা লাভ করা যায়, হিংসার দ্বারাই তাকে রক্ষা করা সম্ভব। বৈপ্লবিক উপায়ে ক্ষমতাদখলের পর যদি ধনিকশ্রেণীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে হয় তবে শ্রমিকশ্রেণী তথা কম্যুনিস্টদলের একনায়কতন্ত্রেরই আবশ্যক। নয় তো ক্ষমতা আবারও হস্তচ্যুত হবার সমূহ সম্ভাবনা। এর পরও কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়।

বিপ্লবের পর ক্ষমতারক্ষার জন্য ডিক্টেটরশিপ কেন প্রয়োজন সেটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু সেই অধিনায়কতন্ত্র কি মানুষকে পৌঁছে দিতে পারবে সাম্যবাদী মুক্ত সমাজে? "ডিক্টেটরশিপ অব দ্য প্রোলেটারিয়াট"-এর পরিণতি মার্ক্স দেখে যেতে

পারেননি। পরিণতি দেখা গেল গত সত্তর বছরে। এই পরিণতি নিশ্চয়ই মার্ক্সের প্রত্যাশার ভিতর ছিল না। কল্পসাম্যবাদীরা রেখে গিয়েছিলেন কিছু স্বপ্ন। মার্ক্সের মনেও একটা স্বপ্ন ছিল। সেখানে পৌঁছবার পথ তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, দেখাতে পারেননি।

মার্ক্সবাদীরা এরপরও বলবেন, শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কতন্ত্রের অধঃপতনের জন্য মার্ক্স দায়ী নন, মার্ক্সীয় চিন্তা দায়ী নন। এটা নেতৃত্বের দোষ। মার্ক্স একটা শ্রেণীর অধিনায়কতন্ত্র চেয়েছিলেন, দলের নয়, ব্যক্তির নয়। শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ ধনিককে সংহার করবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের জন্য রক্ষা করবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা, এইরকমই আশা ছিল মার্ক্সের। শ্রমিকশ্রেণীর নামে অল্পকিছু লোকের শাসন মার্ক্স চাননি। এইরকম কিছু কথা স্মরণীয়ভাবে উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন লেনিনের সমসাময়িক জার্মানির বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ। লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। কিন্তু লেনিন তাঁকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন।

শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ সম্পর্কে রোজা বলেছিলেন : "The dictatorship should be implemented by a class and not a leading minority acting on behalf of a class." তিনি আরো বলেছিলেন, "freedom only for the supporters of the Government, only for the members of one party...is no freedom. Freedom is always freedom for dissenters." স্বাধীনতা থাকবে শুধু সরকারের সমর্থকদের জন্য, একটা বিশেষ দলের লোকের জন্য, এটা কোনো স্বাধীনতাই নয়। শ্রমিকশ্রেণীর নামে এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নেতৃত্ব মার্ক্সবাদের পথ নয়।

লেনিনের সঙ্গে রোজার ঐ বিতর্কে স্বভাবতই আমাদের সহানুভূতি যাবে শ্রদ্ধেয়া জার্মান নেত্রীর দিকে। তবু স্বীকার করতে হয় লেনিনের চিন্তাই ছিল বস্তুনিষ্ঠ, রোজার চিন্তা কল্পনাবিলাসী। বিপ্লবের পর লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ডিক্টেটরশিপ কি চালানো সম্ভব দলীয় সংগঠন ছাড়া? হিংসাত্মক বিপ্লবের পর উভয়শ্রেণী যখন উভয়শ্রেণীকে সংহার করতে সর্বভাবে সচেষ্ট তখন গৃহযুদ্ধই প্রত্যাশিত, অন্য কোনো প্রত্যাশা বাস্তব নয়। বিপ্লব যখন একটি দু'টি দেশেই সীমাবদ্ধ, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েনি, তখন যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ বহুদিন পর্যন্ত চলবে এইরকম অনুমানই বস্তুনিষ্ঠ। এই দীর্ঘ যুদ্ধকালীন অবস্থার ভিতর সরকারবিরোধী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে, এই আশা অবাস্তব। শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ যে একদলীয় সর্বগ্রাসী অধিনায়কতন্ত্রের রূপ নিয়েছিল, এতে আমরা দুঃখিত হতে পারি কিন্তু বিস্মিত হবার কারণ নেই। মার্ক্স ও মার্ক্সবাদীরা যদি অন্য কোনো পরিণাম আশা করে থাকেন তো সেই দুরাশাকে "বৈজ্ঞানিক" বলা যাবে না।

কম্যুনিস্ট শাসনের অধঃপতনের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে মুখ্যত দায়ী করা ভুল। ব্যক্তির একটা ভূমিকা আছে ঠিকই, অন্তত মার্ক্স সেটাকে বড় করে দেখতেন না। ভিত্তি ও সৌধের পার্থক্য টেনে যাঁরা বলেন যে, কম্যুনিস্ট সমাজের ভিত্তিটা ভালো, দোষ সৌধে, তাঁদের সেই বিচারও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কম্যুনিস্ট অধিনায়কতন্ত্র ভিত্তি ও সৌধে মিলে একটি সমগ্র জিনিস, যদি পরিবর্তন প্রয়োজন হয়, তবে সেটা সর্বত্র প্রসারিত হবে। গর্বাচভ সংশোধনের পথে পা বাড়িয়েছেন, বিশ্বাসী মার্ক্সবাদীর পক্ষে তিনি বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

রুশবিপ্লবের পর থেকেই একটা কথা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় পদ্ধতি কিছুটা বৈজ্ঞানিক, মার্ক্সের চিন্তা এখানে মূল্যবান। কিন্তু কম্যুনিস্ট

দুনিয়ার ঘটনাপ্রবাহ মার্ক্সবাদীরা বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিতে বিচার করতে গুরুতর অক্ষমতা দেখিয়েছেন, এইখানে তাঁরা কল্পনাবিলাসী। অভ্যস্ত মার্ক্সবাদী বিচারপদ্ধতিতে এই একটা অসম্পূর্ণতা ও আত্মখণ্ডন আছে। এই আত্মখণ্ডনই বিশ্বাসীর মনে বেশ একটা রহস্যময় উন্মাদনা এনে দেয়। এ থেকে মার্ক্সবাদকে মুক্ত করতে গেলে বিশ্বাসের ভিত্তিটাই টলে যাবে, মুক্ত না করলে মার্ক্সীয় বিচারের ভিতর একটা গুরুতর ত্রুটি থেকেই যাবে।

৪

বিশেষ কোনো জাতি অথবা শ্রেণীতে সর্বপ্রকার দোষ অথবা গুণ কল্পনা করা ভুল।

মানুষ জীবটি যেমন আশ্চর্য তেমনি জটিল। মানুষের মতো হিংস্র ও নির্দয় জীব আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। এই হিংস্রতা কোনো এক বিশেষ সমাজব্যবস্থা থেকে এসেছে এমন নয়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে নির্দয় প্রকৃতির ভিতর নখেদন্তে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী পশুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মানুষকে বাঁচতে হয়েছে, সেই যুগযুগান্তব্যাপী দানবীয় ইতিহাসের এক সঞ্চিত হিংস্রতা সব মানুষের রক্তে মিশে আছে। আবার মানুষের ভিতর কল্পনা, জিজ্ঞাসা ও আত্মত্যাগের যেমন শক্তি আছে, অন্য কোনো জীবের ভিতর নিঃসন্দেহে তেমন নেই। এই সব গুণও আদিম সাম্যবাদ বা ঐরকম কোনো বিশেষ যুগের সৃষ্টি নয়। দীর্ঘ ইতিহাসের ধারায়, খ্যাত ও অখ্যাত বহু সাধকের সাধনায়, এই সব গুণ লালিত।

জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সময় যেমন আমরা স্বজাতিতে সব গুণ আর বিজাতিতে সব দোষ কল্পনা করি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বেও তেমনি শ্রমিক শ্রেণীতে সমস্ত গুণ আর ধনিক শ্রেণীতে সমস্ত দোষ আরোপ করার ঝোঁক আছে। বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও পরিস্থিতি বিশেষ বিশেষ দোষগুণকে বাড়িয়ে তোলে এ কথা স্বীকার করে নেবার পরও মনে রাখা ভালো যে, মানুষের হিংস্রতা অথবা করুণা নিতান্ত শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য নয়। জার্মান অথবা জাপানী শ্রমিক স্বভাবতই ছিল যুদ্ধবিরোধী, ধনিকের অপপ্রচারের ফলে সে যুদ্ধে আকৃষ্ট হল, এই রকমের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিছু দুর্বলতাকে মানুষী দুর্বলতা, মহত্ত্বকে মানবিক মহত্ত্ব, বলে চিনে নেওয়াই ঠিক। জাতি অথবা শ্রেণীর মতো একটা সমষ্টিকে নিয়ে উত্তেজনা ও বিদ্বেষ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন সেটা মানুষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকেই বিপন্ন করে। সতর্কভাবে বিদ্বেষমুক্ত কিছু মানবিক মূল্যবোধই শেষ অবধি আমাদের পথ দেখাতে পারে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে যে সব অন্যায়, অবিচার ও বীভৎসতা আছে তার সঙ্গে আমরা দীর্ঘকাল থেকেই পরিচিত। ধনতন্ত্রের এমন একটা কল্পিত রূপ কেউ কেউ তুলে ধরেছেন যেখানে এই সব দোষ প্রায় অনুপস্থিত। আমরা জানি যে, সেটা ধনতন্ত্রের বাস্তব চেহারা নয়।

কম্যুনিস্ট সমাজে যেসব অন্যায়, অবিচার ও বীভৎসতা আছে তার সঙ্গে আমাদের ভিতর অনেকেই দীর্ঘকাল পরিচিত ছিলেন না। কম্যুনিস্ট সমাজের একটা কল্পিত ছবি অনেকে তুলে ধরেছেন। আমরা এখন জানি যে, সেটা বাস্তব ছবি নয়।

সাম্যবাদীরা বলেন, অধঃপতিত সাম্যবাদী সমাজও ধনতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে ভালো। এ নিয়ে তর্ক হয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, কয়েকটি সাধারণ তথ্য মনে রাখা ভালো।

কম্যুনিস্টশাসন থেকে পূর্ব ইউরোপ বেরিয়ে আসতে চাইছে বটে, কিন্তু কোনো প্রাচীন ধনতন্ত্রে তারা ফিরে যেতে চাইছে না। পশ্চিম ইউরোপে দীর্ঘ সমাজবাদী ও শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ধনতন্ত্রের অনেকটা চরিত্রগত পরিবর্তন হয়েছে। যদিও ব্যক্তিগত মালিকানা সেখানে আছে তবু বলিষ্ঠ শ্রমিক সংগঠনের ফলে মালিক ও শিল্পপতি আজ আর নিরঙ্কুশ শাসন চালিয়ে যেতে পারেন না, সংঘবদ্ধ শ্রমিকের ইচ্ছাটাও কমবেশি প্রভাবশালী। তা ছাড়া, সমস্ত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই আজ দুর্বল ও দরিদ্রের প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের কিছু বিশেষ দায়দায়িত্বের কথা স্বীকৃত। ত্রুটিহীন না হলেও এই সামাজিক সুরক্ষার নীতি উপেক্ষণীয় নয়। আরো মনে রাখতে হবে যে, ধনতান্ত্রিক দেশেও কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশিই সরকারী ও সামবায়িক প্রতিষ্ঠান অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে।

পূর্ব ইউরোপ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজার ব্যবস্থার দিকে ক্রমে ঝুঁকছে। কিন্তু বাজারব্যবস্থা বলতেই ব্যক্তিগত মালিকানার একচ্ছত্র রাজত্ব বোঝায় না। ব্যক্তিগত, সামবায়িক ও রাষ্ট্রীয় নানারকমের প্রতিষ্ঠানেরই সহাবস্থান সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ব্যবস্থার সীমানার মধ্যেই। তা ছাড়া, কিছু কিছু সমাজসেবাকে বাজারব্যবস্থার বাইরে রাখার প্রয়োজনও পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা স্বীকার করে নিয়েছেন। ধনতন্ত্রের দিকে নয়, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এক মিশ্র ব্যবস্থার দিকে আজ পূর্ব ইউরোপের ঝোঁক।

এই মিশ্র ব্যবস্থার সঙ্গেই গত সত্তর বছরের পরীক্ষিত কম্যুনিস্ট সমাজের তুলনা চলছে। কোনো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিকরাই কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় যেতে চাইছেন না। কম্যুনিস্ট সমাজে লালিতপালিত হবার পরও কিন্তু ঐ সব দেশের মানুষেরা আজ মিশ্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকেই যেতে চাইছেন। এরপরও অবশ্য সমস্যা আছে। এমন হতে পারে যে, কম্যুনিস্ট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ঝোঁকে কোনো দেশ বা কিছু লোক অন্য এক স্বৈরতন্ত্রের দিকে ঝুঁকবে। তবু আশা রাখতে হবে যে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার সতর্কতাও ঐ সব দেশের ভিতর থেকেই আসবে।

অনেকে বলছেন, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বিলাসদ্রব্যের যে প্রচলন হয়েছে, যে-ভোগবাদী সংস্কৃতি বেড়ে উঠেছে, তারই আকর্ষণে কম্যুনিস্ট দেশের নতুন প্রজন্ম পশ্চিমী সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এখানে দুটি কথা ভেবে দেখতে হবে। প্রথম কথা, পূর্ব ইউরোপের সব দেশ সমান গরীব নয়, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলনায় চেকোস্লোভাকিয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় আছে। তবুও ঐ দেশের মানুষ কম্যুনিস্ট শাসন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এটা শুধু ভোগ্যবস্তুর আকর্ষণে নয়। পূর্ব ইউরোপের মানুষের কাছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতারও একটা বিশেষ মূল্য আছে। কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অভাবই ঐ ব্যবস্থাকে অসহনীয় করে তুলেছে। এবার দ্বিতীয় কথায় আসা যাক। ভোগবাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, নতুন প্রজন্মে এটা আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে বটে। এটা চিন্তিত হবার মতো একটা সমস্যা ঠিকই। কিন্তু নতুন প্রজন্মকে শুধু দমননীতি দিয়ে কম্যুনিস্ট সমাজে আটকে রেখেই তো সমস্যার সমাধান হবে না। শেষ পর্যন্ত নতুন প্রজন্মকেও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই শিক্ষালাভ করতে হবে। ভুল করবার, ভুলের ভিতর দিয়ে ভালোমন্দ চিনে নেবার, স্বাধীনতা তাদের চাই। প্রতি প্রজন্ম এইভাবেই এগিয়ে যায়। তিয়েনআনমেন চত্বরের সংহারনীতি যুগের পরিবর্তনকে নিষ্ঠুরভাবে বিলম্বিত করে মাত্র।

তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিজীবীদের মুখে পশ্চিমের বিরুদ্ধে অন্য এক উদ্বিগ্ন অভিযোগ

সর্বক্ষণই শোনা যায়। পশ্চিমী ধনতন্ত্রই তো আমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী, ওদের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক শত্রুতা। এই আক্রোশ ও বিলাপ কিন্তু নিষ্ফল, এতে আমাদের আত্মশক্তি আরো দুর্বল হয়। যারা এগিয়ে যাবার তারা পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়ায়, তারপর এগিয়ে যায়। আত্মনির্ভরতার বিকল্প নেই। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজেদের ভিতর সহযোগিতা বাড়াতে হবে, জাগতিক পরিস্থিতি ও ইতিহাসের গতি বুঝেসুজে পথ তৈরি করতে হবে। আজকের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বেরও কিন্তু দেবার আছে কিছু, যেটা পূর্ণ হবে না অনুকরণপ্রিয়তায় বা বিদ্বেষে।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে-সমন্বয়ের দিকে সারা পৃথিবী আজ পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাই কি মানুষের আদর্শ সমাজ ? এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সর্বকালের আদর্শ সমাজ সেটা নয়। এমন কিছু সমস্যা এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যাতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সব মানুষই চিন্তিত। অন্য কোনো পথের অন্বেষণ শেষ অবধি করতেই হবে। সেই অন্য পথ ও অন্য সমাজ, আমাদের পরিচিত ধনতন্ত্রও নয়, পরিচিত সমাজতন্ত্রও নয়, এ দু'য়ের যোগফলে গঠিত কোনো সমাজই নয়। কেন এ কথা বলছি, সংক্ষেপে হলেও তার একটু ব্যাখ্যা দরকার।

মালিকানা ব্যবস্থার সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও আজকের ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজের ভিতর উল্লেখযোগ্য মিল আছে। দুয়েরই লক্ষ্য শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পের প্রাধান্য স্থাপন। প্রযুক্তি ও শিল্পসংগঠনের দিক থেকে আজকের আমেরিকার ও সোভিয়েত দেশের ভিতর পার্থক্য ততটা নেই যতটা পার্থক্য আছে দু'শো বছর আগের আমেরিকার সঙ্গে আজকের আমেরিকার। আর এই থেকেই কিছু মৌল প্রশ্ন ও সমস্যা উঠে আসে।

যে-প্রযুক্তিকে আমরা আজ প্রাগ্রসর প্রযুক্তি বলছি, ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বহু দেশ যে-দিকে সমভাবে এগিয়ে যেতে চাইছে, সারা পৃথিবী জুড়ে সেই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কিন্তু এক ভয়ঙ্কর সঙ্কট দেখা দেবে। ইতিমধ্যেই পরিবেশদূষণ সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিবেশদূষণের কোনো বিশেষ তন্ত্র নেই, দেশ নেই। চের্নোবিলের দুর্ঘটনা সোভিয়েত দেশে না হয়ে মার্কিন দেশেও ঘটতে পারত। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার কোনো ভৌগোলিক পরিধি নেই। অন্য যে-সব জ্বালানি থেকে আধুনিক শিল্প ক্রমবর্ধমান পরিমাণে শক্তি সংগ্রহ করছে তা থেকেও জাগতিক পরিবেশ ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে। রাসায়নিক সারের ওপর অতিনির্ভরশীল আধুনিক কৃষিও একই পরিণামের দিকে পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে।

অতিকেন্দ্রিকতার সমস্যার কথা আমরা আগেই বলেছি। সাম্যবাদী দেশের রাজনীতি এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ধনতান্ত্রিক দেশেও কিন্তু সমস্যাটা আছে। আসলে অতিকেন্দ্রীয়তার দিকে একটা ঝোঁক আধুনিক শিল্পের ভিতরই আছে। বাজারের অর্থনীতি এই ঝোঁককে আটকাতে পারে না। বাজার একদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ায় আবার অন্যদিকে সারা পৃথিবীব্যাপী আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রীয়তাকেও বাড়িয়ে তোলে।

ভোগবাদ বিষয়েও একই কথা। ভোগবাদ একদিন ছোট এক অভিজাত শ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। আজ ভোগবাদী আকাঙ্ক্ষা সব দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এটা শুধু শিল্পের মালিকানার প্রশ্ন নয়। আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তি মানুষকে দিয়েছে জড় প্রকৃতির ওপর আধিপত্য, প্রকৃতিকে দাস হিসেবে দেখবার মানসিকতা। এই প্রভুত্বই আবার তাকে ভোগবাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, সুখ কাকে বলে এ বিষয়ে মানুষের ধারণাটাকেই পালটে দিচ্ছে। সব কিছুকেই আমরা সুখের উপকরণ হিসেবে দেখবার দিকে ঝুঁকছি। আর এরই

ফলে ভিতরে ভিতরে আমরা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছি। সবই যদি উপকরণ হয় তবে কিছুর সঙ্গেই, কারো সঙ্গেই, অভেদ বা একাত্মতা অনুভব করা যায় না।

কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন কোন সমস্যায় তিনি সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ? তিনি বলেন, যে-হারে দেশের ভিতর মাদকদ্রব্য প্রবেশ করছে তাতেই তিনি সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মাদকতার প্রকোপও আজ কোনো বিশেষ দেশে বা সমাজ ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ নেই। সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশে, ধনতান্ত্রিক মার্কিন, আর আমাদের মতো তৃতীয় দুনিয়ার সীমানার ভিতরও নেশাগ্রস্ততা আজ গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

এই ক'টি উদাহরণই যথেষ্ট। আজকের ধনতন্ত্র আর আজকের সমাজতন্ত্রকে মেলাতে পারলেই সব সমস্যার সমাধানে গিয়ে আমরা পৌঁছতে পারব এমন নয়। বাজারের তত্ত্ব যথেষ্ট নয়, শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বও নয়, যদিও দুই তত্ত্বেরই একটা সীমার ভিতর কিছু সদর্থ হয়।

বাণিজ্যকে আশ্রয় করেই মধ্যযুগের সীমানা ভেঙে আধুনিক মানুষ পৃথিবীময় যোগাযোগের পথ তৈরি করেছিল। বাজার একই সঙ্গে দুনিয়াটাকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, আবার বিভক্ত করেছে ; পুরনো সংস্কার থেকে মুক্ত করেছে, আবার নতুন প্রলোভনে আবদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্ত্য উদারনীতির শ্রেষ্ঠ ভাগ একদিন উনিশ শতকের কিছু শ্রেষ্ঠ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তাকে অবজ্ঞা করে এগোতে গেলে মানুষের সাধনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এমন কি গভীরতর বিপত্তির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঐখানেই যাত্রা শেষ এমন কথা কিছুতেই গ্রাহ্য করা যায় না। মার্কিন দেশ থেকে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা কিছুদিন আগে এক নিবন্ধে বলেছেন, পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদের পরাজয় আর উদারনীতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ইতিহাস এক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমন লোমহর্ষক উক্তি, মানুষের সভ্যতার গভীরতর সমস্যা সম্বন্ধে বোধের এমন প্রচণ্ড অভাব, আমাদের স্তম্ভিত করে।

শ্রেণীসংগ্রামের নবদর্শন শ্রমিককে তাঁর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে, এই অবদান তুচ্ছ করবার মতো নয়। তবু প্রাগ্রসর প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল সভ্যতার যেসব সমস্যার কথা একটু আগেই বলা হল, শ্রেণীভিত্তিক চিন্তার ভিতর তাদের আঁটবার চেষ্টা করা ভুল। ক্ষমতার অতিকেন্দ্রিকতা, পরিবেশদূষণের ভয়াবহ প্রসার অথবা আধুনিক মানুষের আত্মার যন্ত্রণা, এইসবের উত্তরে স্বাধীনতা আর মানুষের স্বধর্ম, সমাজে ব্যক্তির স্থান আর বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক, এই সব নিয়ে এমন কিছু চিন্তার প্রয়োজন যেটা যথার্থই এক নতুন যুগের চিন্তা। সভ্যতার এমন এক সঙ্কট ক্রমে গভীর হয়ে উঠেছে যার সামনে সর্বমানুষের স্বার্থের ঐক্যের কথাটাই বড়। মানুষী মূঢ়তা ও মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি কোনো বিশেষ শ্রেণীর ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে না, মানুষই মূল।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যে সমন্বয়ের চিন্তা আজ দেখা দিয়েছে এই পর্বে তার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। তবেই আমরা আগামী যুগের সেই সার্থক সমাজে পৌঁছতে পারব যার ভিত্তিতে থাকবে অহিংসা, বিকেন্দ্রীকরণ, প্রকৃতিপ্রেম, মানবতাবোধ।

সেই সমাজ হঠাৎ বিশ্বজয়ীর বেশে আসবে না। এখনো অন্য শক্তি প্রবল। তবু এরই ভিতর মানুষের মনে আর ছোট ছোট মরূদ্যানে নতুন সমাজের পায়ের চিহ্ন আঁকা হয়ে যাবে। পরস্পর স্বল্পপরিচিত, বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে পথ

তৈরি হচ্ছে নতুন মানবসমাজের। নানাদিক থেকে ভাবনাচিন্তা একই পথে এসে মিশেছে। অথবা হয় তো এক পথ নয়, একই দিশার নানাপথ। উপায়ের বিচারে মার্ক্সের সঙ্গে যোগ নেই, তবু উদ্দেশ্যের বিচারে হয় তো মিল আছে। মিল আছে কিছু কল্পসাম্যবাদীর সঙ্গেও।

সেই কল্পনার সমাজ এখনো দূরে। তবু তাকে ভুলে থাকা ভুল। মানুষের সভ্যতাকে শেষ অবধি ঐদিকে যেতেই হবে, নয় তো সংকট বেড়েই চলবে।

ঐক্য ও শান্তি

বহু জাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিয়ে মানুষের বৃহৎ সমাজ। এদের ভিতর সহযোগ ও সংঘর্ষ একই সঙ্গে চলছে প্রাচীন কাল থেকেই। শুধু সংঘর্ষের কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য বলা হয় না, আবার শুধু সহযোগের কথা বললেও সবটা বলা হয় না। আসলে সহযোগ ও সংঘর্ষ মিলেই একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, মানুষের সমাজ ও ইতিহাসের সঙ্গে যেটা মিশে আছে ওতপ্রোতভাবে।

আমরা ভিতরের অথবা বাইরের দিকে যতদূরই যাই না কেন, এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা থেকেই যায়। যদি বলি জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়বিশেষের অভ্যন্তরে আছে একতা, আর দুই জাতি, দুই সম্প্রদায়ের ভিতর চলে পারস্পরিক সংঘর্ষ, তবে আবারও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রতিটি জাতি, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও আছে একই সঙ্গে সংঘর্ষ ও সহযোগ। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা আমাদের পরিচিত সংসারে অন্তর্ব্যাপ্ত ও সর্বত্র প্রসারিত। এর পরও কেউ প্রশ্ন করেন, কোনটা প্রধান ? সংঘর্ষ না সহযোগ ? একদিক থেকে দেখতে গেলে এ প্রশ্নের কোনও উত্তর হয় না। শুধু সহযোগের উপর ভিত্তি করে একটা আদর্শ সমাজের কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সমাজ বস্তুটা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এই পরিবর্তনকে দ্বান্দ্বিকতা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও অবশ্য বিষয়টা দেখা সম্ভব. সে কথা পরে বলব।

দ্বন্দ্বে বিধৃত যে সংঘর্ষ-সহযোগের কথা এইমাত্র বলা হল তার একটা সাধারণ বাস্তব ভিত্তি আছে, যেটা বোঝা যায় সহজেই। ধনলাভের দুটি উপায়, এক হল অন্যের কাছ থেকেআকাঙ্ক্ষার বস্তু কেড়ে নেওয়া আর দ্বিতীয় উপায় ধনোৎপাদন করা। সন্তান থেকে শুরু করে সব রকমের ধনোৎপাদনের জন্যই শেষ অবধি কোনো না কোনো প্রকারের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। কেড়ে নেওয়ার পদ্ধতির নানা বৈচিত্র্য আছে, সহযোগিতারও। বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়ে সংঘর্ষ ও সহযোগের ধরনটা কীভাবে বদলে চলে, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানে সেটা আমরা জানবার চেষ্টা করি।

উৎপাদন না হলে কেড়ে নেবার মতো বিশেষ কিছু থাকে না। সেই অর্থে উৎপাদনকে প্রাথমিকতা দেওয়া অসঙ্গত নয়। যারা সমাজের শাসনকর্তা তাদেরও এই কথাটা মেনে নিতে হয়, শুধু লুণ্ঠতরাজের ওপর সমাজকে বেশিদিন রক্ষা করা যায় না।

আরও একটা গভীর অর্থে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষেরা তাঁদের বিশ্ববীক্ষায়

ঐক্য ও সহযোগকে সংঘর্ষের চেয়ে বড় সত্য বলে স্থান দিয়েছেন। এঁদের চিন্তায় একটা নিছক দূরের আদর্শের কথা বলা হয়নি, বরং তার ভিতর একটা নিত্যসত্যও আছে। এঁরা বলছেন, হিংসাই যদি প্রধান হত, সহযোগের চেয়ে যদি সংঘর্ষের শক্তি বড় হত, তবে মানুষের সমাজ এতদিনে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ত। যেমন পরিবারের ভিতর কলহই যখন প্রধান হয়ে ওঠে তখন সেই পরিবার ভেঙে পড়ে, বৃহত্তর সমাজেও তেমনি একটা কার্যকর ঐক্যের ভাবনা আবশ্যক। সংঘর্ষটা চোখে পড়ে বেশি, ঐক্য প্রায়শ নিঃশব্দে চলে, তবু সেটা সত্য। হিংসা ও কলহের চিন্তা যখন আমাদের চেতনাকে অধিকার করে বসে তখন অবশ্য বৃহত্তর ঐক্যের ভাবনাকে আমরা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করি, কিন্তু পরিবার ও সমাজ একেবারে ভেঙে পড়লে এমন কোনও জায়গা খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয় যেখানে দাঁড়িয়ে কলহ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

কোনও দূর ভবিষ্যতের জন্য নয়, এই বহতা কালেই, সংঘর্ষের পাশাপাশি সহযোগ ও সহাবস্থানের চিন্তা মানুষের পক্ষে জরুরী। আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে একথাটা নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের স্বদেশচিন্তা ও ইতিহাসবীক্ষাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী একটা বিশেষ মূল্য লাভ করেছে। পৃথিবীময় এই ভাবনায় ভারতভাবনার একটা বিশেষ স্থান আছে।

২

উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে সাগরে বেষ্টিত এই যে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ, এখানে প্রাচীনকাল থেকেই বহুজাতি ও ভাষা, বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিতর স্থায়ী সহাবস্থানের সূত্রের অন্বেষণ চলেছে। এদেশের ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে এই অন্বেষণের যোগ আছে। হিমালয় অতিক্রম করে, বিশেষত উত্তরপশ্চিমের গিরিবর্ত্ম ধরে, একে একে বহু জাতি ভারতের সমভূমিতে এসে পৌঁচেছে। সমুদ্র অতিক্রম করেও নানা ধর্মের নানা মানুষ এদেশে এসেছে। এইভাবে প্রাচীনকাল থেকে যারা একের পর এক এই উপমহাদেশে প্রবেশ করেছে তাদের অনেকেই আর ফিরে যায়নি, কয়েকটি প্রজন্মের ভিতরই এইসব বিচিত্র জাতিভাষাধর্মের মানুষেরা এদেশেরই সন্তান হয়ে উঠেছে। এদের সবাইকে নিয়েই এদেশের বৃহৎ ও বহুত্বে চিহ্নিত সমাজ।

বহুত্বের ভিতর ঐক্য রক্ষার একটা সহজ উপায় প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ এদেশে নিজ নিজ আচারের বিভিন্নতা নিয়ে পাশাপাশি বাস করেছে। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে রাজা ও সম্রাট পর্যন্ত সবাই এই বিভিন্নতাকে মান্য করে চলেছে। গড়ে উঠেছে স্থানীয় ও জাতিভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন। রাজভাষা বা পণ্ডিতদের ভাষা যদিও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছে তবুও প্রাকৃত ভাষাও সংস্কৃতের দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন হয়নি। অধ্যাত্ম ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে নানা মতবাদ, ঈশ্বর অথবা মুক্তি সাধনার নানা পথ, সেকালে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কোনও একটি সত্যধর্ম অন্য সব ধর্মকে গ্রাস করে নেয়নি।

একথাটা অবশ্য সবাই মেনে নেবেন না। আপত্তি তুলবার মতো কিছু সঙ্গত যুক্তিও আছে। প্রাচীন সমাজে ব্রাহ্মণের একটা বিশেষ স্থান ছিল। সেই আধিপত্যের আসনের ওপর আক্রমণ ব্রাহ্মণের কাছে সহনীয় ছিল না। যজমানি ব্যবস্থা ও পুরোহিতের কিছু বিশেষ অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেত না, অন্তত সাধারণ সংসারী মানুষের জন্য প্রাচীন

হিন্দু সমাজে এই ছিল কঠোর বিধান।

তবুও একথা স্বীকার্য যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বা সত্যাসত্যের বিচারে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভাবনায় এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায় যাতে ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে বহুত্বের মূল্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ভালোমন্দ দু'রকমের কথাই শোনা গেছে, কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। বিষয়টা সামান্য ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

মনুষ্যজাতির ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনের একটা ছক বিশেষত পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় পাওয়া যায়। মানুষ কোনও এককালে গাছপাথর কত কিছুতেই অতিপ্রাকৃত শক্তি আরোপ করতে অভ্যস্ত ছিল, তার ধর্মে ছিল জাদুবিদ্যার প্রাধান্য। এককালে বহু দেবদেবীর পুজো ধর্মবোধের অঙ্গ ছিল, তার প্রচলন বহুবিস্তৃত ছিল। একেশ্বরবাদ ধর্মচেতনার এক উচ্চতর স্তর। ইহুদী ঐতিহ্যে এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অপেক্ষাকৃত ভ্রান্ত ধারণাকে খারিজ করেই অপেক্ষাকৃত নির্ভুল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মীয় চেতনার বিবর্তনে এইরকম হওয়াটা ন্যায়সঙ্গত। একেশ্বরবাদের সত্যে যারা পৌঁচেছে তাদের কর্তব্য হল বহু দেবদেবীর পুজো বর্জন করা। ঈশ্বর বা আল্লাহ্ এক, সত্য এক, বহু মিথ্যা অথবা অর্ধসত্যকে পরাস্ত করেই এই সত্যকে জয়ী হতে হবে।

হিন্দুদের ভাবনাচিন্তা এইরকমের ছিল না। এখানে প্রাচীন ও নবীন অকাতরে পাশাপাশি বাস করেছে। বহু দেবদেবীর পুজোর পাশেই একেশ্বরবাদ স্থান করে নিয়েছে। আবার একেশ্বরবাদকেও অতিক্রম করে প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হয়েছে। মুক্তি বা নির্বাণের পথের অন্বেষণটাই প্রধান কথা। আধ্যাত্মিক সত্য নানা মানুষের কাছে নানা ভাবে আসে, সম্পূর্ণ রূপে সেই সত্য অনির্বচনীয়। যা প্রকাশ করা যায় তা হয় তো আংশিক সত্য। এদেশে তর্কের অভাব ছিল না। কিন্তু বহুরূপে সত্যের প্রকাশ সম্ভব এইরকম চিন্তা, অনেকান্তবাদী সম্ভাবনার ধারণা, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের ঐতিহ্যে স্থান পেয়েছিল।

এইভাবে নানা বিচিত্র আচার ও বিচারকে একই সঙ্গে গ্রহণ করে ভারতীয় ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। এগারো শতকে মহাপণ্ডিত আল বেরুনী যখন এদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন তখন এই জিনিসটা তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ করেন। তিনি বলেন, এদেশের জ্যোতির্বিদ্যায় ও অন্যান্য চিন্তায় মুড়িমুড়কি এক হয়ে যায়, "মল ও মণিমুক্তো" মিলে মিশে থাকে। এরা বিশ্বাস করে যে, রাহু চন্দ্রসূর্যকে গিলে খায়, অথচ গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও এদের অজানা নয়। "এদের চোখে দুইই সমান মান্য।" ("I can only compare their mathematical and astronomical literature, as far as I know it, to a mixture of pearl shells and sour dates, or pearls and dung.....Both kinds of thing are equal in their eyes.")

সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে বলা যায়, ভারতীয় ঐতিহ্যে কুসংস্কার ত্যাগ করবার শক্তি দুর্বল। আবার প্রশংসার ভাষায় বলা চলে, আমাদের ঐতিহ্যে বহু মত ও পথকে একই সঙ্গে মান্যতা দেবার সহিষ্ণুতা বেশি। যাই বলি না কেন, ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের এই এক বৈশিষ্ট্য। এদেশের ইতিহাসে, বিশেষত সাধারণ জীবনের স্তরে, ধারাবাহিকতা বেশি, ছেদ কম। এদেশের ঐতিহ্য বহু বিচিত্রকে গ্রহণ করতে করতে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে চলেছে, দীর্ঘ যাত্রাপথে ভারতের সমাজ ও চেতনা অপরিবর্তিত থাকেনি, তবু প্রাচীনকে বর্জন করেনি। ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে লড়াই এদেশেও চলেছে, তবু ভারতের বৈশিষ্ট্য সেখানেও তার চিহ্ন রেখে গেছে।

৩

"ভালো" "মন্দ", সত্যাসত্য, সব কিছুকে সমদৃষ্টিতে দেখবার যে-প্রবণতা আল বেরুনী ভারতীয়দের ভিতর লক্ষ করেছিলেন সেটাকে তাঁর সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি, বরং এদেশীয় বিচারবিমূঢ়তাই সেখানে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইহুদী ঐতিহ্য ইসলামেরও জনক, অন্তত এ-দুয়ের মধ্যে একটা অনস্বীকার্য যোগসূত্র আছে। ভ্রান্তধর্মকে উৎপাটিত করে সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠাকে এই ঐতিহ্যে কর্তব্য বলে মনে করা হয়েছে। একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রচারকে ইসলাম একদিন তার ঐতিহাসিক কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছিল। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর প্রথম একশ' বছরের ভিতর সেই নতুন ধর্মের বিজয় অভিযান ছিল এমনই নাটকীয়, পশ্চিম এশিয়া থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা অতিক্রম করে ইউরোপ অবধি তার বিস্তৃতি ঘটেছিল এমনই দ্রুতগতিতে, যে, সারা দুনিয়ায় এই ধর্ম অচিরেই শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে এইরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হওয়া সেদিন অস্বাভাবিক ছিল না। যতদিনে ভারতের অভ্যন্তরে ইসলাম স্থায়ী রাজশক্তির রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ততদিনে অবশ্য তার আদিপর্বের তেজ কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবু ভারতের ইতিহাসে ইসলামের আবির্ভাব যে একটা নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধর্মীয় বহুত্বকে রক্ষা করবার কোনও প্রতিজ্ঞা নিয়ে ইসলাম এদেশে প্রবেশ করেনি। তবু কালক্রমে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে মোহাম্মদের সংগ্রামী ধর্মকে একটা রফা করতে হল। এব্যাপারে পারস্য আর ভারতের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করবার মতো। প্রাচীন আর্যধর্মের সুবাদে ভারতের সঙ্গে পারস্যের কোনও এককালে মিল ছিল। সেই অগ্নিপূজকদের দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও একদিন গিয়ে পৌঁচেছিল। ইসলামের আগমন ইতিহাসের পরবর্তী যুগে। মোহাম্মদের ধর্মেরও অবশ্য কিছুটা রূপান্তর ঘটেছে, ইরানের ধর্ম আর আরবদেশের ধর্ম একবস্তু নয়। তবু ইসলাম পারস্যে দেশজোড়া আসন লাভ করেছে, ওদেশের প্রাচীন ধর্ম কার্যত লোপ পেয়েছে। ভারতে এইরকম ঘটেনি। কয়েক শতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসনের পরও এই দেশটা বহুধর্মের দেশই থেকে গেছে, ইসলাম ভারতে অধিকাংশের ধর্ম হয়ে ওঠেনি।

এথেকেই কিছু প্রশ্ন ওঠে। ইসলাম ভারতের অন্যতম ধর্ম। শুধু কি অস্ত্রবলে এই ধর্ম এদেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুসলমান শাসকেরা তো দীর্ঘকাল ধরেই এদেশে রাজত্ব করেছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ তবে অ-মুসলমান থেকে গেল কীভাবে? দিল্লীর নিকটবর্তী যেসব অঞ্চলে মুসলমান শাসন সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানেও তো সবাই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়নি। অযোধ্যাতেও একসময় মুসলমান শাসক ছিল। সারা উত্তরভারতেই পাওয়া যাবে সংখ্যাধিক হিন্দুধর্মীর সঙ্গে মুসলমান শাসকের দীর্ঘ সহাবস্থান।

পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যায় অধিক। এখানে ধর্মান্তরগ্রহণের নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা আছে। নীচুজাতের হিন্দুরাই অধিক সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হয়। ওখানকার জমিদারেরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু, প্রজাদের ভিতর মুসলমানই বেশি। মুসলমান নবাব কিছু ছিল বটে, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান দরিদ্রই থেকে গেছে। নিতান্ত অস্ত্রের শক্তিতে অথবা অর্থের লোভে হিন্দুদের মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল এই ব্যাখ্যা দাঁড়ায় না। হিন্দুধর্মের ভিতরই এমন কিছু দুর্বলতা ছিল যেটাকে বাদ দিয়ে মুসলমানধর্মের প্রভাব ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশ স্বাধীন হবার পরেও আমাদের চোখের সামনেই অস্পৃশ্য ও নীচুজাতের হিন্দুরা

অপমানজনক সামাজিক অসাম্যের প্রতিবাদে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে। শিখধর্মেরও এইরকম একটা আকর্ষণ স্বীকার করতে হয়। এদেশে সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সঙ্গে ধর্মান্তরগ্রহণের একটা যোগ আছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা একথাটা সহজে মানতে চায় না, তবু কথাটাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

তুর্কী ও মোগল যোদ্ধারা অসিবলে ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অনেকটাই জয় করে নিয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন হিন্দুসমাজের দুর্বলতা সত্ত্বেও তারা এদেশের সর্বত্র মুসলমানধর্মের প্রতিষ্ঠা করবার কোনও স্থায়ী ও চূড়ান্ত চেষ্টা করেনি। এর কিছুটা কারণ সহজেই বোঝা যায়।

যারা দেশ জয় করতে এসেছিল তারা সাম্রাজ্য স্থাপন ও দেশশাসন করতে চেয়েছে, নতুন অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থে স্থায়ী রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। ধর্মস্থাপন করা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, অনেকের কাছেই প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল না। জোরজুলুম করে সারাদেশে মোহাম্মদের ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এদেশে যুদ্ধবিবাদ ও অসন্তোষের আগুনকে বাড়িয়ে তোলা হবে, তাতে অর্থব্যয় যতটা বৃদ্ধি পাবে রাজস্ব ততটা বাড়বে না, সাম্রাজ্যে শান্তি ও স্থায়িত্ব আনবার পথ সেটা নয়। এইরকম একটা বোধ মুসলমান শাসকদের ভিতর কাজ করেছিল। ঔরঙ্গজেব যতটা গোঁড়া মুসলমান ছিলেন অন্যান্য মোগল সম্রাটেরা তেমন ছিলেন না। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, সদ্ভাব বজায় রাখা, এটাই তাঁদের কাছে অপেক্ষাকৃত জরুরী ছিল।

বহুত্বের বিনাশ নয়, বরং হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে একটা ধর্মীয় সমন্বয়ের চেষ্টা উল্লেখযোগ্য সেই যুগে। এর যে-প্রকাশ ঘটেছিল ভক্তি আন্দোলনের ভিতর তার কথা আমরা অনেকেই অল্পবেশি জানি। এদেশে এমন সুফী পীর ও সাধকের অভাব নেই যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের কাছে সমভাবে শ্রদ্ধেয়, এমন দরগা ও পুণ্যস্থানও অনেক আছে, যেখানে উভয় ধর্মের মানুষেরই ভিড় দেখা যায়। পারস্যের মরমিয়া কবি ও সাধকদের সঙ্গে এদেশের সাধকদের মিল অসাধারণ। সাম্রাজ্যের উত্থানপতন অতিক্রম করে এই বোধ মূল্যবান হয়ে আছে। এসবই ভারতের প্রবহমান ঐতিহ্যের অংশ হয়ে উঠেছে।

মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ইংরেজ শাসকেরা ধর্মে খ্রীষ্টান। বহুদেবদেবীর পুজোয় এদেরও বিশ্বাস নেই, পৌত্তলিকতাকে এরা ভ্রান্তধর্ম বলে মনে করে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে মিশনারিদের অক্লান্ত চেষ্টার কথা আমরা জানি। তবু খ্রীষ্টের ধর্মও ভারতের প্রধান ধর্ম হয়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ শাসকেরা এব্যাপারে একটা সতর্ক নীতি গ্রহণ করেছিল। এদের কাছেও ধর্মসংস্থাপনের চেয়ে রাজস্বসংগ্রহ ও সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই বেশি জরুরী মনে হয়েছে। বিশেষত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এদেশের আচারে হস্তক্ষেপ না করাটাই সাধারণভাবে বিদেশী শাসকদের রাষ্ট্রনীতি হয়ে উঠেছিল। এইভাবে ইংরেজ শাসনেও ভারত রয়ে গেছে বহুধর্মের বহু সম্প্রদায়ের বাসভূমি।

আধুনিক যুক্তিবাদী ভাবনাচিন্তা পশ্চিম থেকে এদেশে পৌঁছল। দেশের ভিতরও অবশ্য প্রাচীন যুক্তিধর্মী বিচারের একটা ধারা স্বীকার্য, যেমন হিন্দুদর্শনে তেমনি ইসলামে, তবে ভক্তিবাদ আর আচারসর্বস্বতাই ছিল অপেক্ষাকৃত প্রবল। এদেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনিবার্য দ্বন্দ্ব উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুক্তিবাদের একটা ঐক্যমুখী ঝোঁক আছে। রামমোহনের ধর্মবিচারে

তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তুলনামূলক ধর্মবিচারের ক্ষেত্রে তিনি একজন অগ্রণী পথিকৃৎ। তিনি বললেন, বিভিন্ন ধর্মের ভিতর যেখানে মিল, সেটাই তাদের সার, সত্যবস্তু। অসত্যের ভিতরই পরস্পর বিরোধ থাকে, সত্যে সত্যে বিরোধ নেই। রামমোহনের ধর্মসমন্বয় চিন্তার মূলে আছে এই ধারণা।

এই থেকে একটা প্রশ্ন এসে যায়। রামমোহন জানতেন বিভিন্ন ধর্মের আচারে অনুষ্ঠানে পার্থক্য আছে। তবে কি আচার অনুষ্ঠান মিথ্যা? ধর্মের সত্যবস্তুর সঙ্গে তার যোগ নেই? আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে কি ধর্ম সম্ভব, সেই ধর্মের কি সমাজে অবস্থান সম্ভব?

সত্যধর্ম ব্যক্তিকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে, বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে যুক্ত করে। ব্যক্তি নিজের ধর্মচেতনাকে প্রকাশ করতে গেলে কিন্তু একটা বিশেষ রূপের ভিতর দিয়েই সেই প্রকাশ ঘটে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এইরকম কিছু রূপে আশ্রিত। তারই ভিতর দিয়ে রূপকে অতিক্রম করে যাবার শক্তি ও আগ্রহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সেটা সত্যধর্মের সঙ্গে যুক্ত, তা নইলে সেটা মানুষকে বেঁধে ফেলে সংকীর্ণতার মধ্যে। সেই সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে মানুষের উচ্চতর ধর্ম বলে কিছুতেই মানা যায় না। উৎসব অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যে দোষ নেই, কিন্তু তাকে আশ্রয় করে আমাদের মন যখন খণ্ড খণ্ড সাম্প্রদায়িকতায় ও বিভেদকারী উত্তেজনায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখনই বিপদ।

তুলনীয় সিদ্ধান্ত আমরা খুঁজে পাই গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীসমাজ নিয়ে ভাবনায়। ধর্মের একটি শর্ত, মানুষের সেবা। কিন্তু সব মানুষকে তো আমরা নাগালের ভিতর পাচ্ছি না। যারা আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের স্বদেশবাসী, কাজ আরম্ভ করতে হবে তাদের নিয়েই। তাদের ভিতর দিয়ে সর্বমানবের কাছে পৌঁছনোটাই আমাদের উচ্চতর অভীপ্সা। আমরা বিশ্বের অভিমুখী হব কি না, এই আভিমুখ্যটাই প্রধান কথা। তা যদি হয় তবে বৈচিত্র্যও হয়ে ওঠে ঐক্যমুখী। তা নইলে দেখা দেয় বিনষ্টির সম্ভাবনা। সেই বিনষ্টি থেকে স্বদেশকে ও বৃহত্তর সমাজকে কী করে রক্ষা করা যায়, এই প্রশ্নের মুখোমুখি মানুষকে দাঁড়াতে হয়েছে বারবার।

স্বার্থপরতা ও সাম্প্রদায়িকতা বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ উন্মূল করা যায় না। এসবই সহনীয় কিন্তু একটা মাত্রার মধ্যে। মাত্রারক্ষা না হলে, আর যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার নিত্য নতুন উপায় উদ্‌ভাবন করতে না পারলে, কারও স্বার্থই শেষ অবধি রক্ষা পায় না। এইরকম একটা অবস্থার মুখোমুখি আমরা এসে দাঁড়িয়েছি আবারও। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই পুরনো চিন্তাকে নতুন রূপদানের সময় এসে গেছে। আর সেই সঙ্গে শান্তির প্রশ্ন আজ নানা কারণে সমস্ত শুভচিন্তক মানুষের মনোযোগের কেন্দ্রে এসে গেছে।

৪

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গকে রোধ করা গিয়েছিল। সেই সাফল্যই হয় তো একটা মোহসৃষ্টিতেও সহায়ক হয়েছিল। এদেশের অনেক জাতীয়তাবাদী মানুষের বিশ্বাস ছিল, ভারতের ঐক্য এমনই দৃঢ় যে তাকে আর ভাঙা যাবে না। ১৯৪৭ সালে কিন্তু দেশ বিভাগ রোধ করা গেল না। সেই মোহভঙ্গের তিক্ততা আমরা অনেকেই আজও অতিক্রম করতে পারিনি।

হিন্দুরা দেশবিভাগের জন্য সাধারণভাবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে দায়ী করে

থাকে। মুসলীম লীগ ও মহম্মদ আলী জিন্নাকে বিশেষভাবে দোষী মনে করা হয়েছে। অধিকাংশ মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক ভাবেই ভিন্ন। আসলে নিজেকে হিন্দু অথবা মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করে সমালোচকের আসনে বসালে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব হয় না। এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার স্থান এটা নয়, সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া যাক।

জিন্না মানুষটি প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। মনে রাখতে হবে যে, সরোজিনী নাইডু ও গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতো শ্রদ্ধেয় নেতারা একদা জিন্নাকে "হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শ্রেষ্ঠ রাজদূত" বলে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে জিন্নার চারিত্র্য ও রাজনীতিক ভূমিকার যে পরিচয় আমরা পাই তাতে ভালোমন্দ যাই থাকুক না কেন, সাম্প্রদায়িকতার কালিমা ছিল না। পরবর্তী ইতিহাস নিয়ে অনেক মতভেদ আছে।

সাম্প্রতিক আলোচনা ও গবেষণা থেকে একথা মনে হয় যে, জিন্না দেশবিভাগের জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি পাকিস্তানের দাবি তুলেছিলেন অনেকটা দর কষাকষির জন্য। পাকিস্তানের জন্য তিনি কিছু বিশেষ সুবিধা চেয়েছিলেন, দেশভাগ না করেই যদি সেটা পাওয়া যেত তবেই তিনি বেশি খুশি হতেন। হিন্দু নেতাদের মধ্যে যাঁরা প্রভাবশালী তাঁদের অনেকেই মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দেবার চেয়ে বরং দেশবিভাগটাই মেনে নেওয়া শ্রেয় মনে করলেন। তাঁরা সেদিন ভুল করেছিলেন কি ঠিক করেছিলেন, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

কেউ হয় তো বলবেন, মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা চাওয়াটাই সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির কথা। এবিষয়ে পরে কিছুটা আলোচনা করা যাবে। তার আগে অন্য দুয়েকটি বিষয় ছুঁয়ে যেতে চাই।

১৯৯০ সালে দাঁড়িয়ে অন্তত একথাটা স্পষ্ট। সম্প্রদায়বিশেষের জন্য ভিন্ন রাজ্য দাবি করা বা বিশেষ সুবিধা চাওয়াতে দোষ গুণ যাই থাকুক না কেন, এটা মুসলমান সম্প্রদায়ের একার বৈশিষ্ট্য নয়। শিখদের একটা প্রবল অংশ আজ "খালিস্তান" চাইছে। আয়ারল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের ভিতর সংঘর্ষ চলছে। আজারবাইজানে আর্মেনীয় খ্রীষ্টান ও আজেরি মুসলমানের ভিতর দ্বন্দ্ব উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এইরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কখনও ধর্ম, কখনও ভাষা, কখনও জাতির ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনীতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি আজ পৃথিবীর দিকে এমনই ছড়িয়ে পড়েছে যে এটাকে এযুগের একটা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁক বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

গণতন্ত্রের নামে এদেশে এমন একটা কথা আজকাল শোনা যাচ্ছে যে-বিষয়ে আমাদের সাবধানে ভাবতে হবে। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বলা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের নামই তো গণতন্ত্র, কাজেই এদেশে গণতন্ত্রের মানে হবে হিন্দুর রাজত্ব, রাষ্ট্রীয় বিধানে হিন্দুর কর্তৃত্ব। এটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। কেন ভ্রান্ত সেটা বলবার চেষ্টা করছি।

গণতন্ত্রের মূলে আছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনই নয়, মানুষের মৌল অধিকার সম্বন্ধে আরও কিছু প্রত্যয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ মানুষরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। এঁরা যদি একমত হয়ে বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মৌল মানবিক অধিকার কেড়ে নেয় তবে কি সেটাকে গণতন্ত্রসম্মত বলা যাবে? যেমন ব্যক্তির তেমনি সম্প্রদায়বিশেষেরও কিছু অধিকার মানুষের স্বাধীনতার মৌল শর্ত। জার্মানিতে একদিন ইহুদীদের সব অধিকারই

কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ইহুদীনিধন যজ্ঞের নেতা হিটলারের পিছনে জনসমর্থন ছিল। সেই অত্যাচারকে গণতন্ত্রের নামে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য বলা যাবে না। সংখ্যালঘুদের প্রতিও একটা ন্যূনতম শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনের জন্য অপরিহার্য। সে জিনিস রক্ষা না পেলে গণতন্ত্রও রক্ষা পায় না।

এদেশের ইতিহাসে দীর্ঘকাল থেকে বহুত্বধর্মিতার দিকে যে প্রয়াস দেখা যায়, এযুগের গণতান্ত্রিক সংবিধানেও তাকে নতুন রূপে রক্ষা করা প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি ঐক্যের নামে ভারতের বহুত্বকে নিষ্পিষ্ট করতে চায় তবে তাকে গণতান্ত্রিক নীতির দিক থেকে সমর্থন করা অন্যায় হবে। এদেশে যারা গণতান্ত্রিক জীবনদর্শনের বিকাশ চায় তাদের এই কথাটা বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আধুনিক যুগে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রসর্বস্বতা বারবার দেখা দিয়েছে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে। এর বিরুদ্ধে সতর্কতা আবশ্যক। সংযম ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা ছাড়া গণতন্ত্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

জিন্না মুসলমানদের জন্য কিছু রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন। সেই দাবি ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শিখ সম্প্রদায়কে হিন্দুরা চিরকাল প্রীতির চোখেই দেখেছে, তবু আজ তারা বিশেষ সুবিধা চাইছে। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর প্রীতিবাক্যের পাশে পাশেই গড়ে উঠেছিল অস্পৃশ্যতার ব্যবধান, অবিশ্বাসের কালো ছায়া। স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে এই আশঙ্কাটা মুসলমানের মনে ক্রমেই বড় হয়ে উঠছিল যে, গণতন্ত্রের নামে ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠের সর্বগ্রাসী শাসন স্থাপিত হবে।

দেশবিভাগের ভিতর দিয়ে সমস্যার সমাধান হয়নি। তবু জিন্নার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সমস্যাটা তিনি বুঝেছিলেন। সমাধানে তিনি পৌঁছতে পারেননি। আমরাও পারিনি। এজন্য সংস্কৃতির যে রূপান্তর আবশ্যক, আমরা কি সে দিকে অগ্রসর হচ্ছি? মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরই আজ "মৌলবাদী" প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছে, সেটা কিন্তু আমাদের ঠেলে দিচ্ছে উলটো পথে। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের কিছু আর্থিক কারণ ছিল, আজও আছে। কিন্তু সেটাও একমাত্র কথা নয়। কাশ্মীর বা আজারবাইজানে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, আর্থিক কারণ থেকে তার পুরো ব্যাখ্যা মিলবে না। আসলে সাম্প্রদায়িকতা নিজেই একটা ব্যাধি, আর এমন উদাহরণ সহজেই দেওয়া যায় যেখানে আর্থিক সংকটকে সে আরো ভয়ংকর করে তুলেছে।

১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগ রোধ করবার উপায় ছিল কি না তা নিয়ে তর্ক আজ নিষ্ফল। আমাদের ভাবতে হবে ভবিষ্যতের কথা। যে-নতুন প্রজন্ম আজ বড় হয়ে উঠেছে, দেশবিভাগের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তারা কোনওভাবেই যুক্ত ছিল না। পুরনো শত্রুতাতে তাদের আবদ্ধ থাকবার কারণ নেই। কোনও নতুন শত্রুতা গড়ে তুলবারও অর্থ হয় না।

অথচ ভারতে ও পাকিস্তানে যুদ্ধের আয়োজন বেড়ে চলেছে। দু' দেশেই সামরিকবাহিনী সুসজ্জিত। এই সেদিনের খবর, ফরাসী দেশ থেকে পাকিস্তান লাভ করবে পরমাণু চুল্লি। পাকিস্তান কি পারমাণবিক বোমা তৈরি করে ফেলেছে? ভারতও কি তৈরি করেছে? দুই দেশের ভিতর সমরাস্ত্রের সংগ্রহ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। পৃথিবীর দুটি দরিদ্রতম দেশের ভিতর যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে এইরকমের ঊর্ধ্বশ্বাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তখন সেটা শোচনীয় অমানবিকতার একটা অসহনীয় উদাহরণ হয়ে ওঠে। কোটি কোটি মানুষের অন্নবস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, অথচ প্রতিরক্ষার নামে অর্থের বরাদ্দ বেড়েই চলেছে। যদি যুদ্ধ বাধে তবে কোনও দেশেরই সাধারণ মানুষের

তাতে কোনও উপকার হবে না। আর যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় অথবা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার হয় তবে তো সর্বনাশ।

এই যুক্তিহীন অবস্থার কি অবসান সম্ভব নয় ? সারা ভারতীয় উপমহাদেশ নিয়ে একটি পরিসংঘ বা সম্মিলিত রাষ্ট্র গড়ে উঠবে, সমগ্র উপমহাদেশের জন্য সৈন্যবাহিনী থাকবে শুধু একটি, অধিকাংশ গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হবে যথাসম্ভব, এই চিত্র আজ অবাস্তব মনে হয়। অথচ পৃথিবীতে গতকালের কত "অবাস্তব" সম্ভাবনা আজ বাস্তবতা লাভ করছে। বার্লিন দেয়াল ভেঙে পড়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির ভিতর ঐক্যের কথা শোনা যাচ্ছে। ইউরোপে সম্মিলিত রাষ্ট্রের চিন্তা শুরু হয়ে গেছে।

৫

ভারতীয় উপমহাদেশে যদি শান্তি ও ঐক্য ফিরে আসে তবে সেটা আজ সম্ভব শুধু অহিংসা ও গণতন্ত্রের পথে। ভারত কখনো পাকিস্তানকে জয় করে নেবে অথবা পাকিস্তান ভারতকে, এচিন্তা উন্মাদের চিন্তা। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে পদানত করে রাখতে পারেনি, ভারত পাকিস্তানকে অথবা পাকিস্তান ভারতকে পায়ের নিচে রাখতে পারবে এটা মূর্খের কল্পনা। স্থায়ী ঐক্য সম্ভব শান্তির পথে। আজ নয়, কাল নয়, তবু কোনও এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এটা সম্ভব হবে, এ আশায় বুক বাঁধা ছাড়া উপায় কি ? যুদ্ধের আয়োজন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে শুধু সামগ্রিক ধ্বংসের দিকে। শান্তি ও ঐক্যই বাঁচবার পথ।

উপমহাদেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আগে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি চাই। আমাদের সমস্ত সমন্বয়ী চিন্তাকে উপহাস করে চলেছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পৌনঃপুনিক দাঙ্গা। এই উন্মত্ততা থেকে আমরা কি দেশকে উদ্ধার করতে পারব ? দেশের ভিতর শান্তির উদ্যোগ আর ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের ভিতর যুদ্ধবিরোধী সংকল্প দিয়ে কাজ শুরু হতে পারে। দূরের লক্ষ্যটিকে মনের ভিতর লালন করবার মতো সাহস চাই। প্রতি পদক্ষেপে এই প্রশ্নটাই যেন প্রধান হয়ে ওঠে, আমরা শান্তি ও ঐক্যের লক্ষ্যের দিকেই চলেছি তো ?

ভারতে গণতন্ত্রের শত্রুরা বলছে, এই উপমহাদেশে অন্যত্র কোথাও গণতন্ত্র নেই, সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার নেই, এখানেই কেন গণতন্ত্র রক্ষা করতে হবে ? প্রশ্নের গোড়াতেই ভ্রান্তি আছে। আমরা গণতন্ত্র চাই আমাদেরই স্বার্থে এবং সকলের স্বার্থে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে সংহার করবার নীতি একবার মেনে নিলে তার কোনও শেষ নেই। বহু সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতের বৃহৎ সমাজ। হিন্দুদের নিজেদের ভিতরই আছে নানা জাতি ও সম্প্রদায়। বহুত্বকে মর্যাদা দেবার অভ্যাস যদি আমরা ত্যাগ করি তবে স্বজাতি ও ভিন্ন জাতি সহ ভারতের সমগ্র সমাজই ভেঙে পড়বে। অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার কোনও একজাতিতে আবদ্ধ নয়। এই সবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগ্রাম অবশ্যই চাই। আত্মসমালোচনার প্রয়োজন সকলেরই, যেমন হিন্দুর তেমনি মুসলমানেরও। সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আছে আত্মসমালোচনার অক্ষমতা, এমন অসহিষ্ণুতা, এমন অন্ধতা যাতে শেষ অবধি অন্যায় দীর্ঘজীবী হয়, সুস্থ ও স্বাধীন জীবনের উপযোগী জীবনদর্শন পরিত্যক্ত হয়, ক্রমপ্রসারিত বিদ্বেষ সবাইকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়।

ভারতের একটা ঐক্য আছে। সেটা কিন্তু মূলত সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় নয়। রাষ্ট্রের ঝোঁক ক্ষমতার দিকে। রাষ্ট্রের ঝোঁক অতিকেন্দ্রিকতার দিকে। রাষ্ট্রসর্বস্বতায় বিপদ আছে। রামকে "রাষ্ট্রীয় পুরুষ" করে তোলাতে বিপদ আছে। ঈশ্বরকে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাকার করে দেওয়া ঠিক নয়। রাষ্ট্রসর্বস্ব সংস্কৃতি সবাইকে একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলতে চোয়। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এদেশে গণতন্ত্রকে হতে হবে বহুত্বনিষ্ঠ। সব দেশেই তাই, এদেশে আরো বিশেষভাবে। শান্তি ও গণতন্ত্র চাই প্রত্যেকের জন্য, সকলের জন্য। এটাকেই লক্ষ্য বলে মানতে হবে। সংঘর্ষ সম্পূর্ণ দূর করা যাবে না। তবু যারা সহযোগে বিশ্বাসী, যারা একথা মানে যে ঐক্য একটা পূর্বনির্মিত বস্তু নয় বরং সেটা ক্রমাগত সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তাদের যদি পরাজয় ঘটে তবে সেটা হবে সারা দেশেরই পরাজয়।

অবিশ্বাসীরা বলে, সাম্প্রদায়িকতায় তারাই উসকানি দিচ্ছে রাজনীতি যাদের ব্যবসা, তাদের ঠেকানো যাবে কী করে? আমাদের ছোটো ছোটো চেষ্টা কি ব্যর্থ হতে বাধ্য নয়? উত্তরে দু'টি কথা বলা যায়। সাম্প্রদায়িকতায় যারা আক্রান্ত তারা ভ্রান্ত, কিন্তু সবাই মন্দ নয়। যুক্তি ও নতুন চিন্তার প্রয়োজন আছে। ছোটো ছোটো বৃত্ত থেকেই কাজ শুরু হতে পারে, সব স্থায়ী কাজের ভিত্তি সেইখানে। রাজনীতির ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাতেই ইতিহাসের পথ তৈরি হয় এমন তো নয়। তাই যদি হত তবে মানুষের ইতিহাসের অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তনেরই ব্যাখ্যা পাওয়া যেত না। ছাত্র ও যুবশক্তি, সংগঠিত শ্রমিক, নারীশক্তি, নবচিন্তক, এরা অঘটন ঘটাতে পারে, এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে অতি সাম্প্রতিক ইতিহাসেও। আসলে মানুষ জীবটি শুধু ব্যবসায়িকী বুদ্ধি দিয়ে চলে না। তার ভিতর আছে অন্য এক বেগ। সেই নিগূঢ় শক্তি একই সঙ্গে সৃজনধর্মী, বৈচিত্র্যমুখী আবার ঐক্যসন্ধানী। সেই শক্তিতে বিশ্বাস হারানো ভুল।

ঐক্য নিয়ে আরো কিছু চিন্তাভাবনা

বাংলাভাষায় একটি শব্দের ব্যবহার ক্রমে বাড়ছে—শব্দটি চিন্তক। যিনি ভক্ষণ করেন তিনি যেমন ভক্ষক, যিনি গান করেন তিনি যেমন গায়ক, যিনি চিন্তন করেন তিনি তেমনি চিন্তক। 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি বহুব্যবহৃত, কিন্তু খুব সন্তোষজনক নয়। বুদ্ধিকে জীবিকার জন্য ব্যবহার করেন যিনি তিনিই তো বুদ্ধিজীবী। আইনজীবীরা অবশ্যই এঁদের ভিতর পড়েন। কিন্তু আইনকে ফাঁকি দিতেও বুদ্ধি লাগে। চোরাকারবারি বুদ্ধি খাটিয়ে খান, সেটাই তাঁর জীবিকা। বুদ্ধিজীবী শব্দটার ভিতর চিন্তার বিশুদ্ধতা অথবা কোনো বৃহৎ লক্ষ্যের আভাস স্পষ্ট নেই। চিন্তন শব্দটির ভিতর সেই আভাস অনেকটা আছে। মন সকলেরই আছে, সংসারে ভালোমন্দ চিন্তা সবাই করেন ; কিন্তু মনন অথবা চিন্তনের একটা গভীরতর তাৎপর্য আছে। জীবনের সঙ্গে সেটা যুক্ত, কিন্তু জীবিকার সামান্যতায় তবু আবদ্ধ নয়।

যিনি সার্থক চিন্তক, যিনি মনস্বী, তিনি খণ্ড ঘটনাকে, বিভক্ত বস্তুকে, বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে

যোগ করে দেখেন। এইভাবেই খণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় পূর্ণতা লাভ করে। আসলে সাধারণ মানুষও এইভাবেই বোঝে, এটাই জানবার সাধারণ পদ্ধতি। আমরা যখন কোনো ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাই তখন সেই ব্যক্তির উৎপত্তিস্থল, তাঁর পিতামাতার নাম, দেশ অথবা জন্মস্থান, তিনি এখন কোন কর্মে নিযুক্ত আছেন, এইসবের ভিতর দিয়ে তাঁকে পরিচিত করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই ব্যক্তিকে আমরা জানি। কোনো ঘটনার কারণ ও পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ হলে তবেই বলি যে ঘটনাটা আমরা বুঝেছি। যুক্তির লক্ষ্য হচ্ছে যোগস্থাপন। মানুষের স্বভাবের ভিতরই এই ঝোঁকটা আছে। তবে আরো নানা বিপরীত আবেগে, ভয়ে লোভে উন্মাদনায়. এই যোগস্থাপনের প্রচেষ্টা পদে পদে বিপর্যস্ত হয়। বিপর্যয় সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করা, উচ্চতর ঐক্যের দৃষ্টিতে দ্বন্দ্বমূলক প্রশ্নগুলির বিচার করা, বুদ্ধিজীবীরা যদিও সর্বত্র সুবেদী নন তবু মনন ও চিন্তনের এই কর্তব্য।

বহু দেশ নিয়ে এক পৃথিবী। কথাটা বলা সহজ, কিন্তু বিভিন্ন দেশের ভিতর দ্বন্দ্বের শেষ নেই। এই শতাব্দীতেই আমরা দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, আঞ্চলিক যুদ্ধ তো অসংখ্য অবিরত চলেছে। দ্বন্দ্ব শুধু দেশে দেশে নয়, দেশের অভ্যন্তরেও সংঘর্ষ লেগেই আছে। এক একটি দেশ নানা জাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমষ্টি। এদের ভিতর অসাম্য ও অশান্তির শেষ নেই। প্রতিটি গোষ্ঠী আবার বহু পরিবার ও ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত। ব্যক্তির সঙ্গে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সামঞ্জস্যরক্ষা, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে মেলানো, সমাজের মৌল সমস্যা। প্রতিটি পরিবারের ভিতরই এই মূল সমস্যার আঘাত কিংবা ধ্বনিপ্রতিধ্বনি কোনো না কোনো ভাবে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ, বিভেদের ভিতর ঐক্যস্থাপনের প্রশ্ন মানুষের বৃহৎ সমাজে বহুস্তরে বহুরূপে দেখা দেয়। তবু এদের ভিতর কোথাও একটা মিল আছে। যে-কোনো জটিল সমস্যাকেই বুঝবার সুবিধার জন্য নানা অংশে ভাগ করে নিতে হয়। এটাই বিশ্লেষণী যুক্তির অভ্যাস। অথচ কোনো আংশিক সমাধানই যথেষ্ট নয়, একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী শেষ পর্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে।

এই মুহূর্তে এদেশের ও বিশ্বের সামনে কিছু জরুরী প্রশ্ন আছে, ভয়ংকর সমস্যা আছে। এসব হয়তো সাময়িক, তবু অগ্রাহ্য করা যায় না। ভবিষ্যতে আজকের কোনো কোনো প্রশ্ন তুচ্ছ মনে হবে, তবু আজ তাদের মুখোমুখি হওয়া চাই। যা নিতান্ত সাময়িক তাও একেবারে মিথ্যা নয়, তাকে মিথ্যা বললে এগিয়ে যাবার রাস্তা তৈরি হয় না। অথচ সাময়িকতার ঊর্ধ্বে কোনো উচ্চতর সত্য অথবা আদর্শ নেই এই বিশ্বাসে মানুষ শুধুই সুবিধাবাদে বা ভোগবাদে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তাতেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় না। মানুষের জন্য কোনো অনিবার্য পথ নই, তাকে পথ বেছে নিতে হয়। অনিবার্যতার তত্ত্ব ইতিহাসে স্বীকার্য নয়। সময়ের সীমানার মধ্যেই পদে পদে একাধিক বিকল্প সম্ভাবনা দেখা দেয়। এর ভিতর কোনটা শ্রেয় সেটাই বড় প্রশ্ন। সেই পথই খুঁজে নেওয়া আবশ্যক যাতে সাময়িক সমস্যা উপেক্ষিত নয়, তবু উচ্চতর সত্যের সঙ্গে যার যোগ আছে। চিন্তক সাহায্য করেন সচেতনভাবে পথ বেছে নিতে, খণ্ডকালের সঙ্গে বৃহৎকালের যোগসাধন করতে।

২

বহু দেশকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা ইতিহাসে বারবার হয়েছে। সাম্রাজ্য, বাণিজ্য এবং ধর্মের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রোমক সাম্রাজ্য আজ থেকে প্রায় দু' হাজার বছর আগে ইউরোপের দক্ষিণ ভাগের অনেক দেশকে এক কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে এনেছিল। পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার কিছু ভূখণ্ড একসময়ে এই সাম্রাজ্যের সীমানার ভিতর এসে যায়। রোমক সাম্রাজ্য কিন্তু ইতিহাসের প্রাচীনতম সাম্রাজ্য নয়, বিশালতমও নয়। ভারতের ইতিহাসে অশোকের সাম্রাজ্য স্মরণীয়। চেঙ্গিজ খানের যে সাম্রাজ্য একদিন মাঞ্চুরিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল আয়তনে সেটা আরো বিশাল। কালের গতিতে রুশ দেশ থেকে একদিন তাতার আধিপত্য অপসারিত হল। তারপর ক্রমে গড়ে উঠল অন্য এক সাম্রাজ্য, সাইবেরিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ অবধি যার প্রসার। সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বহুবার হয়েছে এবং ভেঙেছে।

প্রাচীন যুগেও সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের একটা সম্পর্ক প্রায়শ দেখা যেত, আমাদের যুগে সেটা আরো স্পষ্ট। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদা সূর্য কখনো অস্ত যেত না তার সঙ্গে বাণিজ্যের যোগ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই।

সাম্রাজ্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক প্রাচীন। সম্রাট অশোক বুঝেছিলেন যে যুদ্ধজয়ই যথেষ্ট নয় ; তিনি বৌদ্ধধর্মের বাণীপ্রচারে আগ্রহী হলেন। রোমক সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে যদিও খ্রীষ্টধর্ম অবজ্ঞাত ছিল তবু কালক্রমে সেই ধর্মই রাজধর্ম হয়ে উঠল। পয়গম্বর মোহাম্মদের মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যে পারস্য থেকে স্পেন পর্যন্ত একে একে বহু রাজ্য ইসলামের পদানত হল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম পৌরাণিক যুগ থেকেই হিন্দু রাজাদের আনুকূল্য লাভ করেছে। হিন্দুধর্মের নানা শাখা আছে, কোনো রাজা শৈব কেউবা শাক্ত কেউ বিষ্ণুভক্ত। ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের যোগের কথা সবাই জানেন, সেটা সবিস্তারে বলা সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন। খ্রীষ্টধর্মেরও বহু শাখা, বহু চার্চ। এইরকমই একটি বিশেষ শাখার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পুরনো রুশদেশের সম্রাট। ১৯১৭ সালের লেনিনপন্থী বিপ্লবের পর মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ হয়ে উঠল নতুন রাষ্ট্রধর্ম, এক রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের সূত্রে বাঁধবার চেষ্টা হল সাইবেরিয়া থেকে পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যকে।

আধুনিক যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তকে পারস্পরিক প্রভাবের বৃত্তের মধ্যে টেনে আনবার কাজে বাণিজ্য যেমন কার্যকর হয়েছে আর কিছুই বোধহয় তেমন নয়। বাণিজ্যের সঙ্গে বিত্তবানের ক্ষমতা এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের কথাটা জড়িয়ে আছে। কিন্তু আরো কিছু কথা আছে যা তুচ্ছ নয় সভ্যতার ইতিহাসে। বাণিজ্যের ফলে ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা সরে যাচ্ছে, মানুষ সচল হচ্ছে, এক দেশের খবর অন্য দেশে অনবরত পৌঁছচ্ছে, বাজারের প্রসার ঘটছে অর্থাৎ দেশে দেশে সম্পর্ক বাড়ছে, উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ভিতর পারস্পরিক অজ্ঞতা যত কমবে ততই বিভেদও অবশেষে হ্রাস পাবে, ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজের ভিত্তি তৈরি হবে, এইরকম চিন্তা আধুনিক যুগের প্রভাতে অনেকের মনে উদিত হয়েছিল। তরুণ মার্ক্সের মনেও এই চিন্তা প্রভাব ফেলেছিল। 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি : "National differences and

antagonisms between peoples are daily more and more vanishing, owing to the development of the bourgeoisie, to freedom of commerce, to the world-market, to uniformity in the mode of production and in the conditions of life corresponding thereto. The supremacy of the proletariat will cause them to vanish still faster." অর্থাৎ, মার্ক্স আশা করেছিলেন যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের ফলে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে প্রভেদ কমে যাবে, আর শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এইসব বিভেদ আরো দ্রুত দূর হয়ে যাবে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে পৌঁছে আমরা যা প্রত্যক্ষ করলাম তার সঙ্গে পূর্বের ঐ প্রত্যাশার অনেকটাই পার্থক্য আছে। ভৌগোলিক দূরত্বকে মানুষ জয় করেছে, সংবাদের প্রসারে আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে, বাণিজ্যের পরিমাণ ও ভূপর্যটকের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু ভাষা ধর্ম এইসব আশ্রয় করে সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় বিভেদের চেতনা এখনো প্রবল। ইসলাম একদিন দুনিয়াটাকে এক ধর্মের বন্ধনে, এক ভ্রাতৃত্বে, আবদ্ধ করবার স্বপ্ন দেখেছে। সাম্রাজ্য একদিন সসাগরা পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিল। তা হয়নি, তা হবার নয়।

সাম্রাজ্যের জোরে পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে এমন সম্ভাবনা আজ লুপ্ত। সাম্রাজ্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে। পৃথিবীর সব মানুষ ক্রমে ক্রমে এক ভাষা এক ধর্ম এক মতাদর্শ গ্রহণ করবে এমন কোনো কল্পনাকেও মনে স্থান দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। তবে পৃথিবীতে ঐক্য আসবে কোন পথে ?

প্রশ্নটা জরুরী, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। একদিকে ঐক্যের পূর্বকল্পিত পথগুলি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। অন্যদিকে ঐক্যের প্রয়োজন বেড়েই চলেছে। এমন এমন সমস্যা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে যার সমাধানের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আবশ্যক, তা ছাড়া উপায় নেই। এর কিছু উদাহরণ সহজেই দেওয়া যায়।

গত দেড়শ' বছরে যেসব মতবাদ জগতে প্রধান হয়ে উঠেছে তার ভিতর গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ছাড়াও জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছবার সোপান হিসাবে কখনো কখনো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু কার্যত ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বার্থের দ্বন্দ্বই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে এবং জাতীয়তাবাদকে উত্তেজিত করে তুলেছে। এযুগের জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতর ক্ষমতা নিয়ে কখনো-ঠাণ্ডা-কখনো-গরম যে লড়াই চলে তারই পরিপোষক মতাদর্শ এযুগের জাতীয়তাবাদ। মানুষের যেখানে স্বার্থের ঐক্য জাতীয়তাবাদের মনোযোগ সেদিকে নয়। এযুগের সাম্যবাদকেও এদিক থেকে বিচার করা আবশ্যক। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে মালিক ও শ্রমিকের ভিতর দ্বন্দ্ব যখন তীব্র হয়ে উঠেছে, উনিশ শতকী সাম্যবাদের সেটাই জন্মলগ্ন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের দ্বন্দ্বটাই সাম্যবাদী তত্ত্ব ও ভাবাবেগকে পরিপুষ্ট করেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের স্বার্থের সংঘাতের উর্ধ্বে সর্বমানবের হিতের কথা একটা রাজনীতিক ধাপ্পা মাত্র, শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রবক্তারা এইরকম ভাবতেই অভ্যস্ত। এই অভ্যাসটার আজ সংশোধন আবশ্যক।

গত কয়েক দশকে পরিবেশরক্ষা ও বৃক্ষরোপণ নিয়ে নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কেউ হয়তো বলবেন যে, গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে নির্বিচারে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির স্বার্থে। এর দীর্ঘকালীন ফলাফল কিন্তু শিল্পপতিসহ সারা সমাজেরই স্বার্থের বিরোধী। নির্বিচারে বৃক্ষনিধনের ফলে দেশে অবশেষে মরুভূমির রাজত্বই বাড়বে, তাতে ক্ষতি

সর্বশ্রেণীর মানুষেরই। এই সমস্যাটি সম্বন্ধে বহুদিন আগেই দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শ্যামলা পৃথিবীকে মরুভূমিতে গ্রাস করে নিচ্ছে, যুদ্ধটা এই আগ্রাসী রুক্ষতার বিরুদ্ধে। "মরুবিজয়ের কেতন" উড়াতে আহ্বান জানিয়েছিলেন কবি বৃক্ষরোপণ উৎসবের ভিতর দিয়ে। এই উৎসব ও সংগ্রাম সর্বমানুষের স্বার্থে।

সমস্যাটা আরো একটু বড় আকারে দেখা যাক। তাপ ও বাষ্পের শক্তিকে উৎপাদন ও পরিবহণের কাজে নিযুক্ত করবার কৌশল আয়ত্ত করে শিল্পবিপ্লব শুরু হল। আধুনিক শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির প্রয়োজন বেড়ে চলল। কয়লা ও তেল ছাড়া আধুনিক শিল্পের অনেকটাই অচল। অথচ কয়লা ও তেলের সরবরাহ অফুরান নয়। তা ছাড়া এইসব জ্বালানি পোড়াবার ফলে আবহাওয়াতে বিষাক্ত বা অনিষ্টকর গ্যাস জমে ওঠে। একটা মাত্রা পর্যন্ত সেটা বিপজ্জনক নয়। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই বিপদ। আধুনিক শিল্প যতই ছড়িয়ে পড়ছে বিপদটা ততই বাড়ছে। এ বিষয়ে আমাদের নগরসভ্যতা বহুদিন পর্যন্ত অজ্ঞ ও নিরুদ্বিগ্ন ছিল। ইদানীং জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে উদ্বেগের কারণও বাড়ছে। আধুনিক শিল্প ও নগরসভ্যতা যে পথে চলেছে সে পথে আর বেশীদূর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নয়।

ভোগবাদের বৃদ্ধি ও দ্রুত প্রসার এই সময়কার আরেক লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য। আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তি নতুন নতুন ভোগ্যবস্তু মানুষের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসছে। দূরদর্শনের গুণে ধনী দেশ ও ধনী পরিবারের আধুনিকতম ভোগের উপকরণ দরিদ্র দেশেরও মানুষের নজরে আসছে। ভোগের তৃষ্ণা ছড়িয়ে পড়ছে। কেতাবী নৈতিকতা দিয়ে আমি এর বিচার করছি না। প্রশ্নটা সহজভাবে এই। যে ভোগের তৃষ্ণা সকলের মধ্যে ছড়িয়ো পড়ছে সেটা মেটাবার মতো সম্পদ কি পৃথিবীতে আছে? আমরা আগেই দেখেছি যে আধুনিক শিল্পের সীমাহীন প্রসার মানুষের পরিবেশের পক্ষে নিরাপদ নয়। অথচ ভোগবাদী জীবন কিছু মানুষের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে আর অধিকাংশ মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়েও বঞ্চিত থাকবে এই অবস্থা সামাজিকভাবে অসুস্থ ও বিপজ্জনক। কোনো এককালে সাধারণ মানুষ অসাম্যকে নিরুপায়ভাবে মেনে নিয়েছিল। আজ সেই অবস্থা নেই। ভোগবাদ আজকের সমাজে অসাম্যের পীড়নকেই অসহনীয় করে তুলছে। বিষাক্ত বাষ্পের মতোই সামাজিক পরিবেশ এক সর্বব্যাপী অসন্তোষে দূষিত হচ্ছে। এটা সকলের পক্ষেই বিপদের কথা, ধনীনির্ধন কেউই এর মার থেকে রক্ষা পাবেন না। এইখানে আমরা সাম্যের তত্ত্বে ফিরে আসছি, অন্য এক যুক্তির পথে। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথাই এখানে প্রধান।

শক্তির উৎস হিসাবে কয়লা ও তেলের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করবার জন্য পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরতার কথা অনেকে ভাবছেন। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ একাধিক কারণে বিপজ্জনক। সতর্কতা সত্ত্বেও এতে পরিবেশদূষণের ভয়ংকর পথ খুলে যাবে, চের্নোবিলের বিপদসঙ্কেত উপেক্ষা করবার মতো নয়। বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তবে একটা কথা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। আমরা পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের কথা যতই বলি না কেন, সেই শক্তির হিংসাত্মক ব্যবহারের বিপজ্জনক সম্ভাবনা রোধ করা কঠিন। চল্লিশ বছর আগে কেবল বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তির সামনেই ঐ পথ খোলা ছিল। আজ ছোটো ছোটো দেশও ঐ পথে অগ্রসর হচ্ছে, আমাদের ঘরের কাছেই উদাহরণ আছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্ধোন্মাদ কোনো

সন্ত্রাসবাদী দল যে ভবিষ্যতে ঐ ভয়ঙ্কর অস্ত্র ব্যবহার করবে না, এমন কথা কি জোর করে বলা যায় ? পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যাপারে আমাদের অত্যন্ত সাবধানে চলাই ভালো। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মানুষ অবশেষে এমন এক শক্তি আয়ত্ত করেছে যা দিয়ে গোটা মনুষ্যসমাজকেই ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব। অথচ নৈতিকভাবে মানুষ এখনও পশুত্বের খুব উর্ধ্বে উঠতে পারেনি।

এইমাত্র কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা গেল, এইসব প্রধানত বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সমস্যা। এইসবের ভিতর দিয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে আকার গ্রহণ করছে। উনিশ শতকী দৃষ্টিকোণ থেকে সেটা পৃথক। আমরা আজ জানি যে, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নটা আর দেশবিশেষের অথবা শ্রেণীবিশেষের জয়পরাজয়ের প্রশ্ন নয়, সেটা সমগ্র মানবসভ্যতার অস্তিত্বরক্ষার প্রশ্ন। আমরা আরো জানি যে, কোনো বৃহৎ শক্তির অধীনে পৃথিবীকে ধরে রাখা যাবে না, সব দেশের ও সম্প্রদায়ের জন্য যথাসম্ভব স্বায়ত্বশাসন ও আত্মবিশ্বাসের পথ খোলা রাখতে হবে। আমরা আরো জানি যে, বৃহৎ শিল্পনির্ভর নগরসভ্যতার যে জয়যাত্রা এতদিন অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল তারও দিকপরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। এইরকম কিছু কথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এদেশের ও সারা বিশ্বের পুনর্গঠনে যা প্রাসঙ্গিক।

সমাজদর্শনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আগমনে পুরনো মতবাদ সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয় না ; কিন্তু কথার ঝোঁকটা বদলে যায়, কাজেই ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। উনিশ শতকের কিছু মতবাদে দ্বন্দ্বের ওপর জোর পড়েছিল। আজও দ্বন্দ্বের বাস্তবতা অস্বীকার করা হচ্ছে না, তবু শান্তি যে অবিভাজ্য, হিংসা ও অসংযম যে আত্মঘাতী হতে পারে, এই কথাটার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কিন্তু আমাদের বিশ্বদৃষ্টিটাই পালটে যাচ্ছে।

৩

সাবা পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে যে কথাগুলি এপর্যন্ত বলা হল, ভারত নিয়ে চিন্তাভাবনায় সেসব অগ্রাহ্য হতে পারে না।

প্রায় দু'শ বছর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ঐক্যের ধারক ছিল। ১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারত থেকে ব্রিটিশ রাজের সার্বভৌম ক্ষমতা অপসৃত হল। তারপর পাকিস্তান আবারও দু' টুকরো হয়েছে। ভারতেও "বিচ্ছিন্নতাবাদী" শক্তি সক্রিয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যদিও চিন্তিত হবার কারণ আছে।

মনে রাখতে হবে, ভারত তার অশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে ছোটখাটো একটি পৃথিবী। বিশ্বের প্রতিটি প্রধান ধর্ম এখানে উপস্থিত। এত ভাষা আর কোনো দেশে নেই। ভারতের নিকটতম তুলনা চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে। সেখানে কম্যুনিস্ট মতাদর্শকে আশ্রয় করে একদলীয় সর্বগ্রাসী জবরদস্ত রাষ্ট্রতন্ত্র এতদিন চলছিল। সেই শাসন যখন শিথিল হল তখনই সেখানেও "বিচ্ছিন্নতাবাদী" শক্তির অস্তিত্ব ভালভাবেই টের পাওয়া গেল। এটাকে একটা পৃথিবীব্যাপী ধারা বলে মেনে নেওয়াই ভাল। গোরবাচভ যে-পথে এই সমস্যার সমাধান করতে চাইতেন সেটা শিক্ষাপ্রদ। সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলি একের পর এক স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের অধিকার দাবি করছে। গোরবাচভ চান, সোভিয়েত দেশের ঐক্য অটুট থাকুক। কিন্তু তিনি জানেন যে, আজ আর সেটা শুধু জোরজুলুমের দ্বারা সম্ভব হবে না। অঙ্গরাজ্যগুলিকে যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য ও

স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দিতে হবে। ভারতকেও এইরকম কোন পথেই এদেশের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কেউ কেউ বলছেন, ভারত হিন্দুপ্রধান দেশ। সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের ইচ্ছা অনুযায়ীই দেশ চলবে, এটাই গণতন্ত্রের পথ। গণতন্ত্রের এই ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করে যদি শাসন চালানো হয় তবে তাতে গণতন্ত্র রক্ষা পায় না। পরমতসহিষ্ণুতা, অপর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতির ভাব, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আবশ্যক। মার্কিন দেশে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় সংখ্যায় অধিক, কৃষ্ণাঙ্গেরা সংখ্যালঘু। কিন্তু মার্কিন দেশের যে ভাবধারা কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি সহানুভূতিহীন সেটা সে দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে। একটা মানবিক ঔদার্য গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ।

কেউ কেউ দাবি তুলেছেন, ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে হবে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ যদি ইসলামি রাষ্ট্র হয় তবে ভারত কেন হিন্দুরাষ্ট্র হবে না? এটা সুযুক্তি নয়। পাকিস্তান অথবা বাংলাদেশকে ইসলামি রাষ্ট্র বলেছেন যাঁরা তাঁরা কি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান? আমরা তাঁদের পথে যাব কেন? তাতে আমাদের দেশের মানুষের কোন উপকার হবে? ওঁরা বলছেন, তাতে ভারতের ঐক্য দৃঢ়তর হবে? কথাটা কি সত্য? ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলে প্রচার করলে শিখদের মনে এদেশের সঙ্গে একাত্মবোধ বাড়বে? নাগা মিজোদের মনে? ভারতীয় মুসলমানদের তাতে ভারতের প্রতি আনুগত্য বাড়বে? না কি যতটুকু আনুগত্য আছে সেটা এরপর আরো কমে যাবে?

এমন কথাও কেউ কেউ বলেন যে, প্রয়োজন হলে মুসলমানদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। এ দেশের কোটি কোটি মুসলমান ভারত ত্যাগ করে কোথায় যাবেন? বাংলাদেশ ওঁদের নেবে না, পাকিস্তান ওঁদের নেবে না—পাকিস্তান বিহারী মুসলমানদের নিতে রাজি হয়নি। এসব কথার পরিণাম কি? এ শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে দেবার পথ। এ পথে ঘাতকবাহিনীর সংখ্যা ও প্রতাপ বাড়বে, জুলুমবাজ ফাশিস্তপন্থীদের ক্ষমতা বাড়বে। হিন্দু-মুসলমানসহ সারা দেশের সাধারণ মানুষের এতে অমঙ্গল। যেমন সারা বিশ্বে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আবশ্যক, সেই পথেই শান্তি ও মানুষের মঙ্গল, তেমনি ভারতেও কোনো প্রবল কেন্দ্রীয় শক্তির চাপে সকল সম্প্রদায়কে একপথে চালনা করবার চেষ্টায় দেশের শুধুই অকল্যাণ, সেটা ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনার বিপরীত। সেই সাধনা এখনো পূর্ণ হয়নি, যুগ যুগ ব্যাপী একটি প্রয়াস রূপেই সেটা আছে, সেটাই পথ। 'ভারত-ইতিহাস-চর্চা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছেন : "কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া উঠে, অথচ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিলুপ্ত না হয়, এই দুঃসাধ্য সাধনের প্রয়াস বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে, আজও তাহার সমাধান হয় নাই।" রবীন্দ্রনাথ ঐক্যসাধন ও একাকারীকরণের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ দেখেছিলেন। যাঁরা আজ ঐক্যসাধনের নামে একাকারীকরণের চেষ্টায় নেমেছেন তাঁদের কাছে বিনীতভাবে তবু দৃঢ়ভাবে সমস্যাটা পুনর্বিবেচনা করবার জন্য অনুরোধ জানানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

হিন্দুরা নিজেদের ভিতর ঐক্যবদ্ধ নয়। মুসলমান-বিদ্বেষের সাহায্যে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে এ ধারণা ভুল। সমস্যা সমাধানের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। তা নইলে যে হিংসার শক্তি নিয়ে আজ আমরা অপর সম্প্রদায়কে আক্রমণ করব সেই হিংসাই কাল আত্মঘাতী হয়ে ফিরে আসবে, হিংসার আগুন গৃহযুদ্ধের আকারে কেবলই ছড়িয়ে পড়বে। হিংসাকে হিংসা দিয়ে ঠেকানো যাবে না।

জাতপাতের সংঘাত সম্প্রতি বেড়ে গেছে। জাতিভেদপ্রথা সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যে আকারে এই প্রথা প্রচলিত তাতে ঘোরতর অসাম্য আছে। একদিকে এ দেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান, যাতে সকলের সমান অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত, অন্যদিকে বিভেদমূলক জাতিভেদপ্রথা, এই দুয়ের সহাবস্থান অশান্তি সৃষ্টি করবেই। যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ভিতর ধনী-দরিদ্রের দারুণ পার্থক্য অসন্তোষ সৃষ্টি করে তেমনি দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিসম্প্রদায়ের ভিতর ঘোরতর অসাম্য সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়।

স্বীকার করা প্রয়োজন যে, এই অসাম্য দূর করবার জন্য এদেশে তেমন কার্যকর কোনো চেষ্টা এখনো দেখা যায়নি। চেষ্টা নানাদিক থেকেই হতে পারে। শিক্ষাগত মানে অনুন্নত জাতগুলি অনেকখানি পিছিয়ে আছে। এদের ভিতর শিক্ষার অভাব দূর করবার জন্য বিশেষ কার্যক্রম প্রয়োজন। আসলে এটাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতের মানুষের ভিতর দ্বন্দ্ব না বাড়িয়েই এ কাজে অনেকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব, আর দ্বন্দ্ব যদি বাড়েও তবু এ কাজটা করে যেতে হবে। তাছাড়া ভূমিসংস্কার এবং নানারকম স্বনিযুক্ত কাজে সুযোগবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে পিছিয়ে-পড়া দুর্বল মানুষের অবস্থার উন্নতি হতে পারে। সংরক্ষণনীতি নিয়ে সম্প্রতি দেশের ভিতর সংঘাত বেড়ে গেছে। সংরক্ষণ মানে এখানে সরকারি চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ। মনে রাখা দরকার যে, সরকারি চাকরীতে নিয়োগের জন্য একটা ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা চাই। অনুন্নত জাতগুলিতে সেই যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরই খুব অভাব। কাজেই শিক্ষায় উন্নতির দিকেই মনোযোগ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ কাজটা কঠিন, কিন্তু এটা না হলে অন্য কিছুতেই বিশেষ ফল হবে না। আর এটা হলে অন্য সবই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যাবে।

আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দরকার একটা বড় রকমের সাংস্কৃতিক রূপান্তর। হিন্দুদের অনেক মন্দিরে আজও তথাকথিত নীচুজাতের মানুষের প্রবেশের অধিকার নেই। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। নতুন মন্দির গড়ার চেয়েও পুরনো মন্দিরের দ্বার অপমানিত মানুষের জন্য অবারিত করা সত্য ও মনুষ্যত্বের বিচারে বেশি জরুরী। শুচিতা অশুচিতা নিয়ে সূক্ষ্ম স্তরভেদ হিন্দুর আচারে বিচারে অভ্যাসে এমনভাবে ঢুকে আছে, আমরা অনেকে তাতে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যে এর হীনতা ও অমানবিকতা আমরা লক্ষ করতেই ভুলে গেছি। কিন্তু যাঁদের আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রেখেছি তাঁরাও আজ জাগছেন। মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্রমে বাড়ছে, বাড়বে। যাঁরা এতদিনের সুবিধাভোগী তাঁরাই যদি এগিয়ে এসে পিছিয়ে-পড়া মানুষের সঙ্গে হাত মেলান তবে পরিবর্তনটা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে ঘটতে পারে।

ক্ষমতা যতই রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীকৃত হচ্ছে ততই রাষ্ট্রযন্ত্রে স্থানলাভের জন্য মারামারি বাড়ছে। সংরক্ষণের প্রশ্নটাও রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। অনেক সমস্যারই মূল এখানে। সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের স্থানটা সংকুচিত করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ একথা বহুবার বলে গেছেন অনেকদিন আগে। আজকাল পঞ্চায়তী রাজের কথা অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে। আমাদের সংবিধানে ঐ কথাটা বীজরূপে আছে, যদিও তার পরিণত রূপ নেই। সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government." এদেশে স্বায়ত্তশাসনের বনিয়াদ তৈরি করবে গ্রাম পঞ্চায়েত।

পঞ্চায়েত সমিতিতে পিছিয়ে-পড়া জাতের জন্য আসন সংরক্ষিত করা যেতে পারে। জনগণের প্রতিনিধিত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়, উচ্চবর্ণের মানুষই বরাবর নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিত্ব করবে এটা অসঙ্গত ! অবশ্য এমন সময় আসতে পারে যখন এই রকম সংরক্ষণের আর প্রয়োজন থাকবে না। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা পালটানো উচিত হবে।

এদেশে পঞ্চায়েতসহ সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেরই বিকৃতির কিছু সাধারণ কারণ আছে। অনেক বছর ধরে যে শাসনব্যবস্থা ও আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে তার ঝোঁক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে। রাজনীতিক দলগুলির লক্ষ গদিতে বসা, গদি আঁকড়ে থাকা। যেহেতু ক্ষমতা নিয়ে লড়াইটাই মুখ্য, কাজেই এই দলগুলিও লড়াইয়ের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। দুর্নীতি আরো বেড়েছে ভোগবাদের প্রচণ্ড প্রভাবে। নতুন মধ্যবিত্তের এই নেশা বেড়েই চলেছে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এরই মধ্যে পঞ্চায়েতের জন্ম। পঞ্চায়েতও হয়ে উঠেছে কোথাও আমলাতন্ত্রের আজ্ঞাবাহী, কোথাও দলীয় লড়াইয়ের পদাতিক ও হাতিয়ার এবং প্রায়শ দুর্নীতিগ্রস্ত। তাছাড়া রাষ্ট্র যেমন তার অধিকারের কোনো সীমা মানতে চায় না, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল যেমন সবকিছুকেই নিজের নিয়ন্ত্রণের ভিতর নিয়ে আসতে চায়, পঞ্চায়েতের তেমনি স্বৈরাচারিতার দিকে ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। এইসবই দুঃখজনক। গ্রামোন্নয়নের জন্য এমন অনেক কাজই আছে, যেমন বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ও শিক্ষার প্রসার, উপযোগী প্রযুক্তির প্রচার ও প্রবর্তন, যেখানে পঞ্চায়েতের একটা সদর্থক ভূমিকা সম্ভব ও প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে দলীয়তা যত কম থাকে ততই ভাল। সুনিয়মের সীমার ভিতর ব্যক্তি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। স্বায়ত্তশাসন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই লক্ষ্য।

একই সঙ্গে ঐক্য চাই, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে ঐক্যের বিরোধ নেই। ক্ষমতা নিয়ে লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে দেশ টুকরো টুকরো হতে চলেছে। এই হিংস্র লড়াইটাকে কী করে সংযত করা যায় সেটাই প্রশ্ন, তা নইলে সর্বনাশ। এদেশের মনস্বীরা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছেন। বিকেন্দ্রীকরণ ও মৌল বা "তৃণমূল" স্বায়ত্তশাসনের ভিতর দিয়েই এই বৈচিত্র্যবিধৃত ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব। বাঁচবার জন্যই ঐক্যের প্রয়োজন, ঐক্যের আরো প্রসার প্রয়োজন। রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি সবই এইখানে এসে মিশেছে। দেশভাগের ভিতর দিয়ে ঐক্যের প্রয়োজনটাই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার পথ সম্বন্ধে আমাদের নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিছুদিন আগে এদেশের এক প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তানকে আটকাবার জন্য ভারতের হাতে পারমাণবিক বোমা থাকা একান্ত আবশ্যক। সারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আমরা যুদ্ধসাজের যে দৃশ্য দেখে এসেছি ভারতীয় উপমহাদেশে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে। পার্থক্য এই, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলির তুলনায় আমাদের দেশ অনেক দরিদ্র। ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশের মতো অতি দরিদ্র দেশে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-স্বাস্থ্যের যতই অভাব থাকুক না কেন যুদ্ধের অস্ত্রসংগ্রহের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় চলেছে, এই অবস্থাকে আমরা অসহায়ভাবে মেনে নিচ্ছি, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কী হতে পারে! দেশকে যতই টুকরো টুকরো করা হবে ততই যুদ্ধশিবিরের সংখ্যা বাড়বে, সেনাবাহিনীর ভার সামলাতে সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাবে। এই পথে কারো নিরাপত্তা নেই, যুদ্ধ যদি বাধে তবে তার আঘাত সকলের পক্ষেই

ভয়ংকর হবে। এই পরিস্থিতি থেকে কি উদ্ধার নেই ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে দুই যুদ্ধশিবির গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এই অবস্থাটাকে অনিবার্য মনে হয়েছে, পরিবর্তনের কোনো আশাই দেখা যায়নি। অবশেষে ১৯৯০ সালে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেছে। ইউরোপ শান্তি ও পুনর্মিলনের দিকে পা বাড়িয়েছে। এটা কোনো যুদ্ধের পথে ঘটেনি, ঘটতে পারত না। অহিংসা শব্দটি অথবা তার প্রতিশব্দ এখন ইউরোপীয় নেতাদের মুখে বারবার শোনা যাচ্ছে। মানুষের ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, তবু ইউরোপ যে একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে সেটা স্পষ্ট। ভারতের সামনে কি নতুন পথ নেই ? সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য একটাই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থাকবে, একটিই সেনাবাহিনী, এটা কি অসম্ভব স্বপ্ন ? অতিসীমিত কিছু দায়িত্ব নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসন, অঙ্গরাজ্যগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের উদার অধিকার, গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে স্বায়ত্তশাসনের বনিয়াদী প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি দান, এই পথেই তো শান্তি স্বাধীনতা ও ঐক্যের জন্য নতুন সংবিধান রচনা সম্ভব। এটা হয়তো আজও দূরের লক্ষ্য। কিন্তু ইতিহাস অভাবনীয় পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আশা রক্ষা করা ছাড়া উপায় কী ?

নবচিন্তকেরা নতুন আশার জন্ম দেন, তাকে লালন করেন, ক্রমে সেটা বাস্তবে পরিণত হয়। সংকটের অন্ধকারের মধ্যেই নতুন আশা অংকুরিত হয়, স্বপ্নের কুঁড়িরা আলোর জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে, ক্রমে নবচেতনা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইরকমই বারবার হয়েছে।

এ দেশে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন শীঘ্র আশা করা যায় না। উন্নতির কোনো অনিবার্য উর্ধ্বরেখাও নেই। তবু মনে রাখতে হবে যে আমরা ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে শেষ পর্যন্ত ঐক্যের বিকল্প নাস্তি, ঐক্যের বিকল্প বিনাশ। পথ যদিও পতন-অভ্যুত্থানে বন্ধুর তবু লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার হওয়া চাই। ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে যে বৃহৎ ঐক্যের কথা এইমাত্র বলা হয়েছে, সারা পৃথিবীর ঐক্যের যেটা আঞ্চলিক প্রতিচ্ছবি, তাকেই লক্ষ্য বলে জানতে হবে। লক্ষ্য স্থির হলে বিচার পরিষ্কার হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন "দুঃসাধ্যসাধনের প্রয়াস", আমরা প্রত্যেকে গ্রামে শহরে সর্বত্র, নিজ নিজ ছোটো বৃত্তের ভিতর, তারই অনুকূল সমাজ ও সংস্কৃতির রচনার কাজে যদি সাধ্যমতো নিযুক্ত থাকি তবেই রামায়ণের সেই ক্ষুদ্রা কাঠবেড়ালটির মতো ঐতিহাসিক সেতু রচনার কাজে আমরা সামান্য কর্মীর মর্যাদার অধিকারী হব। এ দায়িত্ব হিন্দুর, এ দায়িত্ব মুসলমানের, প্রতি সম্প্রদায়ের, প্রতিটি ব্যক্তির। গান্ধীর মৃত্যুদিবসে কি আমরা নতুন করে শপথ নেব ?

উল্লেখপঞ্জী

১। Simon Kuznets "Economic Growth and Income Inequality", American Economic Review, March, 1955.

২। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর গণতন্ত্র অসম্ভব একথা আধা সত্য মাত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না ; কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিতর থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হওয়া সম্ভব এবং ধনতন্ত্রের ক্রমান্বিত সংস্কারের ভিতর দিয়ে এই আন্দোলন ধাপে ধাপে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

৩। প্রত্যাহারের পর লেনিন ইত্যাদিরা অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ-অবস্থা ওঁরা বৈপ্লবিক নীতির দিক দিয়ে গ্রহণ করেননি, গৃহযুদ্ধের অবস্থার বিপাকে সাময়িকভাবে গ্রহণ

করতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র। অথচ গৃহযুদ্ধ যখন প্রায় অবসিত সেই অবস্থাতেও এই ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করবার উদ্দেশ্যে অন্ততঃ দুটি নূতন ডিক্রী জারি করা হয়েছিল ; আর যতদিন গৃহযুদ্ধ চলছিল ততদিন বহু কম্যুনিস্ট নেতার বিবৃতিতে এ-কথাই বারবার শোনা গেছে যে, এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কম্যুনিস্ট বৈপ্লবিক আদর্শ দিনে দিনে মূর্তিমান হয়ে উঠছে। এবিষয়ে পোলানীর "The Logic of Liberty" পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা অবশ্যপাঠ্য।

৪। এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এর বক্তব্যের সঙ্গে পরবর্তী অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখার জন্য এই তারিখটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

৫। "The bourgeois relations of production are the last antagonistic form of the social process of production"—(Critique of Political Economy).

৬। এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখনও চীনের বর্তমান নেতাদের "বৈরবিহীন" দ্বন্দ্ব রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করেনি।

২

অর্থনীতি

খাদ্য ও কৃষি সমস্যা

কিছুকাল যাবৎ আমাদের আর্থিক বিশেষ দুর্দিন চলছে। এর কারণের দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা সম্ভব কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ আমাদের কৃষির দুরবস্থা।

গত পাঁচ-সাত বৎসর আমাদের খাদ্যোৎপাদন বাড়েনি। ১৯৬০-৬১-র পর ১৯৬৪-৬৫ সালে কিছুটা বেড়েছিল বটে, কিন্তু পরবর্তী দু' বৎসরে আবারও কমে গেছে। ফলে খাদ্যমূল্য ও অন্যান্য দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দু' বছরে শস্যোৎপাদন কমবার অন্যতম কারণ দেশের একটা বড় অংশ জুড়ে খরা অথবা সুবৃষ্টির অভাব। বর্ষণের সঙ্গে কৃষিশ্রীর এই সম্পর্ক শুধু এদেশেই নয় বিদেশেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৮-৫৯ সালের পর তিন বৎসর চীনদেশে খাদ্যোৎপাদন কম হয়; সে দেশের সরকার তখন প্রধান অপরাধী হিসাবে আবহাওয়াকে সনাক্ত করেন। এমন কি ভারত অথবা চীনের অপেক্ষা শিল্পে অনেক বেশী অগ্রসর সোভিয়েত দেশেও গত দশ বৎসরে আবহাওয়ার ভালমন্দর ফলে শস্যোৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি বারবারই চোখে পড়ে। অতএব এদেশে বৃষ্টির উপর কৃষির নির্ভরতা বহুদিন চলবে এ কথাটা ধরেই নেওয়া যায়?

এইটুকু বলে শেষ করলে অবশ্য সবটুকু বলা হয় না। ফলন শুধু বর্ষণের উপরই নির্ভর করে না, কৃষি ব্যবস্থার উপরও নির্ভর করে। বারিধারাটা এখনও প্রধানত আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে; কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি আমাদের হাতের বাইরে নয়। তবে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সময়সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে আমাদের খাদ্যের যোগান কম। অতএব কি করা যায়?

এখানে গোড়াতেই একটা তর্কের সম্ভাবনা আছে। ১৯৬৬ সালে কংগ্রেসী সরকারের আমলে অনেকে জোর গলায় বলেছিলেন যে, দেশে খাদ্যের অভাব নেই; খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির ওটা কারণ নয়। এখনও কেউ কেউ সেকথা বলছেন, হয় তো বা খানিকটা কম প্রত্যয়ের সঙ্গে। কিন্তু ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি এবং ইতিমধ্যে দেশের জনসংখ্যা যে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে একথাটা অস্বীকার করা কঠিন। হিসাব করে হয়তো দেখান সম্ভব যে, দেশে মোট যে পরিমাণ খাদ্য আছে সেটা সকলের ভিতর সমানভাবে ভাগ করে দিলে সকলেরই একরকম চলে যেত। কিন্তু এ যুক্তিটার উপর নির্ভর করে বেশীদূর এগোনো যায় না। শস্যোৎপদান হ্রাস পেলেও মাঝারি ও বড় চাষীর পরিবারে আহারের পরিমাণ প্রায় একই থাকে; হ্রাসবৃদ্ধির ধাক্কাটা গিয়ে পড়ে অন্যদের উপর। চাষীর কাছ থাকে ধান কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাতেও বেশী লাভ নেই। নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, খুব বড় গোছের জোরজদবরদস্তি

করতে গেলে চাষী বরং তার শস্য ও সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে ; তাতে সারা দেশেরই ক্ষতি।

তাহলে কী করা যায় ? চাষীর হাতে এখন যেটুকু শস্য উদ্বৃত্ত আছে সেটা দেশময় অবাধে বিক্রী করতে দেওয়া হোক, কেউ কেউ একথা বলেছেন। এর পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। একটা উদাহরণ ধরা যাক। বীরভূমে উদ্বৃত্ত শস্য আছে, কিন্তু চব্বিশ পরগণায় এখন ঘাটতি। বাইরে থেকে চব্বিশ পরগণায় খাদ্যের আমদানি বন্ধ করে দিলে ওখানে মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে, লোকের কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠবে। বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর থেকে চব্বিশ পরগণায় চাল রপ্তানির সুযোগ থাকলে ঐসব জেলায় চালের দাম খানিকটা বাড়বে বটে, কিন্তু চব্বিশ পরগণায় অনেকটা কমবে। মোটের উপর এতে দেশের মানুষের কষ্ট কম হবে। শুধু জেলা-রাজনীতির দৃষ্টি নিয়ে তাকালে স্থান থেকে স্থানান্তরে খাদ্য চলাচলে বাধা সৃষ্টির নীতি সমর্থনযোগ্য মনে হতে পারে ; কিন্তু দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখলে যথাসম্ভব অবাধ চলাচলই ভালো।

দেশময় খাদ্যের চলাচল অবাধ হলেও অবশ্য খাদ্যমূল্য স্বাভাবিক স্তরে নেমে আসবে বলে আশা করা যায় না। খাদ্যের ঘাটতি দূর না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যমূল্য অস্বাভাবিক থাকবে। এ অবস্থায় দেশের দরিদ্র লোকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য সরকারের কিছু কর্তব্য আছে। অর্থাৎ নিম্ন আয়ের ব্যক্তিরা যাতে বাজার দরের চেয়ে সস্তায় অত্যাবশ্যক খাদ্য যোগাড় করতে পারেন সে ব্যবস্থা চালু রাখার দায়িত্ব সরকারের। ব্যবস্থাটা নানাভাবে করা যায়। সরকার বাজার দরে চাল ক্রয় করে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করতে পারেন। এতে অসুবিধা এই যে, ক্রয় ও বিক্রয় মূল্যের ভিতর অনেকটা পার্থক্যের ফলে সরকারের এই খাতে বহু অর্থব্যয় হবে। অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় কাজে অর্থের অনটন ঘটবে। দ্বিতীয় পথ হিসাবে সরকার মাঝারি ও বড় চাষীদের কাছ থেকে নিয়ন্ত্রিতমূল্যে ধান অথবা চাল ক্রয় করে স্বল্পমূল্যে বিক্রী করতে পারেন। চাষীকে যে দাম দেওয়া হবে সেটা বেশী নিচু হলে চলবে না ; কারণ তাতে ধানচাল আদায় করা কঠিন হবে, ভবিষ্যতে কৃষিকাজে চাষীর উৎসাহও কমে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বছর চাষীদের আগের চেয়ে বেশী দাম দিতে রাজী হয়েছেন ; নীতি হিসাবে এটা ভালো। একই সঙ্গে রেশনের দোকানে চালের মূল্য বৃদ্ধি না করবার ফলে অবশ্য সরকারের উপর একটা ঘাটতির বোঝা এসে পড়েছে। সংবাদে প্রকাশ যে, এ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাড়ে চার কোটি টাকা চেয়েছিলেন ; কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হননি। কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে অসম্মতির কারণ অনুমান করা অবশ্য কঠিন নয়। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার চাইবেন এ অবস্থায় চাষী ও ক্রেতাসাধারণ উভয় পক্ষকেই যথাসম্ভব সন্তুষ্ট রেখে ঘাটতির বোঝাটা কেন্দ্রের উপর নিয়ে ফেলতে ; কেন্দ্র চাইবেন প্রদেশ সরকারকে এই ঘাটতি বৃদ্ধির ব্যাপারে সংযত করতে।

প্রদেশ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও ঘাটতি হ্রাসের ব্যাপারে বিভিন্ন উপায় চিন্তা করে দেখবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি রাজস্ব বিলোপ না করে সেটাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যায় কিনা চিন্তার যোগ্য। এই নতুন ব্যবস্থায় চাষীকে ভূমিরাজস্ব বা ভূমিকর দিতে হবে টাকায় নয়, ধানে। খাদ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যতদিন রোধ করা যাবে না ততদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থাটা বিবেচ্য। একর প্রতি দেয় ধানের পরিমাণ ছোট চাষীর তুলনায় বড় চাষীর ক্ষেত্রে ক্রমশ বাড়ানো যেতে পারে। এইভাবে সরকার কিছুটা ধান কর হিসাবে বিনামূল্যে পেতে পারেন। এতে কৃষকের নিজ উদ্বৃত্ত ধানের পরিমাণ

জানাবারও প্রয়োজন নেই। যে সব চাষীর জমির আয়তন পাঁচ একরের কম তাঁদের এই কর থেকে রেহাই দেওয়া ভালো। কর মিটিয়ে দেবার পর উদ্বৃত্ত ধান, বা তার প্রধান অংশ, সকল চাষীকে অবাধে বিক্রী করতে দেওয়া যেতে পারে। সরকারও প্রয়োজনমত বাজারে ধানচাল ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন। শহরে রেশনের দোকানে সবাইকে স্বল্পমূল্যে চাল সরবরাহ্ না করে যাঁদের মাসিক আয় পাঁচশ টাকার কম তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট।

দীর্ঘকালীন দৃষ্টিতে কিন্তু আমাদের খাদ্য তথা আর্থিক সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব নয় কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধি ভিন্ন। এদিক থেকে কৃষি ব্যবস্থার আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে বহুদিন আগে কৃষির উন্নতির জন্য একটা ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশজোড়া লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষক আর তারই মাঝে মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকজন অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, সঙ্গতিবান, বড় কৃষক। ব্যাপারটা তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে : কৃষির উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও মূলধনের প্রয়োগে নেতৃত্ব আসবে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, অর্থবান বড় কৃষকদের পক্ষ থেকে। সেই দৃষ্টান্তে ছোট কৃষকদের উন্নতিও ত্বরান্বিত হবে। ভূমির অধিকারী ছোট ছোট কৃষকেরা হবেন জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ ; কিন্তু দৃষ্টান্ত ছাড়া ছোট চাষীর পক্ষে তাড়াতাড়ি এগোনো সম্ভব নয়।

রাণাডের কথাটা চিন্তা করে দেখবার মত। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে অবশ্য ঠিক একই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন নয়। মধ্যপ্রদেশের মত যে-সব অঞ্চলে চাষীদের ভিতর শিক্ষার মান বিশেষভাবে নিচু অথচ জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী সেই সব অঞ্চলে রাণাডের প্রস্তাব বিশেষ প্রযোজ্য মনে হয়। আবার কেরলের মত যে-অঞ্চলের সাধারণ গ্রামেও শিক্ষার মান উঁচু ও জমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে বড় চাষীর প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। কাজেই ভারতের সকল অঞ্চলের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা এবং ভূমির মালিকানার ঊর্ধ্বমাত্রা ঠিক একই প্রকার হবার আবশ্যকতা নেই।

ছোট ও বড় চাষীর এই সহাবস্থান ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে হলে আরও কয়েকটি ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে।

প্রতিটি চাষীর জমি যথাসম্ভব একটি অবিভক্ত খণ্ড হিসাবে তাকে দেবার চেষ্টা করতে হবে। বড় চাষীর জমি বহুখণ্ডে বিভক্ত থাকলে রাণাডের উদ্দেশ্য বিফল হবে। জমির এই পুনর্বিন্যাস সহজ নয়, কিন্তু এটা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত গ্রামে গ্রামে শিক্ষার দ্রুত প্রসার অত্যাবশ্যক। এছাড়া গ্রাম্য জীবনের জড়ত্ব ভাঙ্গবে না। শিক্ষার আংশিক প্রসারে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, কারণ গ্রামবাসীর ভিতর যে ক'জন শিক্ষিত তাঁরা শহরে গিয়ে ভিড় করেন। সবাই শিক্ষিত হলে শিক্ষিত লোক গ্রামে থাকবেন : সকলের পক্ষে শহরে যাওয়া সম্ভব নয়। যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রাম থেকে নিরক্ষরতা দূর করা প্রয়োজন।

আমাদের দরিদ্র গ্রামে যেখানে শৈশব অতিক্রান্ত হলেই চাষীর ছেলে মাঠে কাজে নামে সেখানে অক্ষরজ্ঞান ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া অবশ্য সহজ কাজ নয়। শুধু স্কুলঘর তৈরী করলেই শিক্ষাবিস্তার হয় না। তাই শিক্ষাকে কি করে জীবন ও জীবিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করা যায় গান্ধীজী সেই দৃষ্টি নিয়ে সমস্যাটা বুঝতে চেয়েছিলেন, সেটাই প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে ছোট চাষীরাই তাতে প্রধান অংশগ্রহণ করতে পারেন। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থারও অনুরূপ বিবর্তন

প্রয়োজন। বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি প্রায়ই গ্রামের অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান কয়েকজনের কুক্ষিগত। এই গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের যুগে সাধারণ নিম্ন আয়ী গ্রামবাসীকে আরও অধিক সংখ্যায় পঞ্চায়েতের সভ্য হিসাবে গ্রহণ করবার কথা বিশেষভাবে ভাবতে হবে। সমবায় ও পঞ্চায়েতে সাধারণ চাষীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না হলে গ্রামে গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সামাজিক বিরোধ ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। আর্থিক উন্নতির কাজেও এই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে সরকারের দাক্ষিণ্য শুধু বিত্তবানের দুয়ারে গিয়ে না ঠেকে, বরং সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে সহায়তা করে।

কৃষির উন্নতির জন্য এখন প্রয়োজন হল জল এবং সেই সঙ্গে সার ও উৎকৃষ্ট বীজের উপযুক্ত ব্যবহার। জল সরবরাহের ব্যবস্থা না হলে সারের ব্যবহারের সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই জলের ব্যবস্থার দিকে প্রথমে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সারের জন্য ক্ষেত্র তৈরী হলে সার ও উৎকৃষ্ট বীজ যাতে কৃষকের, বিশেষত ছোট কৃষকের হাতে যথাসময়ে পৌঁছয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ছোট কৃষকের সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এটা সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া কোথায় কোথায় কী ধরনের সার কত পরিমাণে প্রয়োজন সে বিষয়ে গবেষণা ও নির্দেশ দানের জন্য প্রতি অঞ্চলে বিশেষজ্ঞ থাকা চাই।

কৃষির উন্নতির জন্য কী প্রয়োজন ও কী প্রয়োজন নয়, এ-বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর কিছু ভুল ধারণা বহুদিন যাবৎ চালু আছে। অনেকের ধারণা যে, যৌথ চাষ প্রথা ও ট্র্যাকটরের ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। এটা ভুল ধারণা। এশিয়া ও ইয়োরোপের যে-দেশগুলিতে চাষ সবচেয়ে উন্নত তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই ভুলটা চোখে পড়ে। এশিয়ায় কৃষির সর্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটেছে জাপানে এবং ইদানীং ফরমোসায়। এ-সব দেশে ট্র্যাকটরের ব্যবহারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে না, চাষের কাজ অল্প সংখ্যক লোকের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় এই মাত্র। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ট্র্যাকটর কখনও প্রয়োজন হয় বটে ; কিন্তু সাধারণভাবে বলা চলে যে, ভারতের মত দেশে শিল্পে অটোমেশনের আবশ্যক যেমন সীমায়িত, কৃষিতে ট্র্যাকটরের প্রয়োজনও তেমনই।

অপরপক্ষে কৃষকদের ভিতর শিক্ষার প্রসার সকল দেশেই উন্নতির একটি আবশ্যিক শর্ত। সেই সঙ্গে আরও প্রয়োজন চাষে জল সরবরাহ ও নিষ্কাসনের ব্যবস্থা, সারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ, শস্যনাশী কীট ও বীজানু ধ্বংসের সাবধানী ব্যবস্থা, শস্য মজুত রাখবার জন্য ভালো গুদাম, এবং চাষী যাতে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী হয় সেজন্য সুমূল্য নির্ধারণ। কৃষি উন্নয়নের এই পথ।

আমরা দেশ গড়বো কবে ?

আমাদের দেশপ্রেম আমরা গানে গানে যতটা ছড়িয়ে দিয়েছি, দেশ গড়বার কাজে ততটা প্রসারিত করিনি।

আমরা নাকি এদেশের মানুষকে ভালোবাসি। সে ভালোবাসা এদেশের মানুষের মন থেকে অজ্ঞতা দূর করবার কাজে এগিয়ে যেতে আমাদের কতটুকু সাহায্য করেছে ? এই সেদিনও (২৭ মার্চ, ১৯৬৮) ডাঃ ত্রিগুণা সেন লোকসভায় বললেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের কাজে ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশ যতটা এগিয়ে গেছে, বাংলা দেশ ততটা এগোয়নি। ভারতের এই পূর্ব কোণে আধুনিক শিক্ষার প্রথম আবির্ভাব রামমোহনের দিনে। সেই বাংলা দেশ আজ অশিক্ষায় অগ্রণী হতে চলেছে। আমাদের সকলের পক্ষেই, বিশেষত বিশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনের পক্ষে, এটা লজ্জার কথা। আমরা শিক্ষার চেয়ে রাজনীতিকে, মানুষ তৈরীর কাজের চেয়ে ক্ষমতার কাড়াকাড়িটাকে বড় ভেবে নিয়ে দিনে দিনে ডুবছি। প্রাথমিক শিক্ষকেরাও অর্থব্যয় করে দিল্লীতে গিয়ে দাবি করেছেন, রাজ্যপাল ধর্মবীরকে বাংলা দেশ থেকে সরাও। তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন শিক্ষকদের সংগঠন থেকে রাজনীতি সরানো এবং সেখানে খানিকটা শিক্ষাপ্রীতি ঢোকানো।

আমরা নাকি এদেশের মাটিকে ভালোবাসি। এদেশের কৃষি অথবা আর্থিক মানচিত্রের দিকে তাকালে বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, কথাটা সত্য। সরকারী ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও কর্ষিত জমির একটা বড় অংশ এখনও স্বল্পাংশ লোকের হাতে থেকে গেছে। এই অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ও শিক্ষিত ভূম্যধিকারীরা দেশের মাটিকে সুফলা করাবার জন্য কতটুকু উদ্যোগী হয়েছেন ? যখন ধান কাটা হয়, তখন তাঁরা গ্রামে যান শস্যের একটি অংশ গ্রহণ করবার জন্য। কিন্তু শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তাঁরা কি করছেন ? অথচ করবার কাজ অনেক আছে। একর প্রতি উৎপাদনে এশিয়ার অন্যান্য বহু দেশের চেয়ে আমরা পিছিয়ে আছি। ভারতের তুলনায় চীনে একর প্রতি ধানের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ, তাইওয়ানে আরও বেশী। জাপানে তো প্রায় সাড়ে তিন গুণ। ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৫২-৫৩ সালের গড়পড়তা হিসাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে একর প্রতি ধানের উৎপাদন ছিল আমাদের চেয়ে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বেশী ; কিন্তু দশ বৎসর পর ওঁদের পরিমাণ দাঁড়ালো আমাদের প্রায় দেড় গুণ।

অর্থাৎ, আমাদের জমির উৎপাদন বাড়াবার সম্ভাবনা যতখানি, সেই তুলনায় কাজ হয়েছে সামান্য। আমাদের মাটিকে আমরা অবহেলা করেছি। দেশকে শস্যশ্যামলা কবরার জন্য কী প্রয়োজন তা জেনে নেওয়া আজ কঠিন নয়। ওপরে যে-ক'টি দেশের নাম করেছি তাদের নানা ব্যাপারে পার্থক্য, কিন্তু একটি জায়গায় মিল ; প্রত্যেকটিতেই আমাদের তুলনায় জমিতে সারের ব্যবহার বেশি। সারের সঙ্গে চাই জল, উপযুক্ত বীজ, কীটনাশকের ব্যবস্থা। শিক্ষিত ও বিত্তবান ভূম্যধিকারীদের কাছ থেকেই এই নতুন ধরনের চাষের প্রবর্তনে নেতৃত্ব প্রত্যাশিত। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এই প্রত্যাশা পূর্ণ হচ্ছে কোথায় ? এ কথাটা আজ তীক্ষ্ণ ভাষায় জিজ্ঞাসা করবার সময় এসেছে : যাঁরা সঙ্গতি থাকতেও কৃষির উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী নন তাঁরা জমি থেকে আয় আশা করেন কোন্ যুক্তিতে ? এ প্রশ্নের একটি পুরনো উত্তর অবশ্য আমরা জানি। টাকা ব্যাংকে রাখলে যদি

সুদ পাওয়া যায় তো টাকা দিয়ে জমি কিনলে খাজনা নেওয়া যাবে না কেন ! এই উত্তরে আজ আর সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। মূল কথাটা হলো এই যে, এদেশের মাটিকে যদি আমরা ফলবান করতে চাই তো এই মাটিতে তাঁদেরই অধিকার সর্বাগ্রগণ্য, যাঁরা দেশকে শস্যশ্যামলা করতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট। ব্যক্তিবিশেষের কোনো দাবি যদি এই মহৎ প্রচেষ্টার পথে বাধা হয় তো সমাজ সেই দাবিকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য নয়। যাঁরা জমিতে নিজ অধিকার বলবৎ রাখতে চান, কৃষির উন্নতির জন্য তাঁদের সক্রিয় হতে হবে।

অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ভূম্যধিকারীর জমিও এখন ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট খণ্ডে। যাঁরা জমির উন্নতিতে আগ্রহী তাঁরা এর ফলে বাধা পান। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। বৃহদাকার ক্ষেত ও ট্র্যাকটরের ব্যবহার ছাড়া একর প্রতি উৎপাদন বাড়ানো যায় না এ-ধারণাটা ভুল। তবু জমি বহু খণ্ডে থাকলে তাতে কিছু কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। একত্রসংবদ্ধ একটি ক্ষেতের জন্য নলকূপের ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত লাভজনক ; চাষের উপর নজর রাখাও তাতে সহজ হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষকে কৃষিকাজে নামাবার জন্য যদি বহু খণ্ডে বিভক্ত জমিকে সংবদ্ধ করা প্রয়োজন হয় তো এবিষয়ে আর বিলম্ব না করাই উচিত। জমির উন্নতিতে অমনোযোগী জোতদার ও নিরক্ষর ভাগচাষীকে নিয়ে উন্নত কৃষি ও বলিষ্ঠ সমাজ গড়া যাবে না।

আমরা নাকি বাংলা দেশকে ভালোবাসি। কিন্তু কলকাতা থেকে দূরবর্তী জেলাগুলি মহানগরীর কাছ থেকে বিমাতার স্নেহও লাভ করেনি। কলকাতা দিল্লীর মন এমন কি সহায়তা থেকেও তত দূরে নয়, বাংলার অবহেলিত জেলাগুলি কলকাতাবাসীর চিন্তা থেকে যত দূরে। ফলে বাংলা দেশের রাজধানী থেকে এই জেলাগুলিতে যাতায়াত অপেক্ষাকৃত কঠিন। শিক্ষার ব্যবস্থাও তদ্রূপ। জেলায় জেলায় আজ নতুন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে ; এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রেরা কলকাতার বাইরে কোথাও পড়বার প্রস্তাবকে নির্বাসন দণ্ডের মতোই দুর্ভাগ্যজ্ঞান করেন। বিদেশী মিশনারীরাই শুধু সেখানে হাসিমুখে পড়াতে রাজী। ফলে এই দূরের জেলাগুলিতে জ্ঞানের আলোও বৈদ্যুতিক আলোর মতোই নিষ্প্রভ ও ক্বচিত প্রাপ্য।

এদেশের মেধা ও সম্পদ, রাজনীতি ও জনবল কেন্দ্রীভূত হয়েছে কলকাতা মহানগরীতে ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায়। কলকাতার জনসংখ্যা জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলার সমবেত জনসংখ্যার চেয়ে বেশী। হাওড়া ও হুগলী জেলাকে পশ্চিম দিনাজপুরে ঢুকিয়ে দিলে তারপরও আধ ডজন কলকাতা শহরকে পাশাপাশি বসাবার মতো স্থান অবশিষ্ট থাকে। অথচ পশ্চিম দিনাজপুরের জনসংখ্যা হাওড়া ও হুগলি জেলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও নয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন উন্নতি শুরু হয়, তখন তার রাজধানী স্থাপিত হয় ওয়াশিংটনে, বাণিজ্যের কেন্দ্র নিউ ইয়র্কে, শিক্ষার কেন্দ্র হারভারডে। কলকাতা আমাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র, আবার শিক্ষা ও রাজনীতিরও কেন্দ্র। এই অতিকেন্দ্রিকতা মহানগরীর পক্ষেও ভালো নয়, বাংলা দেশের পক্ষেও নয়। অবশিষ্ট বাংলার পশ্চাৎপদতা ও রাজধানীতে অসংখ্য স্বার্থান্বেষীর তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এদেশের সমাজকে অসুস্থ করে তুলেছে। এর প্রতিকার প্রয়োজন। বাংলা দেশের সামগ্রিক উন্নতি ছাড়া কোটি কোটি অর্থব্যয়েও কলকাতাকে আলাদাভাবে সুস্থ করে তোলা যাবে না।

কথাটা অবশ্য আমাদের অনেকের মনেই ইদানীং উকিঝুঁকি দিচ্ছে। মারচের ২৮-২৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, মাদরাজের উদাহরণে উৎসাহিত

হয়ে "আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে আরও দশটি শিল্প এসটেট স্থাপনের বিষয় রাজ্য সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করছেন।" শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যাতায়াতের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ, শিক্ষার আয়োজন ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করে তবেই শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে ; এই বৃহৎ পরিকল্পনার কোনো বিশেষ অংশের আলাদাভাবে সাফল্য আশা করা যায় না।

শিক্ষা, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে একটি বিরাট অসমাপ্ত কাজ দীর্ঘকাল সমাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের অভ্যস্ত রাজনীতি গঠনমূলক পরিকল্পনার অনুকূল নয়। যে-দেশপ্রেম গড়তে জানে না তা বিদ্বেষ হয়ে সব ভাঙতে চায়। আমাদেরও তাই হয়েছে। এর পরিবর্তন সাধন সহজ নয় ; অথচ একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অথবা পশ্চিমবঙ্গকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়ে আমরা এদেশের কোনো মহৎ ভবিষ্যৎ উদ্ঘাটন করতে পারব, এ-চিন্তা বৈপ্লবিক বাতুলতা ছাড়া কিছুই নয়। এই মূঢ় বিপ্লবমত্তার পাশে পাশে আছে এক সংকীর্ণচিত্ত স্বজন ও অনুচর পোষণ নীতি, সমাজের স্বাভাবিক ঐক্য ও ন্যায়বোধ যাতে দণ্ডে দণ্ডে খণ্ড খণ্ড হচ্ছে। এরও পরিবর্তন প্রয়োজন। আজ যখন নতুন করে নির্ধারিত হবার দিন এসেছে যে, আগামী বহু বৎসরের জন্য ভারতে কারা এগিয়ে যাবে আর কারা পিছিয়ে পড়বে, তখন আমরা যেন এমন একটা রাজনীতিকে আঁকড়ে না থাকি যাতে আমাদের পিছিয়ে পড়াই অনিবার্য হয়।

রাজ্যপালের শাসন চিরস্থায়ী হবে না। আবারও একদিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে, বিধান সভা ডাকতে হবে। যাঁরা গড়বার কাজে আগ্রহী, তাঁদের কি সেই বিধান সভায় আমরা পাব ? একটি বড় গঠনমূলক কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে তাঁরা কি দলনির্বিশেষে দেশ গড়বার কাজে মিলিত হতে পারবেন ? ঐতিহাসিক সূত্রে অর্জিত বহু তিক্ততা ও ছোট ছোট কলহের চেয়ে ভবিষ্যতের দাবি কি বড় বলে স্বীকৃত হবে ? যদি হয়, তবেই মঙ্গল। আমাদের সমস্যা এতো জটিল, সম্পাদ্য কর্ম এতো বৃহৎ, এবং যথাসম্ভব শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন এতো গভীর যে, গড়বার কাজে যাঁরা যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁদের কাউকেই আজ দূরে সরিয়ে রাখার অর্থ হয় না।

শ্লোগান বনাম সত্য

স্বাধীনতা লাভের আগে দেশপ্রেমের মন্ত্র ছিল এদেশের অধিকাংশ আদর্শবাদী মানুষের মূলমন্ত্র। শহীদের আত্মত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না, এ কথাই সেদিন আমরা বারবার বলেছি। দেশ গড়বার কাজে এর সঙ্গে আরও কিছু যোগ করা আবশ্যক, বিশেষত নিয়মিত শ্রমের অভ্যাস ও যুক্তিবাদী মন।

জাতি হিসাবে আমরা অলস। কথাটা হয়ত রূঢ় শোনাচ্ছে, তবু বলা দরকার।

আলস্যজর্জর একটা দেশে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে যে-সব সমস্যা দেখা দেয় আমাদের সমস্যা বহুলাংশে তাই। একটা জীর্ণ কৃষি ও শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে এটাই আমাদের আর্থিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে আছে। একথাটা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। আজ দেশ জুড়ে দুর্নীতির কথা অনেক শোনা যাচ্ছে। দুর্নীতি নিন্দনীয় সন্দেহ নেই। যে-ধন অন্যায়ভাবে লব্ধ তার বন্টন নিয়ে সমাজের স্বাভাবিক সংহতি ভেঙে পড়ে ; অন্যায়ে আত্মসম্মানবোধ দুর্বল হয় ; অন্যায়ে অন্যায় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু এদেশের মূল ব্যাধি আলস্য। তাই আমাদের দুর্নীতির নিন্দাতেও কোথাও একটা ফাঁকি থেকে যায় ; অপরের নিন্দাটা আমরা ব্যবহার করি নিজের কর্তব্যবিমুখতার আচ্ছাদন হিসাবে। অথবা কুৎসাকীর্তনটাই একটা মধুর আলস্যের মত আমাদের পেয়ে বসে। আলস্যের নিন্দায় আমাদের মন তেমনভাবে সাড়া দেয় না। অথচ আর্থিক উন্নতির ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, অন্য বহু দোষকে সে-ইতিহাস ক্ষমা করেছে, কিন্তু আলস্যকে করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ জীবনধারণের মান খুব উন্নত। কঠিন পরিশ্রমে সেটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ওদেশের বন্ধুরাও আশা করি বলবেন না যে, ওখানে দুর্নীতি ছিল না অথবা নেই। শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগেও দুর্নীতি প্রকট ছিল। সোভিয়েত দেশের শত্রু না-হয়েও বলা সম্ভব যে ওদেশ দুর্নীতিমুক্ত নয়। অপরপক্ষে জার্মানী-জাপান-ইংল্যাণ্ড অথবা অন্য যে-কোনো দেশেরই নাম করা যাক না কেন, নিয়মিত শ্রমের অভ্যাস ছাড়া কোথাও আর্থিক উন্নতি সম্ভব হয়নি।

এদেশে ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে ক'ঘণ্টা অথবা কী পরিমাণ শ্রমশক্তি নষ্ট হয়েছে তার হিসাব কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু কাজের সময়ে আলস্য এবং নিছক সময়ানুবর্তিতার অভাবে কী পরিমাণ শ্রমশক্তি নষ্ট হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। সে-হিসাবটা যদি সম্ভব হত তবে দেখা যেত যে এতে করে দেশের সম্পদের যে-অপচয় অহরহ ঘটছে তার তুলনা নেই। এই অপচয় যতদিন না আমাদের বিবেককে পীড়িত করবে ততদিন আমরা পৃথিবীতে প্রাগ্রসর দেশ হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব না। এই অযোগ্যতাকে গালভরা বুলি দিয়ে আবৃত করবার চেষ্টা শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার মতই হাস্যকর ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

বামপন্থী মহলে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। কথাটা এই যে শোষকশ্রেণীর অবসান না-হওয়া পর্যন্ত শোষিতের মনে কর্মে উৎসাহ আশা করা যায় না। শোষণতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে, সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশ ও ধনতান্ত্রিক জাপান উভয় দেশেই শ্রমিকের ভিতর কর্মনিষ্ঠা দেখা গিয়েছে। আর্থিক উন্নতির জন্য সামাজিক নানা পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু কতটা পরিবর্তন অথবা কী ধরনের পরিবর্তন চাই, এ বিষয়ে ইতিহাসনির্দিষ্ট কোনো একমাত্র পথ নেই। গত বিশ বছরের ভিতর শিল্পের উন্নতি পূর্ব জার্মানীতে একভাবে হয়েছে, পশ্চিম জার্মানীতে ভিন্নভাবে। কোনো বিশেষ দেশের আর্থিক বিন্যাস কী হবে অথবা হওয়া বাঞ্ছনীয় সেটা সে দেশের বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করছে।

মনে রাখা ভালো যে, শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে কি-ধনতান্ত্রিক কি-সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই শ্রমিক সাধারণকে স্বল্প মজুরীতে কাজ করতে হয় এবং নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করে নিতে হয়। চীন ও সোভিয়েত দেশ সম্বন্ধেও এ কথাটা সত্য। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশের একটি পত্রিকায় চীন সম্বন্ধে লেখা হয়েছে : "কয়েকটি দেশের অর্থনীতিবিদের মূল্যায়নে প্রকাশ, চীনের জনপ্রতি শস্যোৎপাদন ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৬তে শতকরা ১৫

ভাগ কমে গিয়েছে। সমাজবাদী দেশসমূহের মধ্যে চীনই একমাত্র দেশ যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের কোনো উন্নতি হয়নি, বরং অবনতি হয়েছে।" (ইজভেস্তিয়া, ১০ এপ্রিল, ১৯৬৭)। মন্তব্যটি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয়। সোভিয়েত লেখকদের মনে রাখা উচিত যে, আর্থিক পরিকল্পনার প্রথম বিশ-পঁচিশ বছরে ওঁদের দেশেও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। এই প্রথম পর্যায়টা কেটে গেলে তারপর অবশ্য অবস্থার উন্নতি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এটাও ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দেশ সম্বন্ধেই সত্য। কিন্তু আপাতত আমরা আর্থিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে।

চীনের লালরক্ষীরা নাকি দেশের "ধনতান্ত্রিক" অধঃপতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। প্রকারান্তরে যে-কথাটা এতে স্পষ্ট তা হল এই যে, সাম্যবাদের পেয়ালা ওঁরা মুখে তুলে দেখেছেন "ধনতন্ত্রে"র মতো তা বিস্বাদ ঠেকেছে। যে-কথাটা ওঁরা মানতে চাইছেন না তা হল এই যে এটাই স্বাভাবিক। পোল্যাণ্ড-হাঙ্গারী থেকে সোভিয়েত-চীন পর্যন্ত সব দেশেই দেখা গিয়েছে যে এটাই নিয়ম। কিন্তু উদাহরণের প্রয়োজন নেই। আর্থিকভাবে অনুন্নত একটা দেশের উপর বিশেষ নামধারী কোনো দলকে বসিয়ে দিলেই জীবন মধুর হয়ে উঠবে অথবা সমাজে অন্যায়ের অবসান ঘটবে এ চিন্তাটা সত্য তো নয়ই, এমন কি প্রকৃত প্রস্তাবে মার্কসীয়ও নয়। কোনো দল বড় বিপদ ঘটাতে পারে, তার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বড় সুখ কোনো দলই আনতে পারে না ; এ বিষয়ে বাস্তববাদী হওয়াই ভালো। উন্নতির বিভিন্ন পথের ভিতর কোনো একটির প্রতি আমাদের কারও কারও খানিকটা পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। কিন্তু সেটার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা স্বপ্নবিলাস মাত্র। এই বিলাসটা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।

অতএব গোড়ার কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। আওয়াজে দেশের সম্পদ বাড়ে না, কাজে বাড়ে। সেই কর্মের অভ্যাসের সঙ্গে যোগ করা প্রয়োজন যুক্তিবাদী মন। এদেশে আমরা সবাই ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ; তাই যুক্তিবাদের কথাটা একটু জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন। যুক্তিবাদই যথেষ্ট কিনা সে তর্কে আপাতত যাব না। সেই অসাধারণ মানুষের কথাও বলব না যাঁকে কোনো নিয়মে বাঁধা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাই বলছি। সেখানে প্রেমেরও স্থান আছে। কিন্তু শুধু প্রেম যথেষ্ট নয়, সে দেশপ্রেমই হোক আর জীবপ্রেমই হোক। যুক্তিনিষ্ঠারও প্রয়োজন আছে। এ কথাটা বড় সহজে মেনে নিলে সেই গ্রহণটাও বর্জনের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমাদের বৈষয়িক জীবনে দৈনন্দিন কাজে অনুরাগ-বিরাগমুক্ত যুক্তির দৃষ্টির একটা সাধারণ উপযোগিতা আছে। প্রতিদিনের বেচাকেনার সম্পর্কে এটা স্পষ্ট। বিক্রেতা বিক্রয় করেন নিজের স্বার্থে, ক্রেতাও কেনেন নিজের স্বার্থে ; এ নিয়ে মানঅভিমানের প্রশ্ন উঠে না। অথচ দু'টি স্বতন্ত্র স্বার্থ—আত্মীয়তার বন্ধনহীন দু'টি স্বার্থ—যে পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে, এ কথাটা অন্ধপ্রেম সহজে মানতে চায় না। প্রেম যাকে আপন বলে কাছে টানতে পারে না তাকেই সন্দেহের চোখে দূরে ঠেলে দেয়। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ বিদেশকে এমন একটা প্রেম-ও-সন্দেহের মিশ্র দৃষ্টিতে দেখে থাকে। বিদেশের সঙ্গে হয় আমাদের ভাই-ভাই সম্পর্ক, নয় তো আমরা শত্রু। এটা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বিচার নয়।

বিদেশী সাহায্য ও মূলধন গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের এই মনোভাবটা প্রকট। সমালোচকদের যুক্তি শুরু হয় এই ভাষাতে, "শুধু কি নিঃস্বার্থ ভারতপ্রেম থেকে ওরা আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। ওরা টাকা ধার দিচ্ছে নিশ্চয়ই নিজের স্বার্থের

মুখ চেয়েই।" কিন্তু এটা কোন যুক্তি নয়। ওঁদের স্বার্থে ওঁরা দেবেন, আমাদের স্বার্থে আমরা নেব—অথবা নেব না। নেওয়া-না-নেওয়াটাই একমাত্র কথা নয় ; চিন্তা পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। ওঁদের যাতে লাভ আমাদের তাতেই ক্ষতি, এই প্রত্যয়টা যুক্তিসহ নয়। আত্মরতির ওটা বিপরীত পিঠ। সতর্কতা ভালো ; কিন্তু শুধু নিঃস্বার্থ অপরের সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্কে আবদ্ধ হব এই প্রতিজ্ঞা করে যিনি সংসারে প্রবেশ করবেন অচিরেই তাঁকে গুহাবাসী হতে হবে। অবশ্য আত্মকেন্দ্রিকতার মতোই মাত্রাহীন পরনির্ভরতাও বিপজ্জনক। এদেশে আমরা একই সঙ্গে আত্মকেন্দ্রিক ও পরনির্ভর। শিশুসুলভ অসহায় নির্ভরতা ও অকৃতজ্ঞতায় অভ্যস্ত দেশের এই মনটাকে একটু বর্হিমুখী করা প্রয়োজন।

বেচা-কেনার ক্ষেত্রে যে-কথাটা সত্য বৃহত্তর অর্থে জীবনের আরও নানা ক্ষেত্রে সেটা অন্তত অংশত প্রযোজ্য। পরিপূরক স্বার্থের ভিত্তিতেই সমাজে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আবার সহযোগিতা মাত্রই শর্তাধীন, অর্থাৎ সহযোগীদের কে কি পাবেন এ সম্বন্ধে কয়েকটি লিখিত অথবা অলিখিত নিয়মে আবদ্ধ। এই শর্তগুলি সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর ভিতর সহযোগিতার অলিখিত বিধানও গত শতাব্দীতে যা ছিল আজ আর তা নেই। শিল্পের ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের চায়ের বাগানে কুলি ও ম্যানেজারের ভিতর যে সম্পর্ক সুইডেনের শিক্ষিত শ্রমিকের সঙ্গে শিল্পপতির সেই সম্পর্ক নয়। যুক্তিবাদী দৃষ্টি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজে উচ্চতর সহযোগিতার নব নব রূপ অন্বেষণ করে এবং জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে। এই গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে যে-কর্মপ্রয়াস ও সংগ্রাম তাতেই দেশের মঙ্গল।

যুক্তি বলতে যদি শুধু তর্কের নিয়ম বুঝি তো যুক্তিবাদ যথেষ্ট নয়। অবশ্য ন্যায়শাস্ত্রও উপেক্ষণীয় নয় ; কিন্তু সমাজকে সুস্থ রাখবার জন্য যে-যুক্তিবাদী মন প্রয়োজন সেটা মূলত তর্কের নিয়ম নিয়ে নয় বরং জীবনের প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এই 'উদার দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে উগ্র অসহিষ্ণুতার বিদ্রোহ এ দেশে ও বিদেশে আমরা বার বার দেখেছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করেছে অন্ধ বিদ্বেষ। মতবাদের স্বাধীন আলোচনাকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে চরিত্রহননের কুৎসিত চিৎকার।

এই শেষ কথাটা বিশেষভাবে বলতে হল কারণ ইদানীং চরিত্রশিকারীরা আবার মৃগয়ায় মত্ত হয়েছেন। এই অভাবপীড়িত দেশে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে প্রকাশ্য অথবা গোপন সাহায্য গ্রহণের অভিযোগটা সহজে ছড়ায়। ডাঙ্গে ও মানবেন্দ্র, এমন কি সুভাষচন্দ্র, এবং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী প্রায় সকল দলের বিরুদ্ধেই কখনও-না-কখনও এই অভিযোগ শোনা গিয়েছে। (সম্প্রতি রামমনোহর লোহিয়া দম্ভ করে বলেছেন যে, একমাত্র তাঁর দলই নাকি এই পাপ থেকে মুক্ত !) এ বিষয়ে প্রয়োজনমত অনুসন্ধান করবার দায়িত্ব আমাদের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের। কিন্তু মতামতের দ্বন্দ্বটা ইতিমধ্যে স্বাধীন ও যুক্তিনিষ্ঠ রাখা প্রয়োজন। কোনো মত সত্য হলে সেটা গ্রহণীয় ; মিথ্যা হলে যুক্তির সাহায্যেই তার ভ্রান্তি প্রমাণ করা সম্ভব। এই ঋজু বিচারনিষ্ঠা গণতান্ত্রিক সমাজের মহামূল্য সম্পদ। বিচারহীন বিদ্বেষ হট্টগোলে গণতন্ত্রের শত্রুদের অবশেষে জয় হয়। এতে দেশের সমূহ ক্ষতি।

আর্থিক পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে ভাঙাগড়ার মাঝখানে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ভুল-বোঝাবুঝি ও সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এরই মাঝে সামাজিক সহযোগিতার নতুন ভিত্তি রচনা করতে হয়। এই যোগের কাজেই চাই যুক্তির ব্যবহার। প্রেম আমাদের অনাত্মীয়কে আত্মীয় ভাবতে শেখায়। কিন্তু বৃহৎ সমাজে এমন

বহুলোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় যাঁদের আমরা স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহে কাছে টানতে পারি না ; তবু তাঁদের প্রতিও ন্যায়বিচার রক্ষা করে চলা প্রয়োজন। এমন বহু লোকের সঙ্গে যোগসূত্রে আবদ্ধ হতে হয়, যাঁদের মতামত আমাদের বিপরীত, কিন্তু তাঁদের প্রতিও সহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। এটাই যুক্তির শিক্ষা। যাঁদের আমরা আত্মীয় করে তুলতে পারিনি সেই অনাত্মীয় অপরের প্রতিও ন্যায় ও সহিষ্ণুতার ন্যূনতম শর্ত রক্ষা করে আমরা সমাজে সেই সভ্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করি যাতে গঠনের কাজ সহজ হয়, কলহে ও অনিয়মে সমাজ অকারণে দুর্বল হয় না। দেশকে গড়তে যদি শ্রমের অভ্যাস চাই তবে সেই সৃষ্টিকে অহেতুক বিনাশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চাই যুক্তিতে বিশ্বাসী, ভয় শূন্য মন।

আর্থিক উন্নতির শর্ত

১

আর্থিক উন্নতির মূল শর্তগুলি সরল। শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রসার এবং কৃষি ও শিল্পে, অথবা ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের প্রয়োগের সাহায্যে মানুষের উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিই আর্থিক উন্নতির মূল কথা। শিল্পোন্নত দেশগুলির ভিতর অন্যান্য নানা পার্থক্য দেখা যায়, যেমন বিভিন্ন দেশে রাজনীতিক ব্যবস্থা এক নয়। কিন্তু শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার ও বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ ভিন্ন কোনো দেশেই আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন নিয়মিত কঠিন পরিশ্রমের অভ্যাস এবং শ্রমের প্রতি একটা শ্রদ্ধাবোধ। কথাটা বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এরিক ফ্রমের ভাষায় বলা যাক। ফ্রম লিখেছেন : "The drive for relentless work was one of the fundamental productive forces, no less important for the development of our industrial system than steam and electricity." (The Fear of Freedom) বাষ্পীয় শকট ও বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কার ছাড়া যেমন শিল্পবিপ্লব হত না, শ্রমে একান্ত অনুরাগও তেমনই শিল্পোন্নতির জন্য ছিল অত্যাবশ্যক।

আধুনিক যুগের গোড়ায় পাশ্চাত্ত্য সমাজে ধার্মিক ও নাস্তিক বহু চিন্তাশীল মানুষ শ্রমের প্রতি নিষ্ঠা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছেন। উদাহরণত খ্রীষ্টান পিউরিটান আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃতির বিবিধ সম্পদ মানুষকে দান করেছেন ভগবান। পার্থিব সম্পদ নানাভাবে বাড়িয়ে তুললে ঈশ্বরের এই দানের প্রতি সম্মান দেখান হবে এবং ভগবান তাতে তুষ্ট হবেন। এই জাতীয় একটা চিন্তা ষোড়শ শতকের শেষ ভাগ থেকে ক্রমশ পশ্চিম ইয়োরোপের উঠতি দেশগুলির ভিতর ছড়িয়ে পড়ে। জাপানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সবাইকে শিখিয়েছে কঠিন পরিশ্রমকে কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করতে। বিজ্ঞান ও শ্রম—আর্থিক উন্নতির এই যুগ্ম ভিত্তি। যে-দেশ বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী ও ধনোৎপাদনের জন্য কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত তারই উন্নতি অনিবার্য।

ব্যক্তিবিশেষ চৌর্যের সাহায্যে বড়লোক হতে পারে। কিন্তু কোনো বৃহৎ সমাজ অথবা দেশের আর্থিক উন্নতি শুধু লুঠতরাজ ও প্রবঞ্চনার উপর স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমাদের ভিতর অনেকের বিশ্বাস যে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির আর্থিক উন্নতির মূলে

আছে ঔপনিবেশিক শোষণ। এ ধারণা বহুব্যাপ্ত হলেও অভ্রান্ত নয়। শুধু পরস্বাপহরণের পুরস্কারস্বরূপ ইতিহাস কোনো দেশকে আর্থিক উন্নতির বরমাল্য দান করেনি। এজন্য অন্য গুণের প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও শ্রমে অনুরাগই স্থায়ী সমৃদ্ধির মূল শর্ত। এই শর্ত যে-দেশে পূর্ণ হয়নি ঔপনিবেশিক শোষণের সুযোগ পেয়েও সে বেশী দূর এগোতে পারেনি। ষোড়শ শতক থেকে ইংল্যাণ্ড ও স্পেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্য কয়েকটি অংশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। লুঠতরাজে সে যুগে স্পেনের জুড়ি মেলা ভার। অথচ আর্থিক দিক থেকে স্পেন ইয়োরোপের একটি পশ্চাদপদ দেশ হয়েই রইল। অপর পক্ষে যে-সব দেশে আর্থিক উন্নতির মূল শর্ত পূর্ণ হয়েছে উপনিবেশের উপর নির্ভর না করেও তারা এগিয়ে যেতে পেরেছে। ইয়োরোপে আজ জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে উঁচু সুইডেনে। উপনিবেশের সাহায্য ছাড়াই সুইডেনের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। জার্মানী, জাপান, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ উপনিবেশ হারাবার পর আরও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার মূলে নেই ততটা সুচিন্তিত স্বার্থবুদ্ধি যতটা আছে যুক্তির চেয়েও আদিম জঙ্গী মনোবৃত্তি। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বরং একথাটাই বলা উচিত যে, কোনো দেশেরই আর্থিক উন্নতির জন্য উপনিবেশ অপরিহার্য নয় ; এমন কি অবস্থাবিশেষে এর অস্তিত্ব শোষক ও শোষিত উভয় দেশেরই উন্নতির পথে বাধা।[১] আঠার শতকের শেষভাগে সেকালের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। মার্কিন দেশ ইংল্যাণ্ডের হাত ছাড়া হওয়াতে উভয় দেশই আখেরে উপকৃত হয়েছে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উন্নতির প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক শোষণ নয়, বরং বিজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। এ বিষয়ে আমাদের ভুল ধারণার সংশোধন প্রয়োজন। কারণ এরই ফলে আমরা আজও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনায় যতটা উৎসাহী দেশীয় অন্ধতার বিরোধিতায় ততটা নই। সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা ভালো, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়।

আগেই বলেছি যে, বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া আর্থিক উন্নতির স্থায়ী ভিত্তি নেই। এখানে খানিকটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তা নইলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। আঠার শতকের শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় ; ফরাসী দেশে তখনও শুরু হয়নি। অথচ বিজ্ঞানচর্চায় ফ্রান্স সেদিন পিছিয়ে ছিল বলা চলে না। উনিশ শতকের রুশ দেশেও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন বেশ কয়েকজন। এঁদের ভিতর মেণ্ডেলেফ সর্বজনবিদিত ; কিন্তু লমনসভ থেকে শুরু করে আরও কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের চর্চায় উপরতলায় গুণীজ্ঞানীদের কথা ধরলে উনিশ শতকে রুশদেশ মার্কিন দেশের চেয়ে খাটো ছিল না। অথচ আর্থিক উন্নতিতে মার্কিন দেশই সেদিন এগিয়ে গেল।[২] এসব তথ্য থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। অভিজাত বংশীয় কয়েকজন গুণী ব্যক্তি বিজ্ঞানচর্চায় ডুবে থাকলেই উন্নতি ঘটে না। বিজ্ঞানকে উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করাও প্রয়োজন। ক্ষেতে ও কারখানায় বিজ্ঞানকে টেনে আনা আবশ্যক। একাজ যে দেশে সুসম্পন্ন হয় সে দেশ আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। আঠার শতকের ফরাসী দেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের, উনিশ শতকের রুশ দেশের চেয়ে আমেরিকার, শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

আমাদের দেশের দিকে তাকালেও একথাটাই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এদেশে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক একেবারে জন্মাননি এমন নয়। তবু জাপান এগিয়ে গেছে আর আমরা পিছিয়ে

আছি। এদেশের শিক্ষিত মানুষ তেমনভাবে কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞানেরপ ব্যবহারে এগিয়ে যাননি যেমনভাবে ওঁরা গেছেন জাপানে। কৃষির ক্ষেত্রে এই দৈন্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। উনিশ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞানের প্রয়োগে জাপানে কৃষির উন্নতি শুরু হয়ে গেছে। আর এদেশে ওপরতলায় কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে কিছু গবেষণা সত্ত্বেও নীচের তলায় তেমন কিছু ঘটেনি। শিল্পের ক্ষেত্রেও এদেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারের সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপিত হয়নি। এদেশের শিল্পপতিরাও প্রায়ই গবেষণায় অর্থ ব্যয় করতে নারাজ। অথচ শুধু সরকারী গবেষণাগারে বিজ্ঞানচর্চাই আমাদের শিল্পের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আগেই বলেছি যে, দ্রুত আর্থিক উন্নতির জন্য চাই বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে শ্রমনিষ্ঠার সংযোগ। নিয়মিত শ্রমের অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে সমাজের চেতনাকে জাগ্রত করা অন্যদিকে তেমনই চাই শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যোগসাধন ও শ্রমে অবহেলার জন্য দণ্ডবিধান। প্রাচীন সমাজে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের সম্পর্ক ছিল শিথিল। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এ দুয়ের যোগ ঘনিষ্ঠ। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থাতেই এটা লক্ষ্য করা যায়। সমালোচকেরা কখনও ব'লে থাকেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকের কাজে উৎসাহ থাকা সম্ভব নয়, কারণ শ্রমের সম্পূর্ণ ফল শ্রমিক লাভ করেন না। কিন্তু সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রমিকের মনে কাজে আগ্রহ আসে না এই ধারণার সঙ্গে তথ্যের সামঞ্জস্য নেই। পশ্চিম জার্মানীর তুলনায় পূর্ব জার্মানীতে, ইংল্যাণ্ডের তুলনায় পোল্যাণ্ডে, অথবা জাপানের তুলনায় সোভিয়েত দেশে শ্রমিকের কাজে উৎসাহ বেশী একথা বলা চলে না। আসলে সোভিয়েত ও প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ভিতর মজুরী ব্যবস্থার সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য। শিল্পোন্নত দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপারে সর্বসাধারণের কতগুলি ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা আছে। কিন্তু শ্রমের সঙ্গে দণ্ড ও পুরস্কারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ভিন্ন নিয়মিত পরিশ্রমের অভ্যাস তৈরী করা কঠিন একথাটা সোভিয়েত ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সমভাবে বহুদিন আগে মেনে নিয়েছে।

কৃষির ক্ষেত্রে নানা বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব। যেমন কৃষক যদি তাঁর জমির মালিক হন তাহলে সরকারকে কর দেবার পর তাঁর শ্রমের ফল তিনি নিজেই লাভ করেন। কাজেই যে-কৃষক জমির মালিক তাঁর কাজে উৎসাহ বাড়বার সম্ভাবনা বেশী। অবশ্য যে-দেশে অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র ও অশিক্ষিত সেখানে দেশময় ছোট ছোট স্বাধীন চাষী সৃষ্টি করলেই যে চাষের উন্নতি হবে এমন বলা যায় না। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যবহার কি উপায়ে দ্রুত চালু করা যায় সেটাই প্রধান প্রশ্ন। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার জন্য চাই জল, সার, ভালো বীজ ইত্যাদির প্রয়োগ এবং নানাধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে কৃষিপদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতিসাধন। এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত বড় চাষী অনেক সময়ে অগ্রণী হন। তিনি পথ দেখালে অপেক্ষাকৃত ছোট চাষীও নতুন পথ গ্রহণ করেন। চাষের উন্নতি নানা পথেই সম্ভব ; কিন্তু এখানেও মূল শর্ত ঐ একই, বিজ্ঞান ও শ্রমের সমন্বয়।

অর্থনীতিজ্ঞেরা এককালে আর্থিক উন্নতির মূল শর্ত হিসাবে একটি বিষয়ের উপরই বিশেষভাবে জোর দিতেন, সেটি হল মূলধন গঠন। মূলধন গঠন প্রয়োজন সন্দেহ নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের সহায়তায় যে-দেশে উৎপাদনপদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতিসাধন না হচ্ছে সেখানে মূলধনের ব্যবহারে খুব বেশী ফললাভ হয় না। মূলধন গঠন করাও সেদেশে কঠিন। অর্থনীতির ছাত্রমাত্রেই জানেন যে, কৃষিপদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকলে শুধু বাড়তি

শ্রম অথবা মূলধন নিয়োগ করে ফসল সমান হারে বাড়িয়ে যাওয়া যায় না। বরং ফসলবৃদ্ধির হার এ অবস্থায় ক্রমেই কমে আসে। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন প্রয়োগের দ্বারাই উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা সম্ভব। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মূলধন সমাজের পক্ষে ফলপ্রসূ হয়।

অবশ্য বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের জন্যও মূলধন প্রয়োজন। কাজেই উন্নতিশীল সকল দেশকেই শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মূলধন গঠনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। *এই অর্থে একেও আর্থিক উন্নতির অন্যতম শর্ত হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া যায়।*

২

বিভিন্ন দেশে মূলধন গঠনের প্রয়াস বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। জাপানে "জাইবাৎসু" গোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু বড় বড় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন। ব্যবসায় থেকে একদিকে যেমন তাঁরা অনেক লাভ করেন অন্যদিকে তেমনই এই লাভের একটা বড় অংশ মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ করেন। সোভিয়েত দেশে ভিন্ন ব্যবস্থা। বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব সেখানে রাষ্ট্রের হাতে। দীর্ঘদিন যাবৎ সোভিয়েত সরকার ভোগ্যবস্তু যে-খরচে তৈরী হয় তার চেয়ে অনেকটা বেশী দামে বিক্রী ক'রে এ দু'য়ের পার্থক্যটা একটা কর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, ক্রেতার দাম ও বিক্রেতার খরচের ভিতর পার্থক্যটা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতির হাতে যাচ্ছে লভ্যাংশ হিসাবে, আর সমাজতান্ত্রিক দেশে সরকারের হাতে যাচ্ছে বাড়তি রাজস্ব হিসাবে। এই টাকারই অংশবিশেষ পরে মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে শিল্পের প্রসারের জন্য। জাপানী সরকার ভূমিকরের সাহায্যে কৃষকের আয়ের একাংশ নিজে গ্রহণ করেন। জাপানে আর্থিক উন্নতির প্রথম পর্যায়ে এটাই ছিল সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস। সোভিয়েত দেশে ব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। যৌথচাষ প্রথায় চাষীকে ফসলের একটা অংশ সরকারের হাতে তুলে দিতে হত নামমাত্র দরে ; বাজারদরের চেয়ে সেটা অনেক কম। সরকারের অর্থলাভের এটা ছিল একটা উল্লেখযোগ্য উপায়।

অর্থাৎ, বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থা বিভিন্ন ; কিন্তু সব কিছুর ভিতর একটা বড় মিলও আছে। সব দেশেই চাষী ও মজুর অথবা সাধারণ ক্রেতার হাত থেকে জাতীয় আয়ের একটা অংশ প্রথমে সরিয়ে নেওয়া হয়, তারপর সেটা নিয়োগ করা হয় মূলধন হিসাবে আর্থিক সম্প্রসারণের জন্য। উৎপাদিত ধনের একটা অংশমাত্র সরাসরিভাবে মজুরী হিসাবে শ্রমিকের হস্তগত হয়। উদ্‌বৃত্ত অর্থ ব্যয় হয় অংশত মূলধন হিসাবে ; তা ছাড়া প্রতিরক্ষা ও শাসনযন্ত্র চালাবার খরচ আছে, 'পরিচালক'গোষ্ঠীর ব্যয়ভারও আছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্ক্স এই ব্যাপারটাকে নাম দিয়েছিলেন "শোষণ"। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ধনতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক কোনো সমাজেই উৎপাদিত ধনের সমস্তটা শ্রমিকের হাতে পৌঁছয় না।

সাম্যবাদী এখানে একটা আপত্তি তুলতে পারেন। তিনি বলবেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনের একটা অংশ শ্রমিকের হাত থেকে সরকার সরিয়ে রাখেন বটে, কিন্তু সেটা নিযুক্ত হয় দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য, এই আর্থিক উন্নতির ফলও শ্রমিকই অবশেষে ভোগ করেন। আর ধনতান্ত্রিক দেশে পুঁজিপতি অর্থ বিনিয়োগ করেন নিজের স্বার্থে। এতে কিন্তু সবটা বলা হল না। মার্ক্স বলেছিলেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা

ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয় না। পুঁজিপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা দিয়েও শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না। মার্ক্স দেখেছিলেন যে, ধনিকশ্রেণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্যবসায়ে মন্দা ও সংকট ডেকে আনে। কিন্তু আর একটি ব্যাপার তিনি তেমন গভীরভাবে লক্ষ করেননি। ধনতন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীরও অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আজকের জাপানী, জার্মান বা ইংরেজ শ্রমিক যে বিশ অথবা পঞ্চাশ বৎসর আগের তুলনায় অনেকটা সচ্ছল অবস্থায় আছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। "সাম্যবাদী" পূর্ব জার্মানীতে শ্রমিকের অবস্থার যে-উন্নতি হয়েছে "ধনতান্ত্রিক" পশ্চিম জার্মানীতে উন্নতি তার চেয়ে কম হয়নি। পুঁজিপতি হয় তো পুঁজি বিনিয়োগ করেন নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই, যদিও জাতিকে শক্তিশালী করবার কথা তিনি যে কখনও ভাবেন না এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি যাই চিন্তা করুন না কেন পুঁজি বিনিয়োগের ফলে উৎপাদন পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটে। অবশ্য মূলধনের অপচয় ও অপব্যবহারও আছে এবং তা থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়।[৪] তবু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে মূলধন গঠনের সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির যোগ স্পষ্ট। বিশেষত যে-সব দেশ বিজ্ঞানে অগ্রসর তাদের সম্বন্ধে কথাটা খুবই সত্য। উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশ দক্ষ ও শিক্ষিত হয়ে ওঠে, শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়। দক্ষ, শিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার মান অনিবার্যভাবে ক্রমশ উন্নত হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় দেশেরই বর্তমানকালের ইতিহাসের এটা একটা প্রধান ঘটনা। সকল দেশেই পুঁজি গঠনের গোড়ার কথা হল ধনের একটা অংশ শ্রমিকের হাত থেকে সরিয়ে রাখা, আর তার শেষ ফল হচ্ছে শ্রমিকের উৎপাদিকা শক্তি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। এই উন্নতি কোনো দেশেই সহসা ঘটেনি এবং বিনা কষ্টেও সম্ভব হয়নি। এ কথাটা তবু স্বীকার্য যে, যাকে "শোষণ" বলা হয় এবং যা ছাড়া মূলধন গঠন সম্ভব নয়, তাই আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিকের জীবনের মানের উন্নতিরও কারণ।

৩

কোনো সামাজিক ব্যবস্থাই অন্যায় থেকে মুক্ত নয়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তো নয়ই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূলধনের উপর কর্তৃত্ব প্রধানত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে। সাম্যবাদী সমালোচক এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চান। এ ব্যাপারে সাম্যবাদী আদর্শের একটা যৌক্তিকতা আছে। ধনতান্ত্রিক দেশে মূলধনের যাঁরা মালিক তাঁরা অনেক সময় শিল্পের পরিচালক নন। তাঁদের অনেকেই শিল্পের "ঘুমন্ত" বা কর্মহীন অংশীদার। এই ব্যবস্থাতে আমাদের ন্যায়বোধ পীড়িত হয়। যাঁদের ভূমিকা ছাড়াই শিল্পকর্ম চলতে পারে তাঁদের আয় ন্যায্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন। আদর্শের দিক থেকে বৃহৎ শিল্পে যাঁরা কর্মে অংশীদার তাঁদেরই কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু এই আদর্শকে অবিলম্বে রূপদান করা কঠিন। শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হলে সহসা কোনো বৃহৎ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আবার হিংসাত্মক উপায়ে উদ্দেশ্যসাধন করতে চাইলে তার ফল অনেক সময়েই আদর্শের বিপরীত হয়। হিংসার অস্ত্র হিসাবে যে-দল গঠিত হয়, অত্যাচারের যন্ত্রে তা অবশেষে পরিণতি লাভ করে। পুঁজিপতির অন্যায়ের চেয়ে এই দলীয় অত্যাচার কম পীড়াদায়ক নয়। তা ছাড়া গৃহযুদ্ধের ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা

ভেঙ্গে পড়লে তাতে আর্থিক দিক থেকেও দেশ পিছিয়ে যেতে পারে।

শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে সামাজিক ভাঙ্গাগড়ার মাঝখানে বিপ্লব ডেকে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু অনুন্নত দেশে "সমাজতন্ত্র" নামধারী কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই ব্যবস্থা বিকৃত সমাজতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই হয় না। পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বে সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি পায় বটে ; কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, আর্থিক উন্নতির প্রথম যুগে বিনা কষ্টে মূলধন গঠন কোনো ব্যবস্থাতেই সম্ভব নয়। মূলধন গঠনে সহায়তা করাই পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা। এই শ্রেণীর উচ্ছেদের পর মূলধন গঠনের কাজ গিয়ে পড়ে রাষ্ট্রের হাতে, অর্থাৎ রাজনীতিক দলবিশেষ ও আমলাতন্ত্রের হাতে। অনুন্নত দেশে মূলধন গঠন ইতিহাসের এক "নোংরা" কাজ। হিংসাত্মক বিপ্লবের পর এই কাজের ভার গিয়ে যখন পড়ে ভ্রাতৃহন্তা এক সমাজে পারস্পরিক সন্দেহে কলুষিত একদল মানুষের হাতে তখন সেই শাসক দলের অধঃপতন রোধ করা যায় না। এরই ফলে ঘটে সমাজতন্ত্রের বিকৃতি। শোষণমুক্ত সমাজের নামে হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত দেশকে ভেঙ্গে তচনচ করলেই আদর্শসমাজের দ্বার উন্মুক্ত হয় না।

ধনতন্ত্রের বহু গলদ আছে। তার বিরুদ্ধে সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া নিঃসন্দেহে প্রয়োজন। দু'য়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত গোড়ার যুগে, দেশের একাংশে শ্রীবৃদ্ধি ও অন্যাংশে দারিদ্র্য ও অভাব বৃদ্ধি ঘটতে দেখা গেছে। শুধু শ্রেণীগত অসাম্য নয় আঞ্চলিক বৈষম্যও সামাজিক ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমৃদ্ধ সমাজেও সম্প্রদায়বিশেষের ভিতর অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের উদাহরণ আছে ; যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। এ জাতীয় বৈষম্যের প্রতিকারের জন্য ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ যথেষ্ট নয় ; রাষ্ট্রেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন। ধনতন্ত্রের আর একটি সমস্যা "শোষণ"কে কেন্দ্র করে। একটি তুলনার সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কৃষক যখন বীজধান সরিয়ে রাখেন তখন তিনি জানেন যে, তাঁর নিজেরই ভবিষ্যতের জন্য এটা প্রয়োজন। পুঁজিপতি যখন উৎপাদিত ধনের একটা অংশ শ্রমিকের হাত থেকে সরিয়ে নেন, তখন কিন্তু সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে এই "শোষণ" ও পুঁজিগঠনের যোগটা মোটেই প্রত্যক্ষ নয়।[৫] এই জটিলতার উপর যোগ হয়েছে শ্রমিকের সঙ্গে মালিক ও পরিচালকের সামাজিক দূরত্ব ও মনান্তর। সব সমাজব্যবস্থার মতো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনের ভিতর যদি কোনো দিগবোধ রক্ষা করতে হয় তবে উন্নততর সহযোগিতাই আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত। একথা শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যেমন সত্য বৃহত্তর সমাজজীবন সম্বন্ধেও তেমনই। সমাজে উন্নততর সহযোগিতা তাকেই বলি যাতে একই সঙ্গে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে, মানুষে মানুষে অসাম্য লাঘব হয় ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিস্তৃতি ঘটে।

উন্নতির এই বিভিন্ন উপাদানের ভিতর সামঞ্জস্য বিধান সহজ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, বৈপ্লবিক উল্লম্ফনে হঠাৎ সাম্য, স্বাধীনতা ও উৎপাদিকা শক্তির মহান শিখরে আরোহণ করা যায় না। অসাধ্যসাধনে মত্ত হলে অকারণে দুর্দশা বাড়ে। পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে সাধ্যের সীমানা ক্রমশ বিস্তৃত করেই মানুষকে এগোতে হয়। এ পথে কিছু ফল লাভ যে সম্ভব, এ শতাব্দীর ইতিহাসে তার উদাহরণের অভাব নেই। মার্ক্সবাদী বিচারে ধনতন্ত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে ; ধনতন্ত্রের সংকট বৃদ্ধি পায় ; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সংকট প্রতিফলিত হয় ঘোরতর দ্বন্দ্বে ও যুদ্ধে। এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে কিন্তু এ যুগের ইতিহাসের গতির গুরুতর অমিল

আছে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লবের আকর্ষণ কমে এসেছে ; দারিদ্র্যের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের সংগ্রামের মতো শ্রেণীসংগ্রামও এসব দেশে অপেক্ষাকৃত সংযত আকার ধারণ করেছে। শিক্ষা ও সংগঠন-শক্তির ফলে শ্রমিকের প্রতি অন্যায়ের প্রতিরোধ ক্রমে সহজ হয়েছে ; যে-অন্যায় একদিন ছিল অতি সাধারণ, আজ তা ব্যতিক্রম। উনিশ শ' ত্রিশের দশকের গোড়ায় ধনতন্ত্রের সংকট যতটা তীব্র ছিল আজ ততটা নেই। ব্যবসায়ের উত্থান পতন আছে বটে, কিন্তু উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এখন পরিকল্পনার সাহায্যে আর্থিক সংকট নিয়ন্ত্রণের শক্তি বেশী। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা আজ দ্রুত অবক্ষয়ের পথে। আর উপনিবেশ হারিয়েও শিল্পোন্নত দেশগুলি আগের চেয়ে সংকটমুক্ত ও আরও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ধনতন্ত্রের গলদ আছে ; কিন্তু বৈষয়িক অর্থে তার সাফল্যও অস্বীকার করা যায় না।

৪

তবু এসব কিছুকে খর্ব করে যে-সমস্যা আজও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চরিত্র ভিন্ন। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব আজকের পৃথিবীতে তীব্র ও নিষ্ঠুর। এই দ্বন্দ্বকে ধনতন্ত্রের সংকটের প্রতিফলন বলা ভুল। ধনতান্ত্রিক দেশ যেমন ধনতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সাম্যবাদী দেশও তেমনই আজ সাম্যবাদী দেশের শত্রু হয়েছে। এর মূলে আছে জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস ও ক্ষমতার নেশা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ মূলত বাজার নিয়ে দ্বন্দ্ব নয়। ইন্দোনেশিয়া হাত ছাড়া হওয়াতে হল্যাণ্ডের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েনি ; ভিয়েতনাম হাত ছাড়া হলেও মার্কিন অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে না। বিজ্ঞানকে যদি বলি উন্নতির পরম বন্ধু, যুদ্ধকে যদি বলি শত্রু, তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, এ যুগের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও যা-কিছু চূড়ান্ত কলঙ্ক তার কোনোটারই ব্যাখ্যা চলে না শুধু শ্রেণী সংগ্রামের সূত্র ধরে। ধনতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্রকে আমরা যে বাস্তবের চেয়েও ভয়ঙ্কর অথবা রমণীয় করে আঁকি এরও মূলে আছে হয় তো যুক্তির চেয়েও আদিম প্রবৃত্তি, আদর্শের ছদ্মবেশে যুযুৎসা। মানুষের সব উন্নতির পথে আজ বড় বাধা যুদ্ধ। যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতিই এ যুগে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের সবচেয়ে ভয়াবহ উদাহরণ। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার কলহ ছাপিয়েও আজ তীব্র হয়ে উঠেছে জাতিতে জাতিতে ক্ষমতার লড়াই। সারা পৃথিবীতে অচিরে ধনতন্ত্র অথবা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শান্তি আমাদের চাই। এ যুগের প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান ও শান্তি।

মানুষের ইতিহাসে বিজ্ঞানের প্রাধান্য সাম্প্রতিক ঘটনা। এই অল্পকালের ভিতর বিজ্ঞান আমাদের জীবনের বহিরঙ্গে এনেছে বিরাট পরিবর্তন। কিন্তু মানুষের মনের গভীরে পরিবর্তনের গতি মন্থর, সেখানে আজও প্রাগৈতিহাসিক শক্তিরই প্রাধান্য। প্রকৃতি একদিন মানুষের কাছে ছিল বুদ্ধির অগম্য ভয়ংকর শক্তির লীলাক্ষেত্র, প্রাচীন আফ্রিকার অরণ্যের মতো অন্ধকার ও বিপদসংকুল। মানুষের জীবন ছিল সেদিন অজ্ঞাত শত্রুর আক্রমণে প্রতিক্ষণ বিপন্ন। অগণিত শতাব্দী জুড়ে মানুষ বেঁচেছে প্রতি মুহূর্তে অতি ভয়ে। যেখানে প্রতিক্ষণ প্রাণ বিপন্ন সেখানে প্রাণী যেমন ভীত তেমনই হিংস্র। সেই অন্ধ, ক্ষমাহীন প্রাগৈতিহাসের কবল থেকে মানুষের মন আজও মুক্তি পায়নি। বিশ শতকের বিজ্ঞান মানুষের মনের সেই স্তরের অন্ধকার এখনও দূর করতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে যদি-বা

আমরা ভদ্র এবং কিছু পরিমাণে দায়িত্বজ্ঞানও রাখি, সমষ্টিগতভাবে আমরা প্রায়ই দায়িত্বজ্ঞানহীন ও হিংসার অধীন। আমদের মনের ওপরের দিকটায় যেহেতু আমরা যুক্তি ও গণনায় অভ্যস্ত অতএব সব কিছুর একটা আর্থিক ব্যাখ্যা আমরা সহজে গ্রহণ করি ; কিন্তু আজকের যুগের বহু সমস্যার মূলেই আছে যুক্তির চেয়ে প্রাচীন যৌথ আতঙ্ক ও হিংসা। মার্কিন দেশে নিগ্রো সমস্যার মূলে শেতাঙ্গদের আর্থিক লাভক্ষতির গণনার চেয়েও অযৌক্তিক বর্ণবিদ্বেষ প্রধান। আরব-ইজরায়েল অথবা ভারত-পাকিস্তান বৈরিতার গোড়ায় আছে ধর্মবিদ্বেষ। গণতন্ত্র, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজতন্ত্র কিছুই আজ সামষ্টিক বিদ্বেষের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ ছোট-আমি ও বড়-আমির ভিতর পার্থক্য করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ কপট বড়-আমি। ছোট-আমি যখন নিজের ক্ষুদ্র ভয়কে লুকোতে চায় কোনো অতিকায় উত্তেজনার আড়ালে তখনই বিপত্তির সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। প্রকৃত বড়-আমি হিংসার অধীন নয় ; সে চলে শান্ত বুদ্ধিতে। তারই হাতে বিজ্ঞানের শক্তিও নিরাপদ।

মানুষের গড়বার ও ভাঙ্গবার শক্তি একদিন ছিল ছোট সীমায় বাঁধা। তার সমস্ত আস্ফালন সত্ত্বেও সে পৃথিবীর কোনো একটি কোণে মায়ের কোলে দামাল শিশুর মতো সামান্য আলোড়ন সৃষ্টি করতো পারতো মাত্র। আজ পৃথিবী ধ্বংস করবার ক্ষমতা তার হাতে। এই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে যদি তাকে বাঁচতে হয় তো সেই সঙ্গে চাই বিজ্ঞানকে গড়বার কাজে প্রয়োগ করবার যোগ্য ভয়বিদ্বেষমুক্ত বুদ্ধি। এ যদি না হয় তো প্রকৃতিকে পরাভূত করেও মানুষ মানুষকে বাঁচাতে পারবে না। উন্নতির শর্ত সরল তবু কঠিনসাধ্য।

কর্মসংস্থান ও আর্থিক পুনর্গঠন

বেকার সমস্যা এদেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আশার কথা এই যে, গ্রামে ও শহরে আগামী কয়েক বছরে কর্মসংস্থান বাড়াবার কিছু সুযোগও উপস্থিত। হরিৎ বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে বছরে একটির জায়গায় দুটি, এমন কি তিনটি ফসল তুলবার সম্ভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে কৃষিতে শ্রমের নিয়োগও বৃদ্ধির পথে ; অন্তত পল্লী অঞ্চলে অর্ধবেকারত্ব এতে কমবে বলে আশা করা যায়। গ্রামে গ্রামে সেচব্যবস্থা, পথঘাট ইত্যাদি বাড়াতে গেলে শ্রমিকের প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে শোনা যাচ্ছে, তাতেও কিছু শিক্ষিত মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তা ছাড়া ছোট শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা তো আছেই। মহানগরীতে উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে ; তাতেও লোকের দরকার। এইসব খণ্ড খণ্ড সম্ভাবনা যখন আমাদের সামনে এসে পড়েছে তখন একটা সামগ্রিক দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করে তাদের বিচার প্রয়োজন। কারণ, সাময়িকভাবে কিছু কর্মের সংস্থান করাই যথেষ্ট নয়। ব্যাধির মূল কোথায়, কি করে তাকে দূর করা যায়, সেটাও বিবেচ্য।

এদেশে বেকারের সংখ্যা কত ? এ প্রশ্নের কোনো পরিষ্কার উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন। দ্বিতীয়

পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার গোড়ায় সারা ভারতবর্ষে এই সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। অন্তত এই রকম একটা হিসেব কিছুদিন চালু ছিল। পরিকল্পনার পাঁচ বছরে কর্মপ্রত্যাশীর সংখ্যা বাড়বে এক কোটি, আর নতুন কর্মসংস্থানও হবে মোটামুটি ঐ একই সংখ্যায়, এইরকম একটা আশাও সেই সময় প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৯৬১ সালে যখন দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা তার অন্তে পৌঁছল তখন দেখা গেল যে, আদি হিসেবগুলো ভুল। প্রথম সংখ্যাটা হবে এক কোটির চেয়ে আরও সতের লক্ষ বেশী, দ্বিতীয়টা বিশ লক্ষ কম ; অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭ লক্ষ। ৫৩ লক্ষের সঙ্গে ৩৭ লক্ষ যোগ করে তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার গোড়ায় বেকারের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৯০ লক্ষ। কিছুদিন পর অবশ্য জানা গেল যে, এই সংখ্যাটাও ভুল। কিন্তু সে কথা এখন থাক। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা আরও বেড়েছে, বৃদ্ধির পরিমাণ নাকি পঁচিশ লক্ষ। যদি তাই হয় তো তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে, অর্থাৎ ১৯৬৬ সালে, বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ১৫ লক্ষ। তবে নতুন হিসেবে বলা হলো যে, ঐ সংখ্যাটা আসলে হবে ৯০ লক্ষ থেকে এক কোটির ভিতর। মোট কথা এদেশে বেকারের সংখ্যা আমরা সঠিক জানি না, কিন্তু সংখ্যাটা বাড়ছে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সংখ্যা নিয়ে বিভ্রাটের কথা বলেছি। এজন্য কাউকে হাস্যাস্পদ প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এদেশের বেকারের সংখ্যাগণনা সহজ নয়। পূর্ণ বেকারের পাশে পাশে আছেন অর্ধ বেকার। এঁদের সনাক্ত করা জটিল ব্যাপার। কর্মসংস্থানের জন্য অনেকে খাতায় নাম লেখান। কিন্তু যাঁরা বেকার তাঁরা সবাই নাম লেখান না ; যাঁরা নাম লেখান তাঁদের সবাই পুরোপুরি বেকার নন। এইরকম নানা জটিলতা আছে। কিন্তু সংখ্যা গণনার জটিলতা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। মূল বিষয়ে ফিরে আসা যাক।

বেকার সমস্যার কারণ কি ? গান্ধীবাদীদের একটা ব্যাখ্যা ছিল। তাঁদের বিশ্লেষণ আরম্ভ হয় গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে। গ্রামের এক সময়ে কৃষি ও কুটির শিল্পের ভিতর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল। আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের প্রভাবে কুটির শিল্প ভেঙ্গে পড়ে। এই থেকেই গ্রামের অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের শুরু। আধুনিক শিল্পের কল্যাণে নগরের প্রসার হয়েছে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে। কিন্তু এইসব যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ততটা শ্রমনির্ভর নয়, যতটা মূলধননির্ভর। গ্রামীণ অর্থনীতির বিপর্যয়ের ফলে দেশময় যে-পরিমাণ মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে, নগরে অথবা আধুনিক শিল্পে সে-পরিমাণে নতুন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে গান্ধীবাদী ব্যাখ্যা মোটামুটি এই রকমের।

এই পুরনো ব্যাখ্যাটির খানিকটা নবীকরণ সম্ভব। তার আগে অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। বিগত দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতর আর্থিক বৈষম্যের প্রশ্ন পরিকল্পনা কমিশনের আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় সমস্যাটির প্রতি আরও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ কথাটা স্পষ্ট হয়েছে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংহতি প্রয়োজন, আবার আঞ্চলিক বৈষম্য এই সংহতিকেই বিপন্ন করতে পারে। কাজেই বেকার সমস্যার পাশে পাশে এই বৈষম্যের প্রশ্নও একটি প্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে আজ স্বীকার্য।

এদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য কম নয়। ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় যে-সব তথ্য পেশ করেন তাতে জানা যায় যে, ১৯৬৯-৭০ সালে পঞ্জাবে মাথাপিছু আয় ছিল ৯৪৫ টাকা, আর বিহারে ৪০২ টাকা। অর্থাৎ, পঞ্জাবের তুলনায়

বিহারের মাথাপিছু আয় অর্ধেকেরও অনেকটা কম। আবার একই প্রদেশের ভিতরও উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা-দুর্গাপুর-আসানসোল জুড়ে আছে ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পাঞ্চল। অথচ এই একই রাষ্ট্রে পল্লী অঞ্চলের শতকরা নব্বুই ভাগ অংশে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি আজও।

গান্ধীবাদীরা গ্রাম ও শহরের অসম সম্পর্কের কথা বলেছেন এবং সেই সূত্রে বেকার সমস্যার ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রামকে অনগ্রসর অঞ্চলের এবং শহরকে অগ্রসর শিল্পাঞ্চলের প্রতীক বলে ধরে নিলে গান্ধীবাদী ব্যাখ্যাটি নতুনভাবে রাখা যায়। অনগ্রসর অঞ্চলে কুটির শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে ওঠেনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অর্ধবেকারের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে। এদের একটি অংশ জীবিকার অন্বেষণে শহরে আসে। কিন্তু আধুনিক শিল্প মূলধনবির্ভর ; দেশের দ্রুতবর্ধমান অর্ধবেকারদের সবাইকে এখানে কাজের সুযোগ দেওয়া যায় না। কাজেই নগরেও বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলে। এমনিভাবে গ্রাম অথবা অনগ্রসর অঞ্চলের দারিদ্র্য এবং নগর অথবা আধুনিক শিল্পাঞ্চলের বেকারত্ব ও সামাজিক অস্থিরতার ভিতর একটা কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আঞ্চলিক অর্থনীতি আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলা যায়। এখনও এ ব্যাপারে অবস্থার কোনো বড় পরিবর্তন হয়নি। আর্থিক কর্মকাণ্ডের যে-একটা আঞ্চলিক ভিত্তি আছে, এ কথা পাঠ্যপুস্তকে শুধু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসঙ্গেই স্মরণ করা হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার বিশ্লেষণে প্রচলিত অর্থবিজ্ঞান প্রায়ই স্থানবোধশূন্য। শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত তত্ত্বের বেলায়ও এর বড় ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এইসব আলোচনায় জাতীয় আয়ের মোট কতটা অংশ মূলধন হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে সেটাই প্রধান কথা, দেশের কোন্ অংশে তার বিনিয়োগ হচ্ছে সেটা প্রধান নয়।

অথচ বেকার সমস্যার পিছনে উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের পারস্পারিক সম্পর্কে গঠিত একটি পটভূমিকা যে-মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টির ভিতর আসে তখনই আঞ্চলিক প্রশ্নকে আর তুচ্ছ করা যায় না। অনগ্রসর অঞ্চল থেকে মানুষ জীবিকার সন্ধানে শিল্পাঞ্চলে আসে বটে। দেশের ভিতর এইরকম একটা সচলতা থাকা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ মানুষের জন্য তবু জীবিকার সংস্থান চাই তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে। এ ছাড়া উপায় নেই। অনুন্নত অঞ্চলে যদি কর্মের সুযোগ না থাকে, স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে যদি সেখানে শিল্পগঠনের উদ্যোগ না থাকে, তবে তাতে সেই অঞ্চল এবং সমগ্র দেশ উভয়েরই ক্ষতি।

প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব প্রায়ই অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হয় না। বরং অনগ্রসরতাই অনগ্রসরতার মূল কারণ। অর্থাৎ, সাফল্য যেমন সাফল্যকে ডেকে আনে এবং ব্যর্থতা ব্যর্থতাকে, অনগ্রসরতাও তেমনই এমন কিছু অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে এরপর অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। আর্থিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের জন্য শুধু প্রাকৃতিক সম্পদই প্রয়োজন হয় না ; সেই সঙ্গে চাই একটা অনুকূল পরিপার্শ্ব, পথঘাট, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ইত্যাদি। যে-সব গ্রাম বাজার থেকে বেশী দূর, সেখানে উন্নতি ও 'আধুনিকীকরণে'র শক্তিও দুর্বল। কাজেই গ্রাম ও শহরের ভিতর পারস্পারিক নির্ভরশীলতার একটা সম্পর্ক সযত্নে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কয়েকটি গ্রামের মাঝখানে একটি বাজার ; বাজারের সঙ্গে যোগ একদিকে গ্রামের, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বড় শহরের ; সেই শহরের সঙ্গে যোগাযোগ আবার কেন্দ্রীয় নগরের। পথঘাট এমনভাবে

পরিকল্পিত যে, গ্রাম থেকে বাজারে অথবা নিকটবর্তী শহরে যাতায়াত সহজ। সেই সঙ্গে চাই শিক্ষার সুবন্দোবস্ত। এই হলো মোটামুটি ছক, যার ভিত্তিতে গ্রাম ও শহরের ভিতর ধীরে ধীরে নৈকট্য স্থাপন করা যায়।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরবাসীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের বাস বৃহত্তর কলকাতায়। লোকসংখ্যার হিসেবে বৃহত্তর কলকাতা এখানকার পরবর্তী বৃহত্তর শহরের তুলনায় ত্রিশগুণের চেয়েও বড়। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে আছে একটি বৃহৎ নগরীর একাধিপত্য। ফলে কলকাতার সঙ্গে পল্লী বাংলার বৃহদংশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব এতই বেশী যে, এ-দুয়ের ভিতর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সৃষ্টিশীল সম্পর্ক গড়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। ভারতের অন্যান্য কোনো কোনো অঞ্চলেও তুলনীয় অবস্থা দেখা যায় ; তবে শিল্পাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের ভিতর বৈসাদৃশ্য সম্ভবত অন্য কোথাও এমন প্রকট নয়। এই নাগরিক একাধিপত্যের পরিবর্তে চাই বিকেন্দ্রিক উন্নয়নের ভিন্ন রূপরেখা।

গান্ধীবাদীরা গ্রামীণ শিল্পের সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান করতে চান। এই চিন্তাধারারও কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। দ্বিতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার সময়ে কথা শোনা গিয়েছিল যে, আমরা ভারী শিল্পের সাহায্যে বেকার সমস্যার সুরাহা করব। সিংহলেও দু বছর আগে (১৯৭০ সালের অগাস্ট মাসে) কর্মসৃষ্টির বড় একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাতে গ্রামীণ শিল্পের জন্য বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু নানা রকম অসুবিধা অবিলম্বে দেখা দেয়। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার মিল আছে। শুধু সরকারী সহায়তায় গ্রামীণ শিল্পকে চিরকাল টিকিয়ে রাখা যাবে না। গান্ধীবাদীরা নিজেরাই স্বীকার করেন যে, এজন্য ছোট শিল্পের দক্ষতা বাড়ানো দরকার। কুটির শিল্পের যান্ত্রিক উন্নতিতে ওঁরাও আজ আগ্রহী।

এই চিন্তাধারাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। ছোট শিল্পের দক্ষতা বাড়াবার জন্য যেমন যান্ত্রিক নতুনত্ব প্রয়োজন, তেমনই কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কিনবার সমস্যা আছে, আবার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করবার প্রশ্নও আছে। এই সব নানা কারণে ছোট শিল্পকেও একটা সংগঠনের ভিতর আসতে হয়। কোনো কোনো শিল্পকে কৃষকের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু এমন অনেক ছোট শিল্প আছে যাদের বাজারের কাছে, অথবা ঐ রকম কোনো সুবিধাজনক জায়গায়, পরস্পরের সান্নিধ্যে স্থাপন করতে পারলে কাজের সুবিধা হয়। যাকে গ্রামীণ শিল্প বলা হয় তার উন্নতির প্রশ্ন আজ গ্রামের স্বয়ম্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সম্ভবত ঠিক হবে না। গ্রামীণ যে-অর্থনীতি শিল্পবিপ্লবের সংঘাতে ভেঙ্গে গেছে সেখানে প্রত্যাবর্তনের পথ আর খোলা নেই। বরং আমাদের দৃষ্টিকোণ আরও একটু বিস্তৃত করে আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে ছোট শিল্পের কথা চিন্তা করা এখন ফলপ্রসূ হতে পারে। গ্রাম এবং ছোট ও মাঝারি শহরের সমন্বয়েই একটি অঞ্চল। এই কাঠামোর ভিতর স্থানীয় সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহারের জন্য শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয়।

জাতি গঠন ও আর্থিক পুনর্গঠনের কাজের ভিতর এইখানে মিল্। গ্রাম ও জনপদ, আঞ্চলিক সমাজ ও বৃহত্তর সমাজ, এইসব নিয়েই জাতি। ব্যক্তি একই সঙ্গে ছোট, বড় এবং আরও বড় সমাজের অংশ। শিল্পবিপ্লবের একটা ঝোঁক আছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও বৃহৎ জাতির মাঝখানে আত্মীয়তা এবং সমাজবদ্ধতার অন্য যে-সব বৃত্ত আছে, তাদের সে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এই ঝোঁকটা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন মানুষের স্বভাব তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মানুষের আর্থিক ও আত্মিক কিছু অভাব সুষ্ঠুভাবে মেটানো যায়

আঞ্চলিক সমাজের সীমানার ভিতর। আবার অন্য কোনো কোনো প্রয়োজনে তাকে যুক্ত হতে হয় আরও বৃহৎ সমাজ এবং অবশেষে সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে। একথা যেমন সত্য সমাজনীতিতে, তেমনই অর্থনীতিতে। এইসব ছোট এবং বড় সমাজের ভিতর তাই কর্মের সমন্বয় প্রয়োজন। এটা সহজ কথা হয়েও সহজ নয়, কারণ বাস্তব অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমন্বয়ে পৌঁছতে হয় নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে। গান্ধী বলেছিলেন, জনপদের জন্য গ্রাম, দেশের জন্য জনপদ, পৃথিবীর জন্য দেশ। সেকথা এখনও সত্য। কিন্তু এই পারস্পারিক নির্ভরতার প্যাটার্নের ভিতর ছোট বড় বিভিন্ন গোষ্ঠীর দায়দায়িত্বের ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে। আমদের আজকের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মবিভাগের রেখাগুলি নতুন করে এঁকে নেওয়াই প্রধান কাজ। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ অর্থনীতি, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও জাতীয় অর্থনীতি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করার সময় এসেছে।

সমাজ সংগঠনের বৃহত্তর কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আর্থিক পুনর্গঠনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খোঁজা আবশ্যক। একথা অর্থনীতিবিদদের ভুলে থাকার একটা অভ্যাস আছে। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আর উপেক্ষা করা যায় না ; পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও সেটা বলা দরকার। আর্থিক উন্নয়নের জন্য ন্যূনতম একটা সামাজিক সংহতি প্রয়োজন। বেকার সমস্যা ও আঞ্চলিক অসাম্যের সমস্যা আজ এমন আকার ধারণ করেছে যে, এর সঙ্গ সেই ন্যূনতম সমাজ সংহতির প্রশ্নই জড়িয়ে পড়েছে। আর্থিক পরিকল্পনার যাঁরা প্রণেতা, নগরের সমস্যা স্বভাবতই তাঁদের চেতনাকে একটু বেশী করে অধিকার করে থাকে। কারণ নাগরিক অসন্তোষ বেশী সরব। নগরের সমস্যাকে উপেক্ষা করা বিপজ্জনক। তবু ব্যাধির মূল খুঁজতে হলে আরও গভীরে যেতে হবে।

এদেশের যাঁরা নীতির নির্ধারিক তাঁদের ভিতর কি সেই নতুন চিন্তা শুরু হয়েছে ? পল্লী অঞ্চলে আরও কিছু পথঘাট, স্কুল অথবা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়, যদিও এ সবই প্রয়োজন। পল্লী ও নগরের সম্পর্কের প্রশ্নটা নিয়েই নতুন করে ভাবতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের আর্থিক চিন্তায় এখনও স্বচ্ছতা আসেনি। নতুন পরিকল্পনামন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর বলেছেন যে, বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা জোরদার করতে হবে। পল্লী অঞ্চলে যেটুকু না করলেই নয় তাই হবে। আর শহরে, ব্যবসাবাণিজ্যে, ক্ষুদ্র শিল্পে ও সেবাকর্মে যথাসম্ভব বেশী কর্মের সংস্থান করা হবে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮ জুলাই)। একটি বহু প্রচারিত সংবাদপত্রে পরিবেশিত এই খবরটি কি নির্ভুল ? পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবে যা ঘটছে, তারই প্রায় একটি হুবহু চিত্র এখানে পাওয়া যাচ্ছে। এসব দেশের পল্লী অঞ্চলে নতুন কাজেব সুযোগ বাড়ছে না : আর শহরের অতিস্ফীত ব্যবসাবাণিজ্যে ও তথাকথিত সেবাকর্মে অর্ধবেকারদের সংখ্যা ক্রমশ অস্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে চলেছে। এই প্রতিক্রিয়াটিকে সরকারী সহায়তায় আরও একটু সুচারুভাবে সম্পন্ন করাই কি যথেষ্ট ? তবে কি 'নয়া অর্থনীতি'র চাকা ঘুরেও ঘুরছে না ? আশা রাখতেই হয় যে, পরিকল্পনামন্ত্রীর আরও কিছু বক্তব্য আছে, যা তিনি এখনও বলেননি। দেশের অর্থনীতি নিয়ে নতুন একটা সামগ্রিক চিন্তা পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হওয়া চাই। গ্রামকে উপেক্ষা করে দেশময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে না।

উন্নয়নের তত্ত্ব ও ভবিষ্যৎ

আর্থিক উন্নয়ন বিষয়ে আঠারো শতকের শেষভাগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন এডাম স্মিথ। বৃটেনে শিল্পবিপ্লবের সেটা জন্মলগ্ন। স্মিথের তত্ত্বের একই সঙ্গে ধারক ও সমালোচক ডেভিড রিকার্ডো। তাঁর পর উনিশ শতকের মধ্য ও শেষভাগে যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তার ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলেছিলেন তাঁদের ভিতর কার্ল মার্ক্স ও জন স্টুয়ার্ট মিল বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেই সময়ে আরো কিছু দেশে, যেমন জার্মানীতে, দ্রুত শিল্পোন্নয়ন শুরু হয়েছে। আর বৃটেনে ততদিনে শিল্পবিপ্লব শৈশব অতিক্রম করে গেছে। স্মিথের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের টীকাভাষ্য তখন আর যথেষ্ট রইল না। উনিশ শতকের অভিজ্ঞতার আলোতে উন্নয়নতত্ত্বকে নতুনভাবে সাজানো সম্ভব ও প্রয়োজন হল। মিল ও মার্ক্সের পর আরো এক শতাব্দীর অধিক কাল কেটে গেছে। অনিবার্যভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে আরো নতুন তথ্য ও অভিজ্ঞতা, উনিশ শতকের পরিধির ভিতর যাদের খোঁজ পাওয়া কঠিন হবে। পূর্বসূরীদের চিন্তা এখনও মূল্যবান। তবু সময় এসেছে নতুন চিন্তার। পুরনো চিন্তার ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়।

(ক)

১৭৭৬ সালে এডাম স্মিথের সেই বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হল, An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, অর্থাৎ জাতিসমূহের ধনদৌলতের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান। স্মিথ একদিকে ছিলেন তাত্ত্বিক ও দার্শনিক, অন্যদিকে আর্থনীতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর ভালো রকম পরিচয় ছিল।

আর্থিক উন্নয়নের মূল কারণগুলি কী ? স্মিথের অনুসন্ধান এই নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যের খানিকটা পরিচয় দেওয়া যাবে। তার আগে পরিভাষা সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন আছে। বাংলায় 'অর্থ' শব্দের দুটি ভিন্ন ব্যবহার দেখি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'money' বাংলায় তাকে অনেক সময় 'অর্থ' বলি। যেমন ধরুন এই বাক্যটি, 'জিনিস বিনিময়ের অসুবিধা দূর করতে গিয়ে অর্থের আবিষ্কার হল' (ধনবিজ্ঞান)। এখানে ঐ শব্দটির মানে হল money অর্থাৎ মুদ্রা। আবার ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'economic development' তাকে বাংলায় তর্জমা করে আমরা বলি আর্থিক উন্নয়ন। এখানে অর্থ শব্দটির অন্য এক মানে পাচ্ছি।

অনেকে হয়তো ভাববেন, এই দুই অর্থের ভিতর পার্থক্য তেমন বড় নয়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি মানেই হল টাকাপয়সার বৃদ্ধি। অথবা কথাটা উলটে বলা যায় টাকাপয়সা বাড়লেই আর্থিক উন্নতি হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইরকম মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কি এ কথা বলা যায় ? এইখানেই এডাম স্মিথের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী কিছু অর্থশাস্ত্রীর মতের মৌল পার্থক্য দেখা যায়। স্মিথের আগের যুগে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি ছিল, 'ম্যার্কেন্ট্যালিস্ট' মতবাদের। এই মতবাদের লেখকেরা বিশ্বাস করতেন, দেশের ভাণ্ডারে সোনারুপো যত জমবে ততই আর্থিক উন্নয়ন এগিয়ে যাবে। অবশ্য তাঁদের কথাটা এখানে অতিরিক্ত সরল আকারে বলা হল। যাই হোক, এডাম স্মিথ ম্যার্কেন্ট্যালিস্ট মতবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি এই কথাটা

জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছিলেন যে, সোনারুপো অথবা মুদ্রার পরিমাণ বাড়ানোটা আর্থিক উন্নয়নের মূল কথা নয়। উন্নয়নের একটা বাস্তব ভিত্তি চাই। যেমন শ্রমের দক্ষতা অথবা কার্যক্ষমতা আর্থিক উন্নয়নের বাস্তব নির্ধারক। আমাদের জানতে হবে, কার্যক্ষমতা কীভাবে বাড়ে ? ইতিহাস ও তত্ত্ব মিলিয়ে এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের বুঝে নিতে হবে।

এডাম স্মিথ বললেন, বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে শ্রম বিভাগ বেড়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে বাড়ছে শ্রমে দক্ষতা। একই মানুষকে যদি সব কাজই করতে হয় তবে কোনো কাজেই তার বিশেষ দক্ষতা আশা করা যায় না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সবই যদি একই ব্যক্তিকে করতে হয় তবে জুতো সেলাইয়ের কাজে তাঁর বিশেষ পারদর্শী হবার সম্ভাবনা কম, শাস্ত্রেও বিশেষ পণ্ডিত হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। এডাম স্মিথ অবশ্য অন্য এক ধরনের কর্মবিভাগের কথা বিশেষ করে ভাবছিলেন। শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সবটা আর কোনো একজনের হাতে থাকে না, প্রক্রিয়াটা ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত হয়ে যায়, আর প্রতিটি অংশে নিযুক্ত হয় এক বা একাধিক কর্মী। একই সঙ্গে যন্ত্রের ব্যবহারও বেড়ে যায়, বহুবিভক্ত প্রক্রিয়াগুলি যখন যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। এসবই ঘটতে পারে তখনই বেশি পরিমাণে শিল্পোৎপাদন যখন প্রয়োজন, আর বাজারের বিস্তার ঘটলে তবেই এটা সম্ভব। কৃষককন্যা যদি ঘরে বসে নিজের কাপড় নিজে বোনে তবে সেখানে শ্রমবিভাগের সুযোগ কম। কিন্তু বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে কাপড়ের কল ; কাজের প্রক্রিয়াটা সেখানে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ; সেই সঙ্গে বাড়ে যন্ত্রের ব্যবহারও। শ্রম বিভাগের ফলে কেউই আর নিজের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিস নিজে উৎপাদন করে না, নির্ভর করতে হয় বাজারের ওপর। মিলের মালিক উৎপন্নদ্রব্য বাজারে বিক্রী করবার আগেই শ্রমিককে তার মজুরী মিটিয়ে দিতে হয়, যাতে দিনের শেষে তার গ্রাসাচ্ছদন জোটে। কিন্তু মজুরী অগ্রিম দিতে গেলেই প্রয়োজন মূলধন। কাজেই শ্রমবিভাগ ও বাজারভিত্তিক উৎপাদনের জন্য মূলধন অত্যাবশ্যক। মূলধন আসে সঞ্চয় থেকে। এডাম স্মিথ তাই সঞ্চয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এমনিভাবে স্মিথের চিন্তায় শ্রমবিভাগ, বাজারের বিস্তার, সঞ্চয় আর মূলধন পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সবের ভিত্তিতে বৃদ্ধি পায় কার্যদক্ষতা। আর্থিক উন্নয়নের এটাই বাস্তব ভিত্তি। এই বাস্তব ভিত্তি যদি অনুপস্থিত থাকে তবে দেশে শুধু মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এই যে 'বাস্তব' বিশ্লেষণের ওপর জোর দেওয়া এটা পাশ্চাত্য ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের একটা বৈশিষ্ট্য। টাকার মুখোশ পরে আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের সামনে দেখা দেয়। সেই মুখোশের পশ্চাতে আছে 'বাস্তব' অর্থনীতি। শ্রম ; ভূমি। মূলধন, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি আর শ্রমিকের জীবনধারণের অন্ন। এইসব উপাদানের সংযুক্ত সুদক্ষ প্রয়োগে উৎপাদন হয় পণ্যদ্রব্য। পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ের জন্য বাজার। টাকা এই বিনিময়ের সহায়ক। তেল যেমন চাকা ঘোরাতে সাহায্য করে, কিন্তু তেলটা চাকা নয়। অর্থনীতির চাকাটা দৃষ্টির ভিতর আনতে হবে। 'বাস্তব' বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ, ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের জোর এইখানে। পরবর্তী কোনো কোনো অর্থনীতিবিদদের মতে তার দুর্বলতার একটা কারণও নিহিত এইখানে।

আগেই দেখেছি, উন্নয়নতত্ত্বে সঞ্চয়কে একটা বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন এডাম স্মিথ। এটাকে ধ্রুপদী অর্থনীতির আরেক বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। জমিদার আর শিল্পপতি এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি এডাম স্মিথের মনোভাবের পার্থক্য লক্ষ করবার মতো।

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের প্রতি তাঁর মনের এক কোণে একটা গভীর সন্দিগ্ধতা ছিল। এই শ্রেণীর মানুষ সুযোগ পেলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণকে বিপাকে ফেলে, এই ধরনের উক্তি আছে তাঁর লেখায়। কিন্তু আর্থিক উন্নয়নের কাজে, দেশের ধনদৌলত বাড়াবার ব্যাপারে, তবু জমিদার বা অভিজাত শ্রেণীর ওপরে তিনি স্থান দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি শ্রেণীকে। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ সঞ্চয়ী নয়, শিল্পপতি সঞ্চয়ী। সঞ্চয় আর সঞ্চয়ের বিনিয়োগ, উন্নয়নের জন্য এটাই জরুরী। কৃষিতে উন্নতির জন্যও এটা প্রয়োজন। ব্যবসায়িক দৃষ্টি নিয়ে কৃষিতে মনোযোগ দিলে তারও উন্নতি ঘটে।

আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ডে রাষ্ট্রের স্থান কী হবে? অনেকে বলেন, বাজারের হাতেই এডাম স্মিথ সব ছেড়ে দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রের জন্য আর্থিক ক্রিয়াকর্মে বিশেষ কোনো ভূমিকা তিনি অবশিষ্ট রাখেননি। স্মিথ সম্বন্ধে এটা ভুল ধারণা। অবশ্য আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ডে বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর চিন্তায় স্বীকৃত। কিন্তু এ কথাও তিনি বুঝেছিলেন যে, ব্যবসায়ীদের হাতে সব ছেড়ে দিলে ঝোঁক চলে যায় একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকে। কাজেই রাষ্ট্রের একটা সদাসতর্ক ভূমিকা ছাড়া ব্যবসায় নির্বাধ থাকে না। তা ছাড়া এমন অনেক ক্রিয়াকর্ম আছে যাতে জাতীয় জীবন সামগ্রিকভাবে উন্নত কিংবা উপকৃত হয়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যবসায়ীর পক্ষে সেই সব কাজ তেমন লাভজনক নয়। স্মিথের প্রিয় উদাহরণ, জনসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা। এইসব ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চেয়েছিলেন।

এডাম স্মিথের পর ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের প্রধান নায়ক ডেভিড রিকার্ডো। জমিদার আর শিল্পপতির ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্বের একটা পরিষ্কার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় রিকার্ডোর লেখায়। স্মিথ জোর দিয়েছিলেন এই কথাটার ওপর যে, জমিদারশ্রেণী সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কাজে বড় আগ্রহী হয় না, আগ্রহী হয় বিলাসব্যসনে. কাজেই আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর ভূমিকা দুর্বল। রিকার্ডো দেখালেন যে, আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ এবং দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীত। তৎকালীন একটা রাজনীতির বিতর্কের ভিতর দিয়ে প্রশ্নটা জরুরী হয়ে উঠেছিল। নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের বৈরসম্পর্কের কারণে ফরাসী দেশের গম এক সময়ে ইংলণ্ডে আসতে পারেনি। নেপোলিয়ন বিগত হবার পর বেশ কিছুকাল ফরাসী গমের আমদানির ওপর একটা শুল্ক থেকে গেল ইংরেজ কৃষকের স্বার্থে। ঐ শুল্কটা থাকবে, না তুলে দেওয়া হবে, এই নিয়ে তর্ক শুরু হল। তুলে দিলে অপেক্ষাকৃত সস্তা গম ইংলন্ডের জনসাধারণের হাতে আসবে। গমের দাম কমে গেলে কিন্তু জমিদারের প্রাপ্য খাজনা কমে যাবে। গমের দাম বেশি হলে জমিদারের লাভ। কিন্তু খাদ্যমূল্য বাড়লে মজুরীও বাড়ে, তাতে শিল্পপতির ক্ষতি। রিকার্ডো ছিলেন আমদানী শুল্ক তুলে দেবার পক্ষে। জমিদার ও শিল্পপতির স্বার্থের দ্বন্দ্বটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। রিকার্ডো সেটাকে তত্ত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। স্মিথের মতো তিনিও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে ছিলেন।

যেমন জমিদার ও শিল্পপতির ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, বিশেষত হ্রস্বমেয়াদী দৃষ্টিতে, তেমনি দ্বন্দ্ব আছে শ্রমিক ও শিল্পপতির ভিতরও। এডাম স্মিথ ও রিকার্ডো সেটা লক্ষ করেননি এমন নয়। শ্রমিকেরা সংগঠিত নয় বলে শিল্পপতিদের সঙ্গে দর কষাকষিতে তারা সুবিধা করতে পারে না, স্মিথের লেখায় এই ধরনের মন্তব্য আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বটার ওপর স্মিথ অথবা রিকার্ডো ততটা জোর দেননি। তাঁদের দৃষ্টিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগটাই

বেশি গুরুত্বপূর্ণ জাতির স্বার্থে। এইখানে এসে পড়ে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টির একটা বিচার। আর্থিক উন্নয়নের ফলে দীর্ঘমেয়াদে কি শ্রমিকেরও অবস্থার উন্নতি ঘটে? ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের মতে সেটা নির্ভর করছে অন্য কিছু অবস্থার ওপর, যার ভিতর প্রধান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

দেশে পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন শিল্পের বৃদ্ধি ঘটে তেমনি শ্রমের জন্য চাহিদাও বাড়ে। জনসংখ্যা যদি একই হারে বেড়ে চলে তবে মজুরি বাড়বে না। অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে শ্রমিকের দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। ম্যালথাস এ কথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। তবে সংখ্যানিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। স্মিথ থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত সবাই সেটা মানতেন। একদিকে প্রয়োজন পুঁজিসঞ্চয় অব্যাহত রাখা আর অন্যদিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ। তবেই শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হবে, ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের এই ছিল অভিমত। একটা প্রশ্ন এখানে তোলা যেতে পারে। পুঁজিসঞ্চয় করা হলেই কি যথেষ্ট? তার বিনিয়োগের সুযোগ থাকছে কি না সেটাও তো দেখা দরকার। যদি সঞ্চিত পুঁজির বিনিয়োগের সুযোগ কমে যায়, তবে তা থেকেই কি আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে পারে না? এ বিষয়ে ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীদের ভিতর মতামতের কিছু পার্থক্য ছিল। তবে অধিকাংশের মতটা সংক্ষেপে এই রকম। ধরা যাক উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র আছে শুধু দুটি, খাদ্যশস্যের চাষ আর কাপড়ের কল। যারা কৃষিতে নিযুক্ত তাদেরও কাপড়ের প্রয়োজন আছে, আবার যারা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদেরও খাদ্যের চাহিদা আছে। দুটো ক্ষেত্রেই যদি অনুপাত রক্ষা করে মূলধন বিনিয়োগ করা যায় তা হলে চাহিদার অভাবে উৎপাদন আটকে যাবে না। এমন অবশ্য হতে পারে যে, কাপড়ের কলে অত্যধিক টাকা ঢালা হল আর কৃষিকাজ অবহেলিত থেকে গেল। তা হলে বাড়তি কাপড় কিনবার মতো যথেষ্ট চাহিদা হয়তো বাজারে থাকবে না, কারণ চাষীদের আয় যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিতর পুঁজির বিনিয়োগে অনুপাত রক্ষা না করলে বাজারে সঙ্কট দেখা দিতে পারে। ভুলটা শোধরাতে সময় লাগে কিন্তু বাজারের সংকেত বুঝে নিয়ে ঠিক পথে ফিরে আসা সম্ভব। এইরকম ভুল সংশোধন করতে করতেই অর্থনীতি এগিয়ে চলে। যোগান বাড়াতে গিয়ে বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়, আর তা থেকেই বাড়তি আয় এবং চাহিদাও সৃষ্টি হয়। খাদ্যশস্য ও বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের তাত্ত্বিক ছকের মধ্যে যদি আমরা যন্ত্রশিল্প যোগ করে দিই তা হলেও মূল যুক্তিটা ভেঙে পড়বে না। বাজারে সংকট যদিও মাঝে মাঝে দেখা দেয় তবু পুঁজির বিনিয়োগ ও আর্থিক উন্নয়ন সাময়িক হেরফের অতিক্রম করে এগিয়ে চলে। ইতিহাসের পথ মসৃণ নয়, এ কথা স্বীকার করে নিয়েও সাময়িক উত্থানপতন অথবা সুবিধা-অসুবিধার চেয়ে আর্থিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী নির্ধারকগুলির প্রতি অধিক মনোযোগী হতে শিখিয়েছে ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞান। 'বাস্তব' বিশ্লেষণের মতোই এটাও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ দৃষ্টিতে উন্নয়নের পথে একটি মূল বাধাই ধ্রুপদী আর্থিক তত্ত্বে স্বীকৃত; ভূমির উৎপাদিকা শক্তির একটা সীমা আছে। ফলে উন্নয়নের গতি একসময়ে ক্রমবর্ধমান বাধার সম্মুখীন হতেই পারে। কিন্তু সেটা বাজারের সঙ্কট নয়। উন্নয়নের দীর্ঘকালীন সীমা নির্ধারিত হচ্ছে চাহিদার অভাব থেকে নয়, জমির উৎপাদিকা শক্তির সীমাবদ্ধতা থেকে। জমি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে না শুধু কৃষিযোগ্য ভূমি। আরো ব্যাপক অর্থে তেল কয়লা সহ সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই ধরতে হবে।

ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এইরকম বলা হয়ে থাকে। কথাটা একেবারে ভুল নয়। তবে সম্পূর্ণ ঠিকও নয়। ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিলেই যে কাউকে ধনতন্ত্রের সমর্থক হতেই হবে এমন নয়। যেমন ধরা যাক জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা। তিনি অর্থবিজ্ঞানের ঐ সিদ্ধান্তসমূহ মোটামুটি মানতেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও সমবায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজবাদের ভিতর সমন্বয়ে তিনি আস্থা স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ অগ্রসর হবে সমবায়ের পথে, এই তাঁর আশা ছিল। জন স্টুয়ার্ট মিলের সমন্বয়ী চিন্তা যুক্তিগ্রাহ্য কি না সেই আলোচনা আপাতত মুলতুবী থাক।

উনিশ শতকের গোড়ায় ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানের প্রভাব প্রবল হলেও সমালোচকের অভাব ছিল না। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে লিস্ট্ অথবা সিসমঁদির নাম। তবে অন্যান্য সবাইকে প্রসিদ্ধিতে ছাড়িয়ে গেছেন মহাপণ্ডিত কার্ল মার্ক্স। তাঁর চিন্তার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া এখানে অসম্ভব। তবু সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

মার্ক্সের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর শোষণতত্ত্ব বহু লোকের মুখে-মুখে শোনা যায়। মানুষ তার শ্রমের দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করে। শ্রমের পরিমাণ দিয়েই দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। আবার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম নিজেই একটি পণ্যদ্রব্য, কারণ বাজারে তার ক্রয়-বিক্রয় চলে। শ্রমিক যে-পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে আর শ্রমের পরিবর্তে যে-মূল্য লাভ করে, এই দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে। যে-মূল্য শ্রমিক সৃষ্টি করেছে অথচ লাভ করেনি তাকে বলা হয়েছে উদ্‌বৃত্ত মূল্য। শ্রম ক্রয় করে পুঁজিপতি ও উদ্‌বৃত্ত মূল্য তারই হস্তগত হয়। এরই নাম শোষণ। উদ্‌বৃত্ত মূল্য দিয়েই শোষণের পরিমাপ হয়। উদ্‌বৃত্ত মূল্যের দ্বারা পুষ্ট হয় শোষকশ্রেণী।

শ্রমের মূল্য, অর্থাৎ শ্রমিকের মজুরি, নির্ধারিত হয় কী ভাবে ? ধনিকেরই স্বার্থে শ্রমিক লাভ করে সেই নিম্নতম মজুরি যাতে সে কষ্টে-সৃষ্টে বেঁচে-বর্তে থাকে আর প্রতিদিন ফিরে আসে আবারও উৎপাদনের কাজে উৎসর্গিত হবার জন্য। উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজি সঞ্চয় হয়, তাই দিয়েই নতুন করে শ্রমিক নিযুক্ত হয়, আর ক্রয় করা হয় সেই যন্ত্রপাতি যার সৃষ্টির মূলেও আছে শ্রম। পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের জন্য পুঁজিপতির চাহিদাও স্বাভাবিকভাবে বাড়বার কথা আর তাই ঊর্ধ্বমুখী চাপে বাজারের সাধারণ নিয়মে মজুরি বৃদ্ধি পাবার কথা। কিন্তু ধনিকশ্রেণী মজুরি-বৃদ্ধি রোধ করতে বদ্ধপরিকর। একে তো শ্রমের ক্রেতা হিসেবে পুঁজিপতিদের ভিতর একটা সমঝোতা বা অলিখিত চুক্তির মতো আছে। তা ছাড়া মজুরি-বৃদ্ধির উপক্রম দেখা দিলে শ্রমিকের নিয়োগ কমিয়ে দিয়ে যন্ত্রের নিয়োগ বাড়াবার পথে অগ্রসর হয় শিল্পের মালিক। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমিকদের ভিতর বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। এই বেকারবাহিনীর চাপে মজুরি সর্বনিম্ন স্তরেই থেকে যায়। এইসঙ্গে ধনতন্ত্রের আরো একটা ঝোঁকের কথা মার্ক্সীয় অর্থতত্ত্বে বলা হয়েছে। শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোটো ছোটো শিল্প হয় বড় শিল্পের লেজুড় হয়ে যায়, নয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে বিদায় নেয়। পুঁজি ক্রমশ অল্পসংখ্যক পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। এইভাবে সমাজে দুই বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়। এক মেরুতে অবস্থিত অল্পসংখ্যক ধনিক যাদের হাতে পুঁজি পুঞ্জীভূত। আর অন্য মেরুতে আছে বঞ্চিত জনসাধারণ, যাদের শ্রমশক্তি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এইভাবে ধনিক ও শ্রমিকের দুই শিবিরে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে,

মধ্যবিত্তের স্থান ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

ধনতন্ত্রের ভিতর স্ববিরোধ এবার স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। একদিকে মূলধন ও যন্ত্রের অগ্রগতির ফলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি অসামান্যভাবে বেড়ে যায়; অন্য দিকে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র্যের ফলে ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকে যায়। দেশের ভিতর পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার পথে কঠিন বাধা সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিরা তখন বিদেশে বাজার খুঁজতে বাধ্য হয়। বিদেশের বাজার নিয়ে আরম্ভ হয় বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের ভিতর বিরোধ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট এইভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। মার্ক্সবাদের শিক্ষা এই যে, ধনতন্ত্র স্থির হয়ে থাকে না, তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বিপ্লবের ক্ষেত্র এইভাবে প্রস্তুত হয়। এই বিপ্লবে নেতৃত্বের ভূমিকা নেয় শ্রমিকশ্রেণী। আধুনিক শ্রমিকশ্রেণী একদিকে ধনতন্ত্রেরই সৃষ্টি। অন্য দিকে এই শ্রমিকশ্রেণীই ধনতন্ত্রের সংহারক। মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণমুক্ত সমাজ। যে-রাষ্ট্রযন্ত্র একদিন ছিল ধনিকের হাতে শোষণের ও অত্যাচারের যন্ত্র, সেটা এবার হবে শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিপ্লবোত্তর সমাজেরও বিবর্তনে একাধিক ধাপ আছে, যার প্রথম ধাপকে বলা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক আর উচ্চতর ধাপকে সাম্যবাদী। রাষ্ট্র যেহেতু মূলত শ্রেণী-আধিপত্য রক্ষার নিপীড়ক যন্ত্রবিশেষ, অতএব শোষণমুক্ত সমাজে তার প্রয়োজন ক্রমে ফুরিয়ে যাবারই কথা। সেটাই মার্ক্স আশা করেছিলেন। সেইখানে পৌঁছবার পথে শ্রমিকশ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ একটা ঐতিহাসিক পর্যায়। মানুষের সার্বিক মুক্তিই শেষ লক্ষ্য।

একথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, মার্ক্সীয় আর্থিক তত্ত্বের মূল ছিল ধ্রুপদী, বিশেষত রিকার্ডোর, চিন্তাভাবনায়। তবু এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর কিছু গুরুতর বৈসাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। আর্থিক জীবনে মাঝে মাঝে অস্থিরতা দেখা দেয় একথা রিকার্ডো, মিল সহ সবাই জানতেন। কিন্তু মার্ক্স বিশ্বাস করতেন, ধ্রুপদী অর্থবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন না যে, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিতর সংকট অনিবার্যভাবে ক্রমেই বেড়ে চলবে। ধনতন্ত্রের আশ্রয়ে শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটে, একথা স্মিথ এবং মার্ক্স উভয়েই মানতেন। শ্রেণীবিরোধের কথাও এঁদের কারোই অজানা ছিল না। তবে মার্ক্স তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করতেন না, ধ্রুপদী চিন্তানায়কেরা করতেন, যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার উন্নতি সম্ভব। বলা বাহুল্য, আর্থিক ধ্যানধারণার এই পার্থক্যের সঙ্গে যোগ ছিল রাজনীতির, আরো ব্যাপক অর্থে সমাজনীতির। অবশ্য বিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও আমাদের ঐ দুই বিরোধী তত্ত্বের ভিতরই একটিকে বেছে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং সম্ভব আরো নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

(খ)

থিওরী অথবা তত্ত্বের সঙ্গে তথ্য সব সময়ে মেলে না। অথচ তত্ত্বের উদ্দেশ্য তথ্যকে বুঝতে সাহায্য করা। তত্ত্বের ভিত্তিতে যে-সব প্রত্যাশা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, তথ্যের সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দেখবেন সমাজবিজ্ঞানী। প্রয়োজন হলে সংশোধন করবেন পূর্বকল্পনা। বৈজ্ঞানিকের কাছে কোনো গৃহীত তত্ত্বই শেষ কথা নয়।

হ্ে মোটা ধরনের কিছু তথ্যের প্রতি এবার দৃষ্টিপাত করা যাক। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক

দেশগুলিতে ধন-বণ্টনে অসাম্য এখনও আছে বড় আকারেই। তবে শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এ-কথা বলা যাবে না যে, সেই অসাম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বেকার সমস্যার সমাধান পৃথিবীর উন্নত ও অনুন্নত অধিকাংশ দেশে এখনও নাগালের বাইরে। দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এ-কথাই বলতে হয় যে, ব্যবসায়িক অস্থিরতা এবং উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় মোটের ওপর বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে, যদিও তাদের অভাববোধ বোধকরি কিছুমাত্র কমেনি। জাপানে, পশ্চিম ইয়োরোপে অথবা আমেরিকায় আজকের শ্রমিক এক অথবা কয়েক প্রজন্ম আগের শ্রমিকের তুলনায় উন্নততর জীবনযাত্রার অধিকারী। এটা সম্ভব হয়েছে শিক্ষার প্রসার, শ্রমিক সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে। ধনতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি এ-কথাটা সাধারণভাবে সত্য নয়। অবশ্য এইসব কথারই সমালোচনা সম্ভব। মার্ক্সবাদী মহলে যে-সমালোচনাটি প্রায় শোনা যায় তা হল এই যে, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতি সম্ভব হয়েছে অনুন্নত দেশের শ্রমিকদের শোষণ করে। পশ্চিমের ধনপতি স্বদেশে শ্রমিকদের কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে পেরেছে বিদেশে দারিদ্র্য চালান দিয়ে। অর্থাৎ, উন্নত ধনতন্ত্রের শ্রমিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদপুষ্ট, এর বেশি কিছু নয়। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে অনেকেরই এইরকম বিশ্বাস। এ-বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করা যাবে।

এই শতকের আরেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, নতুন মধ্যবিত্তের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। এই মধ্যবিত্ত শুধু ছোটো ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিয়েই নয়। আরো অন্য ধরনের মানুষ এর ভিতরে আছে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক গবেষক যন্ত্রবিদ ও নানা রকমের বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এরা নতুন মধ্যবিত্তের পঙ্‌ক্তিভুক্ত। পুঁজিপতি নয় এরা, কিন্তু অনেকেই উচ্চপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। পুঁজি বিনেয়োগ করা হয়েছে এদের শিক্ষায়, যার ফলে এদের আয়ের ক্ষমতা বেড়ে গেছে। উল্লেখ করা সঙ্গত হবে যে, এডাম স্মিথের চিন্তায় এ-বিষয়ে আলোচনার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। স্মিথ বলেছিলেন, মূলধন বাস্তব রূপগ্রহণ করে শুধু যন্ত্রে নয়, যন্ত্রীর প্রশিক্ষিত কলাকৌশলেও। যন্ত্রকুশলীদের আয়ের উৎস নয় অশিক্ষিত শ্রম। বরং শিক্ষা, ব্যয়বহুল শিক্ষাই, এদের প্রধান পুঁজি। এদের অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে এক করে দেখা চলবে না। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত আধুনিক শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, বরং তার আশ্রয়ে বেড়ে চলে। নতুন মধ্যবিত্তের আর এক অবলম্বন আমলাতন্ত্র। আধুনিক রাষ্ট্রে, কি ধনতন্ত্রে কি সমাজতন্ত্রে, আমলাদের শক্তি ও সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের মতো দেশেও এরা বর্তমান ও বর্ধমান। উচ্চপর্যায়ের আমলাদের কোনো প্রকারেই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাকার করে দেখা যায় না। এরা নতুন মধ্যবিত্তেরই অংশবিশেষ। যন্ত্রবিদ্ বিশেষজ্ঞ ও আমলাবাহিনী নিয়ে গঠিত এই যে বিশেষ শ্রেণী, এরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তেমনি স্বচ্ছন্দে বিরাজ করে যেমন করে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। এই নব মধ্যমশ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছাড়া আজকের দিনে কোনো সঠিক সমাজতত্ত্ব হয় না। অন্তত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর একটা অতুচ্ছ অংশ মধ্যবিত্তের অংশ হয়ে যাচ্ছে। আজকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এ-বিষয়ে সচেতন যে, সমাজ চলমান। প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্ঠুর পরিবেশে মধ্যবিত্তের ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের

কারণও কম নেই। এটা আশ্চর্য নয় যে, নব মধ্যবিত্তের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাত্ত্বিকভাবে বিপ্লবী। এটাও আশ্চর্য নয় যে, এরা কার্যত স্থিতিশীলতা অথবা সুশৃঙ্খল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ঘোষিত তত্ত্ব আর আচরিত জীবনচর্যার ভিতর এই অসামঞ্জস্য মধ্যবিত্তের জীবন নাটকের মৌল বৈশিষ্ট্য। নতুন প্রজন্ম এই কাপট্যে মর্মাহত, যদিও অতি দ্রুত তাদেরও জীবনের এটা অঙ্গ হয়ে ওঠে।

রুশ বিপ্লবের পর সমাজতন্ত্রবিরোধী মহলে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, নতুন সোভিয়েত ব্যবস্থা বেশি দিন টিকবে না। সে-ধারণা অদ্যাবধি সত্য প্রমাণিত হয় নি। সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভালো-মন্দ দু দিকই আছে। সেখানে ধনের বণ্টনে অসাম্য অপেক্ষাকৃত কম। তবে সাংগঠনিক ও সামরিক ব্যবস্থায় স্তরভেদ, ক্ষমতার অসাম্য ও বিশেষ সুবিধাভোগীদের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বেকার সমস্যার নগ্ন রূপ সেখানে নেই। অপর পক্ষে ভোগ্যবস্তুর গুণগত মান রক্ষা করা যাচ্ছে না। অতিকেন্দ্রিকতার ফলে, তলাকার প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতার অভাবে, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নানা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। কিন্তু প্রধান কথা, এই নতুন ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ও সংশোধনের পথে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে, ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে না। সোভিয়েত সমাজ আত্মরক্ষায় ও দ্রুত শিল্পায়নে সফল হয়েছে। বিদেশী সমালোচকদের নৈরাশ্যবাদী ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে। সোভিয়েত সমাজে যে নতুন মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে তারা এই ব্যবস্থাকে ভাঙবার পক্ষপাতী নয়, সংশোধনের পথে একে চালু রাখতেই আগ্রহী। দেশের ভিতরই কিছু যুবক অবশ্য আছে, কিছু লেখক শিল্পী চিন্তাবিদ্, যারা ঐ-দেশের বর্তমান ব্যবস্থার ঘোরতর সমালোচক, যাদের লেখা সরকারের চোখের আড়ালে প্রচারিত হচ্ছে। তবু এটাই ধরে নেওয়া ভালো যে, ও-দেশের বর্তমান আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহসা ঘটবে না। ভবিষ্যৎ আপাতত অনিশ্চিত।

অন্তত শিল্পোন্নত দেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। মার্ক্স ভেবেছিলেন, ধনতন্ত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে তার আত্মবিরোধ। যে-কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে পুঁজির পরিমাণ যত বৃদ্ধি পাবে ততই পুঁজিপতি আর শ্রমিকশ্রেণী দুই বিপরীত মেরুতে আরো বেশি করে সংবদ্ধ হবে, দুই বিরোধী শিবিরের সংঘর্ষ আরো তীব্র হয়ে উঠবে, বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পক্ক হবে আর শ্রমিকশ্রেণী তখনই খুঁড়বে ধনতন্ত্রের কবর। অর্থাৎ, মার্ক্সের তত্ত্ব মেনে নিলে, প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশেই সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব সবচেয়ে ভীষণ, সেখানেই সঙ্কট সবচেয়ে গভীর। কিন্তু ১৯১৭ সালে বিপ্লব ঘটল অনুন্নত রুশ দেশে, ধনতন্ত্র যেখানে বেশি দূর বিকশিত হতে পারেনি। লেনিন প্রমুখ নেতারা অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ধনতন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়, তৈরি হয়েছে বহু দেশ নিয়ে একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল, এই শিকলের যেটা দুর্বলতম গ্রন্থি, টান পড়লে সেটাই ভাঙবে আগে। তবু স্বীকার করা ভালো যে, রুশ দেশে বৈপ্লবিক ঘটনার পরও আশা করা হয়েছিল যে, মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী বিপ্লব ছড়িয়ে পড়বে এক অথবা একাধিক উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে। কিন্তু ঘটনা অন্য প্রকার। রুশ বিপ্লবের পর প্রায় সত্তর বছর পূর্ণ হতে চলেছে। কোনো প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশেই বৈপ্লবিক প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি।

ব্যাপারটা বিশেষ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গত দশ পনের বছরে, ১৯৭৩ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে। এ-সময়ে ধনতান্ত্রিক জগতে আবারও বড় আকারে আর্থিক দুর্যোগ দেখা

দেয়। আশা করা অসঙ্গত হত না যে, এই সময়ে ঐ দেশগুলিতে জনমত প্রবলভাবে বামপন্থী হয়ে উঠবে, ধনতান্ত্রিক জগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবেশ অপ্রতিরোধ্য হবে। কিন্তু তা হয়নি। ইংলণ্ড ও আমেরিকার মতো প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই সময়ে ভোট পড়ল রক্ষণশীল দলগুলির পক্ষে। আরো উল্লেখযোগ্য, ফরাসী দেশে কম্যুনিস্ট দলের জনসমর্থন এই সময়ে কমে গেল প্রশ্নাতীতভাবে। সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমী দুনিয়ায় সংগঠিত শ্রমিক তার বৈপ্লবিক উৎসাহ অনেক পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছে। এইসব দেশে নব মধ্যবিত্তের চেতনায় আকস্মিক বিপর্যয়ের চেয়ে সামাজিক স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে এসবের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একেই অবলম্বন করে প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক জগৎ বিপ্লব ঠেকিয়ে রেখেছে। এই ব্যাখ্যা কতটা ভার গ্রহণ করতে পারে ভেবে দেখা দরকার। রুশ বিপ্লবের পর পশ্চিমী দেশগুলিতে যখন ধনতন্ত্রের পতন ঘটল না তখন বলা হয়েছিল, পিকিং (বা বেইজিং) আর কলকাতার পথে বিপ্লব এসে পৌঁছবে ইয়োরোপে আমেরিকায়। অর্থাৎ চীন আর ভারত সাম্রাজ্যবাদের বড় খুঁটি, ঐ দুটো দেশ হাতছাড়া হলেই শিল্পোন্নত পশ্চিমী ভূখণ্ডে ধনতন্ত্রের পতন ঘটবে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, চীন কম্যুনিস্ট হয়েছে। কিন্তু এর ফলে পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান জার্মানী ফরাসী দেশ হল্যাণ্ড বেলজিয়াম প্রমুখ আরো বহু দেশ উপনিবেশ হারিয়েছে। অথচ এর পরও ঐ-সব দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রয়োজনীয় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে আপাতদৃষ্টিতে আরো উন্নত জীবনযাত্রার দিকেই এগিয়ে চলেছে। স্পেনের উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। ফ্রাংকোর একনায়কতন্ত্র পিছনে ফেলে, উপনিবেশের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, স্পেন এগিয়ে চলেছে গতানুগতিক পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পথ ধরে। ধনতন্ত্র সেখানেও সংশোধিত হয়েছে, ভেঙে পড়েনি। কেউ হয় তো বলবেন, ঐ-সব দেশকেই ধারণ করে আছে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশ। এতে মার্কিন দেশের ধারণশক্তিকে অত্যন্ত বড় করে দেখানো হয়। ভিয়েতনামে যখন নির্দয় যুদ্ধ চলছিল তখন অনেকে ভেবেছিলেন যে, ভিয়েতনামের উপর দখল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ভিয়েতনাম হাতছাড়া হয়েছে, যুদ্ধে মার্কিন দেশ হেরে গেছে, মার্কিন অর্থনীতি ভেঙে পড়েনি। কেবল ঔপনিবেশিক কারণে নয়, সমসাময়িক কালে আরো নানা অসামঞ্জস্যের ফলে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলি বড় ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। এ-কথা স্বীকার্য। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, বিশেষত প্রাগ্রসর দেশগুলিতে, বহুবিস্তৃত বাজারের উপর নির্ভরশীল। মাঝে-মাঝে অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে এই অর্থনীতি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যার পর নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যে ফিরে আসা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। ধ্রুপদী যুগের অর্থবিজ্ঞানীরাও এই রকম বিপর্যয়ের সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন না। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে নতুন সাংগঠনিক পরিবর্তন ও তজ্জনিত জটিলতা, যেমন বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন কিংবা অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিকারের দিকে ঝোঁক, যার ফলে মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে ওঠে। এইসব সমস্যার ভিতর দিয়ে অনিবার্য হয়ে উঠেছে ধনতন্ত্রের পরিবর্তন, কিন্তু আকস্মিক ধ্বংস নয়। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য ধনতন্ত্র অথবা সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত মনোভাব যাই হোক না কেন, এই দুই ব্যবস্থাকে সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী আরো অনেকদিন চলবে এটা মেনে নেওয়াই বাস্তব বুদ্ধিসম্মত। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে পরিস্থিতির ওলটপালট ঘটা অসম্ভব নয়।

যেসব প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশ তৃতীয় বিশ্বে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তাদের ভিতর নানা কারণে মার্কিন দেশ আজ সর্বাগ্রগণ্য। তৃতীয় বিশ্বের উঠতি মধ্যবিত্তের একাংশ বিদেশী পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সক্রিয়। স্বভাবতই এই সংগ্রাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের লক্ষণে চিহ্নিত। দেশের ভিতর পুরনো প্রতিষ্ঠিত সামন্ততন্ত্রী ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তার স্রোতও এই আন্দোলনে এসে মিশেছে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে নানা রকমের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার। এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার বহু দেশে আন্দোলনের নেতাদের হাতে ক্ষমতা এসেছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। ফলস্বরূপ যে-সব শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছে তাদের বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। অস্থিরতাও উল্লেখযোগ্য। নতুন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বিদেশী বৃহৎ শক্তির নতুন করে চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে দেখি এরই নাটকীয় দৃষ্টান্ত। তবে বাংলাদেশই একমাত্র উদাহরণ নয়। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই বিদেশী সহায়তা নতুনভাবে প্রবেশলাভ করেছে। কোনো দেশে মার্কিন সহায়তা প্রধান, কোনো দেশে সোভিয়েত সহায়তা। ইরান, ইরাক, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, কাছাকাছি এই দেশগুলির ভিতরও কত প্রকার ভেদ। মোটের ওপর মার্কিন পুঁজির প্রশ্নাতীত প্রাধান্য। তবে এটাও এতোদিনে স্পষ্ট যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কোনো সরলরেখায় কিংবা স্থায়ীভাবে মার্কিন অথবা সোভিয়েত পথে যাচ্ছে না। তাদের স্বাভাবিক গতি অন্য পথে। এমন কি আমেরিকা অথবা সোভিয়েত দেশের সামনেও কোনো পরীক্ষিত সরল পথ আজ নেই। আমরা যখন এক-বিশ্বের কথা বলি, বিশ্ব-শান্তির কথা বলি, তখন এ-কথাটা মনে রাখা ভালো। সারা বিশ্ব কোনো এক ধর্মের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে অতীতের এই চিন্তা যেমন অবাস্তব তেমনি কোনো এক অদ্বিতীয় তন্ত্র কিংবা মতবাদ পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করবে এই চিন্তাও বাস্তববুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। এতে শুধু বিদ্বেষ বাড়ে। কিছু আদর্শ, কিছু মূল্যবোধ প্রয়োজন। প্রয়োজন সহাবস্থানের স্বীকৃতি, মনুষ্যত্বের ঐক্যের অভিলাষ। কিন্তু মানুষকে অগ্রসর হতে হবে নানা বিচিত্র পথে।

সহাবস্থানের স্বীকৃতি মানে অবশ্য এই নয় যে, আজকের দিনের বিভেদ ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হবে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বলে যে দুটি ব্যবস্থাকে আমরা চিহ্নিত করেছি উভয়েই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, এ-কথা আমরা আগেই লক্ষ করেছি। এখন প্রশ্ন, এদের গতি কোন দিকে? এদের ভিতর ব্যবধান কি ক্রমে বাড়ছে না কমছে? পরিবর্তনের গতিতে এই দুই ব্যবস্থা ভবিষ্যতে এক অভিন্ন পরিণতিতে এসে স্থিতি লাভ করবে এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ নেই। তবে কোনো কোনো দিক থেকে এদের পার্থক্য কমে আসছে। রাজনীতির উচ্চকণ্ঠ কলহ ও কোলাহলের দাপটে এটা আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না। অথচ এটা লক্ষ করবার যোগ্য বস্তু। যে-সব তত্ত্বের মধ্যে আমরা এতোদিন চূড়ান্ত বিরোধ ধরে নিয়েছিলাম, ক্রমে দেখা যাচ্ছে সেই দ্বন্দ্বের অনেকটাই দুই আংশিক সত্যের বিরোধ। সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার ইঙ্গিত আছে। সেদিকে দৃষ্টি ফেরাবার আগে আজকের দিনের, বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের, কিছু সমস্যার কথা বলে নেওয়া দরকার।

(গ)

পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার ব্যাখ্যা করা হয়েছে শোষণতত্ত্ব দিয়ে। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিকানা নেই শ্রমিকের হাতে। শ্রমিক মূল্যসৃষ্টি করে, অথচ সে লাভ করে

মজুরী, জীবনধারণের মতো মজুরী, উদ্‌বৃত্ত মূল্যের ওপর তার অধিকার নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষের দুর্দশার মূলে আছে এই শোষণ। এই ব্যাখ্যায় কিছু নির্মম সত্য আছে। তবে এটা অসম্পূর্ণ। সারা বিশ্বের সংকটের এমন কি তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যেরও এমন অনেক কারণ আছে যাকে সঠিকভাবে ধরা যায় না ঐ তত্ত্বের ভিতর। শোষণতত্ত্ব কাজে লাগে, কিন্তু তার উপর একান্ত নির্ভর যুক্তিসঙ্গত নয়।

কোনো দেশেই আজকের জগতে শ্রমিকশ্রেণী উৎপন্ন মূল্যের সবটা লাভ করে না। উদ্‌বৃত্ত মূল্যের উপর নির্ভর করে আছে আমলাতন্ত্র ও সামরিকবাহিনী। সব দেশেই তাই, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি সোভিয়েত যুক্তরাজ্যে। উদ্‌বৃত্ত মূল্যের উপর নির্ভর করেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনী লড়ছে। কেউ হয় তো পার্থক্য করবেন এইভাবে, আমলাতন্ত্র ও সামরিকবাহিনী কাজ করছে মার্কিন দেশে ধনিকের স্বার্থে আর সোভিয়েত দেশে শ্রমিকের স্বার্থে। চীন কিন্তু মনে করে না যে সোভিয়েত আমলাতন্ত্র ও সামরিকবাহিনী শ্রমিকের স্বার্থেই কাজ করে যাচ্ছে। এ তর্কের শেষ নেই। মোট কথা, উদ্‌বৃত্ত মূল্য কোনো দেশেই শ্রমিকশ্রেণী সর্বাংশে লাভ করে না।

তৃতীয় বিশ্ব তথা ঔপনিবেশিক দেশগুলির দুর্দশার কয়েকটি বিশেষ কারণ নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। মার্কিন দেশ এক সময় ইংলণ্ডের উপনিবেশ ছিল। মার্কিন দেশের কাঁচা মাল, যেমন তুলো, গম, তামাক, ব্রিটেনে রপ্তানি হত আর ও দেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য ও মূলধন আসত মার্কিন দেশে। আমেরিকা স্বাধীনতালাভ করবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত দু'দেশের ভিতর বাণিজ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল। ভারতও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। এ দেশ থেকেও কাঁচা মাল ও দেশে যেত, ও দেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য এ-দেশে আসত। কিন্তু ঔপনিবেশিকতার এই যে দু'টি উদাহরণ দেওয়া গেল এ দুয়ের ভিতর একটা বড় পার্থক্য আছে। এটা ভালোভাবে ধরতে হলে সোজাসুজি চোখ ঘোরাতে হয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রশ্নের দিকে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে এ দেশে যে নব মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হল এ দেশের প্রাচীন সমাজ ও নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সেই শ্রেণী। ঠিক এইরকম একটা বিচ্ছেদের আশঙ্কা ছিল না মার্কিন দেশে। বাঙালী নবশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পশ্চিমের কাছ থেকে যে সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হল তাতে কিছু ভাব ও আদর্শ ছিল যাকে মূল্যবান বলা চলে। সে যুগের অনেক গুণী মানুষই তাকে মূল্যবান বলে সমাদর করেছেন। কিন্তু নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় এতে করে দেশের মানুষের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলল। যারা গ্রাম-বাংলায় নেতৃত্ব দিতে পারত তারা ইংরেজি শিখে নগরবাসী হল। এ দেশের সমাজের একটা বড় ভাঙনের আরম্ভ এইখানে। শুধু যে মিলের কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গ্রামের শিল্প মার খেল তাই নয়। সব মিলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে ব্যাপ্ত করে এ দেশের জনসমাজে একটা বড় দুর্দশা নেমে এলো। এ থেকে ইংরেজ কতটা পেল তা দিয়ে আমাদের ক্ষতির পরিমাপ হয় না। এটা সেইরকমের খেলা নয় যাতে একপক্ষের ক্ষতি আর অন্য পক্ষের লাভের মধ্যে সাম্য থাকবেই। ম্যানচেস্টারের বস্ত্র-শিল্পকে শেষ অবধি ভালোভাবে রক্ষা করা যায়নি। এ দেশে কাপড়ের কল হয়েছে। কিন্তু ভারতের গ্রামীণ সমাজ তার ভারসাম্য ফিরে পায়নি।

উনিশ শতকের শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। দলে দলে জাপানী যুবক বিদেশ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে, স্বদেশেরই উন্নতিসাধনের ইচ্ছায়। পশ্চিমের প্রযুক্তি নিয়ে জাপান দ্রুত এগিয়ে যায়। সেটা অন্ধ মুগ্ধ

অনুকরণ হয়ে ওঠেনি। বিশেষত স্বদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে জাপান সতর্ক ছিল। এর সুফল ও কুফল দুই-ই লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ দেশের সমাজে যে ধরনের ভাঙন দেখা দিয়েছে জাপান তা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

এইরকম নানা তথ্য থেকে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। কোনো বিশেষ শ্রেণী উদ্‌বৃত্তমূল্যের ওপর কতোটা নির্ভর করছে সে-কথা বললেই সবটা বলা হয় না। দেশের সমাজের সঙ্গে তার যোগ কী-ধরনের সেটা আরো গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শোষণের সঙ্গে একদিকে আর্থিক উন্নয়ন অন্যদিকে শ্রেণীদ্বন্দ্বের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই সম্পর্কটা খুব সরল নয়। আধুনিক কালে জাপানের দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'শোষণ' ছাড়া মূলধন গঠন হয় না। জাপানেও শোষণ অবশ্যই আছে। কিন্তু সেখানে শ্রমিকের সঙ্গে মালিক ও পরিচালকের বিচ্ছেদ গভীর হয়নি, পাশ্চাত্য দেশে যেমন হয়েছে। বরং শ্রমিক মালিক পরিচালক মিলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা আনুগত্য সেখানে এখনও প্রধান, যেটা পারিবারিক সম্বন্ধেরই মতো। জাপানের আর্থিক উন্নতির একটা মূল কারণ বলে এটাকে গণ্য করা হয়েছে। ভারতে এটা সম্ভব হয়নি। আরো তলিয়ে ভাবতে গেলে পুরনো জাতিভেদ আর ব্রিটিশ আমলের সাদা-কালোর বিভেদ এইসব নানা কথা এসে যায়।

পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে আর্থিক সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে, জনসংখ্যাবৃদ্ধি। সমস্যাটা নানা সংস্কার দিয়ে আচ্ছন্ন, ক্রমশঃ বুঝবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ আর্থার লুইস। শ্বেতাঙ্গদের বাইরে ইনিই প্রথম এবং অদ্যাবধি একমাত্র যিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর একটি সহজ মডেল ছিল, এই আলোচনার শুরুতে যার উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুন্নত দেশগুলিতে যে শিল্পে শ্রমিকদের অল্প মজুরিতেই পাওয়া যায় তার কারণ এই সব দেশে অপর্যাপ্ত সংখ্যায় মজুর আছে দুঃস্থ গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের এই মজুরদের আধা-বেকার অবস্থা। পুঁজিপতিরা পরিকল্পিতভাবে এই বেকারবাহিনী সৃষ্টি করেনি, বরং অনুন্নত চাষের সঙ্গে এই অর্ধবেকারেরা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই অর্ধবেকারেরা আকৃষ্ট হয় কৃষি থেকে শিল্পাঞ্চলে। ক্রমে চাষের ক্ষেত্রে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যা কমে আসে, তখন মজুরি বৃদ্ধি পায় কৃষিতে ও শিল্পে। ভারতের মতো দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে, বিশেষত গত তিরিশ বছরে, শিল্পের বেশ খানিকটা উন্নতি ও প্রসার হয়েছে। অথচ দেশে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাও এই সময়ে বেড়েছে। এর একটা ব্যাখ্যা দরকার।

পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে লুইসের মডেল যতটা মিলছে আমাদের সঙ্গে ততটা মিলছে না। এর কারণ আছে। জন্মহার ও শিশু মৃত্যুহার দুটোই কমাবার উপায় বিজ্ঞান আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে সাম্প্রতিক কালে। উনিশ শতকে এই সব উপায় ও পদ্ধতি এতোটা জানা ছিল না। আজকের উন্নতিশীল দেশগুলি এই সব পদ্ধতি অবলম্বন করতে শুরু করেছে। কিন্তু মৃত্যুহার যত তাড়াতাড়ি কমছে, জন্মহার অনুন্নত দেশে তত তাড়াতাড়ি কমছে না। গত শতকে ইউরোপের উন্নতিশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বাড়ছিল বছরে শতকরা দেড় ভাগ অথবা আরো কম। আজকের উন্নতিশীল দেশগুলিতে সংখ্যাবৃদ্ধির হার শতকরা আড়াই ভাগ, কোথাও কোথাও আরো বেশি। এই সব দেশে শিল্পের প্রসার ঘটছে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক

সংখ্যা বাড়ছে ; কিন্তু একই সঙ্গে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাও বাড়ছে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে। আরো মনে রাখা দরকার যে, আজকের উন্নতিকামী দেশের বৃহৎ শিল্পে শ্রমসংকোচক প্রযুক্তি নিয়োগ করবার সুযোগসম্ভাবনা যতখানি ততটা ছিল না উনিশ শতকে। এই সব কারণে আমাদের মতো দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর, সঠিক প্রচার ও সংগঠনের। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেছে। আবার শোষণতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে গিয়ে মার্ক্সবাদীরা বলেছে যে, জনসংখ্যার সমস্যাটা ধনতন্ত্রের সৃষ্টি, সমাজতন্ত্রে এর প্রয়োজন থাকে না। গত কয়েক দশকে প্রথমে ধনতান্ত্রিক জাপান এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক চীন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অসাধারণ তৎপরতা দেখিয়েছে। ১৯৬৫ থেকে '৭৫ সালের মধ্যে চীন ও ভারত দুই দেশেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল মোটামুটি শতকরা আড়াই ভাগ। তারপর চীনে সেই হার দ্রুত নামিয়ে আনা হয়েছে শতকরা দেড় ভাগেরও নীচে, ভারতে কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি এখনও। গোঁড়ামি-ত্যাগ করে ব্যাপারটা বুঝবার সময় নিশ্চয়ই এসে গেছে। নয় তো একটা কঠিন সমস্যাকে অকারণে কঠিনতর করে তোলা হবে।

আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় কিছু জটিলতা আছে, যা থেকে সৃষ্টি হয়েছে পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে আরো বাধা-বিঘ্ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যদিও পরস্পর সংযুক্ত তবু এ দুয়ের ভিতর পার্থক্যটাও মনে রাখা দরকার। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিশ্বজনীন। পৃথিবীময় বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় এর ভিত্তি, এই সহযোগিতা যত দৃঢ় হয় ততই ভালো। প্রযুক্তির সম্পর্ক প্রয়োগের সঙ্গে। দেশে কালে এই প্রায়োগিক সমস্যাগুলি ভিন্ন। আধুনিক প্রযুক্তি বলতে যা বোঝায় তার উদ্ভব প্রধানত শিল্পোন্নত দেশের প্রায়োগিক প্রয়োজন থেকে। অনুন্নত বা অল্পোন্নত দেশগুলিতে উন্নত দেশের প্রযুক্তি ব্যবহার করবার সময় সেটা ভেবেচিন্তে করা দরকার। উনিশ শতকে উন্নত ও অল্পোন্নত দেশের ভিতর প্রযুক্তির পার্থক্য ততটা ছিল না আজ যতটা। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি প্রাগ্রসর দেশের কাছ থেকে প্রযুক্তি ধার করতে পারে, এটাকে প্রথমোক্ত দেশের পক্ষে একটা বড় সুবিধা বলে মনে করা হয়। কোনো কোনো দিক থেকে এটা যে একটা সুবিধা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্পোন্নত দেশের নব্য মধ্যবিত্তের চোখে আধুনিক প্রযুক্তির এমন একটা আকর্ষণও আছে দেশের মঙ্গলের সঙ্গে যার যোগ দুর্বল। তাই এ বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। যন্ত্রবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এই সবে প্রয়োগের অতএব প্রযুক্তির দিকটা প্রধান। যে-সমস্যাটার কথা এই মাত্র বলেছি তার উদাহরণ এইবার দেওয়া যেতে পারে। চাষের ক্ষেত্রে শ্রমসংকোচক নানা যন্ত্রের উদ্‌ভাবন হয়েছে। আমেরিকা ক্যানাডা বা সাইবেরিয়ার মতো অঞ্চলে জমির আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা কম। সেখানে শ্রমসংকোচক যন্ত্রের ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু ভারতে বা চীনে অবস্থা অন্যরকম। কৃষিযন্ত্রের সীমাবদ্ধ প্রয়োগই এখানে সঙ্গত। নয় তো শ্রমের ব্যবহার অত্যধিক সংকুচিত হবে, বেকারের সংখ্যা বাড়বে। মাটি কাটবার জন্যও অনেক বৃহৎ যন্ত্র আছে, তাতে অল্প মানুষ নিয়েই অনেক বেশি পরিমাণ মাটি কেটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু যে সব দরিদ্র দেশে শ্রমশক্তির প্রাচুর্য, সেখানে এসব যন্ত্র কতটা ব্যবহার করা সামাজিক দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

চিকিৎসাবিদ্যা নিয়েও এই প্রসঙ্গে চিন্তা করা দরকার। কলকাতার মতো শহরে হাসপাতালের কী দুরবস্থা সেটা ভুক্তভোগী সবাই জানে। এই অবস্থার নানা কারণ আছে। প্রশাসনিক দুর্বলতা তো আছেই। কিন্তু একটা মূল সমস্যা হল হাসপাতালে অত্যধিক ভিড়। বহু লোক ফিরে যায় যাদের ফিরিয়ে দেওয়া অন্যায়, আবার যাদের রাখা হয় তাদের জন্যও উপযুক্ত স্থান নেই। কলকাতার হাসপাতালে এই অতিরিক্ত ভিড়ের প্রধান কারণ গ্রামবাংলায় চিকিৎসার ব্যবস্থার অভাব।

আমাদের মেডিক্যাল কলেজে যাঁরা পড়ান পৃথিবীর প্রাগ্রসর চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁরা অল্পবেশি পরিচিত। তাঁদের কাছে শিক্ষা পেয়ে আমাদের অনেক ছাত্র উন্নত দেশগুলিতে চিকিৎসার কাজে গৌরবের সঙ্গে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে পরিচিত আমাদের ডাক্তারবাবুরা এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে তেমন সুবিধা করতে পারেন না। তাঁদের বিদ্যা প্রয়োগ করতে হলে যে- ধরনের যন্ত্রপাতি ও ঔষধ প্রয়োজন এ-দেশের গ্রামে গ্রামে সে সব পাওয়া যায় না। পুরনো চিকিৎসাপদ্ধতি হয় তো এতোটা বৈজ্ঞানিক ছিল না, প্রযুক্তির দিক থেকে এতোটা অগ্রসর ছিল না। কিন্তু এ দেশের হাকিম কবিরাজ হাতের কাছে যে সব গাছ-গাছড়া এবং অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যায় যথাসম্ভব তারই ব্যবহারে রোগীর চিকিৎসা করতেন। তাঁদের চিন্তা ও উদ্‌ভাবনী শক্তি এই দিকে চালিত হয়েছিল। সমস্ত বিশ্বকে বাজার ধরে নিয়ে আমরা যে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি সেটা আমাদের গ্রামে ঢুকবার পথ পায় না, এমন কি শহরেও সকলের পক্ষে সেটা বড় সহায়ক নয়। অতি উন্নত প্রযুক্তির এইরকম অসুবিধা আছে। এতে নগরের ধনী মানুষের হয় তো উপকার হয়। কিন্তু দেশের মঙ্গলের সঙ্গে এর যোগাযোগ দুর্বল। উন্নত প্রযুক্তি মাত্রই উপযুক্ত প্রযুক্তি নয়। অবশ্য উন্নত প্রযুক্তির পক্ষে আছে প্রচারের যন্ত্র। কিন্তু সে জন্যই সতর্কতা আরো বেশি প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রযুক্তি নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থা মাত্রই উন্নতিশীল দেশের পক্ষে অপকারী এমন বলা যাবে না। আজকাল তো সমাজতান্ত্রিক দেশ সহ সর্বত্র এই সব সংস্থাকে ডাকা হচ্ছে। তবে অত্যুন্নত দেশের প্রযুক্তি—অনেক সময় সে সব দেশে বর্জিত কিছু যন্ত্রপাতি সহ সেই প্রযুক্তি—আর অল্পোন্নত দেশের শ্রমকে একত্র করবার চেষ্টায় বিপত্তি ঘটা সম্ভব। আর্থিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখা দরকার। উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু স্বনির্ভরতাকে একটা বিশেষ মূল্য দিতেই হবে। সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি থাকলেই বিপদের সম্ভাবনা।

আধুনিক সমাজকে বলা হয়েছে 'consumer society' অর্থাৎ এর ঝোঁক ভোক্তার দিকে, ভোগ সুখের দিকে। সুখের সঙ্গে আনন্দের একটা পার্থক্য প্রচলিত আছে। ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির ভিতর দিয়ে আমরা যা পাই তাকে বলা যায় সুখ ; আত্মার তৃপ্তিতে আনন্দ। আত্মা বলতে এখানে প্রকৃতির বাইরে কিছু বোঝাচ্ছে না। অপরের সঙ্গে যোগের ভিতর আত্মার আনন্দ। আধুনিক সমাজে ব্যক্তির আকর্ষণ ভোগ্যবস্তুর প্রতি। এমন কি উপভোগের প্রতি ততটা নয়, ভোগ্যবস্তুর ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার প্রতি যতটা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় সমাজের স্বাভাবিক ঝোঁক এইদিকে। যে সব ভোগ্যবস্তুর ওপর আমার প্রতিবেশীর অধিকার আছে আমারও সেই সবের ওপর অধিকার থাকা দরকার, নয় তো আমি তুলনায় হীন হয়ে পড়ি। প্রতিযোগী সমাজের এই ধর্ম। আধুনিক মানুষের

অনেক দুঃখ অনেক সমস্যার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে এইখানে। কয়েকটি সমস্যার কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

পৃথিবীটা এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে। সিনেমা দূরদর্শনের দৌলতে উন্নত দেশের জীবনযাত্রার ছবিও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের মানুষের সামনে ভেসে ওঠে পাশের বাড়ীর দৃশ্যের মতো। উন্নতিশীল দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষার পরিধির ভিতর এসে পড়ে সেই জীবনযাত্রা। যাদের সাধ্যে কুলোয় তারা কলেজ পেরিয়েই চলে যায় বিদেশে, বিশেষত মার্কিন দেশে। যারা সেটা পারে না, তারা দেশে বসেই বিদেশের জীবনযাত্রার অনুকরণ করে। এই নিয়ে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর কয়েকটি ফলাফল বিবেচনা করা যেতে পারে। এক, আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে না দেশের সমস্যা। দুই, মান-ইজ্জতের প্রতীক হয়ে ওঠে যে সব ভোগ্যবস্তু, পারিবারিক আয়ের অনেকটাই খরচ হয়ে যায় তাতে। যে সব প্রয়োজন আরো মৌল, সে সবের জন্য আয়ের সামান্যই অবশিষ্ট থাকে। এই সমস্যাটা দেখা দেয় যেমন মধ্যবিত্ত পরিবারে তেমনি শ্রমিকের পরিবারেও। ফলে আয়বৃদ্ধি হলেও অভাব মেটে না। এরই সঙ্গে যোগ দুর্নীতির সমস্যার। ভালোমন্দ যে-কোনো উপায়ে 'উপরি' আয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে মানুষ। তৃতীয় বিশ্বে এই ব্যাধির প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে সাম্প্রতিক কালে। দুর্নীতিতে দুর্বল হচ্ছে উন্নয়নের বাস্তব ভিত্তি। একই সঙ্গে বাড়ছে অর্থ আর অনর্থ।

এশিয়া আফ্রিকায় নব্য মধ্যবিত্তের আয় দেশের সাধারণ মানুষের আয়ের তুলনায় অনেক বেশি। এর একটা সহজ কারণ আছে। এ সব দেশের মাথা পিছু গড়পড়তা আয় পশ্চিমের উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম। সাধারণ মানুষের রোজগার দেশের গড়পড়তা আয়ের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না। কিন্তু শহরের নব্য মধ্যবিত্তের আয় সেই হিসেবে নির্ধারিত হয় না। তাদের চোখ পড়ে আছে নিজের দেশের গ্রামের দিকে নয়, শিল্পোন্নত দেশের শহরের দিকে, যেখানে গড়পড়তা আয় হয় তো পঞ্চাশগুণ বেশি। আজকের ঘানা স্বাধীন হবার আগে সে দেশে একবার গিয়েছিলাম। সেখানে তখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষিত লোকের অভাব. বিলেত থেকে অধ্যাপক আমদানি হয়েছে পড়াবার জন্য। তাদের মাইনে ঠিক হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই বিলেতের মাইনের মান অনুযায়ী, এমন কি তার চেয়ে খানিকটা ওপরে। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশী অধ্যাপকদেরও মাইনে ঠিক হল সেই বিদেশীদের অনুকরণে, তা নইলে সমাজে ইজ্জত থাকে না। তখনকার রোডেসিয়ার খনিতে বিদেশী যন্ত্রবিদেরা নিযুক্ত ছিল। সেখানেও একই ঘটনা। নব্য মধ্যবিত্তের কলাকৌশলের বাজারটা আন্তর্জাতিক। কাজেই তার দৃষ্টি বাইরের দিকে। এয়ার ইন্ডিয়ার পাইলট উড়োজাহাজ চালিয়ে যায় আমেরিকার বন্দরে। সে চাইবে সেখানকার পাইলটের সঙ্গে তুলনীয় মাইনে, তা নইলে তার সম্মান থাকে না। এয়ার ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের বেশি বিভেদ করা যায় না, কারণ দুয়ের ভিতর কলাকৌশলের তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই। বিভিন্ন সরকারী সংস্থার উচ্চ পদের কর্মচারীদের ভিতর আবার মাইনের তুলনীয়তার প্রত্যাশা থাকে। এইভাবে একদিকে যেমন নব্য মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর আকার বেড়ে চলে অন্যদিকে তেমনি তার আয়ের মান দেশের দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। এদের আয় যতই দেশের গড়পড়তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে ওঠে ততই সাধারণ মানুষের আয় নেমে যায় দেশের সামান্য গড়পড়তার চেয়েও আরো নীচে। উন্নতিশীল অনেক দেশে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের

ওপর গড়ে উঠছে অসাম্যের এই নতুন বনিয়াদ। এতে যে শুধু নির্ধনের অসুখ বেড়েছে তাই নয়, ধনবানদের ভিতরও একদিকে বিচ্ছিন্নতাবোধ অন্যদিকে মাৎসর্য ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্ত ব্যাধির মতো।

(ঘ)

সমস্যা থেকে অবশেষে আসতে হয় সমাধানের চিন্তায়। এ-কথা প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, সামাজিক ব্যাধির নিদানতত্ত্বের তুলনায় নিরাময়পদ্ধতি অনেক বেশি জটিল ও দুঃসাধ্য। অর্থাৎ রোগের কারণ যদি বা বোঝা যায় রোগ দূর করা কঠিন হয়। কখনো বা একটা রোগ সারাতে গিয়ে অন্য রোগ তৈরি হয়ে যায়। উন্নয়নের ব্যাপারেও এই সাবধানী বাক্য প্রযোজ্য। আসলে সমাজের ব্যাধি একটি নয়, অনেক। ধাপে ধাপে এগুনো ছাড়া উপায় নেই।

আমাদের দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের আরো অনেক দেশে আর্থিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটা বড় ভূমিকা পালন করছে। এই ভূমিকা শুধু পরিকল্পনা প্রণয়নে সীমাবদ্ধ নেই। প্রধান প্রধান অনেক শিল্পে ও ব্যবসায়ে সরকারী উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক আকারে উপস্থিত। এইসব দেশে অনেক সময় দেখা যায় যে, পরিকল্পনায় ও পরিকল্পনার রূপায়ণে শিল্পের প্রতি রাষ্ট্র যতোটা মনোযোগী কৃষি অথবা পল্লী-উন্নয়নে ততোটা নয়। ভারী শিল্প বিশেষভাবে রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এর একাধিক কারণ আছে। একে তো ভারী শিল্পের সঙ্গে প্রতিরক্ষার একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বহুসংখ্যক ছোটো উদ্যোগের দেখাশোনা করা কঠিন, অল্প সংখ্যক বড় উদ্যোগের তত্ত্বাবধানের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ।

আরো কিছু যুক্তি আছে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে দারিদ্র্যের কারণে পণ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদা যথেষ্ট নয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা সীমাবদ্ধ। বিদেশের বাজারে প্রবেশলাভ সহজ নয়। এ অবস্থায় একটা সহজ পথ হল, যেসব জিনিস এতকাল আমদানি করা হত সেসব যথাসম্ভব দেশেই উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। এইসব জিনিস অনেক সময় বৃহৎ ও ভারী শিল্পে প্রস্তুত হয়। উন্নয়নের বিশেষভাবে ভিত্তি শক্ত করবার জন্য যন্ত্রশিল্পকে অগ্রাধিকার দেবার কথা ভাবা হয়েছে। স্বনির্ভরতার জন্য ভারী শিল্পের প্রয়োজন আছে।

একই যুক্তিতে কৃষিকেও সমানভাবে অগ্রাধিকার না দেবার কোনো কারণ নেই। খাদ্যশস্য আমদানি করতে আমাদের কম টাকা খরচ হত না। অর্থনীতির ভিত্তি শক্ত করবার জন্য কৃষির প্রতিও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এতদিনে আমরা অবশ্য এমন জায়গাতে এসে পৌঁছেছি যেখানে খাদ্যাভাব যদিও দূর হয়নি তবু খাদ্যশস্য আমদানির ওপর আমাদের আর নির্ভর করতে হয় না সাধারণ অবস্থায়। অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের অনটন এখনও আছে, যেমন তেল, ডাল, চিনি। দুধ মাছের অপ্রতুলতাও উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ শিল্পের বেলায় যেমন উৎপাদনবৈচিত্র্য চাই, আজ কৃষির ক্ষেত্রেও সেটা প্রয়োজন।

এই সবই সাধারণভাবে স্বীকার্য। তর্ক এসে যায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে।

বাজারের হাতে কতটা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন, এটাই একটা প্রধান প্রশ্ন। প্রশ্নটা আরো গুরুত্ব পেয়েছে এই জন্য যে, যে-সব দেশে এতদিন বাজারের ওপর নির্ভরতার নীতি স্বীকৃত ছিল না, সেখানেও এখন ঐদিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছে। চীন ও পূর্ব ইউরোপের নানা দেশের অর্থনীতিতে এই ঝোঁকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে একটা নতুন সত্য। এতোদিন তর্কের তোড়ে যেসব জিনিসকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করা হত, যেমন পরিকল্পনা ও বাজারব্যবস্থা, সমবায় ও পারিবারিক কৃষি, দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব এবং সেটাই আবশ্যক। দুই শিবিরবদ্ধ গোঁড়ামিতে অর্থতত্ত্বের মুক্তি নেই ; এতে শুধু অনর্থ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তত্ত্বের দিক থেকে এটা দেখানো কঠিন নয় যে, বাজারের নির্ণয় সামাজিক হিতের দিক থেকে আদর্শ নির্ণয় নয়। সরকার জনসাধারণের প্রতিনিধি, অন্তত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এরকমই ধরে নেওয়া হয়। ব্যবসায়ী চলে নিজের স্বার্থে ; সরকার চলে জনসাধারণের স্বার্থে। এইভাবে দেখতে গেলে সরকারী নিয়ন্ত্রণই সর্বাবস্থায় ভালো। একাধিক কারণে তর্কটার এভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে না। এডাম স্মিথ দেখিয়েছিলেন যে, আমরা যখন নিজের স্বার্থে কাজ করি তখনই যে সামাজিক স্বার্থের বিপরীত কাজ করি এটা মোটেই ধরে নেওয়া যায় না। চাষী নিজের স্বার্থেই চাষ করে, শাকসবজি ডিম বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। এটা সে ব্যক্তিগত স্বার্থে করে বটে, কিন্তু এতেই সমাজের স্বার্থও পূর্ণ হয়। কাজেই স্মিথের অনুমান এই যে, বাজারের গঠনটা যদি একচেটিয়া ব্যবসায়ের দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকে না পড়ে, সরকার যদি কতগুলি ব্যাপারে তার দায়িত্ব পালন করে, তবে ব্যবসায়ীর স্বার্থের সঙ্গে সমাজের স্বার্থের সাধারণভাবে সামঞ্জস্য আশা করা যায়। আবার সরকার জনসাধারণের নামে কাজ করে বলেই যে, তার সিদ্ধান্ত সব সময়েই কার্যত জনসাধারণের অনুকূল হবে, এটাও ধরে নেওয়া যায় না। সরকারকে কাজ করতে হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে দলীয় রাজনীতির চাপের ভিতর। বাজার যেমন বাস্তবে আদর্শ গঠন লাভ করে না, আমলাতন্ত্র ও দলীয় রাজনীতির বেলায়ও তেমনি কোনো আদর্শ অবস্থা কল্পনা করে নেওয়া অবাস্তব। এসব ব্যাপারে বিশুদ্ধ তত্ত্ব দিয়ে চালিত হতে গেলেই মুশকিল।

বাস্তবে যে সমস্যা দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা চোখের সামনে দেখছি। সরকারী নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে এসেছে লাইসেন্স, পারমিট, ইত্যাদি। পদে পদে আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে ছাড়পত্র অনুমতিপত্র, এইসব যোগাড় করতে হয়। এতে পদে পদে কাজ আটকে যাচ্ছে, প্রথমে সময় নষ্ট, তারপর ঘুষ দিয়ে কাজটা করিয়ে নেওয়া, এটাই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজ আটকে দেওয়াই অর্থকর হয়ে উঠেছে। এতে করে অভ্যাস নষ্ট এবং স্বভাব নষ্ট। এটাই চলছে সর্বস্তরে। এদেশের দুর্নীতির এই চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত। অন্যান্য দেশেও এটা অনুপস্থিত নয়।

এই অবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের জটিলতা কমাবার পক্ষে যুক্তি আছে। বাজার হৃদয়হীন ; কিন্তু আমলাতন্ত্রও তাই। আমলাদের বিশেষভাবে দোষ দিয়েও লাভ নেই। সরকারী নিয়ন্ত্রণ বেশি জটিল হলে এই রকমই ঘটে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অনেক দেশই, এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও, ক্রমে বাজারের ওপর নির্ভরতার পথে ফিরে এসেছে। তবে এই প্রত্যাবর্তনও শর্তহীন হতে পারে না। মানুষের সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো যায় না। সমাজের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী প্রয়োজনের ভিতর কোনটাকে কতটা

অগ্রাধিকার দিতে হবে তার নির্ধারণে রাষ্ট্রের কিছু সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা থাকা চাই, সেই পরিকল্পনার-কাঠামের ভিতরই সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করবে। যে যুগে অর্থবিজ্ঞানের মূল ধারায় ছিল বাজারব্যবস্থার ওপর প্রায় নিঃশর্ত আস্থা, সে যুগকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। অধিকাংশ অর্থবিজ্ঞানীর ভিতর সেই আস্থার ভিত্তি দুর্বল হয়েছিল কেইনস্-এর চিন্তাধারার প্রভাবে। দেশের ভিতর মোট পুঁজিবিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের কাজটা বাজারব্যবস্থার হাতে ছেড়ে দিলে যে বিপদ আছে, এ-বিষয়ে তিনিই সবাইকে স্মরণীয়ভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও আমরা আর দাঁড়িয়ে নেই। কেইনস্-এর উদ্বেগ ছিল পুঁজিবিনিয়োগের মোট পরিমাণ নিয়ে, তার বন্টন নিয়ে নয়। বাস্তবে সমস্যাটা শুধু তাই নিয়েই নয়। আরো অন্য সমস্যা আছে, কেইনস্-এর চিন্তার কেন্দ্রে যা কখনো স্থান পায় নি।

আঞ্চলিক উন্নয়নে অসামঞ্জস্য এইরকম একটা সমস্যা। এর উদাহরণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। এই উপমহাদেশেও এটা বর্তমান। উন্নত অঞ্চল উন্নততর হয় ; অনুন্নত অঞ্চলের সঙ্গে তার ব্যবধান বেড়ে চলে। নগর হয়ে ওঠে মহানগর। চতুস্পার্শ্ব থেকে রস টেনে নিয়ে সে বেড়ে ওঠে। বাজারব্যবস্থা এই ঝোঁক ঠেকাতে পারে না। সচেতন কেন্দ্রীয় নীতি দিয়ে একে ঠেকাবার প্রয়োজন হয়। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োগ করতে হয়। তা নইলে আমরা এমন একটা দুষ্ট বৃত্তের ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়ি যাকে ভাঙবার সাধ্য নেই বাজারের। এই কলকাতা মহানগরীই সেই দুষ্ট বৃত্তের এক সুস্পষ্ট উদাহরণ। অতিস্ফীত এই মহানগরীতে সমস্যার অন্ত নেই। একে উদ্ধার করবার জন্য, এর পরিবহণ বাসস্থান ও জল সরবরাহকে সহনীয় করে তুলবার উদ্দেশ্যে এবং পরিবেশের উন্নতি ও রূপসজ্জার জন্য, হাজার হাজার কোটি টাকার নানা প্রকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে। সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে যখন শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নের ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই তখন কলকাতায় এই পরিমাণ টাকা ঢালা যাবে কি না আর তাতেও কলকাতার সমস্যার সমাধান হবে কি না, এটাও চিন্তার বিষয়। কলকাতায় অবস্থা আরো একটু সহনীয় হলেই পরিপার্শ্বের দুঃস্থ অঞ্চল থেকে আরো বেশি মানুষ মহানগরীর প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তার ফলে পরিবহণাদির বাড়তি সমস্ত ব্যবস্থাই আবারও প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রচুর হয়ে পড়বে। এই সম্ভাবনার কথা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? এই সেই উভয় সংকট : কলকাতাকে তার নির্ধারিত কাজের উপযোগী স্থান করে তুলতে হলে বাকী বাংলাকে উপবাসী রেখে এখানে অজস্র টাকা ঢালতে হয়। যদি সেটা সম্ভব হয়, যদি কলকাতাকে কাজকর্মের উপযোগী করে তোলা যায়, তবে উপবাসী বাংলার আরো অগণিত মানুষ সম্ভবত এখানেই উপচে পড়বে এবং এখানকার পথঘাট আবারও অবরুদ্ধ হয়ে কাজের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

এই উভয়সংকট থেকে বেরোবার একটাই পথ ভাবা যায়, সেটা বিকেন্দ্রীকরণ। কলকাতা পশ্চিমবাংলার প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র, পূর্ব ভারতের একমাত্র বন্দর ; কলকতা এই রাজ্যের রাজধানী ও প্রশাসনের কেন্দ্র ; কলকাতা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। কিন্তু এই ত্র্যহস্পর্শের ফল ভালো হয়নি ; এটা প্রয়োজনও নয়। পাকিস্তানের ভাগ্য ভালো লাহোর, করাচী আর ইসলামাবাদকে একস্থানে এনে ফেলতে হয়নি। ন্যুইয়র্ক ব্যবসায়ের কেন্দ্র, ওয়াশিংটন রাজধানী, শিক্ষার কেন্দ্র অন্য এক রাজ্যে। পশ্চিমবাংলায় মহাকরণ ও শিক্ষাকেন্দ্র অন্যত্র হতে পারে। এই সেই পথ যাতে কলকাতা এবং সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ খানিকটা ভারসাম্য ফিরে পাবে। এটা নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রশ্ন ; সুস্পষ্ট নীতি ছাড়া এটা

সম্ভব নয়। কলকাতার নব্য মধ্যবিত্তের অভ্যস্ত ছকে বাঁধা জীবনে এতে অসুবিধা দেখা দেবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যতের জন্য এটাই সুপথ।

কলকাতা উদাহরণ মাত্র। মোট কথা, পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আছে। কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রে একটি স্থানীয় বাজার ও ছোট শহর ; কয়েকটি ছোট শহরের কেন্দ্রে একটি মাঝারি শহর ; এইভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের বিন্যাস ও উন্নয়ন সম্ভব। পথঘাট স্বাস্থ্য ও শিক্ষার কেন্দ্র সবই এইভাবে সাজানো দরকার। এটাই স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ। কিন্তু নানা কারণে এই পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটে। একবার বিচ্যুতি ঘটলে ঠিক পথে ফিরে আসা সহজ নয়। সেজন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত প্রচেষ্টা।

বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে যুক্ত আছে মালিকানার প্রশ্ন। মালিকানা বা স্বামিত্ব বলতে কার্যত বোঝায় বিশেষ ধরনের অধিকারপুঞ্জ। ধনতন্ত্রে এ-জাতীয় অধিকার ধনিকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত ; রাষ্ট্রতন্ত্রে রাষ্ট্রের হাতে। রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রতন্ত্রের একটা ভেদ দেখিয়েছিলেন। আমরা এ বিষয়ে শব্দের ব্যবহার নিয়ে ততোটা সাবধানী নই। সেখানেই একটা দ্ব্যর্থতা থেকে যায়। সমাজের হাতে সব অধিকার ন্যস্ত এ-কথা বললেও স্পষ্ট হয় না যে, সেইসব অধিকার বস্তুত প্রয়োগ হচ্ছে কী ভাবে। সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত কোনো কোনো ব্যবস্থা কার্যত রাষ্ট্রতন্ত্রেরই ভিন্ন নাম, অতিকেন্দ্রিকতার এই ফল। বিকেন্দ্রিত সমাজব্যবস্থার চিত্র ভিন্ন রূপ। সেখানে মালিকানা-সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার কোথাও কেন্দ্রীভূত নয়, বরং কর্তব্য ও দায়দায়িত্বর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন বিন্যাসে বিন্যস্ত। গান্ধীজী বলেছিলেন পরিকল্পনা শুরু করতে হবে গ্রাম থেকে। গ্রামসমাজকে সংগঠিত করতে পারলে আমাদের মতো দেশে অনেক কাজ সহজ হয়ে ওঠে, তা নইলে অনেক চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যেমন ধরা যাক, জনশিক্ষা। জনশিক্ষার প্রসারে আমাদের সাফল্য এযাবৎ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এ কাজের সঙ্গে একটি বা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে সংগঠিত সমিতিকে যুক্ত করতে পারলে ভালো হয়। তা নইলে অব্যবস্থা ও প্রতারণা দূর করা কঠিন। বয়স্কশিক্ষার নামে যে-টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা সেই কাজে খরচ হচ্ছে কি না, শিক্ষক নিয়মিত তাঁর কাজ করছেন কি না, ছাত্রদের কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এসব কে দেখবে? এসব কাজ সরকারী কর্মচারী বা পরিদর্শক দিয়ে ঠিকভাবে করা যায় না। টাকার অপব্যবহার হয়, ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে ভুল রিপোর্টে।

জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এখানেও আমরা যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পারিনি। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা এখনও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেনি, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে জন্মনিয়ন্ত্রণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এটা সমীক্ষায় লক্ষ করা গেছে। স্ত্রীশিক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ এই দুটি ব্যাপারেই আমরা পিছিয়ে থাকব যতদিন পর্যন্ত না গ্রামাঞ্চলে এদের যথেষ্ট প্রবেশ ঘটে। আবারও গ্রামসমিতির কথা তুলতে হয়। গ্রামাঞ্চলে যেখানে সবাই সবাইকে চেনে সেখানে এইসব ব্যাপারে গ্রামসমিতিকে সঙ্গে নিতে পারলে কাজ সহজে এগিয়ে যায়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের দরিদ্রতম মানুষদের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক খাদ্যবস্তু সুলভে বা ন্যায্য দামে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। বাজারব্যবস্থার একটা ত্রুটি এই যে, যাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই তাদের সবচেয়ে জরুরি

প্রয়োজনও মেটানো সম্ভব হয় না। দরিদ্র গ্রামবাসীর অন্নের ব্যবস্থা না থাকলে শিক্ষার ব্যবস্থাও করা যাবে না। এ ব্যাপারে চীন অথবা শ্রীলংকার তুলনায় ভারত পিছিয়ে আছে। শ্রীলংকার সুবিধা, সেটা ছোট দেশ। গ্রামে গ্রামে এই জাতীয় সেবার ব্যবস্থা করা প্রশাসনিক দিক থেকে সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ। চীনের সংগঠনশক্তি এইসব কাজের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। ভারতে এজন্য প্রয়োজন সংগঠিত গ্রামসমিতি। এই কাজটা আবশ্যক, কিন্তু সহজ নয়। জমিদারি উচ্ছেদ নিয়ে অশ্রুবিসর্জন করবার মতো লোক অবশ্য বেশি অবশিষ্ট নেই। জমির পুনর্বন্টনের পক্ষে একটা বড় যুক্তি এই যে, এতে করে গ্রামসমাজে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। দলীয় জবরদস্তি কিন্তু গ্রামস্বরাজের ধারণার বিরোধী। রাজনৈতিক দল প্রায়শ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের যন্ত্রবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও বিনোবা ভাবে সাবধানী বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। আমাদের মতো দেশে কৃষির জন্য ভূমিবন্টন ও সংগঠন কেমন হওয়া দরকার এ নিয়ে অনেক বাদবিসংবাদ হয়েছে। প্রশ্নটা একাধিক কারণে জটিল। সমাধানের যে-পথই আমরা বেছে নিই না কেন, কয়েকটি মূল কথা, কিছু সতর্ক বাণী, মনে রাখা আবশ্যক।

এ-দেশে ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। চাষের জমির জন্য পরিবারপিছু একটা যুক্তিসংগত সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার পর উদ্‌বৃত্ত জমি যদি ভূমিহীনদের ভিতর ভাগ করে দেওয়া হয় তবে প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারের হাতে যে-পরিমাণ জমি আসে তাতে সেই সব পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ জমি লাভের পরও তাদের অন্যের জমিতে চাষ করতে হবে অথবা অন্য কাজ খুঁজতে হবে। এই অবস্থায় নিজের জমি ধরে রাখাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়। সব জমি যৌথখামারে পরিণত করলেও সমস্যা দূর হবে না। যৌথখামারের ভিতরও জমির উপর জনসংখ্যার চাপ থেকেই যাবে। এই পরিবর্তনের ফলে শস্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে এই প্রত্যাশার কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। গত তিরিশ বছরে চীন ও ভারতে শস্যোৎপাদন মোটামুটি একই হারে বেড়েছে। এ-ব্যাপারে সোভিয়েত দেশের রেকর্ডও সন্তোষজনক নয়।

সমবায়ের সপক্ষে কিছু ভালো যুক্তি আছে ; তবে বড় বড় কম্যুনে কৃষিকাজ ভালো হয় না। এ বিষয়ে চীনের অভিজ্ঞতা শিক্ষাপ্রদ। ১৯৫৮ সালে সেখানে কম্যুনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। কিছু কাল পরীক্ষানিরীক্ষার পর সেই ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা হয়েছে। কম্যুন এখনো আছে, কিন্তু চাষবাসের কাজ সোজাসুজি কম্যুনের হাতে নেই। অতিকায় কম্যুন ঐ কাজের পক্ষে উপযোগী নয়। পরিবার অথবা অপেক্ষাকৃত ছোট সমবায়েই চাষবাস ভালো হয়। কিছু সমন্বয় সহযোজনের দায়িত্ব এবং বড় আকারের মূলধন বিনিয়োগের কাজই বৃহত্তর সংগঠন বা কম্যুনের হাতে দেওয়া যায়। বৃহৎ খামারের অতিকেন্দ্রিকতা ভেঙে চীনের চাষব্যবস্থা বেরিয়ে এসেছে। সেখানে বাজারের ভূমিকাও বাড়ছে। আসলে বাজার ও সমবায় দুইই চাই। আর বিভিন্ন রকমের কর্ম ও দায়িত্বের জন্য বিভিন্ন আকারের সমবায় চাই। পল্লীর অর্থনীতিতে পারিবারিক উদ্যোগেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবশ্যক।

সালের পর চীনদেশে পারিবারিক চাষবাসের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে। এর ভাল মন্দ নিয়ে বিতর্ক আছে। এসব ব্যাপারে বিভিন্ন দেশকে নিজ নিজ পরিস্থিতিতে সতর্ক পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

কোনো একদিন আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি এবং অন্যান্য বৃত্তি ও উদ্যোগের

ভিতর একটা ভারসাম্য ছিল। তার নীরব সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে এ-দেশের বৃত্তিভিত্তিক বিভিন্ন জাতের আকারে ও বৈচিত্র্যে। সেই ভারসাম্য একদিন ভেঙে পড়ল। সমস্যা আরো বেড়ে উঠল জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক প্রযুক্তিকে অবহেলা করাও যায় না আবার তাকে নির্বিচারে গ্রহণও করা যায় না। এইখানে এসে যায় বিকেন্দ্রিত শিল্পায়নের কথা। কৃষিতে নিযুক্ত মানুষদের একটা বড় অংশকে গ্রামীণ শিল্পে অথবা কৃষির বাইরে অন্য কোনো উৎপাদক কাজে নিয়ে আসতে হবে, তা নইলে গ্রামের আর্থিক সমস্যা ঘুচবে না। যাকে এইমাত্র গ্রামীণ শিল্প বলা হল তার অবস্থান যে গ্রামেই হতে হবে এমন নয়। কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রে যে ছোট শহর সেখানেও তার স্থান হতে পারে। বিকেন্দ্রিত শিল্পায়নের জন্য ব্যাঙ্কের ঋণনীতি ও পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন চাই তেমনি গবেষণার সংগঠনে ও সমস্যা নির্বাচনে নতুন উদ্দেশ্যের প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনার এক একটি বৃত্ত তৈরি হতে পারে কিছু গ্রাম ও বাজারসহ ছোট শহর নিয়ে। এক বৃত্তের সঙ্গে বৃহত্তর বৃত্তের যোগ ঘটিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি জাতীয় অর্থনীতির দিকে। আর্থিক ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের এইরকম একটা রূপরেখার ইঙ্গিত ছিল গান্ধীর চিন্তায় ও রচনায়।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পল্লীকে ভিত্তি হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁদের আদর্শ সমাজের সংগঠনের চিত্রটি দেশের সামনে তুলে ধরেছিলেন। এরই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এঁরা শিক্ষারও রূপায়ণ করেছিলেন। দেশের সঙ্গে নব মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের পথ এই। তবে গ্রামের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকা এঁদের লক্ষ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার। আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করি নে যে, গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যাবুদ্ধি বিশ্বাস ও কর্ম, যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত---বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী···গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে, যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।" (পল্লীপ্রকৃতি)। বিশ্ববিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তিকে অবহেলা করা ভুল। তবে সমাজের যে রূপ ও বিন্যাস আমাদের অভীষ্ট তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রয়োগ কাম্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে যোগ চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন গান্ধীও। সেই চিন্তার সঙ্গে এঁরা বিরোধ দেখেননি পল্লীসংগঠনের। পল্লীতেই আছে আত্মীয়বুদ্ধির ও প্রতিবেশীচেতনার মূল ও মৃত্তিকা, যাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে না।

এইখানে এসে যায় একটা জীবনদর্শনের কথা, যা থেকে অর্থনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে গেলে পরিণামে বিপত্তি ঠেকানো যায় না। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে উপযোগবাদ বা সুখবাদ। এর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনা শোনা গেছে। উপযোগবাদের প্রধান দুর্বলতা বোধ করি এই যে, সুখ জিনিসটাকে সে খণ্ড খণ্ড করে দেখে। তাতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সুখের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হয়ে ওঠে, মানুষে মানুষে আনন্দের পরিপূরকতা তেমন স্বীকৃতি পায় না। অবশেষে সমাজের সংহতি বিপন্ন হয়। তাই আমরা বিস্মিত হই না যখন দেখি জন স্টুয়ার্ট মিলের মতো চিন্তানায়ক উপযোগবাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করেও তার সীমানার মধ্যে স্বস্তি বোধ করেননি। যে ভোগবাদী জীবনদর্শনের

কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি, উপযোগবাদে উপস্থিত তার দার্শনিক ও ব্যবহারিক ভিত্তি। একটা স্তর আছে যেখানে সুখ এইরকম খণ্ডিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ নিয়েই আসে। একেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একে শেষ সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে এ যুগের সমস্যার সমাধানে পৌঁছবার পথ নেই।

ব্যক্তির ও সমাজের চেতনার মহত্তর দিকটাকে কী করে জাগ্রত করা যায় সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া কঠিন। মানুষ অনেক কিছু ধীরে ধীরে শেখে সংকটের ভিতর দিয়ে। পরিবেশদূষণ আমাদের শেখায় প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের স্তূপীকৃত ব্যর্থতা অঙ্গুলিনির্দেশ করে প্রতিবেশীকে নিয়ে পল্লীসংগঠনের দিকে। যুদ্ধের ভয়াবহতা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় আন্তর্জাতিক শান্তি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা। আবার সংগঠনের ব্যর্থতা এই শিক্ষা রেখে যায় যে, সংগঠনই সব নয়। চেতনার একটা নিজস্ব ভূমিকাও আছে যার কোনো সাংগঠনিক বিকল্প নেই। প্রয়োজন নবচেতনা ও নবসংগঠনের একটি শুভবৃত্ত। কোনো আকস্মিকতায় এর আরম্ভ নয়, শেষও নয়। আপ্তচিন্তার শেকল ছেঁড়া সহজ নয়। তবু শুরু হয়ে গেছে নতুন পথে পরীক্ষানিরীক্ষা।

সমাজের এক নব কল্পচিত্র পৃথিবীর কিছু আদর্শবাদী মানুষের চিত্তে আজ স্বপ্নের মতো বিচরণ করছে। সেই আদর্শ আর শুধুই নিরবয়ব কল্পনা নয়। মাঝে মাঝে যেন অবয়বপ্রাপ্ত হয়ে সে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে উঁকিঝুঁকি মেরে অন্তর্হিত হচ্ছে। এই নব আদর্শের ভিত্তিতে অধুনা স্থান পেয়েছে সৈন্যবাহিনীর সংগঠনসংক্রান্ত এক যুগান্তকারী ধারণা।

উচ্চনীচ ভেদসম্পন্ন আমাদের এই পরিচিত সমাজের একই সঙ্গে প্রতিরূপ ও আশ্রয়, জাতীয় সেনাবাহিনী। ক্ষত্রতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র, আজকের অসাম্যচিহ্নিত সমাজেব এই দুই প্রধান স্তম্ভ। মনে রাখতে হবে যে, সেনাবাহিনীর সংগঠনের সঙ্গে শিল্পবিপ্লবের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এ যুগের সামরিক ব্যবস্থা ও সাজসরঞ্জাম ভারী শিল্প ও আধুনিক পরিবহণকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। ফরাসী বিপ্লবের যুগে সেনাবাহিনী আর সাধারণ মানুষের ভিতর এতো বড় পার্থক্য ছিল না। উনিশ শতকের শেষভাগে বিসমার্কের যুগে ব্যবধান প্রকাণ্ড হয়ে উঠলো। এঙ্গেলস শেষ জীবনে এটা লক্ষ করেছিলেন। সেই ধারা তারপর আরো বহু দূর এগিয়ে গেছে। এরই সঙ্গে তাল রেখে অতিকেন্দ্রিক সমাজের অপর এক স্তম্ভ, আমলাতন্ত্র, বেড়ে উঠেছে। ধনতন্ত্রে তো বটেই, আজকের সমাজতন্ত্রেও এই দৃশ্য। বৃহৎ শক্তি বলে পরিচিত প্রতিটি দেশেই আধুনিক সামরিক সংগঠন ও ভারী শিল্প, অতিকেন্দ্রিক সমাজ ও আর্থিক পরিকল্পনা, এই সবই পরস্পর সংবদ্ধ।

মার্কস সমাজেকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখেছিলেন, সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীন। এদের ভিতর আপসহীন লড়াই। সম্পত্তিবান সম্পত্তি রক্ষার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবেই, কারণ তার সমস্ত স্বার্থ নিহিত সেইখানে। আজকের বাস্তবে কিন্তু অন্য একটি মাত্রা এসে যোগ হয়েছে, একে বাদ দিলে কোনো গণনাই আর নির্ভুল থাকে না। ধনতন্ত্র পথ নয়, একথা ঠিক। তবু একথা বলাই আজ যথেষ্ট নয়। নব মধ্যবিত্তের বিশেষ সুবিধার ভিত্তি নয় মামুলী সম্পত্তি ব্যবস্থা। নব মধ্যবিত্ত বাধ্য নয় এই সম্পত্তিব্যবস্থার জন্য আমরণ লড়াই চালিয়ে যেতে। ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে কায়েমী সুবিধার বিকল্পভিত্তি। আজকের সমাজতন্ত্রে নব মধ্যবিত্ত ফিরে এসেছে, স্থিতি খুঁজে পেয়েছে, আমলা আর

সামরিকবাহিনী এই দুই পরস্পরসংবদ্ধ সমাজবর্গকে আশ্রয় করে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই শিক্ষাকে উপেক্ষা করা যায় না।

একে ভাঙতে হলে ভাঙতে হয় আমলাতন্ত্র তথা সামরিকবাহিনীর সংগঠনকে। চীনের নেতা মাও নতুন সংগঠনের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। মার্কসের প্রোলেতারিয়েত ছিল শিল্পবিপ্লবের সন্তান, প্রাগ্রসর নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে তার যোগ। মাও-এর নেতৃত্বে চীনের বিপ্লবী সৈনিক হয়েছিল কৃষকের সহচর, গ্রাম থেকে অচ্ছেদ্য। সেই চিন্তা তারপর দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সেখানেও অন্তত কিছু মানুষের কাছে এই নতুন আদর্শ এসে পৌঁছেছিল।

চীন আজ যে পথে চলেছে মাও-এর পথ থেকে সেটা বেঁকে গেছে অনেক দূরে। বাংলাদেশে সামরিকবাহিনী ও আমলাতন্ত্র জাঁকিয়ে বসেছে। আবারও এক সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের ভাবনা ভাবছে বাংলাদেশে কিছু বিপ্লবী, হয়তো ভাবছে চীনেও এবং অন্যদেশে। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থান ঘটানোটাই প্রধান কথা নয়, সমস্যা সেইখানে নয়। ভস্ম থেকে বারবার গড়ে ওঠে অসাম্যের সৌধ। সমস্যা এইখানে।

নতুন আদর্শের স্থায়ী রূপায়ণে কে পথ দেখাবে? জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এর মিল কম। ক্ষমতালিপ্সার সঙ্গে একে মেলানো অসম্ভব। কোনো বৃহৎ শক্তির কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্ব আশা করা যায় না। হয়তো পথ দেখাবে কোনো ছোট দেশ। আর তার বিস্তৃতির জন্য ক্ষেত্র তৈরি হবে ধীরে, পৃথিবীজোড়া মানুষের হৃদয়ে। এ পথের পরিণতি সংগঠিত অহিংসায়। অথবা মেনে নিতে হবে সংগঠিত অসাম্যকে। হিংসার ওপর সাম্য গড়ে তোলা যাবে না। দুই বিকল্পের ভিতর ভবিষ্যৎ দোদুল্যমান। অহিংসা কি সম্ভব? অসাম্য কি সহনীয়? আমরা কোন দিকে চলেছি সেটাই প্রধান প্রশ্ন। এযুগের চেতনায় অসাম্য ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। একে রোধ করতে না পারলে এর অন্তে আছে মানুষের আত্মহনন। আজকের সমাজে তার ইঙ্গিতের অভাব নেই।

সমাজের গভীরতর মূল্যাশ্রয়ী পরিবর্তনের নির্দেশ প্রচলিত উন্নয়নতত্ত্বের ভেতর খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। পৃথিবীতে একদিকে ব্যাপক দারিদ্র অন্যদিকে জাতিসমূহের আয়ের সিংহভাগ সামরিক খাতে খরচ হচ্ছে, শুধু এই তথ্যের জোরেই সামরিক ব্যয় কমানো যাবে না। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নতুন কল্পনা ও দূরদৃষ্টি, প্রত্যয় ও সংঘবদ্ধ প্রয়াস। উন্নয়নতত্ত্বকে অবশেষে যুক্ত হতে হবে বৃহত্তর সমাজ দর্শনের সঙ্গে। আঠার উনিশ শতকের চিন্তকদের কাছে আমরা ঋণী। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব ভবিষ্যতের কাছে। সেই ভবিষ্যৎ মানুষকে ডাক দিয়েছে নতুন চিন্তার পথে।

উল্লেখপঞ্জী

১। আঠার শতকের শেষভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা নির্লজ্জভাবে বাংলা লুঠ করে। এই লুণ্ঠনে কিন্তু বাংলার যতটা ক্ষতি হয় ইংল্যাণ্ডের ততটা লাভ হয়নি। এ বিষয়ে জন স্ট্রেচির 'The End of Empire' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে রুশ দেশেরও দ্রুত আর্থিক উন্নতি শুরু হয়ে যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরে রুশ দেশের শিল্পোৎপাদন জর্মনীর মতই উল্লেখযোগ্য গতিতে বাড়তে থাকে। এতে বিদেশী পুঁজির একটা ভূমিকা ছিল ; কিন্তু শুধু বিদেশী পুঁজি নিয়োগে কোনো দেশের দ্রুত উন্নতির ব্যাখ্যা হয় না।

৩। সমাজতান্ত্রিক দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানেও মুনাফা বা লাভের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু সে আলোচনায় এখন যেতে চাই না।

৪। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা চলেছে। সাম্যবাদী দেশেও মূলধনের অপচয় পূর্ব ইয়োরোপের অর্থনীতিজ্ঞদের ভিতর আজ প্রধান আলোচ্য বিষয়।

৫। এটাকে শুধু ধনতন্ত্রের সমস্যা বললে অবশ্য একটু ভুল হয়। আধুনিক সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়া এমন দীর্ঘসূত্রে বাঁধা, পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা এমন জটিল এবং পরিবর্তন এতো দ্রুত যে, আজ যা মানুষের হাতছাড়া হয় ও কাল যা হাতে আসে তা এক বস্তু নয় এবং এ দু'য়ের মধ্যে তুলনাও কোনো শিল্পোন্নত দেশেই আজকের বীজধান ও কালকের নবান্নের সম্পর্কের মতো সরল নয়।

৩

সমাজদর্শন

বিজ্ঞান ও প্রগতির পথ

এক

আমরা তার্কিক। অথচ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের মাটিতে এখনও শিকড় গাড়তে পারল না। কেন?

পুরনো কথা দিয়ে শুরু করি। বৈদিকযুগের শেষ দিকে আচার অনুষ্ঠান, বিশেষত যাগযজ্ঞ, ধর্মের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠলো। ব্রহ্মের ব্যক্তসত্তা এই বিশ্ব নিয়ত নিজেকে আহুতি দিচ্ছে অব্যক্ত ব্রহ্মের কাছে। যজ্ঞ ও মন্ত্রকে কেন্দ্র করে সমাজে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হলো। সেই সঙ্গে বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত হলো। পুরুষসূক্তে শুধু একটি চরাচরময় আহুতিই কীর্তিত হয়নি, চতুর্বর্ণের অলৌকিক ভিত্তিও কল্পিত হয়েছে।

আচার ও উচ্চবর্ণের এই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিতে দেরি হয়নি। বিদ্রোহ নানা রূপ নিয়েছে। রামায়ণে দেখতে পাই আত্মবিদ্যা ও আন্বীক্ষিকীর ভিতর বিভেদের সূচনা। আন্বীক্ষিকী তর্কে ও বিচারে বিশ্বাসী। মহাকাব্যে অভিযোগ শুনতে পাই যে তার্কিকদের তর্কে প্রাচীন বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে; আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিচার।

শুধু চার্বাকই বেদকে অস্বীকার করেননি; জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেও বেদ অস্বীকৃত। ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধ মৌন ছিলেন। মানুষের দুঃখ কি করে দূর করা যায় এটাই তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল। বুদ্ধ কার্যকারণ সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। দুঃখ-বিষয়ক চিন্তায়ও সেই একই কথা: প্রথমে দুঃখের মূল কারণ আবিষ্কার করা আবশ্যক, তারপর সেই কারণ দূর করে তবেই দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তিনাশ সম্ভব। ধর্মীয় জীবনে বুদ্ধ ব্রাহ্মণের একাধিপত্য অস্বীকার করলেন; নিম্নবর্ণকেও তিনি ধর্মের সাধনায় উচ্চস্থান দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বুদ্ধ ছিলেন জ্ঞানের পথের যাত্রী। তাঁর কাছে যাগযজ্ঞের চেয়ে সৎচিন্তা বড়। তিনি চিত্তকে সজাগ রাখতে বলেছিলেন। মৃত্যুর আগে রোরুদ্যমান শিষ্যদের জন্য বুদ্ধ বাণী দিয়ে গেলেন: অন্তরের আলোতেই নিজের পথ চিনে নিও, অন্য পথপ্রদর্শক নেই।

কিন্তু এই বিচারের ধারা ব্যবহারিক জীবনে খুব বেশী উন্নতি এনে দিতে পারেনি। ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা খানিকটা এগিয়ে থেমে গেছি। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা পঞ্চভূতের কথা ভেবেছি এবং বস্তুর গঠন ও উপাদান সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করেছি; লৌহ প্রস্তুত করতে শিখেছি; অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভ করেছি; ইত্যাদি। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর এই জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রায়ই সম্ভব হয়নি। প্রাচীন ভারতের প্রতি অতিভক্তি হেতু আমরা অবশ্য অনেক সময় দাবি করে বসি যে, অদ্যাবধি বিশ্বের বৈজ্ঞানিকেরা যা-কিছু জেনেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন তা সবই আমাদের ঋষি ও পণ্ডিতদের জ্ঞাত

ছিল। কথাটা বিচারে টেকে না। ঋষিদের আত্মবিদ্যা নিয়ে এখানে প্রশ্ন তুলছি না। বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারিক জ্ঞানের কথাই আপাতত আলোচনা করছি। এই জ্ঞানের ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার বাড়ে ; পার্থিব শক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন ভারত যদি এই বিজ্ঞানপ্রদত্ত জ্ঞান ও শক্তিতে সত্যি অতুলনীয় হতো তা হলে বহিঃশত্রুর কাছে সে বারবার পরাজিত হতো না। এমন কোনো অতুলনীয় জ্ঞানলাভ যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, এটা লজ্জার কথা নয়—ইতিহাসের সেই পর্যায়ে সেটাই স্বাভাবিক। তবে ঐ সত্যটাকে আজ স্বীকার করে নেওয়া ভালো। বিজ্ঞানের অতি আধুনিকতত্ত্ব দূরের কথা, প্রাচীন ভারতের পন্ডিতেরা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। অনেকে অবশ্য এ প্রসঙ্গে ভাস্করাচার্যের নাম উল্লেখ করেন। বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহা এ বিষয়ে লিখেছেন : "এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য।...কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন না।...সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোনো হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপলার-গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়।" (মেঘনাদ রচনা সংকলন, পৃ ১৬১)। অতীতের মুগ্ধপ্রেমে ঐতিহাসিক বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দেওয়া বিবেচকের কাজ নয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের তার্কিকেরা তর্কবিদ্যায় নিঃসন্দেহে কুশলী ছিলেন। তাঁদের যে-ধীশক্তি বাহ্য জগৎকে জয় করতে পারেনি, অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্যের ক্ষেত্রে একান্ত নিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়ে বৃহৎ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, সেই বিশ্লেষণী শক্তিদ্বারাই আবার তাঁরা জগৎকে মিথ্যা প্রমাণ করে গেছেন। শঙ্করাচার্য বা নাগার্জুনের চেয়ে বড় তার্কিক কে ? অবশ্য ন্যায়দর্শনে জগৎকে মিথ্যা বলা হয়নি। কিন্তু বেদান্ত বা বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেশি। জগৎ সম্বন্ধে চিন্তার ভিত্তি হিসাবে যে আদি প্রত্যয়গুলি আমরা অনিবার্যভাবে গ্রহণ করি সমালোচনায় সেগুলিকেই 'মিথ্যা', অর্থাৎ আত্মবিরোধে চিহ্নিত, মনে হতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে জগৎসৃষ্টি বোঝা যায় না। সৃষ্টির আগে কী ছিল ? সৃষ্টির আগে তো কিছু থাকা সম্ভব নয় ; অথচ শূন্য থেকেও কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। সৃষ্টি যদি রহস্যাবৃত হয় পরিবর্তনও কি তেমনই রহস্যময় নয় ? ক থেকে খ-এর উদ্ভব ; কিন্তু ক-এর ভিতরই কি খ নিহিত ছিল ? তবে দুয়ের ভিতর পার্থক্য কি ? ক-এর ভিতর কি খ নিহিত ছিল না। তবে খ এল কোথা থেকে ? জগৎকে অথবা পরিবর্তনকে সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় ; কিন্তু সত্য বলে প্রমাণ করা কঠিন।

অথবা বলা যায় যে, জগৎ সত্যাসত্যের সমন্বয় ; অর্থাৎ, এক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে মিথ্যা। জগৎ সত্য কি মিথ্যা এই তর্কে বুদ্ধিকে আমরা ক্লান্ত করতে পারি, কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান তাতে বাড়ে না। আধুনিক যুগে বিজ্ঞান বলতে যা বুঝি, জগৎ সম্বন্ধে 'ব্যবহারিক' জ্ঞান নিয়েই তার কারবার। সেকালের পণ্ডিতেরা অধীতব্য বস্তুকে নানাভাবে সাজাতে পারদর্শী ছিলেন ; তর্কজাল বিস্তারেও মধ্যযুগীয় মনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কিন্তু সেই তার্কিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এক বস্তু নয়। আমরা আজও যতখানি তার্কিক ততখানি বৈজ্ঞানিক নই। এদেশের মন থেকে মধ্যযুগ এখনও বিদায় নেয়নি।

দুই

উনিশ শতকের গোড়ায় আশা জেগেছিল যে, নতুন পাশ্চাত্ত্য চিন্তার প্রভাবে দেশের মন থেকে মধ্যযুগীয় জড়ত্ব দূর করা যাবে। বাংলার নবজাগরণের নেতারা এই চিন্তা থেকেই ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রামমোহন এদেশের প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন এবং উপনিষদের চিন্তায় তিনি তাঁর নতুন ধর্মের উপাদান খুঁজেছেন। কিন্তু আমাদের পুরাতন দর্শন ও ভাবধারার সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনকে নতুন করে গড়া যাবে না, এই প্রত্যয় তাঁকে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করেছিল। ১৮২৩ সালে সরকার যখন একটি নতুন সংস্কৃত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ-মঞ্জুর করেন তখন রামমোহন প্রতিবাদ জানিয়ে বড়লাটকে লিখেছিলেন :

"This seminary (similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon) can only be expected to load the minds of youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use."

সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণের নিয়ম শিক্ষায় ও প্রাচীন দর্শনের আলোচনায় আর যাই লাভ হোক, পৃথিবীকে নতুন করে গড়া সম্ভব হবে না ; যেমন সম্ভব হয়নি বেকনের পূর্ববর্তী ইউরোপের মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায়।

রামমোহনের উক্তিতে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ ও সেই সঙ্গে বেকনের নামোল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়ে খানিকটা আলোচনা প্রয়োজন।

রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপের মন প্রাচীন গ্রীক চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) কিন্তু কৈশোর থেকেই প্ল্যাটো এবং বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের প্রতি বিরূপ হলেন। এই বিরূপতার কারণটি উল্লেখযোগ্য। বেকনের জীবনীকার ডঃ উইলিয়ম রলি (William Rawley) লিখেছেন :

"Whilst he was commorant in the university, about sixteen years of age, he first fell into dislike of the philosophy of Aristotle; not for the worthlessness of the author, but for the unfruitfulness of the way; being a philosophy (as his lordship used to say) only strong for disputations and contentions, but barren of the production of works for the benefit of the life of man."

অ্যারিস্টটল ও সেই সঙ্গে ইউরোপের মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্যকে বেকন ত্যাগ করলেন, কারণ তাতে তর্ক বাড়ে, কিন্তু মানুষের পার্থিব অবস্থার উন্নতির উপযোগী জ্ঞান বাড়ে না। বিজ্ঞানকে বেকন চেয়েছিলেন জাগতিক উন্নতির সহায় হিসাবে।

বিজ্ঞানের মূল্য তার ব্যবহারে। এই মতবাদের অবশ্য অপব্যাখ্যা সম্ভব। মিথ্যাকেও 'বিজ্ঞান'সম্মত মনে হতে পারে। নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনে মিথ্যা প্রচার যুদ্ধে ও রাজনীতিতে বিরল নয়। যে-অসত্য সাময়িকভাবে লাভজনক হতে পাবে তার তুলনায় যে-সত্য বিশ্বমানবের সম্পদ হতে পারে তার একটি বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃতি না হলে পরস্পরবিরোধী মিথ্যার আধিপত্যে মানুষের অগ্রগতি বিপন্ন হওয়া সম্ভব। তবে বেকনের বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও পটভূমিকা ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন নৈয়ায়িকদের তর্কের স্থানে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চাকে অধিষ্ঠিত করতে যাতে মানুষের বৈষয়িক উন্নতির

পথ প্রশস্ত হয়।

বেকন ধর্মবিরোধী ছিলেন না। বরং তাঁর জীবনদর্শনকে তিনি বাইবেলের উপরই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বাইবেলে কথিত আছে যে, ভগবান প্রথম মানুষকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন :

"Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it."

তিনি বলেছিলেন, এই পৃথিবীর উপর তোমাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হোক, তোমরা ধনবান হও, তোমাদের বৃদ্ধি হোক। পরে ভগবানের নিষেধ অমান্য করার ফলে মানুষের পতন ঘটে। কিন্তু মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য সেই প্রথম দিনেই স্থির হয়ে গেছে। ভগবানের অভিশাপে মানুষ তার নিষ্পাপ সারল্য হারিয়েছে ; সেই সঙ্গে প্রকৃতির উপর তার কর্তৃত্ব স্থাপনের পথও ঐ অভিশাপেই কঠিন পরিশ্রম সাপেক্ষ হয়েছে। বেকন বলেছেন যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান দুই-ই আমাদের চাই। ধর্মকে চাই সেই নিষ্পাপ সারল্য পুনরুদ্ধারের জন্য, আর বিজ্ঞান দেবে আমাদের প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব ও পার্থিব সম্পদ। বেকনের সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"For Man through the Fall lost both his state of innocence and his lordship over the created world. Both these losses can, even in this life, be partially repaired; the former by Religion and Faith, the latter by Arts and Sciences." (*Novum Organon*).

ইতিহাসে মানুষের প্রগতি সম্বন্ধে বেকনের চিন্তায় এক নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হলো। বেকন বললেন যে, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসে যে বিরাট পরিবর্তন এনে দেয় দিগ্‌বিজয়ী বীর ও সাম্প্রদায়িক গুরুদের শক্তি সে তুলনায় সামান্য। সম্রাটপূজায় অভ্যস্ত ইউরোপে, সাম্প্রদায়িক কলহে রক্তাক্ত ইউরোপে, বেকনের কণ্ঠধ্বনি মানুষকে আহ্বান করল শিল্প ও বিজ্ঞানের সাধনায়, গঠনমূলক কর্মের পথে।

সেই আহ্বান উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতে এসে পৌঁছেছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের চিন্তায় তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

রামমোহন এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার আধিপত্য কমাতে চেয়েছিলেন যাতে নতুন চিন্তার স্রোত দেশে সহজে প্রবাহিত হতে পারে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষাকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন চিন্তার বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ধারণা অতি পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিনয় ঘোষ মহাশয়ের গবেষণার গুণে সেই পরিকল্পনার সঙ্গে আমরা অনেকেই আজ পরিচিত।

বেকন যেমন প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শন বর্জন করেছিলেন বিদ্যাসাগরও তেমনই সাংখ্য বেদান্তকে ভ্রান্ত বলেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন দর্শন ভ্রান্ত হলেও সমাজ সংস্কারকের সে-বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এমন কিছু তরুণ পণ্ডিত তৈরি করতে যাঁরা একদিকে যেমন ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক দর্শনবিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত হবেন অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ও প্রাচীন শাস্ত্র ভালোভাবে জানবেন। তা ছাড়া আধুনিক ভারতীয় ভাষায় জনসাধারণের জন্য নিজের মতামত প্রকাশ করবার দক্ষতাও এঁদের অর্জন করতে হবে। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ছিল বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনা। তিনি লিখেছিলেন :

"Youngmen thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu philosophy than if they were to derive their knowledge of philosophy

simply from European sources.''

শুধু ইংরেজীতেই যাঁদের বিদ্যা সীমায়িত তাঁদের ধ্যানধারণা দেশের মনে পৌঁছবে না। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শাস্ত্রীয় সমালোচনায় অভ্যস্ত ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সঙ্গে পরিচিত এমন এক নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে যাঁরা দেশের মনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হয় না যে, ঈশ্বরচন্দ্রের সেই আশা পূর্ণ হয়েছে।

তিন

এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পর শতাধিক বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। বিজ্ঞান আমাদের জীবনযাত্রায় একেবারেই ফলপ্রসূ হয়নি একথা বলা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রথমভাগে এদেশে রেলগাড়ী ছিল না। বাষ্পীয় যানের প্রবর্তন নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। 'ন্যুইয়র্ক ডেইলী ট্রিবুন'-এর পৃষ্ঠায় মার্ক্স সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন :

''The railway system will become in India truly the forerunner of modern industry.''

কয়েকটি আধুনিক শিল্প যে তারপর এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এমন নয়। বাষ্পীয় শকটের যুগ ছাড়িয়ে আমরা বিমানপথের যাত্রীও হয়েছি। কিন্তু শতবর্ষ পরে মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণীর ঐ ক্রিয়াবিশেষণটি (''truly'') এখনও যেন আমাদের সমানে তিরস্কারবাণী হয়ে আছে।

আবারও বলতে হয় যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের মাটিতে এখনও শিকড় গাড়তে পারেনি। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়, আর্থিক জীবনে, রাজনীতিতে সর্বত্র এটা প্রকট।

কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর প্রচলন হয়েছে ; পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় আধুনিক লেখকদের নামও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু যে-মন নিয়ে আমরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করি, তাকে আধুনিক মন বলা যায় না। সেকালে সংস্কৃত টোলের ছাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্যে ও নানা শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করত ; আজকের ছেলে পাঠ্যপুস্তক বিষয়ক ব্যাখ্যাপুস্তক মুখস্থ করছে। আমরা মুখে বলি যে, বিদ্যার্থীকে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে, নিজের মতো করে উত্তর লিখতে হবে। বিদ্যার্থী কিন্তু কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষা কক্ষে যায়, ধরাবাঁধা প্রশ্নের ভিতর উত্তরের সুবিধা না থাকলে পরীক্ষাকেন্দ্র ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। এদিক থেকে টোলের শিক্ষাব্যবস্থাই অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল।

বিজ্ঞানের যুগে জ্ঞান ক্রমশ বেড়ে চলেছে, শিল্পে অবিরত উন্নতি ঘটছে, প্রচলিত ধারণার বহু পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা এমন ছাত্র চাই যারা প্রশ্ন করতে শিখবে, নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নিজ বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করতে জানবে। ধরাবাঁধা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থের ভিতর দিয়ে পরিবর্তনশীল জীবনের জন্য এই প্রস্তুতি অথবা বুদ্ধির এই বিকাশ সম্ভব নয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা আধুনিক যুগের উপযোগী মানুষ তৈরি করতে অক্ষম। সংস্কারের কোনো আন্তরিক চেষ্টাও অনুপস্থিত। কিছুদিন আগে সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ের একজন অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের মতামত সংগ্রহ করেন। পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের নামে অনেকেই চাইছেন যে, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে প্রধান প্রধান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করবার ভার বেশি করে তুলে

দেওয়া হোক। যেন পঠিতব্য বিষয়গুলিও ইতিমধ্যে অবসর গ্রহণ করে থেমে আছে! রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আজও জুড়ে বসে আছে এক মধ্যযুগীয় মন।

বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে পারে, আমাদের বৈজ্ঞানিকরাও এই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত নন। অতএব তাঁরা ব্যক্তিগত উন্নতির প্রচেষ্টায় পারিষদনীতিতেই ব্যস্ত। তার উপর আবার এদেশের গবেষণাগারে বিজ্ঞানচর্চা যতটুকু হয় তার সঙ্গে আমাদের উৎপাদনব্যবস্থার, কৃষি ও শিল্পের, যোগাযোগ ক্ষীণ। এদেশে আধুনিক কৃষিগবেষণার সূচনা হয়েছে শতাব্দীর বাঁকে ; জাপানেও প্রায় একই সময়ে ঐ জাতীয় কাজ শুরু হয়। কিন্তু জাপান শুধু গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেই সন্তুষ্ট থাকেনি ; গ্রামে গ্রামে সমস্ত চাষীকে শিক্ষিত করে তুলেছে এবং কৃষি ব্যবস্থার বহু উন্নতি সাধন করেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষও ওদেশে কৃষিকাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। আর এদেশে অধিকাংশ চাষী আজও নিরক্ষর। এদেশের মাটিকে সুজলাসুফলাশস্যশ্যামলা করবার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ উদ্যোগী হয়নি। এর নানা কারণ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই কারণগুলি দূর করবার জন্য আমরা যথেষ্ট সচেষ্ট নই। এই কৃষিপ্রধান দেশে বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের বিচ্ছেদ মাঠে মাঠে মহৎ সম্ভাবনার ব্যর্থতায় প্রকট।

যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভিতর গঠনমূলক প্রচেষ্টা অনুপস্থিত, সেখানে সেই নিশ্চেষ্টতার একটা বৈপ্লবিক কৈফিয়ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ দেশে শিক্ষিতদের ভিতর এ কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, ছোট ছোট ক্ষেতে উন্নত ধরনের চাষ সম্ভব নয় ; সেইজন্য চাই বৃহৎ যৌথ কৃষিক্ষেত্র। যৌথ চাষ যতদিন না চালু হচ্ছে, ততদিন বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা আশা করা যায় না। বৈজ্ঞানিক কৃষির নাম শ্রবণ মাত্র আমরা মুখস্থ শ্লোক উচ্চারণের মতো করে বলি "ট্রাক্টর"। যেন ঐ একটি বস্তুতেই বৈজ্ঞানিক কৃষি নামক অবয়বহীন একটি ভাব মূর্তি লাভ করেছে। এই ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। ট্রাক্টরের ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের সাহায্যে চাষ সম্ভব ; যে দেশে জনশক্তির অপ্রাচুর্য সেখানে এই বিশেষ যন্ত্রটির ব্যবহার প্রয়োজনীয়। কিন্তু জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াবার জন্য ট্রাক্টর অপরিহার্য নয়। বরং প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজ বপন, জল ও সারের ব্যহার, কীটাদিনাশের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন। জাপানে কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধির মূল কারণ অপর্যাপ্ত সার ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এইসব উপায়ে ছোট ক্ষেতেও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। অবশ্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারকে কৃষিকাজে টানতে হলে অপেক্ষাকৃত বড় জোত প্রয়োজন। বাংলা দেশের জমির মালিকানায় পঁচিশ একরের একটি ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই পঁচিশ একর জমিও ছোট ছোট বহু খণ্ডে বিভক্ত। মধ্যবিত্ত পরিবার সাধারণত এই খণ্ড খণ্ড জমি বর্গাদার বা ভাগচাষীর হাতে তুলে দেন। পঁচিশ একর জমি একটি অবিভক্ত ক্ষেত্র হিসাবে লাভ করলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেও নিজস্ব পরিচালনায় কৃষিকর্মকে জীবিকা উপার্জনের পথ হিসাবে গ্রহণ করা সহজ হবে। কৃষির উন্নতিতে মধ্যবিত্ত মানুষ যেখানে নিজে মনোযোগী নয়, সেখানে জমির মালিকানায় তার অধিকার সঙ্কুচিত করাই ভালো। যৌথ চাষ না হলেও চলে ; কিন্তু বর্গাদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। এটা এমন কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবিষয়ে উৎসাহিত হলে এই পরিবর্তনটুকু সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হবে না। দুঃখের বিষয়, এ দেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যদিও বেড়েছে, এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্রদের বিজ্ঞানস্পৃহা নির্জীব ; ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের চেয়ে

রাজধানীর অফিসঘর ও রাজনীতির উত্তেজনা তাঁদের কাছে বেশি আকর্ষণীয়।

আমাদের রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের মিত্রতা নেই। এর কোনো দীর্ঘ বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়। দুয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যেই বক্তব্য শেষ করতে হবে।

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ভিতর আমাদের মন দ্বিধায় দোদুল্যমান। ইংরেজ ও মুসলমানের প্রতি বিরূপতায় রক্ষণশীল হিন্দুয়ানীর সমর্থকদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে। ইংরেজী হটাবার তোড়জোড়ে ও গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনে এই দৃষ্টির সংকীর্ণতা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার কাম্য, এর সপক্ষে সুযুক্তি আছে। কিন্তু এই যুক্তি যাঁরা মেনে নিয়েছেন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার সঙ্গে একটি দ্বিতীয় ভাষাকে যুক্ত করা প্রয়োজন, তা নইলে আমরা মনে ও বুদ্ধিতে প্রাদেশিক হয়ে পড়ব। এ দেশে আমরা যদি বিজ্ঞান চিন্তাকে সবল রাখতে চাই তো মাতৃভাষার পাশে এই দ্বিতীয় স্থানটি দিতে হবে ইংরেজীকে। উচ্চশিক্ষায় বাংলা ও হিন্দীকে আবশ্যিক করার চেয়ে, হিন্দীভাষীর পক্ষে হিন্দী ও ইংরেজী এবং বাঙালীর জন্য বাংলা ও ইংরেজীর দ্বৈতবন্ধনই যে শ্রেয়, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মাতৃভাষা ও ইংরেজীর পর অপর একটি ভারতীয় ভাষা যদি শিক্ষণীয় হয় তো সংস্কৃতের দাবিটাই আগে বিবেচ্য। এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের কাছে আমাদের বিজ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত হতে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনে। গো-রক্ষার সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে গান্ধীজীর ভূতপূর্ব সচিব ১৯৬৭ সালের ৬ জানুয়ারি তারিখে স্টেটসম্যান কাগজে প্রকাশিত একটি পত্রে লিখেছেন :

"We go against the principle of cow protection when we use leather goods made from the skins of the slaughtered animal; we condemn the cow and its progeny to death by slow starvation or under the butcher's knife when we throw them out of work by using the tractor for ploughing, the electric pump for irrigation, the diesel engine for oil pressing, crushing sugar cane, grinding corn or husking rice, the truck for transfer of farm products, and chemical fertilizers in the place of composted manure...Let those who support the demand for stopping cow slaughter, therefore, if they mean business, launch a movement to restore to the cow and its progeny its due place in our economy."

যে-সমাজে গরুর মূল্য শুধু তার দুগ্ধে নয়, বরং কৃষি, শিল্প ও পরিবহণব্যবস্থায় গো-শক্তিই প্রধান চালক শক্তি, সেখানেই গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গরুর দুগ্ধ, মাংস ও চর্মের ব্যবহারই প্রাধান্য লাভ করে ; শক্তির উৎস হিসাবে ধেনুর চেয়ে বিদ্যুৎই বড় হয়ে ওঠে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, জাপানে শিল্প-বিপ্লবের আগে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা গো-মাংস ভক্ষণ করতেন না, কিন্তু এখন করেন। তা-ছাড়া, গো-মাংস রপ্তানির প্রশ্নও আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিয়ে গরুকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করলেই বিপদ। এই যুক্তিহীন রাজনীতিতে গো-মাতা রক্ষা পান না ; সমাজের সংহতি ও প্রগতি বিপন্ন হয়।

দুঃখের বিষয়, এ দেশে মার্ক্সবাদও শেষ অবধি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়ক হয়নি। মার্ক্স স্বয়ং বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর চিন্তায় মানবতাবাদী ঐতিহ্যের ধারাও মিশেছে।

ফয়েরবাখ্ খ্রীষ্টধর্মের একটি মানবতাবাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন। ধর্ম বলেছে যে, ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করলে সমাজকে শাস্তি ভোগ করতে হয়, আর ঈশ্বরের অন্য নাম প্রেম। ফয়েরবাখ্ অর্থ করলেন, মানবপ্রেমেই্ সমাজের ভিত্তি। ঈশ্বর মানুষ থেকে অন্তরিত মনুষ্যত্ববোধ।

মার্ক্স চেয়েছিলেন, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে, মনুষ্যত্বে বিধৃত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু ইতিহাসকে তিনি ব্যাখ্যা করলেন শ্রেণীসংগ্রামের সূত্র ধরে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থের দ্বন্দ্বই মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির পথে বড় বাধা। এই্ দ্বন্দ্বের মূলে আছে উৎপাদনের মূল উপকরণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। শ্রেণীসংগ্রামের ভিতর দিয়েই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অবসান ঘটতে পারে। শ্রেণীসংগ্রামের পথেই্ শুধু মনুষ্যত্বের জয়লাভ সম্ভব। মার্ক্সবাদের এটা মূলকথা।

শ্রেণী সচেতনতা থেকে যে-ঐক্যবোধ, তাকে মনুষ্যত্ব বলা চলে না ; মানুষ হিসাবে যে-স্বাজাত্যবোধ, তারই নাম মনুষ্যত্ব। ইতিহাস থেকে এই্ মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের অন্তে তাকে খুঁজে পাওয়া অনেকের কাছে অতিনাটকীয় মনে হয়েছে। তার চেয়ে বিশ্বাস করা ভালো যে, ইতিহাসের ধাপে ধাপে মনুষ্যত্বের ক্রমশ বিকাশ ঘটছে, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে দ্বন্দ্ব ও মানবিক সহযোগিতা দুই-ই উপস্থিত। ইতিহাস সহযোগিতারও ইতিহাস। মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে সমাজ এক মুহূর্তও টিকতে পারে না। ভগবানকে যেমন শুধু সৃষ্টির আদিতে অথবা অন্তে কল্পনা করা অর্থহীন, মানবিক সহযোগিতা ও মানুষের আন্তরিক ঐক্যবোধকেও তেমনই ইতিহাসের আদিতে ও অন্তে মাত্র প্রতিষ্ঠা করলে ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যায়।

মার্ক্সের আদর্শ ছিল মনুষ্যত্বের আদর্শ। কিন্তু যে-পরিমাণে শ্রেণীযুদ্ধের ঐকান্তিক ধারণা মার্ক্সবাদীর চেতনাকে অধিকার করেছে সে-পরিমাণে একটি নতুন বিপদও সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানবুদ্ধি পরাস্ত হতে বসেছে জঙ্গীবুদ্ধির কাছে। তাই উত্তেজক বক্তৃতায় এঁদের যতটা উৎসাহ দেখা যায়, লোকশিক্ষায় ততটা নয়। গো-রক্ষা নিবারণী আন্দোলন উপলক্ষে বামপন্থীরা "দক্ষিণ-পন্থী চক্রান্তের" কথা বলেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারে সক্রিয় হননি। পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনায়ও এঁরা "সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত" দেখতে পান। মার্ক্সবাদীর মন যে-সুরে বাঁধা হয়ে গেছে তাতে যুদ্ধের সুর যত অনায়াসে বাজে, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা তেমন আসে না। স্বয়ং নেহরু তাই একবার বলেছিলেন যে, এঁদের শান্তি আন্দোলনের ইস্তাহারও কেমন যেন যুদ্ধনিনাদের মতো শোনায়।

মনুষ্যত্বের নীতি আর যুদ্ধের নীতি এক নয়। উগ্র জাতীয়তাবাদী যেমন তার 'যুদ্ধং দেহি' ডাকে সমাজে বিপদ ডেকে আনেন, শ্রেণীসংগ্রামের ধ্বজাধারীও তেমনই দ্বন্দ্ববোধের তীব্রতায় সমাজকে বিপদের পথে ঠেলে দিতে পারেন। যুদ্ধের একটা উন্মাদনা আছে—সেটা ধর্মের নামেই্ হোক আর শ্রেণীর নামেই হোক। সেই উন্মাদনায় অবশেষে মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন হয়। মার্ক্সবাদ এই্ বিপদ থেকে মুক্ত নয়। মাওবাদে এটা প্রত্যক্ষ। সোভিয়েত লেখক ফেদোসিয়েভ লিখেছেন : "সমাজ যতদিন শ্রেণীবিভক্ত, ততদিন তার সমগ্র ইতিহাসই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, এই মার্ক্সীয় তত্ত্বের স্থলে মাও সে-তুঙ ইতিহাসকে যুদ্ধেরই ইতিহাস বলে তাঁর সমরবাদী ইতিহাসতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মাও সে-তুঙ-এর বিচারে শ্রেণীসংগ্রামের নিয়মনীতি নয়, যুদ্ধের নিয়মনীতিই রাজনীতির পথ নির্ধারণ করবে।" (মার্ক্সবাদ ও মাওবাদ, সোভিয়েত সমীক্ষা, ২৫ মে ১৯৬৭)। এই পরিণতি আকস্মিক নয়, মার্ক্সবাদেই এর বীজ নিহিত ছিল। অবশ্য চীনের বিশেষ

ঐতিহাসিক পরিস্থিতিও এজন্য অংশত দায়ী।

এদেশে অতিবৈপ্লবিক পদ্ধতিতে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। বরং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে উগ্র দক্ষিণপন্থীরাই দিল্লীতে ক্ষমতায় আসবেন। আর বাংলা দেশে এতে অরাজকতা স্থায়ী হবে। শিল্পে ও আর্থিক উন্নয়নে আমরা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ক্রমশ পিছিয়ে যাব। এই দুর্গতি ও আশাভঙ্গের ফলে আমাদের বৈপ্লবিক উন্মাদনাটাই যদি আরও বাড়ে, তাতে কারোরই মঙ্গল হবে না। আর সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে আমাদেরই।

যে-প্রাণশক্তি নিয়ে বাংলা দেশ বৈপ্লবিক মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকেছে, তার ভগ্নাংশ নিয়েও যদি শিক্ষিত বাঙালী গঠনমূলক কাজে, লোকশিক্ষার প্রসারে, শিক্ষার সংস্কারে, বিজ্ঞানচর্চায় ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রচারে, এবং কৃষি ও শিল্পে তার প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করত, তা হলে ভারতের প্রগতির ইতিহাসে বাংলা দেশ আবারও একটি গৌরবে উজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করতে পারত। কিন্তু সে আশা আজ সুদূরপরাহত। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ধারা এই বাংলায় জয়ী হবে, এ সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে চলেছে।

চার

বেকন বলেছিলেন, জ্ঞানই শক্তি। কথাটা নানাভাবে সত্য। যে-অন্ন ক্ষুধার্তের দেবতা, বিজ্ঞানই শুধু সেই অন্ন জনে জনে বিতরণ করতে সমর্থ। বিজ্ঞানই পারে গ্রামে গ্রামে প্রদীপ জ্বালাতে। প্রকৃতির শক্তিকে বিজ্ঞান করে মানুষের ভৃত্য, মানুষকে সে করে প্রাণীজগতের অধিপতি। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের বার্তা বিজ্ঞান এক নিমেষে অলৌকিক ডাকহরকার মতো আমাদের ঘরে পৌঁছে দেয়, যেন এই বিপুলা পৃথ্বী ছোট একটি পল্লীমাত্র। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য শিল্প ও বিজ্ঞান অপরিহার্য। আবার পরমাণুবোমার ভয়ঙ্কর শক্তি মানুষের হাতে তুলে দিয়ে বিজ্ঞান মানুষকে বলে, এক হও, নয়তো ধ্বংস হও। বিজ্ঞানই আমাদের আজকের রাজনীতিকে গ্রাম্য রাজনীতি বলে চিনিয়ে দেবে। এবং বিজ্ঞানই অবশেষে এ যুগের একটি "বৈজ্ঞানিক" আশাকেও ভ্রান্ত বলে চেনাবে। বিজ্ঞানের বলে সমৃদ্ধিময় যে নতুন জগৎ আমরা সৃষ্টি করবার আশা রাখি, স্বয়ং বুদ্ধেরও তা কল্পনার অতীত ছিল। তবু সে সমৃদ্ধি যেদিন আমরা লাভ করব, জীবন থেকে দুঃখ সেদিনও দূর হবে না। মৃত্যু যদি থাকে তো ভয়ও থাকবে ; পরিবর্তন যতদিন আছে, আশংকা ততদিন দূর হবে না। বিজ্ঞান আমাদের জাগতিক সমৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করে সুখের অলীক আশা থেকে মুক্তি দেবে। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।

স্বজন ও সজ্জন

স্বজনপোষণ আজ এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারদিকে এর বিরুদ্ধে আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সবাই যথাসাধ্য স্বজনপোষণ করে চলেছেন। স্বজন বলতে কেউ বোঝেন নিজ পরিবার, কেউ বা নিজের দল, অথবা স্বজাতি।

আক্ষেপ ও আচরণের এই বিরোধ থেকে একটা কথা সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা অপরের স্বজনপোষণে বিক্ষুব্ধ, কারণ নিজের দলীয় স্বার্থে তাতে আঘাত লাগে। কিন্তু নীতিগতভাবে আমরা স্বজনপোষণের বিরোধী নই। অন্তত ঐরকম কোনো নীতিবোধ আমাদের মনের গভীরে স্থান পায়নি। সেখানে স্বজাতিপ্রীতির একমাত্র বিরোধী শক্তি স্বার্থপরতা। অতএব স্বজনপোষণকে আমরা একরকম কর্তব্যই মনে করি। যিনি স্বজনপোষণ করেন না, তিনি স্বার্থপর। এর চেয়ে বড় কোনো নীতি অথবা বিচারের কথা যদি-বা আমাদের ভাষায় স্থান পেয়েছে, আমাদের বিবেক তার দ্বারা ভারাক্রান্ত নয় এবং আচরণেও তার প্রকাশ নেই।

১৮৬১ সালে কলকাতা "হাই কোর্ট" স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্ত্য বিচারধারার সঙ্গে এদেশের পরিচয় শুরু হয়েছে আরও আগে। কিন্তু যে ধ্যানধারণার ওপর পাশ্চাত্ত্য বিচারনীতি প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের একটা বিরাট অসামঞ্জস্য থেকেই গেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনায় এই অসামঞ্জস্য অহরহ প্রকট। কেউ অধিকার হিসাবে কিছু দাবি করলে আমরা অসন্তুষ্ট হই। স্বজাতি হিসাবে অথবা স্নেহাকাঙ্ক্ষীরূপে চাইলে আমরা কথাটা বুঝি। আর বুঝি মারের ভয়ে। কিন্তু অধিকারের প্রশ্ন উঠলে আমাদের হৃদয় হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। তখন যুক্তিমাত্রই আমাদের মনে হয় 'তর্ক'। তর্ক জিনিসটা যে আমরা কোনো ক্ষেত্রেই পছন্দ করি না এমন নয়। দার্শনিক তর্কে আমাদের কিঞ্চিৎ রুচি আছে। কিন্তু অধিকার নিয়ে তর্ক জিনিসটা আমাদের বড়ই অভদ্রতা ঠেকে।

গোড়ার কথাটা এবার অন্যভাবে বলা যাক। কিছুটা স্বজনপোষণ সবদেশেই আছে, অর্থাৎ অপরিহার্য। আসল সমস্যা এই যে, আমাদের সমাজে পারিবারিক কর্তব্য ও 'পাব্লিক ডিউটি'র ভিতর সীমারেখা অস্পষ্ট। ঐ ইংরেজী শব্দটির কোনো বাংলা প্রতিশব্দ মনে পড়ছে না। সামাজিক কর্তব্য বলতে তো আমরা সাধারণত পরিবার ও কুটুম্বদের প্রতি কর্তব্যই বুঝি। যৌথ পরিবার যদিও আজ অটুট নেই তবুও আমাদের মনের গভীরে যে-নীতিগুলি আমরা চিনি, যৌথ পরিবারের অতি প্রাচীন আধারেই তাদের সৃষ্টি। এসব নীতি আজ সর্বক্ষেত্রে পালিত না হলেও এরা সর্বজনপরিচিত। যৌথ পরিবারের নীতির সঙ্গে স্বজনপোষণের কোনো বিরোধ নেই। যে-নীতির ওপর দাঁড়িয়ে স্বজনপোষণের সমালোচনা সম্ভব, আমাদের কাছে সেটাই বিজাতীয়। আমরা যখন পরিবার ভেঙ্গে বেরিয়ে আসি তখনও প্রায়শ কোনো দল অথবা সমিতি আমাদের চিত্তে যৌথ পরিবারের স্থান গ্রহণ করে। উপরন্তু দলীয় আনুগত্যের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। যেহেতু যথার্থ সমাজবোধ আমাদের চিন্তায় অনুপস্থিত, অতএব দলীয় স্বার্থকে সামাজিক হিতের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা কঠিন হয় না ; এবং পারিবারিক স্বার্থের পিছনে ধাবিত হতে বিবেকজনিত যেটুকু অস্বস্তি বোধ করার সম্ভাবনা থাকে, দলীয় ব্যাপারে ততটুকুও থাকে না। দলীয়তার ঊর্ধ্বে স্বাধীন বিচার অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলে কোনো বস্তুর সঙ্গে আমাদের অধিকাংশেরই পরিচয় নেই।

মানুষকে বুঝতে হলে তার সমাজকে বুঝতে হয়। আগেই দেখেছি যে, আমাদের সনাতন সমাজের একটা বড় ভিত্তি ছিল যৌথ পরিবার। স্নেহ, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণ এই প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজসংহতির ভিত্তি এবং ধর্মের অঙ্গ হিসাবে আচারেরও একটি বিশিষ্ট স্থান অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া পরিবার ও সমাজকে অতিক্রম করে হিন্দুধর্মে ব্যক্তির এমন একটি নিঃসঙ্গ আত্মাকে স্বীকার করা হয়েছে যার মুক্তি সম্ভব ব্রহ্মের সঙ্গে যোগস্থাপনে।

হিন্দুর ধর্মে যেখানে মোক্ষের কথা বলা হয়েছে সেখানে সমাজসংসার গৌণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সেখানে সাক্ষাৎ সম্পর্ক। এটা আমাদের বৈশিষ্ট্য। ইহুদী ধর্মে ভগবান চুক্তি স্থাপন করেছেন একটা গোটা জাতি অথবা সমাজের সঙ্গে। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মে বহুলোকের মিলিত উপাসনার যেমন রীতি আছে, হিন্দুধর্মে তেমন নেই। হিন্দুর ভজন নিঃসঙ্গ সাধকের গান। খৃষ্টানের জন্য আছে সম্মিলিত ধর্মসঙ্গীত। ব্যতিক্রম দেখানো কঠিন নয় ; যেমন, কীর্তন। কিন্তু মোটের ওপর একটা পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না।

সত্য সম্বন্ধে ধারণাতেও একই প্রকার সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সব ধর্মেই সত্যকে বড় স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্য শ্রদ্ধেয় কেন ? যদি বলা হয় যে, সাধক ও ভগবানের ভিতর সত্যই যোগসূত্র তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাছে সত্য থাকবে এটাই প্রধান কথা হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যদি নিজেব কাছে সত্য না থাকে তো আত্মবিরোধ দেখা দেয় ; সেই অবস্থায় তার মুক্তি সম্ভব নয়। হিন্দুর কাছে এটাই প্রধান কথা। কিন্তু সত্যের আরও একটি গুণ আছে। সত্য এক ব্যক্তিকে অন্যের সঙ্গে আবদ্ধ করে, সত্য সমাজসংহতির ভিত্তি। সত্যকে বিসর্জন দিলে মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি থাকে না, অতএব সমাজ উৎসন্নে যায়। বাইবেলে যে-ধর্মের ব্যাখ্যা আছে তাতে এদিকটাকে বড় করা হয়েছে। ভগবানের দশটি প্রধান আজ্ঞার ভিতর একটি হল এই যে, প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে কখনও মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

হিন্দুর কাছে এটা অপেক্ষাকৃত সামান্য কথা মনে হবে। তার চেয়ে বড় অহিংসা, সংযম প্রভৃতি গুণের ব্যাখ্যা। এইসব গুণ আয়ত্ত করতে পারলে মিথ্যা সাক্ষ্যের মতো সামান্য ব্যাপার উল্লেখেরই প্রয়োজন হবে না। এই ধরনের কিছু চিন্তা আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখা ঠিক নয়। হিন্দুর কাছে অহিংসা, সংযম ইত্যাদি হল মূলত জিতেন্দ্রিয় হয়ে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, মোক্ষলাভের উপায়। বাইবেলের ধর্মে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যকে এমনই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যে, ভগবানের প্রধান আজ্ঞায় বারবারই এ বিষয়ে ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। পার্থক্যটা যদিও আপেক্ষিক তবুও এর গুরুত্ব আছে। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বাইবেলে যে-কথা আছে তার সঙ্গে তুলনীয় বাক্য মহাভারতেও পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব বাক্য যে আমাদের ঐতিহ্যে তেমন কেন্দ্রীয় স্থান লাভ করেনি যেমন করেছে স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শ, তার কারণ আমাদের মূল সুরটি অন্তর্মুখী। হিন্দু মনে মনে নিঃসঙ্গ।

এই বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজকে ধারণ করে ছিল প্রধানত আচার ও পারিবারিক বন্ধন। আমাদের প্রাচীনেরা মহানুভবতার মুহূর্তে বসুধাকে কুটুম্ব চিন্তা করেছেন। এটা আত্মীয়তাবোধের বিস্তৃতি হিসেবে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু অপরের প্রতি আমাদের কর্তব্য শুধু কুটুম্বতাবোধ দ্বারা নির্ণয় করা নিরাপদ নয়। কুটুম্বচিন্তায় ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারের প্রশ্নটা নগণ্য। মা সন্তানকে ভালোবাসেন সেটা মায়ের ধর্ম ব'লে,

সন্তানের অধিকার বলে নয়। স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসাকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজই চলে না। কিন্তু আধুনিক সমাজের পক্ষে এটা যথেষ্ট নয়। নাগরিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এমন বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় যাদের সঙ্গে তার কোনো আত্মীয়তার বন্ধন নেই। আধুনিক জীবনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তনশীলতা। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে অনাত্মীয় ও ভিন্ন রুচির মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-নীতিবোধ প্রয়োজন, প্রাচীন নীতিবোধের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য আছে।

আত্মীয় শব্দেরও অর্থে স্তরভেদ আছে। অনাত্মীয়ের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েই আত্মীয়তার উচ্চতর স্তরে ওঠা যায়। কথাটা তত্ত্বের আকারে বলা যাক। যেমন ব্যক্তির চেতনায় তেমনি সমাজজীবনের বিকাশে প্রেম ও যুক্তির একটা দ্বান্দ্বিক বিবর্তন লক্ষণীয়। প্রেমের দৃষ্টিতে সাধারণও বিশেষ হয়ে ওঠে। আমরা প্রত্যেকেই নিজের কাছে 'বিশেষ' ; প্রেম অপরকে নিজের অংশ করে তাকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আর যুক্তির স্বভাব হল বিশেষকে একটি সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা। যাকে আমরা অক্লেশে আত্মীয় বলে চিনি, তার প্রতি সদ্ভাবের জন্য যুক্তি প্রয়োজন হয় না। কিন্তু প্রতিবেশীর কাছে তুমি যে আচরণ আশা কর তার প্রতি তোমার আরচণও সেই রকম হওয়া উচিত, এই চিন্তায় মানুষ আদিম আত্মীয়তাবোধকে অতিক্রম করে প্রেম ও যুক্তির একটি নতুন সমন্বয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। মনে রাখা আবশ্যক যে, এই চিন্তারই একটি ধাপে যীশুখৃষ্ট 'প্রতিবেশী' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে অপরিচিতকেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। বৃহত্তর সমাজে পারস্পারিক কর্তব্য ও অধিকারের একটি নতুন ভিত্তি এইভাবে স্থাপিত হল।

আধুনিক জীবনের সাধারণ কাজকর্মে যে নীতিবোধ প্রয়োজন হয় তাতে অনেক সময় প্রেমের অংশটা প্রধান নয়, তাকে প্রাধান্য দেওয়া বিপজ্জনক। পরীক্ষার খাতা দেখার সময় পরীক্ষক যে নীতিবোধ থেকে নিরপেক্ষতা রক্ষা করেন তাতে সাধারণ অর্থে প্রেম অনুপস্থিত ; তার পরিবর্তে আছে ন্যায় ও মঙ্গলবোধ। অধিক গুণসম্পন্ন অপরিচিত ব্যক্তিকে চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেবার জন্য যে ন্যায় দৃষ্টি আবশ্যক, তাতে অপরিচিতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও প্রেমদৃষ্টির সঙ্গে সেটা অভিন্ন নয়।

প্রশ্নের আরও গভীরে যাওয়া যাক। আত্মীয় ও প্রতিবেশীর ভিতরে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। আত্মীয় আমাদের "অহং" থেকে পৃথক নয়। স্ত্রী যেমন স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, পুত্র যেমন পিতার প্রলম্বন, পরিবারও তেমনই আমিত্বের পরিবর্ধিত সংস্করণ। আত্মীয় সম্প্রসারিত অহং-এর অংশবিশেষ। প্রতিবেশী স্বতন্ত্র ব্যক্তি ; তাকে স্বতন্ত্র জেনেও তার সঙ্গে আমরা কল্যাণেরই বন্ধনে আবদ্ধ হই। আধুনিক সমাজে মানুষে মানুষে এটাই প্রতীক সম্পর্ক। অতএব এ যুগে সজ্জন হতে হলে, সদিচ্ছাব দ্বারা চালিত হতে হলে, স্বজনচিন্তার অধিক কিছু প্রয়োজন। "তুমিই সে" এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে হিন্দুধর্ম বিশ্বকে ব্যক্তির অন্তরাত্মায় স্থাপন করেছে। কিন্তু যাকে আমরা সম্পূর্ণ আপন করতে পারিনি, সেই অপর মানুষের প্রতিও আমাদের কর্তব্য আছে। এ বিষয়ে হিন্দুধর্মে আচার ভিন্ন কোনো কার্যকর নির্দেশের অভাব। প্রাচীন আচারে আমরা আজ শ্রদ্ধা হারিয়েছি। অথচ ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধে চিহ্নিত আধুনিক জীবনদর্শন এখনও আমাদের ধ্যানধারণায় প্রবেশ করেনি।

বলে রাখা ভালো যে, বিভিন্ন ধর্মে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব সমস্যা আছে। কিন্তু সেটা এখানে আলোচ্য নয়। আমাদের সমাজের সমস্যা নিয়েই এই প্রবন্ধের ভাবনা। আধুনিক যুগের উপযোগী নীতিবোধ

আমাদের ভিতর বিস্তার লাভ করেনি, অতএব প্রাচীন আত্মীয়-চিন্তার দুই বিপরীত মেরুর ভিতর আমরা আজও দোদুল্যমান। আমরা এক লাফে সমাজকে ডিঙিয়ে ভগবানের কাছে হাজির হই। যখন সংসারে ফিরে আসি তখন হয় স্বার্থবুদ্ধি, নয়তো স্বজনপোষণ নীতি দিয়ে চালিত হই। যে বৃহৎ সমাজবোধ অথবা বিবেক এ দুয়ের ভিতর সেতু রচনা করতে পারতো, আমাদের সংস্কৃতিতে আজ তার অস্তিত্ব প্রায় চোখে পড়ে না। এ ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে এতোই ব্যাপক যে, এর ব্যতিক্রম আমরা কদাচিৎ কল্পনা করি। কারও কাজ যদি আপাতদৃষ্টিতে নিঃস্বার্থ হয় তো অত্যন্ত গোপন উদ্দেশ্য কল্পনা করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আরও গভীর হয়। নয়তো তাঁকে আমরা সাধুসন্ত বানাই। মোট কথা, কোনো ব্যক্তি সংসারে থেকেও ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ন্যায়বুদ্ধি দ্বারা চালিত হতে পারেন, এটা সচরাচর আমাদের হিসেবের মধ্যে আসে না। কারণ নিজের চেতনার ভিতর এটা আমরা সহজে খুঁজে পাই না। অপরের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আত্মজ্ঞানেরই প্রতিফলন।

যেমন প্রাচীন আত্মীয়তাবোধে ভাঙন ধরলেও নতুন ন্যায়বোধ আমাদের ধ্যানধারণায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তেমনই পুরাতন আচারের ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন আচার আমাদের সমাজে এখনও গড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনাত্মীয়ের প্রতি আমাদের কর্তব্য পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন আচারের প্রয়োজন হয়। আচার বস্তুটির প্রতি আধুনিক মনে একটা বিরূপতা আছে। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। আচার সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢালে; ফলে পরিবর্তন কঠিন হয়। তবু ব্যক্তিগত জীবনে অভ্যাসের মতোই সমাজজীবনে আচারের একটা স্থান আছে। অভ্যাসের জোরে যেমন আমরা কিছু প্রয়োজনীয় কাজ অক্লেশে করি, আচারের গুণে তেমনই কতগুলি দায়িত্ব সহজে পালন করা যায়। দায়িত্ব পালনের সময় যদি প্রতিবার চিন্তা করতে হয় যে, এবার ওটা না করলেই নয় কি না, তা হলে কর্তব্যে অবহেলা করার পক্ষে কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না।

এই অবহেলা আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে। চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির কথা বলছি না। সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনাচারের কথা বলছি যার যোগফল বৃহৎ। আমাদের অনেকেই বাড়ীতে পূজাহ্নিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন, কিন্তু অফিসে আড্ডা দেন। বাড়ীতে যাঁরা এসব কিছুতে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও সচরাচর অপরের অনুষ্ঠানে বাধা দেন না; চক্ষুলজ্জাটা অবিশ্বাসীর। অফিসে যিনি কাজে বিশ্বাসী তিনি মনে মনে উত্যক্ত বোধ করলেও আড্ডায় বাধা দেন না; চক্ষুলজ্জাটা বিশ্বাসীর। অর্থাৎ, পুরনো আচারের জনমানসে একটা প্রতিষ্ঠা আছে; কিন্তু পরিবারের বাইরে দৈনন্দিন ক্রিয়াকাণ্ডে যেখানে আমরা অনাত্মীয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ, সেখানে কোনো কর্মভিত্তিক নীতি গণমানসে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেখানে ব্যক্তি হিসাবে আমাদের প্রত্যাশা আছে, অভিযোগ আছে, কিন্তু সমাজ হিসাবে আমাদের কোনো আচার নেই, অতএব অভিযোগ পূরণের কোনো সহজ ও নিয়মিত পথ নেই।

স্বজনপোষণের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তারপর বলেছিলাম ব্যক্তির অধিকারের কথা। সেটা আরও গোড়ার প্রশ্ন। তাই দিয়ে শেষ করছি। কর্তব্যবোধ ও অধিকারবোধের ভিতব যে নতুন সামঞ্জস্য নাগরসংস্কৃতিতে আবশ্যিক, আমাদের সমাজে সেটা এখনও অপরিচিত, অন্তত অনাদৃত। অনাত্মীয় নাগরিকের প্রতি কর্তব্যপালনে আমরা অভ্যস্ত নই; অতএব অনাত্মীয় ব্যক্তির অধিকারও এখানে উপেক্ষিত। ব্যক্তির

অধিকার আমরা বুঝি না, গ্রাহ্য করি না। পরিণামে অধিকারসংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসায় প্রাধান্য লাভ করে যুক্তির চেয়ে আদিম দুটি প্রবৃত্তি। আমরা দয়া বুঝি, আর বুঝি ভয়। যখন কিছু পেতে চাই, হাতজোড় করি—নয়তে মারমুখো হই। যখন কিছু দেবার প্রশ্ন ওঠে, কৃপা করি—অথবা গোলমাল এড়াবার জন্য দিই। ভয়ে আত্মসমর্পণ করি, তাকে বলি দরদ। যে বস্তুটি আজ আমাদের নেই তা হল মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড নেই, কারণ যে নীতি আমাদের সংস্কারের অঙ্গ, সেটা এ যুগের নয় ; যে নীতি এ যুগের যোগ্য, মনের গভীরে তাতে আমাদের বিশ্বাস নেই। আমাদের একটা বড় পটুত্ব আছে, সেটা হল কোনো প্রকারে বাঁচা। কোনো প্রকারে আমরা বাঁচছি, বাঁচবো ; তবে সেটা যুগের যোগ্য জীবন নিয়ে বাঁচা নয়।

কথাটা নৈরাশ্যবাদের মতো শোনাচ্ছে। তাহলে অন্যভাবে বলা যাক। আধুনিকতার একটা সদর্থ আছে ; সেই অর্থটি যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারব, সেটাই হবে এ যুগে আমাদের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার। কারণ রাজা উজীর কে এলেন গেলেন তাতে খুব যায় আসে না ; দেশের সংস্কারেরও পরিবর্তন চাই। আধুনিকতার যেটা গভীরতর অর্থ, যার কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি এবং যুক্তি, সেটাকে জেনে, তাকে গ্রহণ করে, তবেই তাকে সার্থকভাবে অতিক্রম করা সম্ভব। তার অভাবকেই বলব এ যুগের প্রকৃত অপসংস্কৃতি।

পঞ্চপ্রীতি

চীনের কম্যুনিস্ট নেতারা যখন দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের শেষে দেশ গড়বার কাজে অগ্রসর হলেন তখন তাঁরা চারটি বিষয়ে প্রীতির কথা বলেছিলেন। স্বদেশপ্রীতি, শ্রমের প্রতি প্রীতি, বিজ্ঞানপ্রীতি ও জাতীয় সম্পদের প্রতি প্রীতি, এই চারটিকে সেদিন তাঁরা সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন। (''Love for the fatherland and the people, love of labour, love of science, and taking care of public property shall be promoted as the public spirit of all the nationals of the Chinese People's Republic.'')

কম্যুনিস্ট চীনের চিন্তার এই অংশটি বিশেষ প্রশংসনীয়। এদেশের জাতীয়তাবাদীরাও এটিকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন। পঞ্চশীলের শোচনীয় পরিণতি সত্ত্বেও চীনের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আধুনিক শিল্পপ্রধান সমাজের ভিত্তিতে আছে শ্রম ও বিজ্ঞান। স্বদেশপ্রীতি যদি আমাদের চিত্তকে শ্রম ও বিজ্ঞানের দিকে চালিত না করে তো এযুগে স্বদেশপ্রেমও নিষ্ফল। আবার বহুলোকের শ্রমে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন জাতীয় সম্পদের প্রতি মমতা। উদ্ধৃত বাক্যটিতে তাই শ্রম ও বিজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠাকে মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে এবং তার দুই প্রান্তে প্রহরীরূপে স্থাপিত হয়েছে স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় সম্পদের প্রতি মমতা।

এই মূল্যবান সত্যটি এদেশে আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয় না। আমাদের ভিতর যাঁরা নিজেকে বিপ্লবী বলে পরিচয় দেন তাঁরাও ব্যক্তিগত জীবনে

জাগতিক ফললাভের জন্য শতপ্রকার দৈবশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাঁদের আচার বিচার সকলক্ষেত্রে বিজ্ঞানপ্রীতি দ্বারা আলোকিত নয়। হরিনাম উচ্চারণ মাত্র সমস্ত পাপ কাটে কি না জানি না ; কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বৈপ্লবিক ধ্বনিবিশেষ উচ্চারণ দ্বারা মনের অন্ধ তামসিকতা কাটে না।

এদেশের মানুষ পাশ্চাত্ত্য সমাজে অনেক দোষ দেখেন। কিন্তু এইসব দোষ জাগতিক উন্নতির পথে তেমন বাধা নয়। অপরপক্ষে পাশ্চাত্ত্য দেশের দুটি গুণ উল্লেখযোগ্য, কঠিন শ্রমের অভ্যাস ও বিজ্ঞানের প্রচণ্ড শক্তিতে বিশ্বাস। এই দুটি গুণ বাদে প্রগতিশীলতার বিচার অর্থহীন।

এদেশে সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধেও একই প্রকার বিচার প্রয়োজন। যে আন্দোলনের ফলে শ্রমের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় অথবা বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রসারিত হয় তাকেই প্রগতিশীল আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। জাতিভেদের প্রভাবে আমরা কর্মের নানা ছোট ছোট ভেদকে মিথ্যা মর্যাদার প্রশ্ন করে তুলেছি। আবার এদেশের জলবায়ুর গুণে একটা আলস্যভাব আমাদের অনেকেরই স্বভাবসিদ্ধ। এই আলস্যপ্রিয়তাকে যদি আমরা সঙ্ঘশক্তি দ্বারা একটা মৌলিক অধিকারে পরিণত করতে উদ্যত হই তবে সেই সঙ্ঘশক্তিও দেশের উন্নতির সহায়ক হয় না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দুটি ধরন আছে। আমরা যখন নিজের কর্তব্যে হেলা করি এবং সেই অবহেলাকে নিজের বিবেকের কাছে মার্জনীয় ও অপরের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য চারিদিকে অন্য সকলের বাস্তব ও কল্পিত অন্যায় সম্বন্ধে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠি, তখন সেই পরনিন্দামুখরতা একপ্রকার আলস্যবিলাসের মুখোস মাত্র হয়ে ওঠে। আমরা যখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য যথাসম্ভব পালন করে তবেই অপরের সমালোচনা করি, তখন সেই সমালোচনা প্রশংসার যোগ্য হয়।

আমাদের মধ্যবিত্তের জীবন সাধারণভাবে ঔদাসীন্য ও সাময়িক উত্তেজনার ভিতর আবর্তিত। পারিবারিক ও দলীয় কলহ আমাদের মাঝে মাঝে চঞ্চল করে তোলে, নয় তো আমরা ঝিমিয়ে চলি। বৃহত্তর জাতীয় প্রশ্নের আলোচনাতেও আমাদের মনের এই ধর্ম লক্ষ করা যায়। বিশেষ কোনো শিল্পে অথবা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রের পরিচালনা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় কি না এই প্রশ্নটা আমরা যেমন উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা করি রাষ্ট্রীয়করণের পরে সেখানে কর্মের গতি দ্রুত হল কিনা তাতে আমাদের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। অথচ দেশের উন্নতি অথবা অধোগতির পক্ষে এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী।

এদেশে শ্রম-ও-বিজ্ঞানবিমুখতাকে অনেকে অন্যায় সমাজব্যবস্থার ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। এই ব্যাখ্যা অংশত সত্য। কিন্তু সমাজব্যবস্থা প্রথমে সকল প্রকার অন্যায় থেকে মুক্ত হবে তারপর দেশের মানুষ শ্রম ও বিজ্ঞানে উন্মুখ হবে এমন হয় না। আধুনিক জাপান উনিশ শতকের শেষভাগে স্বদেশের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শ্রম ও বিজ্ঞানে অনুরক্ত হয়ে ওঠে, যদিও সেই সমাজে সেদিন অন্যায়ের অভাব ছিল না। যদি উন্নতি চাই তবে শ্রমনিষ্ঠা, বিজ্ঞানের বিকাশ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন একই সঙ্গে আবশ্যক। যে-জাতি ওঠে, সে এইভাবেই ওঠে।

স্বদেশপ্রীতিও কখনও বিদেশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমাত্র হয়ে ওঠে। প্রীতিরও বিকার ঘটে যখন একটি বৃহত্তর বিদ্বেষের বিষে সে জর্জরিত হয়। শ্রম ও বিজ্ঞান তখন হিংসার দাসে পরিণত হয়। আদর্শনিষ্ঠা ও ক্ষমতালিপ্সা তখন একাকার হয়ে যায়। আধুনিক জাপানের ইতিহাসে এর উদাহরণ আছে। আজকের চীনও এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। অসহিষ্ণুতায়

আমাদের দৃষ্টি একপ্রকার ভ্রান্ত স্বচ্ছতা লাভ করে। এই অন্ধ স্বচ্ছতার চেয়ে দ্বিধা ও সন্দেহের কুয়াশাও ভালো।

এই বিকারের কবল থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হলে অপর চারটি খণ্ডপ্রীতিকে একটি বৃহত্তর প্রীতির সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। এই বৃহত্তর প্রীতির সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। সমাজ ও রাজনীতিতে এর প্রকাশ মানবতা ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগে।

এই পঞ্চপ্রীতির আশ্রয় ছাড়া আমাদের স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলবার কোনো আশা নেই। আজ যখন বিদ্বেষের রাজনীতি বিপুল আকার ধারণ করেছে তখন এই আড়ম্বরহীন মৌল সত্যটি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ করা কর্তব্য।

ধর্ম, যুক্তিবাদ ও স্বাধীন সমাজ

১

বিজ্ঞানের প্রগতির পথে ধর্ম প্রতিবন্ধক, এমন একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। কথাটার সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণও আছে। গ্যালিলিওকে ধর্মযাজকদের হাতে নিগ্রহ স্বীকার করতে হয়েছিল। জীব হিসাবে মানুষের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ডারউইনের মত খৃষ্টধর্ম সহজে মানতে চায়নি। নতুন সত্যের পথে কুসংস্কার বারবারই বাধা হয়েছে। এ সবই স্বীকার্য। তবু ধর্মের প্রতিবন্ধকতাকে খুব বড় করে দেখাবার আগে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের অন্য দিকটার প্রতিও একটু নজর দেওয়া উচিত। মধ্যযুগের শেষভাগে বিজ্ঞানচর্চা ইয়োরোপে নতুন করে শুরু হয় ধর্মের ছায়াতে ; ধর্ম প্রতিষ্ঠানের ধার ঘেঁষে এই নতুন প্রয়াস বেড়ে ওঠে। চার্চের আওতা থেকেই খৃষ্টীয় তের শতকে রোজার বেকন গণিত ও জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার মহত্ত্ব ঘোষণা করেন। সেই থেকে আজ অবধি বহু বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাসী। ধার্মিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঈশ্বরের নিজের হাতে লেখা বই,তাই এর সূত্রোদ্ধার মহৎ কাজ।

ধর্মকে কেন্দ্র করে বহু কুসংস্কার জমে ওঠে। বিজ্ঞানের প্রগতির পথে তারা বাধা হয়। সে বাধা অতিক্রম করেও বিজ্ঞান এগিয়ে চলে। আর কুসংস্কারকে ছাড়িয়েও ধর্মের বাণীর কিছু অর্থ হয় তো অবশিষ্ট থাকে। থাকে কিনা সে কথা পরে বিবেচ্য। তার আগে অন্য একটি প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞানের প্রগতি অন্ধবিশ্বাসে বাধা পেয়েছে, এটাই ধর্মান্ধতার একমাত্র বিপদ নয়। তার চেয়েও বড় বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য পথে। ধর্মান্ধতার তিক্ততম ফল সাম্প্রদায়িক বিরোধ।

উদাহরণ দিয়ে কথাটা বোঝান সহজ। ষোড়শ শতকে জার্মানী ছিল শিল্পে-বাণিজ্যে-সংস্কৃতিতে ইয়োরোপের অগ্রগণ্য দেশগুলির অন্যতম। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের তুলনায় জার্মানীকেই অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশ বলে ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন। অথচ আরও এক শতাব্দী পরে জার্মানী ইয়োরোপের একটি পিছিয়ে-পড়া দেশ। এর প্রধান কারণটি লক্ষ করবার মত। সতের শতকে ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ভিতর যে রক্তাক্ত সংগ্রাম শুরু হয় তারই সাংঘাতিক পরিণতি হিসেবে জার্মানী

বহুকালের জন্য কি-রাজনীতি, কি-অর্থনীতি, কি-সংস্কৃতি, জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। এর বিষময় ফল পৃথিবীকে বিশ শতক পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে।

সতের শতকে অবশ্য শুধু জার্মানীতেই নয়, ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশেই সমাজজীবন সাম্প্রদায়িক বিরোধে আলোড়িত হয়ে ওঠে, আর বহু দেশই এর ফলে অল্পবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু রক্তক্ষয়ের ভিতর দিয়ে একথাটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরধর্মসহিষ্ণুতা ছাড়া সুস্থ সমাজজীবন সম্ভব নয়। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। কথাটা আর-একভাবে ধরা যাক। শোনা যায় মানুষ বাস্তব স্বার্থ দিয়ে পরিচালিত। স্বার্থসিদ্ধির কিন্তু দুটো পথ আছে; একটাকে বলা যায় বিরোধ অথবা দস্যুবৃত্তির পথ, অর্থাৎ পরস্বাপহরণ বা অপরের ক্ষতি সাধন করে নিজের লাভ; অন্যটি সহযোগিতার পথ, অর্থাৎ সহযোগিতায় সকলের উন্নতি। বিরোধ ও সহযোগিতার ভিতর কোন পথটা মানুষ বেছে নেবে সেটা শুধু 'বাস্তব' অবস্থা দিয়েই নির্ধারিত হয় না: ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মানসিকতার উপরও সেটা নির্ভর করে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে যখন আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠি তখন বিরোধের পথকেই একমাত্র পথ বলে মনে হয়। হিন্দু-আমি ভাবি মুসলমানকে নিধন করেই আমার জয় সম্ভব; মুসলমান-আমি ভাবি হিন্দুকে বধ করে আমার জয়। হিন্দু মুসলমানে যুক্ত প্রয়াসের ভিতর দিয়ে যে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরই স্বার্থসিদ্ধির আরও একটা পথ খোলা আছে সাময়িকভাবে সে কথাটা আমরা বিস্মৃত হই। দেশ বিভক্ত হয়।

সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে অস্বীকার করে আধুনিক যুক্তিবাদের উদ্ভব। যুক্তিবাদী নীতির বিচারে এটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ব্যক্তির চরম আনুগত্য কোনো গোষ্ঠিবিশেষের প্রতি নয়, বরং নিজের প্রতি; এবং যেহেতু মানুষে মানুষে সহযোগিতার ভিতর দিয়েই ব্যক্তির স্বার্থ-সিদ্ধি সম্ভব অতএব সামাজিক সহযোগিতা যুক্তিবাদীর কাম্য। সামাজিক সহযোগিতার অন্বেষণে যুক্তিবাদীর দৃষ্টি কোনো জাতি অথবা সম্প্রদায়বিশেষের পরিধিতে আবদ্ধ নয়; বরং নানাভাবে নানা পথে মানুষের সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করাই তাঁর লক্ষ্য। আঠার-উনিশ শতকের বহু যুক্তিবাদী তাই নিজেদের পরিচয় দিতেন 'মানবতার বন্ধু" বলে। যথাসম্ভব বেশী লোকের যথাসম্ভব বেশী সুখই কাম্য, বেন্থামের এই উক্তিতে সেদিনকার যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে।

সম্প্রদায়সর্বস্ব ব্যক্তি বলবেন, সম্প্রদায়ের জন্য মৃত্যু বরণও শ্রেয়। যুক্তিবাদী এতে শংকিত বোধ করবেন। তাঁর মতে এ ধরনের আত্মত্যাগী মনোভাব বিপজ্জনক। ধর্মরোষ অথবা আদর্শবাদী উৎসাহের আতিশয্য নিয়ে সুস্থ সমাজ চলে না। ববং সাধারণ মানুষ স্বার্থান্বেষণ করবে লাভক্ষতি গণনা করে, যুক্তিবিচারের সাহায্যে, এটাই সমাজজীবনের পক্ষে অধিক নিরাপদ। বিচার-বিবেচনা করে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্কে আবদ্ধ হবে, এতেই সকলের মঙ্গল। ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে নয়, বরং স্বার্থকে আশ্রয় করে যে সহযোগিতা, মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের কঠিন মাটিতে যার মূল, সেই সহযোগিতাই নির্ভরযোগ্য।

এ ধরনের যুক্তিবাদী দর্শনের লাভক্ষতির অর্থটাও একই সুরে বাঁধা। অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতিটা ধর্মীয় উৎসাহে কেউ শ্রেয় বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু শ্রেয়ের এমন সংজ্ঞা নিয়ে দুই বিরোধী দল কাজে নামলে সাধারণ জীবন বিপর্যস্ত হবারই সম্ভাবনা। যা-কিছুতে জীবনে আরাম বাড়ে সহজ দৃষ্টিতে তাতেই লাভ; যাতে ক্লেশ বৃদ্ধি পায় তাতে ক্ষতি। এই আটপৌরে সংজ্ঞাটাই বেন্থামী যুক্তিবাদীরা মেনে নিলেন। স্বার্থান্বেষণ মানেই হল আরামের অন্বেষণ। রাষ্ট্র, জাতি বা ধর্মের জন্য আত্মত্যাগে আকুল না হয়ে মানুষ যদি

বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে সুখের অন্বেষণ করে তা হলেই সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা বেশী। সমাজজীবনের ছোট বড় সব সমস্যার আলোচনাতে এই দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রয়োজন। করের বোঝা গরীবের চেয়ে ধনীর উপরই বেশী পড়বে কিনা, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার স্বীকার্য কিনা এবং কোন্ অবস্থায় স্বীকার্য, মৃত্যুদণ্ড উঠিয়ে দেওয়া উচিত কিনা, এইসব প্রশ্নের সমাধানে একমাত্র বিবেচ্য এতে মোটের উপর সমাজে সুখের ভাগটা বাড়বে, না অসুখের ভাগটা।

সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা ও ধর্মান্ধতার স্থানে এমনি করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যুক্তিপন্থী, সুখবাদ এলো গণতান্ত্রিক জীবনের ভিত্তি রচনার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

২

কিন্তু সুখবাদী দর্শনে জীবন চলে না।

নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালে জীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগটাই বড় মনে হতে পারে—গৌতম বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বহুলোকেরই তাই মনে হয়েছে ; অতএব যুক্তিবাদী দর্শন অনুযায়ী আত্মহত্যাই কেন শ্রেয় হবে না ? আসক্তিহীন মন নিয়ে গণনা করলে সন্তান প্রসব ও পালনে ক্লেশের ভাগটা এতোই বড় যে, কোনো যুক্তিবাদী রমণীর পক্ষে জননী হতে চাওয়াটা স্বাভাবিক নয়। সন্তানকে জননী ভালোবাসেন বলেই সন্তান পালনের ক্লেশও রমণীয়। এখানে সুখ অসুখের হিসাবটা আগে নয়, ভালোবাসাটাই আগে। এই অযৌক্তিক ভালোবাসার প্রভাবেই সাধারণ দৃষ্টিতে যা ক্লেশ তাও সুখদায়ক হয়ে ওঠে। যা কিছু কঠিন সাধনায় লভ্য তার বেলাতেই এই একই কথা সত্য। আহার-নিদ্রার মত সুখকর বস্তু ত্যাগ করে পণ্ডিত কেন পুঁথি নিয়ে পড়ে থাকেন তা পণ্ডিতের মূর্খ ভৃত্যের কেন, পত্নীরও প্রায়ই বোধগম্য হয় না। এবং অনুগত পুরাতন ভৃত্য পণ্ডিতের সেবায় কেন ক্লেশ স্বীকার করে তা যুক্তিবাদী পণ্ডিতের বোধগম্য হবার কথা নয়। সুখ-অসুখের হিসাব মিলিয়ে যিনি জীবনযাপন করতে চাইবেন জীবনধারণ তার কাছে শীঘ্রই একটা বিড়ম্বনা স্বরূপ দেখা দেবে।

নৈতিক মূল্যবোধকেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখবাদের ভিত্তিতে দাঁড় করান কঠিন। সত্য কথা বলা কর্তব্য—কিন্তু কেন ? সুখবাদী বলবেন, সকলে মিথ্যাভাষণে অভ্যস্ত হলে সমাজজীবন অসম্ভব হয়ে ওঠে, এতে সকলেরই ক্ষতি ; কাজেই প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার জন্য সকলেরই সত্য কথা বলা কর্তব্য। কিন্তু যুক্তিবাদী ব্যক্তিবিশেষ ভাবতে পারেন, 'অন্য সকলে সত্য বলুন, আর প্রয়োজনমত আমি পরম সাবধানে মিথ্যা বলি ; এতেই আমার সর্বাধিক সুখ।' কর্তব্যপালনের সকল ক্ষেত্রেই এই একই কথা। কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব যদি স্বীকৃত না হয় তবে অপরের কর্তব্যচ্যুতিতে তারস্বরে প্রতিবাদ এবং নিজের কর্তব্যচ্যুতি যথাসম্ভব গোপন করার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ হয়ে ওঠে।

সুখবাদী দর্শনে তাই সমাজে নীতিবোধ জাগিয়ে রাখা কঠিন। সামাজিক ভাঙ্গাগড়ার যুগে এ বিপদ বিশেষ বড় আকারে দেখা দেয়। আজকের বাংলা দেশের দিকে তাকালে বিপদটা স্পষ্ট চোখে পড়ে। শিল্পোন্নয়নের যুগে বহু প্রাচীন অবস্থাপন্ন পরিবার তলিয়ে যায়, আবার বহু তলাকার মানুষ ওপরে ওঠে। বিত্ত বণ্টনের এই ওলটপালটে বহু লোকই নিজেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত বোধ করে। প্রাচীন সমাজের অসাম্য প্রাচীনত্বের মহিমায় যদি-বা সহনীয় নতুন বিত্তবানদের অধিকাংশের চোখেই অসহনীয়। বিশেষ বিশেষ

পরিস্থিতিতে এই সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেখানে গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের যোগ্যতর ব্যক্তির জন্যও উন্নতির দ্বার রাজনীতিক বা সামাজিক কারণে রুদ্ধ সেখানে সংঘর্ষও তিক্ততর। কিন্তু সংঘর্ষ সম্পূর্ণ এড়ানো যায় না, অসন্তোষ অনিবার্য। ইতিহাসে এমন কোনো দেশের নজীর আজও নেই যেখানে সামাজিক ও আর্থিক রূপান্তরের যুগে অশান্তি ও অবিচারবোধ পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। এই অবিচারবোধের সঙ্গে প্রায়শ যোগ হয় সব কিছুতে একটা অশ্রদ্ধার ভাব। যাদের আমরা মনে মনে অবজ্ঞা করি তাদেরই কৃপার উপর যখন নির্ভর করতে হয়, পিতা ও পুত্রের মূল্যবোধে যখন প্রভেদ দুস্তর হয়ে ওঠে, জীবনযাত্রার বহুমুখী পরিবর্তনের ধারায় নব নব অভাববোধ যখন অর্থাগমের চেয়ে দ্রুত বেড়ে চলে, তখন অসন্তোষ ও অশ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই সুদূরপ্রসারী অসন্তোষ ও শ্রদ্ধাহীনতার ভিতর ব্যক্তির মনে কর্তব্যবোধ জাগিয়ে রাখা কঠিন। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুখবাদ এ অবস্থায় সমাজ সংগঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। নিজের কর্তব্য করে তবেই আমরা অপরকে সমালোচনা করবার অধিকারী হই, একথা শুধু সুখবাদকে আশ্রয় করে জোরের সঙ্গে বলা যায় না অথচ এ কথাটা একেবারে উপেক্ষা করেও সমাজসংগঠন সম্ভব নয়। ইংল্যাণ্ডে শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগের মানসমণ্ডল তাই গঠিত হয়নি শুধু স্বেচ্ছামী সুখবাদে; তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ব্যাপক আদর্শবাদী ধর্ম আন্দোলন। এই ধর্ম আন্দোলনে দুটি বস্তুর উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল; পরমতসহিষ্ণুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা। ইংল্যাণ্ডের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাসে এই আন্দোলনের অবদান অল্প নয়।[১]

সামাজিক ভাঙ্গাগড়ার যুগে সমাজসংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার অপর এক পথও চোখে পড়ে। সুখবাদে হতাশ হয়ে সমাজসংগঠনের দৃঢ়তর ভিত্তির সন্ধানে উৎকণ্ঠিত দেশ ঝুঁকে পড়ে উগ্রজাতীয়তাবাদ আর রাষ্ট্রপূজার দিকে। যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের দুর্বল বাধা উপেক্ষার সঙ্গে সরিয়ে দিয়ে মধ্যযুগের ঈশ্বরের আসনে এসে বসেন নতুন যুগের রাষ্ট্র—ধর্মান্ধতার আর এক ভয়াবহ নতুন সংস্করণ।

গোড়াকার প্রশ্নে আবার ফিরে আসা যাক। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কার্যকরী এমন কি কথা আছে যা যুক্তি বা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ (বা খণ্ডন) করা সম্ভব নয়, যাকে কুসংস্কার বলেও ত্যাগ করা চলে না, বরং জীবনকে যা ধারণ করে আর স্বাধীন সমাজ সংগঠনের ভিত্তিতে যাকে স্থান দিতে হয়? কিছু কি আছে?

জীব হিসাবে সুখ আমাদের কাম্য, দুঃখ অনভিপ্রেত। এই জৈবিক প্রেরণাকে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। এই প্রেরণা জীবন থেকে লুপ্ত হলে সাধারণ মানুষের কর্মে উদ্দীপনা থাকবে না। কিন্তু সুখ দুঃখের গণনা করেও বাঁচবার কোনো তীব্র বাসনা অবশিষ্ট থাকে না। সাধারণ মানুষ এমন কোনো গণনা করতে বসে না বলেই বহু দুঃখের ভিতরও সে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করে যায়। যুক্তিকে অতিক্রম করেও জীবনের প্রতি আমাদের একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে। এই অন্ধ আকর্ষণের জায়গায় সুখদুঃখের যুক্তিবাদী গণনামাত্রকে অধিষ্ঠিত করলে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতই জীবন ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। মানুষের চেতনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন যুক্তিনির্ভরতা বাড়ে অন্যদিকে তেমনই প্রয়োজন হয় জীবনের প্রতি আদিম অন্ধ আকর্ষণকে যুক্তির অতীত এক অহেতুক জীবনপ্রেমে পরিণত করবার। এই অহেতুক প্রেমের দৃষ্টিতে সুখ দুঃখ সমান

রমণীয়—সাহিত্য পাঠকের নির্লিপ্ত অথচ দরদী দৃষ্টিতে যেমন মিলন ও বিরহ উভয়ই মধুর। ভক্তের ভাষায়, সবই তাঁর লীলা। ভাষা নিয়ে কলহ সম্ভব। কিন্তু জীবনের প্রয়োজন বিচিত্র ! আমরা সুখ চাই, দুঃখ চাই না ; আবার সুখে-দুঃখে মিলিয়ে জীবনকে অকারণে শিশুর মত ভালোবাসতে চাই—তা যদি না পারি তো সমস্ত জীবনই তিক্ত হয়ে ওঠে। আপাত বিপরীতের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ এই সত্যটাকে সুখবাদী দর্শনে স্থান দিতে হলে সুখের অর্থ পালটে যায়।

কর্তব্যের বিচারেও ধরা পড়ে স্বার্থ ও পরার্থের একটা অনুরূপ দ্বৈতাদ্বৈত বিচিত্র সমন্বয়।

জৈব প্রকৃতিতে স্বজাতির সঙ্গে একটি সহজাত বন্ধনবোধ আছে। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আমরা স্বতন্ত্র মানুষ বলে ক্রমশ আবিষ্কার করি, আত্মসচেতন হই। এখানেই একটা নতুন দ্বন্দ্বের শুরু। পরার্থ যতদিন শুধুই পরার্থ ততদিন পরার্থে আত্মত্যাগ অর্থহীন। যুক্তিবাদী বোঝাতে চেষ্টা করেন, তুমি অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করলে তবেই অপরে তোমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে ; অতএব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই পরার্থে কর্ম প্রয়োজন। কিন্তু এমনতর যুক্তিতে কাজ ভালো এগোয় না। মনে মনে সারাক্ষণই সন্দেহ থেকে যায় যে, অপরে আমার জন্য তেমন কিছুই করছে না, আমিই অপরের জন্য খেটে মরছি। সমাজ আমার কাছ থেকে কাজটি আদায় করে, মূল্যটি পুরো দিচ্ছে না। আমাদের কর্তব্যবুদ্ধির পিছনে এই যুক্তিবাদী স্বার্থবুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। তা নইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকে, আর প্রবঞ্চিত হবার সম্ভাবনাটাও মিথ্যা নয়। কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিকে যে অতিক্রম করতে পারেনি কর্তব্যমাত্রই তার কাছে ক্লেশ ; আর দিনানুদৈনিক প্রতিটি কর্তব্য যার কাছে অবাঞ্ছিত বোঝা মাত্র, স্বার্থবুদ্ধির মারে জীবনের স্বাদ থেকেই সে বঞ্চিত। আবারও আমাদের যুক্তিবাদকে অতিক্রম করতে হয়।

এই সমন্বয়পন্থী ত্রিভঙ্গী দর্শন আদর্শবাদী মনে হতে পারে, সাধারণ লাভক্ষতি হিসেবের পথ ধরে এখানে পৌঁছা কঠিন। কিন্তু একবার যখন আমরা এখানে পৌঁচেছি তখনই একথাও স্পষ্ট জেনেছি যে, জীবনে এর প্রয়োজন জীবনেরই দায়ে অস্তিত্বকে সহনীয় করবার জন্য। আর তাই কোনো সুদূর স্বর্গলোকে নয়, দূর ভবিষ্যতে কোনো সর্বাঙ্গসুন্দর সমাজে নয়, আজকের এই অসম্পূর্ণ, অসুন্দর, অবিচারপীড়িত পৃথিবীতেই আমাদের চেষ্টা করতে হয় যেন সুখের অন্বেষণে আশা হতাশার মাঝখানে সুখে-দুঃখে মণ্ডিত জীবনকে অকারণে ভালোবাসতে পারি ; যেন কর্তব্যসাধনের পথে সংসারের সঙ্গে আমাদের কর্মের যোগ আনন্দের সঙ্গে অনুভব করতে পারি। কঠিন এ প্রয়াস, কঠিনতম সিদ্ধি ; কিন্তু এ ভিন্ন জীবন বিস্বাদ, বিরস। হিংসার মত্ততায় অথবা পরলোকের মিথ্যা আশ্বাসে এই বিরসতাকে সাময়িকভাবে ভুলে থাকা যায়। সভ্যতার রোগ নির্ণয় করতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেছিলেন যে, যুক্তি ও নীতির ধমকে হিংসা বাইরের বিশ্ব থেকে পিছিয়ে এসে অন্তর্মুখী হয় ; আত্মনিপীড়নই সভ্যতার ব্যাধি। কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় আরও জটিল। বাইরের শত্রুকে নিয়ে আমাদের মাতামাতি যখন মন্থর হয়ে আসে তখন আমাদের সামনে যে প্রশ্নটা মৃত্যুর সমান মুখব্যাদান করে দাঁড়ায় তা হল এই, জীবনের অর্থ কি ? অগত্যা স্বীকার করতে হয়, জীবনের অর্থ অর্থহীন জীবনপ্রেমে। সে প্রেম যুক্তিতে ধৃত নয়, যুক্তিবিরোধীও নয়।

সনাতন ও আধুনিক

আমাদের অহংকার, আমরা অত্যন্ত সহনশীল জাতি। এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু এর স্বপক্ষে অতি পরিচিত যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করব না ; কারণ এতে আমাদের তেলে মাথাকে আরও তৈলাক্ত করা হবে মাত্র। আপাতত আমার বক্তব্য ভিন্ন, যদিও অনুমান করি যে এই ভিন্ন বক্তব্যটিকেও অনেকেই উল্লিখিত সনাতন সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচনা করতে বিলম্ব করবেন না।

আমাদের চিন্তা ও ধর্মচেতনার একটা বড় দুর্বলতা এই যে, আমরা সংশয়কে জোরের সঙ্গে অনুভব করতে অভ্যস্ত নই। যত মত তত পথ একথা যদি সত্য হয় তবু মনে রাখা ভালো যে, একই ব্যক্তি যদি একাধিক মত ও পথ একই সঙ্গে অবলম্বন করেন তবে সন্দেহ করবার কিছুটা কারণ ঘটে যে এর কোনোটিকেই তিনি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেননি। রামকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্র ও লেনিনকে যিনি একই মুহূর্তে গ্রহণ করেন তিনি সম্ভবত এঁদের কারও প্রতি সুবিচার করছেন না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বিবেকানন্দের মত লেনিনের (এবং লেনিনের মত বিবেকানন্দের) কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। বিভিন্ন মতেই সত্যের ভগ্নাংশ আছে বটে। কিন্তু কোন্ মতে কতটুকু সত্য আছে তারও বিচার প্রয়োজন। যে-খণ্ডসত্য মতবিশেষে বিধৃত তার সীমা নির্ধারণ করেই তাকে সঠিক জানা যায়। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে ধর্ম নতুন রূপ ধারণ করেছে। মানুষের চেতনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব সংশয়ের ভিতর দিয়ে ধর্মের সত্য নতুনভাবে উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মের যদি কোনো সম্পূর্ণ কালোত্তীর্ণ সার থাকে তবে তা সম্ভবত অনুচ্চার্য। উচ্চারিত ধর্মকে যুগ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা ভুল ; কারণ তাতে জীবনের প্রয়োজন থেকেই তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

১

ধর্মের সত্য যখন একই বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে তখনও যুগভেদে সেই বাক্যের অর্থে পৌঁছবার পথ বদলে গেছে, অতএব তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যেরও পরিবর্তন ঘটেছে। উদাহরণত পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসের একটি অধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বিশ্বাসই মুক্তির পথ, এটা ধর্মের একটি প্রাচীন কথা। আধুনিক যুগ শুরু হবার আগে কথাটার একটা সরল অর্থ ছিল। সন্তান যেমন নিশ্চিন্তে পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল, মানুষের পক্ষে তেমনই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সেদিন কঠিন ছিল না। আধুনিক যুগের গোড়াতেই যুক্তি ও বিশ্বাসের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হল।

এই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে গিয়ে বহু মানুষ একটি সিদ্ধান্তে নানাভাবে ফিরে এসেছেন। সিদ্ধান্তটি এই যে, ধর্মের যেটুকু গ্রহণীয় তা যুক্তির অতীত, কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ নয়। যেমন খৃষ্টীয় তের শতকে সেণ্ট টমাস একুইনাস বললেন যে, খৃষ্ট ধর্মের সত্য যদিও সাধারণ যুক্তিকে অতিক্রম করে যায় তবু যুক্তির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই ("although the truth of the Christian faith surpasses the capacity of the reason, nevertheless that truth which the human reason is naturally endowed to know cannot be opposed to the truth of the Christian faith")। এমনি করে যুক্তি ও

বিশ্বাসের ভিতর সন্ধি স্থাপিত হল। বলা বাহুল্য যে, প্রাচীন বিশ্বাসের সঙ্গে এই নতুন ধারণা সমার্থক নয়।

কিন্তু এখানেও সমস্যার সর্বসম্মত সমাধান পাওয়া গেল না। তর্কের অবকাশ রইল। আমরা সংসারে প্রতিনিয়ত দেখছি যে, নির্দোষ মানুষ নিগ্রহ ভোগ করছে। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সঙ্গে সংসারের এইসব প্রত্যক্ষ অন্যায়কে কিছুতেই সাধারণ যুক্তি দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করা যায় না। ভগবান কাকে যে কৃপা করবেন আর কাকে করবেন না তার কোনো ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না। ষোড়শ শতকে এরাসমুসের সঙ্গে তর্কে যুক্তি ও বিশ্বাসের সন্ধিতে অনাস্থা জানিয়ে প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের নেতা লুথার বললেন : "Common sense and natural reason are highly offended that God by his mere will deserts, hardens and damns. There is no use trying to get away from this by ingenious distinctions." শুধু সৎকার্যের পুরস্কারস্বরূপ ঈশ্বরের করুণা লাভের আশা ত্যাগ করাই উচিত। মানুষের যুক্তির পথ ধরে ভগবানের ইচ্ছা চলে না। অতএব অহেতুক বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই মুক্তির ইঙ্গিত আসে।

হঠাৎ মনে হতে পারে যে, আমরা প্রাচীন যুক্তিবিহীন বিশ্বাসেই আবার ফিরে এলাম। কিন্তু যে ঐতিহাসিক পরিক্রমার ভিতর দিয়ে এই প্রত্যাবর্তন তারই ফলে এই নতুন সিদ্ধান্তের ভাবার্থও ভিন্ন। যে-যুক্তির সাহায্যে লুথার যুক্তি থেকে বিশ্বাসকে বিচ্ছিন্ন করলেন তারই জের টেনে আবার ঈশ্বরকেই বিশ্বাস থেকে বাদ দেওয়া সম্ভব। ভগবান সর্বশক্তিমান অথচ ন্যায়বোধহীন একথা অবিশ্বাস্য ; অতএব ঈশ্বর নেই।

তারপরও জীবনে বিশ্বাসের স্থান থাকে। ব্যারট্র্যাণ্ড রাসেল বাল্যে পিউরিট্যান ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান এবং অবশেষে এই প্রত্যয়ে আসেন যে করুণাই ধর্ম : "The thing I mean is love, Christian love, or compassion....If you have this, you have all that anybody should need in the way of religion." ("Science and Value")[২] ঈশ্বর যদি নাও থাকেন তবু মানুষের প্রতি প্রেম অথবা করুণা রক্ষা করেই মানুষের মুক্তি সম্ভব।

ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতনই এই করুণা যুক্তিকে অতিক্রম ক'রে যায়, যদিও যুক্তির সঙ্গে এর বিরোধ নেই। সংশয়বাদী রাসেল ইতিহাসের একটি দীর্ঘ অধ্যায়কে ব্যক্তিগত জীবনে অতিক্রম করেন।

আমরা নিঃসংশয়ে মাতৃপূজা থেকে নাস্তিক্য পর্যন্ত সবই গ্রহণ করেছি। ফলে আমাদের চিন্তা গতিহীন হয়ে পড়েছে।

২

গীতায় ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের উপদেশ আছে। এই উপদেশের একটা গভীর তাৎপর্য আছে সন্দেহ নেই। কোনো বিশেষ ফললাভ অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধি যে-ভালোবাসার উদ্দেশ্য তাকে যেমন আদর্শ ভালবাসা বলা যায় না, ভালোবাসার শেষ লক্ষ্য যেমন মুক্তি, জীবনও তেমনই।

কিন্তু এর পরিপূরক একটি সত্যও এই সঙ্গে স্বীকার্য। যদি লোকহিতের জন্য কাজ করতে হয় তো লোকহিতরূপ ফলে আমাদের আগ্রহ থাকা বাঞ্ছনীয় ; এবং এই ফল যাতে লাভ হয় কর্মকে তার উপযোগী করাও কর্তব্য। অর্থাৎ মানুষের মহত্তম প্রেরণাকে কোনো

এক স্তরে ফলাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ক'রেও অন্য স্তরে তাকে ফলাফলের গণনার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন। অন্তত আধুনিক যুগে ফলের দ্বারাই কর্মের বিচার হয়। এই বিচারপদ্ধতি বহু পরিমাণে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির পথকে আলোকিত করেছে। ঐতিহাসিকভাবে ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে এই দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া সে সবও বোধগম্য হয় না।

পাশ্চাত্ত্য জগতে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংক্রান্ত মৌলিক ধ্যানধারণার যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এই প্রসঙ্গে সেটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ বিষয়ে টনি ও ম্যাক্স ওয়েবরের পুস্তকের সঙ্গে এদেশেও অনেকেই পরিচিত।

সময় যে সোজা পথে অতীত থেকে ক্রমশই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়, এ-কথাটা আজ আমাদের যতই স্বতঃসিদ্ধ মনে হোক না কেন বস্তুত এটা মোটেই সহজ কথা নয়। বরং প্রকৃতির তালে তালে ঋতু পরিবর্তনের পথ ধ'রে সময়ের যে-গতি স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা যায় তা হল পুনঃ পুনঃ আবর্তিত বৃত্তাকার গতি। অতীত যে চিরকালের মতোই অতীত, যে সময় হারালাম তা যে কখনই আর ফিরে পাওয়া যাবে না, সময় সম্বন্ধে এই সচেতনতা চিরকালীন নয়। আর পৃথিবীতে আমাদের একবারই জন্ম, প্রতি মুহূর্তে আমরা এই সীমাবদ্ধ সময়কে কণায় কণায় হারাচ্ছি, এই আর্ত অনুভূতিতে আধুনিকতার বিশেষ সুরটি তো খুবই স্পষ্ট।

কিন্তু আপাতত সময়ানুভূতির এই বেদনার্ত সূক্ষ্মতার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের গতি সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হয়েছে একটি সহজ অর্থে। টাকা ধার নিলে অথবা জমা রাখলে তার ওপর সুদ জমে। কতটা সুদ জমবে সেটা নির্ভর করে সময়ের ওপর শতকরা হিসাবে, যেমন বছরে শতকরা পাঁচভাগ, দশভাগ বা ঐ রকম কিছু। অতএব ব্যবসায়ী কতটা মাল বিক্রয় করলেন অথবা কি পরিমাণ লাভ করলেন সেটা জানাই যথেষ্ট নয়, কতটা সময়ের ভিতর মাল বিক্রয় হল বা লাভ হাতে এলো সেটাও হিসাব করা আবশ্যক। কোনো কাজ সম্পন্ন হল কি না সেটাই সব কথা নয়, কত শীঘ্র কাজ সম্পন্ন হল তাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। আমাদের সমাজে সময়ানুবর্তিতা এবং কাজের গতি দ্রুত করবার দিকে-যে দৃষ্টি নেই এতেই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের জীবনের বহিরঙ্গে আধুনিকতার ছাপ যদি-বা আছে, আমাদের চেতনা এখনও আধুনিক গুণসম্পন্ন হয়নি।

ব্রহ্মচর্য অথবা ইন্দ্রিয়সংযমকে আমরা সনাতন ধর্মের অঙ্গ ব'লে জানি। কিন্তু এখানেও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের গোড়ায় পৌঁছে শব্দার্থের অথবা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যের একটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। মধ্যযুগের সাধক জানতেন যে, আমরা যতদিন এই সতত পরিবর্তিত জগতের সঙ্গে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে অভিন্ন ক'রে দেখি, লোভে এবং ভয়ে এর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে থাকি, ততদিন আমাদের মুক্তি নেই। অতএব তিনি চিত্ত থেকে ছোট ছোট বাসনাকে উন্মূল করতে চাইতেন, যাতে সেই শূন্য হৃদয়ে ভগবানের অবতরণ সম্ভব হয়।

আধুনিক যুগে ইয়োরোপে পিউরিট্যান আন্দোলনের নেতারা ইন্দ্রিয়সংযমকে ব্যবহার করেছেন জাগতিক উন্নতির প্রয়োজনে। তাঁদেরও শেষ উদ্দেশ্য আত্মিক মুক্তি। কিন্তু এই জগতে যার যেখানে স্থান সেখানে অধিষ্ঠিত থেকে সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের ওপর তাঁরা জোর দিলেন। বিশেষভাবে আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির দায়িত্ব তাঁদের চিন্তায় একটা বড় স্থান লাভ করল। অর্থগৃধ্নুতার দ্বারা একের ধন সম্ভবত অন্যে লাভ করতে পারে ; কিন্তু নতুন সম্পদ সৃষ্টি করবার জন্য প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম, সময়ানুবর্তিতা এবং তৎসংশ্লিষ্ট

সংযম। ম্যাক্স ওয়েবর তাই পিউরিট্যান ধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "worldly asceticism" কথাটি ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের ইন্দ্রিয়সংযমের উদ্দেশ্য ছিল জগৎ থেকে মনকে মুক্ত করা ; ক্যালভিন (বা কালভ্যাঁ) যে-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও পথপ্রদর্শক তার বৈশিষ্ট্য হল, জাগতিক কর্মের ভিতর দিয়ে চরিত্রগঠন। বলা বাহুল্য হিন্দুধর্মেও কর্মযোগের শিক্ষা আছে এবং অর্থকে জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, এই কথা ব'লে যদি কেউ পিউরিট্যান আন্দোলনকে আমাদের সনাতন ধর্মের সঙ্গে মেলাতে চান তবে সেটা কিঞ্চিৎ ভুল হবে। সংসারের কর্ম হিন্দুর ধর্মে বর্ণ ও জাতিভেদ দ্বারা নির্ধারিত। আর ইয়োরোপে আধুনিক যুগের আন্দোলনে যে তীক্ষ্ণ সময়-সচেতনতা আছে, আমাদের সমাজে তা নেই।

এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে পরবর্তী রেফর্মেশন এবং বিশেষভাবে পিউরিট্যান আন্দোলনের পার্থক্যের সামান্য উল্লেখ আবশ্যক। মধ্যযুগে ইয়োরোপে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল শিক্ষা ও উচ্চ চিন্তার অদ্বিতীয় ধারক। রেনেসাঁসের যুগে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা যুক্তিকে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ব'লে জানতেন। রেনেসাঁসের যুগে ইয়োরোপের মনে আত্মবিশ্বাস এবং যুক্তির প্রতি আগ্রহ নতুন ক'রে জাগ্রত হল। এই নবজাগরণের মুহূর্তে ইয়োরোপ ধর্মকে বর্জন করেনি। বরং যুক্তির আলোকে সে ধর্মকে নতুন ক'রে চিনতে চেয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতিকে। ফলে একদিকে বিজ্ঞানচর্চার অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণে উৎসাহ প্রসারিত হয়েছে ; আর অন্যদিকে মানুষ সম্বন্ধে ধারণা গেছে পালটে। সমাজে ব্যক্তির একটি পূর্ব নির্ধারিত স্থান আছে, এই রকম একটা ধারণা মধ্যযুগে প্রবল ছিল। রেনেসাঁসের চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষকে এখন কল্পনা করা হল অনন্তসম্ভাবনাময় অদ্বিতীয় জীব হিসাবে। মানুষের চরিত্র ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, অশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ নিজেকে ক্রমাগত আবিষ্কার করছে। আপনাকে জানা তার কখনও ফুরোবে না।

যুক্তিতে বিশ্বাসী ও মানুষের রহস্যে মুগ্ধ রেনেসাঁসের যে-মন লেওনার্দোর চিত্রে পরিস্ফুট ইয়োরোপের আধুনিক ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আর্থিক উন্নতির জন্য চরিত্রের যে অনুশীলন প্রয়োজন তার পক্ষে রেনেসাঁসের বাণী যথেষ্ট ছিল না। শিল্পী জানেন যে মানুষের হৃদয় রহস্যে আবৃত, তার কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। কিন্তু কর্মের পথে যিনি নেতা তাঁকে বলতে হয় যে, ব্যক্তিকে তার নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্ত থেকে কর্তব্য সমাপ্ত করবার মতন আত্মসংযমের অধিকারী হতে হবে। সমাজে ব্যক্তির স্থান সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় ধারণা ভুল ; মানুষের নতুন পথে অগ্রণী হবার অধিকার স্বীকার্য। কিন্তু ব্যক্তি যদি তার অন্তহীন সম্ভাবনার দোহাই দিয়ে পদে পদে নিজের দায়িত্ব এড়াতে চায়, কোনো অবস্থারই মুখোমুখি স্থিরভাবে দাঁড়াতে না পারে, তা হলে সমাজে কোনো বড় কাজ সম্পন্ন করা যায় না।

তা ছাড়া শিল্পোন্নয়নের জন্য আবশ্যক বর্তমানের ভোগ সংকুচিত ক'রে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়। বিশেষত শিল্পোন্নয়নের প্রথম যুগে এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এদিক থেকে প্রাচীন আভিজাত্যের সঙ্গে বণিকবুদ্ধির একটা পার্থক্য স্পষ্ট। অভিজাতবংশীয়ের চোখে বণিকের জমাখরচের হিসাবে একটা ক্ষুদ্রতা আছে ; বণিক কৃপণ। শুধু যুক্তি দিয়ে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর একটিকে নির্বাচন করা যায় না। যেহেতু বর্তমানই প্রত্যক্ষ সত্য, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অতএব ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়কে জীবনে বড় স্থান দিতে হলে এক বিশেষ

ধরনের অভ্যাস ও বিশ্বাস প্রয়োজন। পিউরিট্যান আন্দোলন পাশ্চাত্ত্য জগতে শিল্পোন্নয়নের উপযোগী অভ্যাস ও বিশ্বাস সৃষ্টির কাজে সহায়ক হয়েছে। অথবা হয় তো বলা উচিত যে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন একই সঙ্গে পরিপূরক ও বিরোধী। এদের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে ইয়োরোপের প্রগতি সম্ভব হয়েছে।

মোট কথা, ধর্ম অপরিবর্তনীয় নয় ; এবং জাগতিক ফল লাভ যদিও ধর্মের শেষ উদ্দেশ্য নয়, তবু জগতের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রেই ধর্মের পরিবর্তন ঘটে। নয়তো প্রাচীন ধ্যানধারণার সঙ্গে বর্তমানের অসামঞ্জস্য প্রগতির পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়।

৩

রেনেসাঁসের প্রতিতুলনায় পিউরিট্যান আন্দোলনেব যে তাৎপর্য তারই কিছুটা ছায়া পড়েছে এদেশে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পারস্পরিক বিরোধ ও পরিপূরকতায়।

শ্রীমতী মীরা চৌধুরীর যে-খাতাটিতে গান্ধী একবার লিখেছিলেন : "Never make a promise in haste. Having made it fulfil it at the cost of your life." সেই খাতারই অন্য পাতায় কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে যোগ করেছিলেন : "Surrender your pride to truth, fling away your promise if it is found to be wrong."

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন মানুষের অন্তহীন ও বহুরূপী সম্ভাবনায়। কোনো প্রাচীন শপথ যদি ব্যক্তিত্বের নব নব অভিব্যক্তির পথে বাধা হয়, তবে সেই শপথের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে ব্যক্তিত্বকে মুক্তি দেওয়াই তাঁর কর্তব্য মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাংগঠনিক কাজ যদিও উল্লেখযোগ্য তবু তাঁর নিজের কাছে কবি পরিচয়টিই প্রধান ছিল। কবি হিসাবেই তিনি মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এমন একটি নতুন ধারণা তাঁর সাহিত্যে ও চিন্তায় তুলে ধরেছিলেন যাকে বাদ দিয়ে আধুনিকতার দ্বার অতিক্রম করা যায় না।

গান্ধী জানতেন যে, সংকল্পের দৃঢ়তা ছাড়া মহৎ কিছু সম্পন্ন করা যায় না। আর সত্যকে বিসর্জন দিলে সামাজিক সম্পর্কের কোনো নির্ভরযোগ্য ভিত্তিই অবশিষ্ট থাকে না। উদ্ধৃত বাক্যে কর্মযোগী হিসাবে নিজের বাক্যে অটল থাকবার প্রয়োজনের ওপরই তিনি জোর দিয়েছেন।

পিউরিট্যান অথবা সংযমী নীতিবাদের দুটি রূপ, মধ্যযুগীয় ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক, আগে আলোচনা করেছি। এ দু'য়ের ভিতর অনেক পার্থক্য। এ-দেশে স্বাবলম্বনের চেয়ে গুরুজনদের প্রতি বাধ্যতাকে বড় গুণ বিবেচনা করা হয়, অর্থাৎ, আমাদের ভিতর মধ্যযুগীয় মনোভাবেরই প্রাবল্য। সময়ের অপচয় আমাদের পীড়িত করে না। ন্যায়-অন্যায় বোধ আমাদের ক্ষীণ। নিয়ম সম্বন্ধে আমরা তখনই অতিমাত্রায় সচেতন যখন দায়িত্ব এড়াবার জন্য নিয়মটাকে কাজে লাগানো যায়। নয় তো নিয়ম সম্বন্ধে আমরা নির্বিকার।

এরই ভিতর মোহনদাস করমচাঁদের আবির্ভাব উল্লেখযোগ্য। গান্ধীর মতামতের কোনো কোনো অংশ আমার মধ্যযুগীয় মনে হয় ; যেমন নিরামিষ, গোমাংস, অথবা যৌন সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর কিছু কিছু ধারণা। কিন্তু কয়েকটি মৌলিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন আশ্চর্যভাবে আধুনিক। তাঁর সময়সনিষ্ঠা প্রবাদে পরিণত হবার যোগ্য ; নিত্য সহচর ঘড়িটি উদ্যত তর্জনীর মতো তাঁর আদর্শের ইঙ্গিত বহন করেছে। যেমন সময়ের তেমনই

অর্থের ব্যবহারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী মানুষ। তিনি জাতে "বেনে" এ কথাটা যেমন প্রকাশ্যে উল্লেখ করতেন, তেমনই বণিকের শ্রেষ্ঠ গুণ তাঁর কর্মে পরিস্ফুট ছিল। তাঁর নিয়মনিষ্ঠাও বিখ্যাত। তিনি নিয়মকে কর্মের সহায় জানতেন এবং সেই অর্থেই তাকে জীবনচর্যায় বিশিষ্ট স্থান দিতে চেয়েছিলেন। এটাই অবশ্য গান্ধীর পূর্ণ পরিচয় নয়। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এটা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ আমার প্রিয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে আমি জীবনের কিছু অর্থ খুঁজে পাই। কিন্তু গান্ধীকে আমাদের প্রয়োজন। গান্ধীর ভিতর এমন কিছু গুণ ছিল যাকে অগ্রাহ্য করলে আমাদের সমাজের বনিয়াদ শক্ত হবে না। আর সুস্থ সমাজ ছাড়া সংস্কৃতিকেই বা কতদিন বাঁচানো যাবে ?

পাশ্চাত্ত্যের মতো এদেশেও সম্প্রতি যুব-বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করেছে। তবে এ দু'য়ের ভিতর একটা বড় পার্থক্য আছে। পশ্চিমে শিল্পোন্নত সমাজের ভিত্তি ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর নিয়মের আতিশয্যেব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পিউরিট্যান মতবাদের এবং আধুনিক আমলাতান্ত্রিক সমাজের একটা দিক আছে যেটা হৃদয়হীন। পাশ্চাত্ত্য দেশের তরুণেরা সমাজকে আরও হৃদয়বান করে তুলতে চাইছেন। কতটা সম্ভব হবে সেটা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রশ্ন। নিয়মের যেমন অত্যাচার থাকে, তরুণের প্রত্যাশায়ও তেমনই আতিশয্য আছে। এর মাঝামাঝি কোথাও রফা হবে।

এদেশের তরুণেরাও সমাজের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ। ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তবু পার্থক্য আছে। আধুনিক সমাজের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপন করাই আজ এদেশে বড় প্রয়োজন। আমরা যদি শিল্পোন্নত সমাজের নিয়ম আয়ত্ত করবার আগেই তাকে অতিক্রম করতে চাই, আধুনিক যুগে পৌঁছবার আগেই তাকে ছাড়িয়ে যেতে অধীর হ'য়ে উঠি, তবে বিপত্তি অনিবার্য। যাঁরা বিক্ষুব্ধ তাঁরা সবই ভাঙতে চাইছেন ; কী গড়া প্রয়োজন এ-বিষয়ে তাঁদের ধারণা স্বপ্নের চেয়েও অস্পষ্ট ও অবাস্তব। যা অন্যায় ও যুক্তিহীন অথবা বর্তমান সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, তার বিরোধিতা নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক সমাজ গঠনের বর্তমান পর্যায়ে এমন অনেক কিছু গড়বার আছে, যা শুধুই বিক্ষোভের ধমকে আয়ত্ত করা যাবে না।

দেহের শক্তিহীনতা আমাদের জাতি হিসাবে অতিশয় ভীতু ও শান্তিপ্রিয় করেছিল। মনের আলস্যে আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে, যাদু ও বিজ্ঞান সমান সত্য। আলস্যের সগোত্র সাময়িক উত্তেজনা। ক্ষণিক উত্তেজনার ধাক্কায় দেশকে একটা মহৎ সাধনের তুঙ্গে তোলা যাবে, এই লোভনীয় বিশ্বাসের কাছে যদি আমরা আজ আত্মসমর্পণ করি তবে সেটা হবে অযুক্তিরই জয়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁদের মিল ছিল অক্লান্ত সাধনার শক্তিতে এবং জীবনকে একটি নিত্য পরীক্ষিত সত্য হিসাবে লাভ করবার অদম্য আগ্রহে। সময় সম্বন্ধে সচেতন তবু শান্ত, অভ্যস্ত অশ্রান্ত পরিশ্রমে, সত্যের সন্ধানে আগ্রহী, বিরাট অথচ বহুলাংশে বিরোধী দু'টি ব্যক্তিত্বে এই গুণ সমান প্রত্যক্ষ। একে বাদ দিয়ে আমাদের আদর্শ কল্পনা করা যায় না ; একে উপেক্ষা ক'রে এ যুগের লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি, সব কিছু ব্যাপ্ত ক'রে এক বৃহৎ আন্দোলন এদেশে একদিন শুরু হয়েছিল। আজ আমরা সেই আন্দোলন থেকে পিছিয়ে এসে রাজনীতির দ্বারা সব জয় করতে চাই। কিন্তু জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরাজিত হ'য়ে রাজনীতির সাহায্যে জয়ী হওয়া যায় না। এ জন্য আমাদের অসমাপ্ত রেনেসাঁস ও রেফর্মেশনকে

পূর্ণতর করা আশ্যক। এই দুই মহৎ আন্দোলনকে আমরা এদেশে স্থান ও কালের উপযোগী ক'রে নিতে পারি ; কিন্তু এদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে চাইলে ভুল করা হবে। ব্যক্তি ও সমাজের চারিত্র্যগঠনে প্রতিটি পর্যায়ের একটা ঐতিহাসিক অবদান থাকে। আধুনিক যুগের গুণ আয়ত্ত না ক'রেই ভবিষ্যৎকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইলে অতীতকে বিকৃতভাবে চিরস্থায়ী করা হয়। তাকে তখন আমরা সনাতন ব'লে যতই অহংকার করি না কেন, সেটা আমাদের বাড়বার পথে বাধা হয়েই থাকে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবপ্রসঙ্গে

আলস্য, দুর্নীতি ও কুসংস্কার আমাদের প্রধান ব্যাধি।

একথার পর অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। দুর্নীতি আমাদের সমাজের একটি প্রধান ব্যাধি এ বিষয়ে অধিকাংশ পাঠক একমত হবেন ; কারণ আমরা সবাই নিজেকে বাদ দিয়ে সর্বত্র দুর্নীতি দেখি। কুসংস্কারকে এই তালিকাভুক্ত করা অনেকেরই মনঃপূত হবে না ; কুসংস্কার কার নেই ? ওটা অপেক্ষাকৃত গৌণ সমস্যা।

যদি উদাহরণ হিসাবে অস্পৃশ্যতার কথা বলি তবু হিন্দু পাঠকদের অনেকেই ইতস্তত করবেন। বলা হবে যে, শিক্ষিতদের ভিতর অস্পৃশ্যতা বস্তুটি আজকাল প্রায় নেই। শহরে ওটা উঠে গেছে, গ্রামে অশিক্ষিতদের ভিতর সম্ভবত দেখা যায়—তাও বাংলাদেশে কমই আছে। ভারতের কোনো কোনো অন্ধকারাচ্ছন্ন অঞ্চলে অস্পৃশ্যতার প্রাদুর্ভাব, তবে শিক্ষার প্রসার ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাও দূর হয়ে যাবে। সংক্ষেপে, ওটা নিয়ে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক।

অথচ অস্পৃশ্যতা আমাদের সমাজে সর্বব্যাপী। এটাকে আমরা এতোই সহজে গ্রহণ করে নিয়েছি যে, এর কবল থেকে মুক্তি পেতে হলে এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রথমে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সেটা সহজ নয়, কারণ অস্পৃশ্যতা থেকে আমরা যতটুকু মুক্ত হয়েছি তার সম্বন্ধে আমরা ততটুকুই সচেতন ; যতটা অবশিষ্ট আছে, আমাদের সমগ্র সত্তার সঙ্গে সেটা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে তাকে আলাদাভাবে চেনাই কঠিন।

হিন্দুমনের অবচেতন স্তরে অস্পৃশ্যতাবোধের রাজত্ব। এর ব্যাপ্তি ও প্রভাব উপলব্ধি করতে হলে শুধু উচ্চ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর ভিতর সম্পর্কের পর্যালোচনাই যথেষ্ট নয়। মুসলমানের প্রতি হিন্দুর ব্যবহারে অস্পৃশ্যতার লক্ষণ অস্বীকার করা যায় না। ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা যাঁরা খানিকটা সামলে নিয়েছেন তাঁদের মন থেকেও নিম্নবর্ণ ও মুসলমান সম্পর্কে একটা সূক্ষ্ম অপবিত্রতাবোধ দূর হয়নি। শিক্ষিত শহরবাসী হিন্দুও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নন।

অস্পৃশ্যতাবোধ যে স্থূল অথবা সূক্ষ্ম বিভিন্ন আকারে আমাদের হিন্দুসমাজে প্রায় সর্বব্যাপী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পরও আমাদের একটি দ্বিতীয় সাফাই আছে। বর্ণহিন্দুদের বক্তব্য এই যে, বিবাহ অথবা খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে ওঁরা কতগুলো আচার

পালন করেন বটে, অর্থাৎ নিম্নবর্ণের হিন্দুকে অথবা মুসলমানকে ওঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে অপবিত্র জ্ঞান করেন সত্য, কিন্তু এই অস্পৃশ্যদের প্রতি ওঁদের মনে স্নেহ অথবা প্রীতির অভাব নেই। অর্থাৎ অস্পৃশ্যতার অস্তিত্ব স্বীকার করবার পরও সমস্যা হিসাবে এর গুরুত্ব অনেকে মানতে চান না।

প্ল্যাটো ক্রীতদাস প্রথার সমর্থক ছিলেন, ক্রীতদাসদের তিনি নীচ মনে করতেন ; তবে এই নীচ মানুষদের প্রতি প্রভুদের স্নেহভাব রক্ষা করা উচিত এটাও তিনি বিশ্বাস করতেন। আমরা বর্ণহিন্দুরা সমাজের একাংশকে শুধু নীচ নয়, অপবিত্র মনে করি। তারপর দাবি করি যে, ওদের প্রতি আমাদের মনোভাব প্রীতিপূর্ণ। এই দাবিটা মিথ্যা নয়, আবার সত্যও নয়। ওদের প্রতি আমাদের হিংসা নেই, প্রীতিও নেই, আছে শুধু তাচ্ছিল্য। কিন্তু যদি আমাদের মনে প্রীতিভাব থাকতো তবু সেটা আজকের দিনে যথেষ্ট হত না। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের "নীচ" জাতিরা প্রীতির অধিক কিছু চাইবে। মানুষ হিসাবে সাম্যের ভিত্তিতে স্বীকৃতি চাইবে। তা যদি না পায় তো প্রীতিও রক্ষা করা যাবে না। শিক্ষার বিস্তার ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতাজনিত তিক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া আশ্চর্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চাশ বছর আগের তুলনায় আজ কৃষ্ণাঙ্গদের ভিতর শিক্ষার ও আর্থিক মানের উন্নতি হয়েছে, আবার অসাম্যজনিত তিক্ততাও সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্কিন দেশের শ্বেতাঙ্গরা জানেন যে, ওঁরা কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি অসম ব্যবহার করছেন। এ নিয়ে ওঁদের অনেকেই আজ চিন্তিত। আমাদের হিন্দুদের নিয়ে মুশকিল এই যে, আমরা চিন্তার কোনো এক স্তরে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে মিশিয়ে দিই, সমস্ত জীবের ভিতর সাম্য কল্পনা করি ; তারপর আচারে ও ব্যবহারে কোনো প্রকার অসাম্যই আমাদের আর বিচলিত করে না। এটা কিন্তু আজ সমাজকে রক্ষা করার পথ নয়। অন্তত ভারতের কোনো কোনো অংশে অবস্থা ইতিমধ্যেই আশংকাজনক।

বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর অসাম্য (অথবা অসম উন্নতি) যে তিক্ততার কারণ হয় এ নিয়ে আজ আর তর্কের অবকাশ নেই। তবু যে-কথাটা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন তা হল এই যে, শুধু সংবিধানের কয়েকটি ধারা দিয়ে এই অসাম্য দূর করা যাবে না। অতএব এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

আর্থিক উন্নতির চেষ্টাও যথেষ্ট নয়। জাতিভেদ যে-জীবনদর্শনের অঙ্গ তারই পুনর্বিচার প্রয়োজন। বহুদিন আগে রামমোহন লিখেছিলেন :

"The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them (the Hindus), have entirely deprived them of patriotic feeling."

কথাটার ভিতর খানিকটা অত্যুক্তি আছে। কিন্তু জাতিভেদ যে আমাদের জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উপরন্তু এদেশে যে-সামাজিক পরিমণ্ডলে জাতিভেদ সজীব আছে, তাই আবার আমাদের বিজ্ঞানবিমুখ করেছে। বিজ্ঞানকে আমরা গবেষণাগারের সামগ্রী হিসাবে মনে করি, বাস্তবজীবনে তাকে সহায় বলে প্রায়ই বিশ্বাস করি না। শুধু খাদ্যাখাদ্য বিচারে নয়, জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটে আমাদের চিন্তার ভঙ্গীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি স্থাপন করা যাক। মানুষের সামাজিক চেতনার বিবর্তনে কয়েকটি স্তর আছে। যেমন, আদিমকালে মানুষ ছিল যাদুতে বিশ্বাসী ও

নানাপ্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তির উপাসানায় অভ্যস্ত। যুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তার ভঙ্গীতে পরিবর্তন দেখা দেয়। ধর্মের যে-সব প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্তির প্রত্যক্ষ বিরোধ আছে, সে সব প্রত্যয় তখন পরিত্যাজ্য মনে হয়। আধুনিক যুগে ফলিত বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে জাগতিক সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মূল্য অধিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এদেশেও জীবনের বহিরঙ্গে এর প্রভাব পড়েছে। কিন্তু আমাদের মনের গভীরতর স্তরে যাদুতে বিশ্বাস এখনও সুরক্ষিত। এরই অন্যতম উদাহরণ অস্পৃশ্যতা।

সমস্যা হিসাবে অস্পৃশ্যতার গুরুত্ব স্বীকার করবার পর এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। অস্পৃশ্যতার মূলে আছে জাতি ও কর্মভেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি প্রাচীন ও মূঢ় কুসংস্কার। এই কুসংস্কারটির সঙ্গে হিন্দুসমাজে প্রত্যেকেই পরিচিত। কোনো বস্তুবিশেষ যদি আমাদের বিচারে অশুচি হয় তবে সেই বস্তু যে-পাত্রে স্থাপন করা যায় তা অপবিত্র, আবার সেই পাত্র যদি কেউ স্পর্শ করে তবে সেই ব্যক্তিও স্পর্শদোষে অপবিত্র। এই জাতীয় বিচার-যে যুক্তিহীন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত এভাবে যদি কেউ শেষ অবধি বিচার চালিয়ে যান তো জগতের প্রত্যেকটি বস্তুকে কোনো-না-কোনো স্পর্শদোষে অপবিত্র মনে করা ছাড়া উপায় থাকে না এবং শুদ্ধিকরণের পদ্ধতিগুলিও যুক্তিহীন প্রতিপন্ন হয়। অতএব কেউই শেষ অবধি এভাবে বিচার করেন না। তবে এই কুসংস্কারটিকে হিন্দুসমাজ যে-পরিমাণে গ্রহণ করেছে সেটাই বুদ্ধি বিভ্রাটের পক্ষে যথেষ্ট। এই বুদ্ধিবিভ্রাট শুধুই হাস্যাস্পদ হত যদি-না সমাজে এর কয়েকটি অমানুষিক ফলাফল প্রতিনিয়ত চোখে পড়ত। হাসপাতালে রোগী আকুলভাবে প্রার্থনা করেও মলাধারটি হাতের কাছে পাচ্ছেন না কারণ জমাদার কাছে নেই এবং সেবিকা সহ অন্য সবাই ঐ পাত্রটি স্পর্শ করতে দ্বিধাগ্রস্ত, এমন হৃদয়হীন ব্যাপার বোধ করি এদেশেই সম্ভব। উচ্চনীচ ভেদাভেদ সব সমাজেই অল্পবেশি দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদে উচ্চনীচ ভেদাভেদের অতিরিক্ত কিছু আছে; সেটা হল পবিত্রতা সম্বন্ধে অতি প্রাচীন ও অন্ধ কুসংস্কার।

অস্পৃশ্যতা উদাহরণ মাত্র; আমাদের মনের যেখানে কুসংস্কারের সার্বভৌমত্ব সেখানে আলোকপাত করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। আমাদের ভিতর অস্পৃশ্যতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং মনের গভীরে বদ্ধমূল বলেই একে দূর করাও কঠিন। ধর্মের সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়ে একে স্পর্শ করা যায় না। মানুষের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বাণী আমরা হৃদয়ের এক অংশে গ্রহণ করি; আর এই সব প্রাচীন সংস্কারকে হৃদয়ের অন্য অংশে লালন করি। এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত সযত্নে এড়িয়ে চলি। অথচ এই বিভক্ত হৃদয় নিয়ে আজ প্রগতি ও জাতীয় সংহতি রক্ষা করা যাবে না। এ জন্য চাই বিজ্ঞাননিষ্ঠ যুক্তিবাদী চিন্তা ও জীবনদর্শনের একটা খুব বড় রকমের আন্দোলন। আরও প্রয়োজন এই আন্দোলনকে জীবনচর্যায় প্রসারিত করবার বহুমুখী উদ্যোগ।

বলা বাহুল্য যে, শুধু হিন্দুসমাজে নয়, মুসলমান সমাজেও এই ধরনের বিশাল আলোড়ন আবশ্যক। ভারতবর্ষে যে-সময়ে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ইসলামের ইতিহাসে সেটা একটা সৃজনধর্মী যুগ নয়। পাশ্চাত্ত্য জগতে তখন নবজাগরণ শুরু হয়েছে, আর আরব চিন্তা তখন সৃজনধর্মিতার একটা আশ্চর্য যুগ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পিছিয়ে পড়েছে। উনিশ শতকে যখন হিন্দু সমাজে নতুনচিন্তার আলোড়ন আরম্ভ হল তখনও মুসলমান সমাজে ধর্মান্ধতার দাপট প্রবল। রামমোহন বেদ অথবা উপনিষদের সব কথা সমান সত্য মনে করতেন না। তিনি প্রয়োজনবোধে প্রাচীন শ্রুতি ও স্মৃতির কিছু গ্রহণ

করেছেন, আবার কিছু বর্জন করেছেন। বাইবেল নিয়ে একই কাণ্ড করেছিলেন রামমোহনের প্রায় সমসাময়িক মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেফারসন। তিনি খৃষ্টান হয়েও ঐ ধর্মগ্রন্থের কোনো কোনো অংশ কেটে বাদ দিয়েছিলেন, আবার কিছু গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থের উদার ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে বটে। কিন্তু সেই ধর্মগ্রন্থের সব কিছুই সমান সত্য নয়, এমন কথা যদি কেউ বলে থাকেন তো মুসলমান সমাজে তার স্থান হয়নি। আজ ১৯৭০ সালে যতদূর জানি ভারতের বিভিন্ন অংশে মুসলমান উঠতি তরুণদের ভিতর ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলন শক্তিশালী।

মানবতার অপমান সব দেশে একই আকারে আসে না। আমাদের সমাজে অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা অগণিত কাল ধরে সেই অপমানের প্রধান রূপ। এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক ধর্মের কাছে মানবধর্ম পরাজিত হবে এমন আশংকা আবারও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

অতএব চিন্তার নতুন আন্দোলন প্রয়োজন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে। এই আন্দোলনের অনুকূল বাস্তব অবস্থাও অংশত উপস্থিত। উনিশ শতকে যখন বাংলাদেশে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তখন শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, আর শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার স্থান ছিল সংকুচিত। অতএব রামমোহন, রানাডে ও বিদ্যাসাগরের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব ছিল অনিবার্যভাবে সীমাবদ্ধ। আজ শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও ক্রমশ শিক্ষা ছড়াচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার স্থান ক্রমে প্রশস্ত হচ্ছে। আর দিকে দিকে দেখা দিয়েছে একটা নতুন চাঞ্চল্য। কিন্তু এই যুগসন্ধিক্ষণে নতুন চিন্তা অনুপস্থিত। তার পরিবর্তে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে ভেল্কিতে বিশ্বাস।

আমরা নাটকীয়ভাবে একটা বড় ফল হঠাৎ লাভে বিশ্বাসী। এই মুগ্ধ আশা এমনই আকর্ষণীয় যে, বার বার প্রতারিত হয়েও একে ত্যাগ করা যায় না। একদিন আমরা ভেবেছিলাম যে, কোনো রকমে ইংরেজকে তাড়াতে পারলেই দেশের সমস্যা অচিরাৎ দূর হবে। এখন আমরা বিশ্বাস করতে উদ্‌গ্রীব যে, সাম্যবাদের নামে কিছু শিল্প রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিলে অথবা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে পারলেই দেশের সমস্যার সমাধান হবে।

কিন্তু এটা যুক্তির কথা নয়। কুসংস্কার যদি আমাদের মনের গভীরে মূল বিস্তার করে থাকে তো জেনে রাখা ভালো যে, শুধু বৈপ্লবিক উত্তেজনা দিয়ে অজ্ঞতাকে ধ্বংস করা যাবে না। নিরপেক্ষ দর্শকমাত্রই লক্ষ করেছেন যে, এদেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের অসংখ্য সমর্থকদের ভিতরও অন্ধ সংস্কারের প্রকোপ কত প্রবল। বিপ্লবের পক্ষে ও বিপক্ষে খণ্ড খণ্ড সাম্প্রদায়িক, উপজাতীয় ও দলীয় আনুগত্যকে রক্তাক্ত সংগ্রামে আজ প্ররোচিত করা কঠিন নয়। ব্যর্থতার বিজ্ঞাপনই হবে ঐতিহাসিকভাবে এই রক্তপাতের সদর্থক ফল। গহযুদ্ধের বিভীষিকা ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পর যুক্তি ও মানবতাবোধের আন্দোলনই আবারও শুরু করতে হবে। তবে এই দেশব্যাপী উন্মত্ততার সার্থকতা কোথায়? শ্রম, বিজ্ঞান ও মানবতাবোধ, দেশ গড়বার এই মূল উপাদান। সামাজিক মুক্তির কোনো ত্বরিত ও সহজ পথ নেই।

আমাদের সামনে উপস্থিত একদিকে অভূতপূর্ব নবজাগরণের অনুকূল বাস্তব অবস্থা। অন্যদিকে এই বাস্তব সম্ভাবনাকে কাজে পরিণত করবার মতো মানসিক প্রস্তুতির আজ এমনই অভাব যে, আশার কথা উচ্চারণ করতেও ভয় হয়। রামমোহনের জন্মের প্রায় দুইশত বৎসর এবং বিদ্যাসাগরের দেড়শত বৎসর পর বাংলা দেশের অসমাপ্ত সাংস্কৃতিক

বিপ্লবকে সমাজের সকল অঙ্গে ব্যাপ্ত করবার সংকল্প কি আমরা এখনও গ্রহণ করতে পারব ?

পল্লী ও নগর

গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত কোনো প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক লিখেছিলেন : "একই বংশে জাত সন্তানসন্ততি এবং তাদের বংশধরদের নিয়ে কয়েকটি পরিবারের ছোট একটি উপনিবেশ, এই হলো গ্রামের স্বাভাবিক রূপ।" গ্রামের এই স্বাভাবিক রূপ অক্ষুণ্ণ থাকেনি। উচ্চ নীচ বিভিন্ন জাতের মানুষের বসতি হয়েছে গ্রামে। তবু তার ভালোমন্দ সব নিয়ে পল্লীসমাজের নিকটতম উপমা মেলে একটি ঈষৎ স্মৃতিভ্রষ্ট যৌথ পবিবারে।

এর সঙ্গে নাগরিক সমাজের পার্থক্য সুস্পষ্ট। বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে-নগরের উৎপত্তি তারই কথা এখানে বলছি। নানা দেশ থেকে বণিকেরা মিলিত হয়েছে নগরে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক অঁরি পিরেন এ ব্যাপারে একটি তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তথ্যটি ভাষাসংক্রান্ত। প্রায় হাজার বছর আগে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে রুশ দেশে যে-সব নগরের প্রতিষ্ঠা হয় তাদের নামের শেষাংশে প্রায়ই "গরড" শব্দটি দেখা যায়। "gorod"-এর সঙ্গে "gostj" শব্দের যোগ আছে, যার মানে হলো অচেনা বিদেশী। এই অচেনা মানুষদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে যে-নগর, তার সঙ্গে পল্লী সমাজের জীবনপদ্ধতি ও ধ্যানধারণার একটা বড় পার্থক্য প্রথম থেকেই ছিল। এই দুই ধ্যানধারণার সমন্বয়ের ওপরই সম্ভবত ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু সে কথায় পরে আসা যাবে।

গ্রামের প্রধান উপজীব্য কৃষি। কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কুটিরশিল্প। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য ছিল কুমোর, কামাব ইত্যাদি। গ্রামীণ অর্থনীতির এই সাবেকি বিন্যাসটি সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। কাজেই এর বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

তবু প্রাসঙ্গিক অন্য দুয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া আবশ্যক।

গতিকে বুঝতে হলে নিশ্চলতা সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা দরকার। আর্থিক উন্নয়নকে বোঝাবার জন্য অর্থনীতিবিদেরা নিশ্চল অর্থনীতির একটা ধারণা তৈরি করে নিয়েছেন। এর কোনো বাস্তব প্রতিকৃতি খুঁজতে গেলে প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার নিকট সাদৃশ্য পাওয়া যাবে।

নিশ্চল অর্থনীতিতে সবই চলেছে, কিন্তু সব মিলে কিছু বদলাচ্ছে না। জন্ম মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু মোট জনসংখ্যার না হচ্ছে বৃদ্ধি, না ক্ষয়। ব্যক্তি শৈশব থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হচ্ছে, কিন্তু সমাজে শিশু, যুবক ও বৃদ্ধের অনুপাতের পার্থক্য হচ্ছে না। যে যার কাজে যাচ্ছে নিয়মিত, তবে মোট উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকছে ; উৎপাদন পদ্ধতিও পুরুষানুক্রমে একই চলছে। এর ভিতর কখনই যে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না, তাও ঠিক নয়। হঠাৎ কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, মানুষ মরে কাতারে কাতারে। কখনও আবার প্রকৃতি মুক্তহস্তা হন। কিন্তু এ সবই ঢেউয়ের মতো আসে যায়। অর্থনীতির

সাধারণ স্তরের এতে পরিবর্তন হয় না।

ব্যাপক দৃষ্টিতে তাকালে আরও বড় বড় ঢেউ চোখে পড়ে। সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের সঙ্গে এর যোগ আছে। সম্রাট যদি শক্তিমান হন তো রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকে। যদি তিনি প্রজাবৎসল হন তো নতুন জলাশয় খননের কাজে মনোযোগ দেন, নতুন পথঘাট তৈরি হয়। চাষযোগ্য জমির বিস্তার ঘটে। সেই সঙ্গে শস্যের উৎপাদন বাড়ে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যের পতনের সময় অরাজকতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে, জনপদও তখন জঙ্গলে ছেয়ে যায়। এমনি করে একটি ঊর্ধ্ব ও একটি নিম্ন মাত্রার ভিতর প্রাচীন গ্রামীণ অর্থনীতির প্রসার ও সংকোচ ঘটে।

নিশ্চল অর্থনীতির মূলে আছে পরিবর্তনহীন গতানুগতিক উৎপাদন পদ্ধতি। আবাদযোগ্য অতিরিক্ত জমি যতদিন থাকে ততদিন বসতি বেড়ে চলে, খাদ্য ও জনসংখ্যা দুই-ই বৃদ্ধি পায়। তারপর আর প্রসার সম্ভব হয় না। খাদ্যের অনটনে জন্মমৃত্যুর হার এমন একটা সামঞ্জস্যে এসে পৌঁছয় যাতে দীর্ঘকালের মধ্যে জনসংখ্যার আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিস্তাব ঘটে না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটা অটল ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

এই স্থাণু সমাজের ভিতর রীতিনীতি, আচার অনুশাসন, কর্মবিভাগ ও জাতিভেদ সব কিছুই একটা অনড়তা লাভ করে। সেই অনড়তা—যা মানুষকে দুরাশা থেকে মুক্ত রাখে এবং যা প্রগতির বিপরীত। যে সব নিয়ম ও নিষেধ দীর্ঘদিন যাবৎ অপরিবর্তিত থাকে, অবশেষে তাদের আর সাধারণ মানুষের রচিত নিয়ম বলে বোধ হয় না। ধীরে ধীরে তারা এক লোকাতীত মহিমার অধিকারী হয়। নিশ্চল অর্থনীতিকে বেষ্টন করে থাকে শ্রুতি, স্মৃতি ও সনাতন ধর্ম।

অতএব মধ্যযুগীয় সমাজ ও অর্থনীতিতে ব্রাহ্মণ অথবা ধর্মযাজকগোষ্ঠীর প্রভাব স্বভাবতই প্রবল। ক্ষত্রিয়দের প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে অন্য দুয়েকটি কথা আনতে হয়। প্রায় কোনো দেশেরই আদিম জাতি আজ সে দেশের একমাত্র জাতি নয়। বিদেশী বিজেতার বেশে যারা এসেছে তারাও ক্রমে ক্রমে নতুন দেশের স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণতি লাভ করেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রাচীন সভ্যতাগুলির এই ইতিহাস। শক হূনেরা যেমন ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তেমনই প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যও বিদেশী বর্বরদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েছে। আজ যারা আক্রমণকারী কাল তারাই নতুন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দেশের রক্ষক। এমনি করে রাজন্যবর্গ সমাজে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন : তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণের রক্ষক।

ফিউডেল বা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পটভূমিকা এই। যোদ্ধা রক্ষক অথবা ভূপতির কাছে সাধারণ চাষী তার স্বাধীনতা সঁপে দিয়ে পরিবর্তে লাভ করেছে নিরাপত্তা। রক্ষককে ত্যাগ করবার স্বাধীনতা চাষীর রইল না ; জমির সঙ্গে সে বাঁধা পড়ে গেল। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা হলেন ; অর্থাৎ, উৎপন্ন ধনের প্রধান অংশ রাজা ও সামন্তদের প্রাপ্য হলো। তবু মধ্যযুগীয় সমাজে দীন চাষী শুধু বাইরের আক্রমণ এবং লুঠতরাজের বিরুদ্ধেই ভূস্বামীর কাছে আশ্রয় আশা করেনি ; বিপদে আপদে, প্রাকৃতির বিপর্যয়ে ও দুর্দিনে, সামাজিক নিরাপত্তার কিছু ব্যবস্থাও তার জন্য ছিল।

ব্রাহ্মণ অথবা ধর্মযাজক, ক্ষত্রিয় অথবা রাজন্যবর্গ এবং সাধারণ চাষী. এই নিয়েই প্রধানত মধ্যযুগীয় সমাজ। এর ভিতর বণিক শ্রেণীকে কখনই ভালোভাবে আঁটা যায়নি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে দ্রব্যের বিনিময় হতো না এমন নয়। বরং বলা চলে যে, দ্রব্যের

সরাসরি বিনিময় ঐ অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিল। যদি ধরে নিই যে, কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি হলো গ্রাম, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এইসব বিভিন্নক্ষরিবারের কোনোটিই সম্পূর্ণ স্বয়ংভর ছিল না, বরং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ছিল—তা নইলে নিবিড় সান্নিধ্যে বসবাস করার তো কোনো হেতুই থাকত না। আর এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকেই আসে আবশ্যক মতো দেওয়া-নেওয়া। এই আদান-প্রদান গার্হস্থ্য জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটাকেই স্বাভাবিক মনে করা হতো। গার্হস্থ্যজীবনই লক্ষ্য ; সীমিত পরিমাণে দ্রব্যবিনিময় তার সহায়ক। বণিকেরস বিনিময়কে ব্যবসায়ে পরিণত করল, লাভ অথবা মুনাফা হলো তাদের লক্ষ্য। ইয়োরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞেরা এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি।

স্থায়ী ও স্থাণু, সুখী ও দরিদ্র গ্রামীণ অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে বাণিজ্যের বিরোধ ছিল মৌলিক। মধ্যযুগীয় সমাজে তাই বণিকের স্থান ছিল স্বাভাবিক ভাবেই অধম। অবশেষে বাণিজ্যের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগীয় সমাজে ভাঙ্গন এল। ইয়োরোপের ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে পরিবর্তনের এই ধারাটা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সেই ইতিহাসেরই দুয়েকটি কথা এবার টেনে আনা যাক।

২

আজ যারা 'দস্যু', বর্বর', কাল তারাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির নেতা। ইতিহাসে এ ব্যাপার ঘটেছে বার বার, নানা পথে।

"রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে" যারা একদিন দেশজয় করতে এসেছিল, সমাজ সংগঠনের দিক থেকে তাদের উপজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 'বর্বর' উপজাতীয় নেতা ও তাদের বংশধরেরাই এরপর একদিন মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মঞ্চে রাজদরবার আলোকিত করে বসেছিল। আধুনিক যুগের গোড়াতেও প্রকারভেদে একই ব্যাপার আবারও ঘটেছে। মধ্যযুগের শেষার্ধে যে-বণিকেরা সংখ্যায় ও শক্তিতে ক্রমশ পুষ্টি লাভ করতে থাকে, তাদের সামাজিক উৎপত্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক পিরেন বলেছেন যে, এরা উঠে এসেছিল সেইসব মানুষের মধ্য থেকে, যাদের জীবিকার কোনো ঠিকানা ছিল না, আইনের চোখে যারা অপরাধী, যারা ভবঘুরে এবং সমাজ থেকে পরিত্যক্ত। এরাই ক্রমশ নতুন যুগের নগরে সংহত হলেস, আর্থিক ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল, ধর্মীয় আন্দোলনে নব দিগ্বলয় রচনা করল, নতুনভাবে আইন প্রণয়ন করল, আর সভ্যতার ইতিহাসে এইভাবে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো।

মধ্যযুগে প্রধানত দুই ধরনের নগরী অথবা 'পুরী'র সন্ধান পাওয়া যায়। এক, ধর্মকে কেন্দ্র করে, যেখানে প্রায়ই মন্দিরসংলগ্ন ধর্মালোচনা ও শিক্ষার ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। আর ছিল দুর্গ ও দরবারকে অবলম্বন করে সুরক্ষিত রাজপুরী। এইসব নগরীতে প্রাধান্য ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের এবং অভিজাতবংশীয় রাজপুরুষদের। সেই সঙ্গে থাকত তাদের সেবক শ্রেণী। এই পরিচিত ব্যবস্থায় চির ধরিয়ে বাণিজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক জাতীয় নগরের আবির্ভাব হলো, যেখানে প্রাধান্য বণিকের।

ইয়োরোপের ইতিহাসে এই নতুন অধ্যায়ের শুরু মোটামুটি এগারো শতকে।

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে রোমক সাম্রাজ্য যখন তুঙ্গে, তখন ভূমধ্যসাগরকে ঘিরে রেখেছিল

এই সাম্রাজ্য। ইয়োরোপের সঙ্গে এশিয়ার বাণিজ্যে এই জলপথটির গুরুত্ব ছিল অত্যন্ত বেশি। রোমের পতনের কিছুকাল আগে থেকেই নানা কারণে দুই মহাদেশের ভিতর বাণিজ্য ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। সপ্তম শতকে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, আর ইয়োরোপ আরও বেশি করে নিজের ভিতর নিজেকে গুটিয়ে আনে। মধ্যযুগের প্রথমার্ধে দূরপাল্লার বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ভেনিস ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য নগরই অবশিষ্ট থাকে না। এগারো শতকে যখন খৃষ্টানজগৎ ও মুসলমানদের ভিতর ধর্মযুদ্ধ শুরু হলো তখন তারই অন্যতম ফল হিসাবে ইয়োরোপ ও এশিয়ার ভিতর বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রশস্ত হলো। একদিকে ধর্মান্ধদের যুদ্ধ, অন্যদিকে এরই সুযোগ নিয়ে বণিকদের বাণিজ্য অভিযান! এগারো শতকের শেষ দিকে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের প্রাধান্যের অবসান ঘটল, আর ইয়োরোপের বণিকদের পক্ষে এই জলপথটি সুমে হলো।

সেকালের বণিকেরা সাধারণত সশস্ত্র এবং দলবদ্ধ হয়ে চলতো। এর কারণ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধ, দস্যুতা ও বাণিজ্যের সীমারেখা যেখানে ক্ষীণ সেখানে এটাই স্বাভাবিক, এমন কি অপরিহার্য। এমনি করে ইয়োরোপের বণিকদের ভিতর যূথবদ্ধতার ভিত্তি রচনা হলো।

বাজার ছাড়া বাণিজ্য চলে না। দূরপাল্লার বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শহর ও গঞ্জের বৃদ্ধি হলো। পণ্য বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ এবং প্রাকৃতিতেও পরিবর্তন দেখা গেল। যারা একদিন গ্রামের বাজার অথবা স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে দ্রব্যসামগ্রী গড়ত, তারাই ক্রমে দূরের বাজারের বণিকদের জন্য তাদের আজ্ঞা অনুযায়ী পণ্য যোগান দিতে শুরু করল। ভবঘুরে বণিকদেরও এবার কেসথাও আস্তানা গাড়া প্রয়োজন হলো।

মন্দির অথবা দুর্গকে কেন্দ্র করে যেসব নগরের কথা আগে বলেছি, তারই উপকণ্ঠে বণিকেরা প্রথমে আস্তানা গেড়েছিল। পরে নতুন নগরের পত্তন হয়। মধ্যযুগীয় নগরের সঙ্গে এদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল। এদের আইন এবং আদর্শ, সংগঠন ও সামাজিক পরিবেশ সবই ছিল স্বতন্ত্র। 'বুর্জোয়া' শব্দটির আজকাল বহুল প্রচলন দেখা যায়। ঐতিহাসিকভাবে বণিকদের নিয়ে এই যে নতুন ধরণের নগর, এরই প্রধান অধিবাসীরা হলো 'বুর্জোয়া'। ধর্মযাজক ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে এই একটি নতুন ক্ষমতাবান শ্রেণী এইভাবে ইয়োরোপীয় সমাজে যোগ হলো।

কৃষিপ্রধান যে সমাজজীবনের সঙ্গে মধ্যযুগীয় নিয়মকানুনের যোগ ছিল তাতে বণিকসম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড ও জীবনযাত্রার প্রয়োজন মিটছিল না। অতএব নতুন আইনকানুনের প্রয়োজন হলো। দেশে এক নিয়ম ; নতুন নগরগুলিতে ভিন্ন নিয়ম। এই স্বায়ত্তশাসিত নগরের প্রতিষ্ঠা ইয়োরোপের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বণিক যতদিন রাজার অধীনে ছিল ততদিন তার নিজস্ব জীবনযাত্রা ছিল সংকুচিত এবং পদে পদে বিড়ম্বিত। রাজার পক্ষে বণিকের ধন কেড়ে নেওয়াও অসম্ভব ছিল না। এখন নগরই হলো বণিকের দুর্গ, যেখানে সে অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত এবং যেখানকার নিয়ম তার নিজস্ব জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চাষীর অধিকার ছিল না যে, সে জমি ছেড়ে কোথাও যায়। দেশে দেশে দিকে দিকে যার যেথা স্থান তাকে সেটা খুঁজে নিতে দেওয়ার কথা মধ্যযুগীয় অনড় সমাজে ছিল অকল্পনীয়। বণিকের জীবনযাত্রায় কিন্তু স্বচ্ছন্দ গতিবিধির

অধিকার মৌল ও অনস্বীকার্য। আজকের কোনো প্রগতিবাদী হয়তো বলবেন যে, ওটা হলো বড়লোকের অধিকার, টাকা না থাকলে মানুষ যাবে কোথায়! সেদিনের ইতিহসস একথা বলে না। বাণিজ্যিক নগর স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বহু চাষী ভূস্বামীর কবল থেকে পালিয়ে শহরের ভিড়ে মিশে যেত। তাকে ধরবার জন্য হয়তো লোক ছুটত; কিন্তু খুঁজে পাওয়া সহজ হতো না। বারো শতকে আইন হলো যে, একটা নির্ধারিত সময় (এক বছর একদিন) পর্যন্ত যে থেকে যেতে পারবে নগরে, তাকে আর জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না। প্রবচন তৈরি হলো যে, শহরের হাওয়া গায়ে লাগলে আর মানুষকে বেঁধে রাধা যায় না।

মধ্যযুগে ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। ধর্মযাজকেরাই ছিলেন শিক্ষক। নতুন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের বাইরেও শিক্ষার আর একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হলো। ধর্মযাজকদের প্রভাব রইল! কিন্তু পাশে পাশে আর একটি ধারাও প্রবাহিত হতে থাকল। ইয়োরোপে উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ চিন্তার বাহন ছিল একদিন লাতিন ভাষা। কিন্তু বণিকের কারবার তো শুধু পণ্ডিতের সঙ্গে নয়। তাকে সাধারণ মানুষের কাছে আসতে হয়। অতএব নগরে নগরে ক্রমশ স্থানীয় ভাষার স্থান হলো—কাজে কারবারে, চিন্তার ক্ষেত্রে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে শুধু অর্থনীতি ও পৌরনীতিতে নয়, সংস্কৃতির ইতিহাসেও এক নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হলো।

দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও উত্তরে বাল্টিক সাগরকে ঘিরে ব্যবসায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নতুন ধাঁচের নগর প্রতিষ্ঠিত হলো তেমনি ইয়োরোপের অর্থনীতিতে আরও নানা পরিবর্তন দেখা দিল। এগারো থেকে তেরো শতকের মধ্যে জনসংখ্যা ও কর্ষিত জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। আর্থিক প্রসারের এই গতি কিন্তু অব্যাহত থাকেনি। চৌদ্দ শতকে এসে ইয়োরোপের অর্থনীতি যেন আর এগিয়ে যাবার দম পাচ্ছিল না। কৃষি ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবার রুদ্ধ হয়ে এলো; জনসংখ্যা অত্যধিক মনে হলো; মহামারী ও বিপত্তি দিকে দিকে দেখা দিল। তারপর ঐতিহাসিক নতুন অধ্যায় আবারও উন্মোচিত হলো বাণিজ্যের সহায়তায়। পনের শতকের শেষ প্রান্তে কলম্বাস ও ভাস্কো ডা গামা সমুদ্র পাড়ি দিলেন। ইয়োরোপের মধ্যযুগের অন্তিম অবসান সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রইল না।

৩

গ্রামীণ অর্থনীতির পাশে পাশে নাগরিক অর্থনীতির উদ্ভব হলো কি করে সে ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে দেখেছি। এবার এই দুই অর্থনীতির পারস্পরিক প্রভাব এবং ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। প্রশ্নটা অন্য ভাবেও রাধা যায়। কোনো দেশেই শিল্প ও বাণিজ্য সর্বত্র সমভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। কোনো অঞ্চল এগিয়ে গেছে; কোনোটি আবার পিছিয়ে পড়েছে। অগ্রসর অঞ্চলের সঙ্গে পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সম্পর্ক এখানে আলোচ্য।

জল উচ্চভূমি থেকে নীচে প্রবাহিত হয়। যদি বলা যেতো যে আর্থিক উন্নয়ন অথবা শিল্পায়ন অগ্রসর ভূমি থেকে ক্রমে অনগ্রসর অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, তবে ব্যাপারটা সবদিক থেকেই বেশ সহজ হতো। প্রকৃত পক্ষে উন্নয়নের ধারাটা অত সরল নয়, বরং বেশ খানিকটা জটিল। শিল্পায়ন কোথাও ছড়িয়ে পড়ে; আবার কোথাও ছড়ায় না। কি করে

ছড়ায় আর কেনই বা ছড়ায় না, দুটিই আলোচনার যোগ্য প্রশ্ন।

ধরা যাক, সাধারণভাবে অনগ্রসর একটি দেশের কোথাও কোনো ভাবে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর একটি শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলো। যেমন ইয়োরোপে বাণিজ্যের প্রসারের প্রথম যুগে সেই পশ্চাৎপদ মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে, আজ যেখানে বেলজিয়ম, সেইখানে, নিয়মের ব্যতিক্রমের মতো দেখা দিয়েছিল একটি কর্মব্যস্ত শিল্পাঞ্চল, ফ্ল্যাণ্ডার্স নামে যার পরিচিতি। শহরে অথবা শিল্পাঞ্চলে ঘনবসতি ; সেখানে খাদ্যের চাহিদা আছে, কিন্তু সেই মতো খাদ্য উৎপন্ন হয় না। খাদ্যের সঙ্গে আরও চাই শিল্পের জন্য কাঁচা মাল। অতএব শহরের সঙ্গে গ্রামের একটা সম্পর্ক গোড়া থেকেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। গ্রামের চাষীর ফসল বিক্রী হয় শহরের বাজারে। গ্রামে কারও কারও হাতে টাকা আসে। সেই টাকা আবার খরচও হয় শহরের বাজারে। নগরে যেমন কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা আছে, পল্লীতেও তেমনি ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পজাতদ্রব্যের জন্য নতুন রুচি।

অগ্রসর ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলের ভিতর পণ্য বিনিময়ের এটাই প্রাথমিক ছবি। এই ধরনটাও কিন্তু ধীরে ধীরে বদলায়। অনগ্রসর অঞ্চলে একবার যখণ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য চাহিদা তৈরি হয় তখন এই প্রশ্নটা অনিবার্যভাবেই একদিন ওঠে যে, স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য কি স্থানীয় শিল্প গড়ে তোলা যায় না ? অনুন্নত অঞ্চলেরও কতকগুলি সুবিধা আছে ; যেমন সেখানে জমির দাম কম, শ্রমও সেখানে মহার্ঘ নয়। অতএব কাঁচামাল অন্যত্র না পাঠিয়ে স্থানীয় ভাবে তাকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করা হবে না কেন ? সেটাই হয়তো অপেক্ষাকৃত লাভজনক। অনেক সময় অগ্রসর অঞ্চলের শিল্পপতিরাই এগিয়ে আসে অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য। মূলধন ও কারিগরী বিদ্যা সবই প্রয়োজন মতো পাওয়া যায় বাণিজ্যের বর্ধিষ্ণু কেন্দ্রগুলি থেকে। এইভাবে অগ্রসর অঞ্চল থেকে শিল্প ছড়িয়ে পড়ে অনগ্রসর অঞ্চলে। ।

এটাই যে সব সময়ে ঘটে তা নয়। তবে এ রকমও ঘটে। আর এর উদাহরণেরও অভাব নেই। ফ্ল্যাণ্ডার্সে ছিল পশমের বিখ্যাত বয়নশিল্প। অতএব সেখানকার বাজারে পশমের বিরাট চাহিদা ছিল। তারই প্রভাব গিয়ে পড়ল, পনেরো ও ষোল শতকে, সেদিনকার নেহাতই অনুন্নত ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর। এর ফলে কৃষির ক্ষেত্রে দেখা দিল বড় রকমের পরিবর্তন। ইংল্যাণ্ড ঝুঁকলো বেশি করে পশম উৎপাদনের দিকে, সেই পশম বিক্রী হতো বিদেশী বাজারে। কিছুকাল পরে পশমের বয়নশিল্পও দ্রুত প্রসারিত হতে লাগল ইংল্যাণ্ডে। ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে অনেক কারিগর সাগর পার হয়ে এলো। আগেও এসেছে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা পছন্দ করেনি। এবার কিন্তু রাজা বুঝতে পারলেন যে, এদের দিয়ে দেশের উপকার হবে। এই ভাবে অগ্রসর ফ্ল্যাণ্ডার্স থেকে শিল্প ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল অনুন্নত ইংল্যাণ্ডে।

ষোল শতক থেকে উনিশ শতকে আসা যাক। ইংল্যাণ্ড এবার পৃথিবীর সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ। আঠারো শতকের শেষ দিকে ম্যানচেস্টারে তুলোর বয়নশিল্পে 'বিপ্লব' ঘটে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিল্পের দিক থেকে তখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত। ইংল্যাণ্ডের চাই গম ও তুলো। উনিশ শতকে এই দু'টি বস্তুই বহু পরিমাণে আসতো কৃষিপ্রধান আমেরিকা থেকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রেও শিল্প ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না। ইংল্যান্ডের অনুকরণে নিউ ইংল্যাণ্ডে আধুনিক বয়নশিল্প দ্রুত প্রসারিত হলো , দেশময় রেলপথ স্থাপিত হলো ; লোহার কারখানা, যন্ত্রপাতি সবই জেগে উঠল। আর এই শিল্পায়নের জন্য সেদিন প্রচুর পরিমাণে মূলধনও এসেছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ ইংল্যাণ্ড থেকে।

উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক শিল্পায়ন পৃথিবীর ছোট একটা প্রান্তেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তা সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমশ এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তবে গত দু'শো বছরের ইতিহাসের এটাই একমাত্র কথা নয়। আরও একটা বড় কথা আছে। সেটা প্রথমটির প্রায় বিপরীত। গত দু'শো বছরে পৃথিবীর উন্নত ও আর্থিকভাবে অনুন্নত দেশগুলির ভিতর তারতম্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে, এমন উদাহরণেরও অভাব নেই। আঠারো শতকে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য দেশের ভিতর আর্থিক তারতম্য যতটা ছিল, বিশ শতকে তার চেয়ে প্রশ্নাতীতভাবে বেশি। সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য বেশি দূর যেতে হয় না ; আমাদের চোখের সামনেই এ ঘটনা ঘটেছে। গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস কার জানা নেই ? উন্নত দেশগুলি আরও দ্রুত এগিয়ে গেছে, পশ্চাৎপদ দেশগুলি তাল রাখতে পারেনি। কেন এমন ঘটে ? এর তো একটা ব্যাখ্যা চাই।

প্রথমে চুম্বকাকারে মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। নগরে বা অগ্রসর শিল্পাঞ্চলে এমন কতগুলো সুবিধার সমন্বয় ঘটে যাতে পুঁজি বিনিয়োগ সেখানেই অপেক্ষাকৃত লাভজনক হয়। অনুন্নত অঞ্চলে যদি বা মজুরী নিম্নমান তবু ঐ সব সুবিধার অভাবে সেখানে মূলধনের প্রয়োগ বাধা পায়। একটি সাফল্য যেমন অন্য সাফল্যকে ডেকে আনে, এক শিল্পকে অন্য শিল্প তেমন কাছে টানে। এই পারস্পরিক সান্নিধ্য থেকে উভয়েই লাভবান হয়। একে আমরা বলব শিল্পের সান্নিধ্য গুণ। সান্নিধ্য গুণে অগ্রসর শিল্পাঞ্চলে প্রয়োজনীয় অনেক বস্তু সহজে লভ্য হয়। সেখানে অনায়াসে টাকা লগ্নি পাওয়া যায়। দূর বাজারের খবর সেখানে আগে এসে পৌঁছয়। নানা জাতীয় কর্মকুশলী লোক একত্র মিলিত হয়। পথঘাট, বিদ্যুতের সরবরাহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সবই উন্নত ধরনের হয়। সেই সঙ্গে উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের ভিতর একটা সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রার ব্যবধানও গড়ে ওঠে যাকে অতিক্রম করা কষ্টসাধ্য। ফলে মূলধন ও কর্মকুশলতা যেখানে একবার শিকড় গেড়ে বসে সেখানেই স্তূপীকৃত হতে থাকে। তার সামান্য উচ্ছিষ্টই অনগ্রসব অঞ্চলের হাতে পড়ে। উন্নত অঞ্চলের প্রত্যক্ষ স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বাদবাকীর ভাগ্যে জোটে।

আর্থিক উন্নয়ন কি করে নগর থেকে পল্লীতে, এক অঞ্চল থেকে ভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সে কথা আগে বলেছিলাম। আবার কেন ছড়ায় না, বরং উন্নতি এবং অনুন্নতির দুই বিপরীত মেরু সৃষ্টি হয়, সে কথা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করছি। কোথাও উন্নয়নের প্রসারধর্মিতাই প্রবল ; আবার কোথাও বৈষম্যের প্রবণতটা অধিক শক্তিশালী। দুটি ছবি পাশাপাশি দেওয়া দরকার।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের প্রধান গ্রন্থে 'জাতীয় ধনের কারণ অনুসন্ধান' করা হয়েছে। গ্রন্থটির একটি পরিচ্ছেদের নাম "কি করে শহুরে ব্যবসায়ে পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হলো"—হাউ দ্য কমার্স অব দ্য টাউনস্ কনট্রিব্যুটেড টু দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্য কানট্রী)। স্মিথ লিখেছেন, শহরের ব্যবসায়ীরা প্রায়ই জমি কিনে গ্রামের ভদ্রলোক হতে চান। এটা গ্রামের পক্ষে ভালো কথা। এই ব্যবসায়ীরা টাকা ব্যবহার করতে জানেন, আর গ্রামের বনেদী ভদ্রলোকেরা জানেন শুধু টাকা উড়াতে। ব্যবসায়ীরা জমির উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগ করতে ভয় পান না, সাবেকী লোকদের সে অভ্যাস নেই। অ্যাডম স্মিথ এই কথাগুলি একেবারে কল্পনার ওপর নির্ভর করে লেখেননি। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর যোগ আছে। গ্ল্যাসগোকে কেন্দ্র করে যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তাঁরাই

স্কটল্যাণ্ডে কৃষির উন্নয়নে একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ স্মিথের ঐ কথাগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতা মোটেই মেলে না। কলকাতার প্রতিষ্ঠা হলো বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে। উনিশ শতকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরাও বাণিজ্যের আকর্ষণে এই মহানগরীতে এসেছেন, টাকা জমিয়েছেন, জমি কিনেছেন—কিন্তু কৃষির উন্নতি কতটুকু হয়েছে? কলকাতার সঙ্গে দেশের পল্লী অঞ্চলের ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে। কলকাতা পল্লীর শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি। ঐতিহাসিক প্রতিবাদের মতো রবীন্দ্রনাথ অবশেষে কলকাতা ত্যাগ করে পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় নিলেন। নিয়মের অপর পারে শ্রীনিকেতন দাঁড়িয়ে রইল একটি বিরল ব্যতিক্রমের মতো।

শিল্পের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের এই তারতম্য চোখে পড়ে। রেলপথের স্থাপনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইয়োরোপের বহু দেশে শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। মার্ক্সের স্বদেশ জার্মানিতে রেলপথই, কারও কারও মতে, শিল্পবিপ্লবের দ্বার খুলে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জগতে শিল্পায়নের ইতিহাসের সঙ্গে মার্ক্স সুপরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষে যখন রেলপথের প্রবর্তন হলো তখন, অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন যে, এদেশের শিল্পায়ন এবার অপ্রতিরোধ্য। তারপর একটা পুরো শতাব্দী কেটে গেল। আধুনিক শিল্প ভারতীয় অর্থনীতির একটি সংকীর্ণ প্রান্তদেশ অতিক্রম করে অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার পেল না।

শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান বাজার: বিদেশের বাজার অথবা স্বদেশের। অধিকাংশ উন্নতিশীল দেশে বাণিজ্য উন্মুক্ত করেছে বিদেশে বাজার, আর কৃষির উন্নতির ফলে প্রসারিত হয়েছে আভ্যন্তরীণ বাজার। জাপানের উদাহরণ থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়। ভারতের ক্ষেত্রে একই নিয়মের প্রমাণ মেলে উল্টো দিক থেকে। বিদেশের বাজার অধিকার করে আমরা দ্রুত শিল্পায়নের পথে এগিয়ে যাব এমন সম্ভাবনা ছিল না। আবার নানা ঐতিহাসিক কারণে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির জড়তাও বহুদিন পর্যন্ত ভাঙ্গেনি। কাজেই আভ্যন্তরীণ বাজারও ব্যাপ্তিলাভ করতে পারেনি। স্বদেশী আন্দোলনের সাহায্যে যদি-বা এই সংকুচিত দেশীয় বাজারের আরও একটু বড় অংশ আমাদের অধিকারে আসত তবু সেটা ভারতীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট হতো না। প্রয়োজন ছিল 'কৃষি বিপ্লব' বা কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন। কৃষিতে অনুন্নত একটা দেশে রেলপথ বসালেই শিল্পবিপ্লব ঘাটে না।

এটা শুধু এদেশের অভিজ্ঞতার কথাই নয়। বরং এটাই আর্থিক বিবর্তনের অন্যতম প্রধান রূপ, যার উদাহরণ মেলে বহু 'ঔপনিবেশিক' দেশে। এসব দেশের কথা মনে রেখেই কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি, যেমন, ওলন্দাজ লেখক বোয়কে, এক বিশেষ জাতীয় অর্থনীতির কথা বলেছেন, যার নাম দিয়েছেন তাঁরা "ডুএল ইকনমি" বা দ্বিখণ্ডিত অর্থনীতি। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবে সাবেকী অর্থনীতিও ক্রমশ হয়ে উঠেছে আধুনিক। দ্বিখণ্ডিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এই যে, সেখানে আধুনিক ও সাবেকী অর্থনীতির দীর্ঘকালীন সহাবস্থান চলেছে, একের প্রভাবে অন্যের চরিত্রের মৌল পরিবর্তন ঘটছে না।

এই বর্ণনায় একটু ভুল আছে। যেসব দেশের কথা আমরা বলছি সেখানে আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের পাশেই পাওয়া যাবে অনুন্নত গ্রামীণ অর্থনীতি এবং প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টির আধুনিকীকরণের ঝোঁক প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু তাই বলে পরস্পরের প্রভাবে এদের কোনো চরিত্রের পরিবর্তন ঘটছে না, একথা বলা যায় না। দ্বিখণ্ডিত অর্থনীতির

জটিলতম সমস্যার মূলেই আছে এই পারস্পরিক প্রভাব।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক সময়ে কৃষি ও কুটিরশিল্প মিলে একটা স্বাভাবিক ভারসাম্য ছিল। আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের প্রভাবে উন্নয়নের ধারা যেসব দেশে সেই প্রাচীন অর্থনীতির অভ্যন্তরে গিয়ে পৌঁছয়নি সেখানেও প্রাচীন ভারসাম্য অচিরেই ভেঙ্গে পড়েছে। এদেশে লোকসংখ্যা গণনার হিসেবে এক সময় দেখা গিয়েছিল যে, ১৮৮১ থেকে ১৯৩১ সালের ভিতর শিল্পের ওপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা অনেকটা কমে গেছে। এই হিসাবগুলো অবশ্য নির্ভুল নয় ; বরং বড় রকমের ভুলই এতে আছে। কিন্তু প্রধান কথাটা মনে রাখা দরকার। গত শতাব্দীর শেষ দিকে এবং এ শতাব্দীর গোড়ায় যখন রেলপথ প্রবর্তনের কল্যাণে এবং অন্যান্য কোনো কোনো আধুনিক শিল্পের বিকাশের ফলে সাধারণভাবে কৃষিতে নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা হ্রাস পাবে এমন আশা করা স্বাভাবিক ছিল, তখন লোকগণনায় ঠিক উল্টো ফলটাই দেখা গেল কেন ? এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কুটিরশিল্পের ভাঙ্গনই এই অস্বাভাবিক পরিণতির একটি প্রধান কারণ।

আধুনিক শিল্পের সঙ্গে এসেছে বিজ্ঞান ও আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র। দেশের অনুন্নত অঞ্চলেও এর ফলে মৃত্যুর হার কমেছে। অতএব লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেড়েছে। অথচ এসব দেশে আধুনিক শিল্প এমন শক্তি অর্জন করতে পারেনি যে, এই দ্রুত বর্ধমান লোকসংখ্যার জন্য কর্মের সংস্থান হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে একদিকে কুটিরশিল্পের অবক্ষয়, অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি—এ দুয়ের প্রভাবে অর্ধবেকারদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। এদের সবাই গ্রামে বসে ধুঁকতে রাজী নয়। গ্রাম ছেড়ে নগরে মানুষ এসেছে জীবিকার সন্ধানে। কিন্তু নগরে, অর্থাৎ আধুনিক শিল্পে, এদের জন্য কর্মের সুযোগ সীমাবদ্ধ। অতএব গ্রামে ছিল যারা অর্থবেকার, নগরে এসে তাদের অনেকে পূর্ণ বেকার। অথবা এখানেও শিল্পের বাইরে কোনো অপ্রয়োজনীয় কাজে তারা আবারও অর্ধবেকার। কিংবা তাদের স্থান হয় 'সমাজবিরোধী'দের দলে।

অতএব উন্নতির ধারা যেখানে নগর থেকে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েনি সেখানেই যে প্রাচীন ও আধুনিক দুই অর্থনীতি পরস্পরের প্রতি পরম অনীহায় এক সহযোগহীন অথচ দ্বন্দ্বহীন সমান্তরাল জীবনযাপন করছে এমন নয়। বরং নিষ্ফল আঘাতে এরা একে অন্যকে ক্রমাগত রুগ্ন করে তুলছে।

গ্রামে পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য, নগরের অসম ঐশ্বর্যের প্রভাবে যা আরও অসহনীয়। মহানগরীতে বেড়ে চলেছে তাদের সংখ্যা, যারা একে ত্যাগ করতে পারে না অথচ ঘৃণা করে। যেখানে বাস করে আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ, সেই অর্ধোন্নত দেশগুলিতে কি-সামাজিক, কি-সাংস্কৃতিক, কি-আর্থিক, যে-সব সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে তার মূলে আছে গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের এক সামঞ্জস্যবিহীন সহাবস্থান। এদের ভিতর কোনো শর্তেই কি মৈত্রী সম্ভব নয় ?

৪

নগর গ্রামের ওপর চেপে বসে ; গ্রামকে শোষণ করে ; মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয় ; সমাজকে রুগ্ন করে। আধুনিক শিল্পায়নের বিরুদ্ধে এই ছিল গান্ধীর অভিযোগ। নগর ও গ্রামের সম্পর্কের ভিতর তিনি ঔপনিবেশিক শোষণের আদলই খুঁজে

পেয়েছিলেন। পশ্চিম ইয়োরোপে শিল্পায়নের অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে মার্ক্সের মনে হয়েছিল যে, ধনবাদী সমাজের প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব। গান্ধীর অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্য এক সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেল : নগর ও গ্রামের দ্বন্দ্বই সমাজের প্রধান সমস্যা। উপনিবেশ শোষণ করে ইংল্যাণ্ডের যে উদ্‌বৃত্ত সম্পদ তাতে যেমন সে-দেশের পুঁজিপতি ও শ্রমিক উভয়েই লাভবান, গ্রাম থেকে আহৃত ধনে তেমনি নগরের সকল শ্রেণীই অংশীদার। নগরের শ্রমিক অথবা করণিকও এ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নয়। গ্রামের দারিদ্র্যের তুলনা হয় না। অর্থ ও ক্ষমতা উভয়েরই কেন্দ্রস্থল নগর। এখান থেকেই দেশ শাসিত হয় এবং সে শাসন দেশের স্বার্থে নয়। এই অতিকেন্দ্রিকতার অত্যাচার সমাজতন্ত্রের নামেও আসতে পারে। আধুনিক শিল্পায়নের ভিতরই নগরভিত্তিক শাসন ও শোষণের ঝোঁক নিহিত আছে, এই ছিল গান্ধীর মত। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য : নেহরু মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র হলেই এই সমস্যা মিটে যাবে, কিন্তু আমি তা মনে করি না।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি ও কুটিরশিল্পের পারম্পর্যের ভিত্তিতে যে স্বয়ংভরতা একদিন স্থাপিত হয়েছিল, সেই দিকে গান্ধী চোখ ফেরালেন। ঐখানেই তিনি পেলেন তাঁর বাঞ্ছিত ভবিষ্যতের ঠিকানা। মরিস ফ্রিডম্যানকে গান্ধী বলেছিলেন, বৃহৎ শিল্পের ওপর নির্ভর করলে গ্রাম শোষিত হবেই, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এটাই অনিবার্য। অতএব আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে আত্মনির্ভর গ্রামের ওপর, যেখানে উৎপাদন হবে মুখ্যত প্রয়োজন অনুযায়ী।

গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কয়েকটি কথা সহজেই তোলা যেতে পারে। ১৯৪৫ সালে গান্ধীর উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে নেহরু লিখেছিলেন : 'আমার এটা অনিবার্য মনে হয় যে, আধুনিক যানবাহন এবং আরও বহু রকমের আধুনিক উদ্যোগ আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। এ ছাড়া গতি নেই। যদি তাই হয় তবে তো বেশ কিছু ভারী শিল্প এসেই গেল। বিশুদ্ধ গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে এর কতটুকু সঙ্গতি! তা ছাড়া বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে, সামরিক ও আর্থনীতিক দু-রকমের আক্রমণের বিরুদ্ধেই, আত্মরক্ষার কথাও এই প্রসঙ্গে চিন্তা করতে হবে। আমার তো মনে হয় না যে, ভারত বস্তুত স্বাধীন হতে পারবে, যদি না সে শিল্পকলার দিক থেকে উন্নত দেশ হয়।' ভারী শিল্পের প্রয়োজন গান্ধীও স্বীকার করেছিলেন ; তাঁর শেষ দিকের লেখাতে সেটা সন্দেহাতীত। কিন্তু ওটাকে যেন তিনি নিয়মের ব্যতিক্রমের মতো একবার উচ্চারণ করে তারপর ভুলে থাকতে চাইছিলেন। অথচ প্রয়োজন এখানে নিয়মটাকে নতুন করে লেখা। ভারী শিল্পকে একবার গ্রহণ করলে তাকে ভুলে থাকবার জো নেই। ওটাকে রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেব, এ কথা বললেও সমস্যার সমাধান হয় না। ভারী শিল্পকে প্রবেশ করতে দেওয়া মানেই হলো নগরকে মেনে নেওয়া। আর তা হলেই নগরের সঙ্গে গ্রামীণ সমাজের সম্পর্কের প্রশ্নটা নতুন করে ভাবতে হয়।

আরও কথা আছে। শহর আবশ্যক শুধু ভারী শিল্পের আশ্রয় হিসেবেই নয়। স্মরণ করা প্রয়োজন ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা। গ্রামীণ অর্থনীতির অভ্যন্তর থেকে সেই শক্তি বড় আসে না যার জোরে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। বরং গ্রামীণ অর্থনীতির স্বাভাবিক ঝোঁক নিশ্চলতার দিকে। বাইরের ধাক্কাতেই সেই নিশ্চলতা কাটে। সেই ধাক্কা আসে নগর থেকে। আঠার-উনিশ শতকের অনেক চিন্তাবীর ও অর্থনীতিবিদই এ কথাটা বুঝেছিলেন। মার্ক্সও বুঝেছিলেন। গ্রামের ওপর শহরের আধিপত্য তিনি লক্ষ

করেছিলেন। কিন্তু এর ভিতর ইতিহাসের একটা অগ্রগতির আভাসই তিনি পেয়েছিলেন। আধুনিক শিল্পের আঘাতে যখন ভারতের গ্রামগুলি ভাঙ্গনের মুখে তখন তিনি লিখেছিলেন, এ করেই তো জাতিপাঁতির বাঁধন ভাঙ্গবে। আরও শক্ত ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন, 'এটা যতই কষ্টজনক হোক না কেন, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই গ্রাম্য সমাজই ছিল প্রাচ্য স্বৈরাচারের ভিত্তি। একে না ভেঙ্গে মানুষ তার ভবিষ্যৎকে জয় করবে কী করে!' মার্ক্সের কথাগুলো হয়তো একটু অতিরিক্ত জোরালো হয়েছিল। অন্তত এ দেশে গ্রামীণ অর্থনীতি যতটা বিপর্যস্ত হয়েছে জাতিভেদ ততটা দুর্বল হয়নি, নগর থেকে সঞ্চারিত হয়নি গ্রাম্যসমাজে বাঁধন ভাঙ্গার শক্তি। তবু উনিশ শতকের প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা সত্য আছে যাকে উপেক্ষা করা ভুল।

আধুনিক যুগের জ্ঞানবিজ্ঞান, বৈচিত্র্যধর্মিতা, মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে মুক্তি, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার আদর্শ এবং আর্থিক উন্নয়ন সম্বন্ধে নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনা নগরের পরিবেশেই লালিত হয়েছে। আমাদের সামনে সমস্যা এই নয় যে, গ্রামের সঙ্গে শহরের সম্পর্ক কী করে ছিন্ন করা যায়। বরং এ দুয়ের সম্পর্ক কী করে আরও অর্থপূর্ণ, আরও ফলবান করেতোলা যায় সেটাই মূল সমস্যা। ঔপনিবেশিক আধিপত্যে গান্ধীর আপত্তি ছিল, পারস্পরিক সহযোগিতায় আপত্তি ছিল না। বরং শোষক ও শোষিত দেশের ভিতর সম্পর্কের এই সংশোধনই তিনি চেয়েছিলেন। গ্রাম ও শহরের ভিতর সম্পর্কেও এই পরিবর্তন আনা যায় কিনা সেটাই বিচার্য।

এ দেশে নগর ও পল্লীর ভিতর দূরত্ব বড় বেশি। ছোট ও মাঝারি আকারের শহর নিতান্তই অপর্যাপ্ত। অথচ ছোট শহরের অথবা গঞ্জের সঙ্গেই গ্রামের সাধারণ কাজের সম্পর্ক চলে ভালো। নগরে গিয়ে গ্রামের মানুষ হারিয়ে যায়, গঞ্জে গিয়ে সে দিনের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরবার মুখে প্রয়োজন মতো দু-একটা জিনিস, কিছু নতুন খবর, বাইরের পৃথিবীর এক ঝিলিক সঙ্গে নিয়ে ফেরে। গ্রামের সঙ্গে বৃহত্তর পৃথিবীর যোগাযোগের সেতু এই ছোট শহর। প্রতিটি গ্রামের কয়েক মাইলের ভিতর একটি করে মহানগরী বসানো যায় না, কিন্তু ছোট শহর এনে দেওয়া যায়। এ ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের অবস্থার পার্থক্যটা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে আছে গোটা পনেরো গ্রামের জন্য একটি ছোট শহর। ও সব দেশে আমাদের তুলনায় পথঘাটও অনেক ভালো। আমাদের দেশে শহর-পিছু গ্রামের সংখ্যা দুশো, কোথাও কোথাও আরও অনেক বেশি। কানপুর অঞ্চলের কথা ধরা যাক। মোটামুটি সতেরো হাজার বর্গ মাইলের একটি অঞ্চল; এতে আছে একটি মহানগর (কানপুর), ২৪টি শহর এবং ১১,২৩৯টি গ্রাম। অর্থাৎ, শহর-পিছু গ্রামের সংখ্যা ৪৬৮। এটা অবশ্য এর গণনার আগের হিসেব, কিন্তু নতুন গণনার এমন আর কি বড় পার্থক্য হবে?

গান্ধীবাদীরা কুটির শিল্পের ওপর জোর দিয়ে থাকেন। তাঁরা শিল্পকে ছড়িয়ে দেবার কথা বলেন এবং এজন্য ছোট শিল্পের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই সব ছোট শিল্পের সঙ্গে কৃষির যোগাযোগ আছে, সকল ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে। স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে স্থানীয় ছোট এবং মাঝারি ধরনের শিল্প। ভবিষ্যতে এদিকে আমরা আরও মনোযোগী হব। যা আজ জমিতে ফলছে তার কথা ভাবলেই চলে না, যা ফলতে পারে তার কথাও ভাবতে হবে। আধুনিক শিল্পকে আজ দেশ থেকে তুলে দেওয়া যাবে না। সহায়ক ও প্রতিদ্বন্দ্বী দুই হিসেবেই তাকে মেনে নিয়ে

তবে গ্রামীণ শিল্পকে এগোতে হবে। কুটির শিল্পকে রক্ষা করবার জন্য সরকারী সাহায্য চাওয়া আমাদের অভ্যস্ত রীতি। কিন্তু শুধু দান-অনুদানের ওপর নির্ভর করে ছোট শিল্পকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

অতএব গান্ধীবাদীরাও ছোট শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির প্রয়োজন স্বীকার করেন। এই প্রসঙ্গে আরও দুয়েকটা কথা এসে যায়। উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি অবশ্যই প্রয়োজন ; কিন্তু কোনো শিল্পের কার্যকুশলতা তার পরিপার্শ্বের ওপরও বহু পরিমাণে নির্ভর করে। পুরনো গ্রামীণ শিল্পে আজ আর ফিরে যাওয়া যাবে না। ক্রমশই বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়বে। কেনাবেচার জন্য নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে এসে যায় পথঘাটের কথা, বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহের কথা, শিক্ষার কথা। কোনো পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলকে তুলতে হলে শুধু কুটির শিল্পের জন্য সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট নয়। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন পথঘাট, শিক্ষা, সেচ ও বিদ্যুৎ, যার সাহায্যে অঞ্চলটির সামগ্রিক উন্নয়নের ভিত তৈরি হয়।

গ্রামের কাছাকাছি ছোট শহরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে। শহর ও গঞ্জ জাগিয়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা চাই। এটাও উন্নয়নের ভিত তৈরি করার কাজেরই অঙ্গ। কোনো একটি অঞ্চলে এত মাইল রাস্তা হবে বলাটাই যথেষ্ট নয়। গ্রাম এবং বর্তমান ও সম্ভাব্য ছোট শহর নিয়েই আমরা সেই বিন্দুগুলো পাই, যাদের ভিতর রেখা টেনে টেনে পথঘাটের একটা রূপরেখা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এ কথাটা শুধু পথঘাট সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়। শিক্ষা, বিদ্যুৎ সব কিছু পরিকল্পনার জন্যই এই রকম কয়েকটি স্থির বিন্দু প্রয়োজন হয়। গ্রাম এবং নতুন নতুন উন্নয়ন কেন্দ্র নিয়েই রচনা করা যায় আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য আধার।

বিকেন্দ্রীকরণেরও একটা সীমা আছে। এবং সে সীমা যুগে যুগে বদলায়। মধ্যযুগের বিকেন্দ্রীকরণ আধুনিক যুগে সম্ভব নয়। গ্রামীণ শিল্পকেও আজ প্রয়োজন মতো অনেক সময়ে গ্রামের নিকটবর্তী কোনো উন্নয়ন কেন্দ্রের সান্নিধ্য খুঁজতে হবে। এ প্রসঙ্গে জাপানের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করা যেতে পারে। ছোট শিল্পে পারদর্শিতার জন্য জাপান গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই. এ. জে. জনসন সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর পুস্তকে আমাদের একটি ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, মেইজি যুগে জাপানের গ্রামীণ শিল্প কৃষকের কুটিরে কুটিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ ধারণা ঠিক নয় ; বরং এই সব শিল্প, নামে গ্রামীণ হলেও, কার্যত অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের নিকটবর্তী শহর-বাজারেরই সংলগ্ন ছিল। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে এমন হতো তা নয়। আগে শিল্পের যে সান্নিধ্যগুণের কথা আলোচনা করেছিলাম, ছোট শিল্পের বেলায়ও তা অল্প-বেশি প্রযোজ্য। ছোট শিল্পও পরস্পরের এবং বড় শিল্পের সান্নিধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ সুবিধা লাভ করে। কোন শিল্পের ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ কতদূর সম্ভব অথবা তাতে তার আর্থিক দক্ষতায় কতখানি ইতরবিশেষ হবে, বলা বাহুল্য সেটা তার বিশেষ গঠন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

অতএব বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি চাই, মাত্রা রক্ষা ক'রে। অতিকায় নগরে ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এক কথা, আর গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব অন্য কথা। গ্রাম, ছোট ও মাঝারি শহর এবং কেন্দ্রীয় নগর, এ তিনের পারস্পরিক নির্ভরতাকে আশ্রয় করে পরিকল্পনা বচনা করা আবশ্যক। বিকেন্দ্রিক অর্থনীতির ধারণাটাকেও এই আধারেই স্থাপনা করা চাই। গঞ্জের চারদিকে ছড়ানো গ্রাম ; নগরকে

বেষ্টন করে ছোট ছোট শহর। গ্রামের জন্যই গঞ্জ, গঞ্জকে ছাড়া গ্রামের চলে না। গ্রামের প্রয়োজন মেটে ছোট শহরে, আবার ছোট শহরকে প্রয়োজন মেটাবার জন্য যেতে হয় আরও বড় নগরের কাছে। কোনো কোনো শিল্পের স্বাভাবিক অবস্থান নগরে, আবার কারও স্বাভাবিক বাসভূমি গ্রামে অথবা কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্রস্থিত বাজারে। এই সব বিবিধ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ছোট বড় মাঝারি গ্রাম ও নগরকে হাত ধরাধরি করে চলতে হবে।

অর্থনীতিতে যদি বিকেন্দ্রীকরণ চাই, তবে সেই সঙ্গে ভেবেচিন্তে শাসনব্যবস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন আনতে হবে। আঞ্চলিক উন্নয়নের ওপর জোর দিতে গেলে, কেন্দ্রকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিছুটা ছাড়তে হবেই। অথচ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে শাসনের ভার ছেড়ে দিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হবে এমনও নয়। অনুন্নত অঞ্চলকে যদি বলা হয় যে, তুমি এবার নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী নিজের ইচ্ছা মতো চল, তবে সে ক্রমাগতই পিছিয়ে থাকবে এমন সম্ভাবনাই বেশি। তার সামর্থ্যই যে কম, অতএব বিশেষ সহায়তা আবশ্যক। সেটা পাওয়া যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এই সহায়তার শর্ত হিসেবে যদি তাকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয় তা হলেও আবার বিভ্রাট ঘটবে পদে পদে। প্রতিটি ব্যর্থতার জন্য যতদিন সে অন্য কাউকে দোষ দিতে পারবে ততদিন তার আত্মশক্তি জাগরিত হবে না।

আমাদের শিক্ষা এককেন্দ্রিক ; সেই কেন্দ্রটি মহানগরীতে। জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োজনের একটা যোগ থাকা উচিত ! মহানগরীর প্রয়োজন এক, গ্রামের প্রয়োজন ভিন্ন। আমাদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে গ্রামেব প্রয়োজনের যোগ নেই। এমন কি, এ দেশের মহানগরেরও যোগ ঘনিষ্ঠ নয়। জ্ঞান উৎপাদনের কলকারখানাগুলি উন্নত দেশে ; সেখান থেকে তৈরি বিদ্যা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফত এ দেশের বিদ্যার্থীদের ভিতর বিতরণ করা হয়। জ্ঞানের ব্যবসায়ে এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চলেছে। কোনো দেশ থেকেই অবশ্য জ্ঞান আহরণ করতে কারও লজ্জাবোধ করা উচিত নয় ! কিন্তু বিদ্যার সঙ্গে বেত্তার এবং বেত্তার সঙ্গে তার জীবনের একটা যোগ থাকা আবশ্যক। রোগশোক এ দেশের গ্রামে গ্রামে। ডাক্তার তৈরি হয় মহানগরীতে। সেই অধীত বিদ্যায় গ্রামের রোগীকে এ দেশে সহজলভ্য উপকরণে কি করে যথাসম্ভব নিরাময় করা যায় ও সুস্থ রাখা যায়, তার প্রতি দৃষ্টি কম। ফলে আমাদের ডাক্তারীর ছাত্রের বিলেতে পেশা জমাতে অসুবিধা হয় না, কিন্তু স্বদেশের গ্রামে সে অসহায়। এ শুধু একটা উদাহরণ। মোট কথা, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যে, আমাদের প্রয়োজনের দ্বারা সেটা চালিত হয়। আর প্রয়োজন বলতে শুধু মহানগরীর প্রয়োজন নয়। এই বৃহৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনকেই বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

এমন কোনো দিন আসতে পারে, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কাজ করবে কোনো-না-কোনো মহানগরীতে, সন্ধ্যায় কাজের শেষে ফিরে যাবে নিজ নিজ পল্লীতে। অন্তত এটা সম্ভাবনার সীমার বাইরে নয়। কিন্তু এ কথাও নিশ্চিত যে, আরও বহুদিন পর্যন্ত গ্রামই হবে এ দেশের অধিকাংশ মানুষেব বাসস্থল ও কর্মস্থল। অতএব নগরের জীবনধারার সঙ্গে কলহান্তরিত পল্লীর মিলন ঘটানো এ যুগের একটা বড় কাজ। শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থনীতি, সব কিছুকেই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নয়তো কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

এই মিলন প্রচেষ্টা দূর ভবিষ্যতেও সম্ভবত অর্থহীন মনে হবে না। গ্রামীণ সমাজের

ত্রুটি যাই থাকুক না কেন, তার মূলে আছে পারিবারিক আদর্শ, সহজ প্রীতির আদর্শ। অপর পক্ষে নাগরিক সমাজে স্বাধীন ব্যক্তিমানুষ বৈচিত্র্যের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছে। এ দুয়ের কোনোটিকেই কি মানুষ ছাড়তে পারবে? নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে উভয়ের একটা সমন্বয়ের সন্ধান তাকে করতেই হবে।

প্রেম ও নিয়ম

আর্যদের একটি শাখা যখন ভূমধ্যসাগরের উপকূলে (গ্রীস ও নিকটবর্তী ভূখণ্ডে) উপনিবেশ স্থাপন করতে আসে, তারও আগে সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীদের ভিতর পূজিত হতেন বহু নামে কীর্তিত এক দেবী। দেবীর এক তরুণ প্রেমিক ছিলেন, প্রতি শীতের প্রাক্কালে যাঁর ঘটত মৃত্যু আর প্রতি বসন্তে পুনর্জন্ম। গ্রীক ভাষায় এই প্রাচীন দেবীর নামান্তর হলো হেরা। নবাগত গ্রীকদের দেবতা জিউস। (ইনি আদিতে আকাশেরই প্রতীক, যদিও কালক্রমে খানিকটা খামখেয়ালী হয়ে ওঠেন।) তিন শ' বছর জিউস হেরার পাণি প্রার্থনা করবার পর এঁদের পরিণয় সম্পন্ন হয়।

এই কিংবদন্তী আকস্মিক নয়। পৃথিবীর নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় এর বিকল্প কাহিনী খুঁজে পাওয়া যায়।

ইতিহাসের প্রথম যুগে মানুষ যখন বিস্মিত চোখে বিশ্বের দিকে তাকিয়েছে, তখন থেকেই দুটি ধারণা তাকে অভিভূত করেছে। একদিকে সে মুগ্ধ হয়েছে প্রকৃতির সঞ্জীবনী শক্তিতে, ঋতু পরিক্রমায়, শীতের পর বসন্তের আগমনে, মৃতুকে জয় করে জীবনের নব নব আবির্ভাবে। এই বিচিত্র, বহুরূপধারিণী, রহস্যময়ী প্রাণশক্তিকে সে কল্পনা করেছে দেবীমূর্তিতে। এরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তাবোধকে ফিরে ফিরে আবিষ্কার করেছে।

আবার মানুষ চোখ তুলে চেয়েছে অমলিন, নিষ্কম্প আকাশের দিকে। তখন তার বামে ভূলোক, যেখানে নিত্যবিবর্তিত প্রাণের-গুপ্ত সঞ্চার; তার দক্ষিণে দ্যুলোক, যেখানে সকল আলোড়নের ঊর্ধ্বে একটি শান্ত, শাশ্বত সত্য এবং গ্রহনক্ষত্রব্যাপ্ত বিশ্বজোড়া নিয়মের আভাস।

দ্যাবাপৃথিবীর যুগ্ম প্রতীকের ভিত্তিতে মানুষের প্রাচীন কল্পনা ধর্ম ও সমাজকে স্থাপন করতে চেয়েছে। যে-প্রেম অসংখ্য জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে কালের ধারায় প্রবাহিত আর যে-শাশ্বত নিয়ম সূর্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্রকে অমোঘ বন্ধনে ধারণ করেছে, এ দুয়ের একটি বৃহৎ সমন্বয়কে সে শতাব্দীসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে মঙ্গলময় বলে চিনেছে।

২

পরিবারে অথবা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করা সহজ। এজন্য কোনো সচেতন সাধনার প্রয়োজন হয় না। জৈব প্রবৃত্তি থেকেই আমরা রক্তের বন্ধনকে

আত্মীয়তার বন্ধন বলে অনুভব করি।

কিন্তু পরিবারের পরিধিতে মানুষের সব প্রয়োজন মেটে না। প্রয়োজনেরই তাগিদে মানুষে মানুষে সহযোগিতাকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে স্থাপন করতে হয়। আত্মরক্ষার জন্য মানুষ দল গঠন করে। আর্থিক প্রয়োজনে শ্রমবিভাগ ও পণ্যবিনিময় প্রসার লাভ করে।

আর্যদের নানা উপজাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগ থেকে ক্রমশ অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যতদিন নতুন বসতি স্থাপনের যোগ্য খালি জমির প্রাচুর্য থাকে ততদিন স্বত্বাধিকার নিয়ে বিবাদ এবং তার মীমাংসার জন্য পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ নিয়মের প্রয়োজন হয় না। যখন শোনা যায়, "যুদ্ধ বিনা নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী", তখন অনুমান করা যায় যে, বসতি অনেকটা ঘন হয়েছে। বসতি ঘন হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মবিভাগ বৃদ্ধি পায়, পণ্যবিনিময় ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বুদ্ধের যুগে উত্তর ভারতে দূর দূর অংশের ভিতর বাণিজ্য চলত। অশোকের যুগে শুধু উত্তরে তাম্রলিপ্ত থেকে তক্ষশীলা নয়, দক্ষিণে উজ্জয়িনী থেকে কাঞ্চী পর্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্য চলেছে। এই বৃহৎ ও বহু কর্মে নিযুক্ত সমাজকে ধারণ করবার জন্য যে-ধর্মের প্রয়োজন ঘটে, তা কেবল কয়েকটি সরল নীতিবাক্যেই সমাপ্ত নয়, বরং আর্থিক ও সামাজিক জীবনে প্রযোজ্য নানাবিধ নিয়ম ও অনুশাসনে পল্লবিত।

সমাজ যতই বৃহৎ ও জটিল হয়, ততই একমাত্র প্রেম অথবা আত্মীয়তাবোধের দ্বারা সামাজিক সংহিত রক্ষা করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব হয়ে ওঠে। কল্যাণবুদ্ধিকে তখন যুক্তির সাহায্যে রূপায়িত করতে হয় নিয়মের ভিতর। নিয়মই ন্যায়ের ভিত্তি। শুধু প্রেমের উপর ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না ; কারণ প্রেম চঞ্চল, প্রেম নিরপেক্ষ নয়, প্রেম বিচারে অপটু। একথাও অবশ্য সমভাবে সত্য যে, নিয়ম যখন মঙ্গলবোধ থেকে ছিন্ন, তখন সেটা শুধুই বন্ধন। কিন্তু কল্যাণবুদ্ধি কোনো চঞ্চল অনুরাগবিরাগের সঙ্গে সমার্থক নয়। একই কারণে জনমতের যে-দিকটা অস্থির তার সঙ্গেও ন্যায়কে যুক্ত করা যায় না। বিচারককে 'ধর্ম' অথবা নিয়ম মান্য করে বিচার করতে হয়। ধীর চিন্তার ভিতর দিয়ে যে-সামাজিক মঙ্গলবোধ স্থিতিলাভ করেছে তাই হতে পারে ন্যায়ের বাহক। ছোট গোষ্ঠীর জীবনে যদি-বা আত্মীয়তাবোধ প্রধান, বৃহৎ সমাজে প্রেমের পরিপূরক হিসাবে নিয়ম অপরিহার্য।

আদর্শ যাই হোক না কেন, বাস্তবে অবশ্য নিয়মও ত্রুটিহীন নয়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

নিয়ম যদি শ্রেয় হয়, তবু তাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়। যে-সব ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী, জাতি ও সম্প্রদায় নিয়ে বৃহত্তর সমাজ গঠিত, তাদের দৃষ্টিতে সামগ্রিক স্বার্থটা প্রায়ই স্পষ্ট নয়, নিজ নিজ খণ্ড স্বার্থ অনেক বেশি বাস্তব। ব্যক্তির ন্যায়বোধ অনেক সময়েই আত্মীয়তাবোধের পরিধিকে ছাড়িয়ে যায় না। আত্মীয়তাবোধ যখন পরিবারের গণ্ডিকে অতিক্রম করে তখনও সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের সীমা ছাড়ানো তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই মানুষের ইতিহাস জুড়ে দেখতে পাই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। সমগ্র সমাজের মঙ্গলকে এর ঊর্ধ্বে স্থাপন করা কঠিন।

সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে বাস্তব স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাত দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এ ধরনের ব্যাখ্যা শুধু আংশিকভাবেই সত্য। সংঘাত ও সহযোগিতা দুয়েরই একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। দুটি সম্প্রদায় যখন বাস্তব জগতে প্রতিবেশী নয়, তখন তাদের ভিতর দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও গুরুতর নয়। যেখানে বিরোধ ও সহযোগিতা দু'য়েরই সম্ভাবনা আছে,

সেখানে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বিচারে বিরোধের দিকটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক চেতনায় বাস্তবের বিকৃত প্রতিফলনই দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ। এ কথাটা আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। ভারত ও পাকিস্তানের ভিতর বৈরিতার কারণ এই নয় যে, আমাদের ভিতর সহযোগিতার 'বাস্তব' ভিত্তি অনুপস্থিত। ইজরায়েল ও আরব দেশের ভিতর সহযোগিতা স্থাপিত হলে সকলেরই মঙ্গল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

একথা যদি বিগত দু'শ বছরের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পর বিশ শতকেও সত্য হয়, তবে প্রাচীন ইতিহাসে উপজাতীয় আনুগত্য যে বৃহত্তর সমাজ গঠনের পথে বার বার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-নিয়ম সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন তাকেও খণ্ডদৃষ্টিতে মঙ্গলদায়ক বলে চিনে নেওয়া কখনও সহজ ছিল না। তা ছাড়া মানুষের ভিতর একটা বন্য প্রকৃতি আছে যার কাছে সভ্যতাকেই শৃঙ্খল মনে হয়। আর এজন্যই নিয়মের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয়েছে দণ্ডের। রাজধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজদণ্ড।

অথচ শুধু দণ্ড দ্বারা দীর্ঘদিন দেশ শাসন করা যায় না। নিয়মের প্রতি একটা সাধারণ আনুগত্য সৃষ্টি হলে তার ব্যতিক্রমকে দণ্ডিত করা যায়। তা যদি না হয়, নিয়মকে যদি শুধু দণ্ডের জোরেই চাপানো যায়, তবে সেটা হয়ে ওঠে অত্যাচার। এই ভয়ের শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

সমগ্র ভারতকে যুদ্ধের দ্বারা জয় করবার শক্তি অশোকের ছিল। কিন্তু তিনিও একদিন আবিষ্কার করলেন যে 'ধর্মবিজয়' ছাড়া গতি নেই। যে-নিয়ম সমগ্র সমাজকে ধারণ করতে সক্ষম তাকে মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্মবিজয়। বৌদ্ধধর্মকে অশোক তাঁর এই বৃহৎ পরিকল্পনায় সহায়স্বরূপ পেয়েছিলেন।

নিয়মের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য সৃষ্টির পথে দুটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে আমরা যুক্তি দ্বারা খণ্ডস্বার্থকে অতিক্রম করি ; জানি, যে-নিয়ম সকলের প্রতি প্রযোজ্য হলে সকলের মঙ্গল সেটাই সুনিয়ম এবং সেই নিয়মকে মান্য করাই প্রত্যেকের কর্তব্য। সেই নিয়ম ব্যক্তির কাছে প্রেয় না হলেও তাকে শ্রেয় জ্ঞানে অনুসরণ করা উচিত। এটা যুক্তির কথা। কিন্তু যে-সত্য শুধুই যুক্তিগ্রাহ্য, হৃদয়গ্রাহ্য নয়, তার প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রবল হয় না। তাই দ্বিতীয় ধাপে মঙ্গলবোধকে অনুভূতির সঙ্গে অর্থাৎ বৃহত্তর প্রীতির সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। পৃথিবীর সকল মহৎ ধর্মের কেন্দ্রে যদি কোনো সত্যবস্তু থাকে তবে তা হলো যুক্তির সঙ্গে যুক্তির অতীত 'অহেতুকী' প্রীতি অথবা করুণার আশ্চর্য মিশ্রণ। যুক্তি দিয়ে আত্মত্যাগ করা কঠিন। ধর্মের যেটা মহত্তর দিক তার স্পর্শে মানুষের ভিতর যে-বন্যতা আছে সেটাই আবার তাকে আত্মত্যাগী ক'রে তোলে।

ছোট গোষ্ঠীজীবনের বাইরে জৈবিক প্রীতিভাবকে জাগ্রত রাখা কঠিন। ধর্ম যদিও বসুধাকে কুটুম্বজ্ঞান করবার আহ্বান জানিয়েছে তবুও প্রাচীন যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা কর্ম প্রধানত ছোট গোষ্ঠীর ভিতরই আবদ্ধ ছিল। সেই ক্ষুদ্র আধারেই রীতিনীতি রচিত হয়েছে। নিয়ম কঠিন হলেও সেটা বোঝা হয়ে ওঠেনি, বিবেকের দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়নি। প্রাচীন সমাজব্যবস্থার স্থায়িত্বের এটাই একটা প্রধান কারণ। এ দিক থেকে আধুনিক সমাজের সমস্যা অনেক বেশি জটিল।

৩

কোনো সমাজে যে-সব কর্তব্য ও অধিকার স্বীকৃতিলাভ করে তার মূলে একটা ক্ষমতার কাঠামো থাকে। অর্থাৎ যে ক্ষমতাবান তার অধিকারই প্রাধান্যলাভ করে। কথাটা অন্যভাবে রাখা যেতে পারে। সমাজে যদি কোনো সর্বস্বীকৃত কর্তব্য ও অধিকার না থাকতো, নিয়ম বলে কিছুই যদি গ্রাহ্য না হতো, তবে সেই অবস্থায় ক্ষমতাবান বেশি আদায় করে নিত এবং দুর্বল দুর্বলতার দণ্ড হিসাবেই বেশি ছাড়তে বাধ্য হতো। নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হলেও কিন্তু এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয় না। বরং নিয়মটা এমনভাবেই তৈরি হয় যে ক্ষমতাবানেরই সুবিধা থাকে। এ যদি না হয় তবে নিয়মকে কার্যকরী করা যায় না।

এ থেকে কিন্তু অনুমান করা ভুল হবে যে, নিয়মের সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের কোনো যোগই নেই। আক্রমণকারী দস্যুর দল হয়তো দেশে একদিন রাজা হয়ে বসে। কিন্তু দস্যুর সঙ্গে দেশের সম্পর্ক আর রাজাপ্রজার আচরণবিধি এক নয়। রাজার কাছে রাজস্বের বদলে প্রজা শান্তি ফিরে পায়। অরাজকতার চেয়ে শ্রেয় জেনেই প্রজা এই ব্যবস্থা মেনে নেয়। গৃহস্থের প্রতি ডাকাতের কোনো কর্তব্য নেই ; প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য আছে। ধীরে ধীরে শক্তিও প্রীতিবোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে যুগে রাজাকে প্রজাবৎসল হতে বলা হয়েছে। ধর্মের এই অনুশাসনের কোনো প্রভাব ছিল না মনে করার কারণ নেই। রাজামাত্রই সমান নিষ্ঠুর ছিলেন না। ভালো রাজা পথঘাট নির্মাণে, খাল ও সরোবর খননে, ধর্মশালা ও চিকিৎসালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রজা সুখে আছে কি না দেখবার জন্য রাজা ছদ্মবেশে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, এমন উদাহরণও তো আছে। রাজাকে ধর্মের রক্ষক বলা হয়েছে। তিনি ধর্মের বিধান অনুযায়ী রাজ্যশাসন করবেন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সে যুগের রক্ষাকবচ ধর্ম। যেখানে স্বৈরাচার সেখানে শৃঙ্খলা নেই, সবই অনিশ্চিত ; অতএব সেখানে প্রজার অধিকার বলেও কিছু নেই। ধর্ম রাজার অগ্রাধিকার স্বীকার করে নিয়েও তাঁর উপর কর্তব্য আরোপ করেছে ; আর রাজার কর্তব্যই প্রজার অধিকারের ভিত্তি। রাজনীতিতে এটাকেই আমরা নিয়মের রাজত্বের আরম্ভ বলে ধরতে পারি। রাজা ধর্মভ্রষ্ট হলে প্রজারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবে এমন কথাও প্রাচীন শাস্ত্রে আছে।

বিষয়টাকে আরও একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। সমাজে সকলের কর্তব্য ও অধিকার নিয়ম দিয়ে বেঁধে দিলেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। প্ল্যাটোর আদর্শ সমাজব্যবস্থায় সাম্য ছিল না। কিন্তু গ্রীক দার্শনিক যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। অতএব অসাম্যের সপক্ষে তাঁকে যুক্তি বিস্তার করতে হয়েছে। যে-অসাম্য নিয়মের দ্বারা স্বীকৃত তার সঙ্গে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কোনো যোগ আছে কি না এটা বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সমাজের স্থিতি ও প্রগতির জন্য অসাম্যের প্রয়োজন হতে পারে ; মনে রাখা ভাল যে, শুধু প্ল্যাটো অথবা অ্যারিস্টটলই নন, মার্ক্স-এঙ্গেলসও প্রাচীন গ্রীক সমাজে ক্রীতদাস প্রথার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন। অসাম্য মাত্রই অযৌক্তিক না হতে পারে ; কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা এই প্রশ্নটাকে যুক্তি দ্বারা বিচারের বিষয় বলে স্বীকার করে নিই সেই মুহূর্তেই প্রগতির একটা নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সমাজের স্বীকৃত নিয়ম নতুন করে বিচার্য হয়ে ওঠে ; এবং যে-অগ্রাধিকার একদিন সমর্থনযোগ্য মনে হয়েছিল সেটাও নতুন পরিস্থিতিতে ত্যাজ্য মনে হওয়া সম্ভব। সমাজে যাঁরা কর্তৃস্থানীয় তাঁরাও বিশ্বাস করতে চান যে তাঁদের কর্তৃত্ব যুক্তির

উপর প্রতিষ্ঠিত। শাসকগোষ্ঠী যখন যুক্তির সমর্থন হারান তখন তাঁদের নৈতিক দুর্বলতা পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আঠার শতকে ফরাসী দেশে দার্শনিক সমালোচকদের যুক্তি পুরনো সমাজব্যবস্থার ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল।

ক্ষমতার যে-কাঠামোর চারদিকে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কর্তব্য ও অধিকার বিশেষ আকার গ্রহণ করে সেই কাঠামো অপরিবর্তনীয় নয়। কোনো এক যুগে অশ্বারোহী আক্রমণকারীরা ছিল অপ্রতিরোধ্য ; অর্থবলে বলীয়ান রাজ্যও এই অশ্বারোহীদের পদানত হয়েছে। পরবর্তী যুগে অর্থবল বহুক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে। বর্তমান যুগে সাংগঠনিক শক্তির গুরুত্ব ক্রমশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যাঁরা শিল্প সংগঠনে, শ্রমিক সংস্থায়, প্রশাসনিক যন্ত্রে অথবা দলীয় রাজনীতিতে উচ্চস্থানের অধিকারী তাঁরাই ক্ষমতাবান। সংগঠন ও ধ্যানধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিয়ম ও শাসনব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের পথ খোলা রাখা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যুক্তি ও নিয়মের শাসনের সঙ্গে গণতন্ত্রের যোগ এইখানে।

৪

নিয়মের শাসন চাই, আবার সেই নিয়মের পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ উপায়ও চাই। কিন্তু এইসব শর্ত যদি পূর্ণ হয়, কোনো সমাজ যদি নিয়মশাসিত হয় এবং সেই নিয়ম যদি গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিবর্তনীয় হয়, তবেই কি সমাজের কাছে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা পূর্ণতা লাভ করে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আধুনিক শিল্পপ্রধান সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

এ যুগে প্রগতি বলতে আমরা যা বুঝি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি তার অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু এই প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে ও মানুষের মনোজগতে কয়েকটি সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। এই রকম একটি সমস্যা সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলব। আধুনিক শিল্পের ঝোঁক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের দিকে এর একটা সরল বিশ্লেষণ ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের প্রারম্ভে স্কট অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের লেখায় স্থান পেয়েছে। বাজার যতই প্রসার লাভ করে ততই শ্রমবিভাগের সম্ভাবনা বাড়ে। শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আবার যন্ত্রের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এরই অন্যতম ফলস্বরূপ বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। আধুনিক যুগে টেলিফোন ও অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতি এবং যান্ত্রিক গণকের ব্যবহারের ফলে একটি কেন্দ্র থেকে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুবিধা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন শিল্প প্রতিষ্ঠানে তেমনই শাসনযন্ত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা রোধ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

এরই ফলে আধুনিক আমলাতন্ত্রের উদ্ভব। আধুনিক আমলাতন্ত্রের পিছনে একটা 'গণতান্ত্রিক' ও যুক্তিবাদী মন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে জর্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবরের ধ্যানধারণা প্রণিধানযোগ্য। আমলাতন্ত্রের মূলে আছে এক ধরনের যান্ত্রিক যুক্তিবাদ। কোনো বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাকে নিয়ম দিয়ে বাঁধতে গেলেই আমলাতন্ত্র অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমলাতন্ত্র একবার শক্তিমান হয়ে উঠলে তার আতিশয্যও রোধ করা কঠিন। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকবে অথচ আমলাতন্ত্র থাকবে না এটা আশা করাই অযৌক্তিক।

আমরা আগেই দেখেছি যে, সমাজজীবন অতীতে যে-সব নিয়ম দিয়ে বাঁধা ছিল তাতে যুক্তি ও ধর্মরহস্যের সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। মনুর বিধানে এবং সমস্ত মধ্যযুগ ধরে ধর্মরহস্যের দিকটাই প্রধান ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যুক্তির দিকটা প্রকট। আধুনিক যুগের ঝোঁকটাও ঐ দিকে। যে-আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাতে প্রেমের বা ধর্মরহস্যের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। একটা জটিল যান্ত্রিক যুক্তির এখানে অটল আধিপত্য। ব্যতিক্রম শুধু স্বজনপোষণে।

আমলাতন্ত্র যে-সব নিয়ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত তা যতই যুক্তিসঙ্গত, এমন কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হোক না কেন, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা কঠিন ; এবং তার সঙ্গে একাত্মতা দূরে থাক, কোনো প্রকার ঈষদুষ্ণ সহানুভূতি বোধ করাও প্রায় অসম্ভব। আমলাতন্ত্রের দ্বিতীয় ফল ক্ষমতার অসাম্য। আয়ের অসাম্য দিয়ে একে মাপবার চেষ্টা বৃথা। বহুলোকের ভাগ্য নির্ধারণের শক্তি আজ অল্প কয়েকজনের হাতে যতটা কেন্দ্রীভূত এমন সম্ভবত কখনও ছিল না। অথবা কথাটা হয়তো অন্যভাবে বলা ভালো। আমলাতন্ত্রের এমন একটা প্রবল ও অনড় নৈর্ব্যক্তিক সত্তা আছে যার সামনে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অত্যন্ত অসহায়। এরই ফলে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ভিতর প্রাণের যোগ ছিন্ন হয়ে যায় এবং ব্যক্তি যন্ত্রের অর্থাৎ যান্ত্রিকতার দাসে পরিণত হয়। এই যান্ত্রিকতার সঙ্গে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার এমনই একটা গভীর চরিত্রগত বিরোধ আছে যে, কোনো উপায়েই এ দু'য়ের ভিতর মৌলিক সামঞ্জস্যবিধান করা যায় না।

শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণের সাহায্যে এ সমস্যা দূর হয় না। রাষ্ট্রীয়করণের ফলে ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত হবারই সম্ভাবনা। আর্থিক পরিকল্পনা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয়করণের প্রয়োজন অস্বীকার না ক'রেও একথা বলা চলে। আর্থিক পরিকল্পনার পিছনে একটা যুক্তিবাদী মন আছে সন্দেহ নেই। একটা সমগ্র দেশের সম্পদ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কি ভাবে নিয়োগ করা উচিত, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিকেন্দ্রিত খণ্ডদৃষ্টির চেয়ে কেন্দ্রস্থিত সার্বিক দৃষ্টিই কি শ্রেয় নয় ? তবু সমস্যা থেকে যায়। 'নির্ভুল' পরিকল্পনাও নীচের তলার কর্মকেন্দ্রগুলির কাছে অত্যন্ত দূরের জিনিস মনে হতে পারে এবং এই প্রাণস্পর্শহীন নির্ভুলতায় তাদের উৎসাহ জাগ্রত নাও হতে পারে। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার নিম্নতন উৎপাদন কেন্দ্রগুলির হাতে নিজ নিজ পরিকল্পনা রচনার দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে ; শিল্পপরিচালনা শ্রমিকদের নির্বাচিত সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ; আঞ্চলিক স্বয়ংভরতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ সবই হয়তো সমর্থনযোগ্য। তবু ওদেশে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা আজও প্রবল।

সরকারী সোভিয়েত সাহিত্য বহুদিন যাবৎ মূল সমস্যাটাকে গায়ের জোর অস্বীকার করে সাম্যবাদী বাস্তবতার নামে এক অবাস্তব সার্থকতার কপট বাণী প্রচার করেছে। এই কপটতার বিরুদ্ধে আজকের সোভিয়েত লেখকেরা ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বাস্তব জীবনের অতিরঞ্জন যদি ঘটে থাকে তবে তা প্রধানত বিপরীত অর্থে। আদর্শের ভাবমুকুর সাহিত্যিক তুলে ধরেছেন 'কুৎসিত' বাস্তবের সামনে, জীবনের অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে শিল্পীর প্রতিবাদস্বরূপ।

কবিতায় মানুষ খোঁজে নতুন ভাষা। রাজনীতিতে সে এক পা পিছিয়ে। পুরনো ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে মানুষ নতুন সংগ্রামে নামে। উনিশ শতকে সাম্যবাদীদের মনে হয়েছিল যে, তাঁদের সংগ্রামটা মূলত একটা বিশেষ মালিকানা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সেই ধ্বনি নিয়ে দিকে দিকে আজকেও চলছে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রাণের প্রতিবাদ।

এ বিষয়ে গান্ধী মৌলিকতা দাবী করতে পারেন।

আধুনিক যুগে যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সবচেয়ে স্মরণীয় নেতা নিঃসন্দেহে গান্ধী। যান্ত্রিকতা বলতে যন্ত্রের ব্যবহার বোঝায় না, বরং এ যুগে যন্ত্রের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে প্রাণস্পর্শহীন যে যান্ত্রিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তারই নাম যান্ত্রিকতা। এরই বিরুদ্ধে গান্ধীর বিদ্রোহ। তিনি সমাজকে গড়তে চেয়েছেন সেই সব ছোট ছোট অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর ভিত্তিতে, যেখানে মানুষ মানুষকে প্রতিবেশী বলে চেনে। গান্ধীদর্শনে এই ছোট গোষ্ঠীজীবনেরই অন্য নাম 'গ্রাম'। বর্তমান গ্রামীণ সমাজকে নয়, এই আদর্শ 'গ্রাম'কেই তিনি বাঁচাতে চেয়েছেন। নেহরুকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "You must not imagine that I am envisaging our village life as it is today. The village of my dreams is still in my mind." যন্ত্র বলেই তিনি যন্ত্রের বিরোধিতা করেননি। কিন্তু সেই যন্ত্রকেই তিনি স্থান দিতে চেয়েছেন, যাকে গ্রহণ করতে গিয়ে এই আদর্শ গ্রামের মৃত্যু হবে না। ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য কখনও কখনও আরও বড় যন্ত্রকে তিনি স্থান দিতে রাজী হয়েছেন এবং সেই সব যন্ত্রকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে রাখবার নির্দেশও দিয়েছেন; কিন্তু সেটা বতিক্রম বলেই গ্রাহ্য। রাষ্ট্রের প্রাধান্য তিনি কখনই মানতে চাননি। আর এ কথাও তিনি জানতেন যে, হিংসার পথে আর যেখানেই পৌঁছানো যাক, যে-সমাজ তাঁর কাম্য সেখানে যাওয়া যাবে না। অতএব সে পথ তিনি বিপথ বলেই ত্যাগ করেছেন। তিনি নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, সেই নিয়মই বাঁচায়, যাকে হৃদয়ে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়। যান্ত্রিক সভ্যতার নিয়মকে মনে প্রাণে সত্য বলে অনুভব করা যায় না বলেই তিনি তাকে পরধর্ম বলে ত্যাগ করেছেন।

গান্ধীর 'গ্রাম'ভিত্তিক সমাজের আদর্শকে আমরা অনেকেই অবাস্তব বলে উপহাস করেছি। আমরা বলেছি যে, এ যুগের শিল্প ও বিজ্ঞানের ঝোঁক অন্য দিকে। বলেছি, ইতিহাসের এই ধারাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। উত্তরে গান্ধীজী বলতে পারতেন যে, এই যান্ত্রিক সভ্যতাকে মেনে নিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের ভিতর, প্রেম ও নিয়মের ভিতর, সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাবে এই আশাও সমান অবাস্তব। অথচ এই অসামঞ্জস্যকে অনপনেয় বলে স্বীকার করে নেওয়াই কি সহজ?

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে আজ তরুণের যে-বিদ্রোহ সেটাও মূলত এই অসামঞ্জস্যেরই বিরুদ্ধে। তবে আদর্শকে রূপায়িত করার মূল শর্ত এঁরা গান্ধীর মতো গভীরভাবে ভেবে দেখেননি, অথবা সেই সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস এঁদের নেই। বর্তমান সভ্যতার উপকরণ এঁরা ত্যাগ করতে রাজী নন; কিন্তু এরই ভিতর এঁরা জটিল নিয়মের বন্ধন থেকে সেই মুক্তির সন্ধান করছেন সরল আত্মীয়তাবোধের মাঝেই শুধু যাকে লাভ করা যায়। এ আশা পূর্ণ হবার নয়, শত আক্ষেপবিক্ষেপেও নয়। তবু এই বিদ্রোহের আতিশয্যে একদিকে যদি থাকে অপরিণত বুদ্ধির প্রকাশ, অন্যদিকে আছে এ যুগের তরুণের হৃদয়ে চিরকালের মনুষ্যত্বের পরিচয়। এই টানাপড়েনেই রচিত হবে ভবিষ্যতের ইতিহাস।

আধুনিক সমাজের সংকট শুধু অর্থনীতি অথবা রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়। সংশয়বাদী যুক্তি ও হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের যে-বিস্মিত বিপন্নতাবোধ, তার সম্পূর্ণ পরিচয় নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। কারণ জীবন ও ভালোবাসা সম্বন্ধে মানুষের গভীরতম প্রত্যয় ও প্রত্যাশা আজ আক্রান্ত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ যুগের সমস্যাকে

৫

মানুষের একটা দিক আছে যেখানে সে জগতে জয় আকাঙ্ক্ষা করে ; সে জয় করতে চায় জড় জগৎকে, আধিপত্য বিস্তার করতে চায় অপর মানুষেব ওপর। উদ্যোগী পুরুষরূপে সে তার শৌর্য, শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে পরিপার্শ্বকে নিত্য নতুনভাবে গড়ে তোলে।

তার আর একটা দিক আছে যেখানে সে সবাইকে এবং সবকিছুকে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধতে চায়। যাকে সে জয় করেছে, হঠাৎ কখনও আবিষ্কার করে, তাকে আপন করতে পারেনি। যে-পৃথিবী সে সৃষ্টি করেছে, একদিন অনুভব হয় যে, তাকে গৃহ করে তোলা হয়নি। নিজের সৃষ্টির মাঝখানে মানুষ প্রবাসী।

মানুষকে তাই বাঁচতে হয় একই সঙ্গে দু'টি ভিন্ন স্তরে। সে বর্তমানের মানুষ। কালের সীমাকে স্বীকার করেই তাকে চলতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তের নিয়মকে মেনে নিলেই তার মুক্তি সম্পূর্ণ হয় না। স্বপ্ন এবং বাস্তবের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের ইতিহাস বিবর্তিত।

তিন দিগন্ত

আমরা যখন মুক্ত মন নিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করি, তখন একটি উপলব্ধি বারবারই আমাদের স্পর্শ করে যায়। আমরা উপলব্ধি করি যে, পরস্পরবিরোধী অনেক উক্তি একই সঙ্গে সত্য, যদি বা সম্পূর্ণ নয় তবু অংশত। একথা মেনে নেবার পর বাদবিসংবাদের আর প্রয়োজন থাকে না এমন নিশ্চয়ই নয়। তবে কিছু অনাবশ্যক বাদবিতণ্ডার হাত থেকে এর পর নিস্তার পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করে দেখা যায়, কোন উক্তিটি চৈতন্যের কোন স্তর থেকে নিঃসৃত। চৈতন্যের এক স্তরে সত্য এক রূপে প্রকাশিত, অন্য স্তরে অন্য রূপে।

চেতনার তিনটি প্রধান স্তর আছে। কোনো স্তরকেই বাদ দিয়ে চলে না ; তবে চৈতন্যের বিবর্তনে কখনও একটির প্রাধান্য, কখনও অন্যটি প্রধান। চেতনা ও বাস্তব পরস্পর সম্পৃক্ত, অতএব বাস্তবেরও বিভিন্ন স্তর আছে। প্রতি স্তরের বৈশিষ্ট্য, অথবা অন্তর্নিহিত ঝোঁক, চিহ্নিত করা কঠিন। যে-সব শব্দকে আমরা চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করি, সে সবই দ্ব্যর্থবোধক। চৈতন্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই শব্দ অন্য অর্থ ধারণ করে। চেতনা এক একটি সঙ্গমে দ্বিভঙ্গ মূর্তিতে দেখা দেয়। তবু বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে বিষয়টি বোঝবার চেষ্টা বৃথা নয়। এতে জটিলতার ভিতরও কিছুটা পরিচ্ছন্নতা আসে।

সভ্যতার প্রত্যূষে মানুষ বাস্তবকে দেখেছে আদিম ভালোবাসা ও ভয়ের একটি মিশ্র কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়ে। এই আদিম অথবা প্রাকৃত চেতনার একটি গুণ উল্লেখযোগ্য। এতে 'আত্মপ্রেম' ও 'বিশ্বপ্রেম' অন্ধভাবে মিলেমিশে আছে। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সীমারেখা এখানে অস্পষ্ট। ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন সচেতন নয়। বরং জীবিত ও

মৃতদের নিয়ে গঠিত একটি বিস্তীর্ণ পারিবারিক অথবা আত্মীয়সমষ্টিতে তার অহংচেতনা নিমজ্জিত।

চেতন ও অচেতনের সীমারেখাও মানুষের এই শৈশবে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। গাছপালা নদী পাহাড়প্রস্তর মেঘবিদ্যুৎ সব কিছুর ভিতরই চেতনা ছড়িয়ে আছে। সব মিলে, কিছুটা মোহে কিছুটা ভয়ে আশ্রিত, একটা বৃহৎ ত্রিভুবনব্যাপী অনির্দেশ্য আত্মীয়তার ইঙ্গিত। প্রাচীন ধর্মে ও সাহিত্যে এর প্রতিফলন দেখি। আকাশ ও পৃথিবীর ভিতর বিবাহবন্ধন ঘটে, দেবতারা মানুষের প্রতি উদাসীন নন, সূর্যের ঔরসে মানবীর গর্ভে মহাযোদ্ধার জন্ম হয়। এই প্রাচীন কল্পনায় দিব্যতার সঙ্গে মিশে থাকে অজস্র ভয়ের বিকৃত মুখচ্ছবি। তবু এতে এমন একটি বিশ্বমুগ্ধতা ও সীমাভাঙ্গার শক্তি আছে, উপজাতীয় ক্ষুদ্রতায় খণ্ডিত তৎকালীন সমাজের প্রতিতুলনায় যেটি বিস্ময়কর এবং মানুষের মৌল প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো সম্পূর্ণ ধারণা থেকে যাকে বাদ দেওয়া যায় না।

প্রাকৃতচেতনার পাশে পাশে ক্রমে দেখা দেয় সংস্কৃতচেতনা।

সংস্কৃতচেতনা অনেক বেশি যুক্তিধর্মী। সমাজ বিবর্তনের এই স্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের সূত্র উপজাতীয় কুটুম্বতার গণ্ডি অতিক্রম করে বহুদূর ব্যাপ্ত। ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিসুখের গণনার প্রতি ঝোঁক ক্রমশ প্রবল। যদিও ব্যাপক অর্থে মানুষ 'যুক্তিশীল', তবু চেতনার এই দ্বিতীয় স্তরে যেটি পাই সেটিই বিশেষ অর্থে যুক্তিধর্মিতা বা র‍্যাশনালিজম।

এই যুক্তিধর্মী মন প্রকৃতিকে স্বেচ্ছাচালিত নয়, বরং নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে জানে। পাহাড়প্রান্তর মেঘবিদ্যুৎ থেকে ভূতপ্রেত দেবদেবতারা ক্রমে অন্তর্হিত হন; প্রকৃতি এবার হয়ে ওঠে 'জড়' প্রকৃতি। সংস্কৃতচেতনা একদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার নিয়মের ভিতর, একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য অখণ্ড সামঞ্জস্যের ভিতর জানতে চায়। অন্যদিকে এই বিশেষ জ্ঞান, যাকে চেতনার এই স্তরে আমরা বলি বিজ্ঞান, ক্রমশ একটি নতুন অর্থ লাভ করে। ব্যক্তিসুখগণনার অভ্যাস যুক্তিধর্মিতার একটি প্রধান প্রেরক। এই বিশ্ব আত্মার দ্বারা নয়, বস্তুর দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানের বলে এই বস্তুময় জড়প্রকৃতিকে মানুষ দাসে পরিণত করতে সক্ষম। বিজ্ঞানের, এমন কি দর্শনেরও, সার্থকতা তার প্রয়োগে। বিজ্ঞান ও শিল্পকে সুপরিকল্পিতভাবে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখের পরিবর্ধক হিসেবে প্রয়োগ করা যুক্তিধর্মী চেতনার লক্ষ্য।

প্রাকৃতচেতনার ভিত্তি যেমন প্রাচীন পল্লীতে, সংস্কৃতচেতনার পরিপুষ্টি তেমনই নগরে। অর্থাৎ, রাজদরবারে ও রাজধানীতে, বাণিজ্যকেন্দ্রে, শিল্প ও বিজ্ঞানের ছায়ায়, রাষ্ট্রশাসনের আবর্তে। সংস্কৃতচেতনা তাই রাজসিক, সুখসন্ধানী, গণনাকুশলী, বৈজ্ঞানিক। ক্ষেত্র অথবা প্রসঙ্গ অনুসারে একে কখনও রাজসিক অথবা নাগর, প্রয়োগধর্মী এবং যুক্তিধর্মী নামে চিহ্নিত করা সুবিধাজনক। প্রসঙ্গত আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাকৃতচেতনায়ও যুক্তি উপস্থিত, যেমন যাদুবিদ্যায়; কিন্তু সংস্কৃতচেতনার বিচারে যুক্তির অভাবটাই সেখানে বড়।

প্রাকৃতচেতনার তলে যে মোহাবিষ্ট চরাচরব্যাপী আত্মীয় অনুভব লক্ষ করা যায়, তারই অপর পিঠে আবার আছে অজ্ঞতা এবং ভয় থেকে উদ্ভূত নানা কিম্ভূত কল্পনা ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। যুক্তির বিচারে এ সবই মূঢ়তা। প্রতিতুলনায় নাগরচেতনার কেন্দ্রে আছে একটি স্বার্থবিন্দু; বাইরের বিশ্ব সেই স্বার্থের সাধনে সম্ভাব্য উপকরণ। অর্থাৎ, প্রয়োগধর্মী চেতনার দৃষ্টিতে বাইরের বিশ্বের আত্মীয়মূল্য নেই, তার উপকরণ মূল্যটাই প্রধান।

কথাটা এবার একটু ভিন্নভাষায় বলা যাক। এ যুগে মানুষের জ্ঞান ও জাগতিক প্রয়োজনের মধ্যে একটা সচেতন সেতু স্থাপিত হয়েছে। দু'য়েরই পরিবর্তন ঘটছে, বিবর্তন চলছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের দ্বারা, আবার বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের প্রয়োজনের রূপরেখাও বদলে চলেছে। জাগতিক উদ্যোগের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ এই-যে যুক্তিধর্মিতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যার বিশেষ প্রকাশ, এর চর্চায় যে জাতি আগ্রহী নয়, এ যুগে সে-জাতি পিছিয়ে পড়ছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই যুক্তিধর্মিতা মানুষকে শুধু জাগতিক অর্থেই শক্তিশালী করেনি, উপরন্তু চিত্তের অনুশীলনেও এর মূল্যবান ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। যুক্তি মানুষের চিন্তায় স্বচ্ছতা এনেছে। একটি আলোকিত স্বার্থবোধ মানুষকে নিষ্ফল অভিমান, ক্রোধ ও উত্তেজনা দমনের শিক্ষা দিয়েছে। একে বিদ্রূপ করা সহজ। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। শ্রমণেরা সাধারণের ব্যতিক্রম ছিলেন। প্রয়োগধর্মী সংস্কৃতিই শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে সাধারণকে সচেতন করেছে। স্বার্থকে উপেক্ষা করে নয়, বরং তাকে স্বীকার করে নিয়েই, কঠোর ও নিয়মিত শ্রমের অভ্যাস শিল্পোন্নয়নে ও চরিত্রগঠনে সহায়ক হয়েছে। যুক্তিধর্মিতা যেখানে এই কঠিন পথ এড়িয়ে গেছে, সেখানে সমাজজীবনে ও ঐতিহাসিকভাবে সেই পরিমাণে সে নিষ্ফল হয়েছে। যুক্তিই আবার পারে এই নিষ্ফলতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। প্রাকৃতচেতনা থেকে নয়, সংস্কৃতচেতনা থেকেই আসে নৈর্ব্যক্তিক ন্যায়ের আদর্শ। যে-প্রাকৃতচেতনা যুক্তিধর্মিতার ভিতর দিয়ে পরিশোধিত নয়, শিল্পীর দৃষ্টিতে তাকে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, কিন্তু মানুষের চৈতন্যের অভিব্যক্তির বিচারে কিছুতেই তাকে সম্পূর্ণ বিবেচনা করা যায় না।

অথচ যুক্তিধর্মিতাও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যদি সে স্বয়ংসম্পূর্ণ হত তবে তার গুণগত বিবর্তনের কোনো প্রয়োজন থাকত না। আগেই বলেছি যে, জগৎকে বস্তুময় এবং বস্তুকে উপকরণস্বরূপ চিন্তা করবার একটা ঝোঁক যুক্তিধর্মিতার ভিতর প্রবল। সামাজিক বন্ধনের গূঢ় অর্থ প্রাকৃতচেতনায় যেভাবে ধরা পড়েছে, নাগরচেতনায় সে-ভাবে নয়। প্রাকৃতচেতনা মৌল সামাজিক বন্ধনগুলিকে ধর্মের ওপর স্থাপন করতে চেয়েছে। নাগরচেতনায় এটা অগ্রাহ্য। স্বাধীন মানুষ এসব বন্ধন পারস্পরিক সুবিধার প্রয়োজনে গ্রহণ করে, আবার সুবিধার খাতিরেই ত্যাগও করে। কোনো আনুগত্যই শর্তহীন নয়, কারণ শর্তহীন আনুগত্য তো দাসত্বেরই অন্য নাম। নাগরিক স্বাধীনতার এটাই মূল কথা। এর মূল্য কম নয়। এরই ফলে আমরা সহমরণের সংস্কার থেকে বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারে এসে পৌঁচেছি। কিন্তু মানুষ যখন মানুষকে মূলত প্রয়োজন অথবা স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ মাত্র বিবেচনা করে এবং এই বিবেচনার ওপরই নিজের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করে তখন অন্য এক দিক থেকে বিপদ দেখা দেয়। কারণ অন্তরে অন্তরে সে তখন আত্মীয়হীন হয়ে ওঠে।

যেমন সমাজবন্ধনের ক্ষেত্রে তেমনই বিশ্বদৃষ্টিতেও ঘটনা একইভাবে আবর্তিত হয়। প্রাকৃতচেতনা চরাচরময় নানা দেবতা উপদেবতাকে স্থাপন করে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করে নিয়েছিল যার সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা সম্পর্ক ছিল, যার সামনে পত্রপুষ্পাঞ্জলি ও প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়ানো যেত। বিজ্ঞানের জগৎ বর্ণগন্ধহীন, গণিতের নিয়মে বাঁধা তরঙ্গ অথবা সম্ভাব্যতায় নির্মিত। এর সামনে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দাঁড়াবার কোনো অর্থ হয় না। একে, অন্তত কিয়দংশে, যান্ত্রিক দাসের মতো ব্যবহার করা যায় বটে ; কিন্তু যান্ত্রিক দাসের সঙ্গে কি প্রেম অথবা মিত্রতা সম্ভব ? যন্ত্রকে আমরা গড়তে

পারি, ভাঙ্গতে পারি, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারি ; কিন্তু তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করা যায় না, আত্মার ভিতর গ্রহণ করা যায় না।

এমনই ভাবে সমাজে এবং বৃহৎ বিশ্বে একান্ত প্রয়োগধর্মী চেতনা অথবা ব্যবহারিক বুদ্ধি মানুষকে পরবাসী করে তোলে। এর থেকে নিস্তার পাবার জন্য আমরা নানা পথে ঘুরি, ছোট কোনো গোষ্ঠীর ভিতর নিজেকে প্রাণপণে আবদ্ধ করি যেন একটি নকল উপজাতীয়তায় আত্মিক নিরাপত্তার সন্ধানে, উত্তেজনা অথবা উত্তেজক পদার্থে আশ্রয় খুঁজি, বিশেষ কোনো বহিঃশত্রুকে শেষ শত্রু কল্পনা করি, বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরিত্রাণের পরম পন্থা বলে বিশ্বাস রাখি। এতে সমস্যার সমাধান হয় না। উত্তেজনায় কিছুকাল নিজেকে ভুলিয়ে রাখা যায় ; কিন্তু উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে আসে, অবশিষ্ট থাকে শুধু অবাধ্য অভ্যাস। একটি বহিঃশত্রু বহিষ্কৃত হলে আর একটি রঙ্গমঞ্চ দখল করে দাঁড়ায়। এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যুক্তিধর্মিতার স্পর্শে যা উপকরণমাত্রে পরিণত হয় না। এখানেই তার বিশেষ উপযোগিতা, আবার এখানেই তার সীমা।

এই সীমার ওপারে চেতনার তৃতীয় স্তর, যার নাম দেওয়া যেতে পারে অধ্যাত্মচেতনা। অধ্যাত্মচেতনায় বস্তুর আর একটি রূপ উদ্‌ভাসিত। প্রয়োগধর্মী চেতনায় যেমন বস্তুর পরিচয় উপকরণ হিসেবে, অধ্যাত্মচেতনায় তেমনই অস্তিত্বমাত্রই, অন্য কার্যকারণ অথবা উপযোগিতা নিরপেক্ষভাবে, শুধু তার অস্তিত্বের গুণে, বিস্ময়কর। শিশু যে-আদিম বিস্ময়ের চোখে পৃথিবীর দিকে তাকায়, তার সঙ্গে এর একটা মিল আছে। এদিক থেকেই প্রাকৃতচেতনার সঙ্গে অধ্যাত্মচেতনার মিল। কিন্তু অমিলও আছে। শৈশব অথবা প্রাকৃতচেতনায় যে-বিস্ময়ের শক্তি দেখি, তার চারিদিকে একটা আতংকের পরিমণ্ডল অহরহ উঁকিঝুঁকি মারে। সে আতংক জৈব আতংক। আমাদের জৈব সত্তা দৃশ্য ও অদৃশ্য বহু আক্রমণকারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অতএব ভয় স্বাভাবিক, সাবধানীবুদ্ধি স্বাভাবিক। ভয় থেকে হিংসার উৎপত্তি। এই ভয় এবং হিংসা একদিকে আমাদের জৈব সত্তার বর্মস্বরূপ। অন্যদিকে এরা আমাদের শুদ্ধ বিস্ময় ও শুদ্ধ আনন্দের অধিকার কেড়ে নেয়। অধ্যাত্মচেতনায় আমরা সেই বিস্ময় ও আনন্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

এই অধ্যাত্মচেতনা যুক্তিবিরোধী নয়, আবার যুক্তির দ্বারা সৃষ্টও নয়। যুক্তি ঠিকই বলে যে, আতংকগ্রস্ত হওয়া অযৌক্তিক, ভয় অথবা হিংসার আতিশয্যে লাভ নেই। কিন্তু কঠিন সাবধানী বুদ্ধির যে আবরণ আমাদের চেতনাকে আচ্ছাদিত করে থাকে, যুক্তি দিয়ে তাকে ছিন্ন করা কঠিন। অথচ সেই উজ্জ্বল উদ্ধারের দর্শনমাত্র যুক্তিরও পুনর্জন্ম সম্ভব। নবজাতক যুক্তির চোখে অধ্যাত্মচেতনাও বিস্ময়করভাবে কাম্য। চেতনার এই একটি নতুন দিগন্ত। এর পরও মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে ; অস্বীকার করে না যে সাবধানী বুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে সে জানে যে, এ সবই বাহ্য।

অধ্যাত্মচেতনার প্রকারভেদ আছে। যে-অধ্যাত্মচেতনায় ক্ষুদ্র জৈব ভয়ের মিশ্রণ বেশি, তাকে খাঁটি বলে স্বীকার করা যায় না। যুক্তির ভিতর দিয়ে যেটা সংস্কৃত ও পরিশোধিত হয়ে আসেনি, সেটা প্রাকৃতচেতনারই নামান্তর। তাতে কুসংস্কার কাটে না, বিচার উন্মুক্ত হয় না, সমাজ সবল হয় না। অন্তত আধুনিক সমাজের উন্নতির পথে সেটা বিঘ্ন। যুক্তিধর্মিতাকে উপেক্ষা করা ভুল। কিন্তু যুক্তিরও নব নব রূপ আছে, নতুন সম্ভাবনা আছে। একথা যখন আমরা ভুলি তখন যুক্তিবাদও হয়ে ওঠে একটি অসহিষ্ণুতার মন্ত্র।

মানুষের ভিতর একটি শক্তি অথবা তেজ আছে, যাকে বিশুদ্ধ রূপে অনুভব করি অহেতুকী প্রীতিতে, যার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হয় অকারণ আনন্দে। এই তেজ সব কিছুকে

স্পর্শ করে খুশিতে সব কিছুতে ছড়িয়ে পড়তে চায়। সংসারের প্রয়োজনে একে আমরা সংকুচিত করে আনি, ভয়ে অথবা ক্রোধে একে আমরা কখনও বা ধ্বংসাত্মক করে তুলি। কিন্তু এই সব সাময়িক প্রয়োজনের উর্ধ্বে অহেতুক প্রেম অথবা আনন্দের একটি নিজস্ব মূল্য আছে। অর্থাৎ একে প্রয়োজন এরই জন্য, অপর কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। অধ্যাত্মচেতনা যখন আসে, তখন এ কথাটাই আমাদের সে স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর এই পুরনো পৃথিবীকে আমরা নতুন চোখে দেখি। সেই সঙ্গে মানুষে মানুষে প্রাচীন বন্ধনও নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দেয়।

কোনো সরলরেখায় চৈতন্য এক স্তর থেকে স্তরান্তরে প্রসারিত হয় না। কখনও যুক্তিধর্মিতা আরোহী ; কখনও দেখি সংস্কৃতচেতনা থেকে প্রতিক্রিয়ায় প্রাকৃতচেতনার দিকে প্রত্যাবর্তন। কোথাও বিভিন্ন স্তরের ভিতর সমন্বয়ী বুদ্ধি প্রধান ; কোথাও আবার সংঘাতটাই প্রবল। চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব সার্থকতা আছে। প্রতি স্তর অন্য স্তরকে কিছু পরিমাণে পূর্ণ করে তোলে, কিছু পরিমাণে গ্রাস করে। প্রাকৃতচেতনা থেকে শক্তির সঞ্চার হয় সংস্কৃতচেতনায় ; এই যোগাযোগ ছিন্ন হলে সংস্কৃতচেতনা বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো নিস্তেজ হয়ে পড়ে। অথচ প্রাকৃতের বশ্যতা যুক্তির পক্ষে মারাত্মক। শুদ্ধ প্রেমের ওপর সমাজ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না ; নিছক স্বার্থও যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিচিন্তায় ও যুগমানসে সমভাবে চৈতন্যের বিভিন্ন ধারা এসে মিশেছে ; মিশ্রণের বৈশিষ্ট্যেই ব্যক্তি এবং যুগের বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতচেতনা ও অধ্যাত্মচেতনার দ্বন্দ্বে ও মিলনে রূপলাভ করেছে এ যুগের সূক্ষ্মতম ট্র্যাজেডিচেতনা। গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথ, রুসো অথবা রাসেল, চেতনার তিন স্রোত কার ভিতর কিভাবে মিশেছে সেটা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমরা কেউই চেতনার কোনো শুদ্ধ স্তরে বাস করি না। আমাদের সকলের জীবনই মিশ্র রাগরাগিণীতে বাঁধা। তবু শুদ্ধ রাগগুলি কিছুটা চিনে রাখা ভালো। এতে মানুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত ভাবনাচিন্তার স্বরূপ নির্ণয় করা অন্তত কিছুটা সহজ হয়। চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরের ভিতর সমন্বয়সাধনের একটা অস্থির ও সমাপ্তিহীন প্রয়াস ইতিহাসে পরিস্ফুট।

যুক্তি ও প্রতিষ্ঠান

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিকে বিচিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজ ক্রমাগত বিবর্তনের পথে চলেছে। এই বিবর্তনের প্রতি স্তরে তার যেমন একটা ভিতরের রূপ আছে, যেটা তার চেতনার রূপ, তেমনি একটা বাইরের রূপ আছে, যেটা তার প্রতিষ্ঠানের রূপ। উভয়কে যখন একসঙ্গে মিলিয়ে দেখি তখনই এদের সঙ্গে পরিচয়টা আরও গভীর হয়। মানুষে মানুষে কিছু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানের ভিতর ধরা দেয় না ; আমাদের এই আলোচনাতে স্বভাবত তাদের স্থান হবে না।

যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রাকৃত চেতনার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, সাধারণভাবে তাদের আত্মীয়তান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বাস্তব

অথবা কল্পিত একটা আত্মীয়বন্ধনের ছাঁচে ঢালা। সমাজ ও চেতনার বিবর্তনের পরবর্তী স্তরে বাণিজ্যের প্রসারের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এই স্তরের প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান বণিকতান্ত্রিক। বণিকতন্ত্রে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থবুদ্ধি। যুক্তিধর্মী নাগরচেতনার ঐতিহাসিক বিবর্তনে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। নাগর সভ্যতার আরও একটি অবলম্বন, আইন ও আমলাতন্ত্র। আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য আমাদের যুগে বেড়ে চলেছে। এর তাৎপর্য যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

প্রাকৃত চেতনার স্তরে আত্মীয়তন্ত্র, নাগর চেতনার স্তরে বণিকতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র, বিবর্তনের ধারায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের এই প্রধান গড়নধরন। আরও এক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আবশ্যক, যাকে বলা যেতে পারে বান্ধবসমিতি, আত্মীয়তন্ত্রের সঙ্গে যার কিছুটা সাদৃশ্য আবার মৌল পার্থক্য আছে। নতুন ধর্মের গোড়ায় বান্ধসমিতির উদাহরণ চোখে পড়ে। বলা বাহুল্য, আত্মীয়তন্ত্র সমেত প্রতি ধরনের প্রতিষ্ঠানের আবার রূপভেদ আছে। আর বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব এবং সংমিশ্রণও অনিবার্য।

১

যুক্তিধর্মিতায় চিহ্নিত প্রতিষ্ঠান নিয়েই আমাদের প্রধান আলোচনা। কিন্তু তার পটভূমিকা হিসেবে আত্মীয়তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলে নেওয়া আবশ্যক।

আত্মীয়তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের আদিরূপ স্বভাবতই পরিবার। একই সূত্র ধরে আমরা সহজেই যৌথ পরিবার থেকে উপজাতিতে গিয়ে পৌঁছই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রাচীন যুগের রাজ্য সাম্রাজ্য সব কিছুরই আদলটা সাধারণভাবে আত্মীয়তান্ত্রিক। রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্কের আদর্শরূপ পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অবলম্বিত।

আত্মীয়তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দুয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। আত্মীয়তন্ত্র সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পরিবারের ভিতর একটা স্বাভাবিক অসাম্য আছে। যেমন বয়োজ্যেষ্ঠরা স্বাভাবিকভাবেই কনিষ্ঠদের চেয়ে উঁচুতে। পিতামাতা সন্তানের ওপরে, একই নিয়মে পিতামহ পিতার ওপরে। সে যুগের বৃহত্তর সমাজেও দেখি, কিছুটা পরিবর্তিত আকারে, একই নিয়ম। পরিবারের ভিতর পিতা সন্তানকে রক্ষা করেন এবং শিক্ষা দেন। বৃহত্তর সমাজে শিক্ষা দেন গুরু ও ব্রাহ্মণ, রক্ষা করেন রাজা এবং তাঁর অধীনে রাজপুরুষেরা। শিক্ষা, এক অর্থে, রক্ষারও অধিক। যিনি শুধুই রক্ষক তিনি রক্ষা করেন সাময়িকভাবে, আর শিক্ষা রক্ষা করে স্থায়ীভাবে। সেকালে শিক্ষার ভিতর দিয়ে হস্তান্তরিত হত, এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে, সেই ঐতিহ্য, সনাতন ঐতিহ্য অথবা স্বধর্ম, সমাজকে যুগ যুগ ধরে যেটা রক্ষা করে চলত। অন্তত সমাজে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল। অতএব ব্রাহ্মণ ও ধর্মকে রক্ষা করাই প্রজাপালক রাজার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

আত্মীয়তান্ত্রিক সমাজের অসাম্য শুধু স্বাভাবিকই নয়, দৈবনির্দিষ্ট। যদিও দণ্ডনীতির কঠিন ভিত্তিতে এর প্রতিষ্ঠা, তবু এই অসাম্য আত্মীয়তাবোধের বিরোধী নয় বরং পরিপূরক বলেই সেদিন বিবেচিত হত। যুগধর্মের সঙ্গে না মিলিয়ে বিষয়টা বোঝা যায় না। দাস্যভাবের উদাহরণ ধরা যাক। বণিকযুগের দাসব্যবস্থা ব্যবসায়ের অঙ্গ ; প্রাচীন যুগের দাস কিন্তু হীন হলেও আত্মীয়ভাবের অঙ্গ। দাস্যভাব নিয়ে ভগবানের আরাধনার চিন্তা

সে-যুগের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক। স্বধর্ম পালনের ভিতর দিয়ে দাসও মুক্তি পায়, এমন কি অপরের আরাধ্য হয়। উনিশ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও গৃহযুদ্ধ, সেটা এক বস্তু। আর হনুমান যে দাস্যের ভাবমূর্তি, সেটা অন্য বস্তু। প্রাচীন ইতিহাসে, এ দুয়ের মাঝামাঝি, দাসপ্রথার আরও বিভিন্ন রূপ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

২

দাসকে যদিও আত্মীয়তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা গিয়েছিল, বণিককে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার ভিতর আঁটা কখনই সহজ ছিল না। যতদিন ঐ সম্প্রদায় আকারে ছোট ছিল এবং বাণিজ্য প্রধানত দেশের ভিতর আবদ্ধ ছিল, ততদিন বণিককে একটি আলাদা প্রকোষ্ঠে রেখে এবং সেটিকে তৃতীয় শ্রেণী বলে চিহ্নিত করে কোনো প্রকারে অবস্থা আয়ত্তে রাখা গিয়েছিল। তারপর সেটা আর আয়ত্তের ভিতর রইল না।

আসলে প্রাচীন সমাজের স্থায়ী ভাবের সঙ্গে বণিকবৃত্তির একটা মৌল পার্থক্য ছিল। বণিক বলতে এখানে অবশ্য আমরা তাদেরই বোঝাচ্ছি, বাণিজ্য অথবা ব্যবসায় যাদের পেশা। নয় তো মাঝে মাঝে প্রয়োজনে এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস সংগ্রহ অনেকেই করে থাকে। পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতর শাকের বদলে মূলো অথবা উপহারের পরিবর্তে উপহারের প্রাপ্তিযোগ হামেশাই ঘটে। সাধারণত অর্থের ব্যবহার ছাড়াই এই রকম দ্রব্য বিনিময় চলে। বলা বাহুল্য, একে আমরা ব্যবসায়ের সংজ্ঞার ভিতর ধরছি না। জীবিকার ভিত্তি হিসেবে নিয়মিত দ্রব্য বিনিময়, প্রধানত অর্থের মাধ্যমে, যারা করে থাকে তাদেরই বণিক বলা চলে।

প্রাচীন সমাজের অভ্যস্ত আচরণের সঙ্গে বণিকবুদ্ধির পার্থক্য এইখানে। বণিকবুদ্ধি চলে স্বার্থ গণনার ভিত্তিতে। বণিকের সামনে একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্যটা এমন যে, ব্যক্তিগত গণনা বা হিসেবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য এই গণনা লাভক্ষতির গণনা। প্রাচীন সমাজ চলে আচার এবং শাস্ত্রের অনুশাসন অনুযায়ী। এই আচারের কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই এমন নয়। কিন্তু অনেক কালের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের ভিতর দিয়ে আচার একটা স্থিরতা লাভ করে। ব্যক্তি তার পৃথক অভিজ্ঞতার গণ্ডির ভিতর নতুন করে আচার ও অনুশাসনের মূল্য যাচাই করতে উদ্যত হয় না। বরং আচারের মূল্য তার ঐতিহ্যবাহিতায় বা শাস্ত্রপ্রামাণ্যে।

লাভক্ষতির ব্যবসায়িক গণনার ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগের যুক্তিধর্মিতার প্রাথমিক প্রকাশ। এর ফলে ব্যক্তি তার স্বতন্ত্র স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়। ব্যবসায়িক গণনার ভিতর দিয়ে যুক্তিতে একজাতীয় তথ্যনিষ্ঠতা আসে। আত্মা অথবা মোক্ষ সম্পর্কিত চিন্তায় এই প্রকার তথ্যনির্ভরতা সহজে আসে না। সাবধানী ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবের অভ্যাসের ফলে যুক্তি বাস্তবধর্মী হয়। সমাজে যুক্তির বিবর্তনে এটা একটা প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

বাণিজ্য যখন বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন দেশাচারকে আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়। বণিকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে দেশের কৌতূহলী মানুষের চিন্তার পরিধির ভিতর সঞ্চিত হয়। ফলে প্রাচীন আচার ও অনুশাসনকে আর অনিবার্য মনে করা যায় না। বরং তুলনামূলক বিচারের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। এই আপেক্ষিক দৃষ্টিতে বিচারের মুক্তি ঘটে, চিন্তার স্বাধীনতার যুগ শুরু হয়। বাণিজ্যের ফলে সাংসারিক বস্তুনির্ভর অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। এই অনুসন্ধানী মনোবৃত্তির পিছনে যদিও ব্যবসায়িক

স্বার্থ থাকে, তবু এর একটা বৃহত্তর তাৎপর্যও আছে।

দেশাচার ছোট ছোট গোষ্ঠীতে আবদ্ধ। বাণিজ্য যখন বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তখন এমন কিছু আইনকানুনের প্রয়োজন দেখা দেয়, বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে যেটা সমভাবে গ্রহণযোগ্য। বর্ণ ও উপজাতিতে বিভক্ত সমাজের স্থিতিরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আচারবিচারের উদ্দেশ্য এক, আর ব্যবসায়িক চুক্তি রক্ষার জন্য যে আইনের প্রয়োজন তার উদ্দেশ্য ভিন্ন। কাজেই বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আইনের ক্ষেত্রে একটা নতুন আন্দোলন দেখা দেয়। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশি যুক্তি আশ্রিত। উপরন্তু একটা বিশেষ অর্থে এই নতুন আইন সমদৃষ্টিসম্পন্ন।

আত্মীয়তান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক অসাম্যবোধের কথা আগেই বলেছি। বণিকের দৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে যে-সম্পর্কটা আছে, সেটা হল ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক। ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিতর কাউকেই প্রথম দৃষ্টিতে বড় অথবা ছোট মনে করা যায় না। অর্থাৎ, বাণিজ্যের মূল সম্পর্কটা, অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে, সমানে সমানে সম্পর্ক। পার্থক্য বস্তুত দেখা দেয়। তবুও তাত্ত্বিক প্রশ্নটা মূল্যবান। আইনের চোখে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই সমান, বণিক সংস্কৃতির এই রকম একটা ঝোঁক আছে, প্রাচীন সমাজের অসাম্যের সংস্কার থেকে যেটা উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। সব মিলিয়ে যুক্তির ঐতিহাসিক বিবর্তনে বণিক সংস্কৃতির একটা বড় অবদান অস্বীকার করা যায় না। বাণিজ্য যখন বহির্মুখী ও প্রসারশীল, তখনই এই অবদান সম্ভব হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই এর একটা প্রভাব পড়েছে। চেতনার এতো বড় একটা আন্দোলন যদি প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে স্পর্শ না করত, তবে সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার হত।

আমলাতন্ত্র নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে পুরনো ইতিহাসে আবারও একটু ফিরে যেতে হয়।

প্রাচীন সাম্রাজ্যে আমরা লক্ষ করেছিলাম, আত্মীয়তন্ত্রের একটা সম্প্রসারিত গঠন। মধ্যযুগে সাম্রাজ্যের সংগঠিত মূর্তির প্রধান উদাহরণ, সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রেরও আবার নানা রূপ আছে এবং এদের ভিতর পার্থক্য কম নয়। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সাধারণ মন্তব্যই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একরূপে সামন্তরাজা অথবা সুবেদারগণ নিজ নিজ রাজ্যে প্রায় সর্বেসর্বা। প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁদের হাতে. তাঁরাই প্রজাদের রক্ষক এবং দণ্ডদাতা। তাঁদের ক্ষমতা সচরাচর পুরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকে। সম্রাট যদিও তাঁদের কাছ থেকে রাজস্বের একাংশ লাভ করেন এবং সেই সঙ্গে পান আনুগত্যের অঙ্গীকার, তবু পুরুষানুক্রমিক অধিকারের ফলে সামন্তরাজারা প্রায়শ বিশেষ ক্ষমতাবান।

এই বিকেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের পিছনে একটা যুক্তি আছে। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় যুদ্ধ জয়ের ভিতর দিয়ে, যদি-না আক্রান্ত দেশ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধ জয়ের পর অনেক ক্ষেত্রেই একটা সামরিক শাসন কিছু কালের জন্য চলে। কিন্তু সম্রাট মুখ্যত আকাঙ্ক্ষা করেন যশ এবং রাজস্ব। দূর দেশ থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় সহজ নয়। অনুগত কোনো রাজপুরুষ যদি সেখানে রাজা হয়ে বসেন এবং রাজস্বের একাংশ যথা সময়ে সম্রাটকে পাঠান তবেই সমস্যার সমাধান হয়। সামন্তরাজার আনুগত্যের অঙ্গীকার থেকে সম্রাট লাভ করেন যশ. প্রয়োজনে সামরিক সহায়তা; নিয়মিত রাজস্ব এবং উপঢৌকনে আসে সমৃদ্ধি।

কিন্তু এই বিকেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রের একটা বিপদও আছে। সামন্তরাজারা নিজ নিজ

রাজ্যে শক্তিশালী। সম্রাটের প্রতি তাঁদের আনুগত্য চিরকাল অটুট থাকে না। বিকেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্রে কখনও কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়ে ; সেই সুযোগে সামন্তরাজারা বিদ্রোহে প্রলুব্ধ হন। সম্ভবত এই সমস্যার সমাধান হিসেবেই দেখা দেয় সামন্ততন্ত্রের এক বিকল্প রূপ। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এবার শাসন চালান মনোনীত রাজপুরুষেরা। প্রয়োজন মতো এঁদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানানরিত করা হয়. যাতে এঁরা না কোথাও স্থায়ীভাবে শিকড় গাড়তে পারেন। অর্থাৎ এটা হয়ে ওঠে বদলির চাকুরি। চীনে রাজপুরুষদের নির্বাচনের জন্য সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। তা ছাড়া কেন্দ্রের অধীনে গুপ্তচরবাহিনী দেশে বিদেশে খবর সংগ্রহ করে বেড়ায়, সাম্রাজ্যের নিবাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে।

সামন্ততন্ত্রের এই দুই রূপের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। বস্তুত দ্বিতীয় রূপে আমরা পাচ্ছি, প্রাচীন সমাজের ভিতর থেকে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব। তবে এই আমলাতন্ত্রও পরিবারভিত্তিক বা আত্মীয়তান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার কাঠামোর ভিতর প্রতিষ্ঠিত। প্রসিদ্ধ চীনা দার্শনিক কুং-এর চিন্তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

বর্ধিষ্ণু বণিকতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগের ফলে আমলাতন্ত্র ক্রমে তার আধুনিক রূপে পরিণত হল। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের যুগেও কয়েকটি ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাতে আত্মীয়তান্ত্রিক সমাজের ভাবাদর্শ থেকে তার একটা স্বতন্ত্র চেহারা ফুটে ওঠে। যুক্তিধর্মিতার একটা বিশেষ দিকের বিকাশও সেই সঙ্গে লক্ষ করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ঐ দিকটি পরিস্ফুট। গুপ্তচর বাহিনীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এর সংগঠনে ও নিয়ন্ত্রণে যে পরিকল্পিত কূটনীতির সন্ধান মেলে, সেটা আধুনিক যুগের মেজাজকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দরবারী সমাজ এবং রাজনীতিক ক্ষমতার লড়াই যুক্তিধর্মিতার বিবর্তনে স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে।

আরও একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখযোগ্য। রাজস্ব আদায়ের জন্য সম্রাট নির্ভর করতেন সামন্তরাজা ও রাজকর্মচারীদের ওপর। এখানে প্রচুর কারচুপির সম্ভাবনা ছিল। কাজেই প্রাচীন আমলাতন্ত্রের মধ্য থেকেই ধীরে ধীরে হিসেব পরীক্ষার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল। সরকারী নিরীক্ষকদের নিযুক্ত করা হল হিসেব পরীক্ষার জন্য। কখনও কখনও আবার আমলারা বাণিজ্যের কাজেও নিযুক্ত হলেন। সরকারী উদ্যোগে শিল্প পরিচালনা চালু হল। বণিকের সংস্কৃতি আর আমলা সংস্কৃতির ভিতর অন্তত আংশিক যোগাযোগ শুরু হয়ে যায় প্রাচীনকাল থেকেই।

আধুনিক আমলাতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার উল্লেখ ছাড়া যুক্তিধর্মিতার বিবর্তনে আমলাতন্ত্রের বিশেষ অবদান বোঝা সম্ভব নয়। আত্মীয়তন্ত্র দয়া স্নেহ শ্রদ্ধার ওপর স্থাপিত ; আমলাতন্ত্র নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মীয়দের নিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের গঠন অন্যপ্রকার। আমলারা সরকারী নীতি নির্ধারণ করেন না, কিন্তু প্রয়োগ করেন। তাঁদের কাজ প্রধানত অনাত্মীয় সহকর্মীদের নিয়ে অনাত্মীয় জনসাধারণের জন্য। এ অবস্থায় নিরপেক্ষভাবে, নিয়ম মান্য করে, কাজ চালিয়ে যাওয়া আমলার ধর্ম। এখানেই আত্মীয়তন্ত্রের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের মৌল পার্থক্য। কোনো আমলা স্বধর্মচ্যুত হতে পারেন, তাঁর পদস্খলন হতে পারে, সেটা অন্য কথা। মূল কথাটা স্বধর্ম নিয়ে। আত্মীয়তন্ত্রে, এমন কি বণিকতন্ত্রে, যদি কেউ আত্মীয়ের প্রতি পক্ষপাত দেখান তবে সেটা তার স্বধর্মের বিরুদ্ধে যায় না। নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ ব্যবহার আত্মীয়ধর্মের অঙ্গ নয়। কিন্তু এটাই আমলার আচরণবিধির অঙ্গ। আদর্শ আমলার

আচরণে সৌজন্যের সঙ্গে একটা নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিয়মানুগতা থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে এটা যুক্তিধর্মিতার একটা বিশিষ্ট প্রকাশ।

বণিক সংস্কৃতি ও আমলা সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সংমিশ্রণ ঘটেছে একালের অতিকায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে। প্রতিষ্ঠানের আকার যেখানে বৃহৎ, সেখানে প্রশাসনে অনিবার্যভাবে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অল্পবেশি ফুটে ওঠে। আবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গুণাগুণও কিছুটা থেকে যায়। বৃহৎ শিল্পের অপর বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি ঝোঁক। বড় শিল্পগুলির ভিতর যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তাতে বিজ্ঞানের সহায়তা সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। দীর্ঘকালীন ও ব্যাপক দৃষ্টিতে অনিবার্য সিদ্ধান্ত এই যে, বিজ্ঞানই শিল্পের শ্রেষ্ঠ সহায়।

বিজ্ঞানের দুটি দিক আছে। এক তার বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিক। যুক্তিধর্মী মন বিশ্বপ্রকৃতিকে যতক্ষণ না জানতে পারছে নিয়মের ভিতর দিয়ে, ততক্ষণ তার জানাটা অসম্পূর্ণ, সেই অসামঞ্জস্যের কাঁটা মনে বিঁধে তাকে করে রাখে অসুখী। কিন্তু বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে মানুষ শুধু জানবার সুখ চায়নি, আরও চেয়েছে করবার শক্তি। এটাই সেই দ্বিতীয় দিক, যেখানে বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে প্রযুক্তিবিদ্যা। জ্ঞানই শক্তি। প্রযুক্তিবিদ্যার শক্তিতে মানুষ পৃথিবীকে বদলে চলেছে, গড়ে তুলেছে নতুন শিল্প এবং সেই সঙ্গে গড়বার ও ধ্বংস করবার আরও নানা উপাদান। সাধারণ মানুষের ভিতর বিজ্ঞানের আজ যে মর্যাদা, তার একটা বড় কারণ প্রযুক্তিবিদ্যার এই ব্যহারিক শক্তি। আধুনিক যুগ শুধু বিজ্ঞানধর্মী নয় ; প্রাচীন যুগকে সে পিছনে ফেলে এসেছে অদম্য প্রয়োগধর্মিতায়।

এ যুগের যুক্তিধর্মিতার ভিত্তিতে আছে, একদিকে যেমন বণিক সংস্কৃতি ও রাজনীতি, আইন ও আমলাতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তায় শাসনযন্ত্র ও আমলাতন্ত্র আজ আরও বেশি শক্তিশালী। বণিকতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেরও চরিত্র এবং সংগঠন বদলে চলেছে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে। সাংগঠনিক দৃষ্টিতে, বণিকতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের ভিতর পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রে কমে আসছে। মোটের ওপর আমাদের যুগ রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রাধান্যের যুগ।

৪

যুক্তিধর্মিতার পরিমণ্ডলে যে-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করেছি। এবার কয়েকটি সমস্যা আলোচনা করা আবশ্যক। মানুষকে যেমন আমরা চিনতে পারি তার বিশেষ গুণে ও বিশেষ দুর্বলতায়, মানুষের প্রতিষ্ঠানকেও চেনা যায় তেমনিভাবে। আর আজকের সমস্যার ভিতর দিয়ে বিবর্তনের পরবর্তী ধাপ সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আত্মীয়তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে যেমন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি সংযুক্ত হয় রক্তের বন্ধনে ও আত্মীয়তার বাস্তব অথবা কল্পিত ধারণায়, বণিকতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি পারস্পরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় স্বার্থ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের যুক্তিতে। অন্তত আধুনিক যুক্তিধর্মী প্রতিষ্ঠানের এটাই আদর্শ রূপ। মধ্যযুগীয় ধারণায় রাজা রাজ্যশাসন করতেন দৈব অধিকারে। কিন্তু সতেরো ও আঠারো শতকে এই রকম একটা মত প্রচলিত হল যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সামাজিক চুক্তিতে। চুক্তির পিছনে সাধারণত একটা স্বার্থের যুক্তি থাকে, সেটা বাণিজ্যিক চুক্তিই হোক আর রাজনীতিক চুক্তিই হোক।

রাজশক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তির তত্ত্বে নতুন যুক্তিধর্মী চেতনার প্রকাশ পরিস্ফুট। এই নতুন যুগধর্ম সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে, যেমন ব্যবসায়িক ও আমলাতান্ত্রিক এমনকি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানেও, সংক্রামিত হয়েছে। সমাজের সব সম্পর্কই যেন আজ দাঁড়িয়ে আছে, লিখিত অথবা অলিখিত চুক্তির ওপর।

চুক্তি দু'পক্ষই স্বেচ্ছায় মেনে নেয়, নয় তো সেটা চুক্তিই নয়। এটাই চুক্তির সংজ্ঞা। যেহেতু এতে দু'পক্ষেরই সম্মতি আছে অতএব, কোনো নাকোনো অর্থে, চুক্তিতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ আছে। কিন্তু সেই অর্থটা একপক্ষের কাছে নিদারুণ হতে পারে। দরিদ্র মানুষ সামান্যতম মজুরীতে সারাদিন খাটবার চুক্তি স্বেচ্ছায় মেনে নিতে পারে, কারণ তা নইলে তাকে অনাহারে মরতে হবে। অনাহারের চেয়ে অর্ধাহার ভালো, এমনকি অপমানজনক শর্ত সত্ত্বেও সেটাই ভালো মনে হতে পারে। চুক্তিটা এখানে পারস্পরিক স্বার্থের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বটে। তবু ওটা ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকৃত হবে, এমন কথা নেই। ন্যায়ের জন্য পারস্পরিক স্বার্থের চেয়ে আরও বেশি কিছু প্রয়োজন। দুই পক্ষের সুবিধার বণ্টনে একটা "সাম্য" থাকা চাই। চুক্তিটা "যুক্তিসঙ্গত" হওয়া চাই। বণিকতন্ত্রের কাঠামোর ভিতর এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন। যেখানে দু'পক্ষের শক্তির তারতম্য বড়, সেখানে চুক্তি দুর্বল পক্ষের বিরুদ্ধে যাবেই।

এ ছাড়া আরও সমস্যা আছে। মজুরীর প্রশ্ন যদিও জরুরী, তবু সেটাও একমাত্র প্রশ্ন নয়। আজকের সমাজে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাধান্য লাভ করছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান বৃহৎ। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যারও যেন ঝোঁক আছে বৃহৎ শিল্প গঠনের দিকে। এই সব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সংগঠন 'আমলাতান্ত্রিক'।

আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নিয়মের ওপর চলে। এই নিয়মগুলো হয়তো কখনও যুক্তিসঙ্গত, হয়তো কখনও নয়। কিন্তু যেখানে নিয়মটা যুক্তিসঙ্গত, সেখানেও প্রত্যেকটি কর্মীর কাছে সেই যুক্তি পরিষ্কার নয়। কারণ, যুক্তিটা দাঁড়িয়ে আছে প্রতিষ্ঠানের জটিল ও সামগ্রিক প্রয়োজনের ওপর। কর্মীবিশেষ সমগ্র প্রয়োজনটা দেখছেন না; তিনি প্রয়োজনকে দেখছেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছোট পরিধির ভিতর। কাজেই প্রতিষ্ঠানের নিয়ম যেখানে যুক্তিসঙ্গত, সেখানেও কর্মীকে অনেক সময় সেটা মেনে নিতে হয় যুক্তি ছাড়াই। অর্থাৎ, তাঁকে কাজ করতে হয়, ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে, ওপর থেকে চাপানো একটা "যুক্তিহীন" নিয়মের কাঠামোর ভিতর। ফলে কর্মীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের মনের যোগ ছিন্ন হয়ে যায়, প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে একটা অর্থহীন প্রাণহীন যন্ত্র। এটা কঠিন সমস্যা। সমগ্রের বাইরে অংশবিশেষের অর্থ কখনও স্পষ্ট নয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক প্রয়োজনের একটা ছবি মনের ভিতর ধারণ করা অথবা প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট করে তোলা, সদিচ্ছা থাকলেও, দুরূহ ব্যাপার।

নিয়ম এবং পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত হলেও ঐ সমস্যাটা থাকে। না হলে সমস্যা আরও জটিল। বলা বাহুল্য, নিয়মের পিছনে সব সময় একটা সম্পূর্ণ জীবন্ত যুক্তি থাকে না। প্রাণহীন নিয়ম অপ্রয়োজনে দুই পক্ষের ভিতর ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যোগ হয় প্রশাসনিক দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার নামে যেটা আজ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

আরও বিঘ্ন আছে। সমাজে সর্বক্ষণ ক্ষমতার একটা দ্বন্দ্ব চলছে। নিয়ম ও পরিকল্পনা সেই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত নয়। যাঁরা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত তাঁরাই নানা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরাই পরিকল্পনা রচনা করেন। কোনো সমাজই এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। সাম্যবাদী সমাজেও ক্ষমতার প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকেই পরিকল্পনা বেরিয়ে

আসে। বৃহত্তর সমাজেই হোক আর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরেই হোক, এই সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই ; আছে, এমন আশা করাটাই ভুল।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের পরিপার্শ্বের চেহারা পালটে দিচ্ছে। কিন্তু এর ভিতরও নানা জটিলতা আছে। একটি বিশেষ সমস্যার উল্লেখ প্রয়োজন। আজকের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রধানত নগরভিত্তিক। পিছিয়ে-পড়া দেশ ধার করছে উন্নত দেশের কাছ থেকে। বিজ্ঞানের চর্চা হচ্ছে প্রধানত নগরে, যেখানে উচ্চ শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সমাবেশ, আধুনিক সভ্যতার নানা উপকরণ যেখানে সহজে লভ্য। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ থেকেই আবার একটা জটিলতার সৃষ্টি। নগর ও পল্লীর ভিতর ব্যবধান বেড়ে চলেছে, যেমন বেড়েছে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির ভিতর ব্যবধান। নগরের চিকিৎসক বা যান্ত্রিক নগর ছেড়ে গ্রামে বেশি দিন তিষ্ঠতে পারেন না যে-চিকিৎসাবিদ্যা বা যন্ত্রবিদ্যা তাঁর আয়ত্তে, নাগরিক উপকরণ হাতের কাছে না পেলে তিনি সেটা যুতমতো ব্যবহার করতে পারেন না। সমস্যাটা আরও গভীর। নগর ও পল্লী যে শুধু হাত ধরাধরি করে চলেনি তাই নয় ; উভয়ের সম্পর্ক সংঘাতের রূপ নিয়েছে। বৃহৎ শিল্পের আঘাতে গ্রামের শিল্প ভেঙ্গে পড়েছে। আবার গ্রামের অর্ধ বেকারের দল শহরে ভিড় করে সেখানকার জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

নগর শুধু শিল্প ও বিজ্ঞানের কেন্দ্রই নয়, রাজনীতিরও কেন্দ্র। । রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতাপ ও কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির গুরুত্ব বেড়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব আজকের সমাজে এক কঠিন দ্বন্দ্ব। বৃহৎ শিল্পকে কি করে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয়, এতদিনে আমরা তা জানি। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব তাতে কমে না। এই দ্বন্দ্বকে বশে আনবার অথবা সভ্য করে তুলবার পদ্ধতি এখনও আমাদের আয়ত্ত হয়নি। বরং ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ, নগর ও পল্লীর ভিতর ব্যবধানের সঙ্কট, আর প্রয়োগধর্মী জীবনাদর্শের সব ব্যর্থতা যেন ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মাদকতায় বারবার একটা মিথ্যা পরিত্রাণ খুঁজছে।

যুক্তি থেকে পিছু হটে এসে এই সব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, এমন মনে করা ভুল। যুক্তিধর্মিতার চেয়ে যুক্তি বড় ; কারণ, প্রথমটি হল একটা বিশেষ যুগের ধর্ম, দ্বিতীয়টি মানুষের ধর্ম। যুক্তিকে খুঁজে নিতে হবে ভবিষ্যতের নতুন দিগন্ত। নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠানেরও রূপ বদলে চলবে।

সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল অংশের মানুষদের সংগঠন প্রয়োজন অন্যায় সামাজিক "চুক্তি"র সংশোধনের জন্য। এদেশের গ্রামাঞ্চলে এটা বিশেষ জরুরী। বণিক পর্যায় থেকেও আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে নতুন যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী। বণিক সংস্কৃতি আমাদের হিসেব রাখতে শিখিয়েছে, সেটা লাভ। গান্ধী নিজেকে বানিয়া বলতে দ্বিধা করেননি। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে হিসেব প্রয়োজন, তিনি জানতেন। আমলাতন্ত্র যদি অনাত্মীয়ের সঙ্গে কাজেকর্মে কিছু পরিমাণে নিয়মের শিক্ষা দিয়ে থাকে তো সেটাও লাভ। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নিয়মানুগতার প্রয়োজন আছে। নিয়ম রচনার কাজে কর্মীদের কীভাবে কতটা যুক্ত করা যায়, সেটাই এখন প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই শিল্প পরিচালনায় কর্মীপ্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করছেন একাধিক দেশে, যুগোস্লাভিয়ার নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বৃহত্তর সমাজে প্রয়োজন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এর লক্ষ্য শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে ক্ষমতা তুলে নিয়ে শাসনযন্ত্রের আরও একটু নীচুস্তরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা নয়। রাজনীতির বাইরে যে-সব প্রতিষ্ঠান আছে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আরও নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সরকারী এবং দলীয় আধিপত্যের বাইরে তাদেরও নিজ নিজ অধিকারের একটা ক্ষেত্র থাকা প্রয়োজন। রাজনীতির প্রাধান্যটাই আজ ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণের বড় লক্ষণ। আজকের রাজনীতির কাঠামো দলীয়, উদ্দেশ্য যে-কোনো প্রকারে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া। এতে বিপর্যয় ঠেকানো যাচ্ছে না, বরং বিপত্তি বাড়ছে। এরই উসকানিতে বিচ্ছিন্ন মানুষের সব ব্যর্থতা একটা যৌথ আক্রোশের আকার ধারণ করছে, তত্ত্বে বিধৃত বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে। সমাজের মূলে সেই সব স্বায়ত্তশাসিত ও যথাসম্ভব নির্দলীয় সমিতিকে আজ শক্তিশালী করা আবশ্যক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যেখানে পারস্পরিক নৈকট্যের ওপর স্থাপন করা সম্ভব।

আর আবশ্যক, পল্লী ও নগরের ভিতর সমন্বয়ের চেষ্টা। সমন্বয় চাই, যেমন আর্থিক তেমনি সাংস্কৃতিক। নাগর সংস্কৃতি ও পল্লী সংস্কৃতির ভিতর একটা স্বাভাবিক ও সৃজনধর্মী দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্ভব। লোকসঙ্গীত উঠে আসে দরবারে, যেখানে সে নতুন রূপ পায়, আবার দরবারী সঙ্গীত ফিরে যায় পল্লীতে নতুন প্রাণের সন্ধানে। এই প্রক্রিয়াটা যখনই বন্ধ হয়েছে তখনই ক্ষতি হয়েছে দু'পক্ষেরই। পল্লী সংস্কৃতিতে একটা সহজ মানবিকতার ভিত্তি আছে, যার ওপর যুগে যুগে আচার, অনাচার, ভয় ও অজ্ঞতায় আশ্রিত নানা বিচিত্র সংস্কার, জমে উঠেছে পরতে পরতে। সেই সহজ মানবিকতাকে পুনরুদ্ধার করা সহজ নয়। তবু তারই সঙ্গে যোগে যুক্তিরও মুক্তি। চৈতন্যের স্তরের মতো সংস্কৃতিরও স্তরভেদ থাকবে। সেই বিভিন্ন স্তরের ভিতর একটা আরোহণ অবরোহণের ধারা অক্ষুণ্ণ না রাখলেই অমঙ্গল।

শুরুতে বান্ধবসমিতির সামান্য উল্লেখ ছিল। এবার সেই প্রসঙ্গ ধরেই আলোচনা সমাপ্ত করব। বান্ধবসমিতি এবং আত্মীয়গোষ্ঠীর ভিতর প্রভেদ আছে। বান্ধবসমিতি গঠিত হয় প্রতিবেশীকে নিয়ে। অথবা আমরা যাদের মনে মনে কাছের মানুষ বলে জানি তাদের নিয়ে। আত্মীয় ও প্রতিবেশীব ভিতর একটা মৌল পার্থক্য আছে। প্রতিবেশীকে আমি আমার চেয়ে স্বতন্ত্র বলেই জানি। স্বতন্ত্র জেনেও তাকে আমি বন্ধুরূপে পেতে চাই। সেই বন্ধুত্ব অর্জিত ধন, তাকে রক্ষা করতে হয়। আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আমার অর্জিত ধন নয়। তাকে আমরা স্বতন্ত্র বলে মানি না। তার ওপর আমাদের দাবি সহজাত। যে-সমাজ একবার যুক্তিধর্মিতার স্তরে পৌঁচেছে, অখণ্ড আত্মীয়তন্ত্রে সে আর ফিরে যেতে পারে না, চাইলেও নয়। তাকে তখন একটা বিকল্পে উত্তীর্ণ হতে হয়। বান্ধবসমিতি সেই বিকল্প। সমবায় সমিতিকে বলা যেতে পারে ব্যবসায়িক সংস্থা ও বান্ধবসমিতির এক বিশেষ সংমিশ্রণ।

প্রতি যুগেরই নিজস্ব একটা আদর্শ থাকে, যুগের চেতনার প্রান্তে যেটা প্রতিষ্ঠিত। এ যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, সব প্রতিষ্ঠানেরই বিকৃতি সম্ভব। তবু মানুষের একটা আদর্শকল্পনা থাকে। বান্ধবসমিতি ভবিষ্যতের দিগন্তসংলগ্ন সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আত্মীয়তন্ত্রের দৈবনির্দিষ্ট অসাম্য সেখানে নেই; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে কিন্তু বণিকতন্ত্রের স্বার্থসর্বস্বতা নেই; সমবায় সেখানে পদাধিকারে অযথা খণ্ডিত নয়; যুক্তি সেখানে শুভাকাঙ্ক্ষী।

প্রতিযুগ নতুন ক'রে যাত্রা শুরু করে। রুশ বিপ্লবের পর দুই প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অভিজ্ঞতাকে পদে পদে জ্ঞানের অংশ করে নেওয়া যুক্তির কাজ। এ যুগের প্রধান প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্র। এইখান থেকে আজকের যাত্রা শুরু। এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা ইতিহাসকে নতুন করে দেখছি। লক্ষ্য সহসা বদলায় না, কিন্তু পথ অথবা পদ্ধতি

কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়।

আচার বিচার আনন্দ

আচার ও ধর্মের ওপর সনাতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালে পিতার বৃত্তি পুত্র গ্রহণ করত। পিতার অভ্যস্তকুশলতার উত্তরাধিকার পুত্রের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হত। পিতার প্রতি পুত্রের, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক কর্তব্য, এসবই পরিচিত পৌরাণিক আদর্শে ও ধর্মশসস্ত্রে নির্ভুলভাবে বলা ছিল। সমাজের কোন স্তরে কোন অবস্থায় কার কি করণীয় এ বিষয়ে একটা ঐকমত্য ছিল। ভগবানের স্বরূপ অথবা ন্যায়শাস্ত্রের প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক হত ; কিন্তু বিধবার ব্রত, ব্রাহ্মণের অধিকার অথবা ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে কৃত্যাকৃত্য যেন প্রশ্নাতীত একটা নিশ্চয়তায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এদেশের বৃহত্তর সমাজ বর্ণে ও জাতিতে বিভক্ত ছিল, বিভিন্ন বর্ণের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্য দেশেও সামাজিক উচ্চ-নীচ ভেদ স্বীকৃত ছিল ; আচার ও ধর্মের ওপর এই ভেদাভেদের প্রতিষ্ঠা। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের বেশভূষা, গতিবিধি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণা, সবই ছিল স্বীকৃত ঐতিহ্যের দ্বারা স্থিরীকৃত। এরই ভিতর কখনও কখনও অস্থিরতা দেখা দিত। বিশেষত বাইরের অচেনা শত্রু যখন পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তখন আচারের অচলায়তনও কিছুক্ষণের জন্য কেঁপে উঠত। কিন্তু এটা ছিল ব্যতিক্রম, সাময়িক ছন্দভঙ্গ।

সনাতন সমাজে ব্যক্তিকে বড় বেশি চিন্তা-ভাবনা করে পথ বেছে নিতে হত না। কোন পথ ভালো আর কোনটা মন্দ, এ নিয়ে সন্দেহের তেমন অবকাশ ছিল না। মনের ভিতর তবুও যে দ্বন্দ্ব চলত, তার প্রধান কারণ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য। শাস্ত্রের আলোতে যেটা স্পষ্টভাবেই ভালো বলে চেনা যায়, হৃদয় কখনও কখনও সেটা মানতে চাইত না। কাজেই দুর্বল চিত্তবৃত্তিকে শাসন করাটাই ছিল প্রধান সমস্যা। নয় তো বিচার অটল ও অভ্রান্ত। সনাতনী দৃষ্টিতে, নারী ও পুরুষ, এই চঞ্চল হৃদয়বৃত্তি এবং অবিচল বিচারবুদ্ধির যুগ্ম প্রতীক। দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য নারী ছিল আচারের বিশ্বস্ত সেবিকা। প্রাচীন সমাজ এইভাবে আচারের প্রাচীরে ঘেরা একটি নিঃসংশয় আত্মিক নিরাপত্তার ভিতর ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিল।

আধুনিক যুগের প্রান্তে এসে ভাঙ্গন দেখা দিল। প্রাচীন সমাজ ছিল পরিবারভিত্তিক। পরিবার ভেঙ্গে মানুষ যখন ক্রমশ বেশি সংখ্যায় জীবিকার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো আকর্ষণে বাইরে বেরোতে শুরু করল, তখন থেকেই আচারের পাকাবাড়িতেও ভাঙ্গন শুরু। পিতা এবং পুত্রের বৃত্তি আর অভিন্ন রইল না। ব্যক্তির আবাল্য পরিচিত গৃহপ্রাঙ্গণের বাইরেও যে অন্য দেশ ও সমাজ আছে, ভিন্ন মানুষ যে ভিন্ন ধর্ম ও আচারকে আশ্রয় করে ভগবানের এই সৃষ্টির মধ্যেই স্বচ্ছন্দে স্থান করে নিয়েছে, এই বৈচিত্র্য ব্যক্তির চিন্তায় ও কল্পনায় একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। নিজ সমাজের, এমন কি

ধর্মপ্রতিষ্ঠানেরও, নানা দুর্নীতি ও কুসংস্কার ব্যক্তির আলোচিত চেতনার দৃষ্টিতে এবার অসহনীয় মনে হতে লাগল।

এমনি করে সংশয়ের শুরু। বেদ, বাইবেল, কোরান অভ্রান্ত। কিন্তু অভ্রান্ত বাণীরও নানা ব্যাখ্যা সম্ভব। কোন ব্যাখ্যাটি নির্ভুল ? সনাতনপন্থীরা বললেন, শাস্ত্রকারদের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য। বিদ্রোহীরা বললেন, ব্যক্তির বিবেকই হবে তার পথপ্রদর্শক। আবার মৌল সংশয়বাদীরা বললেন যে, সত্যনির্ণয়ের আসলে কোনো অভ্রান্ত উপায় নেই। তাহলে ?

সত্য নির্ধারণের অভ্রান্ত উপায় থাক বা না-থাক জীবননির্বাহ করা আবশ্যক। অতএব কিছু সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এই অবস্থায় একটি সুখবাদী দর্শন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করল, যুক্তির ওপর যার নির্ভর। সুখ ও দুঃখকে আমরা পাই প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিতর। সত্য সম্বন্ধে যত সংশয়ই থাক না কেন, সুখ আছে দুঃখ আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এজন্য আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো প্রমাণের দ্বারস্থ হতে হয় না। সুখ কাম্য। অন্তত সুখবাদীদের কাছে এটাই সরল অকাট্য সত্য।

সুখ যাতে বাড়ে তাই ভালো, সুখের যাতে বিঘ্ন ঘটে তাই মন্দ। যিনি যুক্তিবান তিনি শুধু এই মুহূর্তের সুখের কথা চিন্তা করেন না। যে-সব উপায়ে সারা জীবনে সুখের যোগফলটা সবচেয়ে বড় হয়, সেই সব উপায় খুঁজে বের করাটাই যুক্তির কাজ। যুক্তি নির্লিপ্ত শুধু এই অর্থে। যুক্তি এই মুহূর্তের সুখে অন্ধের মতো লিপ্ত নয়। তবু যুক্তির দৃষ্টিতে ব্যাপকতম অর্থে সুখই কাম্য। আচারের কোনো নিজস্ব মূল্য নেই ; সুখেরই নিজস্ব মূল্য আছে। এই হল বিচারনির্ভর সুখবাদের কথা।

কিন্তু এই সহজ কথাটিরও অর্থের বিস্তৃতি সম্ভব। যুক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এই সহজ কথাটিও সত্যের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হয়। আমরা যে সুখ দুঃখকে প্রত্যক্ষ অনুভবের ভিতর পাই, সেটা ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ। ব্যক্তিগত সুখবাদে বিশ্বাস রাখলে ব্যক্তি চাইবেন, নিজের জীবনে বৃহত্তম সুখ। অন্যের সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষভাবে এখানে গণনার মধ্যে আসছে না। কিন্তু যুক্তির ভিতর অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণের দিকে একটা ঝোঁক আছে। সুখ নামক অভিজ্ঞতার যদি এমন কোনো নিজস্ব গুণ থাকে যাতে তাকে ভালো বলা যায়, তবে সেটা যদুর অভিজ্ঞতা হলেও ভালো, মধুর হলেও ভালো। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ভালো নয়, সকলের জন্যই ভালো। যদি তাই হয়, তবে ভালোমন্দের বিচারে আমরা একটা বৃহত্তর সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছই। বহুতম মানুষের বৃহত্তম সুখটাই নীতির বিচারে শ্রেয়। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের অল্প সুখের জন্য অপরের বেশি সুখ বিসর্জন দিতে চান, তবে তাকে অন্তত নৈতিক বিচারে সমর্থন করা যায় না। ব্যক্তিগত সুখবাদ থেকে এইভাবে আমরা আরোহন করি বিশ্বজনীন সুখবাদে। এই আরোহণ একান্তই যুক্তিবাদের ওপর নির্ভরশীল। এতে ব্রহ্মবাদের কথা নেই। এই বিশ্বজনীন সুখবাদ মূলত মানবতামুখী।

বিশ্বজনীন সুখবাদে, আমার সুখও মূল্যবান, অপরের সুখও মূল্যবান ; এবং বিশেষ কোনো কারণ না থাকলে ধরে নেওয়া সঙ্গত যে কোনোটিই অন্যটির চেয়ে কম অথবা বেশি মূল্যবান নয়, অর্থাৎ দুটির সমান মূল্য। অথচ অপরের দুঃখ নিবারণের জন্যে আমরা যে কাজ করি, তার একটি বিশেষ মূল্য সমাজে স্বীকৃত। আমাদের নিজের চেতনার ভিতরও এমন একটি স্বীকৃতি আমরা অনুভব করি। এই স্বীকৃতি কি শুধুই কুসংস্কার, না যুক্তিতে এরও একটা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় ? ষোল শতকের গোড়ায় টমাস মোর 'উটোপিয়া' নামে যে পুস্তকটি রচনা করেছিলেন, তাতে এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া

যায়। বইটি অতি সুপাঠ্য, চাপা কৌতুকের ভাষায় লেখা ; তবু এর চিন্তায় এমন একটা আকর্ষণীয়তা আছে যে, বিশ শতকের শেষেও বইটিকে আমরা ভুলতে পারিনি।

'উটোপিয়া'র অধিবাসীরা সুখবাদী। কিন্তু সেখানে ব্যক্তি নিজে কিছু কষ্ট স্বীকার করেও অপরের সুখ বর্ধন করতে আগ্রহী। এর একটি কারণ এই যে, এর ফলে অপরের কাছ থেকেও প্রয়োজনের সময়ে অযাচিতভাবে উপকার পাওয়া যায়, কাজেই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের হিসেবেও শেষ পর্যন্ত সুখের ঘাটতি পড়ে না। উপরন্তু অন্যের দুঃখ লাঘব করতে গিয়ে নিজের মনে এমন একটি প্রসন্নতা লাভ করা যায় যেটা একেবারেই বাড়তি লাভ। এই যে চিত্তের প্রসন্নতা এর স্বীকৃতিমাত্রই কিন্তু সুখবাদী দর্শন গুণগত একটি ভিন্ন স্তরে পৌঁছে যায়। বস্তুত এখানেই সুখবাদের মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম। 'উটোপিয়া'র নায়কও এইখানে একটু নীচু গলায়, সম্পূর্ণ অনুত্তেজিতভাবে, ভগবানকে স্মরণ করেন।

মনুষ্যেতর জীবেরাও পরস্পরকে সাহায্য করে। কিন্তু এই জৈব সহযোগিতার সঙ্গে পরোপকারিতার একটা পার্থক্য আছে। সাধারণ জীব আত্মসচেতন নয়। মানুষ যখন ব্যক্তিস্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও সেই স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়, তখনই তাকে পরোপকারী বলি। এই অতিক্রমণের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে একটি বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে, যোগ ঘটে তার মঙ্গলবোধের সঙ্গে। এই যোগের ভিতর দিয়ে সে সুখের অধিক কিছু একটা লাভ করে, যার নাম চরিতার্থতা, যেটা অধ্যাত্ম আনন্দের সগোত্র।

সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষভাবে কর্মের ভিতর দিয়েই এই যোগ সম্ভব। সনাতন সমাজে কর্ম বলতে বোঝাতো প্রধানত পরিবার ও স্ববর্ণের প্রতি শাস্ত্র নির্ধারিত কৃত্যকর্ম। এটাকেই একদিন আমরা মঙ্গল বলে সহজে মেনে নিয়েছিলাম। এ-যুগের সমস্যা ভিন্ন।

আধুনিককালে, বিশেষত নাগরজীবনে, পরিবার ও কর্মপ্রতিষ্ঠানের ভিতর একটা দূরত্ব স্থাপিত হয়েছে। কুটিরশিল্পের যুগে এমন ছিল না। গৃহ ও কর্মস্থান অভিন্ন ছিল ; ভৃত্য অথবা দাসকেও পরিবারভুক্ত মনে করা হত। ফলে পরিবারের প্রতি আনুগত্য এবং কর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্বের ভিতর সেকালে বিরোধ ছিল না। কৃষি ও কুটিরশিল্পের সীমানা ভেঙ্গে আধুনিক শিল্প যখন বড় আকার ধারণ করল, এদিক থেকে তখনই একটস নৈতিক সমস্যা দেখা দিল। পরিবারের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতির যোগ ও আনুগত্যবোধ স্বাভাবিক। ছেলে সমর্থ হলে কিছু না দিয়ে পরিবারের অন্ন গ্রহণ করতে লজ্জা বোধ করে। পরিবারকে কিছু দিয়ে সে নিজে তৃপ্ত হয়। পরিবারের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এই বোধটা সহজে আসে না। বাইরের প্রতিষ্ঠানকে ঠকাতে ব্যক্তি তেমন সংকোচ বোধ করে না। অথচ শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রমশই বেশি করে এমন সব প্রতিষ্ঠানে কাজের সূত্রে মিলিত হচ্ছি, যেখানে অধিকাংশের সঙ্গে আমাদের কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বৃহত্তর সমাজকে যা দেবার, প্রধানত এই সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়েই আমাদের তা দিতে হবে। এই নতুন পরিস্থিতিতে তাই একটা নতুন কর্মভিত্তিক নীতিবোধের প্রয়োজন দেখা দেয়।

কর্মকে ভিত্তি করে এই যে নীতিবোধ, জাপানে এটা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। সেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও পারিবারিক আনুগত্যের একটা বিকল্প গড়ে উঠেছে, যেন কর্মের সূত্রে কর্মীরা এক পরিবারভুক্ত। এর ভিতর দিয়েই ওরা জাতিকে শক্তিশালী করছে। জাপানে জাতীয়তাবাদ ও কর্মভিত্তিক নীতিবোধের এইখানে যোগ।

পাশ্চাত্য জগতে কর্মভিত্তিক নতুন নীতিবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল, প্রটেস্ট্যান্ট

ধর্ম। শিল্প ও ব্যবসায়ের অভ্যুত্থানের প্রথম যুগে ধর্মেরও সংস্কার ঘটল। সংস্কারকেরা বললেন যে, ব্যক্তির একটা বিশেষ ঐহিক কর্তব্য আছে, যেটা ধর্মীয় কর্তব্যেরই তুল্য। প্রাকৃতিক সম্পদ ভগবান যখন মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন, তখন এতে তাঁর কোনো অভিপ্রায় আছে। মানুষ এই সম্পদ অবহেলা করে ফেলে রাখবে, এটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় হতে পারে না। বরং প্রত্যেকে নিজের সামর্থ্যকে ভগবানের দান বলে বিনীতভাবে গ্রহণ করবে, যে যেখানে নিযুক্ত সে সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে নিপুণভাবে কাজ করবে, আর এই জাগতিক সাধনার ভিতর দিয়ে দেহ ও মনের শক্তি হবে একাগ্র ও অনুশীলিত, এতেই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্যের প্রকাশ। ওঁরা বললেন যে, কর্মই উপাসনা। সংস্কারকেরা শুরু করলেন, ক্রমে এই ভাবটা ছড়িয়ে পড়ল অনেকের মধ্যে।

যুক্তিবাদ তথা সুখবাদী দর্শনের প্রসারিত প্রান্ত ধরে আমরা এই কথাটিতে এসে পৌঁছেছিলাম যে, একটা বৃহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই মানুষের চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা। আধুনিক ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে শিল্পোন্নয়নই এই বৃহৎ উদ্দেশ্য রূপে দেখা দিল। পরোপকার ভালো ; কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত দানের ভিতর দিয়ে সমাজের বেশি মানুষের বেশি উপকার করা যায় না। ফরাসী দেশে স্যাঁ সিমঁ বললেন যে পরোপকারের শ্রেষ্ঠ পথ শিল্পোন্নয়ন। আর সে জন্য চাই বিজ্ঞান ও শ্রম।

শ্রমের সঙ্গে যুক্ত আছে পারিশ্রমিকের প্রশ্নটা। দুটি নীতির এখানে উল্লেখ আবশ্যক। এক হল, শ্রম অনুযায়ী পারিশ্রমিক। শ্রমের গুণগত উৎকর্ষের দিকটাও অবশ্য এখানে ধরতে হবে। শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যদি একটা সদর্থক সম্পর্ক থাকে তবে শ্রমের ইচ্ছা আরো জোরালো হয়। আদর্শবোধ এবং স্বার্থবোধ, দুটোকেই কাজে লাগানো চাই। শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের যোগ থাকলে তবেই ব্যক্তিস্বার্থকে কাজে লাগানো যায়, আর কাজের ইচ্ছা অন্যায়বোধের চাপে দুর্বল হয় না।

প্রয়োজন অনুযায়ী পারিশ্রমিক, এই হল দ্বিতীয় নীতি। এর সঙ্গে পরিবারভিত্তিক আদর্শের একটা যোগ আছে। যার যেমন প্রয়োজন তাকে তেমন দেওয়া আত্মীয়তার সহজ নিয়ম। কেউ হয় তো পঙ্গু অথবা অসুস্থ, শ্রমে অক্ষম অথবা অপটু। তার প্রয়োজন অনুযায়ী তবু সে পাবে, আত্মীয়তা অথবা মানবিক সহানুভূতির রায় এটাই।

বিশ্বজনীন সুখবাদী দর্শনেও সাম্যের দিকে একটা ঝোঁক আছে। যদি বলি যে, বহুতম মানুষের বৃহত্তম সুখই কাম্য, তবে ধনী নির্ধনের অসাম্য সমর্থন করা কঠিন হয়। ধনীর সামান্য সুখের পরিবর্তে যদি দরিদ্রের বেশি দুঃখ লাঘব করা সম্ভব হয়, তবে সুখবাদী বিচারে সেটাই কাম্য। ধনের বন্টনের প্রশ্নে বিশ্বজনীন সুখবাদ এবং প্রয়োজনতত্ত্ব যেন একই মেরুর অভিযাত্রী।

অবশ্য এখানেও কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা আছে। আবার রোগীর চিকিৎসার প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক অথবা বার্ধক্যের প্রশ্নে। রোগীর জীবনকে উপভোগ-করবার ক্ষমতা কম, চিররুগ্নের ক্ষেত্রে তো এই অবস্থাটাই স্থায়ী। বার্ধক্যেও ভোগশক্তি দুর্বল।

তবে কি বৃদ্ধ এবং চিররুগ্নদের যথাসম্ভব বাদ দিয়ে সুস্থসমর্থদের ভোগের আয়োজন বাড়ানোটাই সুখবাদী যুক্তি কথা ? যারা মানসিকভাবে রুগ্ন তাদের ব্যাপারেও কি একই ব্যবস্থা কাম্য ? অথচ অর্থের প্রয়োজন তো এদেরও আছে। প্রয়োজনবাদের সঙ্গে, মনে হতে পারে, সুখবাদের এখানেই বড় পার্থক্য। বিষয়টা কিন্তু অত সহজ নয়। প্রয়োজনের বিচার হবে কার দৃষ্টিতে ? যে মানুষ রোগে শোকে আচ্ছন্ন, তার ভিতর জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনেক সময় ক্ষীণ হয়ে আসে, কাজেই তার প্রয়োজনটা দুর্বল। প্রয়োজনটা

শোকার্তের দৃষ্টিতে হয়তো ততটা নয়, যতটা প্রিয়জনের দৃষ্টিতে। রোগীর চিকিৎসা না হওয়া অবধি—এমন কি আরোগ্যের সম্ভাবনা যেখানে নেই সেখানেও শুশ্রূষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা না হলে—প্রিয়জন সুখ পায় না, শান্তি পায় না। প্রয়োজনটাকে যখন আমরা এইভাবে দেখি তখন দুই তত্ত্বের মধ্যে আবারও একটা সাযুজ্য স্থাপিত হয়। সুখেরও স্তরভেদ আছে ; প্রয়োজনেরও তাই। স্তরভেদে অর্থভেদ হয়।

সুখবাদ যদিও চার্বাক থেকে সাম্প্রতিক কাল অবধি ইতিহাসে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তবু আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতায় এর একটা বিশেষ স্থান ছিল। বেন্থামের যুগে ঝোঁক পড়েছিল, শিল্পের প্রসার এবং ধনোৎপাদন বৃদ্ধির ওপর। অসাম্য সেদিন প্রয়োজন মনে হয়েছিল, অনেকখানি অসাম্য মেনে নেওয়া হয়েছিল, ধনোৎপাদনের জন্য। ধনীরা সঞ্চয় করবে, সঞ্চিত ধন শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হবে, জাতির সম্পদ এতে বাড়বে। এই রকম একটা যুক্তির ছিল প্রাধান্য। এরই জোরে সুখবাদী দর্শনও সেদিন অনেকখানি অসাম্য সমর্থন করেছিল। ক্রমে আর্থিক সাম্যের প্রশ্নটা বড় হয়ে উঠল। অর্থের বণ্টনের কথাটা প্রাধান্য পেল। সেকালের জমিদার বিলাসী ; শিল্পবিপ্লবের প্রথম যুগে পুঁজিপতিরা সঞ্চয়ী ; এ যুগের ধনীরা আবারও বিলাসী। এ যুগে দারিদ্র্য ও বিলাসিতার অসামঞ্জস্য পীড়াদায়ক।

সমবণ্টনেও অবশ্য সমস্যার শেষ সমাধান নেই। সমস্যার নানা স্তর। কাজের ভিতর মুক্তির আস্বাদ চাই। আধুনিক শিল্প শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। এখানেই তার জোর ; এটাই তার দুর্বলতা। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের আদিপুরুষেরা এটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করেছিলেন। যে শিল্পী প্রতিমা গড়েন তিনি কাজের ভিতর দিয়ে নিজের কল্পনাকে রূপদান করেন, নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু যদি বলা হয় যে, কাজটাকে দশ টুকরো করে দশ জনের ভিতর ভাগ করে দেওয়া যাক, তারপর টুকরোর সঙ্গে টুকরো জুড়ে সম্পূর্ণ জিনিসটা পাওয়া যাবে, তবে কাজটা তাতে তাড়াতাড়ি হতেও পারে, কিন্তু কাজের ভিতর থেকে সৃষ্টির আনন্দ পালাই পালাই করে। কাজটা তখন হয়ে ওঠে কর্মীর পক্ষে বন্ধনদশা। আধুনিক শিল্পের যুগে, কর্মবিভাগই কর্মবন্ধন। এই বন্ধন থেকে মানুষ মুক্তি চায়, যদিও মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। শিল্পোন্নত সমাজ আজ জীবনের একটা নতুন দিগন্ত খুঁজছে।

অর্থাৎ, প্রতিটি স্তরের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে, আবার নিজস্ব সার্থকতাও আছে। কর্মবিভাগ যুক্তিরই দান। এতে শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি বেড়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে কাজের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস। এই স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করতে যাদের অনীহা তারা যখন পরবর্তী স্তরের মুক্তি দাবী করে, তখন বিভ্রাট ঘটে। মুক্তিরও একটা বাস্তব পূর্বশর্ত আছে। সেটা বিচারের আলোতে চিনে নিতে পারলে এগোবার পথ সহজ হয়। আজকের বিচার কাল পথের বাধা হয়ে ওঠে। তবু আজকের যুদ্ধটাও জেতা চাই। নয় তো আমরা একই সঙ্গে হই, বর্তমানে নষ্ট এবং ভবিষ্যৎ থেকে ভ্রষ্ট।

পথের শেষ নেই। কর্মই বন্ধন, আবার কর্মই মুক্তি। আচার বিচারের মধ্য দিয়ে সে আমাদের উত্তীর্ণ করে দেয় আনন্দে। একবার নয়, বার বার। দীর্ঘপথের আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই এই আশ্চর্য উত্তরণ সম্ভব।

দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ মঙ্গলবোধ

১

দ্বন্দ্ব এক জিনিস, বিদ্বেষ অন্য।

দ্বন্দ্ব শব্দটির দু'টি বিপরীত অর্থ আছে।

দ্বন্দ্ব মানে সংঘাত ; যেমন, স্বার্থের দ্বন্দ্ব। আবার দ্বন্দ্ব মানে মিলন বা সমবায় ; যেমন, দ্বন্দ্বসমাস।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে ভাবা যাক। যে-বস্তু নিয়ে দ্বন্দ্ব একপক্ষ তার বেশি পেলে অন্যপক্ষের ভাগে কম পড়বে। দু'পক্ষই সেটা চায়। অতএব দ্বন্দ্ব। যে-সব বস্তুর বেলায় এই নিয়মটা খাটে না, সেই সব বস্তু দ্বন্দ্বের বিষয় হয় না। আসন নিয়ে কলহ হয়, যেহেতু আসনের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ; কিন্তু খোলা হাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণ নেই। অপরিমেয় বস্তু সংঘাতের বিষয় হয় না। যে-সব বস্তুর পরিমাণ সীমাবদ্ধ, সেই সব নিয়েই কলহ।

পরিমেয় বস্তুর ভিতরও একটা অবস্থাভেদ লক্ষণীয়। এমন জিনিস আছে যার পরিমাণ, অবস্থাবিশেষে, বাড়ানো সম্ভব নয়। আবার এমন বস্তুও সদা সর্বদাই চোখে পড়ে যার পরিমাণ সীমাবদ্ধ বটে, তবু পক্ষ বিপক্ষের সহযোগিতার ফলে সেটা বাড়ানো সম্ভব। মরুভূমিতে যদি শুধু একভাণ্ড জলই দু'জনকে ভাগ করে নিতে হয়, তবে একজন বেশি পেলে অন্যে কম পাবেই। কিন্তু শিকার কিংবা ফলসংগ্রহ করতে গিয়ে দু'জনের সহযোগিতায় সংগ্রহের মোট পরিমাণ বাড়তে পারে।

অবস্থাভেদটা শুধু বস্তুভেদের ওপর নির্ভর করে না, অনেকক্ষেত্রেই নির্ভর করে দৃষ্টি অথবা সময়ের প্রসারের ওপর। এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্দিষ্ট। কিন্তু আরও একটু বেশি সময় যদি চিন্তার পরিধির ভিতর আনা যায়, তবে অধিকাংশ বস্তুর পরিমাণ আর কঠিনভাবে নির্দিষ্ট থাকে না। আবারও সহযোগিতার ভিতর দিয়ে পরিমাণ বাড়াবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অর্থাৎ যে-সব জিনিস নিয়ে দ্বন্দ্ব তাদের পরিমাণ তাৎক্ষণিক কিংবা সাময়িক দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট, কিন্তু দূরদৃষ্টিতে সম্ভাব্যতার সীমা আরও বিস্তৃত।

বাঞ্ছিত বস্তুর পরিমাণ যেখানে অনড়ভাবে নির্দিষ্ট এবং প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক, সেখানে সংঘাতের বিকল্প সহজে চোখে পড়ে না। তবে সেখানেও একটা কথা আছে। যে-বস্তুর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়, তারও রক্ষা প্রয়োজন। কলহের ফলে সবই নষ্ট হতে পারে। একে বলা যেতে পারে, সর্বনাশ। এই সর্বনাশের সম্ভাবনাটা যদি বিবেচনার ভিতর থাকে তবে দ্বন্দ্ব আবারও অবস্থাবিশেষে সংঘাতের সীমা ছাড়িয়ে রূপ নিতে পারে সমবায়ে।

অতএব স্বার্থবুদ্ধি অবস্থা ও দৃষ্টিভেদে কখনও আমাদের এক পথে চালিত করে, কখনও অন্য পথে। স্বার্থের দিগন্ত যদিও সীমাবদ্ধ, তবু স্বার্থবুদ্ধি কিছুটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। নয়তো ওটা বুদ্ধিই নয়। স্বার্থকামনা আর স্বার্থবুদ্ধি এক বস্তু নয়। স্বার্থের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ হলে তবেই সেটা স্বার্থবুদ্ধি হয়ে ওঠে। স্বার্থবুদ্ধি কিছুটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলেই একান্তভাবে সংঘাতমুখী নয়, বরং সংঘাত ও সহযোগের চিন্তা তাতে একই সঙ্গে বর্তমান।

অপর পক্ষে বিদ্বেষ নঙর্থক ; তাতে সহযোগের চিন্তা নেই। বিদ্বেষে কোনো আলোকিত স্বার্থবুদ্ধি নেই। দ্বন্দ্বে একটা সমন্বয়ের আভাস আছে, বিদ্বেষে কোনো সমন্বয়ী বুদ্ধি নেই। অবশ্য বিদ্বেষের পিছনেও একটা প্রবলভাবে অস্বীকৃত গোপন অনুরাগ

থাকে। কিন্তু অন্ধ কর্তৃত্বের শক্তি নিয়ে অস্বীকারের জোরটাই সেখানে প্রধান।

২

দ্বন্দ্বের নানা রূপ। এক, উপজাতীয় অথবা বিরোধী আত্মীয়গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। ধর্মযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ এই সব কিছুতে উপজাতীয় দ্বন্দ্বের ছায়া পড়েছে। দুই, ব্যবসায়িক অথবা আর্থিক দ্বন্দ্ব। এর আধুনিক উদাহরণ, ব্যবসায়িক সংস্থার ভিতর বাজার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুই প্রকার দ্বন্দ্বের মিশ্রণ ঘটে ; যেমন, জমি নিয়ে প্রাচীন কলহে। তুলনায় ক্রেতা ও বিক্রেতার কলহ ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টান্ত। অর্থই অনর্থের একমাত্র কারণ নয়। আরও আছে পদাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব, ক্ষমতা নিয়ে লড়াই। দ্বন্দ্ব চলে কখনও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, কখনও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে।

ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব গোষ্ঠীবদ্ধ হলেও সেখানে স্বার্থটা প্রাথমিক ; আর উপজাতীয় দ্বন্দ্বে, আত্মীয়তার বন্ধনটা প্রাথমিক। কখনও আবার গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ স্বার্থের সংঘাতও, উত্তেজক অথবা বিদ্বেষযুক্ত মতাদর্শের প্রভাবে, ধর্মযুদ্ধের সাদৃশ্য লাভ করে। দ্বন্দ্বের এই আরও একটি বিশেষ রূপ। এই বৈচিত্র্যই সত্য ; দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বিভিন্ন রূপের পিছনে কোনো অদ্বিতীয় মৌল পদার্থের সন্ধান করা বৃথা।

যুক্তিধর্মিতায় অভ্যস্ত এ যুগে অনেকে ভেবে থাকেন যে, মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব মূলত স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে চালিত। মানুষের চেতনার একটি বিশেষ স্তরকে এঁরা সম্পূর্ণ চেতনার প্রতিনিধি বলে ধরে নেন। তারপরও যদি মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থেকে যায়, সেটাকে নানাভাবে দূরে ঠেলে দেবার যুক্তি উদ্ভাবন করা কঠিন হয় না। যথা, চিন্তায় খানিকটা সরলীকরণ অপরিহার্য ; যেটা মৌল অথবা প্রধান সেটাকে গৌণ থেকে পৃথক করতেই হবে ; স্বার্থবুদ্ধিই হল মৌল অথবা প্রধান। এইরকম একটা যুক্তি তখন সমর্থনযোগ্য মনে হয়।

কিন্তু মানুষ বস্তুত একমাত্র স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে চালিত হয় না। চৈতন্যের আরও একটা অধঃস্তর আছে, আরও একটা উর্ধ্বস্তর আছে। নাগর ও সংস্কৃত চেতনার প্রভাবে আমরা বিদ্বেষকে যথাসম্ভব যুক্তি ও স্বার্থবুদ্ধির পোশাক পরিয়ে শুধু অপরের সমক্ষেই নয়, নিজের কাছেও উপস্থিত করি বটে। তবু, বিদ্বেষ ও স্বার্থবুদ্ধি এক বস্তু নয়। আবার মঙ্গলবোধ স্বার্থবুদ্ধির অধিক কিছু। অবশ্য মিশ্রণ সর্বত্র। মূর্তি নির্মাণে যেমন নতুন উপাদান মিলিত হয়, মূর্ত জীবনে তেমনি চেতনার বিভিন্ন উপাদান মিলে মিশে এক হয়ে যায়। তবু সব উপাদান সর্বত্র একভাবে মেশে না ; মিশ্রণের তারতম্যে মিশ্র বস্তুর গুণভেদ ঘটে।

এই মিশ্রণের উদাহরণ দেওয়া সহজ। তার আগে বিদ্বেষের কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করা যাক। বিদ্বেষদৃষ্টিতে একের অস্তিত্বই অন্যের অস্তিত্বের ওপর একটি আক্রমণস্বরূপ মনে হয়। বিদ্বেষ্টা ও বিদ্বিষ্টের সংঘাতের ফলে সাংসারিক অর্থে হয়তো উভয়ের সমূহ ক্ষতি। দুয়ের সহযোগিতায় দুয়েরই স্বার্থরক্ষার পথ তুলনায় প্রশস্ততর। কিন্তু একের অস্তিত্বই যখন মূলত অন্যের কাছে অসহ্য, সহযোগিতার চিন্তার দ্বার তখন স্বভাবত রুদ্ধ। বিদ্বেষ স্বার্থবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। স্বার্থবুদ্ধি সর্বনাশ চায় না, সর্বপ্রকারে অন্যের ধ্বংসও কামনা করে না। স্বার্থবুদ্ধি অপর ব্যক্তিকে উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। স্বার্থদৃষ্টিতে অপরের একটি উপকরণমূল্য আছে। তার বেশি নেই। মঙ্গলবাধে তারও বেশি আছে। বিদ্বেষের আন্তরিক কামনা অপরের অস্তিত্ব নাশ করা

অথবা তাকে নিজের অস্তিত্বের অংশ করে নেওয়া। একই কারণে বিদ্বেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশের পথে অন্তরায়। যে-সব গোষ্ঠীর ভিতর বিদ্বেষভাবের প্রাধান্য, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি সেখানে দুর্বল। গোষ্ঠীর সঙ্গে একটা অন্ধ একাত্মতা সেখানে প্রবল।

সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীতে সংহত সামাজিক বিদ্বেষের উদাহরণ হিসেবে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ ও ধর্মবিদ্বেষের নাম সহজেই মনে আসে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশবিভাগের পিছনে এই রকম একটা বিদ্বেষভাব ছিল। হিন্দ-মুসলমান বিরোধকে অবশ্য হিন্দু ও মুসলমানের আর্থিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। যেখানেই দুই সম্প্রদায় আছে, সেখানেই তাদের ভিতর স্বার্থের সংঘাত দেখানো যায়। আবার সহযোগিতার ভিতর দিয়ে উভয়ের উন্নতির পথও খুঁজে নেওয়া সম্ভব। বিদ্বেষের দৃষ্টিতে প্রথমটি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে, দ্বিতীয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। দেশবিভাগের আন্দোলনে স্বার্থ অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। নয় তো অল্প কিছু লোকের স্বার্থের পিছনে এতো মানুষের ব্যক্তিবুদ্ধিবিধ্বংসী এমন অন্ধ সংহতি সেদিন সম্ভব হত না। দেশবিভাগের বিভীষিকাময় দিনগুলির রক্তপাত এবং উন্মত্ততারও অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয় না। সম্প্রদায় হিসেবে একের অস্তিত্বই সেদিন অন্যের চোখে যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষেও এই রকম একটা বিদ্বেষের শক্তি অনুভব করা যায়। নয়তো সহযোগিতার পথ খুঁজে বের করা কঠিন হত না। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা এদেশে যে ঘৃণ্যরূপে দেখা দিয়েছে, তার পিছনে আমরা যতই স্বার্থের দ্বন্দ্ব খুঁজি না কেন, সামান্যমাত্র দূরদৃষ্টিতে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, ওটা কারোও পক্ষেই আজ স্বার্থসিদ্ধির পথ নয়, বরং দেশময় সর্বনাশের পথ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গকে একসঙ্গে বাস করতেই হবে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ এই সহাবস্থানের ওপর একটা কালো ছায়ার মতো নেমে এসেছে। এটা শুধু ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানের ব্যাপার নয়। ধনী ও নির্ধন শ্বেতাঙ্গের ভিতর এই তিক্ত ব্যবধান নেই; নির্ধন কৃষ্ণাঙ্গ ও দরিদ্র শ্বেতাঙ্গের ভিতরও ভ্রাতৃত্ব অনুপস্থিত। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের পাশের দেশ মেক্সিকোতে বর্ণবিদ্বেষের সেই করাল মূর্তি নেই। নেই পেলের লাতিন আমেরিকায়, যেখানে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছে কালো মুক্তো বা কালোমণি।

ধনিকের সঙ্গে শ্রমিকের যে সম্পর্ক, তার মূলে আছে স্বার্থ। আর বর্ণবিদ্বেষের মূলে আছে বিদ্বেষ। এ দুটোকে প্রায় মিলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু এরা অভিন্ন নয়। আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশ স্পেন। শোষণের হিংস্রতায় সে অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে পিছিয়ে ছিল না। অথচ সেখানে বর্ণবিদ্বেষ তুলনায় কম। এর একটা দীর্ঘ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আছে। তাতে প্রবেশ না করেও মূল কথাটা মেনে নেওয়া যায়। শোষণ ব্যাপারটাতে স্বার্থের গণনা প্রধান। সমবর্ণের মানুষের ভিতরও শোষণ সম্ভব, যার উদাহরণ পাওয়া যাবে এদেশেই। বর্ণবিদ্বেষটা আছে রক্তে এবং সংস্কারে। অবস্থার চাপে এ দুটো অল্প বেশি মিশে যায়। তখন মানুষে মানুষে সম্পর্কের সমস্যা হয়ে ওঠে আরও তিক্ত এবং জটিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর সংগ্রামটা ছিল বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। সেই বিদ্বেষের রক্তচক্ষুতে তিনি সেদিন দেখেছিলেন মানবতার সর্বনাশ।

চার্চিল ভারত ছাড়তে চান নি। সাম্রাজ্য অটুট রাখতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনিই তো বলেছিলেন, সাম্রাজ্যের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করবার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীর

পদে বসিনি। অথচ যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শ্রমিক সরকারের কাছ থেকে এলো ভারতের স্বাধীনতা। তবে কি জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি শ্রমিক দলের নেতাদের কম ছিল ? হয়তো তা নয়, অন্তত সেটা প্রধান কথা নয়। হয়তো জাতীয় স্বার্থটা শ্রমিক দলের নেতারাই আরও পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন। চার্চিলের ভাষায় ছিল সেই আভিজাত্যের ঔদ্ধত্য যেটা স্বার্থবুদ্ধিকেও অন্তত আংশিকভাবে আচ্ছন্ন করে, যার সঙ্গে মিল আছে বর্ণবিদ্বেষের। উগ্র দক্ষিণপন্থী নেতারা ঝুঁকেছিলেন এমন একটা সংঘাতের দিকে যেখানে স্বার্থবুদ্ধির চেয়েও বিদ্বেষটা বড়। শ্রমিক নেতারা সেই বিপত্তি থেকে দেশকে পরিত্রাণ করলেন। হিটলারের নেতৃত্বে কিন্তু জার্মানিতে বিদ্বেষের শক্তিটাই বড় হয়ে উঠেছিল।

এই রকমই ঘটে থাকে। বিদ্বেষ আসে স্বার্থবুদ্ধির মুখোশ পরে, তারপর সর্বনাশ ঘটায়। আমাদের ইতিহাসে কুরুক্ষেত্র সেই বিপর্যয়ের প্রতীক। কৌরব পক্ষের নেতা যদিও বলেছিলেন, যুদ্ধ বিনা সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়তে তিনি সম্মত নন, তবু ঐ ঘোষণায় জমিজমা সংক্রান্ত স্বার্থবুদ্ধির প্রাধান্য খুঁজতে যাওয়া ভুল। বংশগত কলহে চিরকালই বিদ্বেষের প্রাধান্য, আর বণিকবুদ্ধিতে প্রাধান্য স্বার্থের। আধুনিক যুগে যদিও ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রবল তবু এ যুগেও সেই বুদ্ধি শুধু অংশত জয়ী। প্রথম মহাযুদ্ধের পিছনে কোনো সুচিন্তিত স্বার্থবুদ্ধি ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পিছনেও নয়। সমগ্র মেদিনী জয়ের হুংকারকে স্বার্থবুদ্ধি মনে করা ভুল। আর্থিক অথবা কোনো প্রকার স্বার্থের দ্বন্দ্ব দিয়েই ইতিহাসের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। গৃহকলহ, জাতিবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

৩

স্বার্থের দ্বন্দ্বের সঙ্গে গৃহকলহের সুর মিশে এযুগের রাজনীতি একটা বিশেষ রূপ পেয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনার গোড়াতেই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া প্রয়োজন।

কোনো এক যুগে, অন্তত পশ্চিমী দেশগুলিতে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি প্রধান অবলম্বন ছিল বাণিজ্য। আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেহারা পালটে যাচ্ছে। নতুন মধ্যবিত্তের অন্যতম প্রধান অবলম্বন, আমলাতন্ত্র তথা শাসনযন্ত্র। এই ঝোঁকটা আজ বিশ্বব্যাপী। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোনো সরল বর্ণনা আর বাস্তবানুগ নয়। এই শ্রেণীতে একদিকে যেমন আছেন ছোট দোকানদার থেকে শিল্পপতি পর্যন্ত, যাঁদের অবলম্বন ব্যবসায়, অন্যদিকে তেমনি আছেন শাসনযন্ত্রে নিযুক্ত ছোট করণিক থেকে বড় আমলাগণ, যাঁরা সবাই বাঁধা চাকুরীজীবী। তাছাড়া আছেন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশাসন কাজে অধিষ্ঠিত কর্মী, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা অধ্যাপক এবং এই রকম অন্যান্য চাকুরীজীবী। আরও আছেন আইনজীবী ও চিকিৎসাজীবীর মতো বিশেষ সম্প্রদায়, যাঁরা প্রচলিত অর্থে ব্যবসায়ী নন, আবার পুরোপুরি চাকুরীজীবীও নন। আমলারা এদেশে সবযুগেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক প্রধান অঙ্গ ছিলেন। আজ রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর কি-ধনতান্ত্রিক কি-সাম্যবাদী সবদেশেই আমলা সম্প্রদায় নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবচেয়ে পরিচিত অংশ।

বাণিজ্যে দ্বন্দ্ব অর্থ নিয়ে; রাজনীতিতে ক্ষমতা নিয়ে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব যে-ক্ষমতার ভিত্তি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও কয়েকটি বড় বড় যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে

এই শতকে রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ আরও শক্তিশালী, আরও ব্যাপক ও সংগঠিত হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রবিরোধী হিংসাত্মক আন্দোলনের ফলেও মোটের ওপর রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই আরও গুরুত্ব লাভ করেছে। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে দু'পক্ষেরই নেতারা আসেন প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর থেকে। অর্থাৎ, আজকের রাজনীতি প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভিতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

এই দ্বন্দ্বে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি আছে, আবার তারও অতিরিক্ত কিছু আছে। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির দিক থেকে এর মিল ব্যবসায়ী বুদ্ধির সঙ্গে। ব্যবসায়ী বুদ্ধির বিবর্তন আছে, রূপভেদ আছে। আজকের রাজনীতিতে তার নতুন রূপ। রাজনীতির বুদ্ধির এই ব্যবসায়িক দিকটা নমনীয়, চতুর ও স্বার্থসন্ধানী। এর দীর্ঘ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। উদাহরণ হাতের কাছে। রাজনীতিতে ঘনঘন দল পরিবর্তন এদেশে আজ সাধারণ ঘটনা। যিনি কাল ছিলেন নব কংগ্রেসে, তিনি আজ জনতা দলে। আগামী কাল সম্ভবত আবারও কংগ্রেসে। যিনি একদা ছিলেন কম্যুনিস্ট দলে, অতঃপর নব কংগ্রেসে, তিনি অদ্য জনতা অথবা মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দলে, হয়তো একাধিক দলে। দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নির্বুদ্ধিতা ; মতবাদ বাহ্য এবং প্রয়োজনে জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যাজ্য ; যেমন ব্যবসায়ে তেমনি রাজনীতিতে, স্বার্থের গণনাই মৌল পদার্থ।

কিন্তু রাজনীতির আরও একটা দিক আছে, যেটা মানুষকে ব্যক্তিস্বার্থের বাইরে, ঊর্ধ্বে অথবা অধঃস্তরে টেনে নিয়ে যায়। যাকে আমরা বলি ভাবাদর্শ অথবা আইডিঅলজি, সেই বিশ্বপ্রতিভাস এবং আদর্শ কল্পনারও রাজনীতির ওপর একটা প্রভাব আছে। এই প্রভাবের দুই ভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করব।

জাতীয়তাবাদের মন্ত্রদাতারা দেশের একটা আদর্শরূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাতে একই সঙ্গে ছিল প্রাকৃতপ্রেম এবং কর্তব্যের আহ্বান। জাতীয়তাবাদ আমাদের স্বাভাবিক মমতার পরিধিকে ক্ষুদ্র পারিবারিক প্রাঙ্গণ থেকে তুলে স্বদেশ ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্থাপন করতে চেয়েছে। সেই বৃহত্তর মমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের মাতৃমূর্তি। শৈশবের মুগ্ধ স্মৃতি ও যৌবনের প্রাণচঞ্চল কর্মোন্মুখ আদর্শচিন্তার উপাদানে সেই মূর্তি নির্মিত। এই স্বদেশ প্রেম একদা রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। ঐ পর্যায়ের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গানের জন্য তাঁর কাছে আমরা ঋণী। কিন্তু রাজনীতির আবর্তে ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জাতীয়তাবাদের যে রূপান্তর তিনি লক্ষ করেন জাপানে, তাতে তিনি শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত গানই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। তবু মনে রাখা ভালো যে, কোনো পার্থিব নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ঐ গানটি রচিত হয়নি, বরং 'জনগণমঙ্গলদায়ক' কোনো 'চিরসারথি'ই ঐ গানে বন্দিত।

রাজনীতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংযোগে দু'টি বিপরীত প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। একদিকে এতে রাজনীতিতে একটা আদর্শনিষ্ঠার সঞ্চার হয়। অন্যদিকে আবার ক্ষমতার উন্মাদনায় এবং যূথবদ্ধ স্বার্থের আকর্ষণে জাতীয়তাবাদ নিম্নস্তরে নেমে আসে। দেশপ্রেমের নামে তখন জন্মলাভ করে এক নতুন অসহিষ্ণুতা, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশে যেটাকে রবীন্দ্রনাথ পরিপন্থী বলে জানতেন। এদেশে জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে যে-পরিমাণে জাতিপাঁতির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত একটি বৃহত্তর কর্মভিত্তিক নীতিবোধ সৃষ্টি করা যাবে সেই পরিমাণেই তার সার্থকতা। সংঘবদ্ধ স্বার্থের দ্বন্দ্বে যে-জাতীয়তাবাদ আবদ্ধ নয়, বরং নিজেকে যে বার বার অতিক্রম করে যায় জনগণমঙ্গলদায়ক চিন্তায় ও কর্মে,

তাকে নিয়েই দেশের মুক্তি।

এ যুগের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ভাবাদর্শ সাম্যবাদ। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সমিতির যে আন্দোলন, স্বার্থের দ্বন্দ্বই তাতে স্বাভাবিকভাবে প্রধান। মজুরী বৃদ্ধি, কর্মীদের অবস্থার উন্নতি, এই সব ঐ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু সাম্যবাদী আদর্শকল্পনা শ্রমিক আন্দোলনকে ঐ সীমাবদ্ধ স্বার্থের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে একটা মহত্তর প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছে। এক শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা সাম্যবাদী চিন্তায় স্থান পেয়েছে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সেই সমাজের পথিকৃৎ ও বিপ্লবী অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ধনিক শ্রেণীর বিনাশের পথেই নতুন সমাজের জন্ম এবং মনুষ্যজাতির মুক্তি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সঙ্গে সাম্যবাদের সংযোগে আবারও শুভাশুভ দুটি বিপরীত ফল দেখা গেছে। নতুন মতাদর্শের প্রভাবে বহু মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে একটি বৃহত্তর আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতো সাম্যবাদী সংগ্রামেও শহীদের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অনিবার্য ফল হিসেবে একটা প্রবল বিদ্বেষের শক্তিও এই আন্দোলনে জমা হয়েছে। জাতীয়তাবাদীর থাকে স্বাজাত্যাভিমান, সাম্যবাদীর আছে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। শ্রেণী-শ্রেষ্ঠত্বের এই প্রত্যয় কার্যত দলীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যয় হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রেণী বিদ্বেষের ঐতিহাসিক অনিবার্যতা পরিণত হয়েছে দলীয় বিদ্বেষে। এইভাবে গড়ে উঠেছে অসহিষ্ণুতার এক নতুন তাত্ত্বিক ভিত্তি।

তত্ত্বের চোখে সাম্যবাদী স্বদেশপ্রেম আর আন্তর্জাতিকতার মধ্যে বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সেই তত্ত্বকথা মান্য হয়নি। সোভিয়েত দেশ আজ চীনের চোখে হিংসার আগুন দেখছে, চীন দেখছে সোভিয়েতের চোখে। এই হিংসার উৎস কোথায়? চীন ও সোবিয়েত দেশের ভিতর কোনো কোনো ব্যাপারে বাস্তব স্বার্থের সংঘাত আছে ঠিকই। কিন্তু বহু ব্যাপারে সাম্যবাদী সহযোগিতার সুযোগও কম নেই। তবু সংঘাতটা হয়ে উঠেছে বড়, সহযোগিতার সুযোগ উপেক্ষিত। বিদ্বেষ আবারও যুক্তির মুখোশ পরে এসেছে। উভয় পক্ষেই তর্কের সুরটা কর্কশ, অসহিষ্ণু। স্বার্থবুদ্ধিই হয়তো এই কলহের রাশ টেনে আছে, দু'পক্ষকেই সর্বনাশ থেকে সংযত করছে। এই রকমই ঘটেছে সোবিয়েত ও মার্কিন দেশের দ্বন্দ্বে। তবু স্থায়ী শান্তির জন্য স্বার্থের চেয়ে বড় কিছু প্রয়োজন।

রাজনীতির একটা ক্ষেত্র আছে, থাকবে, যেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। কিন্তু যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা আমাদের আরও একটা কথা ধীরে ধীরে জানিয়ে দিয়ে যায়। বৃহত্তর মঙ্গলবোধের একটা সীমার ভিতর দ্বন্দ্বকে আবদ্ধ রাখতে না পারলে, শেষ অবধি মানবতার সর্বনাশ।

অতএব দ্বন্দ্বের তিনটি স্তর। প্রথম স্তরে আধিপত্য বিদ্বেষের। দ্বিতীয় স্তরে, যুক্তি ও স্বার্থের। কিন্তু যুক্তির অবলম্বন যদি হয় শুধুই স্বার্থ, ব্যক্তিগত অথবা দলীয়, তবে সেই যুক্তিও সুর হারিয়ে বারে বারে নেমে আসে বিদ্বেষে। অবশেষে মঙ্গলবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে রক্ষা পেতে পারে। ইতিহাসে এই রকমই ঘটেছে বারে বারে। শুভবুদ্ধির ভিত্তিতে ছোট বান্ধব সমিতি রূপে যার জন্ম, ক্রমে তারও বাইরের চেহারা এবং ভিতরের চরিত্র দু'য়েরই পরিবর্তন ঘটেছে। আকার ও ক্ষমতাবৃদ্ধিরও সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের দিক থেকে রূপ নিয়েছে এক আধাআমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তার চরিত্রে এসেছে সেই সঙ্ঘবদ্ধ লোভ, দম্ভ এবং নীতিজ্ঞানশূন্যতা, বিদ্বেষে আক্রান্ত আত্মীয়বুদ্ধির বিকার, সুস্থ মানবিকতার যেটা ভিত্তি হতে পারে না। সেই বিকৃতিকে ঠেকাতে প্রয়োজন হয়, যুক্তি এবং

মঙ্গলবোধের সম্মিলিত শক্তি।

এইখানেই দ্বন্দ্বের তৃতীয় স্তর। এই শেষ স্তরে দ্বন্দ্ব কেবল বাইরের ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তির অন্তরেও। বাইরের আন্দোলনে একে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন গান্ধী, অহিংসার ভাষায়। কেউ বলেন, তিনি মাত্রা রক্ষা করেননি, তাঁর যুক্তিতে ছিল সংস্কারের খাদ। তবু তিনি পথিকৃৎ। যুক্তিকে বিদ্বেষের কবল থেকে রক্ষা করবার সংগ্রামে তিনি পথপ্রদর্শক।

সমাজ সংগঠনের পথের সন্ধানে

সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, এ সব কথা আজ আমরা সবাই মানি। যেহেতু এই পরিবর্তনের ভালোমন্দ যা কিছু ফল মানুষকেই ভোগ করতে হবে, অতএব এ ব্যাপারটায় আমাদের একটা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কীভাবে, কোন পথে পরিবর্তন ঘটলে তার পরিণাম শুভ হয়, কেনই বা বিপত্তি আসে, এই সব প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে মাঝে মাঝে ছায়া ফেলে যায়। এই রকম বড় প্রশ্নের কোনো শেষ উত্তর হয়তো আশা করাই ভুল। কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষ চিন্তা করবে এতেই তো তার মনুষ্যত্বের পরিচয়। আমরা অবশ্য এই বড় প্রশ্নের সীমাবদ্ধ দুয়েকটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনা করব।

সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে কথা বলবার আগে সমাজ সংগঠনের কাঠামো অথবা বিন্যাস নিয়ে খানিকটা চিন্তা করে নেওয়া দরকার। বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে যেসব গোষ্ঠী ও সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের দুটি মৌলরূপের কথা প্রথমেই বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। একটিকে বলব আত্মীয়গোষ্ঠী, অন্যটিকে ব্যবসায়িক সংগঠন। আত্মীয়গোষ্ঠীতে আমরা অল্পবেশি নিজেকে অন্যের ভিতর এবং অন্যকে নিজের ভিতর স্থাপন করে দেখি ; অন্যের সুখে সুখ, অন্যের দুঃখে দুঃখ অনুভব করি ; অন্যের গর্বে নিজে গর্বিত, অন্যের অসম্মানে নিজে অসম্মানিত বোধ করি। ব্যবসায়িক সংগঠনে প্রত্যেকের পৃথক স্বার্থ, লাভক্ষতির পৃথক হিসেব। সেখানে সাময়িক স্বার্থে, সীমাবদ্ধ প্রয়োজনে, বিভিন্ন মানুষ-পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, আবার সেই কারণেই কখনও সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

বলা বাহুল্য, এই দুটি মৌলরূপের পাশে পাশে কিছু মিশ্ররূপও দেখা যায়। যেমন ব্যবসায়িক বা বৃত্তিমূলক কারণে কিছু মানুষ একত্র হয়, তারপর বৈবাহিক ও অন্যান্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে আত্মীয়গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

আদিম আত্মীয়গোষ্ঠীতে রক্তের সম্পর্কটা প্রধান। কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর গোষ্ঠী স্থাপিত হয় ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে। একটা সম্প্রসারিত আত্মীয়ভাব সেখানে স্পষ্ট, রক্তের সম্পর্কটা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। তবু সুখে দুঃখে, উল্লাসে বিষাদে, উৎসবে অনুষ্ঠানে সেখানে ব্যবসায়িক স্বার্থের অধিক একটা আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করা যায়। সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজের সেই ঐক্যবদ্ধ রূপকে এই কারণেই আত্মীয়ধর্মী বলা চলে।

সামাজিক ইতিহাস ও বিবর্তনের সম্বন্ধে খুব মোটা তুলিতে আঁকা দুটি ছবি এখানে পাশাপাশি রাখা যেতে পারে। প্রথমটিতে মূল কথা এই যে, মানুষের ছোট ছোট বৃত্ত অথবা গোষ্ঠীকে নানাভাবে বৃহত্তর বৃত্তে যুক্ত করে উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলেছে। কয়েকটি পরিবার মিলে একটি উপজাতি, বিভিন্ন উপজাতি একত্র হয়ে জাতি, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব মিলনের বন্ধুর পথ ধরে এক মহাজাতির অভিমুখে যাত্রা। এই বৃহত্তর মানবসংহতি গঠনের ধারায় ভাষা ও ধর্ম তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নির্বাহ করে চলেছে, সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ঘটছে, জাতীয় দ্বন্দ্ব কলহের মীমাংসার জন্য কতরকম প্রণালী ও সংগঠন উদ্ভাবিত হচ্ছে। এইসব মিলিয়ে মানবজাতি ও সমাজের ক্রমবিবর্তনের একটি ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত। ভারতের ইতিহাসের যে দিকটা রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতায় স্মরণীয় হয়ে উঠেছে অথবা 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তার সঙ্গে এই ধারণার অনেকখানি মিল আছে।

অর্থাৎ, মানুষের গোষ্ঠীজীবনের মূলে যে-আত্মীয়ধর্মিতা, সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে যে-বহুত্ব ও বৈচিত্র্যে আবার সেই সঙ্গে সমন্বয়ের প্রয়াস ও ঐক্যমুখিতা, এই সব আশ্রয় করে মানুষের বৃহত্তর সমাজজীবন গঠনের পথে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা, ইতিহাস বিষয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে এসবই প্রাধান্য পেয়েছে। অন্য ধারণাটিতে প্রধান করে তুলে ধরা হয়েছে সমাজের ভিতর ধনী দরিদ্রের বৈষম্যকে এবং আরো বিশেষভাবে শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঘটনাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটা দৃঢ়বদ্ধ সূত্রাকারে লক্ষ করা যায় মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায়। অপেক্ষাকৃত শিথিল আকারে এই ধরনের চিন্তা অথবা অনুভব বহু সংস্কারপন্থী এমনকি রক্ষণশীল ব্যক্তির বক্তব্যেও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। উদাহরণত উল্লেখ করা যেতে পারে উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনায়ক ডিজরেলির সেই বিখ্যাত উক্তি, ধনী ও দরিদ্র এই দুই জাতিতে বিভক্ত ব্রিটিশ সমাজ। বস্তুত উনিশ শতকের অনেক লেখক,সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজসংস্কারকের চিন্তাভাবনাতেই শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতের কথা খুঁজে পাওয়া যায়। তবু ইতিহাসের ব্যাখ্যার ভিত্তি ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে মার্ক্সীয় সমাজ দর্শনেই।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির কোনোটিই সম্পূর্ণ ভুল নয়। কোনো একটিকে সমগ্র সত্য বলে মনে করাটাই ভুল। ইহুদীদের ভিতর ধনী দরিদ্রের বৈষম্য আছে। কিন্তু এই বৈষম্যকে অতিক্রম করে ধর্মের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ইহুদীর ভিতর একটা আত্মীয়ভাবও আছে। ব্রিটিশ সমাজ শ্রেণীতে বিভক্ত। আবার শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও ইংরেজের ভিতর ভাষা ও জাতীয়তাবাদের আধারে একটা ঐক্যের বন্ধনও আছে। উনিশ শতকের শেষভাগে ও বিশ শতকের গোড়াতে ইংল্যান্ডে ও জার্মানিতে শ্রমিক আন্দোলন দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে। ঐ সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সাম্যবাদী সংগঠনও দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কোনো কোনো সাম্যবাদী নেতার মনে আশা ছিল যে, ইংরেজ ও জার্মান শ্রমিক ঐ যুদ্ধকে ধনিক শ্রেণীর চক্রান্ত বলে চিনে নেবে এবং শ্রেণীগত ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমভাবে নিজ নিজ দেশে শাসকশ্রেণীর বিরোধিতা করবে। সেই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সংকটের মুহূর্তে ধনী ও দরিদ্র ইংরেজ একই পতাকার নীচে দাঁড়িয়েছে সমান ঐক্যবদ্ধ জার্মান জাতির বিরুদ্ধে।

যুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্যবোধে একটা উত্তেজনা এবং মাদকতা থাকে, যাকে সব সময় স্বাস্থ্যকর বলা চলে না। কিন্তু এটাই সব নয়। এই সব উত্তেজনার বাইরেও জাতি ও গোষ্ঠীর জীবনে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়ভাব আছে, মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণতার জন্য যেটা

প্রয়োজন। জার্মানিতে ভ্রমণকালে রেলগাড়ির এক কামরায় বসে কোনো বাঙ্গালী যখন অন্য কামরা থেকে হঠাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্বনি শুনতে পায়, অথবা বিদেশে কোনো স্বদেশবাদীর সঙ্গে যদি সহসা সাক্ষাৎ ঘটে, তখন যে-যোগাযোগের আনন্দ উৎপন্ন হয় সেটা আত্মিক মিলনেরই আনন্দ। সেই অপ্রত্যাশিত যোগে আমাদের হৃদয়ের একটা প্রচ্ছন্ন অথচ স্থায়ী আকাঙ্ক্ষাই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ব্যবসায়ী বুদ্ধি এবং আত্মীয়ভাবের বিচিত্র মিশ্রণে সমাজের ছোট বড় নানা কাজ চলে। এরই গুণে প্রতিদিনের নানা কলহ উত্তীর্ণ হয়ে যৌথ জীবনের সংহতি এবং ব্যক্তির জীবনে একটা ন্যূনতম সাম্য রক্ষা পায়।

অথচ মাত্রা রক্ষা যে পাবেই এমন কোনো নিশ্চিন্ত আশাবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। ব্যবসায়িক বুদ্ধির প্রাবল্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়ভাব যখন তার প্রাণশক্তি হারায় অথবা যখন গোষ্ঠীগত সংহতির ভিতর বিরোধী গোষ্ঠীর প্রতি হিংসার ভাবটাই প্রধান হয়ে ওঠে, তখন সেটা ব্যক্তি ও সমাজ দুয়েরই পক্ষে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। দুরকম বিপত্তিই আধুনিক সমাজে বার বার দেখা দিয়েছে। এই দুই ব্যাধির প্রকোপ থেকে রক্ষা করে মানুষের যৌথ জীবন কী করে গড়ে তোলা যায় সেটাই আজ সমাজ সংগঠনের একটা মূল প্রশ্ন। এযুগের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী আন্দোলন কোনোটিই এই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকেনি। নতুন সমাজ সংগঠনের উপায় নিয়ে অতএব পুনরায় চিন্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজকে পরিবর্তিত ও সংগঠিত করা যায় এমন কথা অতীতে বড় শোনা যেত না। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য সাধনা ও সন্ন্যাসের পথ প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের কোনো ব্যাপক ও পরিকল্পিত পরিবর্তন সম্ভব নয়, এই রকম ধারণাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। আঠারো শতক থেকে একটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচারিত ও প্রসারিত হতে থাকে। এদেশেও উনিশ শতকে নবজাগরণের সঙ্গে যুক্ত এই চিন্তাধারা ক্রমে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মানুষই সেই অদ্বিতীয় জীব যে নিজের সামাজিক জীবন ও ইতিহাস নিজে সচেতনভাবে রচনা করে এগিয়ে যেতে পারে, এই চিন্তায় অনেকটা নতুনত্ব আছে।

আঠারো ও উনিশ শতকে সমাজকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার কথা যাঁরা বলেছিলেন তাঁরা অনেকেই ছিলেন যুক্তিবাদী। মানুষের যুক্তি অথবা বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করা, চিন্তাকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা, এসব ছিল তাঁদের মতে উন্নত সমাজসংগঠনের জন্য প্রাথমিক কাজ। সমাজে যেমন একদিকে অসাম্য ও অন্যায় জমে ওঠে তেমনি অন্যদিকে মানুষের ধ্যানধারণায়ও একটা বিকৃতি ঘটে। সত্যের এই-যে বিকৃতি, সমাজের মনে যখন সেটা সাধারণভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন সেই গৃহীত অসত্যকেই বলা যেতে পারে কুসংস্কার। অন্যায়ের সঙ্গে কুসংস্কারের একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে, একে অন্যের কাছে আশ্রয় লাভ করে, একে অন্যকে পুষ্টকে করে। কাজেই সমাজের শোধনের জন্য সত্যেরও নির্ভীক অন্বেষণ প্রয়োজন। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার টলাতে না পারলে অন্যায়কে দূর করা যাবে না।

এই রকম একটা প্রত্যয় থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রের মহান চিন্তানায়ক জ্যোতিবা গোবিন্দরাও ফুলে সত্যশোধক সমাজ গঠন করেন। এই সত্যশোধক আন্দোলন ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মআশ্রিত সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বদ্ধসংকল্প। যে-সংস্কার হিন্দু সাধারণকে শেখায় যে, গোমূত্র পানে পবিত্রতা লাভ হয় কিন্তু শূদ্রের হাত থেকে পানীয় জল গ্রহণ করলে উচ্চবর্ণের মানুষ অপবিত্র হয়, সেই সংস্কারকে মহাত্মা ফুলে

সামাজিক অসাম্যের ধারক বলে জানতেন। এই আন্দোলনেরই পরবর্তী পর্যায়ের নেতা সুপণ্ডিত আম্বেডকর। তিনি দেখেছিলেন যে, শতাব্দীসঞ্চিত কুসংস্কারের প্রভাবে হিন্দু সমাজের বিবেক অসাড় হয়ে গেছে। নিম্নবর্ণের প্রতি সব রকমের অন্যায় ও অপমানই ঐতিহ্যের নামে গ্রহণীয় ও সহনীয় হয়ে উঠেছে। আম্বেডকর ভারতীয় রাজনীতির এক বিরাট পুরুষ। কিন্তু তিনি একথা জানতেন যে, শুধু রাজনীতির দ্বারা সমাজকে শুদ্ধ ও মুক্ত করা যায় না। সমাজের চিত্ত ও বিবেককে জাগাতে হলে একটা বৌদ্ধিক আন্দোলনেরও অত্যন্ত প্রয়োজন। জাগ্রত বিবেকই মানুষের মৌল অধিকারকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো রক্ষা করতে পারে, আইন হতে পারে শুধু তার সহায়ক। আমাদের ধর্মে চিত্তশুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। সেখানে জোর পড়েছে চিত্তকে বাসনা কামনা থেকে মুক্ত করবার ওপর। এরও প্রয়োজন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এযুগে ফুলে অথবা আম্বেডকর যে আন্দোলনের নেতা ও পথিকৃৎ তাতে চিন্তার আলোক পড়েছে ভিন্নস্থানে। সামাজিক বিচারবুদ্ধি অথবা বিবেকের শোধনই এঁদের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। আম্বেডকর সংবিধান বিষয়ে জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু তিনি একথা জানতেন যে, সংবিধানের জোরে অন্যায়কে দূর করা যাবে না। তাই তিনি বলেছিলেন, "rights are protected not by law but by the social and moral conscience of society. . .Social concience. . is the only safeguard of all rights fundamental or non-fundamental." (১৯৪৩ সালের রানডের জন্মদিবসে পুণায় প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।)

চিন্তাকে স্বাধীন ও সামাজিক বিচারবুদ্ধিকে ন্যায়নিষ্ঠ করবার জন্য হিন্দুসমাজের অভ্যন্তর থেকে যেমন সত্যশোধক আন্দোলনের উৎপত্তি ঘটে মুসলমান সমাজের ভিতর থেকেও তেমনি অনুরূপ কিছু আন্দোলন দেখা দেয়। উদাহরণত এই শতকের বিশের দশকে ঢাকার কয়েকজন চিন্তানায়কের উদ্যোগে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন নামে পরিচিত ভাবধারার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও উদ্দেশ্য ছিল মোল্লা মৌলবাদীদের আধিপত্য থেকে উদ্ধার করে মুসলমান মানসে নতুন চিন্তার উন্মোচন এবং সেই মুক্ত বিচারধারায় বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়ের অনুকূল ক্ষেত্র রচনা।

উনিশ শতকের দূরদর্শী নেতারা সমাজের অগ্রগতির জন্য সাংস্কৃতিক রূপান্তর ও নবজাগরণের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। বিশ শতকে দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিবর্তন দেখা যায়। রাজনীতিকেই যেন নতুন যুগের নেতারা সমাজ পরিবর্তনের প্রধান সহায় বলে মেনে নিয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিদেশী শাসকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া স্বদেশী নেতাদের কাছে সেদিন সবচেয়ে জরুরী কাজ বলে মনে হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তি যতদিন বিদেশীর হাতে আছে ততদিন দেশের কোনো স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়। আর রাষ্ট্রশক্তি দখলের জন্য যে কর্মপন্থা ও আন্দোলন তারই নাম তো রাজনীতি। কাজেই স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে, অন্তত বিশ শতকে, এদেশে এবং অন্যান্য পরাধীন দেশে রাজনীতিকেই অনেকে বেছে নিয়েছেন জাতীয় উন্নতির প্রধান উপায় হিসেবে।

বলা বাহুল্য, এই চিন্তাধারা সকলে গ্রহণ করেনি। আম্বেডকরের কথা এইমাত্র বলা হয়েছে। পুণায় প্রদত্ত যে-বক্তৃতা থেকে ওপরে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেই ভাষণে তিনি রাজনীতিসর্বস্বতার খোলা সমালোচনা করেছেন। ইংরেজের হাত থেকে হিন্দু উচ্চবর্ণের কিছু নেতার হাতে ক্ষমতা এলেই দেশের কোনো মৌল উন্নতি ঘটবে একথা আম্বেডকরের মনে হয়নি। তাই সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন তাঁর কাছে প্রকৃত

স্বাধীনতার পূর্বশর্ত বলে মনে হয়েছে। এদিক থেকে বামপন্থী সাম্যবাদী নেতাদের সঙ্গে আম্বেডকরের মতামতের মিল ও অমিল দুই-ই লক্ষ করবার যোগ্য।

সাম্যবাদী নেতারাও বিশ্বাস করেন যে, এদেশীয় মধ্যবিত্তের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটলেই তাতে সমাজের কোনো বড় পরিবর্তন সাধিত হবে না। অন্তত মার্ক্সসীয় দৃষ্টিতে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তরই সমাজে অধিকাংশ মানুষের মুক্তির পূর্বশর্ত। কিন্তু আজকের দিনে মার্ক্সসবাদীও কার্যত রাজনীতিকে প্রাথমিকতা দিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাটাই প্রধান কথা। শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় সাম্যবাদী দলকে প্রথমেই সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে এই ক্ষমতা দখলের কাজে। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে এলে তবেই সাংস্কৃতিক অথবা বৌদ্ধিক রূপান্তরের কাজ সফল হতে পারে।

যিনি প্রকৃতই মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী তিনি ধর্মে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অথবা শাস্ত্রের সমালোচনা অথবা জাতিভেদের বিরোধিতায় এদেশে সাম্যবাদী দল আপাতত তেমন সক্রিয় ও উৎসাহী নয়। অপসংস্কৃতিবিরোধী আন্দোলনেও আজ বামপন্থীদের সঙ্গে ঐতিহ্যপন্থীদের মতের অনেকটা মিল চোখে পড়ে। লোকসংস্কৃতির যে-দিকটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন তার কঠোর সমালোচনা উনিশ শতকী প্রগতিপন্থীদের চোখে যেমন গুরুত্ব পেয়েছিল আজ আর তেমন নয়। জনগণের সংস্কার অথবা কুসংস্কারের আমূল বিরোধিতা করতে গেলে জনসাধারণের সমর্থন হারাবার ভয় আছে। রাজনীতির কৌশলের দিক থেকে এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জনগণকে যথাসম্ভব সঙ্গে রাখাই বেশী জরুরী। এই রকম একটা চিন্তাধারা যেমন জাতীয়তাবাদী তেমনি সাম্যবাদী রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজনীতির প্রাথমিকতা এযুগে বামপন্থী আন্দোলনের চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বিপ্লবী অথবা প্রগতিবাদী কিনা সেই বিচারে আমরা আজ তাঁর সামাজিক আচরণ অথবা সাংস্কৃতিক বিচারবুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তেমন প্রয়োজন মনে করি না, বরং তাঁর রাজনীতির উগ্রতাকেই প্রধান মানদণ্ড বলে মানি। ভবিষ্যতের সমাজ সংগঠনের পথ হিসেবে এই রাজনীতিসর্বস্বতা কতটা উপযুক্ত অথবা হিতকর সেটাই আমাদের সামনে আজ প্রশ্নের আকারে আবারও দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করবার দুটি উপায়ের কথা বলা যায়। একটি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ, অন্যটি দলীয়রাজনীতির সংবিধানসম্মত পথ। গান্ধীজি অবশ্য একটি তৃতীয় পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর কথা পরে আলোচনা করা যাবে। যে সব দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথ খোলা নেই সেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের আবেদন সহজে স্বীকার্য। রুশবিপ্লবের পটভূমিতে আছে জারের স্বৈরতন্ত্র। ঐ বিপ্লবের ফলে ইয়োরোপ আজ দুভাগে বিভক্ত। এই দুই ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এবং তার কিছু ফলাফলই এখানে আলোচ্য। বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে যে-দল গড়ে উঠেছে তার কিছু নিজস্ব গুণাগুণ দেখা গেছে। এই সব দলে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তা এবং আত্মসমালোচনার রীতি আছে। কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি কুণ্ঠাহীন আনুগত্য, কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা স্বাভাবিক কারণেই বিপ্লবীদলের পক্ষে অনিবার্য ; যে-হেতু বিপ্লবীদল প্রতিপক্ষকে উচ্ছেদ করতে বদ্ধসংকল্প, অতএব প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কোনো সহানুভূতি অথবা বিবেচনা আশা করতেও সে অভ্যস্ত নয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলই কিছুটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা রক্ষা করবে, এই রকম আশা করা হয়।

বিপ্লবের রাজনীতিতে সেই প্রত্যাশার ভিত্তি নেই। বরং প্রতিপক্ষকে প্রতি পদে সন্দেহ এবং সর্তকতার সঙ্গে দেখাই সহিংস বিপ্লবীর পক্ষে স্বাভাবিক। কখনও আবার বিপ্লবী আন্দোলনেরই একভাগ অন্যভাগের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। দলের একাংশ যখন বিপ্লবে আস্থা রক্ষা করে শ্রেণীশত্রুর উচ্ছেদের জন্য অনুপ্রাণিত, অন্য অংশ হয়তো তখনই আপসের রাজনীতিকে ক্ষমতালাভের আশায় কৌশল হিসেবে বেছে নেয়। এই দুই গোষ্ঠীর অতি নির্মম ভ্রাতৃকলহ তখন রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তোলে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে যে বিপ্লবী দলটি গড়ে ওঠে ক্ষমতা হস্তগত হবার পর সেই দলই মহান আদর্শের নামে অত্যাচারের একটি নতুন নির্দয় যন্ত্রবিশেষ পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু আজকের সমস্যা শুধু বৈপ্লবিক হিংসায় বিশ্বাসী দলকে নিয়েই নয়। সংবিধানশাসিত সমাজের অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশেও দলীয় রাজনীতির যে অবনতি ঘটে সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। ক্ষমতার লড়াই যখন রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে তখন সুনীতির সঙ্গে রাজনীতির একটা বিরোধী সম্পর্ক দেখা দেয়। যে-কোনো উপায়ে, নীতির বালাই না রেখে, ক্ষমতা দখল করবার জন্য দু'পক্ষই সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এদেশে গত কয়েক বছরে ব্যাপারটা নাটকীয় আকার ধারণ করেছে নীতিহীন দলত্যাগের ভিতর দিয়ে। কিন্তু দল থেকে দলে সুযোগসন্ধানী আবর্তন প্রত্যাবর্তন শুধু বাইরের দৃশ্য। তারও পিছনে টাকার খেলা, গুপ্ত হত্যা, চরিত্রহননের মিথ্যা চক্রান্ত, অজস্র কাপট্য এবং সমাজ জীবনে দাঙ্গা-ও-কলহ-সৃষ্টিকারী উস্কানি ও প্ররোচনা নিয়ত চলতে থাকে। মূল্যবোধের ধ্বংসস্তূপের ওপর দলীয় রাজনীতির প্রাসাদ গড়ে ওঠে। দলীয় রাজনীতির একটা অপেক্ষাকৃত সদর্থক দিকও নিশ্চয়ই ছিল, এখনও আছে। সেটা উপেক্ষণীয় নয়। তবু সমস্যার জটিল দিকটাই এখানে তুলে ধরা প্রয়োজনীয়। সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। রাজনীতির পরিপূরক স্বতন্ত্র ও বহুমুখী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন যখন সবল থাকে তখন পরিস্থিতির চেহারা একরকম। রাজনীতি যখন সব কিছু গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন পরিস্থিতি অন্যরকম। এই নতুন পরিস্থিতিতে সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সঙ্গত কারণেই চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

মূল প্রশ্নে আবারও ফিরে আসা প্রয়োজন। কিছু মূল্যবোধের আশ্রয়েই সুস্থ সমাজ রক্ষা পেতে পারে। সেই মূল্যবোধকে কে রক্ষা করবে? রাজনীতি কি তার রক্ষক হতে পারে? আজকের রাজনীতি দেখে তো তা মনে হয় না। রাজনীতির কদর্যতায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা উৎকণ্ঠিত। তারই আক্রমণে মূল্যবোধ আজ বিপন্ন। উত্তরে বলা হবে যে, দোষটা রাজনীতির একার নয়, দোষটা সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতির। তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়। এই পরিস্থিতি থেকে রাজনীতি একা কি সমাজকে রক্ষা করতে পারে? গান্ধী রাজনীতির সঙ্গে সুনীতি অথবা ন্যায়বোধের যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় শেষ বয়সে রাজনীতির নৈতিক শোধনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই শোধন তখনই সম্ভব যখন রাজনীতিকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকে একটা বৃহত্তর নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, মানুষের অনুভবকে এবং সেই সঙ্গে জনমতকে যে-আন্দোলন সক্রিয়ভাবে গঠন করে। সেই শক্তি থাকে সাহিত্যিকের, শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের, প্রকৃত চিন্তানায়কের, সকল মহৎ সাধকের। এঁরা রাজনীতির ভৃত্য হবেন না। সারা দেশের বিবেক এবং চিত্তকে এঁরা প্রভাবিত করবেন। সেই জাগ্রত বিবেকের প্রভাব পড়বে রাজনীতির ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ, একটা সদর্থক সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনীতির

শোধনের পূর্বশর্ত, যদিও বলা প্রয়োজন যে, রাজনীতির শোধনই তার লক্ষ্য নয়। মনুষ্যত্বের গঠন তার মূল লক্ষ্য।

মূল্যবোধের দুটি আধার : এক, ব্যক্তি ; দ্বিতীয়, প্রতিষ্ঠান। গান্ধী অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনই ছিল এক একটি শিল্পকর্ম, যার ভিতর দিয়ে কিছু মূল্যবোধকে আমরা চিনে নিতে পারি। কিন্তু এই সব মূল্যকে এঁরা শুধু এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ও বাণীতে নয়, কিছু প্রতিষ্ঠানের ও গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়েও সাকার করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর গঠনমূলক কাজের কথা সবাই জানেন। রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতিতে তাঁর গঠনমূলক প্রচেষ্টা কিছুটা ঢাকা পড়ে গেছে। অথচ তিনি নিজে বলেছিলেন : "শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" (অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠি, ১৫ নভেম্বর ১৯৩৪।) অন্তত একথা স্বীকার্য যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনাকে বুঝবার চেষ্টা মর্মান্তিক ভ্রম। যে-সব মূল্যে এঁরা বিশ্বাসী ছিলেন, গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে তাদের রূপায়িত করতে চেয়েছেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। সেই প্রচেষ্টা আজ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করা প্রয়োজন। গান্ধীর সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্র ছিল আরো বৃহৎ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেও কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। শিক্ষা, সমবায় এবং পল্লী সংগঠনের ক্ষেত্রে কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে নিজস্ব চিন্তা তিনি আশ্চর্য যত্নের সঙ্গে আগ্রহী দেশবাসীর জন্য লিখে রেখে গেছেন। সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে যে গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক, তাঁর এই বিশ্বাসকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রচার করে গেছেন।

গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তার ভিতর অনেকটা মিল ছিল। পল্লীকে সমাজ সংগঠনের ভিত্তি বলে মেনে নিয়েছিলেন দুজনেই। এর মূল কারণ শুধু এই নয় যে, ভারতের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। এর অতিরিক্ত একটা আদর্শগত কারণ দুজনের চিন্তাতেই খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষের মনের একটা দিক আছে যেটা আত্মীয় ও প্রতিবেশীকে আশ্রয় করেই বাঁচতে চায়। পল্লী হল এই আত্মীয়ধর্মী গোষ্ঠীজীবনের প্রতীক। বাস্তব পল্লীতে ভালো মন্দ অনেক কিছুই আছে ; কিন্তু গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শচিন্তায় পল্লীর এই প্রতীকী তাৎপর্যটি বুঝে নিতে হবে। 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।" তিনি জানতেন যে, মনের কোনো এক স্তরে মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, তা যদি হতে না পারে তবে সে অচরিতার্থ। কিন্তু একই সঙ্গে সেই বিশ্বকে আবার মানুষ পেতে চায় ধরাছোঁয়ার পরিধির ভিতর ছোটো এক পল্লীতে। শান্তিনিকেতনে এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই বিশ্বভারতীর মূলভাবটি প্রকাশ পেয়েছে সেই বিখ্যাত বাক্যে, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'। বিশ্বকে চাই, কিন্তু তাকে একটি নীড়ের ভিতরও চাই। পল্লী সেই নীড়।

মানুষের অন্তর্গত আত্মীয়চেতনা যে ছোট বৃত্তের ভিতর প্রত্যক্ষ আকার ধারণ করে তারই নাম পল্লী। এইখানে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার আরম্ভ। এখানেই সমবায়ের ভিত্তি। এই সহযোগিতায় তিনটি স্তর একই সঙ্গে বর্তমান। এর কেন্দ্রে আছে ব্যক্তিমানুষ। জীবনধারণের ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্যক্তিমানুষ অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ দেহের পোষণ এই সহযোগিতার প্রাথমিক লক্ষ্য। কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তি নিজে যেমন কিছু লাভ করে তেমনি প্রতিবেশী সহযোগীকে কিছু দান করে। এরই

ভিতর দিয়ে ঘটে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ। যাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সহযোগ তাদের ভিতর দিয়ে উপরন্তু বিশ্বের উদ্দেশ্যেও আমরা কিছু তর্পণ করি। সহযোগের প্রতিটি বৃত্তই কোনো বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে যোগাযোগের সেতুবিশেষ। সমাজ গঠনের এটাই স্বাভাবিক নীতি। অসংখ্য পল্লী নিয়ে ক্রমসম্প্রসারিত বৃত্তে গঠিত এক যুক্তরাজ্য মানুষের এই বৃহৎ সমাজ। অন্তত সমাজের একটি আদর্শ রূপের সন্ধান পাই এখানে। অর্থনীতি হোক, রাজনীতি হোক, সংস্কৃতি হোক, আদর্শ সমাজ সংগঠনের এই মৌল নীতি।

তাঁর কাম্য মানবসমাজের পরিচয় দিতে গিয়ে 'oceanic circle' শব্দটি গান্ধী ব্যবহার করেছেন। 'মহামানবের সাগরতীর' কথাটি রবীন্দ্রনাথের। পল্লীর নীড় থেকে মহামানবের সাগরতীর পর্যন্ত সমাজগঠনের একটি ছবি মনে মনে রচনা করে নেওয়া যায়। গান্ধীর ভাষায় চিত্রটি এই রকম। গান্ধী লিখেছেন : "In this structure composed of innumerable villages, there will be ever-widening, never ascending circles. . It will be an oceanic circle whose centre will be the individual." এখানে "never ascending" কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। বৃহত্তর সংগঠন পল্লীর কাঁধে চেপে বসবে না। আবারও গান্ধীর ভাষায় ফিরে আসা যাক। গান্ধী বলেছেন : "The outermost circumference will not wield power to crush the inner circle, but will give strength to all within and derive its own strength from it." মানুষের এই যুক্তরাজ্যে প্রতিটি পল্লী এবং আত্মীয়গোষ্ঠী যেমন বৃহত্তর রাজ্যকে শক্তি দান করবে তেমনি তা থেকে শক্তি আহরণ করবে।

এর সঙ্গে সংগতি রেখে গান্ধী তাঁর প্রতিরোধ আন্দোলনের চরিত্র ও সংগঠন উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করেছেন। মানুষের সমাজকে যখন আমরা মূলত শ্রেণীবিভক্ত রূপে দেখি তখন বলা যায় যে শত্রুশ্রেণীর ধ্বংসই আমাদের কাম্য। কিন্তু সমাজকে যখন আমরা অসংখ্য আত্মীয়গোষ্ঠীর যুক্তরাজ্য বলে অনুভব করি তখন বৈরী গোষ্ঠীর উৎখাতের চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া শুভবুদ্ধির পরিচয় বলে মেনে নেওয়া যায় না। অথচ সমাজে অন্যায় আছে, অবিচার আছে, তার প্রতিরোধের প্রয়োজনও আছে। গান্ধী প্রতিরোধের সেই পদ্ধতিই খুঁজেছেন যাতে মানুষের মৌল আত্মীয়বোধকে অক্ষুণ্ণ রেখেই অন্যায়ের অটল বিরোধিতা করা যায় এবং সাম্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিরও পরিবর্তন অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু যে মূল সমস্যাটির সমাধান গান্ধী খুঁজেছেন সেটি ক্ষুদ্র স্থানে কালে আবদ্ধ নয়। নতুন সমাজ সংগঠনের পথে এটি এমন একটি মৌল প্রশ্ন যার উত্তর ভবিষ্যতের মানুষকেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে ক্রমাগত অন্বেষণ করতে হবে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনে চিহ্নিত ন্যায় অন্যায় বিচারকে অতিক্রম করেও মানুষের ভিতর একটা সংবেদনশীল ঐক্যবোধ আছে। দূরের দেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের প্রাণনাশ হলে আমরা স্বাভাবিক বেদনা অনুভব করি, মৃতদের ভিতর কে সাধু কে চোর এই চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হই না। পরিবারে কারো আচরণে আমরা ক্ষুণ্ণ অথবা বিরক্ত হলেও সেই বিরক্তিকে অতিক্রম করে একটা আত্মীয়তাবোধ এবং সদ্ভাব অব্যাহত থাকে ; তাতেই আমরা মনের স্বাস্থ্যেরও পরিচয় পাই। সাংসারিক কারণে দূরে সরে গেলেও মন থেকে সেই সদ্ভাবকে আমরা সহসা বিতাড়িত করতে চাই না। বস্তুত এই সদ্ভাব অথবা শুভবুদ্ধিই নৈতিক মূল্যবোধের আশ্রয়। গান্ধী এমন একটি সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন যেখানে সমাজের মূল প্রতিষ্ঠানগুলি এই শুভবুদ্ধিকে আশ্রয় দেবে, শক্তিশালী করবে। অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনকেও তিনি এমন পদ্ধতির ওপর স্থাপন করতে চেয়েছিলেন যাতে পদে পদে যুদ্ধের প্রয়েসজনে মানবিক শুভবুদ্ধি ও মূল্যবোধকে স্থগিত রেখে চলতে হয় না। আমাদের যুগের ইতিহাস অন্তত আপাতদৃষ্টিতে এই সব ধারণার বিরুদ্ধধারায় প্রবাহিত হয়েছে। সমাজে ঐশ্বর্য এবং ক্ষমতা এমনভাবে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত হয়েছে যাতে মানুষের স্বাভাবিক সংবেদনশীলতার অবক্ষয় ও বিকৃতি ঘটে। প্রতিরোধ আন্দোলনও এমন রূপ গ্রহণ করেছে যাতে সংঘবদ্ধ হিংসার শক্তি কপট নৈতিকতার সমর্থনে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। যুগের এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে গান্ধীকে তাঁর কর্মের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। সভ্যতার সমকালীন সংকটের পরিপ্রেক্ষিতেই গান্ধীচিন্তার বিচার প্রয়োজন।

সমাজ সংগঠনের জন্যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সার্থকতা নিয়ে এই আলোচনা শুরু হয়েছিল। সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেখানে গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত সেখানে তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দুয়ের ভিতরই একটা বেগ সঞ্চারিত হয়। যখন এরা বিচ্ছিন্ন ভাবে চলে তখন দুয়ের ভিতরই একটা দুর্বলতা এবং পরিণামে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেয়। তেমনি আবার রাজনীতি যখন গঠনমূলক কাজ এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তার বিকার রোধ করা যায় না। গত দুই শতকের অভিজ্ঞতা থেকে একটা সমন্বয়ের পথের সন্ধান বোধ করি পাওয়া যায়। এদেশে উনিশ শতকে সংস্কৃতির রূপান্তরের চিন্তা এক রকমের প্রাধান্য পেয়েছিল। শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আশ্রয়ে কি সমাজের সুষ্ঠু পুনর্গঠন সম্ভব, প্রশ্নটা যখন এইভাবে আসে তখন তার আশাব্যঞ্জক উত্তর পাওয়া কঠিন হয়। গঠনমূলক কাজে অনেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। শুধু গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে কি সমাজের কোনো স্থায়ী এবং বড় পরিবর্তন আনা যাবে, এ প্রশ্নের কোনো উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর আশা করা যায় না। শুধু রাজনীতির ওপর নির্ভর করে যে-পথ, তার পরিণতি ঘটেছে 'রাজনীতি প্রমত্ততা'য়। আসলে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও গঠনমূলক কাজের একটা সংযোগ প্রয়োজন। তার মানে এই নয় যে, সংস্কৃতি রাজনীতির প্রতিধ্বনি হবে, অথবা এ দুয়ের কোনোটি গঠনমূলক কাজের মধ্যেই প্রধানত সীমাবদ্ধ হবে। এদের প্রত্যেকেরই একটা আত্মস্বসতন্ত্র্য চসই, এমনকি এদের ভিতর কিছু বিরোধ থাকাটাও আশ্চর্য নয়। তারই ভিতর দিয়ে প্রস্তুত হবে সমন্বয়ের প্রশস্ত পথ। বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যেকটিই যেখানে দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ, সংযোগের ভিতর দিয়ে সেখানে তারা সদর্থে বলশালী এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে আশাব্যঞ্জক।

জয়প্রকাশ নারায়ণ রাজনীতি ও সর্বোদয়ের কর্মপন্থা অতিক্রম করে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'total revolution' অথবা 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি'র কথা বলেছিলেন। এ নিয়ে বহু বাদবিসংবাদ হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। ক্রান্তি অথবা বিপ্লব শব্দটার ভিতর বিরাট ভাঙনের পথে হঠাৎ অন্ধকার পেরিয়ে সূর্যোদয়ে পৌঁছবার একটা প্রতিশ্রুতি আছে, যেটা কারো কাছে যেমন আকর্ষক আবার কারো কাছে তেমনি প্রবঞ্চক মনে হতে পারে। কিন্তু জয়প্রকাশের প্রধান কথাটা ছিল ভিন্ন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, শুধু রাজনীতির দ্বারা বিপ্লব সম্পূর্ণ হবে না, সমাজের সার্থক রূপান্তর সম্ভব হবে না ; শুধু অর্থনৈতিক অথবা গঠনমূলক কাজের সাহায্যেও সেটা সম্ভব নয় ; আবার শুধু সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক আন্দোলনের পথেও নয়। এ সবই বিচ্ছিন্নভাবে অপূর্ণ ; এদের যুক্ত করতে পারলে তবেই সম্পূর্ণতা। তাঁর বিচিত্র ও ঘটনাবহুল জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জয়প্রকাশ এই যে-সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলেন সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য। মার্ক্সবাদ অতিক্রম

করে তিনি এসেছিলেন গান্ধীবাদে। গান্ধীবাদীদের ভিতরও তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, বরং তাঁকে ব্যতিক্রমী বললেই উপযুক্ত হবে। বস্তুত তিনি এই বিশ্বাসেই উপনীত হয়েছিলেন যে, বিশেষ কোনো দল অথবা মতবাদের কাছেই বিবেকবান মানুষের শেষ আনুগত্য অর্পিত নয়। তাঁর আনুগত্য সেই মূল্যবোধের কাছে, বিশেষ দল অথবা সম্প্রদায় অথবা আনুষ্ঠানিক মতবাদের উর্ধ্বে যার স্থান। আধুনিক মন এই রকম একটা কথা ধর্মের ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে। একথা যদি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সত্য হয় তবে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্য না হবার কারণ নেই।

সমাজ সংগঠনের একটি মূল নীতি আগে আলোচিত হয়েছে। বৃহত্তর সমাজের ভিত্তিতে থাকবে আত্মীয়সমাজ, প্রতিবেশীসমাজ, বান্ধবসমিতি। এই প্রতিবেশীসমাজের উদ্দেশ্য একদিকে যেমন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর দিয়ে সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন, অন্যদিকে তেমনি মনের সঙ্গে মনের যোগের সাহায্যে আনন্দের ক্ষেত্র রচনা। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমবায়ের সাহায্যে এই সব মৌল সমিতিকে শক্তিশালী করা গঠনমূলক কাজের প্রধান লক্ষ্য। আমাদের ঐতিহ্যের ভিতর এই সব কাজের যেমন সহায়ক শক্তি আছে, তেমনি প্রতিবন্ধক শক্তিও আছে। এ দেশের পল্লী জাতিতে জাতিতে বিভক্ত। জাতিপাঁতিকে অতিক্রম করে আমাদের কল্যাণমূলক চিন্তা ও প্রচেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হয় না। একে ভাঙবার জন্য প্রয়োজন নতুন সংস্কৃতি, সামাজিক সমালোচনার দিগ্‌দর্শী আন্দোলন। এটা অবশ্য উদাহরণমাত্র। গঠনমূলক কাজ আর সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ভিতর যোগের কথাটাই আসল। এদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে প্রধানত শহরে। আজ দেশময় গ্রামে গ্রামে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের নির্দয় সংঘর্ষ। এই খর্বতাকে অতিক্রম করে পল্লীতে এক অখণ্ড প্রতিবেশীসমাজ সৃষ্টি করা আবশ্যক ; কিন্তু সেটা সম্ভব নয় গঠনমূলক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নবদিগন্ত উন্মোচনকারী প্রচেষ্টা ছাড়া। এরই সঙ্গে রাজনীতিও এসে যায়। সমাজে ক্ষমতার একটা বিভাগ ও বিন্যাস আছে। সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে ক্ষমতার এই বিন্যাসেরও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আজ যারা ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, কাল তারাই যখন সমাজের পরিচালনায় অংশ নিতে চায় তখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার পক্ষ থেকে বাধা আসে। সত্যাগ্রহ ছাড়া সর্বোদয় সম্পূর্ণ হয় না। এমনি করে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও গঠনমূলক কাজ পরস্পর যুক্ত হয়ে পড়ে। এখানেই একটা সমগ্রতা ও সামঞ্জস্য প্রয়োজন, যার অভাবে আমাদের প্রতিটি খণ্ডপ্রচেষ্টা দুর্বল ও অবসন্ন হতে বাধ্য।

আমরা সবাই সব কাজে থাকব এমন নয়। কিন্তু সমাজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সব এসে যুক্ত হয়। আমরা যে যেখানে আছি সেখানেই নিজ নিজ সীমাবদ্ধ ভূমিকা রচনা করে নিতে পারি। তবু মননের ধর্ম এই যে, সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে খণ্ড খণ্ড প্রয়াসেরও সে অর্থ খুঁজে নেয়, অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার করে, সংশোধক নবচিন্তার জন্ম দেয়। শুধু রাজনীতি দিয়ে দেশকে হঠাৎ উদ্ধার করা যাবে, এটা একরকম জাদুতে বিশ্বাস, এতে মননের শক্তি নেই। সাংস্কৃতিক ও গঠনমূলক কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো বৈজ্ঞানিক অথবা নৈতিক রাজনীতি সম্ভব নয়। সমাজ সংগঠনের কার্যক্রম পদে পদে বদলে চলে ; কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আগে থেকে রচনা করা যায় না। কিন্তু একটা দিশাবোধ ও সামঞ্জস্যচেতনা সব সময়েই প্রয়োজন।

বাংলার সংকট ও কলকাতা

নগর কলকাতা ও পল্লী বাংলার ভিতর অসামঞ্জস্য আমাদের সংকটের প্রধান কারণ। নাগরিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রাম্যতার যোগে আমরা এক উদ্ভট সংস্কৃতি ও রাজনীতির অধিকারী হয়েছি। এর পরিবর্তন ছাড়া বাংলার সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

কলকাতাকে আমরা ভালবাসি। কলকাতা আমাদের গর্বের বস্তু। আজ যে-চিন্তার উদয় বাংলায় কাল তারই প্রকাশ ভারতে, এই বহু উদ্ধৃত পুরাতন বাক্যটি যতবার শুনেছি ততবারই মনে মনে জেনেছি যে, বাংলা বলতে এখানে কলকাতা মহানগরীকেই স্মরণ করা হয়েছে। যে-নবজাগরণ ভারতের উনিশ শতকের ইতিহাসে বাঙ্গালীকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, এই কলকাতায় তার উদ্ভব ও উন্মেষ।

অথচ এই কলকাতাই আবার বাংলাদেশের সামাজিক ও আর্থিকভারসাম্য বিপর্যস্ত করে আমাদের ভয়ংকর একটা সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলার সুদূর প্রান্ত থেকে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপাসকের দল কলকাতার ভিড় করেছেন। কলকাতার জ্ঞান ও সম্পদ কিন্তু বাংলার দিকে দিকে অজস্র চরিতার্থতায় ছড়িয়ে পড়েনি। ফলে মহানগরী ও অবশিষ্ট বাংলার ভিতর অতি দ্রুত একটি বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত ও শঙ্কিত করেছিল। তাই মহানগরী ত্যাগ করে তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন পল্লীবাংলার প্রান্তরে, গ্রামোন্নয়নের জন্য কেন্দ্র স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতনে।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, তাঁর বিরাট প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় তিনি সেই একক প্রচেষ্টায় ঘোরাতে পারেননি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কলকাতা ও গ্রামবাংলার ভিতর বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষেই অতি বড় দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। আমরা সবাই এই খণ্ডিত সংস্কৃতির সন্তান।

শহর ও গ্রামের ভিতর কিছুটা অসামঞ্জস্য অনিবার্য ; কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা মাত্রা অতিক্রম করে গেছে। কথাটা আরও একটু ব্যাখ্যা করেই বলি। পাশ্চাত্ত্য অর্থশাস্ত্রের একজন আদি গুরু ছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। স্মিথ সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো, নগর কি করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়ক হয়ে থাকে সেই কথা। পণ্ডিত লেখকের নিজ দেশ স্কটল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের আর্থিক ইতিহাসের সঙ্গে তিনি স্বভাবতই সুপরিচিত ছিলেন। ওদেশে বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ভিতর পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য। স্মিথ সাহেবের গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তার কিছুকাল আগেই স্কটল্যাণ্ডের অপেক্ষাকৃত জনবহুল নিম্নাঞ্চলে শুধু বাণিজ্যেরই নয়, কৃষিরও দ্রুত উন্নতি শুরু হয়ে গেছে। এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লিখেছেন : '১৭৬০ থেকে ১৮২০, এই সময়টাতে ইংল্যাণ্ডে কৃষির উন্নতি ছিল দ্রুত ; কিন্তু স্কটল্যাণ্ডে দ্রুততর। গ্ল্যাসগোর তামাক আর জাহাজের ব্যবসায়ীরা এবং ভারত থেকে প্রত্যাগত কিছু উদ্যোগী স্কট জমি কিনে উন্নয়নের কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন।'

এই উদ্ধৃতিটি এখানে টেনে আনবার একটা বিশেষ কারণ আছে। বৈপরীত্যের উদাহরণ তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। বাংলাদেশেও প্রায় ঐ সময়টাতেই, অথবা সামান্য পরে, রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ নেতাদের আমরা পাই। সেদিন কলকাতায় নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নববঙ্গের নেতারা অনেকেই প্রতিভাবান

ছিলেন। কিন্তু বাংলার নানা অংশ থেকে রাজধানীতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যেন বাকি দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিন্ন করেই এখানে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। নগর ও পল্লী, বাণিজ্য ও কৃষির ভিতর পারস্পরিক সহায়তার অভাবে বাংলাদেশে সামাজিক ও আর্থিক ভারসাম্য ভেঙ্গে গেল।

এটা বাংলার দুর্ভাগ্য ; আবার এটাই কলকাতারও সংকটের কারণ। পিছিয়ে-পড়া জেলাগুলিতে কর্ম ও শিক্ষার অভাবে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে কলকাতা নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্লিষ্ট ভাগ্যান্বেষীর দল কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। ক্রমে মহানগরীর সঙ্গতি অতিক্রম করেই ভিড় বেড়েছে। এমনই ভাবে শহর ও দেহাত একই দুষ্ট চক্রে জড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা যেমন বাংলাকে উপেক্ষা করেছে, বাংলার দুর্দশাও তেমনই মহানগরীকে এক দুরারোগ্য ব্যাধির দিকে ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে। দেশ বিভাগের পর অগণিত উদ্বাস্তুর জন্য গ্রামবাংলা অথবা মহানগরী, কোথাও আর সুস্থ স্থান সংকুলান হয়নি।

কোনো জাতির জীবনে আর্থিক ব্যাধি দুরারোগ্য হয় না, যদি তার সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে সাংস্কৃতিক ব্যাধি ও অন্যান্য জটিলতা। আমরা গ্রাম বর্জন করেছি, নাগরিক বোধ অর্জন করিনি।

আমাদের অভ্যাস ও সংস্কৃতিতে কয়েকটি বড় দোষ আছে। আমরা কিছুতেই নিজে দায়িত্ব নিতে চাই না। যদি কোনো বস্তুর অভাব ঘটে তবে কারও শরণাপন্ন হয়ে সেটা লাভ করা যায় কিনা সেটাই প্রথমে আমাদের চিন্তার বিষয় হয়। কারণ আমরা অত্যন্ত চালাক ; অন্যের কৃপায় যা লাভ করা যায়, নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করা আমাদের মূর্খতা বোধ হয়। যদি কোনো দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পড়ে তবে কী উপায়ে সেটা অন্য কারও ওপর চালনা করা সম্ভব, আমাদের ভাবনা স্বভাবতই সেদিকে যেতে চায়। এদেশে যাঁরা ক্ষমতালিপ্সু, তাঁরাই সাধারণত নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন ; আর সবাই দায়িত্ব এড়াতে ব্যস্ত।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আরও একটি কথা স্পষ্ট। এদেশে যুক্তি অথবা অধিকারবোধের ভিত্তিতে কিছু লাভ করা কঠিন। যদি কিছু পেতে হয় তো অপর ব্যক্তিকে 'দাদা' সম্বোধন করে অনুনয়ের ভাষায় কথা বলা ভালো। নয় তো ভয় দেখালে কাজ হয়। আমরা দয়া করি অথবা গোলমাল এড়াবার জন্য অপরপক্ষের দাবি মেনে নিই ; কিন্তু ব্যক্তির অধিকার বলে কিছু আমরা সচরাচর স্বীকার করি না। এর ফল অনেক সময় যেমন শোচনীয় তেমনই হাস্যকর। যে-দাবিতে আমরা পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোনো যুক্তি লক্ষ করিনি, হঠাৎ যখন তার সমর্থনে পেশীবলের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন আমাদের ভিতর কপট ঔদার্যের উদ্রেক হয় এবং সেই দাবি মেনে নিতে আর কোনো আপত্তি থাকে না। যাঁরা যুক্তি, নিয়ম ইত্যাদির ভিত্তিতে আলোচনা দাবি করেন তাঁদের সেই উৎপাত কিন্তু আমাদের বড়ই অসহ্য বোধ হয়।

অর্থাৎ, একদিকে আমরা দায়িত্ব গ্রহণে অনভ্যস্ত, অপরদিকে আমাদের যুক্তিসঙ্গত অধিকারও অস্বীকৃত। মহানগরী আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমানাকে বিস্তৃত করেছে ; অথচ নাগরিক সভ্যতার গুণ আমাদের জীবনে প্রবেশ করেনি। এটাই হয়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক সংকটের মূল কারণ। সাধ যখন সাধ্যকে অতিক্রম করে যায়, তখন পরিণামে অক্ষম ক্রোধ অনিবার্য। আমরা যেমন ব্যক্তিবিশেষের কাছে ছোট ছোট চাওয়া ও পাওয়ার জন্য কখনও হাত জোড় করি আবার কখনও করি আস্ফালন তেমনই বড়রকম

সমস্যার সমাধানে এই মুহূর্তে ঠাকুর অথবা নিয়তির শরণাপন্ন হই, আবার পরমুহূর্তে সমাজকে হিংসার আঘাতে ভাঙতে চাই। এই অস্থিরতাকে আমরা যতই বৈপ্লবিক আখ্যা দিই না কেন, আমাদের একটি প্রাচীন মানসিকতার সঙ্গেই এর নাড়ীর যোগ। যে-ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং আত্মনির্ভর হয়নি, মায়ের প্রতি তার আবদার ও আক্ষেপে আমাদের আচরণের উপমা মেলে। বাংলাদেশে আন্দোলনকে যতদিন না আমরা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করছি, ততদিন এই আক্ষেপ-বিক্ষোভের রাজনীতি কাটবে না।

সমাজ ও সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখ করতে হয়। যে-আত্মনির্ভরতার অভাব আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এখানেও আছে তারই প্রতিফলন। আমাদের শিক্ষা স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে না ; সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে শেখায় না। আমাদের যেন ধারণা এই যে, কিছু বাঁধাধরা বাক্য অভ্যস্ত ভুলসহ মোটামুটি মুখস্থ করার যে-শক্তি, তারই নাম বিদ্যা। এই বিদ্যায় আমরা আজ আর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি না, আবার একে অতিক্রম করে কোনো নতুন প্রত্যয়েও আমরা পৌঁছতে পারিনি। বলা বাহুল্য, এই বিদ্যার সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের যোগ যৎসামান্য।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য ছাত্র এবং শিক্ষিত সমাজে কোনো প্রবল প্রচেষ্টা নেই। অথচ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াবার জন্য আন্দোলন শক্তিশালী। একদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কোনো মূল্য নেই এমন একটা ধিক্কার ছাত্রদের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে ; অন্যদিকে সকল প্রকার অসদুপায়ে এই ডিগ্রীলাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও চলেছে।

শিক্ষার প্রসারে আমরা ভুল নীতি অনুসরণ করছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে সারা দেশে যথাসম্ভব শীঘ্র ছড়িয়ে দেবার প্রতি আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষিত বেকারের সমস্যা কিছুটা লাঘব না হওয়া পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো নিরর্থক ; তাতে ছাত্র ও বৃহত্তর সমাজ কারোরই কোনো লাভ হবে না। শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন চাই, এ কথাটা আজ সবাই বলছেন ; কিন্তু কার্যত অনেকে কোনো পরিবর্তনেই সম্মত নন। জ্ঞানচর্চায় শ্রবণ ও স্মৃতির তুলনায় আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বৎসরান্তে একটি বড় পরীক্ষার বদলে সারা বছর ধরে ছোট ছোট পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষার নামে আজ যে প্রহসন চলেছে তার সমাপ্তি ঘটাবার এই একমাত্র পথ। এরই সাথে চাই নানা প্রকার প্রযুক্তি বিদ্যা ও ব্যবহারিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার।

এ সবকিছুই ব্যর্থ হবে যদি না বাংলার অর্থনীতিকে আমরা সেই সঙ্গে ঢেলে সাজাতে পারি।

এজন্য প্রথম প্রয়োজন পশ্চিম বাংলার ওপর কলকাতার একাধিপত্যের অবসান। বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র দেশময় এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, কৃষির সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা আগে বলেছি, সেটা বেড়ে ওঠে। এই নতুন শিল্পকেন্দ্রগুলি ভেবেচিন্তে স্থাপন করতে হবে সেইসব স্থানে, যেখানে আছে একাধিক বড় রাস্তা অথবা রেলপথের সংযোগস্থল। স্থানীয় কাঁচামাল ও কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও কেনাবেচার সুবিধা, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা ইত্যাদি যেখানে নেই, সেখানে প্রয়োজন মতো নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। এজন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রাজ্যব্যাপী

পরিকল্পনার ব্যবস্থা চাই।

ভারতের কোনো কোনো অংশে ইতিমধ্যে কৃষির দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার উন্নয়ন এশিয়ার কোনো দেশের তুলনায়ই নগণ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কি করে ফসল বাড়ানো যায় এটাই আগামী কয়েক বছরে আমাদের কৃষিচিন্তার প্রধান কথা হওয়া উচত। যদি বলি যে, গ্রামে গ্রামে চাই নলকূপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি, স্কুল, সমবায় সমিতি ও বিজ্ঞান আলোচনার কেন্দ্র, তবে কেউ হয়তো বলবেন যে এ সবই কল্পনা। অথচ এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব, তার ইঙ্গিত এ দেশেই আছে, এই মুহূর্তেই।

এটা সবঙ্গীণ পরিকল্পনার রূপরেখা নয়; কোন্ পথে চলতে হবে তার দিগ্‌নির্দেশের চেষ্টা মাত্র। বাংলার রাজনীতি কি আমাদের এ পথে এগোতে দেবে? দলীয় রাজনীতির চেয়ে দেশ যদি আমাদের কাছে প্রিয়তর হয় তো চলবার শ্রেয় পথ তৈরী করে নেওয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এই পরিবর্তন রাজনীতিক দলগুলির ভিতর প্রথমে আশা করা যায় না; বরং দলের বাইরে থেকে যাঁরা দেশ গড়ার কাজে আগ্রহী অথবা দলের ভিতর থেকেও যাঁরা নিজের চিন্তাকে দলীয়তার উর্ধ্বে তুলতে সক্ষম তাঁদের ভিতরই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল প্রকাশ আগে সম্ভব।

আমাদের অভ্যস্ত রাজনীতিতে 'বামপন্থী' 'দক্ষিণপন্থী' এই দুটি শব্দের অর্থহীন প্রয়োগ লক্ষ করস যায়। আপনি 'বিপ্লবে' বিশ্বাসী, তবে আপনি বামপন্থী। সেই সঙ্গে আপনি হয়তো কালীর কাছে মানত করতে অভ্যস্ত, বাড়ির হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করলে আপনার ক্রোধের সীমা থাকে না, পরিবার পরিকল্পনার আপনি প্রচণ্ড বিরোধী, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অর্থে আপনি রক্ষণশীল; কিন্তু তাতে আপনার বামপন্থী পরিচয় ম্লান হবে না। অপর পক্ষে, আপনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে যতই মুক্ত থাকুন না কেন, যুক্তিবাদে আপনার বিশ্বাস যতই সুস্পষ্ট হোক না কেন, আপনি যদি না হিংসার রাজনীতিকে হাততালি দিতে রাজী থাকেন, তবে আপনি দক্ষিণপন্থী। আমাদের রাজনীতিতে যদি শব্দার্থের এই বিকার ঘটে থাকে তবে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের কাজে এই অভ্যস্ত ধ্বনিগুলি বিভ্রান্তিকর মাত্র। এইসব ধ্বনিগত বিড়ম্বনার উর্ধ্বে উঠেই আমাদের দেশের জন্য নতুন পথ বেছে নিতে হবে। বাংলার নবজাগরণের এমন একটা সদর্থ আমাদের খুঁজে নিতে হবে যেটা আজকের রাজনীতির ব্যর্থ কোলাহলকে অতিক্রম করে যায়।

বাংলার নবজাগরণ ও আজকের সংকট

আচারশাসিত সমাজে রামমোহন যুক্তিধর্মিতার একটি প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই স্রোত সমাজের বেশী গভীরে প্রবেশ করেনি। সে কথা ভিন্ন। তার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে' যে রামমোহনকে আমরা পাই, তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকায় নির্ভীক যুক্তিধর্মিতাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর দেশবাসীর জন্য এমন একটি উর্ধ্বলোকে জাগরণ প্রার্থনা করেন, যেখানে চিত্ত

ভয়শূন্য, জ্ঞান মুক্ত এবং যেখানে "বিচারের স্রোতঃপথ" অবলুপ্ত নয় "আচারের মরুবালিরাশি"তে তখন কবির সেই চিন্তার পিছনে আমরা যেন রামমোহনের একটি মূর্তি প্রত্যক্ষ করি। রামমোহন ধর্ম ত্যাগ করেননি। ধর্মের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর জন্ম ; সেই ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার ও পরিশুদ্ধ করে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

আচারের শাসন থেকে বিচারের মুক্তিতে আরোহণই যেমন রামমোহনের বৈশিষ্ট্য, যুক্তিবাদ থেকে অধ্যাত্মবাদে উত্তরণ তেমনই দেবেন্দ্রনাথের চৈতন্যের বিবর্তনে প্রধান ঘটনা। দেবেন্দ্রনাথ গ্রাম্য পরিবেশে শৈশব অতিবাহিত করেননি। পশ্চিমী যুক্তিবাদকে তিনি সহজ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মতনই লাভ করেছিলেন। সেই যুক্তিবাদ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাসী এবং জগতের সামগ্রীকে উপকরণ হিসেবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এই চিন্তা দেবেন্দ্রনাথকে শান্তি দিতে পারেনি।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, সেই অভাব! তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। ...ভাবিলাম, 'প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব ? তবে তো গিয়াছি! ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয় তবে তো গিয়াছি! আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ ?" (শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪৯) যে অধ্যাত্মচিন্তায় দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে শান্তি লাভ করেন তার বিশদ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সেই চিন্তার একটি মূল কথা এই : মানুষ উপকরণ সংগ্রহ করে ও প্রয়োজন মতো তার পুনর্বিন্যাস করে, একে বলা যায় রচনা। রচনা এবং সৃষ্টি এক নয়। মানুষ রচনা করে, ভগবান সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির রহস্য মানুষের অজ্ঞাত। সৃষ্টির রহস্যে বিশ্ব অনন্ত বিস্ময়কর। দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় : "আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি ; তিনি, তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনা কর্তা নহেন...তিনি ইহার সৃষ্টিকর্তা। ...আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহনক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম।" এছাড়া ভগবানের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য দেবেন্দ্রনাথ আরও কিছু যুক্তি ব্যবহার করেন, যেসব বহু পরিমাণে পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্র থেকে গৃহীত, যার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার কিছুটা যে আভাস দেওয়া গেল তার একটা কারণ আছে। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তার আস্বাদ ঠিক এক নয়। সাধারণের সমক্ষে শাস্ত্রের পর্যালোচনা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে রামমোহন সকল মানুষের গ্রাহ্য একটি সাধারণ ধর্মমতে পৌঁছতে চেষ্টা করেছিলেন। রামমোহনের স্বরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতেও যেন তত্ত্বের আধিক্য। তুলনায় দেবেন্দ্রনাথের ভিতর রহস্যানুভূতি ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রাধান্য, যদিও উপনিষদের প্রতি তিনিও শ্রদ্ধাবান। এই পার্থক্য পরবর্তীকালে গুরুত্ব অর্জন করে।

বিপিনচন্দ্র পাল এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন : "রাজা (রামমোহন রায়) একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ...শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্মাধর্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। ...কিন্তু এই স্বানুভূতি প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে স্থাপন করিতে যাইয়া একপ্রকারের শাস্ত্রপ্রামাণ্যও প্রদান করেন।" মূল প্রশ্নটি এই : ধর্ম বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে সেই সংশয়ের নিরাকরণ করবেন কে, কী ভাবে ? ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগে

এই প্রশ্ন উঠেছিল : এ দেশেও অনিবার্যভাবে একই প্রশ্ন দেখা দিল। দুই বিপরীতমুখী উত্তরও পাওয়া গেল। একদল ধর্মকে "শাস্ত্রপ্রামাণ্যে"র ওপর স্থাপন করতে চাইলেন, এ নয় তো সমাজে ঐক্যবন্ধন বলে কিছু থাকবে না। যুগ যুগ সঞ্চিত শাস্ত্রার্জিত জ্ঞানই নির্ভরযোগ্য। আবার কেউ কেউ বললেন যে "স্বানুভূতি"ই বিশ্বাসের ভিত্তি, নয় তো ওটা যথার্থ বিশ্বাসই নয়, অন্যসাধারণের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় মতের মানুষ ছিলেন, অন্তত সেদিকেই ছিল তাঁর ঝোঁক। তাই তিনি লিখেছিলেন "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পসাহিত্যে যেমন ধর্মমতেও তেমনি, যা গোষ্ঠীগত তার মূল্য সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে এটা পরস্পর অনুকরণের সংক্রামতা ছাড়া আর কিছু নয়।"

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রথম মতটিই আমাদের সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে। যাঁরা মনে মনে দ্বিতীয় মতে বিশ্বাসী তাঁরাও বাইরের আচরণে রক্ষণশীল থেকে গেছেন প্রধানত। দেবেন্দ্রনাথ নিজেই এ-ব্যাপারে উদাহরণস্বরূপ। পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ পিতা সম্বন্ধে লিখেছেন : "My father, though an uncompromising enemy of idolatrous worship, was essentially conservative in his instincts." (The Autobiography of Maharshi Debendranath Tagore, tr. by Satyendranath Tagore and Indira Devi, Macmillan, London, p. 16)

ধর্মের তাত্ত্বিক প্রশ্নে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন "চরমপন্থী" : পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপুজোর ব্যাপারে তাঁর বিরোধিতা ছিল অখণ্ড এবং সংশয়হীন। কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রচলিত বর্ণভেদপ্রথার সঙ্গে আপোস করতে তাঁর অসম্মতি ছিল না ; বরং এ-বিষয়ে কেশব সেনের অনমনীয় মনোভাবটাই তাঁর কাছে আপত্তিজনক মনে হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ জানতেন যে, জাতিভেদপ্রথার ওপর আঘাত হিন্দুসমাজ সহ্য করবে না। এ-ব্যাপারে হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করাই তিনি সমীচীন মনে করলেন।

আমাদের ইতিহাসে এই রকম বারবারই হয়েছে। বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। বুদ্ধ থেকে মার্ক্স অবধি অনেকের ডাকেই মানুষ সাড়া দিয়েছে। তারপর বিশাল সমাজের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বিরোধীরা ধীরে ধীরে নেমে এসেছেন নবলব্ধ সত্যের ঊর্ধ্বলোক থেকে প্রচলিত আচারের কঠিন মাটিতে। বিদ্রোহী মন্ত্র অথবা আওয়াজ ত্যাগ না করেও তাঁরা জীবনের আচরণে আপোস করে নিয়েছেন রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে।

২

যে-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করে গত শতকের নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, সেই শ্রেণীটি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তবু দু'একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

উনিশ শতকে যে-ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি এদেশের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত হয়, বলা হয়েছে যে, কেরানী সৃষ্টি করাই ছিল ঐ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। অজস্রবার উচ্চারণের গুণে কথাটা এখন আমাদের কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওটাকে শুধু অর্ধ সত্য বলেই স্বীকার করা সম্ভব, তাও 'কেরানী' শব্দটিকে অনেকটা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে তবে। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো পাঠক্রম ও পুস্তকের তালিকা দ্রুত দেখে নিলেও বোঝা যায় যে, শুধু কেরানী তৈরি করবার জন্য অত সব প্রয়োজন ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে, ইংরেজী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল

উকীল ও ডেপুটি তৈরি করা। অনিবার্যভাবেই অধ্যাপকও হয়েছে। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার।

শাসনযন্ত্রের উচ্চতম পদে সেদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ইংরেজরা। ভারতীয়েরা সেখানে কদাচিৎ প্রবেশ করতে পেরেছেন। বহুদিন অবধি এদেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চাভিলাষীরা জীবনের শেষে ডেপুটির পদটিই কামনা করেছেন।

ডেপুটির সঙ্গে যোগ হল উকীল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থার এঁরা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ হিসেবেও এঁরা সমান উল্লেখযোগ্য। উকীল অথবা আইনজীবী সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতা বোঝা যাবে না। একই সঙ্গে ইংরেজ শাসনযন্ত্র এবং নতুন জমিদারীপ্রথার অত্যাবশ্যক অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন উকীল। ভূমিস্বত্ব আইনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইনজীবীর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। রাজধানীর বাইরেও জেলায় জেলায় প্রধান শহরে আইনজীবীদের আবির্ভাব ঘটল।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি জীবন্ত করে তোলা যাবে। জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট নাগরিক চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ১৯৩২ সালে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন : "বল দেখি তোমরা কে ? কোথা থেকে এসেছ ? ...প্রায় ৫০/৬০ বৎসর আগে এখানে ইংরেজ গভর্নমেন্ট এসে একটা আড্ডা করলেন, একটা শহর তৈরীর মতলবে। এখানে বসলো আফিস, আদালত, পোস্টাফিস, থানা, আরো কত কি ? সঙ্গে সঙ্গে এলো ডেপুটি, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার, কেরানী প্রভৃতি। ...এরা এসেই এদেশী লোকের কাছ থেকে কিছু জমি কিনে বা পত্তন নিয়ে বসলো। ধীরে ধীরে এদেশের লোক মামলা মোকদ্দমা করতে শিখলো আর তাদের টাকায় উকিল, মোক্তার মোটা হতে লাগলো।" নতুন মধ্যবিত্তের বিবর্তনের একটি দিক অল্প কথায় এখানে পরিষ্কার চিত্রিত হয়েছে।

আইনজীবীর ভূমিকার আরও একটি গভীরতর দিক আছে। আধুনিক অর্থে আমরা যাকে আইনের শাসন বলি, সেটা এদেশে গড়ে উঠেছে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে। এই আইনের শাসন ছাড়া গণতন্ত্র অথবা নাগরিক স্বাধীনতা অসম্ভব। আইনের শাসনই যথেষ্ট নয়, কিন্তু নাগরিক স্বাধীনতার জন্য ওটা আবশ্যক। কাজীর বিচার আচারশাসিত সমাজের অঙ্গ। ইংরেজ আমলে আইনজীবী সম্প্রদায় এদেশে এক নতুন ঐতিহ্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে আমাদের বরেণ্য নেতাদের অনেকেই এসেছেন এই আইনজীবীদের ভিতর থেকেই।

এদেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানসিকতায় এবং বাস্তব ভিত্তিতে যেটা অভাবের দিক, অন্তত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকদের চোখে সে-দিকটা গত শতক থেকেই মোটামুটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল।

ম্যাকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল না জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা। কেরী এবং মার্শম্যান কিন্তু উনিশ শতকের গোড়াতেই জোর দিয়েছিলেন জনশিক্ষার ওপর। মাতৃভাষাকে ওঁরা জনশিক্ষার মাধ্যম করে তুলতে চেয়েছিলেন। ওঁরা দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে, অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্ব ওঁদের চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নগর থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানকে ওঁরা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশের নানা প্রান্তে। কিন্তু শিক্ষার এই নতুন আদর্শ সরকারী নীতিতে স্বীকৃত হয়নি।

ফলে উনিশ শতকের নবজাগরণ নগরভিত্তিক রয়ে গেল। নগর ও গ্রামের ভিতর

ব্যবধান আরও দুস্তর হল। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারে নতুন মধ্যবিত্ত অগ্রণী হল না। উনিশ শতকের গোড়ায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর ব্যবসায় বাণিজ্যে একটা ভূমিকা ছিল। ক্রমে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে গেল। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করল যে অবাঙ্গালী সম্প্রদায়, অন্য যে গুণই তার থাক না কেন, নবজাগরণ অথবা নতুন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ তার ছিল না। উনিশ শতকের নবজাগরণ ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফলবান হতে পারল না। এর কারণ বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয় ; কিন্তু ফলাফল হিসেবে আমরা পেয়েছি আজকের সংকট।

ইয়োরোপে নবজাগরণের একটা প্রধান কথা ছিল, বৈষয়িক ক্ষেত্রে মানুষের আত্মবিশ্বাস। শ্রম ও বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর মানুষ তার নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে, সে নিজের ইতিহাস নিজে সৃষ্টি করছে। এইখানে মানুষের বৈশিষ্ট্য, এইখানে তার গৌরব। এই ছিল পশ্চিমী নবজাগরণের বাণী। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য সৃজনশীল ভূমিকা থেকে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত যতই পিছিয়ে এলো ততই ভিতরে ভিতরে তার আত্মবিশ্বাস ভাঙতে লাগল। তুলনায় পাঞ্জাবী ও গুজরাতীর আত্মবিশ্বাস বেশী। তবু বাঙ্গালীর ভিতর যেটা প্রকট, ভারতের মধ্যবিত্তের বৃহত্তর অংশে সেটাই কম বেশী বর্তমান। বাঙ্গালীর সংকট ভারতেরও সংকট। চেতনায় ও বাস্তবে আমরা সবাই একই উপমহাদেশের অধিবাসী।

মধ্যবিত্তকে আশ্রয় করেই যুক্তিধর্মিতার জন্ম ও প্রসার ঘটে। আমাদের মধ্যবিত্তের যুক্তিধর্মিতা ওকালতিবুদ্ধি এবং ডেপুটির সাবধানী মনোবৃত্তিতে পর্যবসিত হল। এর সঙ্গে প্রয়োগধর্মী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হল না। কর্মভিত্তিক নীতিবোধও এদেশের নগরসমাজে গড়ে উঠল না। আমাদের মধ্যবিত্তের উচ্চাশার চূড়া সরকারী শাসনযন্ত্রে, অর্থাৎ আমলাতন্ত্রে, একটি বড় চাকুরি। সৃজনের সুযোগ সেখানে না থাকুক, নিরাপত্তা এবং মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য আছে ; সেটাই আমাদের বৈষয়িক বৃন্দাবন। এতে করে ভিতরে ভিতরে নিজের প্রতি একটা অবজ্ঞাবোধ অবশ্য আটকানো গেল না। কাজেই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিক্ত এবং বিপ্লবাত্মক ধ্বনি উচ্চারণও আমরা সরল বিশ্বাসে আমাদের অভ্যস্ত মন্ত্রতন্ত্রের অঙ্গ করে নিয়েছি।

এই সব লক্ষণ মধ্যবিত্তের সকল অংশের ভিতরই দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে মধ্যবিত্তের একটি প্রধান অংশ, অধ্যাপক সম্প্রদায়কে, ধরা যাক। আজকের অধ্যাপক নিজ বৃত্তিতে বিশ্বাস হারাতে বসেছেন, অর্থাৎ, যে জ্ঞান তিনি পরিবেশন করছেন তার মূল্য সম্বন্ধে অধিকাংশ অধ্যাপক গভীরভাবে সন্দিহান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা তুলনায় কম, কলা বিভাগে স্বাভাবিক কারণেই এই সংশয়বাদী মনোভাবের বিশেষ প্রাবল্য। এই সংশয়বাদিতা অধ্যাপকদের নতুন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে এগিয়ে যাবার শক্তি দিচ্ছে না, বরঞ্চ নিজ কর্তব্যে অবহেলার সপক্ষে একটি দুর্বল যুক্তি যোগাচ্ছে মাত্র।

যে অধ্যাপকেরা সৎ এবং পরিশ্রমী, তাঁরা অন্যের উপহাসের পাত্র হয়ে উঠছেন। কর্মভিত্তিক নীতিবোধ অধ্যাপক সম্প্রদায় নিজ চেষ্টায় গড়ে তুলবেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলবেন, এমন সম্ভাবনা আজ সুদূর পরাহত। শুধু একটি দাবীতে অধ্যাপক সম্প্রদায়ের ভিতর উৎসাহ এবং অবিচলতা দেখা গেছে। আমলাতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যে বেতন পান অধ্যাপকদেরও সেই হারে বেতন দিতে হবে, এটাই তাঁদের বহুদিনের দাবী। মধ্যবিত্তের অন্যান্য অংশের মতোই অধ্যাপকেরাও আমলাতন্ত্রের উচ্চপদের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেইখানে নিজেদের উচ্চাশার পরিমাপ খুঁজেছেন। অথচ

আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান, সঙ্গত কারণেই, কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক আক্রমণের লক্ষ্য। সমালোচনার এই অধিকার নিঃসন্দেহে রক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, অধ্যাপকেরা আমাদের চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান প্রধান সমস্ত রোগেই আক্রান্ত। কথাটা বিশেষভাবে বলতে হল এই জন্যেই যে, তরুণদের কাছে এঁরাই দৃষ্টান্ত। অন্তত চিন্তার ক্ষেত্রে, বিগত শতকের নবজাগরণের প্রধান উত্তরাধিকারী আজকের অধ্যাপক সম্প্রদায়। নতুন চিন্তার আন্দোলন এঁদের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত। আত্মসমালোচনা ছাড়া সেই অন্দোলনকে সমাজের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলবার আজ আর অন্য পথ নেই।

৩

আমাদের মধ্যবিত্তের চেতনায় ওকালতী বুদ্ধির প্রাবল্যের কথা উল্লেখ করেছি। ঐ জাতীয় বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর প্রয়োজন স্বীকার্য। তবে, 'ওকালতী' বুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানসচেতনতা এবং কর্মভিত্তিক নীতিবোধ যোগ হলে তবেই যুক্তিধর্মিতা নিজ স্তরে একটা সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই যোগাযোগের অভাবে, যে জিনিসটা সম্পূর্ণের অংশ হিসেবে একটা বিশেষ মূল্য পেতে পারত, সেটাই আবার বিকৃত হয়ে ওঠে। ওকালতী বুদ্ধির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আইন সম্বন্ধে সচেতনতা আমাদের একটা নৈর্ব্যক্তিক ন্যায়বোধের দিকে এগিয়ে দেয়নি। পরিবারের বাইরে, বৃহত্তর জীবনের নানা কাজে, স্বজন ও অন্যজনকে সমান চোখে দেখবার প্রয়োজন ঘটে। সেই সমদৃষ্টি আমাদের সমাজে বিরল, স্বজনপোষণই প্রচলিত। আইন বিষয়ে সচেতনতা শুধু আমাদের কলহপরায়ণতাকে উৎসাহিত করেছে। এটাই ওকালতী বুদ্ধির বিকৃতি।

আমরা সাম্যবাদ অথবা সমাজতন্ত্রের কথা বলি। কিন্তু এক্ষেত্রেও একই কারণে সেই বিকৃতিই আবার দেখা দিয়েছে। আমরা সমাজকে যা দিই এবং সমাজের কাছ থেকে যা নিই, এ দুয়ের ভিতর একটা সাম্য থাকা উচিত। আমি যা পাচ্ছি তার পরিবর্তে সমমূল্যের কিছু দিচ্ছি কি না, এ প্রশ্নটা জরুরী। এ দেশের মধ্যবিত্ত কিন্তু নিজেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে অভ্যস্ত নয়। নীরদ চৌধুরী, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতিরঞ্জিত ভাষায় লিখেছিলেন যে, কিছু না করে মাইনে পাবার অধিকার, এ দেশের সংবিধানে অলিখিত কিন্তু সর্বস্বীকৃত অধিকার। অতিরঞ্জনের অংশটা বাদ দিলে কথাটায় তবু কিছু সত্য অস্বীকার করা যায় না। অথচ আমরা সাম্যবাদী ! বলা বাহুল্য, আমি এখানে সাম্যবাদী তত্ত্বের কথা বলছি না ; মধ্যবিত্ত চেতনার অপূর্ণতার কথাই বলছি।

আমরা সবাই কিছু না-দিয়ে কিছু পেতে চাই এবং এটাকেই সরকারী সমর্থনে একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করে তুলতে চাই ; কিন্তু সেটা হয় না। মনের একটা অংশে আমরা জানি যে, সেটা হতে পারে না। অন্যের ভিতর, বিশেষত নিজ গোষ্ঠীর বাইরে কারো মধ্যে, এটা দেখলে আমরা কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। কিন্তু এই সমালোচনা সাধারণীকৃত হয়ে আত্মসমালোচনায় পরিণত হয় না। আত্মপ্রতারণাকে কেউ কেউ তত্ত্বকথা দিয়ে সাজান। তাঁদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না-হওয়া অবধি অন্য কিছু আশা করাটাই ভুল। আগে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপর তাঁরা কাজে মনোযোগী হবেন। কর্মভিত্তিক নীতিবোধের অভাবে শুধু ওকালতী বুদ্ধিরই নয়, তত্ত্বেরও বিকৃতি রোধ করা যায় না।

আপৎকালীন ব্যবস্থায় আজকের সংকট একটা বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত সংকটের মুহূর্তটিকে যখন নাটকীয়ভাবে বেছে নিলেন জরুরী অবস্থা জারি করবার জন্য, তখন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে উঠল। তবু মনে রাখা ভালো যে, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণে ইতিহাসের তাৎপর্য ধরা পড়ে না। সেই তাৎপর্যের আলোচনাই যুগের দৃষ্টিতে বেশী জরুরী। আপৎকালীন অবস্থায় একটি প্রবন্ধে যা লিখেছিলাম, আলোচনার সুবিধার জন্য তারই একটি অংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

"With the proclamation of a special state of emergency in India in June 1975, India has come to the end of her liberal era, at least temporarily. The fundamental rights of the citizen now stand suspended. The press in India has been gripped by a fear unknown in recent history .....There is an essential difference between the kind of discipline that is needed in offices and factories and other places of work for material production and the freedom required for the creative work of writers and artists. Such distinctions are easily overlooked when the problem is sought to be solved by political means and administrative fiats. Those in authority have to be extraordinarily discriminating and forbearing or they cannot avoid gross errors of judgement in such matters...In the perspective of history, the emergency is a passing phenomenon. Through it and beyond it loom those larger discords which belong to a whole age and wait patiently to be resolved."

আপৎকালীন, ব্যবস্থাকে একদিন, অনুশাসন পর্ব, আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। জোর পড়েছিল শৃঙ্খলাবোধের ওপর ; 'কথা কম, কাজ বেশী' এই রকম একটা বুলি চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে সরকার শুধু রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদেরই জেলে পাঠাননি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিলেন, বিবেকবান বহু লেখকের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। অর্থাৎ, আমাদের জাতীয় জীবনে কর্মভিত্তিক নীতিবোধের যে-অভাব অনস্বীকার্য, তাকেই সেদিন ব্যবহার করা হয়েছিল আতিশয্য ও জবরদস্তির সপক্ষে মৌলিক যুক্তি হিসেবে।

জরুরী অবস্থার জবরদস্তি আজ শেষ হয়েছে। কিন্তু মূল সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন শেষ হয়নি। রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তিনি বিচারের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। প্রতিটি সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে এই স্বাধীনতার মূল্য ও মূল শর্তগুলি আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই, কারণ এর অভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অনুচ্চারিত থাকে, আর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল ভুল পথে বহু দূর চলে না-যাওয়া পর্যন্ত ভুল বলে কিছু তার চোখে ধরাই পড়ে না। এতে সকলেরই অমঙ্গল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা মূল্যবান, কেন না চতুর্দিকে একটা আতংকের পরিমণ্ডল সৃষ্টি না করে এই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের মনুষ্যত্বেরই ওপর এটা আঘাত। যুক্তি ও বিচারের স্বাধীনতা চাই, কারণ মানুষের ভিতর চৈতন্যের একটা সৃজনশীল দ্বন্দ্ব ক্রমাগত চলছে, যার ভিতর দিয়ে সে এক স্তর থেকে পথ হাতড়ে অন্য স্তরের দিকে পা বাড়ায়। সেই দ্বন্দ্বকে অস্বাভাবিকভাবে অস্বীকার করার চেয়ে বড় ভ্রান্তি কমই আছে। মানুষের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনো বাঁধা সরকারী রাস্তায় কখনও চলে না। নবজাগরণের যদি কোনো বড় শিক্ষা থাকে তবে এই স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করবার শিক্ষা তার অন্যতম।

এই স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও সমাজে কর্মভিত্তিক নীতিবোধ কি করে জাগিয়ে তোলা যায়, এটাই মূল প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিকেই সাম্প্রতিক ইতিহাস আমাদের সামনে একটি বড় প্রশ্ন

হিসেবে তুলে ধরেছে। স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, এটা সহজ প্রশ্ন নয়। তবু এর একটা সমাধান চাই। কারণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমাধানের পথ যদি আমরা খুঁজে বের করতে না পারি, তবে গণতন্ত্র আবারও বিপন্ন হবে, অন্য কোনো নামে অন্য কোনো রূপে। কিন্তু নামরূপে কি এসে যায়!

জরুরী ব্যবস্থাকালীন দ্বিতীয় বহু বিজ্ঞাপিত বিষয় ছিল, 'বিশদফা' কার্যক্রম, অন্তহীন পুনরুক্তির গুণে যেটা অন্তঃসারশূন্য ধ্বনিতে পর্যবসিত হয়েছিল। কিন্তু এর পিছনেও অপরিচ্ছন্নভাবে একটা মূল ভাব ছিল, যেটা মূল্যবান। সেটা হল, নগর ও পল্লীর ভিতর বৈষম্য হ্রাসের চিন্তা।

এ নিয়েও শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন এবং চিন্তার প্রয়োজন থাকবে। পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এর উত্তর খুঁজে নিতে হবে। উনিশ শতকের নবজাগরণ নগরে সীমাবদ্ধ ছিল। সে জন্য তাকে মূল্যহীন মনে করা অবশ্য ভুল। ইতালীর রেনেসাঁসও ছিল নগরভিত্তিক ; তাই বলে তার মূল্য আমরা অস্বীকার করি না। আমাদের নবজাগরণের নেতারা নমস্য। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। প্রধান কথা এই যে, নগর ও পল্লীর ভিতর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন না হলে নবজাগরণের মূল্যবোধগুলি আজ আর রক্ষা পাবে না। একথা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গভীর ও পরিচ্ছন্নভাবে আর কেউ জানতেন না। তাই মহানগরীর ঐ শ্রেষ্ঠ সন্তানটি পল্লীতে তাঁর সাধনার কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কুসংস্কার যেখানে সব চেয়ে অটল, দৈন্য যেখানে সব চেয়ে গভীর, বিজ্ঞান ও যুক্তিধর্মিতাকে সেখানেই আহ্বান করতে হবে, তার প্রয়োগধর্মী রূপে। ভগবানকেই শুধু নয়, বিজ্ঞানকেও গরীবের ঘরে দর্শন দিতে হয় রুটি এবং স্বাস্থ্য হাতে করে। শিক্ষা চাই, ভূমি সংস্কার চাই, চাই গ্রামে গ্রামে ব্যাংক ও বীমার ব্যবস্থা। আর এ সবই চাই বিজ্ঞানের প্রয়োগের পথ সহজ করে তুলবার জন্য। এ শুধু পল্লীকে বাঁচাবার পথ নয়। এছাড়া নাগরিক সংস্কৃতিকেও মুক্ত এবং সার্থক করবার আর কোনো উপায় নেই। পল্লীকে মুক্ত করে তবেই নগর আজ মুক্ত হতে পারে।

এ যদি না হয় তবে মধ্যবিত্তের যুক্তিধর্মিতা দুর্বল, ভঙ্গুর এবং অপূর্ণই থেকে যাবে। আর এই অপূর্ণ যুক্তিধর্মিতার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-অধ্যাত্মচিন্তা, তাও অপূর্ণ। অপরিশুদ্ধ বলেই অপূর্ণ। আমাদের সমাজ ও রাজনীতিতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে যে ভেদাভেদ ও জটিলতা, তার কিছুই এই অপরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় দূর করা যাবে না। আজকের সমাজকে বেঁধে রাখা যাবে না শুধু 'শাস্ত্রপ্রামাণ্য' দিয়ে সেজন্য চাই গঠন ও সংগঠন, চাই শ্রম ও বিজ্ঞান। আজকের অধ্যাত্মচিন্তাকে সেই সেতু রচনা করতে হবে, যার এক প্রান্তে বিজ্ঞান আর অন্য প্রান্তে 'স্বানুভূতি'। উপজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উর্ধ্বে স্বাধীন মানুষের ঐক্যের যে প্রতিষ্ঠাভূমি নবজাগরণের কাম্য ছিল, তাকে লাভ করবার এই পথ।

উনিশশতকী বাংলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা

মধ্যযুগীয় সমাজ ও চেতনার সঙ্গে তুলনায় আধুনিক যুগকে যুক্তিধর্মিতায় অগ্রসর বলা হয়েছে।

কিন্তু যুক্তিরও ক্ষেত্রভেদ ও প্রকারভেদ আছে। যুক্তিকে অখণ্ড ও অবিভাজ্য মনে করলে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

আইনপ্রণয়নে অথবা আধুনিক আমলাতান্ত্রিক সংগঠনে যুক্তির একটা বিশেষ বিকাশ লক্ষ করা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জন্ম ও জাতিগত মর্যাদার বড় স্থান ছিল। আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের নৈর্ব্যক্তিক পদাধিকার সেই তুলনায় অধিকতর যুক্তিধর্মী—যেমন জেলার প্রশাসক ব্রাহ্মণই হন অথবা নীচুজাতই হন, তাঁর পদাধিকারের তাতে ইতর বিশেষ হয় না। নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধির বিচারে এটা প্রগতির একটা ধাপ। বাণিজ্যে অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে দেখি যুক্তির অপর এক প্রকাশ। আর্থিক লাভক্ষতির গণনায় একপ্রকার যুক্তি আছে একথা স্বীকার্য। আবার বিজ্ঞানে অথবা প্রকৃতিপাঠেও লক্ষণীয় যুক্তির উল্লেখযোগ্য জয়যাত্রা।

এই যে বিভিন্ন রকমের যুক্তিপ্রবণতা, এদের ভিতর ঐতিহাসিক সূত্রে কোনো দৃঢ় এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অনুমান করে নেওয়া অনুচিত। বৃহৎ সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠান ও আইনপ্রণয়নে যে-জাতীয় যুক্তিধর্মিতা আছে তার একটা বড় রকমের বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন রোমক যুগে। অথচ বিজ্ঞানচর্চায় সে-যুগের কীর্তি তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বরং পূর্ববর্তী গ্রীক যুগ গণিতে ও বিজ্ঞানে এবং দর্শনে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে অধিকতর ভাস্বর। এটাও দেখানো কঠিন নয় যে, প্রশাসনিক যুক্তি এবং ব্যবসায়িক যুক্তির ভিতর কোনো অঙ্গাঙ্গি যোগ নেই। কোনো যুগে অথবা কোনো সম্প্রদায়ে নিয়মতন্ত্রী বুদ্ধির প্রাবল্য দেখা দিলেই যে মানুষের এক অবিভাজ্য যুক্তিপ্রবণতা সেই যুগমানসকে ব্যবসায়ী অথবা প্রযুক্তিসন্ধানী বুদ্ধির দিকে এগিয়ে দেবেই, এমন কথা বলা যায় না।

শাস্ত্রের ভয় ও বাঁধাধরার বন্ধন মানুষের চেতনায় যে অসাড়তার সৃষ্টি করে তাকে অতিক্রম ক'রে সুখের অথবা আনন্দের সন্ধানে যুক্তির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মানুষের ভিতর যে-শক্তি তাকে চেতনার স্তর থেকে স্তরান্তরে নিয়ে যায় সেই শক্তিকে পরিপূর্ণত যুক্তি নাম দেওয়া চলে কিনা সেটা অবশ্য ভিন্ন ও গভীরতর প্রশ্ন। তবে যুক্তিকে অস্বীকার করলে প্রাচীনের বন্ধনমোচন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যুক্তির আলোর প্রয়োজন আছে আনন্দের সন্ধানেও। এই যুক্তি কখনও ধর্মসমালোচনার রূপ নেয়, কখনও নতুন অধ্যাত্মচিন্তার পথ খুলে দেয়।

ব্যবসায়ে অথবা নিয়মতন্ত্রে যে-যুক্তিকে আমরা পাই তার সঙ্গে বিশুদ্ধ আনন্দসন্ধানী বুদ্ধির কোনো অচ্ছেদ্য ঐক্য নেই। বরং এদের ভিতর যুগবিশেষে বিরোধী সম্পর্কও লক্ষ করা যায়। আনন্দসন্ধানী বুদ্ধিকেই যিনি উত্তম বলে জানেন তিনি অবশ্য বলবেন যে, যুক্তির অপরাপর যে-সব রূপ ও পরিচয় আমরা পাই সে সবই মেকী। এ কথাটাকে হয়তো বিশেষ কোনো দর্শনের জোরে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণে এতে কাজ চলে না।

ইতিহাসে যুক্তি দেখা দেয় নানা খণ্ডিত ও বিচিত্র রূপে। যে-মানুষ সমাজের মাঝে

দাঁড়িয়ে পথ খুঁজে নিতে চায়, একটা গঠিত জীবনযাত্রা এবং ইতিহাসের ভিতর থেকেই তার পরিপার্শ্বকে সে বিচার করে। অতএব সেই অতীতকে যখন সে অতিক্রম করতে চায় তখনও ভবিষ্যতের ওপর অতীতের ছায়া এসে পড়ে। ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কোনো গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায় যে-খণ্ডিত যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাতে একই সঙ্গে থাকে বর্তমানের প্রান্তস্পর্শী পশ্চাৎকালের অন্তরঙ্গ পরিচয়, আবার সম্মুখের কর্মকাণ্ড তথা নতুন সমস্যার আভাস।

এইভাবে প্রতিযুগই নিজের দ্বারা নিজে অন্তত কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ। আবার প্রতিযুগকেই সেই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ব্যবসায়িক যুক্তি ও নিয়মতন্ত্রী যুক্তি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও আনন্দসন্ধানী বুদ্ধি, এসবের ভিতর একটা সামঞ্জস্য সমাজ ও জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন। কাঙ্খিত সামঞ্জস্যের প্রকৃতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। বাস্তবে একে কখনও পুরোপুরি লাভ করা যায় না। যুক্তির প্রতিটি কাঠামোর একটা নিজস্ব জাড্যগুণ আছে ; তা থেকে ভেঙ্গে বেরোবার জন্য একটা বিশেষ শক্তির প্রয়োজন হয়। কোনো একদিকে আতিশয্য, অন্য কোনো দিকে অপূর্ণতা, প্রতিযুগের নিজস্ব পরিচয় বহন করে। এরই ভিতর দিয়ে যুগের বিচার হয়, ভবিষ্যতের নতুন লক্ষ্য আকার ধারণ করে।

মুখবন্ধে এই ক'টি তাত্ত্বিক কথার উপস্থাপন করা গেল। এবার বাংলার উনিশশতকী রেনেসাঁস অথবা নবজাগরণের আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিকার দুয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আসা যাক।

॥ ১ ॥

বাঙালী হিন্দুসমাজে উঁচু জাত বলতে আমরা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থকেই বুঝি। নবশাখ ও বণিক এই সমাজে উঁচু জাতের ভিতর গণ্য হয় না। ভারতের সর্বত্র জাতিবিচার একপ্রকার নয়। এই তারতম্যের সামাজিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকাই স্বাভাবিক। সে সবের ভিতর যাওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বাঙালী, বিশেষত কলকাতাবাসী, উচ্চজাতের হিন্দুসমাজ থেকে উনিশশতকী নবজাগরণের উদ্ভব। ঐ স্তরের কিছু লোক আঠার শতকের দ্বিতীয় ভাগে ইংরেজের সঙ্গে অল্পবেশী যুক্ত হয়। অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা দেখি যে, সেই সময়ে ব্যবসায়িক জগতে, কিছুকালের জন্য হলেও, এরা অনেকটা প্রাগ্রসর স্থান লাভ করে। কিন্তু অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন ঘটে। উনিশ শতকে দেখি বাঙালী উঁচুজাতের হিন্দুর ব্যবসায়ে সেই স্থান আর নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, উঁচুজাতের বাঙালী হিন্দুরা ব্যবসায় ত্যাগ করলেন কেন আর ত্যাগ করে গেলেন কোথায়?[৩]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসে, তারপর আঠার শতকের শেষ ভাগে ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে এবং উনিশ শতকে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আসে নতুন ধরনের আইন আদালত, বৃদ্ধিলাভ করে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা, গড়ে ওঠে নতুন প্রশাসনযন্ত্র। এইসঙ্গে উঁচুজাতের হিন্দু বাঙালীর সামনে উন্নতির নতুন পথ ও সুযোগ দেখা যায়। জমিদারি থেকে অর্থাগমের একটা পথ খুলে গিয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে। তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু যোগ করতে চেয়েছে কলকাতায় ও অন্যত্র নাগরিক একটা বিশেষ

প্রতিষ্ঠা। এই নাগরিক প্রতিষ্ঠা দুই ভিন্ন পথে হওয়া সম্ভব : এক, ব্যবসায়ের মাধ্যমে আর দ্বিতীয়ত, সরকারী আইন আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন ব্যবস্থায় চাকুরীর পথে। এই দ্বিতীয় পথটাই উঁচুজাতের হিন্দুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। এর নানা কারণ ছিল।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে যে-সব শিল্প উনিশ শতকে প্রধান হয়ে উঠেছিল, যেমন চা অথবা পাট, তার নির্ভর ছিল বৈদেশিক বাজারের ওপর। ফলে, এইসব শিল্পে কর্তৃত্বলাভ বিদেশী বণিকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। পশ্চিম দিকে, বোম্বাইকে কেন্দ্র করে, কাপড়ের কলে অবস্থাটা ছিল ভিন্ন। সেখানে বাজার অনেক পরিমাণে স্বদেশী। ফলে ভারতীয় পুঁজি নিয়োগের ওখানে সুবিধা ছিল বেশী। গুজরাতী পারসীরা সেখানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে।

উঁচুজাতের হিন্দুরা মুসলমান আমলেও প্রশাসনে একটা বড় স্থান অধিকার করেছিল। এক সাম্রাজ্য ভাঙা এবং অন্য সাম্রাজ্য গড়ার মধ্যকালীন সময়ে যদিও কিছুদিনের জন্য ইংরেজ বণিকদের অংশীদার হয়ে তারা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবু তাদের জীবনযাত্রা ও মানসিক প্রবণতা বেশীদিন সেখানে তাদের থাকতে দেয়নি। জমিদারী মেজাজ আর শিল্পপতির প্রয়োজনের ভিতর কিছু কিছু বড় পার্থক্য থাকে। বিশেষত গোড়ার যুগের শিল্পপতিদের শুধু ভোগী এবং বিদ্যোৎসাহী হলেই চলে না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভিতর নতুন পথে এগোবার আর বড় কাজ হাতে নেবার মতো শক্তি ও কল্পনা ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি ছিলেন আদতে রাজসিক ও ভোগী। একদিকে যেমন তিনি বড় ব্যবসায় গড়ে তোলেন অন্য দিকে তেমনি মৃত্যুর সময় বিপুল দেনা রেখে যান, যার ভার বহন করতে হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথকে।

বাণিজ্যের উত্থানপতন, নিত্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অনিশ্চয়তার চেয়ে প্রশাসনিক পদের স্থায়িত্ব অথবা আইনজীবী ও শিক্ষাবিদের নিরুপদ্রব মর্যাদা ও সংস্কৃত জীবনযাত্রা উচ্চবর্ণের হিন্দুর কাছে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। প্রসন্নকুমার একসময়ে ব্যবসায়ে বিপদের সম্মুখীন হন। যে-হেতু ইংরেজী ভাষা ও আইনশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল কাজেই তাঁর সামনে একটি বিকল্প পথ খোলা ছিল। ব্যবসায় থেকে সরে গিয়ে তিনি অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন আইনের ক্ষেত্রে। পরবর্তীকালে জমিদারির সঙ্গে আইনচর্চা অথবা প্রশাসনিক চাকুরীর সংযোগটাই জীবিকার সুগম পথ হিসেবে উচ্চাকাঙ্খী বাঙালীরা নিজেদের ও পুত্রদের জন্য গোড়া থেকেই বেছে নিতেন সচরাচর। ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শুধু কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, বিহার থেকে সুদূর পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বাঙালীরা নতুন শিক্ষাধারার অগ্রদূত হিসেবে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

জীবিকার এই সব পথ বহুদিন পর্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে একরকম বন্ধ ছিল বলা চলে। এর প্রধান কারণ সাংস্কৃতিক বা শিক্ষাগত। হিসেবে দেখা যায় যে, ১৮৮৩-৮৪ সালে, অর্থাৎ রামমোহনের মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও, বাংলাদেশের কলেজসমূহে মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা পঁচানব্বই ভাগই ছিল হিন্দু আর এই হিন্দু ছাত্রদের ভিতর শতকরা পঁচাশি ভাগই ছিল উচ্চবর্ণের। এর পর তৎকালে সরকারী চাকুরীতে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর সংখ্যাল্পতায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

উচ্চবর্ণের হিন্দুরা উনিশ শতকে, এমন কি বিশ শতকের গোড়াতেও, কেন শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হয়নি, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হিসেবে বলা হয়ে

থাকে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে জমির মালিকানাই অপেক্ষাকৃত লাভজনক ছিল। কিন্তু এই উত্তরটা সম্ভবত যথেষ্ট নয়। প্রশ্নটা এই নয় যে, বাঙালী নব্য মধ্যবিত্তগণ জমিদারির প্রতি আকৃষ্ট হল কেন। জমিদারির সঙ্গে শিল্প অথবা ব্যবসায় যোগ করা যায়, যেমন যোগ করা যায় ওকালতি অথবা সরকারী চাকুরী। প্রশ্নটা এই যে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই দ্বিতীয় সংযোগটাই বেছে নিল কেন? জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির ভাগবণ্টনের ফলে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই মধ্যবিত্ত পরিবারের জমি থেকে আয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কমতে থাকে। কিন্তু চাকুরীকে আঁকড়ে ধরার প্রবৃত্তি অথবা অভ্যাস ততদিনে দুর্মর হয়ে উঠেছে। অথচ কিছু অবাঙালী তো বটেই, নিম্নবর্ণের বাঙালী হিন্দুদের ভিতরও কোনো কোনো সম্প্রদায় ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নিজেদের জীবিকার উপায় করেছে। তাদের সামনে অন্যপথ বড় বেশী ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায়, পথ বেছে নেবার সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, উচ্চবর্ণের হিন্দুর সামনে শহরে সরকারী চাকুরীর অন্যপথ খুলে গিয়েছিল। যদি তা না হত, যদি কোনো কারণে ঐ পথটি হিন্দুর কাছে বন্ধ এবং মুসলমানের কাছেই উন্মুক্ত হত, তবে সেই কল্পিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উচ্চবর্ণের হিন্দুকেও সম্ভবত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই আরও উদ্যোগী দেখা যেত। বাঙালী মুসলমান যে সেইদিকে অগ্রসর হয়নি তার অন্তত আংশিক কারণ তৎকালীন মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভাব। যাই হোক কল্পিত ইতিহাস নিয়ে অনুমানের চেষ্টা বেশীদূর না করাই ভালো। বাস্তব পরিস্থিতিতে উচ্চবর্ণের হিন্দু যে-পথ বেছে নিয়েছে, যে-যুক্তির অনুসরণ করেছে, সেটাই আলোচ্য। এই পথনির্বাচন বিশুদ্ধ আর্থিক গণনা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ হিন্দুর বংশানুক্রমিক যে-ঐতিহ্য, বিভিন্ন বৃত্তি ও পদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে তাদের যা ধারণা, সেদিনের ইতিহাসে তাদের সাংস্কৃতিক যে-অভিলাষ বা দিগন্তবোধ, এই সব মিলেই তাদের চলবার পথও নির্দিষ্ট হয়েছিল।

যে-নাগরিক সম্প্রদায়ে উনিশশতকী নবজাগরণের উদ্ভব তার আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা বলা গেল। এবার সেই নবজাগরণের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা আবশ্যক।

২

হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মের নবমূল্যায়ন উনিশশতকী নবজাগরণের প্রথম পর্বের একটা মূল বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ, অথবা ধর্মের সত্যকে নব উপলব্ধির দ্বারা নতুন রূপে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা, অবশ্য পূর্বেও ঘটেছে। বর্ণভেদ ও আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বারবার দেখা দিয়েছে। বুদ্ধ এবং চৈতন্যের মতো প্রচারকেরা সম্যক্ জ্ঞান এবং ভক্তি অথবা প্রীতিকে ধর্মের সারবস্তু বলে চিনেছেন ও চিনিয়েছেন।

তবু উনিশশতকী নবজাগরণে ধর্মের নবমূল্যায়নের যে-প্রচেষ্টা তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিদেশী বণিক ও ধর্মযাজক যখন এদেশের মাটিতে দলে দলে উপস্থিত হল তখন বিশ্বজগৎ এবং অপরাপর ধর্মমত ও ধর্মসমালোচনা আমাদের চৈতন্যের কাছে এমন একটা চমক এমন কি আঘাত পৌঁছে দিল যাতে ঐতিহাসিক নতুনত্ব ছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা পাই রামমোহনের মত চিন্তার নেতাদের কাছ থেকে ধর্মের যুক্তিবাদী পর্যালোচনা। রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম যত্নের সঙ্গে পাঠ করে দেখলেন যে, বিভিন্ন

ধর্মের ভিতর কিছু বৈসাদৃশ্য আছে আবার সাদৃশ্যও আছে। তিনি বললেন যে, ধর্মের যেটা মূল সত্য, যেটা সর্বমানবের, সেখানেই বিভিন্ন ধর্মের ভিতর সাদৃশ্য ; আর ধর্মের যে-অংশটা আচার ও অন্ধবিশ্বাসকে নিয়ে, সেখানেই দেখা যায় পরস্পর বিরোধ। এই যে নানা দেশের মানুষ ও তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ চেতনা ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিচার আর সেই সঙ্গে যুক্তির ভিত্তিতে একটা সর্বমানবীয় সত্যের দিকে অগ্রসর হবার আকাঙ্খা, এতে আধুনিক যুগের একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের ধর্মচিন্তার অবশ্য অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। আধুনিক বিজ্ঞান যতই মানুষকে জড় প্রকৃতির অংশ হিসেবে ব্যাখ্যা করে ততই মানুষের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন একটা নতুন রূপে উপস্থিত হয়। প্রকৃতির নিয়মবদ্ধতা আর মানুষের আন্তরিক মুক্তির কামনা এ'দুয়ের ভিতর কি করে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়, এই অনুসন্ধান দেবেন্দ্রনাথের ভিতর একটা ব্যক্তিগত আকুলতা নিয়ে দেখা দেয়।

উনিশশতকী নবজাগরণে ধর্মজিজ্ঞাসার সঙ্গে সমাজসংস্কারের যোগ হয়। দু'টি মূল প্রশ্ন অনেকখানি আলোড়ন সৃষ্টি করে : প্রথমটি নারীর স্বাধীনতা নিয়ে, দ্বিতীয়টি ব্রাহ্মণের অগ্রাধিকার ও জাতিভেদসংক্রান্ত। সতীদাহনিবারণ ও বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির ভূমিকা সবাই জানেন। নারীর শিক্ষালাভের অধিকার সাধারণভাবে শুধু উদারপন্থীরাই নয় রক্ষণশীলদের ভিতরও অনেকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘরের বাইরে যে বৃহৎ ও বিচিত্র জগৎ সেখানে নারী স্বাধীনভাবে নিজের স্থান বেছে নিতে পারবে কি না, এটা ছিল বিতর্কিত বিষয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভিতরও এ ব্যাপারে মতের গভীর ও তীব্র পার্থক্য ছিল, পিতাপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের ভিতর যার প্রতিফলন সুপরিচিত। এ কথা স্বীকার্য যে, নারীর এই স্বাধীনতার অধিকার বৃহত্তর সমাজ মেনে নিতে পারেনি। জাতিভেদের ক্ষেত্রেও রক্ষণশীলেরাই দলে ভারী ছিল। কিন্তু এই প্রশ্ন নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও বিতর্ক, উনিশশতকী নবজাগরণের কাছে এইজন্য আমরা ঋণী।

এক শতকের ভিতর বাংলাসাহিত্যে যে বহুমুখী পরিবর্তন দেখা যায় সেটা চমকপ্রদ। ধর্ম ও সমাজসংস্কার নিয়ে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের যুগে যে বিতর্ক তারই ভিতর দিয়ে আধুনিক বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধসাহিত্যের সূত্রপাত। এ জাতীয় জিনিস পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ছিল না। সেই সঙ্গে দেখা দেয় তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতিকে একটু দূরত্ব রেখে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখবার বিশেষ মানসিকতা এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন। প্রবন্ধে, প্রহসনে, নাটকে পাওয়া যায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ।[৫] দেবদেবীর স্তুতি ও মাহাত্ম্যকীর্তনের একটা আবরণ অন্তত রক্ষা করতে এতদিন অভ্যস্ত ছিল বাংলা সাহিত্য, তা নইলে কাব্যে মঙ্গল কোথায়, স্থায়িত্ব কোথায় ? এবার সেই আবরণ পরিত্যক্ত হল, মানুষ ও সমাজকে আপন মর্যাদায় সাহিত্যের বিষয়বস্তুরূপে সরাসরি গ্রহণ করা হল, বাংলা উপন্যাসের জন্ম হল। পুরাণ ও মহাকাব্যের চরিত্রগুলি ফিরে এলো নতুন যুগ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে আধুনিক অর্থ ও ব্যঞ্জনা বহন করে, মধুসূদনের কাব্যে যার উদাহরণ। এই সবের ভিতর দিয়ে আরও দৃঢ় একটি পরিবর্তন সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। পুরনো ঐতিহ্যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ও পরিস্থিতির বর্ণনার জন্য কিছু গৃহীত উপমা ও বাক্যাংশ ছিল, যার যথাযথ ব্যবহার লেখকের কারিগরিতে প্রধান হয়ে উঠত। যেহেতু নতুন যুগের সার্থক লেখকের উদ্দেশ্য শুধু ঐতিহ্যকে ভাষা দেওয়াই নয় বরং একটা ভিন্ন ও বহুপরিমাণে ব্যক্তিগত ভাবনাকে মূর্তিদান করা, অতএব নতুন শব্দ ও রচনাশৈলীর সচেতন

সাধনা কাব্য ও সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হয়ে উঠল। ব্যক্তির মূল্য, অথবা রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যিকের চিত্রাঙ্কনে ও অনুভূতিতে একটা বিশেষ মূল্যলাভ করল। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, বিশেষত নারীর চরিত্রচিত্রণে, এটা পরিস্ফুট। সাহিত্যে নবজাগরণের আর একটি সার কথা এই যে, বাংলাসাহিত্য এবার বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হল। বিশ্বসাহিত্যের দিকে মনের একটা জানালা খোলা রাখা, বাইরের সেই প্রভাবকে নিজের মনে গ্রহণ করে তাকে ক্রমাগত নতুন শিল্পবস্তুতে পরিণত করা, সাহিত্যিকের স্বধর্মের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হল।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগের সঙ্গে শেষভাগের সুরের একটা অমিল অবশ্য অনেকেই লক্ষ করেছেন। রামমোহন ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কৃত করেন উপনিষদের যুগের আলোতে। পরে গীতা প্রাধান্য লাভ করে, শিবাজী ও রাণা প্রতাপ কাব্যে ও রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ করেন। স্বাদেশিকতার অভ্যুত্থান ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে সমাজসমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিস্তুতিও লেখক ও বুদ্ধিজীবীর কর্তব্যের অংশ হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ প্রেমেরও তাঁর সীমা ছিল না। সাহসে ও সহানুভূতিতে তাঁর স্বাদেশিকতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম অথবা শাস্ত্রের মাহাত্ম্যপ্রচার তিনি আবশ্যক মনে করেননি। বরং ইংরেজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে দেশীয় পণ্ডিত ও চিন্তকেরা মুক্তমনে এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রের সমালোচনা করবেন, দেশের উন্নতির জন্য এই রকমই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। যতদিনে আমরা বিবেকানন্দের যুগে এসে পৌঁছই ততদিনে দেশের রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীর চিত্তপ্রবৃত্তি দুয়েরই অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু যে যুক্তিধর্মিতাকে নিয়ে উনিশশতকী নবজাগরণের শুরু তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য দেখিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে পুরানো যুগের কৃষ্ণমাহাত্ম্যকীর্তনের কত তফাৎ! বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য যুক্তিধর্মী রচনাশৈলীর উজ্জ্বল উদাহরণ। কঁৎ ও সেই যুগের বাস্তবাশ্রয়ী চিন্তাধারা বঙ্কিমমানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তৎকালীন প্রাগ্রসর দর্শনকে অস্বীকার করে নয়, বরং একপ্রকারে তাকে আত্মসাৎ করেই, বঙ্কিম তাঁর অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল চিন্তাভাবনাকে সাজাতে চেষ্টা করেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সংযোগ প্রশ্নাতীত। তবে মানুষের চেতনার বিবর্তনে অবিশ্বাসেরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে, একথা তিনি জানতেন। তিনিও আধুনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত। স্বাজাত্যের সঙ্গে মিশিয়ে মানবতাবাদকে তিনি পরালেন অন্য এক বেশ, দরিদ্রনারায়ণের সেবা।

উনিশশতকী নবজাগরণ একদিন ধর্ম ও সমাজসংস্কার, শিল্প ও সাহিত্য, সবকিছুকে ব্যাপ্ত করে শুরু হয়েছিল। ধর্ম ও সমাজসংস্কারে তার প্রভাব তেমন গভীর হয়নি, তবে ভারতের অন্যান্য বহু অংশের তুলনায় জাতিভেদ ও ধর্মান্ধতা এখনও বাঙ্গালীদের ভিতর তেমন কট্টর ও প্রবল নয়। অবশ্য অন্য কারণও আছে। নবজাগরণের স্থায়ী প্রভাব পড়েছিল বাঙ্গালীর সাহিত্যে। এবং মূল্যবোধে, বুদ্ধিমুক্তির মূল্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতায়। এই মূল্যবোধও আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরাজিত হয়নি। বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন এই শতকের প্রথমভাগে পূর্ববাংলার মুসলমান চিন্তানায়কদের একাংশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই আন্দোলনের একটি ধারা সংকটের ভিতর দিয়ে আজও, বিশেষত কবি লেখকদের ভিতর দিয়ে, বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

অর্থাৎ, উনিশশতকী নবজাগরণ প্রধানত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত হলেও, সেই সামাজিক সীমার দ্বারা বহু পরিমাণে খণ্ডিত ও বিকৃত হলেও, তার ভিতর একটা মূল্যাশ্রয়িতা ও অসামান্যতা ছিল। বাঙালীর যদি আজ কোনো বিশেষ পরিচয় থাকে তো উনিশশতকী নবজাগরণকে অনুক্ত রেখে সেই পরিচয় উচ্চারণ করা যায় না।

তবু যে বাঙালী মধ্যবিত্তের একাংশ সেই নবজাগরণকে অবজ্ঞা করতে চাইছে, তার অবমূল্যায়নের চেষ্টা করছে, তারও নিশ্চয়ই কারণ আছে। মোটাভাবে বলতে গেলে কারণটা সম্ভবত এই রকম। নবজাগরণ সত্ত্বেও বাংলার দুরবস্থা ঘোচেনি, আর্থিক সংকট থেকেই গেছে। বাংলার কৃষক দারিদ্র্য ও অত্যাচারে পীড়িত ; শিক্ষিত যুবকদের ভিতর বেকারী ব্যাপক ; বাংলার অর্থনীতি দ্রুত উন্নয়নের গতি লাভ করেনি। এসব কথা স্বীকার্য। কিন্তু প্রশ্ন তবু থেকে যায়।

আরও কয়েক শতাব্দী আগে, অর্থাৎ পনের শতকে, ইতালীর বিখ্যাত রেনেসাঁসের কথা আমরা জানি। সেই রেনেসাঁসের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়ে থাকে। মনে রাখা ভালো, ইতালীর আর্থিক সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান সেদিন হয়নি। বরং বিশ শতকের গোড়াতেও ইতালী আর্থিক দৃষ্টিতে ইয়োরোপের পশ্চাৎপদ দেশের ভিতরই গণ্য ছিল। পনের শতকের নবজাগরণও শহরকেন্দ্রিক ছিল। ইতালীর দরিদ্র চাষী তারপরও দরিদ্রই থেকে গেছে। তবু যে সেই নবজাগরণের একটা মূল্য স্বীকার করা হয়েছে তারও তো একটা কারণ আছে।

আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রেনেসাঁস একটা নতুন চেতনা যোগ করেছিল। মানুষ যে সমাজে কোনো একটি পূর্বনির্দিষ্ট স্থান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, ব্যক্তি-মানুষ যে বিচিত্র সম্ভাবনাকে বহন করে আনে এবং নানা অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার ভিতর দিয়ে একটি নিজস্বতা ও অনন্যতা লাভ করে, এই অনন্যতার যে একটি বিশেষ মূল্য আছে, মানুষের সৃজনীশক্তি ও স্বাধীনতার অর্থ উদ্ঘাটনে এই মূল্যবোধ যে একান্ত প্রয়োজন, আবার প্রতিটি ব্যক্তি এই অর্থে বিশেষ হয়েও যে বিশ্বমানবের সঙ্গে মানুষের অধিকারে যুক্ত, এই রকম কয়েকটি কথা রেনেসাঁসের মূল বাণী হয়ে আছে। সমাজ ও চেতনার অভিব্যক্তির কোনো একটি স্তরে এই কথাগুলি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হলে একটা বড় অভাব থেকে যায়। সমাজের সমস্ত সমস্যার এতে সমাধান হয় না, বরং বহু সমস্যা এরপরও থেকে যায়। তবু নবজাগরণের আধারে বিধৃত এই বিশেষ মূল্যবোধের একটা স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে, কারণ এছাড়া বিশ্বমানবের সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ। এ ব্যাপারে আমাদের মনে একটা শ্রদ্ধা রাখাই ভালো। কোনো সমাজের আর্থিক অভাব পূর্ণ হলেই তার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে না। সে জন্য একটা বিশেষ ঐতিহ্য চাই। রেনেসাঁস সেই ঐতিহ্যের নির্মাণে মহান সহায়ক, অতএব শ্রদ্ধেয়। তার কাছ থেকে কতটা আশা করা যায় আর কতটা যায় না, এ বিষয়ে সজাগ থেকেও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রক্ষা করা সম্ভব। ইতালীয় রেনেসাঁস ও বাংলার নবজাগরণের ভিতর, বলা বাহুল্য, দেশকালের ব্যবধানে নানা পার্থক্য আছে। কিন্তু আধুনিক বাংলার বিবর্তমান ঐতিহ্যে রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র এবং আরও অনেকে মানবতাবোধ ও বুদ্ধিমুক্তির সমন্বিত যে আদর্শ যোগ করে গেছেন তাকে মূল্য না দিলে অকারণে আমাদের সাংস্কৃতিক

উত্তরাধিকারকে দরিদ্র করা হবে।

ইয়োরোপে পনের শতকের নবজাগরণের পর এসেছিল পিউরিটান আন্দোলন। মেজাজে সেটাকে বলা যেতে পারে রেনেসাঁসের অনেকটা বিপরীত। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সেটা বিপদ ঘটায়। কিন্তু এ রকম খণ্ড খণ্ড করে দেখলেও বিচার অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মধুর জিনিসটা ভালো, তবু লবণ ও কিছুটা তিক্তেরও প্রয়োজন আছে, যদিও মনে হতে পারে শেষের দু'টি প্রথমটির বিপরীত। মাত্রা রক্ষা করাটাই প্রধান কথা। ইয়োরোপের নাগরিক জীবন ঐ আপাত বিপরীতের প্রভাবেই গঠিত হয়েছিল। বাংলার উনিশশতকী নবজাগরণের ইতিহাসেও এর খানিকটা প্রতিতুলনা পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ যে-ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন তাতে 'পিউরিটান' ভাবধারার বিশেষ স্থান ছিল।[৬] আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এমন কি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কিছু পরিমাণে এর প্রভাব দেখা যায়, যদিও রবীন্দ্রনাথ মূলত অন্যভাবের ভাবুক। দ্বারকানাথের জীবনে ভোগের যে আতিশয্য ছিল অথবা দীনবন্ধু মিত্রের লেখায় উনিশশতকী কলকাতার যে সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়, তার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ প্রত্যাশিত। দেবেন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন নিরলস অধ্যবসায় ও আত্মসংযমের ওপর। তবে যে-বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যোগাযোগে এই শিক্ষা বড় আকারে ফলপ্রসূ হতে পারত সেই অবস্থা সেদিন দেশে ছিল না।

সামাজিক যে আধারে উনিশশতকী বাঙলা নবজাগরণের জন্ম ও বৃদ্ধি তার অপর একটি পরিণাম এই সঙ্গে উল্লেখ্য। ভারতের পশ্চিম উপকূলে নবজাগরণের যাঁরা নেতা তাঁদের ভিতর অনেকেই একটি কথার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক অথবা বৌদ্ধিক আন্দোলনের সঙ্গে সামাজিক আন্দোলন ও গঠনমূলক কাজের একটা সমন্বয় ও পরিপূরকতা থাকা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে অন্যান্য সব কিছু ছাড়িয়ে রাজনীতিটাই ক্রমশ বড় হয়ে উঠল। এই 'পলিটিক্স-প্রমত্ত'তার বিপদ রবীন্দ্রনাথকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তিনি দেখেছিলেন যে বাংলার নবজাগরণ তার কল্যাণবুদ্ধি হারিয়ে ক্রমে দলাদলি ও উত্তেজনাব শিকার হয়ে পড়ছে।

নবজাগরণের আরো একটি দুর্বলতা রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে বুঝেছিলেন এদেশের স্মরণীয়দের ভিতর তার তুলনা পাওয়া কঠিন। তিনি বুঝেছিলেন যে, গ্রামবাংলায় যদি না নতুন জীবন সৃষ্টি করা যায় তবে বাংলার সার্থক নবজীবন সম্ভব নয়। অতএব কলকাতার নাগরিক নিবাস ত্যাগ করে বীরভূমের পল্লী অঞ্চলে তিনি তাঁর কর্মকেন্দ্র বেছে নেন। নবজাগরণের উৎপত্তি অনিবার্যভাবে নগরে। কিন্তু নগর থেকে পল্লীতে যদি তার ব্যাপ্তি না ঘটে তবে তার ক্ষয় অনিবার্য।

কথাটা উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রেনেসাঁসের যুক্তি ও প্রাণবস্তু মূলত আনন্দধর্মী। উনিশ শতকের বাংলায় এই আনন্দধর্মী জীবনদর্শনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের বুদ্ধি। এই যোগাযোগে সামাজিক সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা যতদিন স্বল্পলোকের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন বড় কোনো সমস্যা দেখা দেয়নি। উনিশ শতকের শেষভাগে মুসলমানদের ভিতরও ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হল। ক্রমে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী, হিন্দু মুসলমান ইংরেজী শিক্ষিতদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে চলল। ফলে সরকারী চাকুরী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। সীমাবদ্ধ শহুরে চাকুরীর জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশ সামাজিক জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করে তুলল। এরই অন্যতম পরিণাম, নাগরিক মধ্যবিত্তদের ভিতর বিশ শতকের গোড়ায় চরমপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রাদুর্ভাব। প্রাগ্রসর ও অনগ্রসর গোষ্ঠী

সম্প্রদায়ের ভিতর চাকুরী নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব, আমাদের সমাজে সেই থেকে একটি দুষ্ট ক্ষতের মতো আজও জেগে আছে।

রবীন্দ্রনাথ রেনেসাঁসের সন্তান। তাঁর অন্তরতম প্রেরণাটি আনন্দধর্মী। কিন্তু তিনি এটা স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে, এই আনন্দধর্মী বুদ্ধিকে রক্ষা করা যাবে না একান্ত নাগরিক সীমানায়, সরকারী চাকুরীজীবীদের নিয়মতন্ত্রী কোলাহলে আর হতাশ তরুণদের পথভ্রষ্ট সন্ত্রাসবাদের সন্দিগ্ধ পরিবেশে। পল্লীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সংস্কৃতি ও অর্থনীতির এক নতুন সমন্বয় এ জন্য প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে নবজাগরণের বাণী গ্রামবাংলায় কিছু পরিমাণে সার্থক করে তুলতে হলেও গ্রামীণ অর্থনীতির মৌল পরিবর্তন ও পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন।

উনিশশতকী নবজাগরণ যদিও শ্রদ্ধেয় তবু নিজেকে রক্ষা করবার শক্তি তার নিজের ভিতর ছিল না। তাকে রক্ষা করবার জন্যই তার অপূর্ণতা স্বীকার করে নিতে হয়। নবজাগরণের ধারাকে ব্যাপ্ত করতে না পারলে তাকে রক্ষা করাও যাবে না। তাকে ব্যাপ্ত করা যাবে না গ্রাম ও শহরের বিন্যাস ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ছাড়া। এটা বড় কাজ। এই কাজটা সামনে রেখে চিন্তা করলে অনেক প্রশ্নই অন্যভাবে দেখা দেয়। কর্মের পরিধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নবজাগরণের চরিত্রেরও পরিবর্তন অনিবার্য। রেনেসাঁসচিন্তাকে নতুন ভাবে ভাবিত হতে হবে। আনন্দিনী বুদ্ধি আর ব্যবসায়িকী বুদ্ধির একটা নতুন সমন্বয়ের সময় এসেছে। যুগের এই প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের নতুন করে চিনে নিতে হবে। প্রতিযুগই পূর্বপুরুষদের ও পূর্বঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

আমাদের আগামী দিনের ইতিহাস উন্মুক্ত হবে না কোনো অতিক্রান্ত আন্দোলনের অনুসরণে। একথা পুনরায় বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, রেনেসাঁস ও নবজাগরণ এক বস্তু নয়। ইয়োরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁস এনে দিয়েছিল ব্যক্তিত্ব—অথবা, ব্যক্তির অদ্বিতীয়তা—এবং মনুষ্যত্ব—কিংবা, মানুষের সাধারণ ধর্ম—এ দুয়ের ভিতর একটা সামঞ্জস্যের সন্ধান। প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনের অন্যতম ফল সেই অনলসতা ও নিয়মনিষ্ঠা, পশ্চিমী সমাজের জাগতিক উন্নতিতে যেটা সহায়ক হয়েছিল। আঠারশতকের যুক্তির যুগের বাণী এই যে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ শতাব্দীর অন্ধতার বন্ধন কাটিয়ে প্রগতির অন্তহীন পথ খুলে দিতে পারে। এই তিন আন্দোলনের ফল যেন আমরা বাংলার উনিশশতকী নবজাগরণের কাছ থেকে একই সঙ্গে আশা করেছি। সেই আশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না, সম্ভব নয়। আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির নতুন পথ আজ রচিত হবে না পূর্বতন কোনো শিল্পোন্নয়নের অনুসরণে। যুক্তি ও মুক্তির ধারণারও ক্রমাভিব্যক্তি আছে। মানুষ তার মনুষ্যত্বকে আবিষ্কার করবে নব নব রূপে। তবু অতীতের কিছু জিজ্ঞাসা, কোনো কোনো মূল্যবোধ, আশা করা যায় সহায়ক হবে ভবিষ্যতের পথ খুঁজে নিতে। নবজাগরণের সদর্থ সেইখানে।

নারী মুক্তি

ভবিষ্যতের সমাজ কেমন হবে, আমরা তা জানি না। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলনের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এ যুগের নব প্রজন্মের আন্তরিক ঝোঁক ও আকাঙ্ক্ষা। এমন একদিন ছিল যখন এইসব উৎকাঙ্ক্ষার প্রভাব ছিল না ইতিহাসের গতির ওপর। কিন্তু এখনও কি তাই ? যেমন ধরা যাক কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের ভিতর সমান অধিকারের দাবী নিয়ে পৃথিবীর নানা অংশে, বিশেষত আফ্রিকায় ও মার্কিন দেশে, আজকের আন্দোলন। আর কতদিন একে অগ্রাহ্য করা যাবে ? অথবা বিশ্বশান্তির সপক্ষে বিশ্বজোড়া মানুষের আগ্রহ। শান্তিরক্ষা না পেলে সভ্যতাও টিকবে না। ভবিষ্যতের সমাজের পক্ষে এইরকমই গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নারীমুক্তির আন্দোলন। এর ভিতর দিয়ে যে দাবী উচ্চারিত হয়েছে তাকে বেশিদিন উপেক্ষা করা যাবে না। সেটা যুদ্ধের মতো বিস্ফোরক নয়, কিন্তু অনেকদিনের সামাজিক ধ্যানধারণা ও অভ্যাসের সঙ্গে নতুন যুগের এই দাবীর বিরোধ আছে। সামঞ্জস্যের দিকে অগ্রসর হওয়া এক্ষেত্রে কঠিন তবু প্রয়োজন। তার আগে সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

নারীমুক্তি আন্দোলনে সাম্যের কথা বারবার শোনা গেছে, পুরুষের সঙ্গে সাম্য। কথাটার একাধিক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অর্থ প্রধান হয়ে উঠেছে।

একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের ভোটের অধিকার ছিল না। এই শতাব্দীর গোড়ায় নারী ও পুরুষের ভিতর সাম্যের দাবী বলতে এইটেই হয়ে উঠেছিল প্রধান কথা। এর ভিতর দিয়ে নারীর স্বতন্ত্র সত্তা একটা স্বীকৃতি পেল। এর আগে সমাজের ধারণা ছিল যে, পরিবারের পক্ষ থেকে গৃহকর্তা ভোট দিলেই তো হল, স্ত্রীর আলাদাভাবে ভোট দেবার প্রয়োজনটা কী ? আজ এই প্রশ্নটা আর কেউ তোলে না। স্বাধীন ভারতে মেয়েদের ভোটের অধিকারের জন্য আলাদা আন্দোলনেরই প্রয়োজন হয়নি। সর্বসাধারণের জন্য ঐ অধিকার যেদিন প্রতিষ্ঠিত হল নারীও সেদিন থেকেই ভোটদানের অধিকারিণী বলে স্বীকৃত। শুধু ভোটের প্রশ্নেই নয়, এদেশের সংবিধানে আরো ব্যাপকভাবেই নারী ও পুরুষের ভিতর সাম্যের কথা আইনত স্বীকৃত হয়েছে। নাগরিক হিসেবে নারীর অধিকার পুরুষের সমান। নারী বলে কোনো ব্যক্তির অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না, যদিও প্রয়োজনে নারীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া আইনবিরুদ্ধ নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রেও শুধু নারী বলেই কাউকে বঞ্চিত করা আইনসঙ্গত নয়। অর্থাৎ, মনুসংহিতায় যাই থাকুক না কেন, ভারতীয় সংবিধানে নীতিগতভাবে উভয় লিঙ্গের সমান অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সংবিধান এক বস্তু আর সমাজের অভ্যস্ত আচরণ অন্য বস্তু। এদেশে এখনও বাপ-মা পুত্রসন্তান চায়, কন্যা চায় না। শুধু এদেশেই নয়, অন্যত্রও এটা দেখা গেছে। শিক্ষাদানের ব্যাপারে যদিও মেয়েদের সুযোগ ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে তবু এখনও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মেয়েদের ভিতর নিরক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশি। অর্থাৎ বাপ-মা ছেলের সাক্ষরতাটাকেই বেশি জরুরী মনে করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পরিবারের ভিতর এমন কি খাদ্যের ব্যাপারেও ছেলেদেরই অগ্রাধিকার। চাকরির ক্ষেত্রে ও

নিয়োগকর্তা অনেক সময় মেয়ে নিতে চায় না।

এ সবের পিছনে দুটি ধারণা প্রধানত কাজ করেছে। প্রথম কথা, পুত্রই পরিবারের প্রধান সহায়। বৃদ্ধ বয়সে ছেলের উপরই নির্ভর করতে হবে। মেয়ে তো অন্য বাড়ি চলে যাবে। পুত্রের ভিতর দিয়েই বংশ রক্ষা পায়। দ্বিতীয় কথা, সাধারণ মানুষ এখনও নারী ও পুরুষকে সামর্থ্যের দিক দিয়ে সমান মনে করে না। স্ত্রী যদিও আদ্যাশক্তি তবু পুরুষেরই সামর্থ্য বেশি। বাড়ির ভিতর গৃহিণী পটিয়সী, কিন্তু বাইরের বৃহত্তর জগতে পুরুষের যোগ্যতা বেশি। প্রকৃতিই নারী ও পুরুষকে অসমান করে গড়েছে। এই রকম ধারণা সমাজে প্রচলিত। আর এখান থেকেই তর্কের শুরু।

সামর্থ্যের দিক থেকে যদি নারী ও পুরুষ সমান না হয় তবে অধিকারের বেলাতেও শেষ অবধি তারা অসমানই থেকে যায়। অন্তত কাজেকর্মে সামর্থ্য কিংবা যোগ্যতার সঙ্গে অধিকারের সম্পর্ক স্বীকার করে নিতে হয়। প্ল্যাটোর যুগ থেকেই এইরকম একটা যুক্তির ভিত্তিতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, অতএব প্রাধান্য স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। দেহ যেমন আত্মার অধীন, দাস যেমন প্রভুর, নারীও তেমনি পুরুষের, প্লাতোনিক যুক্তিটা এইরকম।

অতএব নারীমুক্তির প্রবক্তাদের প্রত্যুত্তরটা শুরু হয় এইখান থেকেই। প্রকৃতির সূত্রে নারী ও পুরুষের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে ঠিকই। কিন্তু সেটাকে অযথা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। বৃহত্তর জগতের নানা কাজেকর্মে লিঙ্গভেদে যোগ্যতার কোনো স্বাভাবিক ভেদ নেই। সেখানে যে প্রভেদটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়। সেটা সমাজের সৃষ্টি। দীর্ঘ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভেদে দেখা দিয়েছে নারী ও পুরুষের ভিতর আপাতদৃষ্টিতে যোগ্যতার তারতম্য। যেহেতু দুই লিঙ্গের ভিতর এই তারতম্য প্রাকৃতিক নয় বরং সামাজিক, অতএব শিক্ষা ও সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ঐ অসাম্য দূর করা সম্ভব। যে কাজ পুরুষের পক্ষে সাধ্য নারীর পক্ষেও সেটা সাধ্যের অতীত নয়। এর বিপরীত ধারণার মূলে আছে শুধু রক্ষণশীল সমাজের বদ্ধ সংস্কার। নারী প্রবক্তাদের প্রত্যুত্তর শুরু হয় এইভাবে।

২

একথা স্বীকার্য যে, নারীকে যে রূপে আমরা পেয়েছি সেই নারী প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, বরং বহু পরিমাণে সংস্কৃতির সৃষ্টি। মানুষমাত্রই তো তাই! সমাজ বস্তুটি সংস্কৃতি দিয়ে গঠিত। নারী ও পুরুষের তারতম্যের পিছনে আছে এক দীর্ঘ ইতিহাস যাকে উপেক্ষা করা যায় না। সমাজকে বদলাতে চাইলে তার ইতিহাস কিছুটা বুঝে নিতে হবে। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সেটা মানুষের পরিবারের ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে দু'চারটা কথা সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। এককালে খাদ্যের জন্য মানুষকে নির্ভর করতে হত শিকারের উপর। দল বেঁধে পুরুষেরা শিকারে বেরোতো। পরে আরো বড় হয়ে উঠলো যুদ্ধ। সেখানেও পুরুষের ভূমিকাটাই প্রধান। স্ত্রীরা থাকতো ঘরে। ঘরে থাকবার কারণ সহজেই বোঝা যায়। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানবীর গর্ভধারণের সময়টা দীর্ঘতর। মানব সন্তানের মাথার আয়তন দেহের তুলনায় বড়, ফলে মাতৃজঠর থেকে বেরোবার প্রক্রিয়া অন্যান্য জীবের চেয়ে একটু কঠিন। তা ছাড়া মানবশিশুর বড হয়ে উঠতে সময়

লাগে বেশি। অন্যান্য জীবের তুলনায় শিক্ষাকালটা চলে বেশিদিন ধরে। বানরের মস্তিষ্ক পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় জন্মের ছ'মাসের ভিতর, মানুষের মস্তিষ্ক কিন্তু ছ'বছরেও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এইসব নানা কারণে প্রাচীন কাল থেকেই মানবজাতির স্ত্রীকে মাতৃত্বের দায় বহন করতে হয়েছে অন্যান্য জীবের চেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে।

এই যে পুরুষ শিকার আর যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত, স্ত্রীর প্রধান কাজ সন্তান পালন আর গৃহবিন্যাস, ইতিহাসের অতি দীর্ঘ যুগ ধরে এটা চলেছে। পুরুষ ও নারীর চেতনা ও চরিত্রের গঠনের উপর এর প্রভাব পড়েছে অনিবার্যভাবে। পুরুষকে যে কাজটা করতে হয়েছে, যুদ্ধ ও শিকার, তাতে দয়ামায়ার স্থান কম। নারীকে যে কাজটা করতে হয়েছে, শিশুপালন, তাতে মায়া-মমতার স্থান বেশি। এরই ভিতর দিয়ে নারী ও পুরুষের চেতনা গঠিত হয়েছে, সংস্কৃতি রূপ লাভ করেছে। এ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে বোঝা যায় না। দয়ামায়ার কথাটা বল হল উদাহরণ হিসেবে। নারীর ভিতর নির্দয়তা নেই এমন নয়। অবশ্যই আছে। কিন্তু যে কর্মবিভাগের কথা এইমাত্র বলা হল তাতে নারীর কর্মে দয়ার প্রয়োজন ছিল বেশি। তাই তার প্রকৃতির সেই দিকটা পুষ্টিলাভ করেছে বেশি। যেমন দেহের যে পেশীটা ব্যবহার করতে হয় বিশেষভাবে সেটারই বৃদ্ধি ঘটে বেশি। মানুষের চিত্তবৃত্তির ক্ষেত্রেও সেইরকম একটা ব্যাপার আছে।

আরো কিছু নিয়ম ও নীতিবোধ একইভাবে গড়ে উঠেছে। পুরুষকে দিনের শেষে ঘরে ফিরতে হত। স্ত্রীর বিশ্বস্ততা তার কাছে দামী। ঘরে ফিরে স্ত্রীকে পাবে কিনা, না কি ইতিমধ্যে স্ত্রী অন্য কারো সঙ্গে প্রস্থান করেছে, এইরকম অনিশ্চয়তা থাকলে বাইরের কাজে মন দেওয়া পুরুষের পক্ষে কঠিন। পুরুষ খাদ্য নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যুদ্ধে ও শিকারে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হলেও পুরুষকে শেষ পর্যন্ত বাড়িতেই ফিরতে হবে বিশ্রামের আশায়। সেখানে তার জন্য স্ত্রী অপেক্ষা করছে এইরকম একটা নিশ্চিত ছবি যদি পুরুষের মনের ভিতর রক্ষা পায় তবেই ঘরের এবং বাইরের কাজকর্ম ভালো চলে। সমাজে, পুরুষশাসিত সমাজে, এই ধারণাটাই ছিল স্বাভাবিক। নারীর কাছ থেকে সমাজের প্রত্যাশা এইভাবে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের ঐ পর্বটা সুদীর্ঘ। নারী ও পুরুষের চরিত্রের একটা রূপ আকার ধারণ করেছে ঐ পর্বে ; পুরুষ উদ্যোগী ও কিছুটা বর্বর, নারী মমতাময়ী ও সেবাপরায়ণা। ইতিহাস ও কল্পনায় আশ্রিত এই ধারণার সহসা পরিবর্তন ঘটে না। যে মমতা নারীর বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে শক্তির কোনো বিরোধ নেই, আমাদের পুরাতনী দেবী কল্পনায় সেটা স্পষ্ট। নারী কখনো অবলা, কখনো শক্তিরূপিনী।

শিকার পেরিয়ে এক সময়ে কৃষি ও কুটির শিল্প হয়ে উঠল জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন। সেখানে ঘরের সঙ্গে বাইরের দূরত্বটা কম। কৃষিভিত্তিক সমাজের মাতৃতান্ত্রিক রূপ ধারণ করতে তেমন বাধা নেই। অবশ্য পিছনে ফেলে আসা শিকারের যুগটার ভূত অনেক সময় এখানেও তাড়া করে আসে, এই মুশকিলটা থেকেই যায়। যাই হোক, সমাজ যখন এইরকম একটা স্তরে এসে পৌঁছায় যেখানে কৃষি ও কুটিরশিল্পের বিস্তার ঘটেছে কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্য আর্থিক জীবনের ওপর চেপে বসেনি তখন নারীর শক্তি স্বচ্ছন্দবিহারের একটা ক্ষেত্র পায়। তবে সেই পর্যায়েও নানা কারণে যুদ্ধ আর লুণ্ঠনের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যদিও রণাঙ্গনে বীরাঙ্গনাদের ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা যায়, তবু যুদ্ধ আর লুঠতরাজে পুরুষের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে ওঠে। নারী অপসৃত হয় অবগুণ্ঠনের পশ্চাতে। সে যুগের যুদ্ধের আর এক ফল ক্রীতদাস প্রথা। নারীকে সেই থেকে দেখি ক্রীতদাসী রূপে।

বাণিজ্যের প্রসার আর বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘর আর বাইরের দূরত্ব বেড়ে

যায়। বাণিজ্যে পুরুষেরই প্রাধান্য। বাণিজ্যভিত্তিক শিল্পের ভিতর দিয়ে ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা বিরাটভাবে পালটে যেতে থাকে। একদিকে বাড়ে ধনের পরিমাণ, অন্যদিকে ধন বণ্টনে অসাম্য। এই সঙ্গে আরো লক্ষণীয়, আমলাতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি। সেকালে ছিল পুরোহিততন্ত্র ; একালে আমলাতন্ত্র। দুয়েতেই পুরুষের প্রাধান্য। আইনকানুন যতো জটিল হয়, ঘরের সঙ্গে বাইরের জগতের সাংস্কৃতিক দূরত্বও ততো দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি, দুয়ে মিলে গড়ে উঠেছে পুরুষের আলাদা জগৎ।

কৃষিভিত্তিক সমাজে মেয়েরাও মাঠে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছে পুরুষের পাশে। অর্থাৎ, আর্থিক উপার্জনে মেয়েরা সেখানে সক্ষম। বিয়ের সময় পাত্রপক্ষকেই অনেক সময় যৌতুক দিয়ে পাত্রীকে ঘরে আনতে হয়েছে, কারণ এতে করে ছেলের পরিবারে যোগ হত মাঠে কাজ করবার জন্য আরো এক জোড়া হাত। নাগরিক সভ্যতার প্রসারের ফলে অবস্থাটা পালটে গেল। এবার পণ দিয়ে কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। কারণ মেয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে মেয়ের বাবা, সেই দায়টা গিয়ে পড়ছে বরের ওপর। এখনও আমাদের চোখের সামনেই দেখি, সাঁওতাল বা রাজবংশী মেয়েরা যারা মাঠে কাজ করে, তাদের বিয়েতে কন্যাপক্ষকে পণ দিতে হয় না। অবশ্য নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবে তলার দিকের সমাজেও রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটেছে। জাতে উঠতে গিয়ে মেয়েরা হয়ে পড়ছে আরো পরাধীন। তথাকথিত উঁচু জাতের মেয়েদের জন্য উপার্জনের পথ, আর্থিক স্বাবলম্বনের পথ খোলা নেই, আর্থিক দৃষ্টিতে তারা দায়বিশেষ। এইভাবেই অবস্থাটা চলছিল বহুদিন পর্যন্ত আমাদের পরিচিত মধ্যবিত্ত সমাজে।

কিছুকাল আগে এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত আধখেঁচড়া পরিস্থিতি। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরে যাচ্ছে, চাকরির জন্য। তাদের উপার্জনের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট নয়, অর্থাৎ তাতে আত্মনির্ভর হওয়া যায় না, যদিও বাড়তি আয়টা সংসারের কাজে লাগে। আয়কর্তা মুখ্যত ছেলে। এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সেটা সংখ্যায় অল্প। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা এখনও আর্থিকভাবে পরনির্ভর। কাজেই পণপ্রথা সমানে চলেছে, ব্যতিক্রম যৎসামান্য। নব্য মধ্যবিত্তের আয় আর আকাঙ্ক্ষার ভিতর ফারাক যত বাড়ছে পণপ্রথা ততই আরো নির্দয় কুৎসিত হয়ে দেখা দিচ্ছে। মেয়েদের যদিও বাইরের চাকরি হয়েছে, তবু সংসার চালাবার কাজটা প্রায় পুরোপুরি তাদের উপরই থেকে গেছে। পুরনো ব্যবস্থায় যে অন্যায়টা প্রচ্ছন্ন ছিল, নতুন অবস্থায় সেটা হয়ে উঠেছে আরো প্রকট, আরো সমর্থনের অযোগ্য, অতএব অসহনীয়।

এই নতুন পরিস্থিতি এবং দেশেবিদেশে মেয়েদের উপর তার প্রভাব এবার আরো একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

৩

উনিশ শতকে রামমোহন অথবা বিদ্যাসাগর নারীর মুক্তির জন্য যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা থেকে আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলন জাতে আলাদা। এই আন্দোলন একটা নবপর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে, বিশেষত গত বিশ-তিরিশ বছরে। এর উদ্ভব পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, যদিও এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এদেশেও।

বাণিজ্যের বিস্তার, শিল্পবিপ্লব, নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় আর্থিক

বিন্যাসের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর স্বাধীনতা কীভাবে সঙ্কুচিত হল সে কথা আগেই আলোচনা করেছি। যে ছবিটা আমরা সেখানে তুলে ধরেছি সেটা মূলত মহাযুদ্ধের আগের যুগের। গত কয়েক দশকে অবস্থা অনেকটা পালটে গেছে, বিশেষত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে।

এই পরিবর্তনের পিছনে কিছু বড় বড় শক্তি কাজ করেছে। সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

আজকের যুগে যুদ্ধটা আর আগের মতো পুরুষদের একটা বিশেষ অংশের ভিতর আবদ্ধ থাকে না। যুদ্ধের একটা চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছে, এ যুগের যুদ্ধ "টোট্যাল ওয়ার"। মহাযুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে সমাজের পক্ষে একটা সামগ্রিক ব্যাপার। বড় সংখ্যায় পুরুষেরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যায় তখন দেশময় অতি প্রয়োজনীয় অফিস, কলকারখানা, আর সরবরাহ ব্যবস্থা চালাবার জন্যও নারীদের কাজে যোগ দিতে হয় বর্ধিত সংখ্যায়। মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে মেয়েরা ঘরের বাইরে চলে এসেছে পুরনো অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করে। যুদ্ধের শেষে সৈন্যরা যখন ঘরে ফেরে, তারা এসে দেখে যে সমাজ তাদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই অনেকখানি বদলে গেছে। মহাযুদ্ধের বাইরে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল মেয়েদের ঘরের বাইরে টেনে আনবার কাজে। গান্ধীজীর নেতৃত্ব এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এর পর মেয়েদের পুরনো অবস্থায় ফেরত পাঠানো আর সম্ভব নয়।

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তির একটা বিশেষ ভূমিকা। একদিন ছিল যখন ঘরের কাজ মেয়েদের সবটা সময় গ্রাস করে নিত। আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে শিল্পোন্নত দেশে অবস্থা অনেকটা বদলে গেছে। রান্না কিংবা কাপড় কাচা থেকে শুরু করে ঘরের আরো অনেক কাজই এখন আর ততটা সময় নেয় না। ফলে মেয়েদের হাতে সেই উদ্বৃত্ত অবসর থাকে যেটা তারা বাইরের কাজে দিতে পারে। যখন এটা সম্ভব ছিল না তখন সেই অবস্থাকেই মেনে নিতে হয়েছে। এখন ঘরের কাজের একঘেয়েমি অনেক মেয়ের পক্ষেই আর গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। প্রযুক্তি যে সমাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, সমাজের গঠনটাকেই বদলে দেয়, একথা আমরা জানি। গত কয়েক দশকে এটাই ঘটেছে একটা বিশেষ পথে, আগের যুগে যার তুলনা মেলে না। প্রযুক্তি নানা ধরনের হয়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে যখন শ্রমের প্রয়োজন কমে যায় তখন তাকে বলা যাক শ্রমসঙ্কোচক প্রযুক্তি। আধুনিক শিল্পে এর প্রয়োগ ক্রমশই বাড়ছে, গত শতাব্দী থেকেই এটা অনেকে লক্ষ করেছেন। এই শ্রমসঙ্কোচক প্রযুক্তি অনেকদিন অবধি আবদ্ধ ছিল মিলে, কারখানায়, ঘরের ভিতর প্রবেশ করেনি বড় আকারে। তাই শিল্প-বিপ্লবের ফলে কলকারখানায় কাজের সংগঠনের যে পরিবর্তন ঘটে গেছে সেই রকম কিছু ঘটেনি গৃহস্থের ঘরসংসারে। এই দেয়ালটা এবার ভাঙতে আরম্ভ করেছে, কারখানা পেরিয়ে শিল্পবিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে রান্নাঘর অবধি। আর এরই ফলে সারা সমাজের সংগঠনে একটা অভূতপূর্ব ওলটপালটের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আরো কিছু ঘটনা, যেমন মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, সেই অবস্থায় মহিলারা আরো অধিক সংখ্যায় অর্থোপার্জনের পথে পা বাড়িয়েছেন। যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি আর নবযুগের প্রযুক্তি মিলে মেয়েদের আজ ঠেলে দিয়েছে অতি দ্রুত বাইরের সেই কর্মশালায় যেখানে বহুদিন পর্যন্ত একাধিপত্য ছিল পুরুষের। বাধা দিলে বাধবে লড়াই, অবস্থাটা এখন এইরকম।

চাকরির বাজারে লড়াই আমরা আগেও দেখেছি। পিছিয়ে-পড়া জাতি অথবা সম্প্রদায়ের মানুষ হঠাৎ যখন চাকরির সন্ধানে এগিয়ে আসে তখন পুরনো প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একসময় মীমাংসার সূত্র খোঁজা ছাড়া উপায় থাকে না। কখনো কখনো পিছিয়ে-পড়া জাতি কিংবা সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবী মেনে নিতে হয়। দ্বন্দ্বটা শুধু কাজে নিয়োগের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকে না। পদোন্নতির প্রশ্নটাও এসে যায়। আপত্তি ওঠে যে, তলার দিকের কিছু আসন ছেড়ে দিয়ে অগ্রগামী গোষ্ঠী দখল করে বসে আছে ওপরের দিকের অধিকাংশ আসন। এই সব কথা মেয়েদের আন্দোলনের ভিতর থেকেও শোনা যাচ্ছে। মেয়েরা আজ এগিয়ে আসছে যেন পিছিয়ে-পড়া একটা বিরাট সম্প্রদায়ের মতো। পুরুষের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের চেহারা কিছুটা মিলে যায় একটা পুরনো পরিচিত ধাঁচের সঙ্গে। কিন্তু তুলনাটা বেশি দূর টানা যায় না। আসলে মেয়েদের দাবি কেবল চাকরি নিয়ে নয়। শুধু পদমর্যাদা নিয়েও নয়। অনিবার্যভাবেই এতে নিহিত আছে আরো অন্তরঙ্গ অনেক ব্যাপার। বহুদূর বিস্তৃত এর ফলাফল। সেটা আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। অপেক্ষাকৃত সরল বিষয় থেকে শুরু করে অগ্রসর হওয়া যাক আরো জটিল প্রশ্নের দিকে।

৪

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবী পনেরোটি সন্তানের জন্মদান করেন। সে যুগের মায়েদের অনেকেই বহু সন্তানবতী ছিলেন। আমাদের সময়ে দু'টি অথবা তিনটির বেশি বালবাচ্চা হবে না এই রকমই সরকারী বিধি। চীন দেশে সংখ্যাটা দুই এমন কি আরো কমে সীমাবদ্ধ করার দিকে চেষ্টা চলেছে। ভারত অথবা চীনের মতো দেশে এই সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সরকারী নীতির পক্ষে মূল যুক্তি আর্থনীতিক। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলে এসব দেশে দারিদ্র্য দূর করা কঠিন হয়ে উঠেছে। শিল্পোন্নত দেশে সমস্যাটা ঐরকম নয়। সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ সরকারী নীতির তেমন প্রয়োজন নেই। অথচ অপেক্ষাকৃত ধনী দেশগুলিতেও সন্তানের সংখ্যা দ্রুত কমে এসেছে। অনেক দেশেই জনসংখ্যা তেমন বাড়ছে না, কয়েকটি দেশে কমছে। যেমন ধরা যাক পশ্চিম জার্মানি। গত তিরিশ বছরে সেখানে আর্থিক উন্নতি ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত তালে। অথচ সেখানে জনসংখ্যা এখন আর বাড়ছে না।

গর্ভমোচন এবং গর্ভনিরোধের মৌল অধিকার নারীমুক্তি আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। এই দাবীর একটা আর্থিক দিক আছে ঠিকই, কিন্তু দাবীটা আসেনি প্রধানত দরিদ্র পরিবারের পক্ষ থেকে। শিল্পে অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে যাই হোক না কেন, পাশ্চাত্য সমাজে ঐ ভাবনাটা এসেছে উদরপূর্তির প্রয়োজনে নয়, বরং নারীর বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে। আজকের দিনের মেয়ে চাইছে বাইরের জগতে আরো সক্রিয় ভূমিকা, আরো অবাধ বিচরণ। সন্তানের সংখ্যা বাড়লে সেই স্বাধীনতা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আজকের নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আর্থিক স্বাধীনতা এবং বৃহত্তর সামাজিক স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এই দাবী। নারী গর্ভধারণ করবে কি না অথবা কখন করবে এটা আর নিয়তির হাতে ছেড়ে দেওয়া চলবে না, নারী নিজেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারিণী।

কথাটা আরো একটু বিস্তৃত পটভূমিকায় বললে বোধ করি ভুল হবে না। নারীমুক্তির

প্রবক্তাদের অনেকেই চাইছেন মেয়েদের জন্য সেই যৌন স্বাধীনতা যেটা ছেলেরা ভোগ করে আসছে সমাজের সম্মতিক্রমে বহুদিন থেকে। এটাকেও নারী-পুরুষের সাম্যের দাবীর অংশ বলে বিবেচনা করতে হবে। যতদিন মেয়েরা ঘরসংসারে আবদ্ধ ছিল ততদিন কতগুলি বাধানিষেধ তাদের ওপর একতরফা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা সেসব মেনেও নিয়েছিল। কিন্তু বাইরের জগতে ছেলেদের পাশে পাশে যখন তাদের কাজ করতে হবে তখন পরস্পরের মেলামেশার ব্যাপারে ছেলেদের জন্য এক নিয়ম আর মেয়েদের জন্য অন্য নিয়ম, এই ভেদাভেদ মেয়েরা সানন্দে গ্রহণ করবে না।

পুরনো দুয়েকটা যুক্তি লোকমুখে কখনো কখনো শোনা যায়, কিন্তু তাদের বাস্তবভিত্তি দুর্বল হয়ে গেছে বলেই ওসব আর যুক্তি বলে তেমন গ্রাহ্য হয় না। বলা হয় যে, প্রকৃতিই মেয়েদের অসুবিধায় ফেলেছে, যৌন স্বাধীনতায় মেয়েদের বিপদের আশঙ্কা বেশি, কাজেই ওদের সাবধান হতে হবে নিজেদেরই স্বার্থে। নৈতিক যুক্তি হিসেবে খুব দাম দেওয়া যায় না এই কথাটাকে। সাবধানতা যদি প্রয়োজন হয় তবে তার দায়িত্ব দু'পক্ষেরই সমানভাবে ভাগ করে নেওয়াটা নীতির দিক থেকে শোভন। তাছাড়া বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের ফলে বাস্তব বিচার-বিবেচনার ভিত্তিটা পালটে যাচ্ছে। জন্মনিরোধের উপায় ক্রমেই সহজ হয়ে আসছে। যৌন স্বাধীনতার সঙ্গে সাবধানতাকে মেলানো আজ কঠিন নয়। অর্থাৎ, মেয়েদের ওপর সংযমের দায়িত্ব চাপিয়ে দেবার সপক্ষে যে বাস্তব যুক্তিটা দুয়েক পুরুষ আগে বেশ জোরালো এমন কি ভীতিপ্রদ মনে হত, চলতি প্রজন্মে সেটা আর তেমন ধারালো যুক্তি নয়। যদি কেউ শুদ্ধ নৈতিক বিবেচনায় যৌনসংযমের পথ বেছে নেয় তবে সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে। নৈতিক যুক্তি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তব প্রয়োজনের বাধ্যতাকে নারীর যৌন স্বাধীনতার বিপক্ষে একতরফা ব্যবহার করতে গেলেই মুশকিল, যুক্তিটাকে চট করে আর দাঁড় করানো যায় না। প্রশ্নটা কেবল সংযম নিয়ে নয়, স্ত্রী-পুরুষের ভিতর অসাম্য নিয়ে। যৌন স্বাধীনতার ব্যাপারে এই অসাম্য সমর্থন করা কঠিন হয়ে উঠছে। আধুনিক প্রযুক্তির এই আরেক ফল।

পুরনো ঐতিহ্যে অসাম্যের একটা উৎকট প্রকাশ দেখা গেছে বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়মে। পুরুষের দিক থেকে বিবাহবিচ্ছেদ সহজ, তার উদাহরণ দেওয়া বোধ করি নিষ্প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মুসলমান রীতিপদ্ধতির সঙ্গে নানা কারণে অনেকেই অল্প-বেশি পরিচিত। পয়গম্বর নিজে বিবাহবিচ্ছেদ পছন্দ করতেন না, কিন্তু কার্যত পুরুষের পক্ষে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। হিন্দুদের ভিতর স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীর সংখ্যা দুঃখজনকভাবে বেশি। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ঐতিহ্য এ ব্যাপারে পুরুষের পক্ষপাতী। নারীমুক্তির প্রবক্তারা দাবী করছেন সাম্য। নারী ও পুরুষ উভয় পক্ষ থেকে বিবাহবিচ্ছেদ আরো সহজ করে তুলবার দিকে ঝোঁক আছে এ-যুগের চিন্তা-ভাবনায় বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে। বিবাহবন্ধন যদি নারীর ব্যক্তিত্বের পক্ষে হানিকর অথবা অপমানজনক হয় তবে বন্ধন ভেঙে মেয়েরা যাতে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে সেই পথ খোলা থাকুক, এই দাবী উচ্চারিত হয়েছে সঙ্গত কারণেই।

পাশ্চাত্যে দেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের যাঁরা নেতা তাঁরা সেই দেশের অধিকাংশ নারীর প্রতিনিধিস্থানীয় কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। অধিকাংশ সাধারণ মেয়ের ধ্যানধরণা নারীমুক্তির অগ্রগামী প্রবক্তাদের সঙ্গে মেলে না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নারীমুক্তির নেতাদের অনেকেরই চিন্তার অবস্থান আন্তর্জাতিক বামপন্থী বিপ্লবী·

আন্দোলনের ধারেকাছে। সাধারণ মেয়েদের অধিকাংশের ভোট পড়ে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল দলের পক্ষে। এই রকম সংখ্যার বিচারে কিন্তু নারীমুক্তি আন্দোলনের গুরুত্ব ঠিকভাবে ধরা পড়বে না। এই আন্দোলনের মিল আছে এ-যুগের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে। প্রযুক্তি ও সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন উন্নত এবং উন্নতিশীল দেশগুলিকে আধুনিককালে যে দিকে ঠেলে দিচ্ছে নারীমুক্তি আন্দোলনের গতি সেই দিকে। এইখানে পাওয়া যাবে ঐ আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্য আর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয়।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতার কিছু নিজস্ব বিচার ও আদর্শ আছে। মানুষের অধিকার আর সুখের পথ সম্বন্ধে তার কতগুলি নিজস্ব প্রত্যয় আছে। নাগরিক সভ্যতা ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের কিছু মৌল ধারণায় বিশ্বাস রাখে। কোনো এক যুগে বৃত্তি অথবা জীবিকা ছিল জন্মসূত্রে নির্ধারিত। অন্তত পুরুষের ক্ষেত্রে আমরা আজ এই রকম বিশ্বাস করি না। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশে আজও অধিকাংশ নারীর স্থান যেন জন্মসূত্রেই রান্নাঘরে নির্দিষ্ট। সংবিধানে মানুষের অধিকার বলে যেসব কথা স্বীকৃত সেসব যেন একমাত্র পুরুষেরই অধিকার। অধিকার জিনিসটা সংবিধানে স্বীকৃত হওয়াই যথেষ্ট নয়, সমাজের সংস্কৃতিতে তার সমর্থন থাকা চাই। প্রশ্নটা শুধু বৃত্তিনির্বাচন নিয়ে নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়ে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভিতর যাতে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, আইনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিচার ও সংস্কৃতি যাতে ঐ সাম্যের অনুকূল হয়, পুরুষের স্বাধীনতার ভিত্তিতে যেন না থাকে নারীর অধীনতা, নারীর মুক্তি আন্দোলনের এই লক্ষ্য। এই আন্দোলনের সক্রিয় অংশীদারদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে এর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। নারীমুক্তির মৌল দাবিগুলি এদিক থেকেই বিচার্য। অথচ ইতিমধ্যেই কিছু গভীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। নারীমুক্তি আন্দোলনে যেসব দাবী তোলা হয়েছে তার সঙ্গে এইসব সমস্যার যোগ আছে। নারীমুক্তির নেতারা এইসব সমস্যা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারছেন না। এই দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

৫

আধুনিক নারীমুক্তি আন্দোলনে পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুরটাই প্রধান। এটা আশ্চর্য নয়। এদিক থেকে আন্দোলন কিছু সফল হয়েছে, এ-কথাও স্বীকার করতে হবে। এক কালে যে-সব বৃত্তিতে পুরুষের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল এখন সেখানে অন্তত উন্নত দেশগুলিতে মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 'পলিসি রিভ্যু'-তে প্রকাশিত এক বিববণে দেখা যাচ্ছে, মার্কিন দেশে মহিলা ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল একুশ হাজার, পনের বছর পরে হয়েছে একশ' এক হাজার ; মহিলা আইনজীবীর সংখ্যা এই সময়ে বেড়েছে তেরো হাজার থেকে একশ' চার হাজারে। উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, মহিলাদের পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতারা বলছেন, ওপরের দিকে মহিলাদের যদিও অধিক সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে, নীচের দিকে কিন্তু মেয়েদের অধীন অবস্থা কাটেনি। তবু বাইরের কাজের জগতে মেয়েদের অগ্রগতি অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, গত পনেরো বছরের সময়টাতে মোটের উপর মার্কিন সমাজ ও অর্থনীতি ছিল বর্ধিত হারে বেকার সমস্যা আর উপার্জনহীনতার দ্বারা আক্রান্ত। এ সময়ে চাকরির বাজারে মেয়েদের

পক্ষে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবার কথা। তবু যদি অগ্রগতি ঘটে থাকে তবে সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের অন্যান্য অধিকারও শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রতিষ্ঠা পাবার পথে। ঘরের কাজে পুরুষেরা অংশগ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। মেয়েদের যৌন স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিবাহবিচ্ছেদ আগের তুলনায় সহজ হয়ে এসেছে। পুরুষের ইচ্ছাতে শুধু নয়, মেয়েদের ইচ্ছাতেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে। শিল্পোন্নত দেশের বাইরে এইসব ধারা আমাদের মতো দেশেও সমাজের উপরতলায় খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। আমাদের চোখের সামনেই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে নানা রকম সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। এইসব সমালোচনার কিছুটা পুরনো রক্ষণশীল সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা যায়। আবার কিছু সমালোচনার ভিত্তিতে আছে আরো মৌল বাস্তব সমস্যা। কাজেই তর্কটা জটিল।

সমালোচকদের কেউ কেউ বলছে যে, নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাবে মেয়েরা দুশ্চরিত্র হয়ে পড়ছে। এতে করে মেয়েদের ধী যদি-বা বাড়ছে, হ্রী আর শ্রী কমে যাচ্ছে। আসলে এই সমালোচকদের মনে আছে নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা পুরনো ঐতিহ্যাশ্রিত ধারণা, যা থেকে কোনো বিচ্যুতি কিংবা ব্যত্যয় তাদের আপত্তিজনক মনে হয়। এই পুরনো ধারণার ভিতর কিছু স্ববিরোধ রয়েছে। একদিকে নারীকে মনে করা হয় ছলনাময়ী, নারী পাপের পথ। অন্য দিকে নারী শুদ্ধ মাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি। এমনও একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, নারীর নিজস্ব কোনো যৌন আকাঙ্ক্ষা নেই, নিতান্তই পুরুষের আগ্রহে সে অনাসক্তভাবে মিলিত হয় বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা পুরুষের কামনাতৃপ্তির জন্য। এই ছবিটা সত্য হতে পারে না। নারী ও পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষার মানচিত্রে অবশ্য কিছুটা পার্থক্য আছে। কিন্তু সেই পার্থক্যের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ অন্যপ্রকার। প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে পুরুষকে গঠিত করেছে যৌন আকাঙ্ক্ষার আকর হিসেবে আর নারীকে সৃষ্ট করেছে যৌন আকর্ষণ তথা আনন্দের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে, এ-কথা বিশ্বাস্য নয়। নারীপ্রকৃতি সম্বন্ধে এই ধারণা যদি সত্য হত তবে নারীকে আবার ছলনাময়ী বলে চিত্রিত করার অর্থ কী ? এ-বিষয়ে আলোচনা দীর্ঘ করা অনাবশ্যক। সহজ দৃষ্টিতে বোঝা যায় যে, নারী-পুরুষের ভিতর আকর্ষণটা প্রকৃতির নিয়মেই পারস্পরিক ; মানবিক ভালোবাসায় যৌনতার মিশ্রণ নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই স্বাবাভিক ; আধুনিক নারী যদি আজ শতাব্দীসঞ্চিত ভয় ও সঙ্কোচ থেকে মুক্ত হয়ে যৌনতাকে স্বীকার করে নিতে চায় তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই ; আর নারী ও পুরুষের যৌথ দায়িত্বেই সেই সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যাতে প্রকৃতির দানকে মানুষ আতিশয্যের ক্রূরতা দিয়ে বিকৃত না করে বরং একটা কোমল সৌন্দর্য ও আনন্দের সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারে।

রক্ষণশীল সমালোচকের আপত্তি অগ্রাহ্য হতে পারে ; তবু এর বাইরেও কিছু প্রশ্ন আছে। এই বিষয়টির সঙ্গে জড়িত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের ভাবনাচিন্তা এখনও একান্ত অসমাপ্ত। এই সব নিয়ে খোলা মনে ভাবতে গেলেই বিভ্রান্তিকর নানা তথ্য আমাদের নজরে আসে। প্রথমেই বিবেচনা করা আবশ্যক কিছু বাস্তব সমস্যা।

বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্ন দিয়ে পর্যালোচনা শুরু করা যাক। শিল্পোন্নত দেশে নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রাখা কঠিন। বিবাহবিচ্ছেদের পথ সুগম হয়েছে। বিচ্ছেদ চাইতে পারে শুধু পুরুষ নয়, নারীও। নারীর সাম্য ও স্বাধীনতার সহায়ক

হিসেবেই এটাকে মেনে নেওয়া হয়েছে। নারীমুক্তি আন্দোলনের পক্ষ থেকে সঙ্গত কারণেই এটা চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতে সমস্যা মেটেনি। এক ধরনের অসাম্য থেকেই গেছে। আইনের দিক থেকে বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ দুয়ের জন্যই পথ খোলা আছে। কিন্তু বাস্তবে পুনর্বিবাহের সুযোগ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান নয়। উন্নত দেশগুলিতেও নয়। চল্লিশ পেরিয়ে যাবার পর নারীকে বিবাহ অথবা পুনর্বিবাহের ততোটা যোগ্য মনে হয় না পুরুষকে যতটা মনে হয়। বিবাহবিচ্ছেদের পর, অন্তত একটা বয়স পেরিয়ে গেলে, বিচ্ছিন্না নারীর একাকিত্বের সম্ভাবনা পুরুষের চেয়ে বেশি।

এই অবস্থায় নারীর জীবনে দেখা দেয় এক উভয়সংকট। স্বামীর সঙ্গে যদি সন্তানকেও ত্যাগ করে চলে আসতে হয় তবে সেই একাকিত্ব হয় স্ত্রীর পক্ষে আরো অসহনীয়। আর সন্তানকে যদি প্রতিপালন করতে হয় তো বিচ্ছিন্না স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা কঠিন হয়ে ওঠে। ধরে নেওয়া যাক মহিলাটি চাকরিতে নিযুক্ত, বিবাহবিচ্ছেদের আগেও এবং পরেও। অর্থাৎ, আর্থিক দিক থেকে মহিলাটিকে নিতান্ত অসহায় বলা যাবে না। অসহায় নয় বলেই সমাজের সহানুভূতি তার প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট হবে না। একই কারণে তার ভরণপোষণের নৈতিক দায়িত্ব আগের স্বামীর ওপর সেই পরিমাণে বর্তাবে না, বিশেষত বিবাহবিচ্ছেদের দাবিটা যদি এসে থাকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে। স্বামী-স্ত্রী আর ধরা যাক দু'টি সন্তান, চারজন মিলে সংসার ছিল একটি। বিবাহবিচ্ছেদের পর একটি ভেঙে যখন দু'টি ঘর হল তখন দুই সংসারের মোট খরচ কিন্তু আগের একটির সমান রইল না। সন্তানের দায়িত্ব পিতা আর মাতার ভিতর যেমনভাবেই ভাগ করে দেওয়া যাক না কেন, দুই খণ্ড সংসারের মোট খরচ এক অখণ্ড সংসারের চেয়ে বেশি। অথচ বিবাহবিচ্ছেদের ফলে দু'জনের মোট আয়ের কোনো বৃদ্ধি ঘটেনি। এ অবস্থায় বিচ্ছিন্না মাকে সম্ভবত জীবিকার জন্য আরো কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, জীবনধারণ করতে হয় দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। পরিবার যদি বিত্তবান হয় তবে আর্থিক সমস্যাটা হয়তো তেমন বড় আকারে দেখা দেয় না। কিন্তু উন্নতদেশেও মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারে বিবাহবিচ্ছেদের পর অনেক নারীকেই একটা কঠিন বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নারীমুক্তি আন্দোলন এই সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ঐ নামে যে আন্দোলনের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার মাধ্যমে এর সমাধান আদৌ সম্ভব কি না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা অযৌক্তিক নয়।

এই পরিস্থিতিতে অন্য একটা চিন্তা ক্রমশ আধিপত্য বিস্তার করে। যে নারী স্বাধীনতা চায়, বিবাহবিচ্ছেদের পথ খোলা রাখতে চায়, তার পক্ষে সন্তানের জননী হওয়াটাই একটা বিঘ্নস্বরূপ। সন্তান আর স্বাধীনতা এইভাবে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বিবাহবিচ্ছেদ ওই সমস্যাকে আরো তীব্র করে তোলে, কিন্তু প্রশ্নটা এ ছাড়াই আধুনিক নারীর জীবনে উপস্থিত। কোনো এককালে নিঃসন্তান হওয়াটা ছিল নারীর পক্ষে বড় লজ্জা আর দুঃখের কথা। আজ যদি নারীকে বেছে নিতে হয় সন্তান আর স্বাধীনতার ভিতর একটিকে, তবে সেটা হবে না কি বড় বিষণ্ণ নির্বাচন?

এখানে একটি ছোটো ঘটনার উল্লেখ করছি, যে ঘটনার ভিতর দিয়ে সমস্যাটা আমার চেতনায় ধরা পড়ে। নিউ ইয়র্কে নারীমুক্তি আন্দোলনের এক নেতার সঙ্গে আমি এক সন্ধ্যা একান্তে কাটিয়েছিলাম। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, প্রাণবন্ত, কথায় বার্তায় কপটতা নেই। ওঁর একটা কথায় আমি একটু চমকে উঠেছিলাম ; উনি বলেছিলেন, বোকা না হলে কোনো মেয়ে মা হতে রাজী হয় না। আমি উত্তরে বলেছিলাম, আপনার কথাই যদি ঠিক হয় তবে তো ভবিষ্যতে পৃথিবীতে অধিকাংশ শিশুর ভাগ্যে জুটবে নির্বোধ মা। আমার উত্তরে উনি

অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর কথাটা আমাকে ভাবিয়েছে। যে নারী বাইরের জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে অভিলাষী, আর যথাসম্ভব নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী, সন্তানের জন্মদান তার কাছে নির্বুদ্ধিতার সমান মনে হতেই পারে। আমার পরিচিতা মহিলারা এই অবস্থায় একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সযত্নে থেমে যান। কিন্তু এটাও হয়তো প্রাচীন রীতির কাছে নতি স্বীকার করা বলে মনে হবে নতুন যুগের অনেক উন্নতিকামী নারীর দৃষ্টিতে।

সন্তানের জন্মদান যদি মুক্তিকামী নারীর চোখে অনভিপ্রেত হয় তবে অবশ্য বিবাহেরও বিশেষ অর্থ থাকে না। সন্তানকে নিয়েই পরিবার পূর্ণ হয়। নয় তো দু'জন মানুষ তো বন্ধুর মতো সাময়িকভাবে একসঙ্গে বাস ক'রে আবার যখন খুশি অনায়াসে দূরে সরে যেতে পারে। সন্তান নয়, বিবাহের বন্ধনটাই, যেমন পুরুষ তেমনি সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান নারীর বিচারেও স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক মনে হতে পারে।

নারীমুক্তি আন্দোলনের ভিত্তিতে যে-সব ধারণা উপস্থিত তার ভিতরই এইসব সম্ভাবনা নিহিত আছে। একথা সত্য যে এই মুহূর্তে অনেকেই চাইবে না এইসব ধারণাকে বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে। বস্তুত নারী আন্দোলনের কিছু নেতা নিজেরাই আজ ঐ অন্তর্নিহিত ঝোঁক সম্বন্ধে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন। কিন্তু ঐ ঝোঁকটাকে বাধা দেওয়া যাবে না শুধু সতর্কতার পুনঃপুনঃ উচ্চারণে। সেজন্য চাই অন্য এক সৃজনাত্মক ভাবধারা যাকে নিজ মূল্যে গ্রহণ করা যায়, যার প্রতিষ্ঠা নয় খণ্ড খণ্ড ব্যক্তি স্বার্থের হিসেবনিকাশে। নারী ও পুরুষকে কেবলই প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করে, সাম্য ও মুক্তির দাবিকে সেই ধারণার ভিতর আবদ্ধ রেখে, আগামী দিনের সংকটমোচনের পথ বের করা যাবে না।

৬

পরিবার বলে যে প্রতিষ্ঠানটি বহুযুগ ধরে মানুষের সমাজের ভিত্তিতে স্থান পেয়ে এসেছে তাকে নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রবক্তারা রক্ষা করতে চান কি না, কোন মূল্যে রক্ষা করতে চান, এটা একটা বড় প্রশ্ন। এ বিষয়ে নিজেদের ভিতরই এঁদের ঝোঁকের পার্থক্য আছে; আর সেটাই স্বাভাবিক। আন্দোলনের দুই বিখ্যাত নেতা, Betty Friedan ও Simone de Beauvoir, এঁদের ভিতর ১৯৭৫ সালে এক চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়, যা থেকে বোঝা যায় যে বেটি পরিবারকে যতোটা মূল্য দেন সিমন ততোটা দিতে রাজী নন। একথা স্বীকার্য যে প্রতিটি নারী অথবা পুরুষকেই যে পরিবারবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীদের স্থান প্রায়শ পরিবারের বাইরে, শুধু এদেশীয় সমাজেই নয়, ভিন্ন দেশে এবং সম্প্রদায়েও। এমন নারী ও পুরুষ আছে, ভবিষ্যতে বোধ করি আরো অধিক সংখ্যায় তারা থাকবে, যারা সন্ন্যাস গ্রহণ না করলেও পারিবারিক জীবনে আবদ্ধ হতে চাইবে না। সারা সমাজকে এক ছাঁচে ঢালা যাবে না; বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ও বিভিন্ন জীবনযাত্রার জন্য স্থান রাখতে হবে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, পরিবার একটি মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজে মূল্য পাবার অধিকারী কি না? সনাতন সমাজে পরিবারের ভিতর দিয়ে বংশরক্ষা হয়েছে। আরো ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখলে বলা চলে, এর আশ্রয়ে মনুষ্যজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা পেয়েছে। বিজ্ঞানের শক্তিতে প্রজননের নানা নতুন পদ্ধতি উদ্‌ভাবিত হবে। মানবীর গর্ভ নবজন্মের আধার রূপে আবশ্যক না হতে পারে। কিন্তু এক প্রজন্ম, যে বিশ্বাস করতে শিখেছে একটি জন্মের

অধিকার নিয়েই মানুষ পৃথিবীতে আসে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোন যুক্তিতে কোনো প্রকারের ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী হবে, এ প্রশ্নটা একেবারে অবহেলা করবার মতো নয়। শিশু বড় হয়ে ওঠে শুধু যন্ত্রের সাহায্যে নয়, তার জন্য চাই স্নেহ ভালোবাসার উষ্ণ পরিবেশ। ভালোবাসার গুণেই অনেক ত্যাগও আনন্দের মতো মনে হয়। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম অবধি প্রসারিত স্নেহ ভালোবাসার উপাদানে গঠিত উষ্ণ নীড়েরই অন্য নাম পরিবার। অন্তত সাধারণ মানুষের মানসিক সুস্থতার জন্য এই রকম একটি কুলায়ের এতোকাল প্রয়োজন ছিল।

বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ দুই বিরোধী তত্ত্ব, এই যান্ত্রিক ধারণার জীবন্ত প্রতিবাদ পরিবারের ইতিহাস। সেই ইতিহাস একই সঙ্গে কঠিন বাস্তবতায় প্রোথিত আবার আদিম আধ্যাত্মিকতা থেকে উত্থিত। অপরের মধ্যে আপনাকে দেখা, এটাই আত্মিকতার মূল কথা। সন্তানের ভিতর মানুষ আপনাকেই দেখে। আধ্যাত্মিকতার যদিও আরো উদার ও পরিণত প্রকাশ আছে তবু এই আদিম রূপও উপেক্ষণীয় নয়। আমরা এ বিষয়ে সচেতন থাকি না যতদিন না সন্তানের সঙ্গে পিতামাতার আত্মিক সংযোগ নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। সংশয় যত গভীর হয় ততই বিষয়টা বেদনার ভিতর দিয়ে চেতনায় ধরা পড়ে। যে স্নেহভালোবাসার গুণে আমরা ত্যাগের ভিতরও আনন্দ খুঁজে পাই তাকে অবাস্তব বলে উপেক্ষা অথবা উপহাস করবার প্রবণতা আমাদের এই যুগে অনুপস্থিত নয়। এর অসারতা প্রমাণিত হয় জীবনের অভিজ্ঞতায়। নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক সুখের অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষ হঠাৎ আবিষ্কার করে, জীবনের স্বাদ আর সদর্থ হারিয়ে গেছে। যে সব উত্তেজক সুখ একদিন ডেকেছিল, তারাই অবশেষে জীবনকে অর্থহীনতায় ভরে তোলে।

পরিবারের ভিত্তিতে চাই স্নেহ ও শ্রদ্ধা। তাকে রক্ষা করা আজ আর সহজ নয়। শিকারী পুরুষ একদিন গৃহে বদ্ধ নারীর কাছে যে বিশ্বস্ততা দাবি করতে অভ্যস্ত ছিল সেই দাবি প্রত্যাহার করে নেবার দিন এসেছে। বন্ধুত্বের ভিতর থাকে যে বন্ধনহীন গ্রন্থি, আজ স্বামীস্ত্রীর ভিতর তার চেয়ে খুব বেশি চাইতে গেলে স্নেহ আর শ্রদ্ধাও রক্ষা করা কঠিন হতে পারে। মুক্তি আন্দোলনে একটা পর্যায় থাকে যাকে বলা যায় ভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পর্যায়। তখন কিছু হঠকারিতাও ঘটে থাকে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে তার যথার্থ প্রতিকার হয় না। সেজন্য চাই আরো বৃহৎ কোনো আহ্বান।

নারীমুক্তির প্রবক্তারা পুরুষের সঙ্গে সাম্য দাবি করেছেন। এটা স্বাভাবিক, একে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। পুরুষ তার নিজের স্বার্থে, স্বাধীনতার নামে, যে সমাজ গড়েছে তাতে সে সুখ অথবা স্বস্তি পায়নি। অসুখের সাম্যে কোনো মহত্ত্ব নেই। আমাদের এই পীড়িত হতভাগ্য যুগের পুরুষ অথবা নারী কেউই এমন কিছু সমগ্রভাবে লাভ করেনি যা নিয়ে একে অন্যকে ঈর্ষা করতে পারে। নারী ও পুরুষ উভয়কেই এগিয়ে যেতে হবে সহযোগী হয়ে অন্য এক সার্থক লক্ষ্যের দিকে। সেই সহযোগিতার বোধেই আশ্রয় পেতে পারে, উজ্জীবিত হতে পারে, স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা। পরিবার শেষ অবধি রক্ষা পাবে কি না বলা কঠিন। শুধু বলা যায়, পরিবারের আধারেই সৃষ্টি হয়েছে কিছু আদর্শ, কিছু মূল্যবোধ, যাকে বাদ দিয়ে সম্ভবত রক্ষা পাবে না সমাজ। স্বাধীনতা কথাটার ভিতর একটা সমস্যা আছে। আমরা যখন বলি, স্বাধীনতা চাই, তাতে বলা হয় না কিসের জন্য চাই। যদি বলি, যা ভালো মনে করি তারই জন্য চাই, তবু বলা হয় না ভালো কাকে মনে করি। বাইরের অধীনতা থেকে মুক্তি নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু সেই সঙ্গে চাই নিজের ভিতর শ্রেয় সম্বন্ধে একটা ধারণা, যার মূল্যে

স্বাধীনতা হয়ে ওঠে বিশেষ মূল্যবান। নারীর ভিতর যা মূল্যবান তাকে আবিষ্কার করবার প্রশ্নও এই থেকে ওঠে।

প্রাচীন ঐতিহ্যে নারীচরিত্র নিয়ে দুই পরস্পরবিরোধী ধারণার কথা আগেই বলেছি। দু'টির কোনোটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়, আবার দু'টিতেই কোনো-না-কোনো অর্থে কিছু সত্য আছে। নারীকে যখন প্রাচীন শাস্ত্রে পাপের পথ বলা হয়েছে তখন তাতে প্রকাশ পেয়েছে নারীর প্রতি সাধুপুরুষদেরও যে প্রবল আকর্ষণ, তারই বিরুদ্ধে একটা সতর্কবাণী। অর্থাৎ, এই নারীনিন্দায় যে সত্য আছে সেটা প্রধানত পুরুষের প্রকৃতির দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আবার যুগ যুগ ধরে শিল্পীরা নারীর যে সৌন্দর্য ও সুষমায় মণ্ডিত চিত্র অক্লান্ত নিষ্ঠায় তুলে ধরেছে, আজকের নারী আন্দোলনের নেতারা যখন তাতে শুধু কপটতাই দেখে তখন সেই দোষারোপে যতোটা ক্রোধ থাকে ততোটা বোধ থাকে না। নারীর এই ক্রোধ শুধু পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, নিজের প্রকৃতিরও বিরুদ্ধে। এতে একটা আতিশয্য আছে যেটা দুঃখজনক।

আজকের পুরুষশাসিত সমাজের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ক'রে যেসব নারী উল্লেখযোগ্য সাফল্যের অধিকারিণী হয়েছে তাদের সঙ্গে প্রায়ই পুরুষের চরিত্রগত পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পুরুষের সংস্কৃতি যেন তাদের গ্রাস করে নিচ্ছে। সাম্যের ঝোঁকে নারী তার নারীত্বকে বর্জন করবার সাধনায় ব্যস্ত। অথচ এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে যে, এ যুগে পুরুষ যে সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি কিংবা চরিত্রবৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছে শুধু তার অনুকরণ করে সভ্যতার সংকট থেকে মানুষকে রক্ষা করা যাবে না?

নারীর মূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রচিন্তার দুয়েকটি মূল কথা এখানে স্মরণ করবার যোগ্য। যেহেতু উনিশশতকী ব্রাহ্ম ঐতিহ্য থেকে কবির চিত্ত বিস্তার লাভ করেছিল একটা স্বোপলব্ধ ঔদার্যে, অতএব তাঁর চিন্তায় পরিবর্তন ও গতিশীলতা প্রত্যাশিত। তবু সেই চিন্তার ভিত্তিতে কিছু স্থায়ী উপলব্ধি ছিল। সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নারীকে তিনি চেয়েছেন, কিন্তু সে নয় পুরুষশাসিত সংস্কৃতির অনুকরণশীল নারী। নারীত্ব বলতে যা কিছু যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠেছে তার সবই উপেক্ষার যোগ্য, সবই মূল্যহীন, সবই বর্জনীয়, এমন চিন্তায় সত্য নেই। নারীত্বের ভিতরই এমন কিছু বিশিষ্টতা আছে জৈব স্তর থেকে যা উন্নীত হয়েছে সংস্কৃতিতে, মমতা শ্রী ধৈর্য, যাকে কবি বিশ্বের কাজে আহ্বান করেছেন।

এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ নানা স্থানে নানাভাবে বলেছেন। নারী ও পুরুষের ভিতর যে ভেদ আমরা দেখি তার সবটাই যে সমান সত্য অথবা শ্রদ্ধেয় নয় একথাও অবশ্য তিনি জানতেন। ঐ ভেদ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "মানুষ আপনার কল্পনা ও সংস্কারের দ্বারা তাকে অনেক দূর বাড়িয়ে তুলেছে।" (বিচিত্রা, ১৯২৮) তাই বলে নারী ও পুরুষ অভিন্ন, এমন চিন্তাও তাঁর আছে উপযোগী কিংবা গ্রহণীয় মনে হয়নি। নারী পুরুষের ভিন্নতা কিছুটা প্রকৃতির সৃষ্টি। কিছুটা ইতিহাসের। সেই ইতিহাসকে স্বীকার করে নিয়েই তার ভিতর থেকে একটা মহত্তর সমন্বয়ের ধারণা তিনি তুলে ধরেছেন।

ঐতিহ্যের সূত্রে নারী ও পুরুষ যা-কিছু পেয়েছে তার সবটাই সমান মূল্যবান নয়। ছোটো সীমার ভিতর নারীকে দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকতে হয়েছে বলেই তার চরিত্রে এমন কিছু সংকীর্ণতা এসে গেছে যাকে আজ সচেতনভাবে অতিক্রম করা আবশ্যক। অপর পক্ষে ক্ষমতার লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিষ্ঠুরতার ভিতর দিয়ে পুরুষের চরিত্রে গভীরভাবে ঢুকে গেছে এমন একটা বর্বরতা, মানুষের সভ্যতায় যেটা বারবার বিপদ ডেকে আনছে।

কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে তোলা যাক। আজকের জগৎ যে-নীতিতে চলছে তার সবটাই কি সমর্থনযোগ্য নিছক প্রয়োজনের যুক্তিতে? ক্ষমতা যাদের হাতে তাদের ব্যাখ্যাটা

অবশ্য ঐ রকমই। যুদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয় সেটা প্রয়োজন ছিল। আমলাতন্ত্রের অনম্য স্তরভেদ আর অজস্র জটিলতা, সব কিছুর জন্যই আছে প্রয়োজনের যুক্তি। এই সব প্রচণ্ড 'বাস্তব' যুক্তির পিছনে উঁকিঝুঁকি মারছে একটা মূঢ় ঐতিহ্যের প্রকোপ। শিকারে অভ্যস্ত মানুষকে শিকারের সুযোগ খুঁজতে হয়, মাতাল যেমন খোঁজে মদ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার নেশায় বাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসায় হিংসা। নারীর ভিতর আছে অন্য এক তেজ, শতাব্দীসঞ্চিত মাতৃত্বের তেজ, অন্য এক লাবণ্য, প্রকৃতিসঞ্জাত, অগণিত শিল্পীর সাধনায় আর আত্মনিবেদনে স্বীকৃত। পৌরুষের যেমন একটা আদর্শ রূপ আছে তেমনি নারীত্বের। যাকে বাস্তব বলে আমরা চিনি শুধু তাই দিয়ে আমরা রক্ষা পাই না।

নিবেদিতার ভিতর রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এক লোকমাতার ভাব। দুঃখী মানুষের প্রতি মাতৃস্নেহের প্রসার, নারীর আত্মার বিস্তারের, আত্মীয়তার প্রসারের, রূপ এই। কবি একে দিতে চেয়েছেন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি। একে অস্বীকার করলে ঐতিহ্যের একটা শক্তিকে অযথা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। সংসারে এর প্রয়োজন আছে। আশা রাখতে হবে যে, নারীর এই শক্তি নিযুক্ত হবে সমাজের কর্কশতা ও উচ্চাবচতাকে একটা সমতার দিকে চালনা করবার প্রচেষ্টায়। এ দায়িত্ব অবশ্য শুধু নারীরই নয়, পুরুষেরও। তবু ঐতিহ্যই নারীকে দিয়েছে একাজে নেতৃত্বের বিশেষ যোগ্যতা। নারীর এই ছবিতে আছে বাস্তব ও আদর্শকল্পনার সমাবন্ধ। একেও ইতিহাসের কাজে লাগাতে হবে। নারী ও পুরুষের ভিতর জৈব স্তরে যেমন একটা পরিপূরকতা আছে তেমনি মানুষের সংস্কৃতির ভিতরও আছে পৌরুষ ও নারীত্বের দ্বৈতে বিধৃত ঐক্যের প্রতিশ্রুতি। সভ্যতার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এরই প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন আশার আলো দেখেছিলেন।

মেয়েরা যে বাইরের বিশ্বে আজ দলে দলে যোগ দিচ্ছে এই ঘটনাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর শেষ জীবনের চিন্তায় এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট। পঁচাত্তর বছর বয়সে লেখা একটি প্রবন্ধে তিনি বলছেন : "ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে। একা পুরুষের গড়া সভ্যতায় যে ভারসামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই প্রলয় বাধাবার লক্ষণ আনে, আজ আশা করা যায় ক্রমে সে যাবে সাম্যের দিকে।...আদিকাল থেকে পুরুষ আপন সভ্যতাদুর্গের ইঁটগুলো তৈরি করেছে নিরন্তর নরবলির রক্তে...এ সভ্যতা ক্ষমতার দ্বারা চালিত, এতে মমতার স্থান অল্প।.... সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প আশা করা যাক। এ আশা যদি রূপ ধারণ করে তবে এবারকার এই সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই।" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী'তে ১৯৩৬ সালে, 'নারী' শিরোনামে। যে সমাজকে মানুষ লাভ করেছে অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে, নারী সেখানে স্থান করে নেবে শুধু পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়। কোনো এক যুগে স্ত্রী পুরুষের পরিপূরকতা রূপ নিয়েছিল ঘর ও বাইরের ভিতর বিচ্ছিন্নতায়। সে যুগের অবসান সূচিত হয়েছে। আজ "ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে" নারী ও পুরুষের স্থান হবে পাশাপাশি অন্য এক ঐতিহাসিক কাজের যুগ্ম সম্পাদনে। "অতি দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার ব্যবস্থা ভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতা হয়েছিল একঝোঁকা।" সামঞ্জস্যস্থাপন ছাড়া এখন বিপর্যয় ঠেকাবার উপায় নেই, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস। পরিবার পল্লী ও নগরসহ বৃহত্তর সমাজের নতুন বিন্যাসে নারীর সেবা ও কল্পনা, পরিচালিকা শক্তি ও সৃষ্টির তেজ যদি সভ্যতাকে নিয়ে যায় বৈষম্যমোচনের দিকে, নিযুক্ত হয় এক আশ্রয়দাত্রী আত্মীয়বুদ্ধির বিকেন্দ্রিত বাস্তব রূপায়ণে, তবেই নারীর মুক্তিতে উচ্চারিত হবে সমাজের সামগ্রিক মুক্তির আশ্বাস। সমাজকে মুক্ত করতে গিয়েই নারী

অর্জন করবে তার নিজের মুক্তি। এই পথেই আশা করা যায় মনুষ্যত্বেরও ঐতিহাসিক রূপান্তর। সেটা নারী ও পুরুষ উভয়েরই ব্যক্তিসত্তার রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে কেউ কেউ লক্ষ করেছেন নারীত্বের আদল। অথচ তাঁর পৌরুষ ছিল উজ্জ্বল ও তেজস্বী। মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে আমাদের চিনে নিতে হবে একা পুরুষের ভিতর নয়, নারীর ভিতরও নয়, বরং অর্ধনারীশ্বরের সেই প্রাচীন প্রতিমায় মানুষের খণ্ডিত সংস্কৃতির ভিতরে যা সঞ্চার করতে পারে একটা প্রতীকী সার্থকতা।

৭

ভবিষ্যতের সমাজের অন্য একটা ছবি কল্পনা করা কঠিন নয় আজকের দৃষ্টিতে যেটা অদ্ভুত, অনেকের কাছে ভয়াবহ। বিয়ে ব্যাপারটা সেই সমাজে সাধারণ নিয়মের ভিতর নেই, সেটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। অধিকাংশ শিশুর জন্ম ঘটছে সেখানে বিবাহবন্ধনের বাইরে, মাতৃজঠরেরও বাইরে। একক পুরুষ অথবা নারী নিঃসঙ্গতা এড়াবার জন্য কোনো শিশুকে হয়তো গ্রহণ করছে নিজের রুচি অনুযায়ী, আবার যখন খুশি তাকে তুলে দিচ্ছে সরকারী কিংবা বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের হাতে। ছবিটাকে সম্পূর্ণ করবার প্রয়োজন নেই। অনুমানের হাতে বাকিটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এটা যদিও কল্পনা তবু আজকের উন্নত সমাজের কিছু ঝোঁক অঙ্গুলিনির্দেশ করছে এই দিকেই।

এই সম্ভাব্য ভবিষ্যতের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠবে তার কিছুটা যে আমাদের পুরনো সমাজের অভ্যাসজাত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুয়েকটি গুরুতর সংশয় তবু থেকেই যায়।

যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে মানুষ এসেছে কিছুটা বাস্তব প্রয়োজনে, কিছুটা মনেরও প্রয়োজনে। বাস্তব প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে যন্ত্রেও, এ যুগে তারই প্রাধান্য। চেষ্টা চলছে মানুষের হৃদয়ের প্রয়োজনটাও যথাসম্ভব যন্ত্র দিয়েই মেটাবার। অর্থাৎ, মানুষকে যথাসম্ভব বাদ দিয়েই যাতে মানুষের কাজ চলে সেই চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। আমরা সাম্যের ইমারত গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি এই রকমই একটা যান্ত্রিকতার ভিত্তিতে।

এতে একটা অসুবিধা আছে। ভালেবাসা শুধু পেতে চায় না, দিতেও চায়। যন্ত্র পাবার ইচ্ছেটাকেই প্রবল করে তোলে, দিতে শেখায় না। যন্ত্র মানুষকে করে তোলে ভোগবাদী, ত্যাগী করে না। যদিও যন্ত্র মানুষেরই সৃষ্টি তবু যান্ত্রিকতার গুণে অধিকাংশ মানুষ স্রষ্টার ভূমিকা থেকে নির্বাসিত। এক অসহনীয় একাকিত্বের দিকে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে আধুনিক মানুষ। কিছু সুখকর উত্তেজনার সাহায্যে সেই কৃষ্ণ গহ্বর থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে চাইছে সে। কিন্তু এ পথে স্থায়ী উদ্ধার সম্ভব নয়।

সৃষ্টির কাজের মূলে আছে একটা যোগের আনন্দ। নারী ও পুরুষের ভিতর প্রকৃতি রচনা করেছে যোগের আনন্দের একটি স্বাভাবিক ক্ষেত্র। সে আনন্দ খণ্ডিত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে কখনো নারীর সামাজিক অধীনতার অবরুদ্ধতায়, কখনো ভোগলিপ্সু প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের বিষাক্ত বাষ্পে, নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিতরও যার ব্যাপক প্রবেশ ঠেকানো যায়নি। যার অন্তর্নিহিত পরিণতি যোগের উত্তরণে, তাকে পরিপূর্ণ করা যাবে না করুণাহীন স্বাতন্ত্র্যের অহমিকায়। আমাদের যুগের পক্ষে এ এক কঠিন পরীক্ষা। ভবিষ্যতের সমাজ কেমন হবে আমরা জানি না। সে সমাজের ভিত্তিতে থাকবে কি না ভালোবাসা, রক্ষা পাবে কি না দেবার আর পাবার আনন্দ, সেটাই প্রশ্ন। এরপর এটা আর

নারীমুক্তির আলাদা প্রশ্ন থাকে না, হয়ে ওঠে এযুগের মানুষের সমস্যা, সমকালীন মানবসভ্যতারই দায়। নাগরিক সংস্কৃতির আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। আধুনিকতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট কীর্তি, তার পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গির দান অনেকখানি। কিন্তু এরই ফলে আবার একটা সংকট ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে। এযুগে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যবহারিক স্বার্থ। এটাই আধুনিক মানুষের আচরিত জীবনদর্শন। পুরুষ চলছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উপযোগবাদের পথ ধরে। নারীমুক্তির নামে যে সব অধিকার আজ দাবি করা হচ্ছে তারও মূলে আছে একই কথা। নাগরিক আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয় বরং তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, এই আন্দোলন এবং তার বিবিধ দাবী। অথচ আজ সন্দেহ দেখা দিয়েছে ঐ জীবনদর্শনটা নিয়েই। ঐখানেই সংকটের মূল।

রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তিত হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে ইয়োরোপ থেকে ফিরে আসবার পর গ্রামবাসীদের কাছে এক ভাষণে এই দুশ্চিন্তার কথা তিনি নিবেদন করেছিলেন অতি সরলভাষায়। "একটি কথা তোমাদের কাছে বলা দরকার—অনেকেই হয়তো তোমরা অনুভব করতে পারবে না কথাটি কতখানি সত্য। পশ্চিমের দেশবিদেশ হতে এত দুঃখ আজ প্রকাশ হয়ে পড়ছে ভিতর থেকে—এরকম চিত্র যে আমি দেখব মনে করিনি। তারা সুখে নেই।" সেই অসুখ বেড়েই চলেছে। 'ব্যবহারিক সম্বন্ধ' নয়, যাকে তিনি বিশেষ অর্থে 'আত্মীয়সম্বন্ধ' বলেছেন, যাতে আত্মার প্রকাশ, সমাজের মূলে তাকে রক্ষা করতে না পারলে মানুষের সমাজ সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, এই ছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী। তিনি পথ খুঁজছিলেন এক দ্বান্দ্বিক উত্তরণের। পৌরুষ ও নারীত্বের পরিপূরকতায় সেই উত্তরণ। যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন ব্যক্তিত্বের মূল্যেও বিশ্বাসী সেই কারণে এ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি বিশেষ মূল্যবান। যুগচেতনার এক গভীর স্তর থেকে উত্থিত এই প্রশ্ন লিঙ্গের দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে যায়। নারীমুক্তির নেতাদের চিন্তার পরিধির ভিতর এ প্রশ্নটাকে রাখা চাই। এছাড়া মনুষ্যত্বের মুক্তি কল্পনা করা কঠিন। সব সার্থক আন্দোলনই সার্থকতর হয়ে ওঠে নিজেকে অতিক্রম করার ভিতর দিয়ে।

দ্বন্দ্ব

সত্য সরল। তবুও জটিল। সত্য-যে জটিল তার প্রধান কারণ, সত্যের গঠনে থাকে বিপরীতের সমন্বয়। এই সব বিপরীতের প্রতিটিই সরল। এদের সমন্বয় সরল নয়। এর উদাহরণ সর্বত্র ছড়ানো আছে। যে-কথাটাকে অকাট্য সত্য বলে মনে হয়, দেখা যায় তার বিপরীত কথাটাও একেবারে মিথ্যা নয়। বিশেষত ভালোমন্দের বিচারে আমরা বারবারই এইরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন হই।

স্বার্থপরতা ও মিথ্যাভাষণ মন্দ। এটা প্রায় অকাট্য সত্য। সবাই যদি মিথ্যা বলতো তবে কারো কথাতেই কেউ বিশ্বাস রাখতে পারতো না। একসঙ্গে কাজ করাই তবে

অসম্ভব। সমাজজীবন এভাবে চলতেই পারে না। কিছুটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস নিয়ে কাজ করা যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়ে কোনো সামাজিক জীবনই সম্ভব নয়। পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহানুভূতি শুধু প্রশংসনীয়ই নয়। এসব বাদ দিয়ে মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন দাঁড়াতেই পারে না। সত্যই সহযোগিতার আদর্শ ভিত্তি।

সীমাহীন সহানুভূতি কিন্তু অচল এবং অসহ্য। এটাও অস্বীকার করা কঠিন। অন্যের দুঃখকষ্টকে যখন আমরা অনেকটা নিজের দুঃখকষ্টের মতো অনুভব করি তখন তাকেই বলি সহানুভূতি। আপন কোনো মানুষ চোখের সামনে যন্ত্রণা ভোগ করছে এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে স্থির থাকা খুবই কঠিন। আমাদের স্নেহাস্পদ কেউ যখন অভুক্ত তখন আমাদের খেতে রুচি হয় না। সর্বজীবে প্রেমের কথা ধর্মে বলা হয়। সব মানুষকে সমান চোখে দেখা আদর্শের কথা। কিন্তু সর্বক্ষণই তো জগতে কেউ অভুক্ত আছে। কিছু মানুষ যন্ত্রণাভোগ করছে। সকলের প্রতি সমবেদনা যদি আমাদের হৃদয়ে সজীব থাকে তবে কি আমাদের পক্ষে এক মুহূর্তও স্থির থাকা সম্ভব? নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য কি আমাদের সহানুভূতির সীমা ছোটো করে আনতে হয় না? কলকাতার রাস্তায় প্রতিনিয়তই আমরা দেখছি, কিছু হতদরিদ্র মানুষ নর্দমা থেকে খাদ্য কুড়িয়ে খাচ্ছে। তারপরও কিন্তু আমাদের খাদ্যে রুচি থাকে। হৃদয়কে অনেকখানি কঠিন, নিষ্প্রেম করে তবেই এটা সম্ভব হয়। হৃদয়ের এতোটা কাঠিন্য ভালো কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সীমাহীন সহানুভূতি নিয়ে বাঁচা দুঃসাধ্য।

দ্বন্দ্বের আরো একটু জটিল উদাহরণ এবার লক্ষ করা যাক। জ্ঞান ও প্রেম দু'টিকেই সর্বত্র আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ আকাঙ্ক্ষা করা মানুষের সহজ ধর্ম। সর্বদেশে সর্বকালে শিল্পসাহিত্যসঙ্গীতের ভিতর দিয়ে মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা উচ্চারিত হয়ে চলেছে। এ থেকে যখন সে একেবারে বঞ্চিত হয় তখন আহত প্রেম হিংসার রূপ ধরে, মানুষের ভিতরে এবং বাইরে বিরোধ ও বিনাশের শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। জ্ঞান নানাবিধ, স্তরভেদে প্রেমের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বদলে যায়।

জ্ঞানতৃষ্ণা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলে স্বীকৃত, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের প্রধান পার্থক্য অনেকে এইখানে খুঁজে পেয়েছেন। অথচ সাংসারিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক অনেক সময়েই সহায়ক বলা যায় না। শৈশবের অনেক স্বপ্ন যেমন বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দূরে মিলিয়ে যায়, প্রেমের স্বাভাবিক শক্তিও তেমনি সংসার সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকের পক্ষেই রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। এযুগে সমস্যাটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কৈশোরে পা রাখতে না রাখতেই সংসারের একটা নগ্ন বীভৎস চেহারা নতুন প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। এই তীব্র বাস্তববোধ বহু তরুণের মনে এমন একটা ঘৃণা আর অশ্রদ্ধার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে যে, সেখানে বিশ্বপ্রেমের কথা হাস্যাস্পদ ভাবালুতা বলেই প্রত্যাখ্যাত হয়। নির্বোধেরাই ভালোবাসে, এই জ্ঞানে বহু তরুণ-তরুণী কোনো না কোনো প্রকারে আত্মহননের পথে এগিয়ে যায়। চেতনার এই এক স্তর যেখানে জ্ঞান ও প্রেমের ভিতর বৈর সম্পর্ক এযুগের এক কঠিন সমস্যা। অন্য কোনো স্তরে উত্তরণ অনেকের পক্ষেই অনিশ্চত সম্ভাবনা মাত্র। অনেকেরই অনিবার্য গতি তাই এক অসমন্বিত, আত্মধ্বংসী দ্বন্দ্বে।

এই দ্বন্দ্ব আরো জটিল, আরো বিভ্রান্তকারী হয়ে উঠেছে জীবন সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান এক উদ্দেশ্যহীনতার আক্রমণে। সে কথায় পরে ফিরে আসা যাবে।

(খ)

এবার প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক।

মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আছে। মানুষের প্রকৃতি আর ঐ সম্পর্কটা নিয়ে কিন্তু তর্কের অভাব নেই। কেউ বলেছেন, মানুষের ভিতর স্বার্থবুদ্ধিই প্রধান, এটা মেনে নিয়েই সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে আমাদের চিন্তা শুরু করা উচিত ; এর বিপরীত চিন্তা অবাস্তব। হব্‌স্ কিংবা এডাম স্মিথের কথা এখানে মনে আসে।

স্মিথ বলেছিলেন, কল্পনা করা যাক হঠাৎ একদিন সংবাদ এলো যে চীনদেশটা এক দৈব দুর্বিপাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাতে আমাদের ভিতর প্রতিক্রিয়া কী হবে ? কিছুক্ষণ আমরা জীবনের অনিশ্চয়তা নিয়ে, ভঙ্গুরতা বিষয়ে, কয়েকটি বিষণ্ণ দার্শনিক মন্তব্য করব, তারপর দৈনন্দিন কাজে মন দেব, যেন কিছুই হয়নি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য আঁচড় পড়লে কিন্তু আমরা যথার্থই উদ্বিগ্ন হতাম। স্বার্থ মানুষকে যতটা নাড়া দেয় অন্য কিছুই তেমন দেয় না। স্মিথ বলছেন, যে-সব পরস্পরনির্ভর কাজ নিয়ে আর্থিক জীবনের গঠন, সে সবের পিছনে স্থায়ী ও প্রধান পরিচালক শক্তি হচ্ছে স্বার্থ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাজারকে ভিত্তি করে যে আর্থিক ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থা, তার সমর্থনে ঐ স্কট অর্থবিজ্ঞানীর মতামত অনেকেই উদ্ধৃত করে থাকেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে দাঁড়িয়ে আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, উদ্ভাবনীশক্তি ক্রমাগত প্রয়োগ করে যায় বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, আর এইসবের ভিতর দিয়ে সারা দেশেরই উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে চলে।

আমরা জানি, এই সরল চিত্রটিকে সম্পূর্ণ সত্য বলে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বাজারভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অর্থনীতিতে অসাম্য বাড়ে, ধনসম্পদের অপচয় ঘটে, মানুষের সুখশান্তি নষ্ট হয়। এ নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ করতে গেলে অন্য এক প্রবন্ধ দাঁড়িয়ে যাবে। সেটা এখানে অনাবশ্যক।

সত্য আবারও জটিল। মোট কথা, কেবল স্বার্থবুদ্ধিকে অবলম্বন করে কোনো সুষ্ঠু সামাজিক বা আর্থিক ব্যবস্থা দাঁড়াতে পারে না। অথচ স্বার্থবুদ্ধি বর্জন করে কোনো ব্যবস্থা অন্তত এযুগে আমরা দাঁড় করাতে পারিনি। সাম্যবাদী নামে যেসব দেশ পরিচিত সেখানেও স্বার্থের দ্বন্দ্ব দূর করা যায়নি। বিশেষত ক্ষমতা নিয়ে সংঘর্ষ সেখানে ভয়াবহ রূপে বারবার দেখা গেছে। স্টালিন-ট্রট্‌স্কির দ্বন্দ্ব বিখ্যাত হয়ে আছে নাটকীয়তার গুণে। কিন্তু ট্রট্‌স্কিই একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না স্টালিনের। হত্যাকাণ্ডের অর্ধশতাব্দী পর সম্প্রতি বুখারিনের 'পুনরুদ্ধার' হয়েছে। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এইরকম অসংখ্য হত্যা ঘটিয়েছিলেন সাম্যবাদী সোভিয়েতের রাষ্ট্রনেতা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা জিনিসটা শুধু অর্থনীতিতে নয়, রাজনীতিতেও কত ভয়ংকর আকার ধারণ করতে পারে, এযুগে সাম্যবাদী দেশগুলি তার মুখ্য উদাহরণ হয়ে আছে। তবে এদেশে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতেও উদাহরণের অভাব নেই।

সমস্যাটা তা হলে এই : ধনই হোক বা ক্ষমতাই হোক, স্বার্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত্যাগ করা কঠিন, আবার ঐ ভিত্তিতে কোনো সুন্দর সমাজ গঠন করাও অসম্ভব। বাস্তবে নানা বিপরীত প্রবৃত্তিকেই সমাজজীবনে স্থান দিতে হয়। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এইসব বিপরীতের ভিতর কোনটাকে প্রাধান্য দিতে হবে, আর কীভাবেই বা সেটা সম্ভব ?

এডাম স্মিথ স্বার্থবুদ্ধির কথা বলেছিলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি সেখানেই আবদ্ধ

থাকেননি। সহানুভূতিকেও তিনি মানবপ্রকৃতির এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। স্মিথ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একথাটা অনেকেই কেন যেন ভুলে যান। সহানুভূতির সবচেয়ে সহজ প্রকাশ পরিবারের ভিতর, প্রতিবেশীর ভিতর, কাছের মানুষদের নিয়ে গঠিত আপন সমাজে। সেখানেও অবশ্য হিংসাদ্বেষ আছে। তবু সহানুভূতির শক্তিকে অস্বীকার করা ভুল, সেই শক্তিতেই ছোটো ছোটো গোষ্ঠী ও সমাজ বহু দৈব দুর্বিপাক এবং ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করেও টিকে আছে।

স্বার্থবুদ্ধিকে ভিত্তি করে যেমন বাজারের অর্থনীতির কথা বলা হয়েছে, সহানুভূতিকে কেন্দ্র করে তেমনি এক বিকল্প সমাজব্যবস্থার কথা ভাবা যায়। সহানুভূতির স্বাভাবিক বৃত্তগুলি ছোটো। তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এক বিকেন্দ্রিত সমাজের রূপরেখা কল্পনা করা যায়। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মতো এদেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তকদের অনেকে ঐভাবে চিন্তা করেছেন।

এযুগে বৃহৎ সমাজের ওপর ক্ষমতালোভী রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই ব্যবস্থাতেই এই ব্যাপারটা ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এদের নাম দেওয়া যায় রাষ্ট্রতন্ত্র। রাষ্ট্রতান্ত্রিক দেশের সাধারণ ধর্ম জাতীয়তাবাদ বা রাষ্ট্রীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ এইরকমের জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। এর মূলে তিনি দেখেছিলেন ক্ষমতালিপ্সা, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি বা আত্মীয়ভাব নয়।

বিকেন্দ্রিত সমাজব্যবস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনীতিক সংগঠন নিয়ে গান্ধীজীর চিন্তা উল্লেখযোগ্য। তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা যাবে না, অন্যত্র করা হয়েছে। কিছুকাল যাবৎ আমরা পঞ্চায়েতীরাজের কথা বেশি করে শুনছি। গান্ধী বলেছিলেন গ্রামস্বরাজের কথা। তিনি জোর দিয়েছিলেন আর্থিক স্বয়ম্ভরতার ওপর। গ্রামস্বরাজকে সার্থক করে তুলতে হলে দলীয় শাসন থেকে দূরে সরতে হবে। রাজনীতিক দলগুলি ক্ষমতার সংগ্রামে মত্ত, ক্ষমতার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ তাদের সাহায্যে কখনো পূর্ণতা লাভ করবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গান্ধীর প্রদর্শিত পথ, অহিংস অসহযোগ। দলীয়তা ক্ষমতালোভী বলেই তাতে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন অন্যায়।

গান্ধীজীর মত ও পথ অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হয়েছে। কোনো আদর্শেরই বাস্তবে সম্পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব হয় না। তবু কোন দিকে অগ্রসর হতে হবে সেটাই প্রধান প্রশ্ন। অতিকেন্দ্রিক বৃহৎ সমাজের একটা বিকল্প চিত্র গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পাওয়া যায়। বহুদিন অবধি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে নিয়েই আমাদের চিন্তা আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে। যখন দেখা গেল যে, আজকের জগতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নামে যে-দুটি পরিচিত ব্যবস্থা আছে সেই দুটির ভিতর অনেকখানি মিল আছে, দুটি ব্যবস্থাই রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রকারভেদ হয়ে উঠেছে, তখন অন্য এক বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন দেখা দিল। সেই চিন্তাভাবনা দেশে-বিদেশে শুরু হয়ে গেছে। তার সবটাই গান্ধীজীর নামের সঙ্গে যুক্ত এমন নয়। তবু গান্ধীচিন্তার সঙ্গে এই নতুন চিন্তার মিল অনেকখানি।

পশ্চিমী ও সোভিয়েত শিবিরের দ্বন্দ্ব, বিপ্লবের সত্তর বছর পর, ক্ষমতার লড়াই হয়ে বেঁচে আছে ; তার আদর্শগত ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আদর্শের দ্বন্দ্বটা অন্যত্র ; তার সমাধান অন্যত্র। সেইখানে গান্ধী নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন।

নতুন সংগঠন প্রয়োজন। তবু শুধু প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের জোরে কোনো আদর্শ শেষ অবধি রক্ষা পায় না। এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে পূবে পশ্চিমে সবদেশে। এদেশের অগ্রণী চিন্তকেরা যে স্বদেশীসমাজ বা আত্মীয়সমাজের কল্পনা করেছিলেন তার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনো একটা সাংগঠনিক কৌশলে মানুষ ও সমাজকে দোষমুক্ত করা যায়, আদর্শে পৌঁছে দেওয়া যায়, এ ধারণা ভ্রান্ত।

এযুগের বিজ্ঞান নাগরিক সভ্যতার অবদান। বিজ্ঞানের শক্তি নগরকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, উচ্চাভিলাষ, কর্তৃত্বের অহংকার। যদিও আত্মীয়সমাজে অন্য এক আদর্শের বীজ আছে তবু বিজ্ঞানের অভাব গ্রামকে দিয়েছে জড়তা, মূঢ়তা, অসহায়তা। এই সংকটের ভিতর থেকেই উঠে আসে এক নতুন সমন্বয়ের কল্পনা। সেই সমন্বয়ে পৌঁছবার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সোজা রাস্তা নেই। ধর্ম নিয়ে যাঁরা একটু তলিয়ে চিন্তা করেছেন তাঁরা একথাটা ভালোভাবেই জেনেছেন যে, ধর্মের সারবস্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের জোরে রক্ষা করা যায় না। সমাজের সারবস্তু সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্ত সত্য নয় এমন মনে করবার কারণ নেই, যদিও এবিষয়ে আমাদের মন থেকে মোহ দূর হতে চায় না। সংগঠনের গুরুত্ব অস্বীকার করা অবশ্য ভুল। দুই বিপরীত ভ্রান্তির ভিতর থেকে এখানেও পথ খুঁজে নিতে হবে।

গভীরভাবে বিবেচনা করবার মতো কিছু প্রশ্ন এখানে এসে পড়ে। আমাদের আলোচনার পরিসর অতিসংক্ষিপ্ত। একটি মূল কথার ভিতর দিয়ে আরো নানা কথার ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

মানুষ জীবটির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তার ব্যবহারিক জীবনে একটা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে, তা নইলে তার ভিতরে বিশৃঙ্খলা এসে যায়। এ শুধু বাইরের বিশৃঙ্খলা নয়, লক্ষ্যহীনতায় মনের ভিতরই আমরা পথ হারিয়ে ফেলি। অতীতে এই সমস্যা তেমন গুরুতর ছিল না। ইতিহাসের আদিযুগে মানুষকে লক্ষ্য বেছে নিতে হয়নি, প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকেই সেটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কোনো প্রকারে প্রাণরক্ষা করাটাই তখন লক্ষ্য। সেদিন প্রাণরক্ষার জন্য নিজেকে প্রাণপণে প্রস্তুত করে তুলতেই মানুষের অধিকাংশ শক্তি নিযুক্ত হত। আজও দারিদ্র্যের চাপে অনেক মানুষের জীবনে অবস্থা এইরকম।

ঐতিহ্যের শক্তিও এইসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রাচীন সমাজে লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় ঐতিহ্যের দ্বারা। সেই সমাজে অন্যায়ের অভাব নেই, কিন্তু লক্ষ্যহীনতা সেখানে মৌল সমস্যা নয়। ঐতিহ্যের অনুসারী কর্মকাণ্ড জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। অতিদীর্ঘকাল মানুষের জীবন কেটেছে এইভাবে। অন্তত অধিকাংশের জীবনে এটাই হয়ে উঠেছে প্রধান ধারা। আধুনিক যুগে পৌঁছবার পর ঐতিহ্যের বন্ধন আজ শিথিল। তবু রাষ্ট্রের শাসনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়মে কিছু লক্ষ্য আবারও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে শিল্পপ্রধান সমাজে।

এই যে ব্যবহারিক জীবনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের বন্ধন, এরই ভিতর দিয়ে মানুষের চরিত্রে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছু দোষ এবং গুণ গঠিত হয়ে ওঠে। প্রাত্যহিকতার সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য মানুষের কৌতূহল ও সহানুভূতির সীমাকে সংকীর্ণ করে তোলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষ হয় হৃদয়হীন, সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাপটা ক্রমে অমানুষিক হয়ে ওঠে। সম্ভবত সেই কারণেই আধুনিক সমাজ যে-সমস্ত উদ্দেশ্য স্থির করে দেয়, নতুন প্রজন্মের অনেক তরুণই সেইসব আর মনেপ্রাণে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে পারছে না। অথচ এ বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই যে, একলব্যের যেমন একটা লক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল একাগ্রতার জন্য, অনুশীলনের জন্য, আর অনুশীলন ছাড়া অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটে না, আমাদের অধিকাংশের প্রকৃতিতেই তেমনি সুস্থ থাকবার জন্যই একটা লক্ষ্যাভিমুখিতার প্রয়োজন আছে।

দারিদ্র্য বহুকালের সমস্যা। এযুগের বিশেষ সমস্যা, সমৃদ্ধির ভিতরই হতাশা, লক্ষ্যহীনতার হতাশা। নৈরাশ্যকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে এক উত্তেজক তবু জীবনবিমুখ জীবনদর্শন। একদিকে উচ্চাভিলাষী অমানুষিকতা, অন্যদিকে উদ্দেশ্যহীনতার যন্ত্রণা ও ব্যর্থতা, এ-দুয়ের সীমানা অতিক্রম করা যাবে কোন পথে ? এই অন্য এক দ্বন্দ্ব, যদিও প্রাচীন তবু বিশেষভাবে এযুগেরই। কর্মে ও অনুশীলনে নিজেকে গভীরভাবে নিযুক্ত করবার শক্তি ও অভ্যাস আমরা অর্জন করব অথচ কর্মই আবার বন্ধন হয়ে আমাদের বেঁধে ফেলবে না, কঠিন এই শর্ত। তবু এছাড়া কি মুক্তির পথ আছে ? সেই মুক্তি ব্যক্তিকে লাভ করতে হবে নিজেরই অন্তরে। সমাজ হতে পারে সহায়ক, নয়তো প্রতিবন্ধক। কিন্তু ত্রাণকর্তা হবেন ব্যক্তি স্বয়ং। তা নইলে ত্রাণ নেই।

শাস্ত্রের বাণী গজদন্তের মতো বহুমূল্য ও শীতল। কিন্তু আসল কথাটা অন্য ভাষাতেও বলা যায়। বিবেকানন্দ ফুটবল খেলার কথা বলেছিলেন। খেলার প্রথম কথা শরীরচর্চা। শরীরই আদ্য। আমাদের দেশে কমখরচে বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে এমন খেলা চাই। ফুটবল এইদিক থেকে উপযোগী। কোনো কোনো খেলায় ব্যক্তির কৌশলটা প্রধান। ফুটবলে দলের ভিতর পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কাজ এগোয় না। শরীরচর্চার সঙ্গে গোষ্ঠীজীবনে সহযোগিতার এই শিক্ষা মূল্যবান। এখানেও কিন্তু কথা শেষ নয়, আরো আছে। খেলোয়াড় মনপ্রাণ দিয়ে খেলবে, তারপর হারজিত যাই ঘটে হাসিমুখে তাই মেনে নেবে। এটাই তো 'খেলোয়াড়ী মনোভাব,' আর এটাই কর্মযোগ।

মনপ্রাণ দিয়ে অনুশীলনে 'মানুষ তৈরি' হয়, হারজিত সাময়িক ঘটনা। আমাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক জগতে হারজিতের ব্যাপারটাই অতিশয় বড় হয়ে উঠেছে। এতে সংসারের খেলায় শ্রী থাকে না। যখন দেখা যায় ফুটবল খেলার শেষে মাঠে মারামারি, রাস্তায় দাঙ্গা, তখন বুঝতে হবে, সংকট গভীর। দলবিশেষের নয়, মনুষ্যত্বেরই সেখানে পরাজয়। একটা লক্ষ্যের জন্য নিবিষ্ট হয়ে কাজ করবার শিক্ষা চাই, আর ফলাফলের দুশ্চিন্তা ত্যাগ করেই সেই কাজ করতে হবে। এটাই খেলার মূল শিক্ষা, জীবনেরও।

দ্বন্দ্ব ও উত্তরণ (১৯৮৯)

দ্বন্দ্বের রূপভেদ

মানুষে মানুষে বৈরসম্পর্কের মূল কোথায় ? এ প্রশ্নের নানারকম উত্তর আছে। যে উত্তরটা সাম্যবাদী চিন্তার প্রভাবে অনেকের কাছে অল্পবেশি পরিচিত, সেটা সহজ ভাষায় এইরকম। আমরা ইতিহাসের পাতায় যেসব সমাজের বৃত্তান্ত পড়ি সেসবই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্তার স্থানে অধিষ্ঠিত, অন্যশ্রেণী কর্তার

অধীনে কায়িক শ্রমে নিযুক্ত। বিরোধের মূল এইখানে। সারা ইতিহাস জুড়ে বিস্তৃত এই দুই শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। কথাটা আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

জীবনধারণের জন্য মানুষের কিছু ভোগ্যবস্তু প্রয়োজন। শিকার অথবা গাছের ফল আহরণ করেই যখন জীবনধারণ করা যেত তখন ব্যাপারটা জটিল ছিল না। কিন্তু ক্রমে উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটল। আবশ্যক হল উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপকরণ। এইসব উপকরণের ওপর যাদের কর্তৃত্ব বা মালিকানা তারাই মালিক-শ্রেণী। উৎপাদনের কাজে যন্ত্রপাতির গুরুত্ব গত কয়েক শ বছরে অনেক বেড়েছে। জমির ওপর মালিকানা আরো আগেই এসে গেছে। মূলধন ছাড়া উৎপাদনের সুযোগ সম্ভাবনা, আমাদের পরিচিত সমাজে, খুবই সংকুচিত। অথচ মূলধন অল্প কিছু মানুষের আয়ত্তে। অধিকাংশের মূলধন নেই, আছে শ্রমশক্তি। এরাই শ্রমিকশ্রেণী। মূলধনের মালিকানার জোরে ধনিক শোষণ করে শ্রমিককে। মানুষে-মানুষে বৈরসম্পর্কের মূল এইখানে। এই মতবাদ আজকাল আমাদের এতই পরিচিত যে অধিক ব্যাখ্যা সম্ভবত নিষ্প্রয়োজন।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে : উৎপাদনের উপকরণের ওপর কিছু মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল কী করে? নানাভাবেই সেটা ঘটেছে নানা যুগে। কোনো এক সময়ে অশ্বারোহী যোদ্ধারা নতুন দেশ জয় করে নিয়েছে ; রাজত্ব স্থাপন করেছে ; রাজস্বসংগ্রহের জন্য কোনো-না-কোনো প্রকারে ভূমির ওপর অধিকার কায়েম করে নিয়েছে। দস্যু হয়ে উঠেছে রাজা ; বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটার পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে এইরকমের কিছু ইতিহাস। অন্য এক যুগে বণিকেরা অর্থবান হয়েছে বাণিজ্যের পথে। আমরা জেনেছি, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ। এইভাবে ধাপে-ধাপে ধনিকশ্রেণীর চরিত্রে ও গঠনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আর সেই সঙ্গে শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও আকৃতিপ্রকৃতি বদলে চলেছে। তবু দ্বন্দ্বটা সবসময়ই শোসক ও শোষিতের মধ্যে।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর শুরুতেই আছে এই দৃপ্ত ঘোষণা : 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word, oppressor and oppressed, stood in constant opposition to one another. ...The modern bourgeois society that has sprouted from the ruins of feudal society has not done away with class antagonisms. It has but established new classes, new conditions of oppression, new forms of struggle in place of the old ones.' এখানে ইতিহাসজোড়া দ্বন্দ্বের ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তাতে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মানেই হল শোষকের সঙ্গে শোষিতের সংগ্রাম। অতীতের বহু দ্বন্দ্বের উল্লেখের পর মার্কস্ বলছেন, সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হয়েছে, বুর্জোয়াসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; কিন্তু শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটেনি। শোষণ ও দ্বন্দ্ব নতুন আকারে দেখা দিয়েছে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করবার যোগ্য। বুর্জোয়া বা ধনতান্ত্রিক সমাজের দুই বিরোধী শ্রেণী হল, ধনিক ও শ্রমিক। এরাই শোষক ও শোষিত, প্রধান দ্বন্দ্বটা এদের মধ্যে। আর এই দ্বন্দের ভিতর দিয়েই জন্মলাভ করবে সমাজতন্ত্র, যা ক্রমে পরিণতিলাভ করবে পরিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজে। এই ছিল মার্কস্ ও মার্কস্পন্থীদের অনুভব ও আশা। সামন্ততন্ত্রে শোষক ও শোষিত শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'লর্ড' এবং 'সার্ফ' এই দুটি শব্দ দিয়ে, দেশী ভাষায় রাজা এবং প্রজা। তবে প্রজা শব্দটা বেশি ব্যাপক। বিশেষ অর্থে ভূমিদাস কথাটা ব্যবহার করা হয়। একদিকে ভূম্যধিকারী, অন্যদিকে ভূমিদাস। এই দুই শ্রেণীর

ভিতর দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই সামন্ততন্ত্র পরিণতিলাভ করেছে এমন ঠিক বলা যায় না। আরো একটা বিরোধ ঐ পালাবদলের পর্যায়ে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সেটা হল সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে উঠতি বণিকশ্রেণীর বিরোধ। এটাও শ্রেণীদ্বন্দ্ব বটে। কিন্তু এটা কি শোষক ও শোষিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ?

ভূম্যধিকারী ও ভূমিদাসের ভিতর সম্পর্কটা যেমন সোজাসুজি শোষক শোষিতের সম্পর্ক, রাজন্যবর্গের সঙ্গে বণিকগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কটা ঠিক সেইরকম নয়। বণিকের আয় বাণিজ্য থেকে, বড়ো বণিকের আয় অনেক সময় বহির্বাণিজ্য থেকে, সরাসরি ভূমি থেকে নয়। ভূমিদাসকে কম দিয়ে ভূম্যধিকারী বেশি পায়। কিন্তু বণিকের আয় বেশি কিংবা কম হবে সেটা বহির্বাণিজ্যের আরো অন্যান্য পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আসলে অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে বণিকশ্রেণীর সম্পর্কটা অংশত বিরোধী, আবার অংশত পরিপূরক। রাজন্যবর্গ বণিকশ্রেণীকে বাড়তে দিয়েছে, আবার আটকেও দিয়েছে। বণিকের হাতে যে ধন সঞ্চিত হয় তার কিছুটা রাজার হাতে চলে আসে, এইখানে রাজার লাভ। আবার বণিক বেশি শক্তিশালী হলে রাজার শক্তি খর্ব করার আশঙ্কা দেখা দেয়। বণিক ও ভূম্যধিকারীর ক্ষমতা ও আয়ের উৎস এক নয়, যদিও তারা পরস্পর জড়িয়ে গেছে।

বাণিজ্য ক্রমে শিল্পের পথ উন্মুক্ত করেছে, বণিক হয়ে উঠেছে ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পপতি। উৎপাদিকাশক্তির ঐতিহাসিক বিকাশে বণিকশ্রেণী দেখা দিয়েছে প্রাগ্রসর ভূমিকায়। সামন্ততন্ত্র এই আর্থিক বিকাশের পথে হয়েছে বন্ধনবিশেষ। পশ্চিম ইয়োরোপের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্রকে ভাঙবার কাজে বণিকশ্রেণীর ভূমিকা এই দিক থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমরা তা হলে দু-রকমের বিরোধের সন্ধান পাচ্ছি। এক হচ্ছে শোষক ও শোষিতের ভিতর বিরোধ, সামন্ততন্ত্রে যার প্রধান ও স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে 'লর্ড' এবং 'সার্ফ'-এর ভিতর সম্পর্কে। দ্বিতীয় বিরোধ হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে বিকাশশীল উৎপাদিকাশক্তির। মার্কসের চিন্তাভাবনায় দুই ধরনের বিরোধের কথাই আছে। কিন্তু এরা বাস্তবে অভিন্ন নয়। সামন্ততন্ত্রের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব ছিল ; কিন্তু বিকাশশীল উৎপাদিকাশক্তির পতাকা ছিল না ভূমিদাসের হাতে, ছিল বণিক অথবা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে।

শোষিত শ্রেণীও অবশ্য অবস্থাবিশেষে আর্থিক বিকাশের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাগ্রসর পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর এইরকম একটা ভূমিকার কথা চিন্তা করা হয়েছে। এটাই একমাত্র পথ এমন কথা ইতিহাসের বিচারে বলা যাবে না। তবুও মার্কসীয় ভাবনার আবেদন অস্বীকার করা যায় না। শোষিত শ্রেণীই প্রগতির যাত্রায় সবচেয়ে সার্থক ভূমিকা নির্বাহ করবে, এর চেয়ে তৃপ্তিদায়ক চিন্তা আর কী হতে পারে ! তবে ঐ ভূমিকানির্বাহের জন্য একটা সাংস্কৃতিক প্রস্তুতিপর্বের ব্যাপারও আছে। সেটা উপেক্ষা করলে ইতিহাস অনেক মূল্য আদায় করে ছাড়ে। 'বিপ্লব' জয়যুক্ত হয় ; ধনিক সম্পত্তি হারায় ; তবু সেই চেতনা অধরা থেকে যায় যাকে বাদ দিয়ে মুক্তসমাজ অসম্ভব।

(খ)

শ্রেণীদ্বন্দ্বই মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বের একমাত্র রূপ নয়। "ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চা" প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন : 'আমাদের প্রাচীন ভারতে অসামঞ্জস্য রাজায়

প্রজায় ছিল না, সে ছিল এক জাতিসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতিসম্প্রদায়ের।' স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে, অসামঞ্জস্য রাজায় প্রজায়ও ছিল। সব রাজাই প্রজাবৎসল এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না, আর একথা রবীন্দ্রনাথও জানতেন। কিন্তু উদ্ধৃতিটি উল্লেখযোগ্য অন্য কারণে। ইতিহাসে—শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের ইতিহাসেই, আর ভারত তো একটি ছোটোখাটো বিশ্ববিশেষ—যেসব সংঘর্ষ আমরা দেখি তার অনেকটাই 'এক জাতিসম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য জাতিসম্প্রদায়ের।' মানুষের সমাজে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব আছে শুধু শ্রেণীতে শ্রেণীতে নয়, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়েও বটে।

প্রাচীন সমাজে ব্যক্তির পরিচয় ছিল জাতি অথবা সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আছে ভিন্ন ভিন্ন আচারবিচার সংস্কৃতি। এখনও বিশেষত পল্লীসমাজে ব্যক্তির এই জাতিগত পরিচয়টাই মুখ্য। শহরে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। পৃথিবীর সেইসব বড়ো নগরে যেখানে ব্যবসায় ও শিল্পই প্রধান, ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক বা জাতিগত পরিচয় হয়তো কিছু পরিমাণে তার গুরুত্ব হারায়। গড়ে ওঠে অন্য এক নাগরিক সংস্কৃতি, বহুজাতির মিশ্রণ ও দ্রুত কর্মপ্রবাহের ভিতর দিয়ে। ব্যক্তির জাতিগত পরিচয়কে অতিক্রম করে যাবে তার শ্রেণীগত পরিচয়, এই সম্ভাবনা পল্লীতে ততটা নয় যতটা নাগরিক পরিবেশে। অর্থাৎ, শ্রেণীপরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাস লিখবার ঝোঁকটা মিলে যায় নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে। কিন্তু আজও সেটা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এমনকি নগরেও জাতীয়তাবাদ এক প্রবল শক্তি। আমাদের শতাব্দী জুড়ে এর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। ফ্রান্স ও জার্মানির ভিতর যখন যুদ্ধ বাধে তখন, দীর্ঘ বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সত্ত্বেও, পারীর শ্রমিক হাত মিলায় না বের্লিনের শ্রমিকের সঙ্গে বরং জাতীয় সংহতিই প্রবলতর শক্তি হিসেবে কার্যকরী হয়। রুশ ও চীনদেশের ভিতর দ্বন্দ্বে মস্কো ও বেজিং জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছে কই?

মানুষের ইতিহাসে যত রক্তপাত ঘটেছে কিংবা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষে, 'ধর্মযুদ্ধে' আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কিংবা বর্ণবিদ্বেষে. তার তুলনায় শ্রেণীসংগ্রামকে অতি বড়ো প্রাধান্য দিতে গেলে ঘটনার সঙ্গে থিওরির সঙ্গতি থাকে না। অবশ্য এক 'জাতিসম্প্রদায়ের' সঙ্গে অন্য 'জাতিসম্প্রদায়ের' যে সংঘর্ষ তার পিছনেও কিছু আর্থিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব খুঁজে পাওয়া যায়। তবু রাজনীতির ভাঙাগড়া শুধু শ্রেণীতে-শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে আর্থিক দ্বন্দ্বের অধিক আরো কিছু থাকে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের সঙ্গে যখন মিশে যায় সাম্প্রদায়িকতা তখন তার ফলাফল হয় আরো বীভৎস, আর সেই সঙ্গে দ্বন্দ্বের গতিপ্রকৃতিও বদলে যায়।

যেমন ধরা যাক আমাদেরই জীবৎকালের কিছু কিছু ঘটনা, ভারতবিভাগ, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের ভিতর লড়াই ও তার পরিণতি, আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ। অবিভক্ত ভারতে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল সেটা ভারতবিভাগের একটা কারণ বটে। কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের ব্যাপারটা যোগ না হলে ভারতবিভাগ হত বলে মনে হয় না। ধর্মান্ধতাই শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করেছিল। তা নইলে ইতিহাসের অন্য গতি হত।

জাতিগঠনে ভাষার প্রভাব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। কোথাও সেটা গড়বার শক্তি, কোথাও ভাঙবার। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অভিজ্ঞতার অংশ এইসব। আসাম থেকে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত এই উপমহাদেশে তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। ভালোমন্দ নিয়ে তর্ক সম্ভব, কিন্তু দ্বন্দ্বের ওপর ভাষাভিত্তিক সংহতিবোধের প্রভাব অস্বীকার

করা যাবে না। পশ্চিম পাকিস্তান শোষণ করেছে পূর্ব পাকিস্তানকে। ভাষার ব্যবধান যদি না থাকত তবুও কি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ দাবি করত স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অধিকার? ভাষাই কি বাংলাদেশের দাবিকে দেয়নি এক স্বতন্ত্র মর্যাদা ও প্রেরণা?

কিংবা ধরা যাক বর্ণবিদ্বেষের প্রশ্নটি। মার্কিন দেশে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় দরিদ্র। তবু বর্ণবিদ্বেষের একটা আলাদা চেহারা আছে, বিশেষ আকৃতিপ্রকৃতি আছে, যেটাকে কিছুতেই শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে মেলানো যায় না। দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ ও দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ তো বর্ণের বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় না। আসলে মানুষের মনের গভীরে আছে অন্য এক তামসিক শক্তি, আছে সাংস্কৃতিক সংহতিবোধও, পরস্পর যেসব জড়িয়ে যায় আর শ্রেণীস্বার্থের সাধারণ হিসেবকে ছাড়িয়ে যায়।

মানুষ যে স্বভাবত নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত সেকথা ভারতে বসে সহজে বোঝা যায় কারণ এটা বহুদেবদেবীর দেশ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন দেবতাকে প্রধান স্থান দিয়েছে। এইসব বহুত্বের পিছনেও ঐক্যের ধারণা আছে একথা আমরা জানি এবং মানি। তবু বহুত্বটা মিথ্যা নয়। সামাজিক জীবনে পদে পদে তার বাস্তবতা অনুভব করা যায়। গোষ্ঠীজীবনের চারধারে আচারবিচারসংস্কৃতির একটা সীমানা আঁকা হয়ে যায়। বিবাহ থেকে রাজনীতি অবধি সর্বত্র তার প্রভাব প্রশ্নাতীত। গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে বেষ্টন করে গড়ে ওঠে একটা সামাজিক সংহতি, সামূহিক "অহং"। তাত্ত্বিকভাবে মানুষের ঐক্য স্বীকৃত হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যূথবদ্ধ "অহং" প্রবলভাবে উপস্থিত।

সম্প্রদায় থেকে সম্প্রদায় পৃথক। কিন্তু পার্থক্য মানেই অনিবার্য দ্বন্দ্ব নয়। দ্বন্দ্বের জন্য আরো কিছু শর্ত আবশ্যক। একাধিক গোষ্ঠী যখন এমন কিছু বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে যার পরিমাণ সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কোনো একদল বেশি পেলে অন্যদলের জন্য কম অবশিষ্ট থাকে, আর এইসব গোষ্ঠী যখন একই ক্ষেত্রের ভিতর অবস্থান করে, তখনই এদের ভিতর দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আকাঙ্ক্ষার সীমাবদ্ধ বস্তু বলতে ধন, ক্ষমতা, খ্যাতি সবই বোঝাতে পারে। ক্ষমতা অথবা খ্যাতি যদিও ধনের মতো জড়বস্তু নয় তবু তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব, কারণ একদলের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে অন্যদলের ক্ষমতা কমে। খ্যাতির আকাঙ্ক্ষাটাও ঐরকম, যদিও জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ভিন্নরকম। আমার জ্ঞানবৃদ্ধিতে দ্বিতীয় কারো জ্ঞান কমে যাচ্ছে না। কিন্তু যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব প্রবল সেখানে একজনের খ্যাতির ছটায় অন্যের ঔজ্জ্বল্য কমে। পণ্ডিতদের মধ্যেও তাই দ্বন্দ্বের অভাব নেই।

যারা সমক্ষেত্রে আশ্রিত তাদের ভিতরই দ্বন্দ্ব সম্ভব। যদি একব্যক্তি আদার ব্যবসায়ী হয়, অন্যব্যক্তি জাহাজের, তবে তাদের ভিতর দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কম; দুজন জাহাজের ব্যবসায়ীর ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা বেশি। যদি একজন হয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খ্যাতির আকাঙ্ক্ষী, অন্যজন শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে, তবে বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না; দুজন সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক ঈর্ষা সম্ভব। রৌপ্যের সন্ধানে একাধিক ইয়োরোপীয় দেশ যখন একই পথে ধাবিত হয় তখন দ্বন্দ্বের আশঙ্কা বেড়ে যায়। ভিন্ন-ভিন্ন দেশের যখন উৎপাদনের ক্ষেত্র ভিন্ন, বাজারও ভিন্ন, তখন সংঘর্ষের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম।

প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশের ভিতর দূরত্ব বেশি ছিল। ক্রমে পৃথিবীটা ছোটো হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে বিরোধী স্বার্থের ভিতর সামঞ্জস্যবিধানের সমস্যা কঠিন হয়েছে। কোনো এক সময়ে সমাজের ভিতর বিভিন্ন বর্গের আকাঙ্ক্ষার বস্তু বিভিন্ন ছিল, সামাজিক আচার ও ঐতিহ্যই তাদের ভিতর দূরত্ব রচনা করে দিয়েছে। ফলে তাদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সচরাচর দেখা যেত না, যেমন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভিতর প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব ছিল

বিরল। ক্রমে সমাজের ভিতর এসব দূরত্ব ভাঙতে শুরু হল, সেই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তীব্র হল। ভৌগোলিক এবং সামাজিক দূরত্ব হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সব রকমের বিরোধের ওপরই এর প্রভাব এসে পড়েছে। যে-বিরোধ একদিন ছিল উহ্য, আজ সেটা হয়ে উঠেছে ব্যক্ত এবং ক্রমপ্রসারী, এমনকি বিস্ফোটক।

(গ)

ক্ষমতার দ্বন্দ্বের গতিপ্রকৃতি ধর্মের মতোই সূক্ষ্ম। ক্ষমতাবান শ্রেণীর ভিতরে যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব চলে ইতিহাসে তার প্রভাব তুচ্ছ করবার মতো নয়। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ তারও সহজ ব্যাখ্যা সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্ধ সংস্কারের শক্তি কম নয়। রাজনীতি সম্পূর্ণ অর্থনীতির অনুসারী নয়। সম্পত্তি যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধের কারণ সেখানেও বিদ্বেষের আরো গুপ্ত শিকড় থাকে অর্ধস্মৃতির অন্ধকারে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের শেষে যখন কোনো পক্ষেরই উল্লসিত হবার মতো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখন অগত্যা মেনে নিতে হয় যে, দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি কিছুই সম্পূর্ণ যুক্তির পথ ধরে ঘটে না। সব মিলিয়ে সামাজিক দ্বন্দ্ব এমন বৈচিত্র্যে চিহ্নিত যে তাকে একটা তত্ত্বের মধ্যে বাঁধা বড়ো কঠিন। অতি সরলীকরণে কিছু মিথ্যা প্রত্যাশা আর ভুল উৎসাহ জাগায়।

তবু সমাজবিজ্ঞানীর জন্য কার্যকারণ অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। বহুমুখী ব্যাখ্যায় বাস্তবের খানিকটা কাছাকাছি আসা যায়। তা ছাড়া তত্ত্বকে বারবার পরিবর্তনশীল কালের সঙ্গে যুক্ত করে বদলে নেওয়া প্রয়োজন। সময়ে সামাজিক বন্ধনের প্রকারভেদ ঘটে, ক্ষমতারও চরিত্র বদলায়।

অল্প কিছু মানুষের অনেক মানুষের ওপর নিয়ন্ত্রণের একটি উপায়ের কথা মার্কসবাদে বিশেষভাবে বলা হয়েছে, সেটা মূলধন অথবা উৎপাদনের উপকরণের ওপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা। কিন্তু অন্য উপায়ও আছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতা মূলধনের মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যে-অশ্বারোহীরা দেশজয়ে বেরিয়েছিল তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল অস্ত্রশক্তি। এ যুগে বড়ো-বড়ো দল ও প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ক্ষমতার মূলে দেখা যায় সাংগঠনিক শক্তি। ধনদৌলত মালিকানা সবই ক্রমে এসে যায়; কিন্তু শুরু সেখানে নয়। আরম্ভে আছে অন্য কোনো দক্ষতা। একবার সম্পত্তি লাভের পর কিছুদূর পর্যন্ত সম্পত্তির জোরেই সম্পত্তি রক্ষা করাও যায়। কিন্তু শক্তির অন্য কোনো উৎস না থাকলে সম্পত্তি হারাতেও খুব বেশি সময় লাগে না।

ব্যক্তিগত মালিকানাই সমাজে ক্ষমতার অসাম্যের মূল কারণ—এইরকম মতবাদ ধনতান্ত্রিক সমাজের বিশ্লেষণে কাজে লাগে। সেদিক থেকে এর মূল্য আছে। কিন্তু বিশ শতকের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে আরো কিছু জিজ্ঞাসা জাগে, যার উত্তর মার্কসবাদের পরিধির ভিতর খুঁজে পাওয়া কঠিন। বের্ট্রাণ্ড রাসেল অথবা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো মনীষীদের কথা এসে যায় এইখানে। এই শতাব্দীর সাম্যবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে এঁরা পরিচিত ছিলেন। সন্দেহ নেই যে, এঁদের কিছু প্রশ্নের উদ্ভব এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই। প্রশ্ন শুধু এঁদেরই না, প্রশ্ন এই যুগের।

সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের নামে যে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর অনেকটা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে সেখানে আজও এত ক্ষমতার অসাম্য কেন? মানবিক

অধিকারের সেখানে এত অভাব কেন ? ব্যক্তিগত মালিকানার পুরনো লব্জ দিয়ে কি এর ব্যাখ্যা হয় ? এদেশের সাম্যবাদীরা এসব প্রশ্নে তেমন পীড়িত নন, ধনতন্ত্রকে দোষ দিয়েই তাঁরা খালাস। কিন্তু বিচলিত সোভিয়েত দেশের নতুন প্রজন্মের ভুক্তভোগী মানুষ। চিন্তিত উনিশ শ' আশির দশকে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত নেতা গর্বাচেভ। আলোড়িত চীনদেশের মানুষ। এঁরা কিন্তু বিদেশী ধনতন্ত্রের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে আর নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

আজকের সাম্যবাদী দেশগুলিতে উৎপাদনের উপকরণের মালিক কারা ? জনগণ ? আমলাবর্গ ? ব্যক্তিগত মালিকানা কথাটার একটা স্পষ্ট অর্থ ছিল। আমলাগোষ্ঠীকে মালিক বলা যাবে কোন্ অর্থে ? সমাজকে মালিক বললেই বা কার্যত তার অর্থটা কী দাঁড়াচ্ছে ? ক্ষমতার বিশ্লেষণে নতুন চিন্তার প্রয়োজন। আর তার মানে দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণেও নতুন চিন্তা চাই। সাম্যবাদী সমাজের ভিতর দ্বন্দ্বের চরিত্র কী ? সেখানেও দ্বন্দ্বের বাস্তবতা সম্বন্ধে অন্ধ থাকলেই তো আর দ্বন্দ্ব বন্ধ হয় না।

প্রত্যেক যুগই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে কিছু প্রশ্ন নিয়ে ইতিহাসের দিকে তাকায়। মার্কস্ তাঁর নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে এই কাজটা করেছিলেন। এযুগের প্রাগ্রসর চিন্তকেরাও তাই করবেন। তাঁরা ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়াবেন নতুন প্রশ্ন নিয়ে, আশা করবেন নতুন উত্তর। মার্কসের মানবতাবাদ আর নবমানবতাবাদ কি অভিন্ন ?

(ঘ)

ক্রোধ দিয়ে যেমন ক্রোধকে জয় করা যায় না, শুধু দ্বন্দ্ব দিয়ে তেমনি অতিক্রম করা যায় না দ্বন্দ্বকে। ইতিহাস যদি মানুষকে শুধু দ্বন্দ্বেরই শিক্ষা দিত তবে তা থেকে বেরিয়ে আসার শিক্ষা পাওয়া যেত না ইতিহাসে। বাস্তবে দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তার এক বিপরীত ভাব, দ্বন্দ্বেরও সীমানা টেনে দিয়ে।

জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর বিরোধের পাশে পাশেই চলে সহযোগিতা। বিরোধ ও সহযোগিতা মিলেমিশে থাকে। কখনো একটার প্রাধান্য কখনো অন্যটার। এর স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে বাণিজ্যে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন জাতির ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি। মানুষের অনেক কলহই এরকম। প্রতিবেশীকে ছাড়া চলে না, আবার তার সঙ্গেই ঝগড়া। কলহের কথাগুলি অনেক সময় বড়ো হয়ে ওঠে। সহযোগিতার সুবিধাগুলিতে আমরা নিঃশব্দে অভ্যস্ত হয়ে যাই। আর সেইজন্যই তার মূল্য সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকি না।

শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে হঠাৎ মনে হতে পারে যে, দুই বিরুদ্ধ শ্রেণীর ভিতর স্বার্থের কোথাও মিল নেই। অথচ এই চিন্তাটা ভুল। এই মুহূর্তে সেই আবিষ্কারটা নতুন ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে গর্বাচেভের কিছু ভাবনাচিন্তায়। বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের আজ পরম প্রয়োজন শান্তি। শেষ বিচারে এটা সকলের পক্ষেই কাম্য। বৃহৎ শক্তিদের ভিতর যতই দ্বন্দ্ব থাকুক না কেন, যুদ্ধবাজদের কাছে যুদ্ধ যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিশ্বযুদ্ধের আজ পরিণাম হবে মানুষের সভ্যতার সার্বিক বিনাশ। এই সার্বিক বিনাশে কোনো শ্রেণীরই স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্ন ওঠে না। আমরা যে যে-শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের অনুগত হই না কেন, মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো সব মানুষেরই সাধারণ স্বার্থ।

শ্রেণীসংগ্রামের নামেও এমন কোনো পদক্ষেপ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না যার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হয়। উনিশ শতকে এই বিপদটা এত স্পষ্ট ছিল না, বিশ শতকের গোড়াতেও অবস্থা ঠিক এইরকম ছিল না। গর্বাচেভ আজ অহিংসার কথা যেভাবে বলছেন সেটা শ্রেণীসংগ্রামের পুরনো ভাষার সঙ্গে মেলে না। বৈপ্লবিক হিংসাই নতুন সমাজের ধাত্রী, এই রকমের কিছু ভাষা উত্তেজনার সঙ্গে উচ্চারণ করা তত অসঙ্গত ছিল না আগের দিনে। আজকের দিনে সব মানুষের সমস্বার্থের চিন্তাকে আরো স্পষ্ট করে স্থান দিতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের পাশে পাশে। অপর পক্ষকে যুদ্ধবাজ বলাটাই যথেষ্ট নয়, আত্মসংযমের অভ্যাসটাও প্রয়োজন। তা নইলে শান্তিভাষণও রণহুঙ্কারের মতো শোনায়।

শান্তি চাই, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা নয়। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন চাই। মানুষের ভিতর যে দ্বন্দ্ব আছে, দ্বন্দ্বের কারণ আছে, তাকে অস্বীকার করা নির্বোধ সন্তুষ্টি। দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করবার চেষ্টাতেই সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে। সমস্যা এই, বন্ধন ছিন্ন করতে গিয়ে নতুন বন্ধন সৃষ্টি হয়।

দ্বন্দ্বের নানা রূপ আছে। তবে অর্থ ও ক্ষমতা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই প্রধান। আধুনিক সমাজের ঝোঁক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিকদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীকৃত হয়েছে আমলাতন্ত্রের হাতে। নতুন সমাজে কোন্ পথে পৌঁছতে হবে আমরা স্পষ্ট জানি না। কিন্তু তার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে মান্য, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

আধুনিক সমাজে ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণ দৃশ্যমান, এ যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তার সহায়ক হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের জন্যও কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তাই চাই। কোথায় পাব তাকে ? নবতম প্রযুক্তির কিছু নির্দেশ ইতিমধ্যেই বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে। কিন্তু আরো গোড়ার কথাটা বলতে হয় অন্যভাবে। মানুষই স্রষ্টা, প্রযুক্তি তার সৃষ্টি, এই বোধ স্বাধীনতার শর্ত। অথচ মানুষের সভ্যতায় দেখেছি অন্য এক কাণ্ড, প্রযুক্তিই অন্ধভাবে চালিত করেছে মানুষকে, তার সমাজসংগঠনকে। এইখানে একটা পরিবর্তন চাই। মানুষের বুদ্ধিকে এমনভাবে সংগঠিত করা যাবে না কেন, যাতে মানুষের কাঙ্ক্ষিত আদর্শের উপযোগী প্রযুক্তিই প্রাধিকার লাভ করে ?

বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্রেরও পরিবর্তন আবশ্যক। আমাদের সমাজে ও শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে। এর ভিতর দিয়ে স্থাপিত হয় দক্ষতার নতুন নতুন রেকর্ড, কিন্তু বেড়ে ওঠে অমানুষিকতা। 'খুনে প্রবৃত্তি' বলে একটা জিনিস খেলোয়াড়দের ভিতর পরিচিত, প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্য নাকি এটার বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের রক্তে যে আক্রমক তেজ সংক্রামিত, তার নিষ্কাশনের জন্য খেলাই অবশ্য উত্তম উপায়। তবু মনে রাখা প্রয়োজন, প্রতিপক্ষের পরাজয় নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের গঠন আর তারই সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর।

শিক্ষাকে অতএব স্কুল-কলেজের ব্যাপার বলে আলাদা একটা প্রকোষ্ঠে সরিয়ে রাখা যাবে না। সংস্কৃতির রূপান্তরে থাকে বহু মানুষের স্থান, যেমন শিল্পীর তেমনি সমাজসেবকের। নতুন সংস্কৃতি গড়তে গিয়ে একবার তাকাতে হয় ভবিষ্যতের পানে, আবার ফিরে তাকাতে হয় পুরনো সংস্কৃতির দিকে, যার কিছুটা গ্রাহ্য। এই প্রেক্ষিতেই নববিচার ও রেনেসাঁসের কথা এসে যায়।

পুরনো সংস্কৃতিতে কেউ কেউ খুঁজে পান স্বর্ণযুগের আভাস, আবার কেউ কেউ দেখেন

পরাক্রান্ত শোষক শ্রেণীর কপট স্বার্থের প্রতিবিম্ব। এসবই একতরফা বিচার। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি তখন মার্কসবাদী কিন্তু কট্টর মার্কস্‌বাদের একদেশদর্শিতা থেকে তখনও অনেক পরিমাণে মুক্ত। ১৯৪১ সালে বোম্বাই রেনেসাঁস ক্লাবের এক সভায় মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মানুষের চিন্তাভাবনার দুটি দিক আছে, একটি সাময়িক, সময়ের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়, অন্যটি চিরকালীন। একই কথা দু'বছর পর কলকাতা রেনেসাঁস ক্লাবের সভায় শুনি : 'There are two things in the past: the transitory values—the glory of kings and monuments of ancient grandeur, traditions which persist as die-hard prejudices. On the other hand, there are the abiding, permanent human values which transcend time and space.' বিপ্লবোত্তর সমাজে, শ্রেণীযুদ্ধের অবসানের পর, মানবিক মূল্যবোধ হঠাৎ জন্মলাভ করে এমন নয়। মানবিক মূল্যবোধের একটা ধারা অতীত থেকে প্রবাহিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছে। অন্যায় অবিচারে অন্ধতায় যদিও সেই বোধ আচ্ছন্ন অথবা বিকৃত হয়, তবু লুপ্ত হয় না।

নানকের মতো কোনো ভক্ত সাধক যখন বলেন, 'না কোঈ বৈরী না কোঈ বেগানা। শগল জগৎ হমকো বন আঈ ॥', তখন অতীত থেকে নিঃসৃত এমন একটি ভাবই আমাদের স্পর্শ করে যেটি সর্বমানবের ও সর্বকালের। ঐতিহ্যের নির্বিচার গুণগানে দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করা যায় না, কারণ ঐতিহ্যের ভিতরই আছে সেই প্রথাসিদ্ধ অবিচার, যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রয়োজন। আবার অতীতের সব চিন্তাভাবনাকে তুচ্ছ করে এগোবার চেষ্টাও বৃথা, কারণ উত্তরণের কিছু শর্ত, কিছু সহায়ক শক্তি, ঐখানে খুঁজে পাওয়া যাবে। এজন্য চাই গ্রহিষ্ণু জিজ্ঞাসু মন, দ্বেষহীন বিচার।

দ্বন্দ্বের পুরনো তত্ত্বে সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়নি। প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করাই সেই তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে এটা স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে, শ্রেণীদ্বন্দ্বও ব্যতিক্রম নয়। দ্বন্দ্বের তত্ত্ব হয়ে উঠেছে দ্বন্দ্বের হাতিয়ার, যুদ্ধজয়ই লক্ষ্য। শিবিরবদ্ধ কার্যসিদ্ধিবাদ সংকটকেই স্থায়ী করে চলেছে। প্রতিটি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন অসহিষ্ণুতা, যুদ্ধের নতুন ক্ষেত্র। এই দুষ্টচক্র কী করে ভাঙা যায় সেটাই প্রশ্ন।

মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ

আমরা যখন মধ্যবিত্তের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছি তখন নিজেদেরই বিষয়ে কথা বলছি। আপনি আমি, এই প্রবন্ধটির যাঁরা পাঠক তাঁদের অধিকাংশই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর একটা সুবিধা আছে, আবার অসুবিধাও আছে। সুবিধা এই, আমরা বিষয়টা অনেকখানি ভিতর থেকে জানি। অসুবিধাটাও অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। নিজের সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে লেখা কঠিন। আমাদের চোখে নিজেদের দুঃখ ও ক্ষতি অতিরিক্ত বড় আকার নিয়ে দেখা দেয়, অন্যের দুঃখ কিংবা ক্ষতি তুলনায় ছোটো মনে

হয়। অন্যের লাভ আমরা ঈর্ষার চোখে দেখে থাকি, নিজের লাভটাকে লাভ বলে সহজে স্বীকার করতে চাই না। এই কথাটা মনে রেখে, এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে, অনেকটা সাবধানতা প্রয়োজন হয়।

মধ্যবিত্ত সম্বন্ধে একটা কথা অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত একটা ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণী, মধ্যবিত্তের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কথাটা কি সত্যি? কোন অর্থে এটা মান্য? এই সঙ্গে এসে যায় আরও গোড়ার একটা প্রশ্ন : মধ্যবিত্ত বলতে কাদের বুঝতে হবে? ভবিষ্যৎ নেই কাদের? এবং কেন?

পুরনো একটা সরলীকৃত তত্ত্ব এইখানে স্মরণ করা যেতে পারে। বিষয় ধনতন্ত্র। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একদিকে আছে বড় পুঁজিপতি, যেমন বড় ব্যবসায়ী এবং বৃহৎ শিল্পের মালিকবৃন্দ ; আর অন্যদিকে বিত্তহীন শ্রমিক, সংখ্যায় যারা সমাজের গরিষ্ঠ অংশ। মাঝখানে ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, অল্পস্বল্প পুঁজি নিয়ে যাদের কাজকারবার। তত্ত্বটা হল এই যে, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট শিল্পপতি এদের কোনও স্থায়িত্ব নেই, এদের ভিতর কয়েকজন হয়তো ক্রমে বড় ব্যবসায়ী, বড় শিল্পপতি হয়ে উঠবে, আর বাকি অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব খুইয়ে বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাবে। এই অর্থে মধ্যবিত্তের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সমাজ ভাগ হয়ে যাচ্ছে বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত দুই শ্রেণীর ভিতর। যারা মাঝামাঝি আছে ইতিহাস শেষ অবধি ঠেলে দিচ্ছে তাদের এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে। অবশ্য এমন হতে পারে যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু ছোট শিল্পপতি ও ছোট ব্যবসায়ী যেমন তলিয়ে যাচ্ছে তেমনি কিছু আবার ক্রমাগত জন্মলাভ করছে। কাজেই ব্যষ্টি হিসেবে স্থায়ী না হলেও সমষ্টি হিসেবে ছোট ব্যবসায়ীরা লোপ পাচ্ছে না। অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের আকার এবং প্রকার বদলে চলেছে, কিন্তু এরা টিকে আছে। যাই হোক, এই যে তত্ত্বের কথা বলা হল এটা নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন। মধ্যবিত্তের গঠন সম্বন্ধে যে ধারণা অবলম্বন করে এই তত্ত্বের বিস্তার, আমাদের পরিচিত সমাজের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই। এই সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে চিন্তার ছক তৈরি করা দরকার।

আমাদের পরিচিত সমাজে মধ্যবিত্তেরা অধিকাংশ চাকরিজীবী। অনেকেই সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত। অনেকে শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার। ছোট ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি এখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গরিষ্ঠ অংশ নয়। এই সামাজিক বাস্তবের সঙ্গে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞাটা মিলিয়ে নেওয়া দরকার। তা ছাড়া, এটা একান্তভাবে আমাদের সমাজের কথাও নয়। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সব দেশেই একটা পেশাদারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধান হয়ে উঠেছে, যাদের অবলম্বন প্রযুক্তিবিদ্যা ও কৃৎকৌশল কিংবা কোনও বিশেষ শাস্ত্রে দক্ষতা। সরকারের শাসনযন্ত্র এই শতাব্দী ধরে প্রধান প্রধান সব দেশেই বিশাল আকার ধারণ করেছে, সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কোনও দেশেই নগণ্য নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে বৃহৎ শিল্প বিস্তার লাভ করেছে, এইসব শিল্পে নিযুক্ত নানা স্তরের অফিসার বা আধিকারিক ও কৃৎকুশলীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। আধুনিক শিল্পে অদক্ষ শ্রমিকের স্থান কমছে, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকের গুরুত্ব বাড়ছে। এইসবের ফলে আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে এক নতুন মধ্যবিত্ত, আর্থিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব লোপ পাবার কোনো আশু সম্ভাবনা নেই। এ ব্যাপারে আমাদের দেশও ব্যতিক্রম নয়।

মাঝে মাঝেই অবশ্য রব শোনা যায়, মূল্যস্ফীতির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভেঙে যাচ্ছে।

আসলে মধ্যবিত্ত একইসঙ্গে ভাঙছে ও গড়ছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় সমাজে নিম্নমধ্যবিত্তের ভোগান্তির অন্ত নেই ; কিন্তু মোটের ওপর মধ্যবিত্ত আকারে-প্রকারে বেড়েই চলেছে। যাদের আয় টাকার অঙ্কে প্রায় অনড়ভাবে বাঁধা, মূল্যস্ফীতির ফলে তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। পেনসনভোগীরা এ কথাটা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিটাই একমাত্র ঘটনা নয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ও যে টাকার অঙ্কে বাড়ছে সেটাও প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা এই যে, অর্থনীতির গঠনটাই বদলে চলেছে। সরকারী ও বেসরকারী সবরকম প্রতিষ্ঠানেই এমন সব পদ ও সুযোগ ক্রমেই সৃষ্টি হয়ে চলেছে যাতে মধ্যবিত্তের কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই গত তিরিশ বছরের উল্লেখযোগ্য মুদ্রাস্ফীতির পরও আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত আগের তুলনায় আরও বড় স্থান জুড়ে আছে। হাহাকারের কিছু কারণ অবশ্য আছে, সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা পরে করা যাবে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্তির পথে, এই কথাটা গত কয়েক দশকের ইতিহাসের সঙ্গে মোটের ওপর মেলে না।

আরও দীর্ঘ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে অন্য একটা কথাও স্বীকার করে নিতে হয়। মধ্যবিত্তের সমালোচনায় মধ্যবিত্তই সবচেয়ে মুখর। সেই সমালোচনা ভিত্তিহীন নয়, তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তবু স্বীকার করে নেওয়া ভালো, আধুনিক ইতিহাসের রচনায় মধ্যবিত্তের একটা স্মরণীয় ভূমিকা আছে।

(খ)

মধ্যবিত্তের প্রধান অবদান নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এই শ্রেণীটির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে নগর থেকে, এ যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রধানত নগরভিত্তিক। নাগরিক সভ্যতা বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। বিদ্যুৎকে সে ঘরে ঘরে টেনে এনেছে। পরমাণুর ভিতরের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে তাকে করে তুলেছে মানুষের ব্যবহার্য শক্তির এক বিস্ময়কর উৎস। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অক্লেশে উড়ে বেড়াবার উপায় উদ্‌ভাবন করবার পর এখন সে যাত্রা শুরু করেছে গ্রহে উপগ্রহে। মস্তিষ্কের গঠন ও গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানসংগ্রহ করে সে তৈরি করেছে কিছু অভূতপূর্ব যন্ত্র, যার প্রাথমিক উদাহরণ নানা জাতের কম্প্যুটার। একদিন যন্ত্র ছিল প্রধানত পেশীশক্তির পরিপূরক, আজ সে মস্তিষ্কের শক্তিরও পরিপূরক। এই সবই নগরভিত্তিক মধ্যবিত্তেরই কীর্তি।

এই মধ্যবিত্তের অন্য এক সৃষ্টি আধুনিক গণতন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজে সাধারণ মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও সংগঠনের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সেই অধিকার ক্রমে প্রসারিত হয়েছে। সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, আর্থিক ও সামাজিক সাম্য সম্বন্ধে ধারণা এ যুগে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করেছে। সামাজিক সাম্য নামক বস্তুটি মধ্যযুগে অক্লেশে অস্বীকৃত ছিল। আজ আর সে কথা বলা যাবে না। বৈষম্য এখনও আছে, লজ্জাজনকভাবেই আছে। তবু জাতি সম্প্রদায় অথবা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের কথাটা যে আমরা সংবিধানে উচ্চারণ করি, এটাও প্রাচীন সংহিতার সঙ্গে তুলনায় উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক পরিবর্তন।

মানুষের ইতিহাসকে যদি সামাজিক মুক্তির ইতিহাস বলে বিবেচনা করা যায় তবে তাতে এ যুগের মধ্যবিত্তের একটা বিশিষ্ট, যদিও বিতর্কিত, ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। প্রাচীন সমাজে ব্যক্তিমানুষ ছিল পরিবার জাতি ও গ্রামসমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ। ক্রমে ব্যক্তির

ওপর পরিবার জাতি ও গ্রামসমাজের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে এসেছে। এটা ঘটেছে নাগরিক জীবনের প্রসার ও ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে। পুরনো ঐতিহ্যের বন্ধন ভেঙে মুক্তচিন্তা কিংবা বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে। আধুনিক যুগের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে এটা যুক্ত। বিজ্ঞান হোক, ব্যক্তিস্বাধীনতা অথবা গণতান্ত্রিক অধিকার হোক, মানুষের বুদ্ধির মুক্তির সঙ্গে এই সবকিছুরই যোগ আছে।

এ যুগের মধ্যবিত্ত যে নতুন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে তার বহু গুরুতর ত্রুটি আছে। এই সভ্যতাকে যদি আমরা অতিক্রম করে যেতে না পারি তবে সর্বনাশ ঘটতে পারে। তবু মধ্যবিত্তের অবদান স্বীকার্য। একে অস্বীকার করে এগোবার চেষ্টা করাটা ভুল। এর যেটা শ্রেষ্ঠ অংশ তাকে রক্ষা করেই এগিয়ে যেতে হবে।

(গ)

মুদ্রাস্ফীতির ফলে নয়, মধ্যবিত্তের জীবনে আজ অভাব আর মেটে না ক্রমবর্ধমান ভোগবাদের ফলে। একটির পর একটি নতুন ভোগ্যবস্তু বাজারে এসে পৌঁছচ্ছে; জীবনের সুখ যে সেটি ছাড়া নিতান্তই অসম্পূর্ণ এ কথা বোঝাবার জন্য প্রচারযন্ত্র তৎপর হয়ে উঠছে; গৃহস্থও সেইরকম বুঝতে দেরি করছেন না। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষাই উন্নতির উপায়। এ যুগের মানুষ বিশ্বাস করে, ভোগের আকাঙ্ক্ষাই উন্নতির উপায়।

ভোগবাদের সঙ্গে আধুনিক জগতের কিছু মূল বৈশিষ্ট্যের যোগ আছে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে শক্তি, বাহ্য প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব। শিল্পবিপ্লবের ফলে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের ভিতর একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। ক্রীতদাস যেমন মালিকের আজ্ঞাবহ ভোগের বস্তু, প্রকৃতির ওপর ঐরকমের একটা আধিপত্য স্থাপন করবার দিকে ঝোঁক নাগরিক সভ্যতার। প্রকৃতি দাস, মানুষ প্রভু, বিজ্ঞান সেই প্রভুত্ব কায়েম করবার উপায়। ভালোবাসা থেকে যা পাওয়া যায়, প্রভুত্ব থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। প্রভুত্ব থেকে ভোগের তৃপ্তিই সম্ভব। সেটাই তখন হয়ে ওঠে লক্ষ্য। শেষ অবধি অবশ্য ভোগের তৃপ্তিও লাভ হয় না। দারিদ্র যেমন একটা বন্ধন, যেটা ভাঙা দরকার, ভোগস্পৃহাও তেমনি একটা বন্ধন। এটা ভাঙা কঠিন।

আধুনিক সমাজের আরেক লক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাধান্য। পুরনো যুগে রাজায় রাজায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। সাধারণ মানুষের জীবন ছিল গতানুগতিকায় বাঁধা, প্রায় গতিহীন। আজকের সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে। শুধু অর্থ নিয়ে নয়, ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মধ্যবিত্তের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। গৌরবে অগৌরবে মিশ্রিত সেই কাহিনী।

এ দেশের বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আবার তারই সূত্র ধরে শুরু হয়েছে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের ভিতর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। দেশ দুই খণ্ড হল। স্বাধীনতা লাভের পর চার দশকের বেশি সময় কেটে গেছে। মধ্যবিত্তের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছে দেশের ভিতর। অনুন্নত জাতিসম্প্রদায়ের ভিতর থেকে নতুন মধ্যবিত্ত ধীরে ধীরে গঠিত হচ্ছে, তাদেরও স্বাভাবিকভাবেই কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে। চাকরি নিয়ে দ্বন্দ্ব, সরকারী শাসনযন্ত্রে কর্তৃত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নতুন রাজ্য গঠনের দাবি নিয়ে লড়াই। এইসব দ্বন্দ্বেও নেতৃত্ব প্রধানত মধ্যবিত্তের।

এখানে দেখি অন্য এক অসঙ্গতি অথবা স্ববিরোধ। মধ্যবিত্তের এক প্রধান অবদান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ। অথচ মধ্যবিত্তই আবার নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন সব দ্বন্দ্বে যেখানে সংঘবদ্ধ লোভ ও ক্ষমতাস্পৃহার কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরাস্ত।

একদিকে পরিবার-জাতি-সম্প্রদায়ের বন্ধন শিথিল হচ্ছে। ব্যক্তি আত্মসচেতন হচ্ছে, বিশ্বে তার স্থান কোথায় সে চিন্তা তাকে নিজে করতে হচ্ছে। অন্যদিকে মানুষ পীড়িত তার একাকিত্বে। বন্ধনমুক্তিই যথেষ্ট নয়, সদর্থক কিছু চাই যা নিয়ে বাঁচা যায়। তার অভাবে মানুষ সহজেই ধরা দেয় অন্য কোনও উত্তেজক বন্ধনের হাতে।

এ যুগে এমন ঘটনা বারবার ঘটেছে। হয়তো যাত্রা শুরু হয়েছিল কোনও আদর্শের নামে, কিন্তু পরিণতি আদর্শের পরাজয়ে। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের একটি কাহিনী এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। জার্মানির এক প্রয়াত বিপ্লবী নেতার বৃদ্ধা স্ত্রী ক্লেয়ার থালহাইমারের সঙ্গে শিবনারায়ণের সাক্ষাৎ ঘটে। আউগুস্ত্ ও ক্লেয়ার দু'জনেই মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বন্ধু ছিলেন। সাক্ষাৎকারের শেষে সেই বৃদ্ধা বিষণ্ণভাবে একটি প্রশ্ন করেন। এঁরা তো সবাই একটা আদর্শের জন্যই জীবন বিপন্ন করে কাজ করে গিয়েছিলেন, তবু পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হল ভয়াবহ স্তালিনী সন্ত্রাসের রাজত্ব। কেন এমন হয়? তবে কি এঁদের জীবন ব্যর্থ? অধ্যাপক রায় এ প্রশ্নের পর নিরুত্তর ছিলেন।

(ঘ)

ভারতের অর্থনীতি "মিশ্র" অর্থনীতি। "মিশ্র" মানে সরকারী নীতি ও নিয়ন্ত্রণের কাঠামোর ভিতর সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থান। জবাহরলাল নেহরুর আমলে ঘোষিত লক্ষ্য ছিল এই যে, সরকারী উদ্যোগের প্রাধান্য ক্রমে বাড়বে, এ দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক। গত দশ বছরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করবার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে অনেকে উল্লসিত, অনেকে বিষণ্ণ। তবে এটা বিশ্বব্যাপী একটা ঝোঁকের সঙ্গে মিলছে। চীনে ও সোভিয়েত দেশেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে।

যদিও আমাদের সঙ্গে ওদের অবস্থা ঠিক তুলনীয় নয় তবু একটা কথা সাধারণভাবে লক্ষ করবার যোগ্য। এ যুগের অভিজ্ঞতা এইরকম। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রথম অবস্থায়, অল্প কয়েকটি বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের যখন প্রাধান্য, সেই সময়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ শক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। আরও অগ্রসর স্তরে, শিল্পের সংখ্যা ও ভোগ্যবস্তুর বৈচিত্র্যবৃদ্ধির পর, সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করবার জন্য চাপ প্রবল হতে থাকে।

সরকারী নীতির হেরফেরে এদেশের মধ্যবিত্তের সামগ্রিকভাবে খুব বেশি ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তবে মধ্যবিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ওপর তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হতেই পারে। আমাদের অর্থনীতির মতোই আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও গঠনে মিশ্র। এই শতাব্দীর আরম্ভে সরকারী চাকরিতে বাঙালির ছিল বিশেষ স্থান, ব্যবসায়ে মারোয়াড়ী-গুজরাতীর প্রাধান্য। ব্যবসায় থেকে বাঙালি যতই পিছিয়ে গেছে ততই মতাদর্শের দিক থেকে সে হয়ে উঠেছে বণিকবিদ্বেষী। গান্ধীজী সহজে বলতে পারতেন, তিনি বানিয়া। কোনও বাঙালি নেতার পক্ষে এ কথা বলা সহজ নয়। এখানকার ঐতিহ্য ভিন্ন রকম। এ থেকে কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। সরকারি চাকরি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে চলেছে, সেখানে নিম্নবর্ণের দাবি ক্রমে জোরালো হচ্ছে। এই

ঝোঁকটা অনিবার্য। বাঙালি যুবকেরা শিল্পবাণিজ্যে আরও উদ্যোগী হয়ে উঠলে ভাল। তা নইলে এখানকার মধ্যবিত্তের সমস্যা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে আবশ্যক পল্লীসংগঠনের কাজ।

কিছুদিন আগে পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির শিরোনামা—রাজনীতি দূর হঠো। বিপ্লবী পান্নালাল একদিন বহু লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গেও তিনি পরিচিত। তাঁর আদর্শনিষ্ঠা অতুলনীয়। এমন এক ব্যক্তি যখন ওই কথা বলেন তখন সেটা উপেক্ষা করা যায় না। কথাটা অবশ্য বিচার করতে হবে দেশের সামনে যে-কাজ আছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে।

আমাদের দেশ কোন পথে যাবে সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তবে এমন কিছু কাজ আছে, এমন কিছু পরিবর্তন প্রয়োজনীয়, যে সব সম্পন্ন করতে হবে। তা নইলে শান্তি নেই।

এ দেশের নেতৃত্ব ছিল বহুকাল অবধি উচ্চবর্ণের হাতে। এই উচ্চবর্ণের পরিধি অবশ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। দক্ষিণ ভারতে উচ্চবর্ণ বলতে বুঝতে হবে প্রধানত ব্রাহ্মণ, আমাদের বাংলাদেশে ব্রাহ্মণবৈদ্যকায়স্থ। তবে সর্বত্রই উচ্চবর্ণের প্রাধান্য। এই অবস্থাটার পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। দক্ষিণে ব্রাহ্মণের সেই আধিপত্য আর নেই। উত্তর ভারতে, বিহার থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত, নিম্নবর্ণের সংগ্রাম চলছে। বাংলাদেশে বসে আমরা ব্যাপারটা তেমনভাবে বুঝি না। এটা না বুঝলে কিন্তু এ দেশকে বোঝা হয় না। প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত তথ্য মধ্যবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংঘাত বেড়ে চলেছে। এই সংঘাতের যত শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা যায় ততই মঙ্গল।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে এ দেশে পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ক্রমে এ দেশে আর্থিক পরিকল্পনার যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে কেন্দ্রের প্রাধান্য। এর কিছু কারণ আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য। বিকেন্দ্রীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবর্তন চাই। পরিকল্পনার রচনায় ও রূপায়ণে গ্রামপঞ্চায়েত এবং জিলাপরিষদকে আরও ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে হবে। সমাজবিন্যাসে যেমন নিম্নবর্ণের ক্ষমতাবৃদ্ধি বেশিদিন রোধ করা যাবে না, আর্থিক পরিকল্পনার বিন্যাসেও তেমনি বিকেন্দ্রীকরণই ভবিষ্যতের পথ। এই দুয়ের মধ্যে একটা যোগ আছে যেটা বোঝা কঠিন নয়।

মধ্যবিত্তের ভবিষ্যতের প্রধান নির্ধারক তার নিজেরই অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বের নানা রূপ আছে। এ দেশের মধ্যবিত্ত বহু জাতিতে, ভাষাগোষ্ঠীতে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শহর ও গ্রামের ভিত্তিতে বিভেদও উল্লেখযোগ্য। এককালে শহরের মধ্যবিত্তের নিঃসন্দেহে প্রাধান্য ছিল। এখন গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ক্রমে বড় হচ্ছে। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্তের এই দুই গোষ্ঠীর ভিতর স্বার্থের সংঘাত বাড়ছে। রাজনীতিতে তার প্রতিফলন স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠছে। এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই কিন্তু শহরের মধ্যবিত্তের কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রামের মধ্যবিত্ত লাভ করছে। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্য? বিজ্ঞানমনস্কতা? ভোগবাদ? হয়তো দুইই। কিন্তু কতটা? এ সব প্রশ্নের কোনও পূর্বনির্ধারিত উত্তর হয় না। দ্বন্দ্বের মাঝখানে দাঁড়িয়েই সচেতনভাবে মূল্যবিচারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

আরও একটা বিভেদ সম্প্রতি আমাদের সমাজে সমস্যার সৃষ্টি করছে, যে-বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। সেই বিভেদের যোগ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে।

এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ ইংরেজির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে, অপরাংশ ইংরেজিতে দুর্বল। ইংরেজি ও মাতৃভাষার এই বিরোধ দুঃখজনক, উভয় ভাষাতে যুগপৎ

দক্ষতা অর্জনের সপক্ষে ভালো যুক্তি আছে। কিন্তু কার্যত তা হচ্ছে না। ছাত্রসমাজের দুই অংশের ভিতর বিরোধ শুধু ভাষাজ্ঞান নিয়ে নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভেদটাই বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। ইংরেজিতেই বেশি অভ্যস্ত যারা, তাদের ভিতর আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ তুলনায় বেশি। এদের অধিকাংশ নগরবাসী, অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইংরেজিতে যারা দুর্বল তারা যে সবাই মাতৃভাষা সযত্নে পড়েছে এমন নয়, তবে এদের অধিকাংশ তুলনায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তান, অনেকের যোগ গ্রামীণ অথবা অপেক্ষাকৃত ছোট শহরের মধ্যবিত্তের সঙ্গে। এইভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজটাই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ দুয়ের ভিতর যোগাযোগের নির্ভরযোগ্য সেতু নেই।

এ দেশের সমাজের পক্ষে এটা এক সঙ্কটজনক অবস্থা। রামমোহন ও মাইকেল মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে বিনয়কুমার সরকার ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত অনেকেই তাদের 'বিশ্বদক্ষতা'কে লাগিয়েছিলেন স্বদেশের কাজে ও মাতৃভাষার সেবায়। এ দেশের সমাজের জীর্ণতা তাদের দেশত্যাগী করেনি। আজকের অবস্থা ভিন্ন। উঠতি মধ্যবিত্তের একাংশ স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিতে বিশেষ আগ্রহী নয়। বিশ্বের বাজারের প্রতি আকৃষ্ট এদের বিশ্বদক্ষতা। অপরাংশ তারই প্রতিক্রিয়ায় হয়ে উঠছে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতায় আক্রান্ত, মৌলবাদী। মধ্যবিত্তের যে সঙ্কট ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ইরানে মুখবিকৃতি করে আছে, ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তা থেকে মুক্ত নয়।

কথাটা আবারও বলা যাক। সমস্যা এই নয় যে, মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব লোপ পেতে পারে। আজকের মধ্যবিত্তের গঠনই এমন যে তার লোপ পাবার আশঙ্কা কম। রাজনীতিতে এ-পক্ষ ও-পক্ষ দু'পক্ষেরই নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের হাতে। সমস্যা অন্যত্র। প্রশ্ন এই যে, ইতিহাস আমাদের সামনে যে কর্তব্য স্থাপন করেছে, মধ্যবিত্ত তার জন্য তৈরি কি না?

দলীয় রাজনীতি আমাদের বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। রাজনীতিকে দূর করে দেওয়া কঠিন, তবু তার সীমাবদ্ধতা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আতঙ্কবাদী সন্ত্রাসকে সে ঠেকাতে চায় রাষ্ট্রীয় হিংসার শক্তি দিয়ে। দুর্নীতিকে দুর্নীতি দিয়ে। ক্ষমতা নিয়ে লড়াই বাড়িয়ে তোলে দেশের ভিতর গৃহযুদ্ধ। এইখানে কোনও সবুজের লক্ষণ চোখে পড়ে না। নতুন প্রজন্মের প্রতিশ্রুতিময় যুবকযুবতীরা তাই আকৃষ্ট হয় না এই রাজনীতিতে। ব্যতিক্রম কিছু অভিনেতা, অথবা পারিবারিক ঐতিহ্য। নতুন চিন্তা, নতুন উদ্যোগ ও সদর্থক আন্দোলন, এরপর শুরু হতে পারে বিভ্রান্তিকর দলাদলির বাইরে। সেইখানে সম্ভব নতুন ভবিষ্যতের সূচনা।

মধ্যবিত্তের বড় শত্রু অন্তর্দ্বন্দ্ব, জাতিসম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। আজ দেশকে এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করা জরুরী কাজ। বিজ্ঞানচেতনার প্রতিনিধিত্ব করা যে-মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক দায়িত্ব সে যদি জাতিসম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বে যুক্তির শত্রু হয়ে ওঠে তবে সেটা অতি বড় দুর্ভাগ্যের কথা হবে।

সন্দেহ নেই যে, দেশকে নতুন পথে নিয়ে যাবার কাজে আজকের প্রজন্মের কিছু বিশেষ সুবিধা আছে। বুদ্ধিমত্তায় ও স্বাভাবিক দক্ষতায় এরা আমাদের মুগ্ধ করে। প্রয়াত প্রজন্মের বহু কলহ থেকে এরা মুক্ত। নতুন চোখ নিয়ে সবকিছু দেখা এদের পক্ষে সহজ। এসব সুবিধা তুচ্ছ করবার মতো নয়। এরা সাহস করে এমন ভবিষ্যৎ কল্পনা করতে পারে বিদায়ী প্রজন্মের পক্ষে যেটা অসম্ভব।

মধ্যবিত্তের যে-নেতারা দেশবিভাগের জন্য দায়ী, তাঁরা আজ বহুদিন হল ইতিহাসের মঞ্চ থেকে অপসৃত। আমরা এখনো তর্ক করে যাচ্ছি, কে দোষী ? নিষ্ফল সেই তর্ক। সেদিন দেশকে দু'ভাগ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ ছিল কি না সেই বাগ্‌বিতণ্ডাতেও বিশেষ লাভ নেই। প্রশ্ন এই, আজ কী করা যায় ? ভবিষ্যতে কী করা সম্ভব ? পৃথিবীর দরিদ্রতম উপমহাদেশে কোটি কোটি মানুষকে অর্ধাহারে রেখে ভারত ও পাকিস্তান বহু অর্থব্যয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে দুই সৈন্যবাহিনীকে নব নব রণসজ্জায় সজ্জিত করে তুলছে, এই অমানবিক অসঙ্গতিকে কি চিরকালের মতো মেনে নিতেই হবে ? এখন আবার চলছে দুই দেশের ভিতর পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতিপ্রদ অর্ধগোপন প্রস্তুতি। এর শেষ কোথায় ? এটাই আজকের জরুরী প্রশ্ন। এই উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি নতুন প্রজন্ম কি গড়ে তুলতে পারে না অন্য এক জনমত, অন্য এক ভবিষ্যতের সূচনা ? মৌলবাদের ব্যর্থতা এইখানে যে, সে অতীতের হাতে বন্দী। অতীত থেকে সে পায়নি ঔদার্যের শিক্ষা, পেয়েছে "দেয়াল তোলা"র শিক্ষা। সেই বন্দীদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেশের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়া—এই তো নতুন প্রজন্মের ঐতিহাসিক কর্তব্য ও অধিকার। এই অধিকার কেউ কাউকে দান করতে পারে না, এটা অর্জন করবার বস্তু। আশা রাখতে হবে, নতুন প্রজন্মের সেই শক্তি আছে।

এদেশে মধ্যবিত্ত যুবকদের সামনে একটা বড় সমস্যা বেকারি, বেরোজগারি। এটা অবশ্য মধ্যবিত্তের একার সমস্যা নয়। এর প্রাদুর্ভাব সর্বত্র। আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে এটা আছে বিভিন্ন রূপে। একে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা দরকার। তবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও সরব, কাজেই তার সমস্যার চেহারাচরিত্র ভিন্ন। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা এই প্রজন্মের মনে এমন একটা প্রত্যাশা জাগিয়েছে যেটা অতীতে ছিল না। সমাজের কর্তব্য প্রত্যেকের জন্য শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া, এই প্রত্যাশার প্রতিতুলনায় এদেশে কর্মের অভাব শিক্ষিত যুবকদের কাছে আরো অসহ্য। শিল্পোন্নত দেশের জীবনযাত্রার ছবি এদেশে পৌঁছে গেছে, সেটা পাবার তৃষ্ণাও বেড়ে চলেছে। এইসব অসামঞ্জস্যের ফলে আজকের যুবকের ব্যর্থতা আরো বেশি মানসিক পীড়াদায়ক ও মূল্যক্ষয়ী।

কম বয়সে যে-ছেলেরা অতিবিপ্লবী, নকশালপন্থী, তারাই পরে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, এমন উদাহরণ অল্প নয়। ব্যাপারটা একই সঙ্গে করুণ ও হাস্যাস্পদ মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের সমাজের একটা প্রধান অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে প্রতিফলিত। পৃথিবীর প্রায় দরিদ্রতম দেশের কৃষিঅর্থনীতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে বিশ্বসচেতন এক মধ্যবিত্ত। নকশাল ছেলেরা অন্তত একটা কথা মনে হয় অন্য অনেকের চেয়ে গভীরভাবে অনুভব করেছে। এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারিদ্র ও বেরোজগারি যতদিন এমন নির্মম ও ব্যাপকভাবে টিকে থাকবে ততদিন শহরেও বেকারি দূর করা যাবে না। গ্রামোন্নয়নের কাজটা কঠিন, তবু এর বিকল্প নেই।

অনেকে দুঃখ করে বলেন, পুরনো প্রজন্মের সমানে একটা গৌরবময় ঐতিহাসিক কাজ ছিল, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, আদর্শবাদী যুবকদের যেটা আকৃষ্ট করেছে ; কিন্তু আজকের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবার মতো বড় কাজ নেই। কথাটা মেনে নিলে আদর্শনিষ্ঠার শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। একটা অতি জরুরী অতি মূল্যবান কাজ, এদেশের গ্রামে গ্রামেই সাজানো আছে। গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য গত দশ-বিশ বছরে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ অনেক বেড়েছে। সেই বরাদ্দ টাকার অনেকখানি নষ্ট হচ্ছে লোভী অথবা দায়িত্বহীন

ব্যবসায়ী, আমলা ও অন্যান্য মধ্যবর্তীদের কার্যকলাপের ফলে। গ্রামোন্নয়নের জন্য যে কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন সেটা শুধু সরকারী উদ্যোগে টাকা ঢেলে সম্পন্ন করা যাবে না। সে জন্য আরো চাই, অন্য এক সমাজবোধ এবং স্থায়ী গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী। অতীতের সব কাজের চেয়ে এটা আরো বড় কাজ, আদর্শনিষ্ঠার আরো বড় পরীক্ষা।

মধ্যবিত্তের সমস্ত শক্তি ও প্রতিশ্রুতি কি ভোগের আকাঙ্ক্ষা আর ক্ষমতার কলহেই নিঃশেষ হয়ে যাবে? প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র সুজিত সিংহ্ আটঘরা গ্রামীণ বিকাশকেন্দ্রের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এইখানে পাওয়া যেতে পারে অন্য এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত। একদিকে পল্লীসংগঠন আর অন্যদিকে জাতপাতের সীমানা ভেঙে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর মৌল পুনর্গঠন, এই দুটি কাজে নতুন প্রজন্মের জন্য এমন এক চ্যালেঞ্জ ইতিহাস স্থাপিত করেছে যেটা দুরূহ সুযোগ ও গৌরবে অতুলনীয়। মধ্যবিত্ত নিজেকে স্থায়ী মূল্য দিতে পারে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সীমানা ভেঙে ফেলে।

ইতিহাস চিন্তা

মানুষের সঙ্গে মানুষের তিন প্রকার সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। প্রথমটির নাম দেওয়া যেতে পারে আত্মীয় সম্পর্ক ; দ্বিতীয়, ব্যবহারিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ; তৃতীয়, আগ্রাসী সম্পর্ক। প্রথমটির সহজ উদাহরণ, পিতামাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির সম্পর্ক। কিন্তু এটিকে রক্তের সম্পর্কের চেয়ে আরও ব্যাপক ও বৃহৎ অর্থে ধরা সম্ভব। যেখানেই আমরা অপরকে একটি সম্প্রসারিত 'অহং'-এর অন্তর্ভুক্ত করি সেখানেই তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা অপরের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের অংশ হিসাবে গণ্য করি ; অতএব অপরের আনন্দে আনন্দ এবং অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করি, অপরের গর্বে গর্বিত ও অপরের অপমানে অপমানিত বোধ করি। ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই পক্ষ নিজ নিজ স্বার্থ স্বতন্ত্রভাবে গণনা করে। নিজের স্বার্থেই ক্রেতা ক্রয় করে ও বিক্রেতা বিক্রয় করে ; নিজের ও অপরের সিদ্ধির যোগফলে কোনো পক্ষেরই মাথাব্যথা নেই। একপক্ষ যখন মনে করে যে এই সম্পর্কে তার কোনো স্বার্থ নেই তখন ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আগ্রাসী প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য এই যে, দুই পক্ষ এখানে স্বেচ্ছায় পারস্পারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ নয়, বরং একপক্ষ উপস্থিত অন্য পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। উদাহরণত, ডাকাত ও গৃহস্থের ভিতর সম্পর্কটা ব্যবসায়িক নয় ; বরং আগ্রাসী নামেই একে চিহ্নিত করা চলে। বাস্তবজীবনে এই তিন সম্পর্কের নানাপ্রকার সংমিশ্রণ দেখা যায়। কিন্তু বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এই পৃথকীকরণ প্রয়োজনীয়।

ইতিহাসের একটি পর্যায় ছিল যখন যুদ্ধে পটু যাযাবর গোষ্ঠীর আক্রমণে প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতা বার বার পর্যুদস্ত হয়েছে। চীনে এই আক্রমণকারীরা এসেছে সাধারণত উত্তর দিক থেকে ; ভারতে এদের আবির্ভাব হয়েছে উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ ভেদ করে ; পশ্চিমী দেশগুলিতে আক্রমণ ঘটেছে উত্তর অথবা পূব কোণ ধরে। আক্রান্ত সমাজ অনেক সময়েই সভ্যতার মাপে খাটো ছিল না। কিন্তু সেই সমাজের অভ্যন্তরে ঐক্য ছিল দুর্বল, ভেদাভেদ প্রবল ; আর অভিজাতবংশীয় নেতারা ছিলেন বিলাসে ও পারস্পরিক অসূয়ায় শক্তিহীন। আক্রমণকারীদের সাহস ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসে সুবিদিত ; কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যটি আরও মৌল তা হলো দল ও দলপতির ভিতর একটা প্রবল পারস্পরিক আনুগত্য বা আত্মীয়তাবোধের বন্ধন।

বাবরের আত্মজীবনী থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তিনি একবার দলবল সহ পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে সবাই অবশেষে একটি গুহার মুখে এসে পৌঁছলেন। তখন ভয়ানক বরফ পড়ছিল। এর পরের ঘটনা বাবরের নিজের ভাষারই ইংরেজী অনুবাদে তুলে দিচ্ছি :

Some urged me to go into the cavern, but I thought that I ought not to be in shelter and lie down at ease, while my men were in misery shivering in the drift...There is a Persian proverb, "Death in the company of friends is a feast." (The Life of Babar, by R.M. Caldecott, 1844, p. 117).

এই-যে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়েও অনুগামীদের সঙ্গে মৃত্যুবরণকেই রমণীয় বোধ করা, এটাই উদ্ধৃত বাক্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটিকে একটি অসাধারণ কাহিনীমাত্র মনে করলে ভুল হবে। ইবন খালদুন তাঁর বৃহৎ ঐতিহাসিক গ্রন্থের ভূমিকায় আক্রমণকারী উপজাতীয় গোষ্ঠীদের ভিতর সুদৃঢ় সংহতিবোধ ও তজ্জনিত শক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক যুগের ইতিহাসেও এর ছায়া পড়েনি এমন নয়।

রাষ্ট্রের গঠন, ক্ষমতার লড়াই ও আর্থিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক সব যুগেই ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন পর্যায়ে এই সম্পর্কের প্রকারভেদও লক্ষণীয়। ভারতের সঙ্গে বাবরের সম্পর্ক ছিল আগ্রাসী। কিন্তু রাজ্য স্থাপনের পর আগ্রাসী সম্পর্ককেও ধীরে ধীরে আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠানের ভিতর রূপ দিতে হয়। ক্ষমতা রূপায়িত হয় বিধিবদ্ধ অধিকারে। এখানেই অবশ্য ক্ষমতার লড়াইয়ের অবসান নয়। শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন দেখা দিলে সেটাও আবার স্বীকৃত নিয়ম ও অধিকারে প্রতিফলিত হয়। যেমন ধরা যাক সম্রাটের সঙ্গে সুবেদারের সম্পর্ক ; সম্রাট যতদিন ক্ষমতাবান সুবেদারও ততদিন তাঁর অনুগত। কেন্দ্রীয় শাসন কোনো কারণে দুর্বল হলেই সুবেদারের আনুগত্যও অনিশ্চিত। রাজায়-প্রজায় দ্বন্দ্ব এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে, যদিও সেটা অনেক সময়েই তুলনায় গৌণ। আবার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে যাতায়াতের নিরাপত্তা যখন গুরুতরভাবে বিপন্ন হয়েছে তখন বাণিজ্যের পতন ঘটেছে। রাষ্ট্রের গঠনেও সেই সঙ্গে বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এই সব ঘটনাই প্রধান।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের ভিতর দিয়ে আর্থিক উন্নতির কোনো স্পষ্ট রেখা লক্ষ করা কঠিন। আধুনিক যুগে অবস্থা ভিন্ন। উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি

এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

উৎপাদন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে প্রতি যুগে কিছু সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই মানুষকে সহযোগিতার একটা বিশিষ্ট ধাঁচে সাজাতে হয়। সেই ধাঁচটা কখনও সরল, যেমন চার জন মিলে যখন একটা ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যায়; আবার কখনও জটিল, যেমন আধুনিক পরিবহণ ব্যবস্থায় অথবা বড় কারখানায়। কিন্তু এও তো সহযোগিতার ওপরের স্তরের দৃশ্যমাত্র। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে চালু রাখবার জন্য গভীরতর সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। বিনিময়ব্যবস্থাকেও উৎপাদনব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ধরা যেতে পারে; আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যবিনিময়ের পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া যেহেতু উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূলে আছে কারিগরী পটুত্ব ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান, অতএব তৎসংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থাও আর্থিক জীবনের অপরিহার্য পরিপূরক হিসাবে গণ্য। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবিকাশের একটা অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে।

আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন মূলধন ও ব্যবহারিক জ্ঞান। মূলধন গঠিত হয়েছে কিছুটা ব্যবসায়িক সম্পর্কের মাধ্যমে, কিছুটা আবার আগ্রাসী সম্পর্কের পথে। মূলধনের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যোগসাধন না হলে কোনো স্থায়ী উন্নতি ঘটে না; এক-পুরুষের ধন আর-এক-পুরুষ উড়িয়ে দেয়, অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সেটা ক্ষয় হয়ে যায়। বিজ্ঞান ছাড়া আর্থিক উন্নতির স্থায়ী ভিত্তি নেই। আর্থিক বিবর্তনের ইতিহাসে উৎপাদনের সংগঠন, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যায় যে দেশগুলি তুলনীয়, উপরন্তু যেসব দেশের উৎপাদন পদ্ধতি মোটামুটি একই পর্যায়ের, তাদের সামাজিক জীবনের গঠনে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। যেমন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ভিতর বৈসাদৃশ্যের চেয়ে সাদৃশ্যই ভারতীয় চোখে বেশী করে ধরা পড়ে। আজকের আমেরিকার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের ততটা পার্থক্য নেই যতটা আছে এ যুগের সঙ্গে উনিশ শতকের ইংল্যাণ্ডের।

এসব কথা মেনে নেবার পরও স্বীকার করতে হয় যে, জ্ঞানবিজ্ঞান ও উৎপাদনপদ্ধতির দিক থেকে যেসব দেশ সমপর্যায়ভুক্ত তাদের ভিতরও রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুতর পার্থক্য থাকা সম্ভব। উৎপাদনপদ্ধতি কোন রাষ্ট্রিক কাঠামো ও সীমারেখার ভিতর সংগঠিত হবে সেটা উৎপাদিকা শক্তির অন্তর্নিহিত প্রভাব দ্বারা এককভাবে নির্ধারিত হয় না। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিক ব্যবস্থায় আজ দুস্তর প্রভেদ। এই প্রভেদের কারণ কারও অজানা নেই। কোনো আর্থিক কারণে অথবা উৎপাদিকা শক্তির অন্তর্নিহিত গতির স্বাভাবিক ঝোঁকে পূব ও পশ্চিম জার্মানীর বিভেদ নির্ধারিত হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোভিয়েত লাল ফৌজের গতি যেখানে থেমেছে সেখানেই দুই জার্মানী ও দুই আর্থিক ব্যবস্থার সীমানা চিহ্নিত হয়েছে। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে অর্থনীতি দ্বারা রাজনীতি নির্ধারিত হয়নি, বরং সামরিক ও রাজনীতিক কারণে অর্থনীতি নির্ধারিত হয়েছে।

জার্মানীর এই উদাহরণকে সাধারণ নিয়মের একটি অকিঞ্চিৎকর ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা ভুল হবে। বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থার আশ্রয়ে সমপর্যায়ের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ সম্ভব। রুশ দেশে বলশেভিক বিপ্লবের পর আর্থিক উন্নতি এক পথে ঘটেছে; প্রতিবেশী জর্মানীতে বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে অন্য পথে। আজকের চীনে

আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা যে পথে চলেছে তার একটা বড় নির্ধারক রাজনীতি। একথা মাও ৎসে-তুং-এর চেয়ে স্পষ্টভাবে কেউ বলেননি ; রাজনীতিকেই তিনি অর্থনীতির নিয়ন্তা হিসাবে বহাল রাখতে চেয়েছেন।

অসম উন্নতি অনেক সময় সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো দেশ শক্তিমান হয়, আবার কোনো দেশ পিছিয়ে পড়ে। যে দেশ একবার পিছিয়ে পড়ে, এগিয়ে-যাওয়া দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে ওঠে। একই দেশে বিভিন্ন অঞ্চলের ভিতরও উন্নতির তারতম্য ঘটে, যেমন ঘটেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের ভিতর। আধুনিক যুগে আগ্রাসী অভিযানের বাস্তব রূপরেখা বহু পরিমাণে এই অসম উন্নতির ভৌগোলিক ও সামাজিক বিন্যাস দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। উন্নত দেশ বা অঞ্চলগুলি পশ্চাৎপদ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে যায় ; ফলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরও অনুরূপভাবে সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে। সামাজিক দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যায় শুধু শ্রেণীগত স্বার্থের সংঘাতই বিবেচ্য নয়, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক অসাম্যের বিশ্লেষণও প্রয়োজন।

রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ে রাজনীতির কারবার। উৎপাদনপদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা পরিবর্তন আবশ্যক হয়। এ ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্বের একটা বিশেষ ভূমিকা স্বীকার্য। উপরন্তু সংঘর্ষের এমন কারণও থাকে আর্থিক বিশ্লেষণে যা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। অর্থনীতি ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে হলে অবশেষে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ছাড়িয়ে দৃষ্টি বিস্তার করতে হয়। ইতিহাসের একটি অর্ধসচেতন শক্তির বৃহত্তর পটভূমিকায় সচেতন স্বার্থগুলির পারস্পরিক সামঞ্জস্যবিধানের প্রচেষ্টা রূপায়িত হয়। এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন।

আত্মীয়তার পরিধি, রাষ্ট্রের চৌহদ্দি এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিস্তারের ভিতর প্রায়ই সাযুজ্য হয় না। কিন্তু এই তিনটিকে মেলাবার একটা অসম্পূর্ণ অথচ অদম্য চেষ্টাও অবিরত চলেছে ; এবং এই তিনের অসামঞ্জস্যে উদ্ভূত শক্তি ইতিহাসের একটি প্রধান নিয়ন্তা।

বাণিজ্যের পরিধির সঙ্গে রাজদণ্ডকে মিলাতে গিয়ে আগ্রাসী পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল অংশকে ধর্ম অথবা সংস্কৃতির একসূত্রে বাঁধা সম্ভব ছিল না। অথচ জাতীয় ঐক্যবোধের স্বাভাবিক গণ্ডিকে অমান্য করে সাম্রাজ্যকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। আবার আত্মীয়তাবোধ যদি রাষ্ট্রের সীমানাকে অতিক্রম করে যায় তবে সেই সীমানাও শেষ অবধি মুছে যাবার সম্ভাবনা। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর ভিতর আত্মীয়তার একটা স্বাভাবিক বন্ধন আছে। রাজনীতি যদি একদিন জার্মানীকে বিভক্ত করে থাকে তো জাতীয়তাবোধ সম্ভবত তাকে পুনর্মিলিত করবে। এ বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য স্বভাবতই অস্পষ্ট তবু অর্থব্যঞ্জক। বাণিজ্যের রেখা ধরে অগ্রসর হয়ে লুণ্ঠন ও রাজ্যজয়ের আঘাতে দিগ্‌বিজয়ী বীরেরা কখনও কখনও বাণিজ্যকে সংহার করেছেন বটে। কিন্তু সাম্রাজ্যই আবার শান্তির রক্ষক হিসাবে বাণিজ্যকে উজ্জীবিত করেছে। সেই সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্যকে একই ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করবার চেষ্টাও বার বারই দেখা গেছে। এমনি করে আত্মীয়শক্তি, আগ্রাসী শক্তি এবং ব্যবসায়িক ঘাতপ্রতিঘাতে ইতিহাসের পথ রচিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাসকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব। দিল্লী থেকে

রাজ্যের সীমা বার বার ছড়িয়ে পড়েছে গুজরাত ও বাংলার উপকূল পর্যন্ত ; আর বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনে সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বাবরের কথা আগেই বলেছি। তিনি যখন উত্তর ভারতে রাজ্যস্থাপন করেন তখন এ দেশের প্রতি তাঁর কোনো আত্মীয়তাবোধ ছিল না। এ দেশের জলস্থল ও মানুষ তাঁকে মুগ্ধ করেনি। এ দেশের ধর্মকে তিনি বিধর্ম বলে জানতেন ; রানা সঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে তিনি অনুগামীদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তাতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব কথা তাঁর স্মৃতিচারণে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু যে-সংকীর্ণ আত্মীয়তাবোধ বাবরকে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করেছে, সাম্রাজ্যকে স্থায়ী করবার পক্ষে সেটা যথেষ্ট ছিল না। আকবর বুঝেছিলেন যে, রাজশক্তিকে একটি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। জিজিয়া করের বিলোপের ভিতর দিয়ে তিনি বিজয়ী ও বিজেতাদের ভিতর অপমানের ব্যবধান দূর করতে চেয়েছিলেন। রাজত্বকে আইনের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। আকবর একথা জানতেন যে, বৃহত্তর ঐক্যবোধের জন্য আরও গভীর কিছু চাই। একটি সম্প্রসারিত ও সমন্বয়াকাঙ্ক্ষী ধর্মবোধের ভিত্তিতে তিনি ভারতের ঐক্যকে স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নসন্তানরূপে জন্ম নিয়েছিল একটি উপাসনাগৃহ, যেখানে সকল ধর্মমতের মানুষ হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার জন্য স্বচ্ছন্দে সম্মিলিত হতে পারতেন।

আকবরের সেই উদারনীতি সফল হয়নি। শাহজাহানের সময় থেকেই স্রোত অন্য পথে বইতে লাগল। ধর্মসমন্বয়ের ভিত্তিতে ভারতে মহাজাতি গঠিত হলো না। এর পরিণাম ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাসে সুস্পষ্ট। কিন্তু পরিণাম স্পষ্ট হলেও এই ব্যর্থতার কারণ আমরা নির্মোহ মনে অনুসন্ধান করিনি।

আত্মীয়তাবোধের বিস্তৃতির পথে যেসব বাধা দেখা দেয় তাদের মূল অনেক সময়ে সুদূর অতীতে নিহিত থাকে। ব্যবসায়িক বুদ্ধির ঘোরফের বর্তমানকে নিয়ে ; অতএব শুধু আর্থিক কারণ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাখ্যা হয় না। ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই কথাটা মনে রাখা ভালো। ধর্ম একদিন বাণীরূপে আমাদের ক্ষুদ্রতা থেকে উদ্ধার করে ; ধর্মই আবার আচাররূপে আমাদের ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ করে।

পৌত্তলিকতায় অভ্যস্ত আরবের বিভিন্ন উপজাতিকে মহম্মদের বাণী একদিন বৃহত্তর ভ্রাতৃত্বে উন্নীত করেছিল। ইসলামের অনমনীয় পৌত্তলিকতাবিরোধী চিন্তাই আবার হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমন্বয়সাধনের পথে অন্তরায় হয়েছে। অথচ সাম্প্রদায়িক আনুগত্যকে সম্প্রীতির ওপরে স্থান দিলে সম্প্রদায়কেই ভগবানের ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয় ; এবং এটাও গভীরার্থে পৌত্তলিকতারই ভিন্নরূপ। হিন্দুদের বিশুদ্ধ ধর্মচিন্তা উদার ; কিন্তু আচারের ক্ষেত্রে কয়েকটি মারাত্মক বৈশিষ্ট্য আছে। দৈহিক পবিত্রতা সম্বন্ধে একটি বিশেষ ধারণা হিন্দু সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এরই প্রভাবে অস্পৃশ্যতাবোধ হিন্দু মনের গভীরতম স্তরে পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। মুসলমানকে হিন্দু দৈহিক অর্থে অপবিত্র জ্ঞান করে। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর প্রকৃত আত্মীয়তাবোধের পথে এটা সাংঘাতিক বাধা। এ বিষয়ে হিন্দুরা এমনই নির্বিকার যে, এই অমানুষিক অবস্থাটাকে তারা অমানুষিক বলে চিনতেও প্রস্তুত নয়। যে জড় অপবিত্রতাবোধ আমাদের মানবিক ভ্রাতৃভাবকে আচ্ছন্ন ও খণ্ডিত করেছে তাকে আমরা নির্মম ও প্রশ্নাতীত প্রত্যয়ের সঙ্গে ধর্মের অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছি।

সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা যদি কায়েমী স্বার্থের প্রতিবিম্বমাত্র মনে করি তবে এর স্বরূপ বোঝা যাবে না ; এর সমালোচনাও ব্যাপ্তি এবং গভীরতায় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর অস্পৃশ্যতার ব্যবধান যদি শুধু ব্যবসায়িক বুদ্ধির সৃষ্টি হতো তবে একে দূর করাও অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। এটা মনের আরও গভীরে প্রোথিত বলেই একে উন্মূল করা এত কঠিন। এ কথা শুধু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সম্পর্কেই সত্য নয়। শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষ অব্যাহত। পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলিতেও সমাপ্ত হয়নি ইহুদীবিদ্বেষ। জাতি ও ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বার বারই এমন আকার ও তীব্রতা লাভ করেছে, ব্যবহারিক যুক্তি দিয়ে যার অর্থ উদ্ধার হয় না। সংকীর্ণ আত্মীয়তাবোধ ও মানুষের বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে যে অমিল তাকে অতিক্রম করবার জন্য প্রয়োজন চিন্তার যে বিপ্লব, সেটা কোনো আর্থিক পরিবর্তনের ফলমাত্র নয়।

দুই

মানুষের দুটি পরিচয়। একদিকে সে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং এই সব সম্পর্ক দ্বারা তার সত্তা নির্ধারিত। তার একটি দ্বিতীয় পরিচয় আছে যা তাৎক্ষণিক সামাজিক সম্পর্ককে অতিক্রম করে যায়। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী ইতিহাসের ব্যাখ্যায় মানুষের এই দ্বিতীয় পরিচয়কে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু এটা ভুল। মানুষের গভীরতর আকাঙ্ক্ষা—আশা ও হতাশা—সামাজিক সম্পর্কের ভিতর সংক্রামিত, অথচ এই সব সম্পর্ক দ্বারা সীমায়িত নয়।

মানুষের যে সত্তা সংগঠনের অতীত তাই আবার নিগূঢ়ভাবে সমাজে ও আত্মীয়তাবোধে প্রবিষ্ট। আত্মীয়তাবোধের দুটি বিপরীত মেরু আছে ; জীবধর্ম ও আত্মজ্ঞান। জীবধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ পারিবারিক বন্ধনে। আত্মজ্ঞান বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। এ প্রসঙ্গে একটিমাত্র সূত্রই এখানে আলোচ্য। বৃহৎ সমাজ ও সংগঠনে ব্যক্তিকে বিভিন্ন কর্ম ও পদে চিহ্নিত করা আবশ্যক হয়। বৃত্তি ও পদের দ্বারা সমাজে ব্যক্তির বিশেষ পরিচয়। এই সব বিশেষ চিহ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করলে ব্যক্তির একটি সামান্য পরিচয় অবশিষ্ট থাকে। আমি অমুক অফিসের কেরানী, প্রহরী অথবা পরিচালক, এই বিশেষ পরিচয় আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি বাঙ্গালী, ভারতীয় অথবা মানুষ এই পরিচয় আমার একান্ত অন্তরঙ্গ, এমন কি অবিচ্ছেদ্য। এই সামান্য পরিচয়েই গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যক্তি বৃহৎ আত্মীয়তার সূত্রে বা আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ।

আত্মপরিচয়ের বিভিন্ন স্তর আছে, আত্মীয়তাবোধেরও তেমনই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু বৃত্ত আছে। শুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মীয়তাবোধের কোনো সীমা নেই। কিন্তু এই নিরাকার সাম্যবোধ সাধারণ ব্যবহারের সামগ্রী নয়। কর্মে ও অনুভূতিতে সত্য করে তুলতে হলে একে একটি আধারে স্থাপন করতে হয়, অতএব সীমায় বাঁধতে হয়। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির উপাদানে জাতীয়তাবোধের আধার রচিত হয়। ঐতিহাসিক আত্মীয়তাবোধ একদিকে স্থানে কালে সীমায়িত ও সংস্কারবদ্ধ, অন্য দিকে মানবিক ভ্রাতৃত্ববোধের অস্পষ্ট কল্পনায় অনুরঞ্জিত। সাধারণ অবস্থায় এই আত্মীয়তাবোধ সমাজের সংহতি রক্ষার সহায়ক। কিন্তু এই আধারেই আবার সেই আদর্শেরও উদ্ভব, যুগ-পরিবর্তনের সময় যাকে প্রাচীন সমাজের নিয়মবন্ধন ও পদবৈষম্যের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হতে দেখি।

সমাজে নানা কারণেই সংঘর্ষ ঘটা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কিছু আর্থিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অসন্তোষ যখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত কলহের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং নতুন সমাজগঠনের আন্দোলনে পরিণত হয়, সামাজিক দ্বন্দ্ব তখন ধর্ম ও মানবতাবোধের বিভিন্ন ধ্বজা নিয়ে সংঘাতের রূপ ধারণ করে। এটাকে নিছক ভণ্ডামি বিবেচনা করা ভুল। গৃহযুদ্ধে ব্যক্তির শুধু বিশেষ পরিচয়ই নয়, তার সামান্য পরিচয়ও বিপন্ন হয়—যেমন বিপন্ন হয় ভ্রাতৃহন্তার ভ্রাতৃপরিচয়। তখন আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য ব্যক্তিকে ধর্ম অথবা আদর্শের পতাকা নতুন করে তুলে ধরতে হয়, নয় তো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিতে হয়। যুগ পরিবর্তনের মুখে শাসকগোষ্ঠীও দ্বিধা (অথবা বহুধা) বিভক্ত হয়। সামাজিক বিপ্লব বিরাট পারিবারিক সংঘর্ষের আকারে দেখা দেয়। বিপ্লবের পর ব্যক্তিকে একটি সামান্য পরিচয়ের সূত্রে আবারও বৃহৎ সংহতিতে স্থাপন করতে হয়।

আর্থিক কারণে কখনও কখনও সামাজিক সংহতির পুরনো সীমারেখা অতিক্রম করা বাঞ্ছনীয় হয়ে ওঠে। যেমন হয়েছিল আরব দেশে মহম্মদের তৎকালীন সমাজে। কিন্তু শুধু স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা যায় না। ব্যবসায়িক বুদ্ধির দ্বারা আরবের উপজাতিগণ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি; মহম্মদের ধর্মের আহ্বানেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। উদাহরণ ছেড়ে এবার তত্ত্ব হিসাবে কথাটা বলা যাক। আত্মীয়তাবোধের সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে কোনো সরল রেখা ধরে বৃহত্তর বৃত্তে প্রবেশ করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন প্রথমে স্বীকৃত সংস্কার থেকে ব্যক্তির পরিচয়কে মুক্ত করে শূন্যতায় আরোহণ, তারপর সেই শূন্যতা থেকে নতুন বিশ্বাসের রেখা ধরে সংসারে অবরোহণ। আমরা যখন শুধুই সংস্কারে আস্থা হারিয়েছি, নতুন কিছু লাভ করিনি, তখনকার সেই শূন্যতা কী ভয়ংকর, কত সহজে তা হতাশায় অথবা হিংসায় ভরে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করা আজ কঠিন নয়। কিন্তু এর অতিরিক্ত প্রীতি ও বিশ্বাস সাধারণ অর্থে যুক্তি অথবা ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে লাভ করা যায় না।

এ যুগে শিল্প, বাণিজ্য ও যানবাহনের উন্নতির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সারা পৃথিবী জুড়ে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পক্ষে যুক্তি আজ প্রবল। অথচ জাতীয় সংহতির পুরনো সীমারেখা অতিক্রম করা কত যে কঠিন তাও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট। ধনতন্ত্রই জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষের মূল কারণ, এই অলীক ধারণা আজ ধূলিসাৎ। আণবিক বোমায় সর্বাত্মক ধ্বংসের ভয়কে সত্য জেনেও আমরা জাতীয় বিদ্বেষ অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবতাবোধকে আত্মরক্ষার পথ বলে গ্রহণ করতে পারছি না। পৃথিবীর রাজনীতিতে মানুষের ধর্ম এখনও স্বীকৃত হয়নি। কখনও স্বীকৃত হবে কিনা আমরা জানি না।

ইতিমধ্যে ইতিহাস থেমে নেই, থেমে থাকবে না। আগেই উল্লেখ করেছি যে, শিল্প ও বাণিজ্য পৃথিবীকে একসূত্রে গেঁথেছে। একথা আজ নয়, গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেই মার্ক্স লক্ষ করেছিলেন তাঁর তরুণ বয়সের 'জার্মান আইডিওলজি' গ্রন্থে। বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সারা পৃথিবীতে এক সরকার গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা শুরু হয়েছে বহুদিন থেকে। সাম্রাজ্যবাদকে কেউ কেউ বিশ্বরাষ্ট্রগঠনের দিকে পদক্ষেপ বলেছেন। কিন্তু কার্যত সাম্রাজ্যবাদ জাতীয়তাবাদকেই শক্তিশালী করেছে। গত অর্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি শর্ত আজ আমরা আগের চেয়ে খানিকটা স্পষ্টভাবে জানি। দুর্বল জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধ থামাতে পারেনি। যতদিন না মানুষের

আগ্রাসী অর্থাৎ সামরিক শক্তি আরও বেশী পরিমাণে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, ততদিন পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান আশা করা যায় না। অপর পক্ষে সারা বিশ্বে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষের ছোট ছোট আত্মীয়তাবোধের বৃত্তগুলি মুছে ফেলা যাবে না ; সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুত্ব ও বিকেন্দ্রিকতা রক্ষা করতে হবে। এ বিষয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করবার আছে। যুক্তি যদি-বা নিরাকার ব্রহ্মের ইঙ্গিত বহন করে, সংস্কৃতি মাত্রই 'পৌত্তলিক'। মানবতাবোধ এক হলেও তার প্রকাশ অনিবার্যভাবে বহুত্বে চিহ্নিত। অর্থনীতির স্থান এ দুয়ের মাঝামাঝি। এক জাতীয় উদ্যোগ আছে যার পরিধি প্রধানত স্থানীয়, সেখানে নিয়ন্ত্রণও স্থানীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার এমন উদ্যোগও আছে, যার পরিধি বিশ্বব্যাপী। অতএব আর্থিক ক্রিয়াকাণ্ডে সামরিক সংগঠনের তুল্য কেন্দ্রীকরণ সমর্থনযোগ্য নয় ; আবার সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণও সম্ভব নয়। তবে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে ঝোঁক রেখেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

এই বাস্তব বিন্যাসের ভিতরই আশা করা যায়, মানুষ তার স্থানীয় পরিচয়ের সঙ্গে বিশ্বপরিচয়ের, আত্মীয়বোধের সঙ্গে বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বুদ্ধির, অবশেষে একটা সমন্বয় বিধান করতে পারবে। তা যদি না হয় তো আমাদের এই সর্বাধুনিক সভ্যতা বিগত সমস্ত সভ্যতাকে পরাভূত করবার পর আত্মঘাতে বিনষ্ট হবে।

ইতিহাস ও দর্শন

॥ক॥

মমতা ও মনন

(১) মানুষের প্রকৃতির একটি মূল বস্তু মমত্ববোধ। সব জিনিসকে মানুষ মমতা দিয়ে আবৃত করতে চায়। বাইরের জিনিসকে সে জয় করে, মমত্বের পরিধির মধ্যে তাকে টেনে আনে। এ যদি সে না পারে, তবে তাকে ধ্বংস করতে চায়, কখনও উপেক্ষায় কখনও হিংসায়।

অতএব মমত্ববোধ একটি স্থানু অবিকার ভাব নয়, বরং সচল শক্তির উৎস। এতে একদিকে আছে আত্মরক্ষার শক্তি, অন্যদিকে আত্মসাৎ অথবা নস্যাৎ করবার শক্তি। আমরা যাকে সচরাচর ইচ্ছাশক্তি বলি, তারও মূলে আছে একটি আত্মরক্ষাধর্মী ও আগ্রাসী মমতা অথবা সম্প্রসারণশীল অহংবোধ।

(২) মমত্বের পরিপূরক অন্য একটি মূল উপাদান আছে, যাকে বাদ দিয়ে মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ। এর নাম দেওয়া যেতে পারে মনন অথবা, ভারতীয় অর্থে, দর্শন। মানুষই সেই অদ্বিতীয় জীব যে নিজের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের জৈবিক অবস্থাকে দর্শন করতে পারে। সে একদিকে যেমন প্রীতিতে উৎফুল্ল ও হিংসায় দগ্ধ হয়, হর্ষে উৎক্ষিপ্ত ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, গর্বে স্ফীত ও ব্যর্থতায় মুহ্যমান হয়, অন্যদিকে আবার এই সব জয় পরাজয়, সাফল্য ও বিফলতাকে দূর থেকে ছবির মতো অবলোকন করে এবং এই সবের ঊর্ধ্বে মননের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়।

ফরাসী দার্শনিক পাসকালের সেই বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণীয়। 'মানুষ সামান্য

তৃণমাত্র, প্রকৃতির দুর্বলতম বস্তু। তবে সে এক মননশীল তৃণ। তাকে ধ্বংস করবার জন্য প্রকৃতিকে রণসজ্জায় সজ্জিত হতে হয় না, এক ফুৎকারেই তাকে বিনাশ করা যায়। তবু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মানুষ প্রকৃতির চেয়ে মহৎ। কারণ মৃত্যুকে মানুষ চেতনার দ্বারা চিনে নেয়, অথচ ঘাতক প্রকৃতি অচেতন। মননেই মানুষের মহত্ত্ব।'

মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়ায় মানুষ। সেই দৃষ্টিতে কোনো ভয় নেই, নৈরাশ্য নেই। তারই টানে বিভীষিকার মুখোশ ছিঁড়ে যায়। মৃত্যু হয়ে ওঠে কার্যকারণে আবদ্ধ একটি ঘটনা মাত্র, অথবা শ্যামসমান অভিরাম শুদ্ধ রহস্য। মানুষ মৃত্যুর অধীন ; আবার মানুষ মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। এই বৈপরীত্যের সাযুজ্য শুধু মানুষেই সম্ভব।

মানুষের সত্তার দ্বৈত মুণ্ডকোপনিষদের একটি শ্লোকে অবিস্মরণীয় রূপে চিত্রার্পিত হয়েছে।

> দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
> সমানংবৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
> তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য—
> নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ (৩। ১। ১)

এটি আমাদের প্রাচীন চিন্তার একটি মূল ভাব। দুটি পাখী, স্বতন্ত্র অথচ সংযুক্ত, সখারূপে একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে আছে। এদের একটি জৈব জীবনের তিক্তমধুর ফল ভক্ষণ করছে ; অপরটি নিস্পৃহভাবে অবলোকন করছে।

(৩) মমত্ব এবং মনন অথবা দর্শন, এই দু'টিকে বিপরীত মেরু হিসেবে কল্পনা করা যথেষ্ট নয়। তা যদি করি তবে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিপূরকতা ও ঘাতপ্রতিঘাত উপলব্ধি করা কঠিন হয়। যে-ভাবটি জীবন্ত অন্তর্দৃষ্টির সহায়ক হতে পারত, অবশেষে তা একটি নিশ্চল চিত্রকল্পে পরিণত হয়। ইতিহাসের সঙ্গে দর্শনের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়।

মমত্ববোধের অন্তর্নিহিত গতি এবং জীবনকে কিছুটা দূর থেকে দর্শন করবার প্রবণতা, যেমন আদিতে তেমনই স্তর থেকে স্তরান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, স্বতন্ত্র অথচ বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পরস্পর সংযুক্ত। এই চিন্তায় আমাদের অন্তর্দৃষ্টি চলৎশক্তি লাভ করে। বিজ্ঞান, শিল্প এবং ধর্মের প্রকৃতি এই একই মূলতত্ত্বের আলোতে আলোচনা করা সম্ভব।

(৪) মানুষের আদিম জৈব মমত্ববোধে একটা অন্ধতা আছে। অন্ধ বলেই সে অসহায় ; অসহায়ভাবে ভীত ; ভীত ও ক্রুদ্ধ ; ভীত ও ক্রুদ্ধভাবে জীবনের সঙ্গে আশ্লিষ্ট। এই অন্ধ মমতা আত্মরক্ষার পক্ষে, অন্তত মানুষের আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। মানুষের ভীত আত্মার দৃষ্টিতে প্রকৃতি একদিকে যেমন রহস্যময় অন্যদিকে তেমনই অবাধ্য, স্বেচ্ছাচারিণী, ভয়ংকরী। বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ আত্মরক্ষার অথবা ব্যবহারিক জীবনের সহায়ক রূপে। প্রকৃতিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখবার যে-অভ্যাস বিজ্ঞানের মূল কথা, অবাধ্য প্রকৃতি এবং ভীত আত্মার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়েই তার প্রথম প্রকাশ। মমত্ব ও মনন এখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কিন্তু ব্যবহারিক প্রয়োজনে, জৈব ইচ্ছার যন্ত্র হিসেবে যদি-বা বিজ্ঞানের আরম্ভ, তবু সেখানেই তার শেষ নয়। গণিতের একটা যাদু আছে। প্রাচীন সভ্যতার মানুষ এই দেখে আশ্চর্য হয়েছিল যে, একটি সমকোণবিশিষ্ট ত্রিকোণের হ্রস্ব বাহু দুটির পরিমাপ যদি হয় তিন এবং চার একক, তাহলে দীর্ঘ বাহুটির পরিমাপ হবে অনিবার্যভাবে পাঁচ একক। আরও আশ্চর্যের কথা, সমকোণযুক্ত একটি ত্রিকোণকে যে-ভাবেই আঁকা হোক না কেন, তার হ্রস্ব

বাহু দু'টির বর্গের যোগফল প্রতিবারই দীর্ঘ বাহুটির বর্গফলের সমান। আড়াই হাজার বছর আগে পিথাগোরাস সুরের সঙ্গে গাণিতিক রাশির সাযুজ্য দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন। এর পর গ্রহ নক্ষত্রের কক্ষে কক্ষে গাণিতিক রাশি যখন ছড়িয়ে গেল, তখন মানুষ যেন বিশ্বচরাচর জুড়ে একটি দৈব সঙ্গীতের অনুরণন শুনতে পেল।

মমত্ব অথবা মায়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আসে ব্যবহারিক জ্ঞান। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞানেই আবার ইঙ্গিত থাকে সেই শুদ্ধ জ্ঞানের, যার রূপে আছে সামঞ্জস্য আর উপলব্ধিতে অপর-হেতু-নিরপেক্ষ আনন্দ। এই আনন্দকে মানুষ চিরকালের মতো লাভ করে না। একে বার বার আবিষ্কার করতে হয়। একদিন যা ছিল অন্তর্দৃষ্টি, অন্যদিন তাই হয়ে ওঠে যান্ত্রিক অভ্যাস। সেই অভ্যাসকে ভেঙ্গে আবারও নতুন করে যাত্রা শুরু হয়। মানুষের চেতনার বিবর্তনে মৌল এই ত্রিভঙ্গ ছন্দ।

শিশুর দৃষ্টিতে অকারণ আনন্দ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের একটা যোগ আছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেই যোগটিকে আমরা ফিরে পাই ঊর্ধ্বতন স্তরে। প্রকৃতিকে একটু দূর থেকে দেখবার তাগিদ যদিও আসে ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে, তবুও এই দূরস্থিত দৃষ্টিতে প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে এমন একটি প্রতিসাম্য, বিশ্বে এমন একটি শোভা ধরা পড়ে যে, সাধারণ জৈবিক তাড়নার ঊর্ধ্বে তাকে একটি অধরা মাধুরী বলেই মনে হয়। তখন অন্য ফল নিরপেক্ষভাবে সেই মাধুরী কাম্য হয়ে ওঠে।

কোনো এক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্বের যে-ছবি ধরা পড়ে, যদিও একটি জীবন্ত প্রেরণাতেই তার জন্ম, তবু একদিন সেটি সামান্য অভ্যস্ত বিদ্যায় পরিণতি লাভ করে। এই অভ্যস্ত বিদ্যার কাঠামোই ক্রমে জ্ঞানের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীক ও মিসরীয় বিজ্ঞান একদিন নিশ্চল হয়েছিল। একাদশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্ত্য সমাজে প্রাণশক্তি যেন নতুন করে জেগে উঠল। কিছুদিন পর্যন্ত প্রাচীন বিদ্যার কাঠামোর ভিতরই নতুন জ্ঞান ও ব্যবহারিক কলাকৌশল সঞ্চিত হতে লাগল। তারপর প্রাচীন কাঠামো পরিত্যক্ত হল। রেনেসাঁসের যুগের বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিশ্বজ্ঞানকে নতুনভাবে সাজালেন। নতুন জ্ঞানের ব্যবহারিক মহত্ত্ব কীর্তিত হল বেকনের লেখায়। আর গ্রহনক্ষত্রে পরিব্যাপ্ত বিশ্বময় সামঞ্জস্যে নিরাসক্ত দর্শকের মুগ্ধতা প্রকাশ করলেন স্পিনোজা।

(৫) শিল্পের সঙ্গে কারিগরীর যোগ আছে। শুধু উপযোগিতার জন্য যখন কিছু রচনা করা যায়, তখনও তাতে একটা ব্যবহারিক সৌষ্ঠবের প্রয়োজন হয়। ধনবানদের জন্য যে কারিগরী তাতে অনেক সময়েই প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা শৌখিন চমৎকারিত্ব যোগ হয়। এইভাবে কারিগরী কলাকৌশলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। কলাকৌশল শিল্পীরও প্রয়োজন হয়। অথচ শিল্পী কারিগর মাত্র নন।

সাহিত্যিক শব্দের কারিগর। কিন্তু সাহিত্যে জীবনের যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় তার এমনই একটা বৈশিষ্ট্য আছে, কারিগরী কলাকৌশলের দ্বারা যার ব্যাখ্যা হয় না। কারণ সাহিত্যের মূলে যে-বস্তুটিকে আমরা বিশেষভাবে পাই তা হল, মননের দ্বারা পরিশুদ্ধ মমতা অথবা আবেগ।

এই পরিশোধনেরও একটা জৈবিক প্রয়োজন আছে। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি আবেগ আত্মরক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। নখ যেমন আত্মরক্ষার অস্ত্র, হিংসাও তেমনই। অন্যান্য জন্তুর সঙ্গে এখানে মানুষের মিল আছে, আবার অমিলও আছে। মানুষের কল্পনা ও স্মৃতিশক্তি অন্যান্য জীবের চেয়ে প্রখর। হিংসাকে মানুষ অন্যান্য জীবের চেয়ে দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পারে, তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতে পারে, তা দিয়ে ভিতরে ভিতরে

দগ্ধ হতে পারে। যে-সব সঞ্চালক আবেগ বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষের আত্মরক্ষার সহায়ক, সেই সব আবেগের আধিক্য আবার মানুষকে ক্লান্ত এবং মূঢ় করে, এমন কি তার বিনাশের কারণও হয়। হিংসা ও ক্রোধ থেকে মূঢ়তা ও মৃত্যুর কথা প্রাচীনেরাও বলে গেছেন। অতএব আত্মরক্ষার জন্যই এই সব আবেগের ঊর্ধ্বে উঠবার শক্তিও মানুষের প্রয়োজন।

মানুষের স্মৃতিশক্তি যেমন দীর্ঘ, সময়ের ব্যবধানে আবেগকে কিছুটা নিরাসক্ত ভাবে দেখবার শক্তিও তেমনই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি না হত তবে সঞ্চিত তিক্ততার অন্তর্দাহেই আমাদের দ্রুত মৃত্যু ঘটত। স্মৃতির যাদুর সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবেশী পরিচিত। যে-সব ঘটনা একদিন আমাদের অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তেজিত করে তুলেছিল, তারাই আবার ধীরে ধীরে স্মৃতির পটে ইষৎ সহাস্য, ঈষৎ বিষণ্ন মুখচ্ছবির মতো সারিবদ্ধ হয়। এরই সঙ্গে, সাহিত্যের জাদুরও মিল আছে।

জৈবিক আবেগ সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়ে স্থান পায়। এই রূপান্তরে শিল্পীর অভ্যাসলব্ধ কারিগরী অথবা কলাকৌশল কাজে আসে। কিন্তু ঈষৎ ব্যবধান থেকে দর্শনটাই আরও মূল কথা। এই দর্শন আবেগশূন্য নয়। বরং একটি অখণ্ড আবেগের দ্বারা বিধৃত। সাহিত্যের এই আবেগ জৈবস্তরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েও উপনিষদে কথিত দ্বিতীয় পাখীটির মতো গুণগতভাবে ভিন্ন। ভিন্ন, অথচ সংযুক্ত। অতএব সাহিত্য একই সঙ্গে সর্বকালের, আবার যুগচিহ্নে চিহ্নিত।

প্রেমেরও ভাষা বদল হয়। ভয়েরও প্রকারভেদ আছে। যে-যুগে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভিতর একটা সহজ ঐক্যবোধ ছিল, আর যখন সেই ঐক্যের উপলব্ধি বিধ্বস্ত : এই দুই যুগের ভয় ও অনুরাগ এক বর্ণের নয়, এক ধর্মের নয়। শিল্পী স্থির দৃষ্টিতে দেখেন, এবং সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি যা দেখেন তা পরিবর্তিত হয়ে চলে। আর তিনি যা দেখেন তার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে তবেই তিনি যা সৃষ্টি করেন তা অর্থময় হয়ে ওঠে। ভূতের ভয় যে-মন্ত্রে তাড়ায়, আধুনিক মানুষের নিঃসঙ্গতা তাতে কাটে না। যে-সব শব্দ এবং চিত্রকল্প একদিন পরিচিত ভাব ও আবেগের সর্বস্বীকৃত প্রতিভূ ছিল, সময়ের গুণে তারাও একদিন জীর্ণ ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। নতুন যুগের কবি তাঁর অনুভূত সত্যকে প্রকাশ করেন নতুন ভাষায়।

(৬) আমাদের ব্যক্তিগত এমন কিছু খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতা থাকে, যাদের আমরা সহজে বশে আনতে পারি না, যারা উপদ্রবের মতো সময়ে অসময়ে আমাদের মনে ফিরে আসে। ঐরকম এক-একটি অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যিক বশে আনেন, করুণা অথবা কৌতুক অথবা বিস্ময় কিংবা অন্য কোনো ভাবের ভিতর তাকে স্থাপন করেন। উপদ্রবটা কোনো ছোটো অথবা নেহাত ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে নাও হতে পারে। নিজের যুগ ও সমাজ নিয়ে ধারণাটা হয় তো স্পষ্ট হতে চাইছে। যে-অভিজ্ঞতা আমাদের অস্তিত্বের মূল কথা, তাকেই হয় তো আমরা বাঁচাতে চাইছি। অস্পষ্টতার এবং অস্থায়িতার যন্ত্রণাকে সাহিত্যিক জয় করেন প্রকাশের ভিতর দিয়ে, কোনো স্থায়ী রসের আশ্রয়ে।

ধর্ম একটি ভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। আমাদের 'অহং'-কে নিয়েই ধর্মের প্রশ্ন, যাতে বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে টান পড়ে। যে-অস্বস্তির মূলে ধর্মজিজ্ঞাসা, শুধু শিল্পে তা আশ্বস্ত হয় না।

ছোটো সমাজের পরিধিতে, স্বজন ও প্রতিবেশীর সম্পর্কের ভিতর, মমত্ববোধ ও ব্যবহারিক প্রয়োজন হাত ধরাধরি করে থাকে। যে-বস্তুতে মমত্বের স্পর্শ লাগে, ব্যবহারিক

প্রয়োজনকে অতিক্রম করে সেই বস্তু একটি অতিরিক্ত মূল্যের অধিকারী হয়। বাজারের জাম আর বাড়ীর বাগানের জামের স্বাদ এক নয়। এই অতিরিক্ত স্বাদ কোথা থেকে আসে সে-কথা ব্যাখ্যা করে বলা হয় তো সহজ নয় ; কিন্তু আমাদের মনের কোনো একটি গভীর অভাব অথবা তৃষ্ণার সঙ্গে যে এর যোগ আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাড়াটে বাড়ী ও নিজ বাড়ীর ভিতর একটা পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্য শুধু ব্যবহারিক উপযোগিতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বিশ্বকেও আমরা স্বগৃহ করে তুলতে চাই। অর্থাৎ একে শুধু ব্যবহারের কাজে পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট নই, একে আমরা মমত্বের ভিতরও লাভ করতে চাই। প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে প্রকৃতির শক্তিকে আমরা ব্যবহারের কাজে পাই। কিন্তু মানুষের মন আরও কিছু চায়। যে-মমত্ববোধ সাধারণ ব্যবহারিক জীবনের পিছনে প্রেরণা অথবা শক্তিরূপে সংস্থিত, সেই মমত্ববোধ দিয়েই মানুষ দূরতম নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্ত বস্তুকে আবৃত করে পেতে চায়।

আদিম ধর্মকে অনেকে ভয়ের ধর্ম বিবেচনা করেছেন। সে-যুগে মানুষের চোখে রক্তাক্তদন্তনখরা প্রকৃতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ ছিল। ধর্মচেতনার ওপর সেই ভয়াবহতার ছায়া পড়াই স্বাভাবিক। তবু একথা সহজেই অনুমেয় যে, শুধু ভয় থেকে কোনোকালেই ধর্মচেতনা আসেনি। নিছক ভয়ের ভিতর এরকম শুষ্কতা আছে যাতে গলা শুকিয়ে আসে। ধর্মচেতনার সঙ্গে এর কোথাও একটা গভীর অমিল আছে। আদিম ধর্মচেতনার ওপর অজ্ঞতার ছায়া গভীর হয়ে পড়েছে, আজকের ধর্মও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু কোনো যুগের ধর্মই কেবল এই উপাদানে গড়া নয়। যে-বিশ্বকে মানুষ সম্পূর্ণ জানে না, যাকে সে ভয় করে, তবু যার সঙ্গে সে মমতায় জড়াতে চায়, সেই বিশ্বই আদিম মানুষেরও ধর্মচেতনার বিষয়।

যে-ছোটো সমাজের ভিতর মানুষের মমত্ববোধ ও ব্যবহারিক সম্পর্ক মিলে মিশে প্রত্যক্ষরূপে আছে, তার সংগঠনের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিন্যাসের একটা মিল ভিন্ন ভিন্ন যুগের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেছে। এমন একটা সময় আসে যখন পরিচিত যে-সব সম্পর্কের ভিতর মানুষ তার মমত্ব স্থাপন করেছিল, নতুন পরিস্থিতিতে সে-সবই জীবনের ব্যাপ্তির পথে প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। যে-সব ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা বহুদিনের অভ্যস্ত জগৎকে আত্মীয়ের মুখের মতো চেনা মুখ করে তুলেছিল, সেই সবই আবার নতুন সমস্যা সৃষ্টি করে অথবা সমস্যার সমাধান কঠিন করে তোলে। পুরাতনকে মানুষ আঁকড়ে থাকতে চায় শুধু স্বার্থের গণনা থেকে নয়, মায়ার বন্ধন থেকেও। প্রয়োজনে সেই বন্ধনও ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়। ক্ষয় হয়, তবু একেবারে হারায় না। মমত্বকে বার বার স্থাপন করতে হয় নতুন কল্পনায়। সেই কল্পনায় পুরাতন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না। বরং অনেক প্রাচীন কাহিনী ও ইতিকথাকেই মানুষ নতুন করে লেখে, নতুন যুগের উপযোগী করে নেয়। ধর্ম ও ঐতিহ্যের ইতিহাসে এ ঘটনা বার বার দেখা গেছে।

ঈশ্বরোপলব্ধিকে যে-উপমার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, পরিচিত জীবন থেকেই সে উপমা খুঁজে নিতে হয়। এই আরোহণ ও অবরোহণ মানুষের স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। নিকট ও প্রত্যক্ষের হাত ধরে মানুষ বিশ্বচেতনায় গিয়ে পৌঁছয় ; আবার বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত না ক'রে সে নিকট ও ব্যবহারিক বস্তুকেও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে না। আর এরই ফলে ধর্মও ইতিহাসের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। জ্ঞানের প্রসার এবং সমাজ সংগঠনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষের বিশ্বচেতনার পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন যুগের বাঁকে দাঁড়িয়ে এই চির-পুরাতন-অথচ-চির-নবীন পৃথিবীকে মানুষ যুগের উপযোগী নতুন প্রেমে জড়াবার

ভাষা খুঁজেছে।

সেই প্রেম আবারও হয়েছে আরোহণকারী ও অবরোহণকারী। কারণ ধর্মের উদ্দেশ্য একই সঙ্গে সমাজকে অতিক্রম করে যাওয়া ও সমাজকে ধারণ করা। স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু কোনো সম্পর্কই ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয় ; আবার কোনো সম্পর্কই ব্যবহারিক প্রয়োজন মাত্রে পূর্ণ হতে চায় না। সংসারকে এমন একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার মূল ঊর্ধ্বে। সব উপমাই অসম্পূর্ণ। আমাদের এই প্রয়োজনের সংসার প্রয়োজনে বদলায়। কিন্তু একটি আরোহী-অবরোহী প্রেমে সিঞ্চিত হয়েই সে সতেজ থাকে ; নয়তো জীবন আপনার বৃন্তে স্থিত থেকেও মমতাহীন ব্যবহারিকতার রসহীন তপ্ত স্পর্শে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

(খ)
আত্মীয়তন্ত্র, বণিকতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র

(৭) ব্যক্তির একান্ত উল্লেখে যার নাম মমত্ব, সমাজের পটভূমিকায় তা-ই আত্মীয়তাবোধ। মননের প্রকাশ একদিকে স্বাতন্ত্র্য চেতনায়, অন্যদিকে ন্যায় অথবা সাম্যদৃষ্টিতে। মমত্বের বিকৃতি থেকে আসে নিষ্ঠুরতা, মননের বিকার থেকে অন্যায়।

ব্যক্তির মমত্ব কি ভাবে একটি সমষ্টিতে আশ্রিত হয়, পরিবারই তার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এখানে একের সুখ ও দুঃখ অন্যে স্বভাবত নিজের সুখ-দুঃখের অংশরূপে অনুভব করে। এখানে সহানুভূতি যুক্তি ও নিয়মকে অতিক্রম করে যায়। পিতার অজ্ঞাতেও পুত্র যে অপরাধ করে, পিতার গোচরে আসা মাত্র তিনি তাতে লজ্জিত বোধ করেন, নিজেকেই অপরাধী জ্ঞান করেন। বিদ্বান ছেলের সাফল্যে নিরক্ষর মা গর্ব অনুভব করেন। 'আত্ম'বোধের এই প্রসারকেই সাধারণ ভাষায় বলা যায় আত্মীয়তা অথবা আত্মীয়ভাব। 'রক্তের বন্ধন' আত্মীয়ভাবের আদিম ভিত্তি, কিন্তু একমাত্র অবলম্বন নয়। শিষ্যের কৃতিত্বে গুরু গৌরব বোধ করেন। কর্মী সহকর্মীর সঙ্গে সহমর্মিতায় আবদ্ধ হন। এক বাঙ্গালী পৃথিবীতে সম্মানিত হলে বাঙ্গালীসাধারণ অহংকৃত হয়।

তবুও পরিবারই প্রসারিত মমত্বের প্রাথমিক উদাহরণ। পরিবারে একের সঙ্গে অন্যের বন্ধন শুধু জীবিতদের ভিতরই আবদ্ধ নয়। মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণের দ্বারা জীবিতেরা তৃপ্ত হন। যিনি মৃত তাঁর কর্ণ নেই ; কিন্তু আমাদের ধ্বনি কোনো সুদূর আকাশ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে একটি সমৃদ্ধতর সুর সহ ফিরে আসে। আমাদের ক্ষুদ্র চেতনা অথবা ক্ষুদ্র অহং যেন একটি বৃহৎ চেতনার সঙ্গে যোগ অনুভব করে।

এই যোগ কার্যকারিতাশূন্য অনুভূতিমাত্র নয়। বিশেষত প্রাচীন সমাজে পরিবারের একটি অলিখিত সংবিধান থাকে। সেই সংবিধান বহু পরিমাণে পূর্বপুরুষেব রচিত। সেই অনুযায়ী এবং বর্তমান কালের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিবার শাসিত হয়। কর্তৃত্ব সম্বন্ধে ধারণা, পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কর্তব্য ও অধিকার, এইভাবে নির্ধারিত হয়। এইভাবে ক্ষুদ্র অহং-এর অস্থিরতা বৃহৎ অহং-এর গাম্ভীর্যের ভিতর স্থিতি লাভ করে। সময় বিশেষে সেই স্থিতি কারাবাসের তুল্য হয়। স্মৃতিপ্রণেতারা তাঁদের সংকীর্ণ ভাষাকে চিরকালের বাণী বলে দাবী করেন। এই বদ্ধতা থেকে সমাজকে কিন্তু তাঁরাই মুক্তি দিতে পারেন যাঁরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, বর্তমান ও অতীতের ভিতর সম্পর্কটাকে উপেক্ষা করেন না, বরং তাকে সমকালের উপযোগী করে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরিবার সম্প্রসারিত হয় ; উপজাতি গঠিত হয়। এক উপজাতি অন্য উপজাতিকে পদানত করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী যেসব উপজাতি পাশাপাশি বাস করে, অনুকূল অবস্থায় তারা ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক মহাজাতিতে পরিণত হয়। রাজ্য ও সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। নতুন ও বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন উপজাতীয় ও জাতীয় সংগঠনকেও এক ধরনের আত্মীয়তন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

বলা বাহুল্য, আত্মীয় ভাব ও আত্মীয়তন্ত্র এক বস্তু নয়। প্রথমটি সহজ ভাব ; দ্বিতীয়টি সেই ভাবের প্রলম্বনস্বরূপ একটি রচিত ভাবাদর্শ। প্রাচীন সমাজে অসাম্য ও আত্মীয়চিন্তাকে এই ভাবাদর্শের সাহায্যে একই সূত্রে বাঁধা হয়েছে। রাজা ও প্রজার ভিতর সম্পর্কের এটিই প্রাচীন আদর্শ রূপ। রাজা পিতার মতো, প্রজা সন্তানতুল্য। রাজবংশ ও জাতির উৎপত্তি পূর্বপুরুষসূত্রে স্মরণাতীতকাল অতিক্রম করে চন্দ্র, সূর্য, দেবদেবতার সঙ্গে যুক্ত। দৈব প্রেরণা অথবা দীর্ঘ ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী রাজা শাসন পরিচালনা করেন।

অর্থাৎ বৃহৎ সমাজ সংগঠনের একটি মৌল রূপ আত্মীয়তন্ত্র। চীনা দার্শনিক কুং ফু-ৎসু বা কনফুসিয়সের চিন্তায় এর প্রখ্যাত পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজ সংগঠনের অপর মৌলরূপ আমলাতন্ত্র। প্রাচীন সমাজে এ দুয়ের বিরোধ তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। চীনের আমলাতন্ত্র ঐতিহাসিক খ্যাতির অধিকারী। দার্শনিক কুং কিন্তু ঐ আমলাগোষ্ঠীকেও প্রজার প্রতি আত্মীয়চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। সব আদর্শ সমাজ কল্পনাতেই তৎকালীন অবস্থার একটি উহ্য সমালোচনা থাকে। নিষ্ঠুরতা, অন্যায় ও অরাজকতায় চিহ্নিত প্রাচীন আত্মীয়তন্ত্রের একটা বিকৃত রূপ ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়েছে। কনফুসিয়সের আদর্শ সে-যুগের উচ্চতর ঐতিহাসিক আত্মসমালোচনা। (তাঁর একটি স্মরণীয় উক্তি : কি আশ্চর্য ! এমন একটি লোকের দেখা পেলাম না, যিনি নিজের দোষের জন্য নিজেকে দোষী মনে করেন।)

(৮) মধ্যযুগে সম্রাট রাজত্ব চালাতেন আমলা ও সমান্তদের সহায়তায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় শক্তি যেখানে দৃঢ় সেখানে আধিপত্য আমলাদের ; আর বিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁকটা যেখানে শক্তিশালী সেখানে আধিপত্য সামন্তদের। মধ্য যুগের সমাজে এই দ্বিতীয় ঝোঁকটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বণিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের ফলে মানুষে মানুষে সম্পর্কের একটি ভিন্ন আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে একটি ভিন্ন সমাজ সংগঠনের ভিত্তি রচিত হল। পারিবারিক অথবা আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একের সুখে অন্যের সুখ। বাণিজ্যের অর্থাৎ কেনাবেচার সম্পর্কে দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি অথবা দুটি স্বতন্ত্র সংস্থা মুখোমুখি দাঁড়ায়। বাণিজ্যের ফলে হয়তো দুই দলই লাভবান হয় ; কিন্তু একের লাভ অন্যের লাভের অংশ বলে গণ্য হয় না। প্রত্যেকের লাভ ও ক্ষতির হিসেব আলাদা। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ বাণিজ্যিক সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজে বণিক শ্রদ্ধার স্থান লাভ করেনি। সে যুগের ধর্মের সঙ্গে বণিকধর্মের বিরোধ ছিল মৌল।

অথচ স্বীকার করা প্রয়োজন যে, সাম্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আন্তর্জাতিকতা ও নিয়মের শাসনের যেসব আদর্শ মানুষের ঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান, সেই সব আদর্শের গঠনে বাণিজ্যের ঐতিহাসিক ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। নাগরিক সংস্কৃতি নামে যা পরিচিত, বণিক সভ্যতার দ্বারাই তা লালিত।

বণিক সভ্যতা যুক্তিকে বহুদূর এগিয়ে দিয়েছে। ধর্মকে বণিকশ্রেণী ত্যাগ করেনি ; কিন্তু যুগের প্রভাবে ধর্ম ভিতর থেকে পরিবর্তিত হয়েছে এবং যুক্তির সঙ্গে নতুন সামঞ্জস্যে পৌঁচেছে। ব্যক্তির বহুমুখী সম্ভাবনা নতুনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। মধ্যযুগীয় আত্মীয়তান্ত্রিক সমাজে উচ্চ-নীচের পার্থক্য স্বাভাবিক এমনকি দৈব আদিষ্ট বলেই স্বীকৃত ছিল। ইংরেজী 'hierarchy' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের যোগ থেকে উৎপন্ন। এর প্রথমটির অর্থ, পুত বা পবিত্র (hieros) ; দ্বিতীয়টির অর্থ, শাসক (arkhes)। দৈব নির্দিষ্ট ও পবিত্র ভেদ ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন সমাজের একটি মৌল প্রত্যয়। বিভিন্ন বর্ণের ভিতর উচ্চ নীচ ভেদ ভগবানের বিধান ; এই পার্থক্য অস্বীকার করা নীতিবিরুদ্ধ। অপর পক্ষে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই মৌল প্রত্যয় থেকে মুক্ত। ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিতর কোনো পক্ষই নীতিগতভাবে উচ্চ অথবা নীচ নয় ; বরং নীতি ও আইনের দৃষ্টিতে উভয় পক্ষই সমপদবাচ্য। সাম্য সম্বন্ধে এই ধারণাকে কোনো মতেই পূর্ণাঙ্গ বলে মেনে নেওয়া যায় না। তবে বণিক সভ্যতাই সাম্য ও অসাম্যের প্রশ্নকে প্রাচীন অনুশাসন থেকে ছিন্ন করে ব্যবহারিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

পুরনো সমাজে স্থানীয় আচার ও প্রথার ঊর্ধ্বে সর্বদেশে স্বীকৃত কোনো আইনের ধারণা প্রায় ছিল না। কিন্তু বাণিজ্যের সূত্রে যতই নানা দেশের মানুষ পরস্পর সম্পর্কে আবদ্ধ হল ততই স্থানীয় প্রথাকে সেই বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের সর্বসম্মত ভিত্তি হিসেবে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠল। এরই ফলে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল : আইনের 'স্বাভাবিক' অথবা আদর্শ ভিত্তি স্থানীয় আচারে নয়, বরং সেই সাধারণ যুক্তিতে, বহু দেশের মানুষের কাছে যে-যুক্তি সমভাবে গ্রহণযোগ্য। রোমক সাম্রাজ্যের যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত ; রেনেসাঁসের যুগে এর পুনরুজ্জীবন। দুই বিপরীত চিন্তাধারা অর্থাৎ আত্মীয়তান্ত্রিক সমাজের নিয়ম এবং সার্বজনীন ন্যায় সম্বন্ধে নতুন ধ্যানধারণার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে আইনের নতুন ঐতিহ্য ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হল।

বাণিজ্য শিল্পবিপ্লবের অগ্রদূত, তবে অনিবার্যভাবে নয়। বাণিজ্যবৃদ্ধির অর্থ হল বাজারের বিস্তার। বাজারের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটি কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন দ্রব্য নানা বাজারে বিক্রয় করা যায়। ফলে স্থানীয় বাজারের চাহিদার ওপর আর শিল্পের আয়তন নির্ভর করে না। এই সুযোগে যদি প্রযুক্তি বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে এবং সেই সঙ্গে পরিচালনা পটুত্বের যোগাযোগ দেখা যায়, তবেই দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়। প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের যুগে ঘটেছিল বাণিজ্যের প্রসার । কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি সে-যুগে ঘটে নি ; অতএব কোনো শিল্পবিপ্লবও সেদিন দেখা দেয়নি। আইন প্রণয়ন ও সংকলনে রোমক যুগ খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ ধরনের যুক্তিপ্রবণতা প্রয়োজন, শিল্পবিপ্লবের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট নয়। আরও প্রয়োজন বিজ্ঞান।

(৯) সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তান্ত্রিক, বণিকতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই সঙ্গে তাদের রূপ ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। কোনো এক যুগে এই সম্পর্ক কিভাবে গঠিত হয় এবং পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাবে নতুন সমন্বয়ে পৌঁছয়, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের পক্ষে এটি বিস্তৃত গবেষণার যোগ্য বিষয়বস্তু। সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের একটি প্রধান ভাগ এইভাবে লেখা সম্ভব।

বাণিজ্য বিস্তারের আধুনিক যুগে আমলাতন্ত্রের সহায়তা বণিকশ্রেণীর পক্ষে বিশেষভাবে

প্রয়োজন ছিল। বহু ক্ষেত্রেই সে-সহায়তা লভ্য হয়েছে। শাসনযন্ত্রের ওপর অধিকার নিয়ে অভিজাত শ্রেণীর ভিতর একটা কলহ অথবা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলে। যুগ পরিবর্তনের সময়ে বণিকের সমর্থন নিয়ে অভিজাত শ্রেণীর একটি অংশ জয়ী হয়েছে। বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোটামুটি এই রকম পরিবর্তন দেখা গেছে ইংল্যান্ড থেকে জাপান পর্যন্ত অনেক দেশেই। শাসন পরিচালনায় অভিজাতদের একটা স্বাভাবিক পটুত্ব ছিল। শিল্পায়নের প্রথম যুগে এঁরাই বহু দেশে শাসনযন্ত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বণিক এবং শিল্পপতিদের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা রক্ষা করে এঁরা শাসন চালিয়েছেন। এটাই এঁদের কাছে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন মনে হয়েছে। দেশের আর্থিক উন্নতি এ পথে ঘটেছে।

দেশ শাসন আর বাণিজ্য বিস্তার এক ধরনের কাজ নয়। এ দুয়ের জন্য ভিন্ন জাতীয় গুণের প্রয়োজন হয়। জনগণের যিনি অধিনায়ক হবেন, ঝড়ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়ে দেশ'কে চালিত করবেন, তাঁকে হতে হয় জাতীয় সংহতির প্রতীক। অর্থাৎ, তাঁর ভিতর বৃহৎ অর্থে একটা আত্মীয়গুণের প্রয়োজন। বণিকশ্রেণী ও শিল্পপতি এক নতুন ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রতীক। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নাগরিক সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কিন্তু শুধু নগর নিয়েই তো দেশ নয়। দেশের কাছে পুরনো ঐতিহ্যের ও আভিজাত্যের, সেই 'যুক্তির যুগে'ও, একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পারী নগরী আর ফরাসী দেশ এক নয়। অতএব সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিভিন্ন দেশে এই ঐতিহাসিক সমন্বয় বিভিন্নভাবে ঘটেছে; অথবা কখনও সমন্বয়ের অভাবে ব্যর্থতা এসেছে। দুটি মূল ভাব এবং দুটি পরস্পর অন্তঃপ্রবিষ্ট শ্রেণী অথবা গোষ্ঠীর সহযোগিতার মাধ্যমেই অগ্রগতি স্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে।

(১০) সামাজিক উচ্চনীচভেদ তিন প্রকার: বর্ণ অথবা জাতি ভেদ, আত্মীয়তান্ত্রিক সমাজে যার সমর্থন শাস্ত্রীয়; বিত্ত অথবা শ্রেণী ভেদ, বণিকতান্ত্রিক সমাজে যার বিকাশ উল্লেখযোগ্য; পংক্তি অথবা পদাধিকারভেদ, নিয়ম ও সংগঠনের ওপর যার প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, এই বর্ণ-বিত্ত-পংক্তিভেদ একটি স্থাণু বিন্যাস নয়, বরং পরস্পর সন্নিবিষ্ট ও পরিবর্তনশীল। ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রভাবে এদের রূপান্তর ঘটে। প্রতিটি জাতি, পাতি ও শ্রেণী স্বভাবত নিজেকে রক্ষা করতে আগ্রহী; কিন্তু প্রয়োজনে রূপান্তরও আত্মরক্ষার উপায় হয়। সৈনিক হয়ে ওঠে বণিক, বণিক রূপান্তরিত হয় আমলায়।

বণিকতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওপর তার প্রভাব দেখা যায়। উৎপাদন একদিন পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত ছিল। আধুনিক যুগে ব্যবসায়ী সংস্থার প্রাধান্য। প্রাচীনকালে ক্রীতদাসও যেন পরিবারের অংশবিশেষ ছিল। আঠার শতকের ক্রীতদাস প্রধানত বেচাকেনার সামগ্রী। ক্রীতদাস প্রথা একদিন পরিত্যক্ত হল। শ্রম নিয়ে বেচাকেনা চলল, সেই শ্রম যাকে দিন ও ঘণ্টা অনুযায়ী পরিমাপ করা যায়, অতএব উৎপাদনের প্রয়োজনে যাকে অঙ্কের হিসেবের ভিতর আনা যায়। এর ফলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি এবং "উদ্‌বৃত্ত শ্রমের" নিয়োগ বৃদ্ধি পেল। এরই নাম শোষণ; আবার আর্থিক জীবনে ব্যবহারিক যুক্তির প্রয়োগে এটা ঐতিহাসিক অগ্রগতিও বটে। ক্রমে শিল্পপতি ও শ্রমিক উভয়পক্ষেই সাংগঠনিক ভিত্তিতে দর কষাকষি শুরু হল। এই হিসেবে শ্রমিকসমিতিও এক ব্যবসায়িক সংস্থাবিশেষ। তবে ভাবাদর্শের প্রভাবে, সমহিংসায় ও সমস্বপ্নে, শ্রমিক আন্দোলন যূথবদ্ধ। এই আন্দোলন আজ সামাজিক সাম্যের সপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি।

আধুনিক যুগে আমলাতন্ত্রেরও চরিত্র পালটাতে শুরু করে। আমলাতন্ত্র ক্রমে হয়ে

উঠল আত্মীয়তন্ত্র ও নিয়মধর্মিতার এক অসম্পূর্ণ ও কিছুটা বিকৃত সমন্বয়। উচ্চ নীচ ভেদ আমলাতন্ত্রে অপরিহার্য। এই ভেদকে দৈব নির্দিষ্ট বলে গ্রহণ করা যতই কঠিন হয়ে উঠল, ততই একে নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হল। এই নিয়ম ব্যক্তির পরোয়া করে না ; তবে বিশেষ পদের বিশেষ কর্তব্য এবং অধিকার স্বীকার করে। পদের সঙ্গে সংযুক্ত সেই কর্তব্য ও অধিকার কিন্তু যুক্তির দ্বারা, অর্থাৎ 'সাধারণ স্বার্থ' ও যান্ত্রিক দক্ষতার বিচারে, সমর্থনীয় হওয়া প্রয়োজন। যে-আত্মীয়তন্ত্র একদিন স্বৈরাচারের বাহন হয়ে উঠেছিল তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক আমলাতন্ত্র এইভাবে এক নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম ও যান্ত্রিক যুক্তির আদর্শে আকৃষ্ট হল। সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতিতে যে আমলাতন্ত্রের একটা বিশেষ ভূমিকা ও অবদান আছে, একথা স্বীকার্য।

কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় আধিপত্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসকের সঙ্গে শাসিতের দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রে বেড়ে গেছে। শাসনযন্ত্র বিরাট ও জটিল হয়ে উঠেছে। এই জটিলতা বৃদ্ধির ফলে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভাব বিনিময় কঠিন হয়েছে। শাসনসংক্রান্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি থাকলেও সেই যুক্তি সাধারণের বোধগম্য হয়ে উঠছে না। এই বিযুক্তি আধুনিক সমাজের একটি মূল সমস্যা। নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেও এই সমস্যা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে নিয়মতন্ত্র ত্যাগ করে এই সমস্যাকে অতিক্রম করা যাবে না। বরং কেন্দ্রীয়তা ও বিকেন্দ্রীকরণের সমন্বয় নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এর সমাধান খুঁজতে হবে।

(১১) আমলাতন্ত্র তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রসার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনীতি, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর দখল নিয়ে লড়াই, বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গত দুয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

মধ্যযুগে রাজনীতি ধর্মের অঙ্গ ছিল। আধুনিক যুগের গোড়াতেই রাজনীতিকে ধর্মের আওতা থেকে বের করে আনবার চেষ্টা শুরু হল। এর প্রয়োজন ছিল। দুটি গোষ্ঠী যখন ধর্মীয় অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক আনুগত্যে অন্ধ হয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় তখন তার ফল কত ভয়াবহ, ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার রক্তাক্ত পরিচয় বার বার চোখে পড়ে।

নতুন যুগে মানুষ রাজনীতির দিকে তাকাতে চাইল নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে। মাকিয়াভেলির চিন্তায় এর নিদর্শন পাওয়া গেল রেনেসাঁসের যুগে, সেই ষোড়শ শতকের গোড়ায় যখন সারা সৌরমণ্ডল সম্বন্ধেই মানুষের ধারণা উলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। 'বৈজ্ঞানিক' রাজনীতির ভিত্তি স্থাপিত হল। এর ফলে কিন্তু রাজনীতি অবশেষে শুধু ধর্মনিরপেক্ষই নয়, নীতি নিরপেক্ষ হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিক রাজনীতির চোখে পূর্ব-নির্ধারিত কোনো নীতি বড় নয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধিটাই বড়। এতে হয় তো তেমন বিপদ ছিল না, যদি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যকে কার্যত গ্রহণ করা যেত।

কিন্তু এ যুগে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করাই কার্যত রাজনীতির উদ্দেশ্য। আরও বড় উদ্দেশ্যগুলো মুখের কথা হয়ে রইল। রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করা না গেলে সেই সব উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যাবে না। অতএব রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করাটাই আপাতত একমাত্র অথবা মুখ্য উদ্দেশ্য। এই চিন্তাটাই প্রধান হল। অন্য সংস্কার ত্যাগ করে, অন্য বাধানিষেধ এবং ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য অবজ্ঞা করে, ক্ষমতার অন্বেষণই আধুনিক রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াল। শুধু একটি হৃদয়দৌর্বল্য অন্য সকল মানুষী দুর্বলতার ওপর জয়ী হল, সেটি ক্ষমতার লোভ।

বলা বাহুল্য, এই রাজনীতি অর্ধ বৈজ্ঞানিক মাত্র। সত্যের সঙ্গে অর্ধ সত্যের সাদৃশ্য যেমন, আধুনিক রাজনীতির সঙ্গে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক রাজনীতিরও তেমনই! যেন তেন প্রকারেণ রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে পারলেই কোনো দল তার ঘোষিত মহৎ উদ্দেশ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে অথবা সেখানে পৌঁছবার পথ পরিষ্কার হবে, এই সিদ্ধান্তে কেউই নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাহায্যে পৌঁছাননি। গান্ধী এলেন বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়ে। আদর্শ সমাজের মূল চরিত্রের সঙ্গে যে-সব উপায়ের সামঞ্জস্য আছে, সেই সব উপায়ই গ্রহণযোগ্য। তার বিপরীত উপায় অবলম্বন করে ক্ষমতা দখল করা যায় বটে, কিন্তু তাতে আদর্শে পৌঁছবার পথে নতুন বাধা সৃষ্টি হয়। এই রকম একটা চিন্তা আমরা গান্ধীর কাছ থেকে পেলাম।

শেষ লক্ষ্য ক্ষমতা দখল করা নয়। আদর্শ সমাজ গড়ে তোলাই শেষ লক্ষ্য। দক্ষ মিথ্যাচরণের দ্বারা যাঁরা ক্ষমতা দখল করেন, ক্ষমতা দখলের পর তাঁরা ক্রূর সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠেন। হিংসা ও অসত্যের সাহায্যে রাষ্ট্রযন্ত্র জয় করে নেওয়া যায় কিনা, সেটা প্রধান কথা নয়। এর দ্বারা আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় কিনা, সেটাই বিবেচ্য। গান্ধীর কথাটা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তিনি যে-প্রশ্ন তুলেছেন, সেটা বড় প্রশ্ন। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দেখা আবশ্যক। গান্ধী বলছেন যে, হিংসা ও অসত্য আমাদের বৃহত্তর আত্মীয়বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে। এর পর আমরা যতই ব্যবহারিক অর্থে দক্ষ অথবা বৈজ্ঞানিক হই না কেন, তাতে বিপদের হাত থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় না।

(১২) প্রাচীন আত্মীয়তান্ত্রিক অসাম্য থেকে আইনভিত্তিক সমানাধিকারের দিকে ইতিহাসের যেমন একটা ধারা আছে, নিয়মতন্ত্র থেকে তেমনই আবার আত্মীয়ধর্মী সাম্যের দিকেও একটা ঝোঁক লক্ষ করা যায়। বণিকসভ্যতা কোনো কালেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি। আজ তার অসম্পূর্ণতা আরও প্রকট। সমাজকে শুধু স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। একটা যৌথ দায়িত্ববোধ বা আত্মীয়বুদ্ধিরও প্রয়োজন আছে। পরিবারে যেমন রোগীর সেবা অবশ্য কর্তব্য, সমাজেও তেমনই যাঁরা রুগ্ন ও পীড়িত তাঁদের সকলের শুশ্রূষার ব্যবস্থা থাকা চাই। উচ্চনীচ ভেদ নিরপেক্ষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, সেই শিক্ষা যা একই সঙ্গে মানুষকে জগৎ সম্বন্ধে সচেতন করে এবং সমাজের উৎপাদিকা শক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। বাস্তব ও সাংস্কৃতিক যে-সম্পদ সারা সমাজের সৃষ্টি, তার উত্তরাধিকার যদি প্রধানত স্বল্পসংখ্যক পরিবারেই বর্তায় তবে তাকে অন্যায় বলেই স্বীকার করা প্রয়োজন। সে অন্যায় প্রাচীন হলেও তাকে আর শ্রদ্ধেয় বলা যায় না। বণিকসভ্যতা সেই অন্যায়কে সহজে মেনে নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিবিধানের দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্যবাদ। যেমন সমাজে তেমনই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিতরও সম্পর্কের পরিবর্তন আবশ্যক। যৌথ অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিতেই যৌথ উৎপাদন প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তবু বণিকসভ্যতার অবদানকে অস্বীকার করে নয়, বরং তার ভিতর যেটুকু গ্রহণযোগ্য তাকে গ্রহণ করেই বৃহত্তর আদর্শের দিকে এগোতে হবে। রেনেসাঁসের যুগ থেকে শুরু করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আইনের শাসনের যে-ঐতিহ্য ইয়োরোপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সেটা অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু অশ্রদ্ধেয় নয়। সাম্যবাদী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে প্রধানত পৃথিবীর সেই সব অংশে যেখানে রেনেসাঁসের ধ্যানধারণার পলিমাটি পুরু হয়ে পড়েনি, প্রতিবাদী ধর্মমত ও ব্যক্তিস্বাধনীতার ঐতিহ্য যেখানে দুর্বল। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর

ফলে সাম্যবাদের নামে সৃষ্টি হয়েছে, বিশ শতকের প্রযুক্তিবিদ্যার কাঠামোর ভিতর, বিস্তৃত আত্মীয়চিন্তা ও বর্বর অসহিষ্ণুতার এক ঐতিহাসিক সংমিশ্রণ। একদলীয় শাসন এবং স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্র এর সাংগঠনিক ভিত্তি। সেই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজ যাঁরা নতুন করে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ স্থাপন করতে চাইছেন, ইতিহাসের একটা অপূর্ণতাকেই তাঁরা যে পূর্ণ করে তুলতে উদ্যোগী, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অতি দুরূহ তাঁদের সাধনা।

(১৩) এদেশের রাজনীতির কেন্দ্রে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কলহ। মধ্যবিত্তের দুটি অংশ প্রধান : এক, বাবু-মধ্যবিত্ত ; দ্বিতীয়, ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত। বণিক ও শিল্পপতিদের নিয়ে ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত। এঁদের অনেকে মনে মনে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চান। বাবু-মধ্যবিত্তের কথা একটু সবিস্তারে বলা আবশ্যক। আমলাতন্ত্রকে অবলম্বন করে এক জাতীয় মধ্যবিত্ত পুরনো যুগ থেকেই এদেশে একটা বড় সামাজিক স্থান অধিকার করে আছে। এঁদের একদিন মোগল দরবারে দেখা গিয়েছিল। পরে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে এঁদের পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই সঙ্গে মাস্টারবাবু, ডাক্তারবাবু ইত্যাদি যোগ করে আজকের বাবু-মধ্যবিত্ত। এঁরাই এদেশের বুদ্ধিজীবী। এঁরাই প্রধানত শ্রমিক কৃষকের নেতা। এঁদের হাতে এদেশের প্রশাসনের ভার ; আবার এঁরাই শাসনব্যবস্থার সমালোচকও বটে। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাবু নির্ঝঞ্ঝাট জীবন পছন্দ করেন। এঁদের অধিকাংশের লক্ষ্য এমন একটি সরকারী অথবা আধা-সরকারী চাকুরী, যেখানে প্রবেশের পর অলসগতিতে ও গতানুগতিক ধারায় কয়েকটি প্রমোশনের বেশী আর কিছু কাম্য থাকে না এবং আশা করবারও থাকে না। অধস্তন কর্মচারীদের এইরকম কিছু সুবিধা যিনি করে দেন তিনি দয়ার অবতার। এই বাবু-মধ্যবিত্তই এদেশের পেশীহীন প্রশাসনের কর্তা এবং প্রতিনিধি। আর এদেশীয় সমাজতন্ত্রের এঁরাই ব্যাখ্যাতা।

বলা বাহুল্য, এপথ জাতীয় উন্নতির পথ নয়। বণিকের কিছু সদ্‌গুণ বাবুমধ্যবিত্ত প্রাপ্ত হলে ভালো হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গান্ধীর ভিতর বণিকের গুণের অভাব ছিল না এবং একথা তিনি নিজে প্রকাশ্যেই বলতেন। তিনি অবশ্য ঐ বস্তুটিকে একটা আদর্শের স্পর্শে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। হিসেবের কাজ ও খরচ সম্বন্ধে মনোযোগ জমিদারী মেজাজে ছোট কাজ ; কিন্তু গান্ধী এটাকে ছোটো কাজ মনে করতেন না। বিশেষত জনসাধারণের অর্থে পুষ্ট প্রতিষ্ঠানে এর অবহেলাকে তিনি অমার্জনীয় অপরাধ মনে করতেন। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো মৌল বিরোধ তো নেই-ই, বরং সমাজতান্ত্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠানেব সাফল্য এছাড়া আশা করা যায় না। বণিকের গুণ যথেষ্ট নয়, একথা অনস্বীকার্য ; তবে তার প্রয়োজন ফুরোয়নি। বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে তবেই তাকে আজ স্থাপন করতে হবে।

সেই বৃহত্তর আদর্শের মূল কথাটি সরল।

শ্রম ও বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ ভবিষ্যৎকে জয় করে। এরই সঙ্গে মানবতাবাদ এবং সাম্য অথবা ভ্রাতৃত্বকে যুক্ত করে পাওয়া যাবে এ যুগের আদর্শ। শ্রমেই ভ্রাতৃত্বের প্রকাশ, কারণ শ্রমের ভিতর দিয়ে মানুষ মানুষের সঙ্গে গড়বার কাজে যুক্ত হয়। শ্রমকে আরও ফলবান করে তুলবার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজন। শ্রম ও বিজ্ঞান ছাড়া আজ কোনো সদর্থক দেশপ্রেম নেই। একে যুগের উপযোগী বিন্যাসে স্থাপন করবার মতো নেতৃত্ব চাই, প্রতিষ্ঠান চাই। যৌথ পরিবারের ভিতর উদ্যোগহীন পরাশ্রিত আত্মীয়ের সম্পর্ককে আত্মীয়তার আদর্শ বলা চলে না। সমাজতন্ত্রের নামে আমরা যদি সমাজের আশ্রিত হবার

অধিকারই শুধু দাবী করি তবে দেশের সামগ্রিক সিদ্ধিও সেই অনুযায়ী হবে।

যুগ যুগ ধরে কোনো প্রকারে টিকে থাকাটাই যথেষ্ট নয়। যে-মমতা ইচ্ছাশক্তি হয়ে নিজেকে ও অপরকে শ্রম ও বিজ্ঞানের পথে চালিত করে, তাকে ছাড়া সুখ কদাচিৎ সম্ভব, কিন্তু দেশের সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। অতএব এদেশে নতুন ঐতিহ্য প্রয়োজন। আমাদের মধ্যবিত্তের উদ্‌বৃত্ত প্রাণশক্তি যদি ছোটোবড় রাজনীতি অর্থাৎ ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে নিঃশেষিত হয়, যদি এরই পাশে পাশে নতুন ঐতিহ্য গড়বার মতো লোক যথেষ্ট সংখ্যায় খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে বলতে হবে যে, মানুষ যে শক্তিতে নতুন ইতিহাস রচনা করে আমাদের ভিতর তার অভাব আছে।

দুর্নীতি

(ক)

দুর্নীতির অর্থ নিয়ে একটা বিবাদ আছে। সেটা প্রথমেই পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। বাড়ির মতের বিরুদ্ধে মেয়ে বিয়ে করে বসল ভিন্ন জাতের এক ছেলেকে। এটাকে অভিভাবকেরা অনেক সময় দুর্নীতির ভিতর ধরেন। আসলে এটা দেশীয় আচারের প্রশ্ন। নীতিবিচারকে নিছক দেশাচার থেকে পৃথক করে দেখা আবশ্যক, যদিও সেটা সহজ নয় সব সময়ে।

ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রামমোহন রায় এটা লক্ষ করেছিলেন। শুদ্ধ নীতি আর আচার এক বস্তু নয়। বিভিন্ন ধর্মের ভিতর যেখানে মিল সেখানে পাই শুদ্ধ নীতি। এইরকম তাঁর মনে হয়েছিল। আর বিভিন্ন ধর্মের ভিতর অমিল দেখা যায় আচার নিয়ে। বিবাহের ব্যাপারটা আচারের প্রশ্ন, দেশে দেশে লক্ষ করা যাবে প্রচলিত রীতির ভিন্নতা। সত্যবাদিতা নীতির প্রশ্ন। মিথ্যে বলে স্বার্থসিদ্ধি করা দুর্নীতি, কোনো ধর্মেই এর সমর্থন নেই।

আচার জিনিসটা বাইরের, তার পরিবর্তন ঘটে সমস্ত সজীব সমাজে। কিন্তু নীতির মূল কথা আরও গভীর। আরও চিরন্তন। কথাটা এবার বলা যাক এইভাবে। আমরা প্রত্যেকেই নানাভাবে সমাজের কাছে ঋণী। আমরা যে অন্ন গ্রহণ করি, বস্ত্র পরিধান করি, নিত্য প্রয়োজনের আরও নানা সমগ্রী ব্যবহার করি, তার কতটুকু নিজে উৎপন্ন করি? যে ভাষা, যে সাংস্কৃতিক উপাদান দিয়ে ব্যক্তি তার জীবন গড়ে তোলে, সে সবই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর কাছ থেকে লব্ধ। এই ঋণ শোধ করবার চেষ্টা অথবা আগ্রহ যার ভিতর নেই সে পরশ্রমজীবী। পরজীবিতাই দুর্নীতি। সমাজের ঋণ কখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় না। কিন্তু ঋণশোধের যথাসাধ্য চেষ্টার ভিতরই নীতির পরিচয়। এর অভাবকে বলি দুর্নীতি।

এদেশে দুর্নীতি আছে অনেকদিন থেকেই। তবে গত কয়েক বছরে এর প্রচণ্ডতা বেড়ে গেছে। চারিদিকেই এর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলের কাছেই এটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। ১৯৮৩ সালে আমাকে একবার সুইডেন যেতে হয়েছিল, উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুন্নার মিরডালকে

দেশিকোত্তম উপাধি অর্পণ করা। অতিবৃদ্ধ তিনি, কষ্টে চলাফেরা করেন, তাঁর পক্ষে তখন এদেশে আসা সম্ভব নয়। তবে ভারতে তিনি পূর্বে এসেছেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উভয়েরই ছিল নেহরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। মিরডাল ভারতবন্ধু, তাঁর লেখার সঙ্গে এদেশে অনেকেই পরিচিত। কথাবার্তায় পরিষ্কার বোঝা গেল, ভারত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ তখনও গভীর। অসুস্থ অবস্থাতে তিনি ঐ দূরের দেশে বসেও এদেশ সম্বন্ধে খোঁজখবর রেখেই চলেছেন। তাঁর নানা কথার ভিতর একটি কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। ভারতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ছে, তাকে রোধ করবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। এটা বড় বিপদের কথা, আমরা কেন সাবধান হচ্ছি না ?

অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে তিনি আমাকে জানালেন তাঁর এই দুশ্চিন্তা। আজ সদ্যপ্রয়াত ঐ ভারতবন্ধুর সাবধানী বাণী কানে বাজে।

অভ্যস্ত দুর্নীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে একরকমের আচার, তাকে বলে ভ্রষ্টাচার। ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তাকে সরানো যায়নি। দুর্নীতি রোগটি অবশ্য ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। ওটা আজ নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি সাম্যবাদী দেশগুলিতেও। তবে আমাদের চিন্তা স্বভাবতই এদেশকে নিয়ে। রোগটি দুরারোগ্য, এর কারণ জানা থাকলেও প্রতিকার সহজ নয়। তবু চিকিৎসার আগে রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। অনুসন্ধান শুরু হয় রোগের লক্ষণ থেকে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে।

দুর্নীতির নানা রূপ আছে। তার কিছু বা চমকপ্রদ, আবার কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে বলেই তাতে চমক নেই। আইনের সঙ্গে দুর্নীতির সম্পর্কটা খুব সরল নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুয়ের ভিতর বিরোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। কোথাও আবার আইনের চতুঃসীমার ভিতরই অথবা তার প্রত্যন্তে দুর্নীতির বাস। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

একটি রুগ্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হচ্ছিল। তিনি কাজে যোগ দিয়েছেন বেশিদিন হয়নি। ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসেবপত্র ঠিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়নি অনেকদিন। নতুন পরিচালক প্রতিষ্ঠানটিকে ভিতর থেকে বুঝে নেবার জন্য নিজেই হিসেবের খাতা খানিকটা নেড়েচেড়ে দেখতে চাইলেন। তাই করতে গিয়ে কিছু আশ্চর্য ব্যাপার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। ক্রয়বিক্রয়ের অনেকটাই ভুতুড়ে কাণ্ড। লক্ষাধিক টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে এমন এক যন্ত্র কিনবার নামে যেটা কখনও এসে পৌঁছয়নি। রুগ্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন মাল ক্রমাগত বিক্রয় করা হচ্ছে এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে, সেখানকার ক্রেতা দাম চুকিয়ে দিচ্ছেন অবিলম্বে একের পর এক চেকে, আর সেই সব চেক ব্যাঙ্ক থেকে অবিলম্বে ফিরে আসছে, কারণ ক্রেতার নামে ব্যাঙ্কে টাকা নেই। ফেরত আসা চেক ড্রয়ারে জমছে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তার অতি নিকট-আত্মীয় ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের মালিক।

এর পর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস কেনা হয়েছে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে অনেক উঁচু দামে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পরও কিছু করা যাচ্ছে না কারণ বাড়তি টাকাটা ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেছে অনেক লোকের ভিতর, তাছাড়া কিছু রাজনীতিক জটিলতাও আছে।

দুর্নীতির আরও একটি নমুনা দিচ্ছি, এবার একটি হাসপাতাল থেকে। সেখানকার এক ডাক্তারের মুখে এইরকম শুনেছি। রোগী ভর্তি হচ্ছেন অস্ত্রোপচারের জন্য। কাউকে বেশিদিন ফেলে রাখা হচ্ছে, কেউ বা যত্ন পাচ্ছেন অবিলম্বে। এটা নির্ভর করছে না

রোগীর প্রয়োজনের ওপর, কে আগে ভর্তি হয়েছেন, কে পরে, তার ওপরও নয়। নির্ভর করছে ঘুষের ওপর। সেই ঘুষ দেওয়া হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর কিছু কর্মীকে। তারপর সেটা আরও উপরের স্তরের লোকের সঙ্গে ভাগ হচ্ছে কি না জানি না। তবে এটা ঠিক, অধস্তন কর্মীদের সংঘবদ্ধ শক্তিকে ঊর্ধ্বতন পরিচালকেরাও ভয়ের চোখে দেখেন। একবার এই ঘুষের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল যখন কোনো একজন রোগী টাকা দিয়েও কোনো কারণে প্রতিশ্রুত সেবা পেলেন না। কাকে তিনি টাকা দিয়েছেন সেই কথাটাও যখন তিনি জানিয়ে দিলেন তখন ঠিক হল যে একটা তদন্ত হবে। তারপরই এমন কিছু ঘটে গেল যার ফলে সেই রোগী তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়াই সমীচীন বিবেচনা করলেন। কী ঘটেছিল সেটা অনুমানের ওপরই ছেড়ে দিতে হয়।

এইরকম নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। আরও বহু দুর্নীতি কিন্তু আছে যাতে নাটকীয়তা নেই, আমাদের অভ্যস্ত কর্মজীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে যারা। এরা নিঃশব্দে চলে, কিন্তু সমাজের পক্ষে এদের ক্ষতিকরতা কম নয়। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে এরা পঙ্গু এবং অবসন্ন করে দেয়। কর্মের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আগ্রহকে এই দুর্লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিনিয়ত বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করে, ব্যক্তির পৌরুষ খর্ব হয়, দেশ পিছিয়ে যায়।

কিছুকাল আগের কথা। আমার এক বন্ধুর ছেলে ব্যাঙ্কে কাজ নিয়েছে। তার কর্মজীবনের সেটা শুরু। স্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে সে কাজ করে যাচ্ছে। কর্মচারী সমিতির এক নেতা একদিন তাকে ডেকে কৈফিয়ৎ চাইলেন, এত বেশি কাজ সে করছে কেন ? আমার বন্ধুর ছেলে সরলভাবে বলল, সে তো নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কিছু করছে না, ঐ সময়ের ভিতর সহজেই যতটা কাজ করা যায় ততটাই করছে। তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, এটা সমিতির নিয়মবিরুদ্ধ। কাজ জমতে দিতে হবে।

কাজ জমিয়ে রাখার রীতিটা ইচ্ছাকৃত। এটা চালু হয়েছে নানা কারণে। সারা সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে, সব কাজ এতে পিছিয়ে যায়। অনির্দিষ্ট অনিশ্চিত প্রতীক্ষার দণ্ড দিতে হয় দেশকে। পারি কিন্তু করব না, এই কৌশলে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের চিন্তা বইছে অন্য এক খাতে। কাজ জমে উঠলে বাড়তি আয়ের পথ খুলে যায় অনেকভাবে। যাঁদের কাজ আটকে আছে তাঁরা যদি পারেন তো বাড়তি পয়সা দিয়ে কাজটা করিয়ে নিন। কাজের যে সময়টা একবার বিক্রী হয়ে গেছে মাইনের বদলে সেটাই বে-আইনীভাবে আবার বিক্রী করা যাচ্ছে ঘুষের বদলে।

একই ব্যাপার তাহলে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব। আমার বন্ধুর ছেলে হয়তো ভাবছিল, যেদেশে বহু ছেলের চাকরি নেই সেখানে সে কাজ পেয়েছে, সমাজের কাছে সে ঋণী ; যথাসম্ভব কাজ করে সেই ঋণ সে শোধ করবে। অন্য দৃষ্টিতে দেখলে কিন্তু চিন্তার চরিত্রটা পালটে যায়। সমাজকে আমি যথাসাধ্য দিচ্ছি কিনা, এটা আর তখন প্রধান প্রশ্ন নয়। সমাজের কাছ থেকে যে কোনো উপায়ে কী করে আরও আদায় করে নেওয়া যায়, এটাই প্রধান কথা। সমাজের সেবার চেয়ে স্বার্থচিন্তা তখন বড় হয়ে দেখা দেয়, দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সেই পথ যাঁরা ধরেছেন তাঁরা আত্মসমর্থনে বললেন, আগে তো খেয়েপরে বাঁচি, তারপর সমাজের কথা ভাবা যাবে। বাস্তব অবস্থাটা কিন্তু এই : বিবেকানন্দ যাদের বলেছিলেন দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, তাদের সামনে দুর্নীতির পথে অর্থলাভের পথ উন্মুক্ত নেই। ঐ পথে যাঁরা আজ স্বার্থসিদ্ধি করছেন তাঁরা দরিদ্রতমদের মধ্যে পড়েন না।

দেশের দীনতমদের সঙ্গে যখন আমরা নিজেদের তুলনা করি তখন নিজেকে অভাবগ্রস্ত মনে করা কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের তুলনাটা দেশের সেই অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে নয়। নিজেকে আমরা তুলনা করি সেইসব প্রতিবেশীর সঙ্গে যাঁরা কোনো না কোনোভাবে আমাদের চেয়ে আরও একটু ভাল আছেন। আমাদের অভাববোধের পিছনে আছে প্রতিবেশীর সঙ্গে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভোগবাদী এক সমাজে আমরা বাস করছি। প্রতিবেশীর ঘরে যে ভোগের নতুন সামগ্রীটি আছে তাই দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে আমারও অভাববোধ। সেটি আমার ঘরে না আসা পর্যন্ত আমার মনে সুখ নেই, মানসম্মান বাঁচে না। পাশের বাড়ির অপব্যয়ও মনে হয় অনুকরণের যোগ্য, যেমন বিয়ের বেলায়। সামন্ততান্ত্রিক মর্যাদাবোধের সঙ্গে যোগ হয়েছে কালোবাজারি বুদ্ধি। ধার করে আমরা মানসম্মান বাঁচাই। তারপর ধার শোধবার জন্য প্রয়োজন হয় দুর্নীতির। একেই আমরা বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে সমার্থক করে জেনেছি। অথচ এই পথে প্রতিটি সাফল্য নিতান্ত সাময়িক। প্রতিটি জয়ের পিছনে উঁকিঝুঁকি মারে আর কারও পরাজয়।

এক অবাস্তব সুখকে আমরা সুখ বলে জেনেছি। আর তারই পিছনে ছুটছি নেশাগ্রস্তের মত। পশ্চিমী দেশে কোনো এক যুগে আশা করা হয়েছিল, এই সুখের অন্বেষণেই মানুষ পরিশ্রমী এবং উন্নতিশীল হয়ে উঠবে। পরিশ্রম করে আরও কিছু গড়া, আরও উপার্জন করা, জীবনের মানবৃদ্ধির এটাই রাজপথ। এদেশে দেখছি, উপার্জনের অন্য এক গুপ্ত পথ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তার নাম দুর্নীতি। দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এর মারাত্মক আকর্ষণ।

ঋণ শোধ না করেই যত খুশি, যতদিন খুশি, ধার করা যেতে পারে সমাজের ভাণ্ডার থেকে, এ এক আত্মঘাতী চিন্তা। আমরা কী সৃষ্টি করছি, কতটা করছি, তারই ওপর নির্ভর করে পরস্পর নির্ভরশীল যৌথ জীবনের সমৃদ্ধি। সেবা নয়, সৃষ্টি নয়, শুধু পাওয়া অথবা পাইয়ে দেওয়াই যখন প্রধান হয়ে ওঠে বিভিন্ন দলে এবং প্রতিষ্ঠানে, তখন এটাই জানতে হবে যে, বৃদ্ধির পথে নয় বরং সমাজকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ক্ষয়ের দিকে। পাইয়ে দিতে দিতেই আমরা সবাইকে নিয়ে অধঃপাতে যাই। দুর্নীতির এই এক আশ্চর্য লক্ষণ।

(খ)

সুনীতির কিছু মৌল ধারণা ঐতিহ্যের সূত্রে আমাদের মনে স্থান পেয়ে এসেছে। সেইসব ধারণার প্রধান আশ্রয় পরিবার। মানুষে মানুষে সমবেদনার প্রাথমিক ভিত্তি পরিবারে। এখানেই সেবা অথবা ত্যাগের মূল্য সহজে স্বীকৃত। বড়দের কর্তব্য ছোট ভাইবোনকে সাহায্য করা, একথা তর্ক করে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। যৌথ পরিবারেও মানুষ কিছুই না দিয়ে কিছু পাবার চেষ্টা করে বটে। তবু সেটা যে স্বার্থপরতা, কোনো সুস্থ পরিবারের ভিত্তি যে সেটা হতে পারে না, একথা মানুষ সহজ বুদ্ধিতে বোঝে। সামাজিক নীতির ভিত্তিতে পরিবারের একটা বড় স্থান আছে বহুকাল থেকে।

এই পারিবারিক নীতিবোধকে বৃহত্তর সমাজের এবং প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেটা সহজ হয়নি। অসুবিধা দেখা দিয়েছে একাধিক।

পারিবারিক কর্তব্য আর জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এক বস্তু নয়। পারিবারিক আনুগত্যের অভ্যাস অনুযায়ী যদি কেউ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে চলতে শুরু করেন তবে পরিণতিতে দেখা দেয় স্বজনপোষণ। বৃহত্তর সমাজে আবশ্যক আত্মীয়তার অতিরিক্ত এমন এক নৈর্ব্যক্তিক বিচার যেটা পরিবারের ভিতর সচরাচর গঠিত হয় না।

আরও কিছু গুণ আছে, জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে যার বিশেষ প্রয়োজন। যেমন সময়নিষ্ঠা। এর অভাবে আধুনিক জগতে কার্যদক্ষতা কমে যায়। কিন্তু আত্মীয়বন্ধুদের ভিতর এই গুণটির তেমন চর্চা দেখা যায় না। এইরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। সমাজের অভিব্যক্তির ইতিহাসে কিছু মৌল নীতির আদি নিবাস পরিবার। কিন্তু আধুনিক জগতে এমন কিছু গুণেরও প্রয়োজন ঘটে যা পারিবারিক অভ্যাসের অতিরিক্ত।

অতএব সমস্যা দেখা দিয়েছে দু'দিক থেকেই। পরিবারে আশ্রিত সদ্‌গুণ বাইরের প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত করা সম্ভব হয়নি। পারিবারিক বন্ধনও ইতিমধ্যে জীর্ণ ও দুর্বল হয়ে এসেছে। আবার নতুন যেসব গুণের প্রয়োজন আধুনিক জগতে, সেসবও আমাদের ভিতর বর্তায়নি। স্বীকার করা আবশ্যক, কোনো দেশেই এসব সহজে আয়ত্ত হয়নি। শিক্ষা, প্রচার ও দণ্ডনীতির সাহায্যে নতুন নীতিবোধ কোনো কোনো দেশে অল্প বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদেশে তার বনিয়াদ কখনও দৃঢ় হয়নি। আমরা স্বজনপোষণে অভ্যস্ত। এখন যোগ হয়েছে দলীয়তা। সেখানেও স্বার্থ এবং স্বজনপোষণ ফিরে এসেছে ভিন্ন রূপে।

প্রতিদিনের জীবনে সততা, সময়নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার অভাবে সমাজের যতখানি ক্ষতি হয় কয়েকটি বড় বড় নাটকীয় দুর্নীতির ঘটনায় সম্ভবত ততখানি হয় না। এইসব গুণ আমাদের সমাজে এককালে যতটুকু দেখা গিয়েছিল বিগত কয়েক দশকে তাও অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। তার কিছু কারণ আছে। দুটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম কারণ মুদ্রাস্ফীতি। বেশ কিছুকাল যাবৎ দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলেছে। বিশেষত সালের পর দেশে দেশে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুততালে, ভারতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মূল্যস্ফীতির ফলে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানের ওপর ক্রমাগত টান পড়ছে। যে কোন উপায়ে সেটাকে আমরা রুখবার চেষ্টা করছি। সদুপায় আর অসদুপায়ের ভিতর পার্থক্য করবার ধৈর্য এই অবস্থায় দুর্বল হয়ে গেছে। মুদ্রাস্ফীতি নিঃসন্দেহে দুর্নীতির এক সহায়ক শক্তি।

মুদ্রাস্ফীতির এক কুফল এই যে, আয়ের বন্টনে অসাম্য এতে বেড়ে যায়। আমাদের চোখের সামনেই নতুন ধনী শ্রেণী ফেঁপে উঠেছে। যাঁরা চাকুরীজীবী, যাঁদের আয় নির্দিষ্ট, তাঁরা ফাঁপরে পড়েছেন। একদিকে আধুনিক জগতের নানা নতুন উপকরণে তাঁরা প্রলুব্ধ ; অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির ফলে অভ্যস্ত জীবনযাত্রা রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে সহজ থাকছে না। বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন চলছে সংঘবদ্ধ সমিতির ভিতর দিয়ে। কিন্তু সেটা যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা আছে অন্য নানা পথে। অফিসে হাতের কাজ ফেলে রাখাটা আয়বৃদ্ধির চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। কিছু কিছু দুর্নীতি এসে যায় এরই সঙ্গে। আরও তলে, দেশের যে স্তরে আয়বৃদ্ধির এইসব কোনো পথই খোলা নেই, মুদ্রাস্ফীতির আক্রোশটা সেইখানে আছড়ে পড়ছে সবচেয়ে নির্দয়ভাবে। এই আমাদের গত কয়েক বছরের পরিচিত দৃশ্যপট।

দুর্নীতির পক্ষে কাজ করছে গত কয়েক দশকে আরও একটি পরিস্থিতি।

এদেশে আমরা গ্রহণ করেছি মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতি। এর পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। সেইসব যুক্তির ভিতর সবিস্তারে যাওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন। আপাতত আমাদের আলোচ্য বস্তু দুর্নীতি।

সরকারি, বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগে এদেশে মূলধন বিনিয়োগ এবং অন্যান্য আর্থিক

ক্রিয়াকর্ম চলে। উৎপাদন যাতে বেসরকারি উদ্যোগেও যথাসম্ভব জাতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে সেজন্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেন। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়ন্ত্রণ আছে। আর্থিক নানা ক্রিয়াকর্মের জন্য সরকারি অনুজ্ঞাপত্র এবং ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। এসবের ভিতর দিয়ে বেসরকারি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, রাজনীতিক দল আর আমলাতন্ত্র এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। নিয়মের নামে যেমন কাজে অনেক বাধা সৃষ্টি করা যায় তেমনি তদবির ও অবৈধ অনুতোষণের সাহায্যে বাধা দূর করাও যায়। ইংরেজিতে লাইসেন্স শব্দটির দুটো অর্থ আছে। প্রথমটি আইনসিদ্ধ, দ্বিতীয়টি আইনবিরুদ্ধ। এদেশে গত কয়েক দশকে যে-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে অনেকে নাম দিয়েছেন লাইসেন্সরাজ। অনেক জটিল নিয়মকানুন এখানে দুর্নীতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে। নিয়ন্ত্রণ ও দুর্নীতি দুইই ক্রমে ব্যাপক ও অর্থক্ষয়ী হয়ে উঠেছে। নিয়মকানুন দরকার। বাধানিষেধের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নিয়ম যদি শুধু নিয়মভঙ্গের সুযোগ সৃষ্টি করে তবে সেটা বিপদের কথা।

যে পরিস্থিতিতে এদেশে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া গেল। তবে দুর্নীতির কারণ জানা গেলেও তার প্রতিকার করা সহজ নয়। জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্দোলন শুরু করেছিলেন ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, জরুরী অবস্থা অথবা এমার্জেন্সি প্রয়োজন হয়েছিল দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য। দুর্নীতি কিন্তু কমেনি। এটা এমনি এক সমস্যা যার সমাধান কঠিন, কিন্তু যেটাকে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়।

আমরা যদিও সমাজতন্ত্রের কথা বলি, সাম্যবাদের নাম উচ্চারণ করি, তবু সমাজতন্ত্রের জন্য যে নীতিবোধ প্রয়োজন এদেশে তার অভাব ভয়ঙ্করভাবে চোখে পড়ে। জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য কাউকেই বড় আগ্রহী দেখা যায় না। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করবার ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকে সাবধানী। সরকারী পয়সার ব্যাপারে তার বিপরীতটাই লক্ষ করা যায়। সেখানে কেউ সতর্ক হতে গেলে তাঁকে তিরস্কার করা হয়, এমনকি তিনি হয়ে ওঠেন বিদ্রূপের পাত্র। সরকারি গাড়ির ব্যবহার এরই একটা সহজ উদাহরণ। সমাজতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার কথা, তা নইলে তাঁদের বিশ্বাস সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

দুর্নীতির প্রতিকারের জন্য যদি কিছু করা যায় তবে সরকার এবং জনসাধারণের মিলিত চেষ্টাতেই সেটা সম্ভব। উপায় নিয়ে কয়েকটি মূল কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

কারণ থেকেই প্রতিকারের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে যায়।

মূল্যস্ফীতি যদি দুর্নীতির অন্যতম কারণ হয় তবে দ্রব্যমূল্যের অতিবৃদ্ধি বন্ধ না করা পর্যন্ত দুর্নীতি রোধ করা যাবে বলে মনে হয় না। বহির্বিশ্বের বাজারে যখন অস্থিরতা দেখা দেয় তখন ভারতের বাজারে স্থিরতা রক্ষা করা অবশ্য কঠিন। তবু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যে কী করে সুস্থিতি আনা যায় সরকারকে সেকথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

লাইসেন্সরাজের কথা আগেই বলেছি। সরকারি নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। কিন্তু আর্থিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে এই নিয়ন্ত্রণেরও প্রকারভেদ ঘটে। খাদ্যশস্যের ব্যাপারে ভারত আজ মোটামুটি স্বয়ম্ভর। ভারি শিল্পেরও অনেকটা বিকাশ ঘটেছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের ধরন এখন বদলানো সম্ভব। নিয়মকানুন কিছুটা সরল করে আনা যায়। সেইসব নিয়মই রাখা ভাল যেসব নিয়ম বলবৎ করা যাবে। এ কাজটা ভেবেচিন্তে শক্ত হাতে করতে হবে। অর্থাৎ, একদিকে দরকার অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ বাতিল করা, অহেতুক জটিলতা দূরে

সরিয়ে দেওয়া। এসব জটিলতা থেকে কতিপয় আইনজীবী আর কালোবাজারী ছাড়া আর কারো লাভ হয় না। অন্যদিকে চাই প্রশাসনিক দৃঢ়তা। আমাদের মত দেশে প্রশাসনে দৃঢ়তার অভাব নিয়ে মিরডালের সমালোচনা প্রসিদ্ধ, 'এশিয়ান ড্রামা' গ্রন্থে। সবাই স্বীকার করবেন, নিয়ম রেখে নিয়ম ভঙ্গ করতে দিলে দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এতে সমাজের ক্ষতি, অর্থনীতিরও।

অতিকেন্দ্রিকতা আমাদের শাসনযন্ত্রের অন্য এক দোষ। অতিকেন্দ্রিক শাসনযন্ত্রের ডালপালায় দুর্নীতির ফল ফলে। বিকেন্দ্রীকরণে সমস্যা নেই এমন নয়। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে যখন ক্ষমতা আসে তখনও দেখা দেয় অন্য এক ধরনের দুর্বলতা এবং অনাচার। তবু বিকেন্দ্রীকরণের পথেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। যাদের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, অর্থের ব্যবহারের উপর তাদের কর্তৃত্ব যাতে বাড়ে সেই চেষ্টা করা দরকার। এতে ভুলভ্রান্তি হবে। আশা রাখতে হবে, এই ভ্রান্তি থেকেও জনসাধারণ শিক্ষা লাভ করবে। এটাই গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস।

যে পারিবারিক মূল্যবোধের কথা শুরুতেই বলেছি সেটা স্বাভাবিকভাবে অর্থবহ হয় গ্রামীণ সমাজে। দুর্নীতির শক্তি অবশ্য সেখানেও উপস্থিত। তাছাড়া দলীয় দ্বন্দ্বকলহ সব গঠনমূলক কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলীয় জুলুমের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা আবশ্যক। গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের সঙ্গে নীতিবোধকে কী করে মেলানো যায় সেই পথই খুঁজে নিতে হবে। আগামী পর্যায়ে এটাই দেশের সামনে একটা প্রধান কাজ।

দুর্নীতি রোধের জন্য কিছু আর্থিক ও প্রশাসনিক পূর্বশর্ত নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। দ্রব্যমূল্যের সুস্থিতি, সরকারি নিয়ন্ত্রণের জটিলতা হ্রাস, প্রশাসনিক দৃঢ়তা, এই সবই স্বীকার্য পূর্বশর্ত। আরও আবশ্যক বিকেন্দ্রীকরণ, কর্মসংস্থান, শিক্ষার সংস্কার। এর পরও কিন্তু চাই নীতি নিয়ে চেতনা। নীতিশিক্ষা নামে যে জিনিসটা প্রচলিত তাতে খুব বেশি কাজ হয় না। তবু আবশ্যক কিছু মূল্যবোধ, মৌলনীতির সপক্ষে জনমত গঠন। চীনে ও সোভিয়েত দেশেও আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে, নীতিবোধের কথা নতুন করে বলা হচ্ছে। সাংগঠনিক পূর্বশর্তই যথেষ্ট নয়। নতুন চেতনা ছাড়া নতুন সমাজ গড়া যায় না।

এ কাজ কিন্তু হবার নয় শুধু সরকারি প্রচেষ্টায়। এদেশে নতুন চেতনার স্রষ্টা হবে না দলীয় রাজনীতি। গত চার দশকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে নবচেতনার পদধ্বনি শোনা গেছে যেসব আন্দোলনে তার কোনোটিতেই নেতৃত্ব আসেনি প্রতিষ্ঠিত সরকার অথবা সংগঠিত রাজনীতিক দলের কাছ থেকে। পুরনো প্রতিষ্ঠানের বাইরে গড়ে ওঠে নতুন চিন্তা। বাঁধা বুলি আর অভ্যস্ত আওয়াজ নিয়ে চলে দল। নতুন ভাষা চাই। হিংসার ভাষা নয়। হিংসায় পুরনো শত্রুকে বধ করে আমরা জন্ম দিই নতুন শত্রুর। অতএব চাই সততার ভাষা। মানুষের মনকে বন্ধনমুক্ত করবার ভাষা।

প্রতিবেশী দেশগুলিতে একে একে গণতন্ত্র ভেঙে পড়েছে। দুর্নীতি রোধ করা না গেলে হয়তো ভেঙে পড়বে এদেশেও। তাতেও সমস্যার সমাধান হবে না। সামরিক শাসনে সঙ্কট মোচন হবে না। প্রতিবেশী দেশগুলিতে হয়নি। সঙ্কট অতিক্রম করবার জন্য চাই প্রশাসনিক পুনর্গঠন, শিক্ষার সংস্কার, নতুন নীতিবোধ আর সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের সমবায়ী চেষ্টা। মহান পিতামহেরা বিদায় নিয়েছেন। আমাদের সকলেরই কিছু দায়িত্ব আছে।

১। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ন লিখেছেন :

"It is a common error to regard the Eighteenth Century in England as irreligious. An ethical code based on Christian doctrine was a rule of life to a much larger proportion of the community than it had been in the late medieval and Tudor periods...English Eighteenth Century religion was of two schools, which we may call for brevity, the latitudinarian and the Methodist. The latitudinarian stood for the spirit of tolerance...Methodism...was a way of life devoted not only to religious observance but to self-discipline and work for others. The coincidence in time of Wesley and the Industrial revolution had profound effects upon England for generations to come" (English Social History, তৃতীয় সংস্করণ : পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৬২)

২। অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষ "দেশ"-এর পাতায় (৩০ ফাল্গুন, ১৩৭৬) রাসেলের এই উক্তিটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৩। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন :

"During the years 1757-85 the principal businessmen in Calcutta were mostly higher caste Hindus...This class of people disappeared from business by the beginning of the nineteenth century. Once again Indian business—whatever it was—fell into the hands of those who belonged to the trader caste." (Studies in the Bengal Ranaissance, ed. Atul Chandra Gupta, National Council of Education, Jadavpur, Calcutta, 1958, p. 7)

৪। দ্রষ্টব্য Anil Seal, *The Emergence of Indian Nationalism,* Cambridge University Press, Paperback edition, 1971, pp. 59, 61.

৫। এ যুগের ব্যঙ্গসাহিত্যে আক্রমণ চলেছে সমানভাবে প্রাচীন পন্থীদের কাপট্য ও নব্য সংস্কৃতির আতিশয্যের বিরুদ্ধে। দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" (১৮৬৬) নাটকে প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজী শিক্ষিতদের সংস্কারমুক্তির বিষয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ। "নিম (চাঁদ)। ...আমি জানি হিন্দুরা যেমন প্রেজুডিসবশতঃ মদ খায় না তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিসবশতঃ ঘুস খায় না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস গিয়েছে, কেবল অর্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না।"...কলকাতার ভোগবাদী নাগরিকজীবনের বিরুদ্ধে নিদারুণ শ্লেষ নিয়ে রচিত হয়েছে 'বাঙ্গাল' রামমাণিক্যের করুণ একটি কাতরোক্তি, "রাম। ...বাঙ্গাল কউশ ক্যান—এতো অকাদ্য কাইচি তবু কলকত্তার মত হবাব পারচি না ? কলকত্তার মত না করচি কি ? মাগীবারী গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, গোরার বারীর বিস্‌কোট বক্কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি—এতো কর্যাও কলকাত্তার মত হবার পারলাম না...(মাতাল হইয়া পপাত ধরণী তলে)।" কারো কারো মতে নিমচাঁদের চরিত্রের ভিতর দিয়ে মধুসূদন দত্তকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে ; তবে এ বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রের উক্তি, মধু কি নিম হতে পারে !

মধুসূদন মূলত মানবতাবাদী, নগরসংস্কৃতি ও বুদ্ধিমুক্তির সপক্ষে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) প্রহসনের প্রধান চরিত্র, ভক্তপ্রসাদ, বৃদ্ধ ও কামাতুর অথচ বাহ্য দৃষ্টিতে অতি ধার্মিক। ভক্তপ্রসাদ ও আনন্দের ভিতর মহানগরীতে পাঠরত যুবক অম্বিকা সম্বন্ধে একটি কথোপকথন এই রকম :

"ভক্ত। ...অম্বিকা তো কোনো অধর্মাচরণ শিখছে না।

আন। আজ্ঞে, অধর্মাচরণ কি ?

ভক্ত। এই দেবব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বলতে পারিনা।

ভক্ত। ...আমি শুনেছি যে কলকেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ,

কৈবর্ত, সোনার বেনে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়াও করে ? বাপু, এ সকল কি সত্য ?
আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যা তাও নয়।"

৬। এই প্রসঙ্গে আরও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : David Kopf, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind,* Princeton University Press, 1979.

৪
শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষকতা আমার পেশা ; আমি শিক্ষক সম্প্রদায়ের একজন। অপরের সমালোচনায় ভদ্রতার প্রশ্ন থাকে ; আত্ম-সমালোচনায় সে প্রশ্ন অবান্তর। তা ছাড়া, শিক্ষার সমস্যা আজ এতোই গুরুতর, শিক্ষার পুনর্গঠনের প্রয়োজন এতোই জরুরী যে, বলবার কথাটা একটু জোর দিয়ে বলাই ভালো।

গত কয়েক বছর যাবত পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রদের হৈ-চৈ-টা বেড়ে চলেছে। প্রশ্ন কঠিন বা প্রত্যাশিতের বাইরে বলে ছাত্রেরা বেরিয়ে চলে আসছে। কয়েকজন ছাত্র, যারা পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক, অপর ছাত্রদের জোর করে পরীক্ষা-কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে আসছে। আইনভঙ্গকারীদের আঘাতে কখনও আসবাবপত্র ভাঙছে, কখনও নির্দোষ লোক জখম হচ্ছে। পরীক্ষা হলে নকল তো এখন নিত্য-নৈমিত্তিক। কি করে এ-জিনিসটা বন্ধ করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এটাই আজ একটা প্রধান চিন্তার ব্যাপার হয়ে উঠছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে যে-ব্যাপারটা ঘটছে, সেটা নিন্দনীয় সন্দেহ নেই ; এ বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু আজকের প্রবন্ধে সেটা আমার প্রধান বলবার কথা নয়। পরীক্ষার প্রতিটি কেন্দ্রে যদি আজ কোনো যাদুবলে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই তা হলে নিশ্চিন্ত হতেন। অথচ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে এমন সামঞ্জস্যবিহীন, ছাত্রদের মনে জ্ঞানস্পৃহা জাগাবার পক্ষে এটা এতোই অনুপযোগী যে এর পরিবর্তন যতদিন না হচ্ছে ততদিন শুধু পরীক্ষাকক্ষে শন্তি রক্ষা করেই যিনি নিশ্চিন্ত বোধ করেন শিক্ষার প্রকৃত সমস্যাটা তাঁর চেতনায় প্রবেশ করেনি বলেই আমার ধারণা।

এই বৃহৎ সমস্যার একটি অংশ মাত্র নিয়ে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব। শিক্ষার ব্যাপারে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ ; আমার বক্তব্যও প্রধানত উচ্চশিক্ষার দুয়েকটি সমস্যাতেই আবদ্ধ রাখব। কিন্তু তার আগে বলে নিতে চাই যে, প্রাথমিক শিক্ষাটা পর্যন্ত আজ অবধি আমরা এ দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি, এটা অত্যন্ত ক্ষোভের কথা। অন্তত খানিকটা শিক্ষা আপামর জনসাধারণের ভিতর ছড়িয়ে দিতে না-পারলে আমাদের গণতন্ত্রও যেমন অসম্পূর্ণ থাকবে, কৃষি তথা আর্থিক উন্নতিও তেমনি গোড়ায় দুর্বল থেকে যাবে।

আলোচনার গোড়ায় উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খানিকটা স্পষ্ট করে নেওয়া প্রয়োজন। মধ্যযুগে উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সনাতন ঐতিহ্যের ব্যাখ্যা

এবং বংশপরম্পরায় সেটাকে অবিচল শ্রদ্ধায় বাঁচিয়ে রাখা। বর্তমান যুগের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। এযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে সমাজ। প্রগতিশীল প্রতিটি দেশে এমন এক শ্রেণীর মানুষ প্রয়োজন যাঁদের কাজ হবে জ্ঞানবিজ্ঞানের এই অগ্রগতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা, নিদেনপক্ষে নিজের চিন্তাকে ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া জগতের সঙ্গে তাল রেখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ও প্রধান কাজ এই বিশেষ ধরনের জ্ঞানব্রতী মানুষ তৈরী করা। যে-দেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থায় এই মানুষ তৈরী হবে না সে-দেশ পিছিয়ে পড়বে।

চাকরীর সমস্যার কথা আমি আপাতত বলছি না। সেটার জন্য প্রধান প্রয়োজন কারিগরী শিক্ষার পুনর্গঠন এবং শিল্পের প্রসারের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ভিন্ন। শুধু কেরানী তৈরীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় চালানো তুচ্ছ বস্তুর উৎপাদনে দামী যন্ত্রের ব্যবহারের মতই সামাজিক সম্পদের অপচয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কেরানী তৈরী নয়, বরং সেই মানুষ তৈরী যিনি গৃহীত জ্ঞানকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করতে পারেন, বর্ধিষ্ণু বিজ্ঞানের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারেন, যাঁকে ছাড়া দেশের দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির উন্নতি সম্ভব হয় না। আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এই মানুষ তৈরী করার পক্ষে উপযোগী কি না, এটাই প্রধান প্রশ্ন, ডিগ্রিধারী ক'টি অথবা ক' হাজার ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরলো, সেটা প্রধান নয়।

এই গোড়ার কথাটা মনে রেখে আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে একবার তাকানো যাক। শিক্ষাকে আমরা যুক্ত করতে পারিনি নিয়ত বিবর্তিত জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতা ও সমস্যার সঙ্গে। এটা করা প্রয়োজন। শিক্ষার নামে এখানে চলেছে ধমক ধমকে মুখস্থ বিদ্যার চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু' বছরের শেষে একটি পরীক্ষা, তাতেই ছাত্রের ফলাফল বিচার হয়। পরীক্ষা কাছে না-এলে ছাত্রদের লেখাপড়ার চাড় থাকে না। কাজেই প্রথম দেড় বছর শিক্ষার্থীরা, বিশেষত কলা বিভাগের ছাত্রেরা, শিক্ষায় মনঃসংযোগ করে না। এতে বুদ্ধি ও চরিত্র দু'য়েরই ক্ষতি। বছরের পর বছর এই বুদ্ধিনাশের তুলনায় পরীক্ষা হলে অশান্তির ফলে যে-ক্ষতিটুকু হয় সেটা সামান্য। শেষ ছ' মাসে পড়াশোনার তাড়া পড়ে। বাছাই করা কিছু প্রশ্নোত্তর ছেলেরা তৈরী (অর্থাৎ পরীক্ষার খাতায় লিখবার মত মুখস্থ) করে যায়। এর বাইরে কোনো প্রশ্ন এলে তারা ক্রুদ্ধ বোধ করে, অধ্যাপক তাদের সঙ্গে শর্ত ভঙ্গ করেছেন এই রকম একটা অনুযোগে মুখর হয়ে ওঠে। দু' বছরের ভিতর ক্লাসে কোনো পরীক্ষা নেই—পরীক্ষা নেওয়া হ'লেও শেষ ফলাফলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কাজেই সে-পরীক্ষাতে বিদ্যার্থীর কোনো আগ্রহ নেই। ক্লাসে অধ্যাপক ছাত্রদের কোনো প্রশ্নে টানলে, কোনো আলোচনায় তাকে যোগ দিতে বললে, সেটা তার বিরক্তির কারণ হয়। আবার ছাত্রেরা প্রশ্ন তুললে অনেক অধ্যাপকও তাতে বিরক্ত হন। আসলে আমরা নিজে চিন্তা করে একটা সমস্যার অবতারণা করতে, সেই সমস্যা নিয়ে ভাবতে ও ভাবাতে, অভ্যস্ত নই। 'চিন্তা করা' ও জ্ঞানান্বেষণ নামক কার্যটি যে কি অনেক ছাত্রেরই সেটা জানা হয়ে ওঠে না। অনেকের যেন ধারণা যে কয়েক পাতার একটি সংক্ষিপ্ত নোট তৈরী করার নাম বুঝি জ্ঞানান্বেষণ, আবার কেউ কেউ ভাবেন যে কিছু শ্লোগান বা বাঁধা বুলি চেঁচানটাই মৌলিক চিন্তার নিদর্শন।

অতএব যা হবার তাই হয় ; অর্থাৎ আমরা জ্ঞানস্পৃহ এবং সম্যক সমালোচনায় অভ্যস্ত ছাত্র তৈরী করি না ; বরং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যা-পুস্তক পুঁজি করে শিক্ষার

দরিদ্র মুদিখানা চালিয়ে যাই। মাঝে মাঝে এর ভিতর থেকেও দুয়েকটি উজ্জ্বল ছেলে বেরিয়ে আসে পৃথিবীর যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-ছেলে প্রশংসিত হবে। কিন্তু সেজন্য গৌরবের অধিকারী নয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। উপর দিককার দুয়েকটি ছেলে—কোনো অব্যবস্থাই যাদের প্রতিভাকে বিনষ্ট করতে পারে না—তাদের ছাড়িয়ে গেলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অজন্মা চোখে পড়ে তা দিয়েই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচার হবে।

আমরা শিক্ষকেরা যে এ-ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত এমন মনে হয় না। আমাদের শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা বার বার বেতন বৃদ্ধি দাবি করেছি। সে দাবি ন্যায্য। কিন্তু এর বাইরে আমরা কতটুকু করেছি? বেতন বাড়াবার আন্দোলনে আমরা যে উৎসাহ দেখিয়েছি শিক্ষা অথবা পরীক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে তার এক-দশমাংশও কি কখনও দেখা গেছে? আমাদের সরল যুক্তিটা এই, বেতন না বাড়ালে প্রতিষ্ঠানে ভাল লোক আসবেন না, কাজেই শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না। কিন্তু এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাঁরা পড়াচ্ছেন তাঁরা অনেকেই কোনো একদিন কৃতী ছাত্রই ছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার গুণে তাঁদের জ্ঞান বদ্ধ-জলাশয়ের মত কিছুদিনের মধ্যে পচতে শুরু করে। আমরা ভালো লোক খানিকটা ভালো মাইনে দিয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনতে পারি, কিন্তু তারপর তাঁদের অধঃপতন রোধ করবার জন্য কি করছি?

অধিকাংশ শিক্ষক দশ বছরের ভিতর নিজ নিজ বিষয়ে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের অনেকটা পিছনে পড়ে যান। দর্শন, গণিত, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পিছিয়ে পড়াটা একবার শুরু হলে কারও একক চেষ্টায় সেটা রোধ করা অনেক সময় কঠিন। কিন্তু অধঃপতন বন্ধ করবার জন্য নানা উপায় আছে। একটি উপায় হ'ল অধ্যাপকদের জন্য নিয়মিত পূজোর ছুটিতে অথবা গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষা-শিবিরের ব্যবস্থা করা। শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠান থেকে এ-বিষয়ে উৎসাহ নেই। অথচ শিক্ষকেরা নিজেদের ক্রমাগত শিক্ষিত করে না তুললে যে-জ্ঞান তাঁরা বিতরণ করবেন সেটা বিতরণের অযোগ্য হয়ে উঠবে, এবং সেই অযোগ্য শিক্ষার নামে সমাজের কাছে বর্ধিত পারিশ্রমিক দাবি করতেও বিবেকবান শিক্ষকের একটা সংকোচ বোধ করা উচিত।

কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিষ্ঠাবান অধ্যাপক বিভিন্ন কলেজের সম্বন্ধে একটি বিশেষ সাল ধ'রে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। সত্তরটি শিক্ষায়তন থেকে সংগৃহীত উত্তরে প্রকাশ যে, অধিকাংশ (দুই-তৃতীয়াংশ) কলেজে বছরে অর্ধেক দিন ক্লাস হয়নি! এই বার-মাসে-তের-পার্বণের দেশে খুচরো ছুটিগুলি যথাসম্ভব তুলে দেওয়া দরকার। এটা শুধু ছুটি কমাবার প্রশ্ন নয়— বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক একটা দীর্ঘ অবকাশের প্রয়োজন আছে; কিন্তু কাজের তালে আধুনিকতার স্পন্দন জাগাবার জন্য খুচরো ছুটি ছাটাই আবশ্যক। এই দাবি ছাত্র ও শিক্ষকদের ভিতর থেকে আসা উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা উপরে বলেছি। যেমন পুরনো বিদ্যার বদ্ধ জলাশয়ে নতুন চিন্তা ও বিচারের স্রোত প্রবাহিত করার জন্য পড়াবার পদ্ধতি ও পরীক্ষার ব্যবস্থা এই দুয়েরই পরিবর্তন আবশ্যক। পরীক্ষা আরও ঘন ঘন না হ'লে ছাত্রদের পরিশ্রমী ও জ্ঞানান্বেষণে সতর্ক করে তোলা যাবে না। কিন্তু এই সব সংস্কারের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উদাসীন। সংস্কারের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনটা যাঁরা বোঝেন না প্রশাসনগত অসুবিধাগুলিই তাঁদের চিন্তায় পরিবর্তনের বিপক্ষে বিরাট যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়। একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। বি এ-র তুলনায় এম এ

পরীক্ষার সংস্কার সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। বছরের শেষে একটি, দু' বছরের শেষে আর একটি, এইভাবে দু'ভাগে পরীক্ষা নেওয়া এমন কিছু দুঃসাধ্য কাজ নয়। এই পরিবর্তনটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকেরা নানা কারণে গ্রহণ করতে পারেননি। অর্থনীতি বিভাগ থেকে এর সপক্ষে অভিমত শোনা যায়। ঘরোয়া আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় কর্তাব্যক্তিকে আমি বলি যে, অন্তত অর্থনীতি বিভাগে পরীক্ষা ব্যবস্থার এই সংস্কারটুকু চালু করবার অনুমতি দেওয়া হোক। আমার সে আবেদন সমর্থন লাভ করেনি। যে-কোনো পরিবর্তনই সমস্ত বিভাগের একসঙ্গে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে, প্রশাসনকর্তা এবং বর্তমান ব্যবস্থার সমর্থকদের কাছে এটা যেন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই মতৈক্যের বেড়া ডিঙিয়ে কোনো পরিবর্তন সাধনই দুষ্কর, এ কথাটা সংস্কারের প্রয়োজন যাঁরা বোঝেন তাঁদের কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। আসলে আমরা মুখে যাই বলি-না কেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজনটাই আমাদের ভাবনায় তেমন গভীরভাবে ঢোকেনি। তাই আমাদের কলহ ও দুশ্চিন্তা ছোট ব্যাপার নিয়ে—পরীক্ষা কেন্দ্রে আর একটু শান্তি, কোর্সটা কোনো রকমে শেষ করবার ব্যবস্থা, আরও কয়েকটা নম্বর অবশেষে যোগ করে আরও কয়েকজনকে পাশ করিয়ে দেওয়া অথবা না-দেওয়া।

আমরা শিক্ষকেরা এ-কথাটা কবে মনেপ্রাণে উপলব্ধি করব যে, স্বাধীনতার পর গত বিশ বছরে আর কিছুতেই দেশের এত বড় ক্ষতি হয়নি যতটা হয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিতে; আগামী বিশ বছরে আর কিছুতেই হয় তো এতটা উন্নতি সম্ভব নয় যতটা সম্ভব শিক্ষা ব্যবস্থার সুচিন্তিত, বলিষ্ঠ সংস্কারে; এবং শিক্ষার এই সংস্কারে শিক্ষকদেরও কিছু কর্তব্য আছে!

এদেশে সুস্থ ও প্রগতিশীল সমাজ গড়তে হলে একই সঙ্গে চাই প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার এবং উচ্চশিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন। এর একটিকে ছেড়ে অন্যটির প্রতি পক্ষপাত দেখানো ভুল। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশের জড়ত্ব ভাঙবে না। আবার উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি ও গুণগত পরিবর্তন ছাড়া দেশের দিকভ্রষ্টতা ঘুচবে না, দেশের জাগ্রত-শক্তি খোকামি আর ক্ষ্যাপামিতে নিজেকে ক্লান্ত করবে, ভবিষ্যতকে করবে বিপন্ন।

পরিশেষে আর একটি কথা বলব। শিক্ষায়তনের ভিতর থেকেই শুধু শিক্ষার স্থায়ী উন্নতি সম্ভব। ব্রিটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতাকে বিশেষ মূল্য দিতে আমরা শিখেছিলাম কয়েকজন অসামান্য শিক্ষাব্রতীর নির্ভীক নেতৃত্বে। আজ কারও কারও মুখে শোনা যায়, যে-সরকার জনগণের প্রতিনিধি তার হস্তক্ষেপে দোষ নেই। এটা ভুল ধারণা। শিক্ষা ও রাজনীতির প্রকৃতি ভিন্ন। দলীয় রাজনীতির প্রয়োজনে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে শিক্ষার চরিত্র নষ্ট হয়। শিক্ষার প্রসার ও সংস্কারে সরকারী দাক্ষিণ্য আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্রতীদের রাজনীতিক নির্দেশ ও অনুকম্পার উপর নির্ভরশীল ক'রে তুললে তাতে শিক্ষার স্থায়ী ক্ষতিসাধনই সম্ভব। এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কথা বলছি ১৯৬৮ সালে, এদেশে রাজনীতির এক সন্ধিক্ষণে।

শিক্ষা ও ভাষা সমস্যা

আমি মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ; আমি চাই যে, বিভিন্ন বিষয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠনে মাতৃভাষার স্থান হোক।

কিন্তু এই কথাটুকু বলেই যাঁরা বক্তব্য শেষ করেন, তাঁদের সঙ্গে আমার মতের ঘোরতর অমিল। মাতৃভাষায়, অথবা আঞ্চলিক ভাষায়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য বিশ বৎসর চালাবার পর এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর ভাববিনিময় চলবে কী করে ?

এটা চিন্তিত হবার মতো প্রশ্ন। স্বাধীনতা লাভের সময় আমরা এমন নেতৃবৃন্দ পেয়েছিলাম যাঁরা ছিলেন চিন্তায় ও আদর্শে সর্বভারতীয়। আজ ধীরে ধীরে রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা সামনে এগিয়ে আসছেন, তাঁরা আগের নেতাদের তুলনায় অনেকটা বেশী আঞ্চলিক। এ-অবস্থায় দেশের ভাববিনিময়ের সেতুটা, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর, যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা আবশ্যক। একটা কথা এই সঙ্গে স্পষ্ট করে বলা দরকার। ইংলন্ডের মতো শিল্পোন্নত দেশেও অধিকাংশ লোক নিজ নিজ অঞ্চলে জীবনের অধিকভাগ কাটিয়ে দেন। এদেশেও অল্পসংখ্যক লোকই দেশময় আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন। কিন্তু দেশের ঐক্যের জন্য দেশময় আলোচনার এই স্রোতটাকে অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আমরা অনেকেই ঐক্যে এতোটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, আমাদের ধারণা যোগাযোগের ভাষা ছিন্ন করে দিলেও ঐক্যটা টিকে থাকবে। এমন একটা প্রমাণহীন ধারণাকে অবলম্বন করে শিক্ষানীতি নির্ধারণ করা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রমাণ। দেশের ঐক্য ভাঙা সহজ ; আবার গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন।

এ প্রসঙ্গে অনেকে একটা ভুল তুলনা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষা, তবুও তো ওদের ভিতর আলোচনা চলেছে। তর্জমার বেড়া ডিঙিয়ে আলোচনা অবশ্য ভারতবর্ষ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পরও চলবে। আমি বিভক্ত ইয়োরোপের তুল্য বিভক্ত ভারতের কথা ভাবছি না, বরং রাজনৈতিক ঐক্যে বিধৃত ভারতের সংস্কৃতির কথাই বলছি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষাসমস্যা আলোচনা করতে হবে।

অনেকে আবার বলেন যে, ইংরেজীকে তো আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি না, অতএব ভয়ের কারণ কী ? কিন্তু এখানেই আমাদের দ্বিতীয় বিরাট ভুল। আমরা বলি যে, ইংরেজীকে আমরা রাখবো বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে। আজকের রুশ পণ্ডিতও প্রায়ই ইংরেজী জানেন বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্যই ; কিন্তু তিনি ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন না। আমরা ভুলে যাই যে, একটা ভাষায় বিদেশের বই পড়ে বুঝতে পারা এক জিনিষ ; সে ভাষায় নিজের চিন্তা গুছিয়ে প্রকাশ করতে পারা অন্য জিনিস।

সোভিয়েত দেশের সঙ্গে এদেশের তুলনায় একটি কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। সোভিয়েত দেশও বহুভাষার দেশ। কিন্তু তবুও একটা পার্থক্য আছে। ওদেশে রুশ ভাষার সঙ্গে তুলনীয় সমৃদ্ধ ভাষা আর নেই। রুশ ভাষায় শুধু সংখ্যায় বেশী লোকই কথা বলেন না, পুশকিন-ডস্টয়েভস্কি-টলস্টয়ের ভাষা সাহিত্যিক সম্পদে সোভিয়েত দেশের সকল ভাষার ভিতর অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। এদেশের অবস্থা ভিন্ন। আমাদের কোনো ভাষাই অন্যান্য সব ভাষার তুলনায় ঐরকম প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে

না ; বাঙ্গালী, উর্দুভাষী অথবা তামিল স্বীকার করবেন না যে হিন্দী ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা। ফলে সোভিয়েত দেশের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে রুশভাষা ঐক্যের বন্ধন হিসাবে যেমন সহজে গ্রহণযোগ্য, এদেশে হিন্দী তেমন নয়। নগরে নগরে সাধারণ মানুষের ভিতর খানিকটা হিন্দী অবশ্য ছড়িয়েছে ; সে জন্য সরকারী ফতোয়া বা আইন প্রণয়ন প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আইনের জোরে এ দেশের উপর হিন্দী চাপাতে গেলে তার পরিণাম কি হতে পারে দক্ষিণ ভারত থেকে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগের প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন। এই যোগাযোগটা হবে নিশ্চয়ই মাতৃভাষার মাধ্যমে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যাঁরা নিজ অঞ্চল ছেড়ে ভারতের ভিন্ন কোনো অংশে স্থায়ীভাবে অথবা দীর্ঘ দিনের জন্য বসবাস করতে চাইবেন তাঁরা ওই অঞ্চলের ভাষা শিখে নেবেন। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দেশময় সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে হিন্দী শেখাবার প্রয়োজন নেই। কোনো শিক্ষিত বাঙ্গালী অথবা হিন্দীভাষী যদি তামিল চাষীর ভিতর কাজ করতে চান তো তাঁকে সেই চাষীর ভাষাটাই শিখে নিতে হবে ; সমস্ত তামিল চাষীকে সেজন্য হিন্দী শেখাবার অর্থ হয় না। স্বাভাবিক গতিতে হিন্দী যতটা ছড়ায় ততটাই ভালো। কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নটা তবু থেকেই যায় : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সারা ভারতে যোগাযোগের ভাষা কি হবে ?

একথাটা আজ আমাদের পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখবার সময় এসেছে যে, আজ থেকে বিশ বছর পর ইংরেজীকে আমরা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশের ভিতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা সমস্যা আলোচনার মাধ্যম হিসাবে রাখতে চাই কি না ? যদি চাই তো কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ইংরেজী এতোখানি শিখতে হবে যে,তাঁরা শুধু ইংরেজী বই পড়েই বুঝতে পারবেন না, ইংরেজীতে নিজের চিন্তাও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। কথাটা অন্যভাবেও রাখা যায়। হিন্দী যদি অবশ্যপাঠ্য হয়ও তবু প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইংরেজী ও হিন্দী দুটোই সামান্য শিখবার পর অহিন্দীভাষী ভারতীয় উচ্চশিক্ষার জন্য কোন্ ভাষাটি ভালো করে শিখবেন ? তিনটি ভাষায় উচ্চচিন্তা সুচারুভাবে প্রকাশ করতে শেখা কঠিন কাজ। কিন্তু দু'টি ভাষায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা দুরূহ নয় এবং আমাদের দেশে এটা প্রয়োজন। মাতৃভাষা আমাদের চাই ; কিন্তু সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তঃ ভারতীয় যোগাযোগের একটি ভাষাও চাই। সেই ভাষা হবে কোনটি ? কোন দু'টি ভাষার যোগাযোগে আমাদের জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা যথাসম্ভব বৃদ্ধি পাবে ? এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, দু'টি ভারতীয় ভাষা উচ্চ পর্যায়ে শেখার চেয়ে একটি ভারতীয় ভাষা (মাতৃভাষা) ও ইংরেজী ভালো করে শিখলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ লাভবান হবে বেশী।

অর্থাৎ, আমাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া প্রয়োজন যে, এ দেশের ছাত্রেরা ইংরেজী ও আঞ্চলিক ভাষা উভয়ের মাধ্যমেই শুধু পুস্তক পাঠেই সক্ষম হবেন না, বিদ্বজ্জন সমাজে নিজেকে প্রকাশ করতেও পারবেন। রামমোহন থেকে জগদীশচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই এটা পারতেন ; কিন্তু আজ শিক্ষার সুপরিকল্পনা ছাড়া বিশ বছর পর এ আর সম্ভব হবে না। অথচ দেশের ঐক্য ও প্রগতির জন্য এটা আমাদের না হলেই নয়।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ

এমন একটি ব্যক্তি অথবা সত্তাকে যদি কল্পনা করা যায় যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর তবে তাঁর শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদেরই শিক্ষার প্রয়োজন আছে যাঁরা সম্পূর্ণ নন। আবার এমন একটি ব্যক্তি অথবা সত্তাকে যদি চিন্তা করা যায় যিনি অসম্পূর্ণ এবং নিজেকে নতুন করে গড়বার শক্তি যাঁর একেবারেই নেই, তবে তাঁর শিক্ষাগ্রহণের শক্তিও নেই। কাজেই তাঁর পক্ষেও শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। একদিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ আর অন্যদিকে সেই অপূর্ণ মানুষ, যে নিজেকে গড়বার শক্তিও লাভ করেনি, নিজেকে নতুন করে ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করবার শক্তি যার নেই, এই দুই প্রান্তে শিক্ষা অনুপস্থিত। এর মাঝামাঝি জায়গাতে শিক্ষার স্থান। যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ নন, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্য তাঁর অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। কাজেই শিক্ষার মূলে এইরকম একটা সম্পর্কের কথা আছে, সেই সম্পর্ককে বিশেষ পদ্ধতিতে গড়ে তুলবার, রূপদান করবার, প্রশ্ন আছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলেও এই রকম কিছু সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্পর্ক, এইসবই তাঁর শিক্ষাদর্শনের উপাদান।

প্রকৃতি নিয়েই কথাটা শুরু করা যাক, কারণ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি স্থান বেছে নিয়েছিলেন যেখানে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারবে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক, অথবা মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে শিক্ষার যে ধারণা, সেই সম্পর্ক অথবা ধারণার আবার দু'টি প্রান্ত আছে। সেই দু'টি প্রান্ত নিয়ে একটু ভাবা যাক। একদিকে প্রকৃতিকে ভাবা যায় যেন সে নিয়মের দ্বারা চালিত এক যন্ত্র। ভাবা যায় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এইটেই বের করতে চায় যে, প্রকৃতির যন্ত্রটা কীভাবে কাজ করে বা কীভাবে তাকে দিয়ে কাজ করানো যায়। প্রকৃতিকে যদি আমরা যন্ত্র হিসেবে ভাবি তা হলে শিক্ষার ঝোঁক হবে ঐদিকে। শিক্ষা ব্যাপারটা অবশ্য আরো বেশি যান্ত্রিক ও বোধশূন্যও হতে পারে। শিক্ষক অনেক সময় গতানুগতিক বিদ্যালয়ে অতি বোধহীন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে থাকেন। তাতে বুদ্ধি জিনিসটাই অনুপস্থিত। এবার আসা যাক দ্বিতীয় কথায়। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যে সম্পর্ক তাতে অন্য একটি প্রান্ত আছে। এক প্রান্তে যেমন যান্ত্রিকতা অন্য প্রান্তে তেমনি প্রকৃতি এমন একটি অবয়ব, যার ভিতর দিয়ে মানুষের প্রেম বিস্তার লাভ করতে পারে। এই কথাটা যদি শিক্ষায় ধরা না পড়ে তবে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়, রাবীন্দ্রিক নয়। একটা কথা কবি শিক্ষক সহজ অথচ গভীরভাবে বুঝেছিলেন—সেটা শিশুর ভালোবাসার ধরন সম্বন্ধে। আর মনে রাখতে হবে যে শিশু এখানে মানুষেরই প্রতিভূ। একটু দূর থেকে শিশুকে যখন দেখি তখন এই জিনিসটা লক্ষ করা যায়। শিশুর কান্নার সাধারণত কোনো কারণ থাকে—ক্ষিদে পেয়েছে, কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য, কি যা হোক কিছু। শিশুর খুশীর মধ্যে কিন্তু একটা অকারণ আনন্দ আছে। অকারণে পুলকিত হয়ে ওঠে শিশু, অকারণে নাচতে থাকে। এটা একটা মূল কথা। এই বিশ্ব সম্বন্ধে, প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের একটা অকারণ আনন্দবোধ আছে। আমরা যতটুকু মানুষ সেই পরিমাণে আমাদের সকলের মধ্যে এটা আছে।

সাংসারিক অর্থে যাকে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলে, আমরা যখন ক্রমে তাই হয়ে উঠি, তখন

এই অকারণ আনন্দটাকে পাগলামি মনে করি। আমরা কতগুলো কাজের কথা শুধু যে শিখি তাই নয়, সেটাকেই যেন একমাত্র শিক্ষণীয় মনে করি। এই পৃথিবীকে দেখবার এই দুটো ধরন আছে। একটা হলো, এটাকে কাজের বিষয় ভাবা। আরেকটা অকাজের বিষয়, অকাজের বিষয় মানে আনন্দের বিষয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্যরহিত আনন্দের বিষয়, অহেতুকী প্রীতির বিষয়। রবীন্দ্রনাথ শিশুর শিক্ষায় কাজের কথাটা বাদ দিতে চেয়েছিলেন তা নয়। কিন্তু ঐ অকাজের কথাটাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের এটা একটা প্রধান কথা—একটা মৌল দার্শনিক ভিত্তি বলা যেতে পারে।

আরেকটা কথা এই সঙ্গে এসে পড়ে। এই যে আমরা প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের জানার মধ্যে একটা পার্থক্য করেছি, এই পার্থক্যটা করবার পরও এ দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্কের কথাও মনে রাখা দরকার। প্রকৃতির দ্বারা আমাদের কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; প্রকৃতি আমাদের ধারণ করে, লালন করে। আবার প্রকৃতি আমাদের আনন্দের ক্ষেত্র, যেমন শিশুর কাছে, যেমন শিল্পীর কাছে। মা তো শিশুর কাছে এই রকমই। মা শিশুর কিছু প্রয়োজন মেটান, আবার মায়ের মধ্যে শিশু কিছু অকারণ আনন্দের ক্ষেত্র খুঁজে পায়। উল্টো করেও বলা যায়, শিশুর মধ্যে মা একটা অকারণ আনন্দের ক্ষেত্র খুঁজে পান, তা নইলে তিনি মা নন। এখন এ দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। যে মা শিশুর প্রয়োজন একেবারেই মেটাতে পারেন না সে মায়ের পক্ষে শিশুর কাছে অকারণ আনন্দের ক্ষেত্র হয়ে ওঠাটাও কঠিন। অতএব শিক্ষার ব্যাপারেও মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্কের এমন একটা আদল গড়ে তুলতে হয় যাতে প্রকৃতি মানুষের কিছু প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আবার প্রকৃতিকে মানুষ শিল্পীর মন নিয়ে, শিশুর মন নিয়ে, আনন্দের আর ভালোবাসার সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

প্রয়োজন পূর্ণ করার দিকটাও তাহলে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কথাটা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই বুঝেছিলেন। ভালো করেই বুঝেছিলেন তখনই, বিশেষত যখন গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য তিনি চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখলেন। এই অসহায় এবং দরিদ্র মানুষদের এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন যাতে প্রকৃতির সহায়তায় মানুষের অভাব দূর করবার পথ প্রশস্ত হয়। বিজ্ঞানের সেটা একটা লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, বিশেষত দরিদ্র পল্লীবাসীর অভাব দূর করবার কাজে। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের দিকে তাকালে যেমন আমরা শিশু এবং প্রকৃতির মধ্যে আনন্দের সম্পর্কটাই প্রথম দেখি, শ্রীনিকেতনের দিকে তাকালে তেমনি দরিদ্র গ্রামবাসী এবং প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রয়োজন মেটাবার প্রয়াসের দিকটা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি।

প্রথমেই বলেছিলাম যে,প্রকৃতি একদিকে নিয়মে আবদ্ধ, অন্য দিকে প্রকৃতি অকারণ ভালোবাসার ক্ষেত্র—এ দুয়ের মধ্যে কোনোটাকেই তুচ্ছ করবার মতো কথা মনে করা যায় না। প্রকৃতি যে-নিয়মে আবদ্ধ সেই নিয়মকেও জানা চাই। শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাটা পরিষ্কারভাবে বলেছেন। প্রকৃতি যে-নিয়মে আবদ্ধ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে-নিয়মে চলে, সেটা যদি আমরা না জানি, না বুঝি, তবে আমাদের মনে নানা কুসংস্কার সহজে আশ্রয় পায়। এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মে আবদ্ধ একথা জানলে সেইসব কুসংস্কার ধীরে ধীরে দূর হয়। এইসব কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে মানুষের মনে অনেক অন্ধ ভয় জমে ওঠে। প্রকৃতি যে নিয়মে চলে সে কথা জানলে সেইসব অন্ধ ভয় ধীরে ধীরে দূর হয়। মনের মুক্তির জন্য এটা প্রয়োজন। আবার প্রকৃতির নিয়ম জানবার ফলে আমরা প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে আরো পরিপূর্ণভাবে লাগাতে পারি, অতি সাধারণ ব্যাপারেও। মাটিতে

কী সার দিতে হবে, কী করে ফলন ফলবে, এইসবের মূলেও তো বিজ্ঞান এবং নিয়ম আছে। শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনবিভাগ গড়বার কাজে প্রথম যুগে এলম্‌হার্স্ট ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তাঁর সঙ্গে পত্রালাপে এবং অন্যান্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ খুবই পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, বিজ্ঞানকে প্রয়োজন পল্লীসংগঠনের কাজে এই দুই উদ্দেশ্যেই—এক, মানুষের মনকে অন্ধতা থেকে মুক্ত করবার জন্য, আর দুই, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রথা ও উৎপাদনব্যবস্থার জন্য।

এইখানে ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশীর সম্পর্কের কথাটাও এসে যায়। এতক্ষণ বলছিলাম প্রধানত ব্যক্তি বা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের কথা। এখন আসছি প্রতিবেশীর সম্পর্কের বিষয়ে। প্রতিবেশীর ভিতর ব্যক্তি নিজের আত্মাকে প্রসারিত করে। আক্ষরিক অর্থে এবং দার্শনিক অর্থে আত্মীয়তার এটাই অর্থ। যদিও আত্মীয়তার গ্রাম্য অর্থ রক্তের সম্পর্ক নিয়ে, তবুও তার বৃহত্তর দার্শনিক অর্থ.যার ভিতর আত্মার সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছে। যার ভিতর আমাদের আত্মার সম্পর্ক প্রসারিত হয়নি সে রক্তের সম্পর্কে যদিও আত্মীয় হয়, তবুও গভীরতর অর্থে সে আত্মীয় নয়। আর যাকে আমরা বন্ধু প্রতিবেশী বলে জেনেছি— সেই আত্মীয়।

আমাদের ভাষায় পাতানো দাদা দিদি, পাতানো মাসি পিসী, এইরকম অনেক সম্পর্ক থাকে। সেসব রক্তের সম্পর্ক নয়, কিন্তু সেগুলো অনেক সময় আসল সম্পর্ক—যদি না সেগুলো মামুলী নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। প্রতিবেশীও ঐরকম। যীশুখ্রীষ্ট এক সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন, কে তোমার প্রতিবেশী ? এ নিয়ে অনেক আলোচনা সম্ভব। প্রতিবেশীর একটা আদর্শ রূপ ও সংজ্ঞা আছে। তাকেও আবার দুইভাবে ব্যবহার করা যায় প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের মতোই! এক হল কাজের দিনে কাজের ভিতর, আরেক হল উৎসবের দিনে আনন্দের ভিতর। কাজের দিনে কাজের ভিতর প্রতিবেশী সম্পর্কের সবচেয়ে সার্থক রূপায়ণ হচ্ছে সমবায়ে। সমবায়ের ভিতর দিয়ে প্রতিবেশীরা একত্র হয়ে যাতে সকলের প্রয়োজন সুষমভাবে ন্যায়সংগতভাবে সৃজনশীলভাবে পূর্ণ হতে পারে এমন প্রচেষ্টা করে। আবার উৎসবের দিনে মানুষ আনন্দের জন্যে, শুধু আনন্দের কারণে মিলিত হয়। এই দুই মিলে প্রতিবেশী, এই দুই মিলে আদর্শ পল্লীসমাজ। আমাদের দেশে প্রাচীন মেলাতেও এই দুই একসাথে এসে মিলেছিল, প্রয়োজন আর আনন্দের সেটা মিলনক্ষেত্র।

পল্লী কথাটার শেষ পর্যন্ত অর্থ ঐ। এই যে পৃথিবীজোড়া মানুষ, এদের সকলের সঙ্গে তো আমাদের সোজাসুজি পরিচয় ঘটে না, আমরা প্রত্যেকের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না. প্রত্যেকের সঙ্গে তো আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এ ওকে চেনে, একে অন্যকে আত্মীয় বলে মানে, এই নিয়ে পল্লীসমাজ; বাস্তবে অবশ্য তার ভিতর অনেক কলহ কলঙ্ক থাকে, হিংসা দ্বন্দ্ব সবই থাকে। বাস্তবটা জানা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। কিন্তু শুধু বাস্তব যদি আমরা জানি, আদর্শ যদি না জানি, তবে শিক্ষার প্রশ্ন নেই। আদর্শ যদি না জানি তবে কিসের দিকে আমরা এগোবার চেষ্টা করছি ? কিসের জন্য আমরা নিজেকে নতুন করে গড়বার চেষ্টা করবো। আগেই বলেছি, যদিও শিক্ষার শুরু অপূর্ণতাতে তবু শিক্ষা তখনই সম্ভব এবং সার্থক যখন একটা পূর্ণতার দিকে যাবার ধারণাও সেই সঙ্গে থাকে। কাজেই বাস্তব পল্লীসমাজকে জানতে হয়, কিন্তু একটা আদর্শ পল্লীসমাজের চিত্রও সেই সঙ্গে প্রয়োজন। বাস্তব পল্লীকে রবীন্দ্রনাথ জানতেন না এমন নয়। গ্রামকে তিনি ভিতর থেকে দেখেছেন। তাঁর ছোটো গল্পগুলো পড়লেই বোঝা যায় যে তিনি বাস্তব পল্লীকে ভালোভাবেই জানতেন। তবে বাস্তব পল্লী তো আরো অনেকের

লেখাতে রূপায়িত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আরো পাই একটা আদর্শ চিত্র, যেমন 'স্বদেশী সমাজ' নামে সেই বিখ্যাত লেখায়। বাস্তব থেকে আদর্শে যাবার পথে বিজ্ঞান ও সমবায় এবং কোনো একটা গভীর অর্থে আত্মীয়তা অথবা আত্মবিধৃত আনন্দের ধারণা, এইসব মিলে তিনি পল্লীকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাচিন্তার ভিতর। বিশ্বভারতীর অংশ যেমন শান্তিনিকেতন তেমনি শ্রীনিকেতন। আর শ্রীনিকেতনের প্রথম কথাটাই পল্লীসংগঠন নিয়ে। পল্লীসংগঠন—অথবা রবীন্দ্রনাথ কখনো পল্লীসঞ্জীবন কথাটাও ব্যবহার করেছেন—তারই সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষা। অনেকেই জানেন, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ই একমাত্র নয়, শ্রীনিকেতনে আরও একটি বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছিলেন এবং একদিন এমন সিদ্ধান্তেও এসেছিলেন যে, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের চেয়েও শ্রীনিকেতনের বিদ্যালয়ের তাৎপর্য বেশি, দেশের গভীরতর প্রয়োজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

এরপর আসছে মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের সম্পর্কের কথা। যাকে আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক বলেছি সেটা অনেক সময় একটা সীমাবদ্ধ গোষ্ঠীর সম্পর্ক। পল্লীসমাজ হাতের কাছের উদাহরণ, কিন্তু আরো বড় বড় গোষ্ঠীকেও আত্মীয়তার সম্পর্কের আদলেই চিন্তা করা হয়। জাতি বা ধর্মকে ভিত্তি করে যেসব সম্পর্ক সেখানেও এক ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ককে মৌল বস্তু বলেই মনে করা হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। কারণ এই ধরনের সীমাবদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো অতি সহজে অনাত্মীয় শত্রু খুঁজে নেয়। তখন সেটা বিরোধী আত্মীয়গোষ্ঠীর ভিতর যুদ্ধের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সেটাই আত্মীয়সম্পর্কের আদর্শরূপের বিপরীত। আমরা যখনই কোনো আদর্শরূপ নিয়ে চিন্তা করি তখনই তার বিপরীতটা সম্পর্কেও সতর্ক হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন কীভাবে জাতীয়তাবাদ একটা জঙ্গীরূপ ধারণ করে, চীনকে আক্রমণ করে জাপান, ইউরোপের নানা জাতি মেতে ওঠে যুদ্ধের অমানুষিক উত্তেজনায়। এইসব দেখে এই কথাটাই তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে যে ধারণা তাতে যদিও স্বদেশী সমাজের কথা থাকবে তবুও সমানভাবেই রাখা প্রয়োজন বিশ্বমানবতার কথাও। আর সেই জন্যই তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেন তার নাম দিলেন বিশ্বভারতী। এইখানে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তিনি আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন বিশ্বকে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ও শিক্ষাচিন্তায় একদিকে রইলো পাশের গ্রাম সুরুল, যার উন্নয়নের জন্য শ্রীনিকেতন, আর অন্য দিকে বিশ্বমানব, সমস্ত বিশ্ব। সারা বিশ্ব থেকে জ্ঞানীগুণী মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর ছোটো শান্তিনিকেতনে, যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্। চীন থেকে, জাপান থেকে, ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানীগুণী মানুষকে তিনি টেনে এনেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে। এই বিশ্বমানবতা তাঁর শিক্ষাদর্শের পূর্ণতার জন্য আবশ্যিক।

কথাগুলোকে এবার একত্র সংগ্রহ করে দেখা যাক। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক পূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে সেটা আনন্দের সম্পর্ক, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সম্পর্ক। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ আরো শেখে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত হতে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমবায়ের বাহনে দূর হয় দারিদ্র্য। শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ একটা স্বাভাবিক আনন্দকে উৎসবের পর্যায়ে তুলে নিতে শিখুক এটাও ছিল কবির আকাঙ্ক্ষা, যার কিছু পরিকল্পিত অনিন্দ্যসুন্দর রূপও তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। আবার ছোটো গোষ্ঠী যেন কোনো বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্বের ভিতরই

তার চরম অর্থ খুঁজতে না যায়, ছোটো গোষ্ঠীকে যাতে শেখানো হয় যে, সব গোষ্ঠীরই সার্থকতা বৃহত্তর কোনো মানবসমবায়ের জন্যে নিজেকে সেবা ও আনন্দে সার্থক করে তোলার ভিতর, এই দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই জন্য স্বদেশী সমাজের ধারণার সঙ্গে যোগ করতে হয় মানুষের ধর্মের ধারণাকে।

শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে সহজে ঢুকতে দিতেন না। তারও একটা কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিসচেতন ছিলেন না এমন তো নয়। তাঁর রাজনীতি বিষয়ক নানা ভাষণ ও কর্ম দেশবাসীর অজানা নয়। তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছরে এর উদাহরণের অভাব নেই। নানা তেজস্বী ভাষণ এবং কর্মের উল্লেখ করা যায় সহজেই। অথচ অতখানি রাজনীতিসচেতন হয়েও শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে তিনি দলীয় রাজনীতিকে ঢুকতে দিতে চাইতেন না। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, রাজনীতির সঙ্গে প্রায় অনিবার্যভাবে বড় বেশি দলাদলি এসে যায়। আশ্রম প্রাঙ্গণকে সেই দলাদলি থেকে তিনি মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। আরও একটা কথা আছে। রাজনীতির প্রধান কাজটা হল ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব। প্রথমে সেটা ছিল বিদেশীর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার প্রশ্ন। তারপর একদলের হাত থেকে অন্য দলের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়াটাই প্রধান হল। ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব রাজনীতির একটা মৌল ব্যাপার। সেই দ্বন্দ্বের ভালোমন্দ যাই থাকুক, প্রয়োজন যাই থাকুক, রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে তার বাইরেও একটা বড় কাজ আছে। গান্ধীর যেমন রাজনীতির পাশে ছিল গঠনমূলক কার্যক্রম, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ছিল পল্লীসংগঠন। আরো ছিল মানুষের জীবনে কতগুলো আদর্শকে মূল্যবান বলে শুধু দার্শনিকভাবে প্রচার করা নয়, জীবনচর্যার ভিতরেও প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প। এই ধরনের কিছু কাজকে তিনি গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন, যে কাজ কখনো রাজনীতির ভিতর দিয়ে পূর্ণ হয় না। যাঁরা রাজনীতি করবেন, সক্রিয় রাজনীতি, তাঁরা তো সে-কাজের জন্য আছেনই। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর যেটা বিশেষ প্রতিভা তাকে তিনি মানুষের কাজে নিযুক্ত করতে পারবেন অন্য এক গঠনমূলক ও সৃজনশীল কর্মের ভিতর দিয়ে, যেটাকে রাজনীতির আবর্ত থেকে অনেকখানি দূরে রাখাই ভালো। প্রশ্নটা এই নয় যে, শিক্ষা ভালো কি রাজনীতি ভালো ; প্রশ্নটা এই যে, শিক্ষাকে রাজনীতির হাতে তুলে দেওয়া ভালো কি না। রবীন্দ্রনাথ স্থির করেছিলেন যে,শিক্ষাকে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখাই মঙ্গলজনক। শান্তিনিকেতনে তিনি সেটাই যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ কাজ শুরু করেছিলেন এই শতকের গোড়ায়। আজ শতাব্দী অবসিত হতে চলেছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তা তবু প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বরং কালের এই ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আমরা আরো নিশ্চিতভাবে জানি, ঐসব চিন্তা শুধু অতীতের নয়, বর্তমান আর ভবিষ্যতেরও। পল্লী ও নগরের ভিতর বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। স্বাধীনতালাভের পর এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে ছাত্রসমাজের ভিতর একটা গভীর বিভেদ ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। একদিকে আছে সেই অতিনাগরিক ছাত্রগোষ্ঠী, স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাদের যোগ অতি সামান্য, এদেশটাকে গড়ে তুলবার চিন্তা যাদের উদ্বুদ্ধ করে না, বরং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যাদের অভিলাষ। অন্যদিকে পাই গ্রাম ও ছোটো শহর থেকে আগত সদ্যশিক্ষিত গোষ্ঠী, ইংরেজীর সঙ্গে যাদের পরিচয় কম, বিশ্বের সঙ্গেও সেই মতো, যাদের চিন্তার দিগন্ত নিতান্ত আঞ্চলিক। আগামী শতকের ভারত গড়বার কাজে নেতৃত্ব তবে আসবে কোন্

পথে ? সমস্যার এই এক রূপ। সত্যের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের, বিচ্ছিন্নতা আরো নানা রূপে ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা তো সমাজের ভিতর আছেই। কিন্তু শিক্ষা যখন তাকে আরো বাড়িয়ে তোলে তখন শিক্ষাব্রতীর কাছে সেটা বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। সেটাকে তখন বলি, শিক্ষার বিকার। কোথাও আনন্দ ও সৃজনশীলতার পথরোধ করে দাঁড়ায় বিদ্যালয়, মানুষের ব্যক্তিত্বকে করে পঙ্গু, যা থেকে আসে ধ্বংসাত্মক আক্রোশ। কোথাও শেখানো হয় স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, বিজাতি ও বিধর্মীর প্রতি সন্দেহ, নিহিত আছে যাতে মানবতারই প্রতি অবিশ্বাস।

বিচ্ছিন্নতা দূর করবার পথ রচনা করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে সমন্বয়-সাধন তাঁর শিক্ষাদর্শের মূল কথা সেটা শুধুই কবির কল্পনা নয়। এ যুগের সংকটের সঙ্গে তার যোগ। এইখানে তার বাস্তবতা, তার গভীরতর প্রাসঙ্গিকতা।

শিক্ষার সমস্যা-১

শিক্ষার কিছু তত্ত্ব আছে চিরকালের, আর কিছু সমস্যা সমকালের। সমকালীন অথচ শুধুই সমকালের নয়, এইরকম সমস্যা নিয়ে কয়েকটি কথা বলাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

সমস্যার অবতারণার আগে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি মূল পার্থক্যের উল্লেখ করে নিলে পরবর্তী আলোচনার কিছুটা সুবিধা হতে পারে। প্রাচীন সমাজে বৃত্তিপ্রশিক্ষণের স্থান ছিল প্রধানত পরিবারে, আর উচ্চশিক্ষার স্থান গুরুগৃহে। কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে সেই গুরুগৃহ, গুরু সেখানে পিতৃতুল্য। আধুনিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আকারে অনেক বৃহৎ। এখানে এক একটি বিষয় পড়াবার জন্য আছেন এক একজন অধ্যাপক, এমনকি একই বিষয় খণ্ড খণ্ড করে একাধিক অধ্যাপকের ভিতর ভাগ করে দেওয়া হয়। ওস্তাদ কারিগর একটি সম্পূর্ণ মূর্তি অথবা শিল্পবস্তু নিজে প্রস্তুত করেন, তিনি শিল্পী। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সমগ্র কাজ বহু খণ্ডে বিভক্ত ; শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞদের ভিতরে সেই কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রাচীন ব্যবস্থায় ছাত্রের সমগ্র শিক্ষার ভার এবং তাকে মানুষ করে তুলবার দায়িত্ব ছিল গুরুর হাতে। এযুগে অনিবার্য কারণে এক রকমের যান্ত্রিক কর্মবিভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভ করেছে। আজকে অধ্যাপক গুরু নন, বরং বিশেষজ্ঞ। এ সব কথার কিছু ব্যতিক্রম দেখানো অসম্ভব নয়, কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই। মূল ঝোঁকটা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা চলে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। পুরনো ব্যবস্থায় আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। পটভূমিকার এই পার্থক্য মনে রাখলে আজকের দিনের একাধিক সমস্যার অর্থ আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়।

১

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন নিয়ে কিছুকাল যাবৎ আলোচনা চলছে।

সেকালে রাজা করতেন রাজার কাজ, গুরু গুরুর কাজ। একে অন্যের কাজে সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। আজকাল রাজনীতির যে সর্বব্যাপী যে সর্বগ্রাসী ভূমিকা দেখা যায় তার সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্যের এইখানে একটা গভীর অমিল আছে।

ধর্ম যেমন সরকারের সৃষ্ট বস্তু নয়, রাজা মহারাজার ইচ্ছায় চলে না অথবা চলা উচিত নয়, অন্তত আমাদের প্রাচীন চিন্তায় রাজা মহারাজারাই ধর্মের অনুশাসনের অধীন, উচ্চশিক্ষাও তেমনই রাজনীতির ধ্বজাধারী হবে না, সরকারের আজ্ঞাবাহী হবে না, বরং তার নিজস্ব আদর্শ নিয়ে সে স্বাধীন, এই রকম একটা চিন্তা আমাদের অনেকের কাছে শ্রদ্ধেয়। এই শতকের প্রথম ভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের সপক্ষে মত গঠনের একটা বিশেষ কারণও ছিল। আমাদের দেশ যখন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযুক্ত তখন স্যার আশুতোষ এবং অন্যান্য শিক্ষাগুরুদের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা সাধারণভাবে এদেশে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভের পর এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতি মোটামুটি এই রকম। যখন যে দল সরকারী ক্ষমতায় আসীন তখন সেই দল শিক্ষার ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের সমর্থক। বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু ক্ষমতা হাতে এলে তাঁরাই আবার শিক্ষার ওপর সরকারী শাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। গত দশ বছরে রাজনীতির হেরফেরের ভিতর দিয়ে এই ব্যাপারটা নির্মমভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অন্য সব ধর্ম পরিত্যাগ করে দলীয় রাজনীতিরই যাঁরা অনুসরণ করেন তাঁদের কাছে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু দলীয়তার বাইরেও শিক্ষার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। সেই মূল্যে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কথাটা যদি অনুচ্চারিত থাকে, সংগঠিত না হয়, তবে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমগ্র সমাজ। রাজনীতিতে প্রধান জিনিস ক্ষমতা নিয়ে লড়াই। কোনো এক দল আজ বিজয়ী, কাল অন্য কোনো দল। এই লড়াই এবং হারজিতের খেলায় যখন শিক্ষা জড়িয়ে পড়ে তখন তার নিজস্ব নীতি এবং লক্ষ্য বিপন্ন হতে বাধ্য। এই বিপদ আজ অত্যন্ত স্পষ্ট বলেই এ বিষয়ে খানিকটা তলিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সম্বন্ধে কোনো সরল চিত্রই আজ আর সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিক্ষাবিষয়ক আলোচনায় কখনও কখনও শোনা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হল বিদ্যা নামক একটি দ্রব্যের উৎপাদন, মান নির্ধারণ এবং পরিবেশন। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশেষ ধরনের বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তুল্য। পরন্তু এটা এমন এক প্রতিষ্ঠান যাতে সরকারী অনুদানের পরিমাণ বেশ বড়। এর পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যে-প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের অর্থের একটা বিরাট পরিমাণ এইভাবে নিয়োগ করা হয়েছে তাতে অর্থের অপচয় বন্ধ করবার দায়িত্ব কি সরকারের নেই? আন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যেমন উৎপাদনের মান রক্ষার জন্য নানা রকম আইনকানুন হয়, উৎপাদনকর্মে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের জন্য নানা রকম আচরণবিধি প্রণয়ন করা হয়, জনসাধারণ যাতে বেআইনীভাবে বঞ্চিত না হয় সেজন্য সাবধানী ব্যবস্থা গৃহীত হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কি সেই রকম ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই?

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, শুধু হ্যাঁ অথবা না বলে এই সব প্রশ্নের যথেষ্ট

উত্তর হয় না। একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাধারণ ব্যবসায়কেন্দ্র নয়, বিদ্যা পণ্যদ্রব্য মাত্র নয়, ছাত্র ও অধ্যাপকের ভিতর এমন একটা সম্পর্ক থাকে যার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব কথাই ঠিক ; তবু জনসাধারণ এটাও জানে যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে এযুগে অনেকটা ব্যবসায়কেন্দ্রের মতো ব্যবহার করা হয়েছে, আজকের শিক্ষকেরা ব্যবসায়বুদ্ধি থেকে মুক্ত নন এবং তার কারণও আছে।

এর পরও বলা হবে যে,শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ম বা আচরণবিধি যদিও প্রয়োজন তবু সেই সব বিধি অধ্যাপকেরা নিজেরা প্রণয়ন করলে তবেই সেটা ভালো। বিধিপ্রণয়নের এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। এতেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। গণতন্ত্রের নিয়ম এই যে, কোনো বিষয়ের সঙ্গে যাঁদের স্বার্থ জড়িত তাঁদের সবাইকে যথাসম্ভব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় যে কাজে নিযুক্ত তার সঙ্গে অধ্যাপক, ছাত্র, কর্মী, অভিভাবক সকলেরই স্বার্থ নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা রীতিনীতি প্রণয়নের ব্যাপারে এঁদের সবাইকে যুক্ত করে নিতে পারলেই পদ্ধতিটা গণতান্ত্রিক বলা যায়। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেও কিছু সীমারেখার ভিতর কার্যকরী করা আবশ্যক হয়। অধ্যক্ষ অথবা অধ্যাপক যদি ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত হন তবেই কি শিক্ষার ধর্মরক্ষা হবে ? এ প্রশ্নের কোনো সরল উত্তর নেই। আরও একটা কথা আছে। শিক্ষায়তনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায়টা এমন হওয়া দরকার যাতে পদ্ধতির জটিলতায় ও দীর্ঘসূত্রতায় অথবা দলীয় কলহে সব কাজ বার বার আটকে না যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আচরণবিধি কী রকম হবে এই মৌল সিদ্ধান্তের সঙ্গে অভিভাবক অথবা জনসাধারণের শিক্ষিত প্রতিনিধিদের যুক্ত না করবার কোনো গণতান্ত্রিক কারণ নেই। তবে সেই সব বিধির দিনানুদৈনিক প্রয়োগের পদ্ধতিটা অপেক্ষাকৃত সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছু দায়িত্ব আছে যা বিশেষ ব্যক্তির হাতে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ছেড়ে না দিলে কোনো কাজই এগোয় না।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় অধ্যাপক ও কর্মচারীদের যুক্ত করবার দাবি যত জোরের সঙ্গে ও বারেবারে শোনা যায় অভিভাবকদের সমভাবে যুক্ত করবার দাবি তেমন শোনা যায় না, এর একটা সহজ কারণ আছে। সেই কারণের সঙ্গে শিক্ষার প্রকৃতির ততটা সম্পর্ক নেই যতটা আছে সংগঠনশক্তির। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের সহজে সংগঠন করা যায়, অধ্যাপকদের তো বটেই। অভিভাবকেরা ছড়িয়ে থাকেন নানা স্থানে নিজ নিজ জীবিকার প্রয়োজনে, তাঁদের একত্র করা কঠিন। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের তাঁরাও ভুক্তভোগী। অধ্যাপকেরা সমাজের জন্য যে-সেবার কাজ করেন তারই ভিত্তিতে সমাজের কাছ থেকে তাঁরা কিছু প্রতিদান চাইতে পারেন, সেটাই তাঁদের সমস্ত দাবির নৈতিক ভিত্তি। অভিভাবকদের বাদ দিয়ে কিন্তু এই সেবার যথার্থ বিচার ও মূল্যায়ন সম্ভব নয়। অভিনয়ের বিচারক অভিনেতা একা নন, দর্শকও বটে। পাঠককে বাদ দিয়ে লেখকের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষাদান করেন যদিও শিক্ষক, তার বিচারক শিক্ষক একা হতে পারেন না ; ছাত্র অভিভাবক ও সাধারণভাবে শিক্ষিতসমাজের অভিমত তুচ্ছ করবার মতো নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বায়ত্বশাসনের নামে অধ্যাপক ও কর্মচারীরা যদি এমন অধিকার দাবি করেন যে, তাঁদের দোষগুণের বিচারক হবেন শুধু তাঁরাই, তবে সেটাকে অন্যায় দাবি বলা ছাড়া উপায় থাকবে না। শিক্ষা ও শিক্ষকের মূল্য নির্ধারণে বৃহত্তর সমাজের একটা ন্যায্য স্থান অস্বীকার করা যায় না।

এইবার দলীয় রাজনীতির কিছু প্রবক্তা হয়তো উৎসাহিত হয়ে বলবেন, তাহলে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণে আপত্তি কোথায়? সরকার তো বৃহত্তর সমাজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। কথাটা সাবধানে বিচার করবার যোগ্য। সমাজ ও সরকারকে সমার্থক মনে করা ভুল। যেমন কোনো একটা ব্যাপক অর্থে সমাজই সাহিত্যের বিচারক. কিন্তু সেই কারণেই যদি সাহিত্যের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণকে আমরা বিনাপ্রশ্নে মেনে নিই তবে সেটা হবে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রতি শত্রুতা। দলীয় রাজনীতির সৃষ্ট যে সরকার, তার কর্তৃত্বের যেমন একটা সাময়িক সীমা আছে তেমনই তার যোগ্যতা ও নৈতিক অধিকারেরও একটা সীমা মেনে না নিলে সমাজের পক্ষে সেটা হয়ে ওঠে বিপজ্জনক। মন্ত্রী মাত্রই কোনো একটা অর্থে জনতার প্রতিনিধি। একটা নির্ধারিত সময়ের জন্য শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ও অধিকার তাঁর আছে। কিন্তু রাজার অধিকারের যেমন একটা নৈতিক সীমা আছে, যেটা মেনে না নিলে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বৈরাচার, সরকারের অধিকারের বেলাতেও একই কথা সত্য। গণতান্ত্রিক সমাজ এই রকম একটা সচেতনতা দিয়ে চালিত হয়। রাষ্ট্রের অধিকার সম্বন্ধে এই সীমাবোধ লোপ পেলে স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, জন্ম হয় স্বৈরাচারী সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের।

শাসন পরিচালনার যেমন একটা দিক আছে যেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, অবিলম্বে কর্ম সম্পন্ন করতে হয়, তেমনি আবার মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অন্য একটা দিক আছে যেখানে পরিবর্তন ঘটে ধীরে, সময়ের নিজস্ব নিয়মে। শাসকের সিদ্ধান্ত স্থানে কালে আবদ্ধ, দ্ব্যর্থহীন ও একমুখী। সময়ের বিচার অর্থের বৈচিত্র্যে চিহ্নিত, যেমন একই কবিতা অথবা মন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অর্থ। নানা বিপরীতের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে বৃহৎ সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবন এগিয়ে চলে। এই বহুত্বের ভিতর ঐক্যবিধানের শেষ দায়িত্ব যে সময়েরই হাতে, রাষ্ট্রনায়কের হাতে নয়, এই রকম একটা চেতনা সুস্থ সমাজের পক্ষে প্রয়োজন। মানুষের যে মননশীলতা অনেকান্তমুখী তাকে ঔদার্যের সঙ্গে লালন করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রধান কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্যই আবার প্রয়োজন শাসকদের দলীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা।

সরকার বিদেশীই হোক আর স্বদেশীই হোক, রাজনীতির ধর্ম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বধর্ম এক বস্তু নয়। রাজনীতি প্রধানত সাময়িক উদ্দেশ্য দিয়ে চালিত, ক্ষমতা রক্ষার কৌশল নিয়ে ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা সময়ের অন্য এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যকে রাজনীতির সঙ্গে আবদ্ধ করলে তাকে পরধর্ম আচরণে বাধ্য করা হয়। আজ এ কথা স্পষ্ট।

২

বিদ্যার একটা ব্যবহারিক দিক আছে। আবার যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ এই যে, সে ভয় থেকে মুক্তি দেয়। সার্থক শিক্ষায় জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজনকে কোনো এক স্তরে স্বীকার করেও অন্য এক স্তরে তাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। এই স্বীকৃতি ও অতিক্রম, সতর্ক অথচ গ্রহিষ্ণু বুদ্ধির সঙ্গে দুয়েরই বিচার বিবেচনা আবশ্যক।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা দিয়ে আলোচনার এই অধ্যায়টি শুরু করা যাক। বিজ্ঞান আমাদের আজও ভয় থেকে মুক্তি দেয়নি। বিজ্ঞানের শক্তি আমরা কিছু কিছু চারপাশে দেখি বটে। বিজ্ঞানের বলে কত কিছু ঘটছে, পাহাড় কেটে পথ তৈরি

হচ্ছে, মরুভূমির মাঝখানে নগরের দর্শন পাওয়া যাচ্ছে, মানুষের বুকের মাঝে নতুন হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে অথবা মানুষ চাঁদের পথে যাত্রা করছে, এই সব আমরা দেখছি এবং শুনছি। আমরা বিজ্ঞান পাঠ করছি স্কুলে কলেজে, কাজ চলছে গবেষণাগারে। তবু বিজ্ঞানের ওপর আমাদের আস্থা দুর্বল। পরিবেশ সম্বন্ধে আমাদের মনের গভীরে একটা অন্ধ ভয় এখনও প্রবল। এর অনেক কারণের ভিতর একটা নিশ্চয়ই এই যে, এদেশের জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শক্তি এখনও ব্যাপক হয়ে প্রবেশ করেনি, বরং অনেকটা ওপর তলায় আবদ্ধ আছে। এদেশের যে অগণিত মানুষ দরিদ্র এবং গ্রামবাসী, তাদের অভাব দূর করবার কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

শিল্পোন্নত দেশ থেকে যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমরা আহরণ করি দেশের উপযোগী করে তার প্রয়োগ কিছুই যে হয় না এমন নয়, কিন্তু যতটুকু হয় সেটা মোটেই যথেষ্ট নয়। এদেশে যে প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল আধুনিক দৃষ্টিতে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হয়তো দুর্বল ; কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে তার একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল। হাতের কাছে যে সব বনৌষধি এবং অন্যান্য উপাদান ছড়িয়ে আছে সেই সব ব্যবহার করে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা তাতে হত। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের যোগ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই চিকিৎসাবিদ্যারই ব্যবস্থা হয়েছে। এই চিকিৎসকেরা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অনেকখানি পরিচিত। কিন্তু যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহারে তাঁরা নিপুণ, বড় হাসপাতালের বাইরে সে সব সহজে পাওয়া যায় না ; যে সব ঔষধের ওপর তাঁরা নির্ভরশীল সে সব অনেকটাই দুষ্প্রাপ্য বড় শহরের বাইরে। ফলে এদেশের আধুনিক ডাক্তারেরা বিদেশে আদৃত, কিন্তু এদেশের গ্রামে তাঁরা অসহায়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এখনও বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যাকে এদেশের উপযোগী করে তুলবার কাজে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

বিজ্ঞানকে পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করা আজ আমাদের বিদ্যালয়ে ও উচ্চশিক্ষায় একটা প্রধান কর্তব্য। পরিবেশ বলতে যে শুধু নাগরিক পরিপার্শ্ব বোঝায় না, বরং পল্লীই আমাদের অধিকাংশ দেশবাসীর স্বাভাবিক পরিবেশ, একথাটা সহজ সত্য হলেও আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও তার স্বীকৃতি পরিস্ফুট নয়। অথচ এই শতকের প্রথম দিকেই পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিবেশের যোগসাধনের কথা মর্মস্পর্শী ভাবে বলে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সরকারী নীতিতে ও গবেষণা পরিকল্পনায় পরিবেশ বিজ্ঞানের উল্লেখ বাড়ছে। বোঝা যাচ্ছে যে, ভবিষ্যতে এর গুরুত্ব আরও বেশী করে স্বীকৃত হবে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে কিন্তু পরিবেশবিজ্ঞানের প্রবেশ এখনও কুণ্ঠিত। সেখানে শিক্ষা ও পরীক্ষার উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আমরা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভাগ করেছি, দেয়াল গেঁথে এদের স্বতন্ত্র করা হয়েছে। প্রাণতত্ত্ব ও পরিবেশবিজ্ঞানকে নিয়ে যখন জ্ঞানের ধারাকে নবদিগন্তের সন্ধানে প্রসারিত করবার দিন এসেছে তখন ঐ পুরোনো দেয়ালগুলি নতুন প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে যোগের সাধনাটাই মুখ্য। সাংসারিক স্বার্থে দেখি আমাদের সাবধানী বৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধু সেটাকে অবলম্বন করে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সারা বিশ্বের জন্য একটা উদার আমন্ত্রণের সুর যদি প্রধান হয়ে বাজে তবেই বিশ্ববিদ্যালয় নামটি সার্থক হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীর উদ্বোধন করেন তখন এই আদর্শটি নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পেয়েছিল। আজ দিকে দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সেই আদর্শের পরাভবের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। দেয়াল তুলে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ব

থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। কোনো কোনো উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পাণ্ডিত্যের বিচারের চেয়ে জাতের বিচার বড় হয়ে উঠেছে। যেখানে তা নয় সেখানেও আঞ্চলিকতার বেড়া লঙ্ঘন করা কঠিন। সর্বত্রই দাবি যে, ভেতর থেকে লোক নিতে হবে। মনুষ্যত্বের যে দাবিতে ভেতর আর বাইরের ব্যবধান নগণ্য হয়ে যায় তাকে আমরা মানতে চাইছি না। এই বিচ্ছিন্নতামুখী দাবির সপক্ষেও বলবার কথা নিশ্চয়ই কিছু আছে। তবু মূল প্রশ্নটি থেকেই যায়। অন্যসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পার্থক্য থাকা আবশ্যক। আঞ্চলিকতার দাবি অন্যত্র সঙ্গত হতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলভাবের সঙ্গে এই সব ভেদাভেদ মেলানো যায় না। এই বৃহৎ সমাজে আমরা কি এমন একটি ক্ষেত্রও অন্তত রক্ষা করতে চাইব না, যেখানে জ্ঞান হবে মুক্ত, যেখানে মানুষের বিচার হবে একান্তভাবে তার সত্যকামতা দিয়ে ? এটাই প্রধান প্রশ্ন। এর যদি কোনো সদর্থক উত্তর না থাকে তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেরও কোনো অর্থ থাকে না। সাংসারিক স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই প্রাচীন ও উদার আদর্শকে আমরা যে-পরিমাণে খর্ব করতে উদ্যত হই সেই পরিমাণে ইতিহাসের কাছে নিজেদের অপরাধী করে তুলি।

এর পরও একটা সাবধানী বাক্য যোগ করা প্রয়োজন। খণ্ড স্বার্থ যেখানে আমাদের বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের সঙ্গে তার বিরোধ। তা নইলে নীড়ের সঙ্গে বিশ্বের বিরোধের কোনো প্রশ্ন নেই। জ্ঞানের চর্চায় অথবা গবেষণায় নিকট পরিবেশের প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টি অথবা আগ্রহ যেমন স্বাভাবিক তেমনই আবশ্যক। নিকটের ভিতর দিয়েই আমরা দূরকেও ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে শিখি। খণ্ডকে উপেক্ষা করে নয় বরং খণ্ডের বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টাতেই আমরা অখণ্ড সত্যের আভাস পাই। বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে উচ্চশিক্ষার একটা মূল পার্থক্য এখানেই। বিশেষ একটি বৃত্তিতে পটুত্ব অর্জনই বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যে। উচ্চশিক্ষায় কিন্তু সেটাই আমাদের শেষ লক্ষ্য নয় ; বিশেষের ভিতর দিয়ে সাধারণ সত্যে গিয়ে পৌঁছনটাই লক্ষ্য।

উচ্চশিক্ষাকে রোজগার অথবা জীবিকার উপযোগী করে তুলবার একটা দাবি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। জীবিকার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত এবং অত্যন্ত জরুরী। কোনো এক কালে সনাতন সমাজব্যবস্থায় পুত্র স্বাভাবিকভাবে পিতার কাছ থেকে পারিবারিক বৃত্তিতে দীক্ষিত হত। এখনও অনেক কৃষকের ছেলে এমনি ভাবেই কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করে, যেমন মায়ের কাছ থেকে মেয়েরা গৃহকর্মে নৈপুণ্য লাভ করে। কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সেই সনাতন ব্যবস্থা আর কালোপযোগী নয়। গৃহ যদিও সন্তানের শিক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র তবু গৃহ এবং শিক্ষায়তনের ভিতর দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নতুন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা এদেশে এখনও দুর্বল, এজন্য আরো সুনিশ্চিত ও ব্যাপক আয়োজন আবশ্যক। অষ্টম শ্রেণীর পর থেকেই কিছু ছাত্রছাত্রীর জন্য এই ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়।

একথাটা মেনে নেওয়াই ভালো যে, নিছক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অথবা জীবিকার জন্য শিক্ষা এক বস্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চা ভিন্ন বস্তু। এ দুয়ের লক্ষ্য এক নয়, একের দ্বারা অন্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দুয়ের ভিতর একটা সম্পর্ক আছে বটে ; কিন্তু দুটোকে এক করতে গেলে অনেক সময় দুয়েরই ক্ষতির সম্ভাবনা। অধ্যাপক ও গবেষকের কাজের জন্য বিশেষভাবে যে-ধরনের অভ্যাস ও নৈপুণ্য প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে তারই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও অবশ্য আছে যাকে বলা যেতে পারে আধা-বিশ্ববিদ্যালয় আধা-প্রশিক্ষণভবন। প্রশিক্ষণের উচ্চনীচ বিভিন্ন স্তর আছে। উচ্চতর

প্রশিক্ষণের গৌরব কম নয়। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে যে-ভাবটি রক্ষা করা আবশ্যক সেটি স্বতন্ত্র। নিছক বৃত্তিমূলক কাজের জন্য যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তার যোগ্যতম স্থান বিশ্ববিদ্যালয় নয়। সৈনিক তৈরি করার জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। কারিগর কর্মচারী অথবা প্রশাসক তৈরি করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সুপরিকল্পিত ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা সম্ভব এমনকি বাঞ্ছনীয়। সরকারী ও বেসরকারী নিয়োগনীতিতে একথাটা পরিষ্কার করে দিতে পারলেই ভালো হয় যে, এসব কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে অন্য কাজে যাঁরা নিযুক্ত থাকবেন তাঁরাও পরে কখনও তাঁদের সময়, সুবিধা ও রুচি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যাতে আবার যোগসাধন করতে পারেন, সেই পথ খোলা থাকা বাঞ্ছনীয়। জীবনের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আমাদের নাগরিকেরা যেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরিণত বুদ্ধি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নানাভাবে ফিরে আসতে পারেন সেই সুযোগ যথাসম্ভব বাড়াতে হবে। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন ঘটা উচিত সরকারী অথবা বেসরকারী কাজে পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষায় নয়, বরং মূলত বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে সংযোগ সাধনেরই আগ্রহে।

কথাটা এবার অন্যভাবে বলা যাক। সরকারী শাসনক্ষেত্রে চাকরির জন্য বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের ভিতর একটা দ্বন্দ্ব চলছে এদেশে বহুকাল থেকে। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে পুঁজি করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে যায়। ক্রমে মুসলমানদের ভিতরও ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। হিন্দু ও মুসলমান নতুন মধ্যবিত্তের ভিতর সরকারী চাকরির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দ্বন্দ্ব তখন প্রবল হয়ে ওঠে। দেশ স্বাধীন হবার পর কলেজী শিক্ষা হিন্দু উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণের ভিতর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে সরকারী চাকরি নিয়ে দ্বন্দ্বটাও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন বর্ণের ভিতর। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণের ছাত্রদের ভর্তির প্রশ্ন নিয়ে যে সংঘর্ষ বিশেষত উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে তার সামাজিক ও রাজনীতিক পটভূমিকা এই দিক থেকে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। উচ্চশিক্ষাকে এই দ্বন্দ্বের বাইরে যতটা রাখা যায় ততটাই ভালো। সেটা কী ভাবে করা যায়? উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই ছাত্র বাছাই করে নিয়ে সরকারী চাকরিতে নিয়োগের জন্য আলাদা দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সঙ্গে প্রশাসনিক পদের যোগটা ঐতিহাসিক, কিন্তু সেই পুরোনো ব্যবস্থা আজও সমানভাবে রাখতে হবে কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল দায়িত্ব ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যার প্রতি আগ্রহ এখানে মূল কথা। গবেষণা ও স্বাধীন আলোচনার ভিতর দিয়ে পরীক্ষিত জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত করা, বিদ্যা বিতরণ করা, এইসবই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ। সাহিত্যে হোক, দর্শনে হোক অথবা বিজ্ঞানে হোক, অধ্যাপনা ও গবেষণায় প্রবেশাধিকারের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর অভিজ্ঞানপত্র অর্থবহ। এই ধারণাটা যদি আমরা কাজে পরিণত করতে পারি তবেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী চাকরির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে তার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে। চাকরির জন্য তালিম দেওয়া নয়, বিশ্ববিদ্যার ক্রমপ্রসারিত সীমানার সঙ্গে যোগরক্ষা এবং তদনুযায়ী বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার মান রক্ষা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব।

৩

ভাষা শিক্ষার প্রশ্ন নিয়ে ইদানীং অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষার অতিরিক্ত আরও দুয়েকটি ভাষা শিখে থাকে। ইংরেজীভাষা দেশের বাইরেও অনেক দেশেই আজ ইংরেজীর চর্চা হচ্ছে। পোল্যাণ্ডের নিকটতম দেশ যদিও সোভিয়েত যুক্তরাজ্য তবু রুশভাষার চেয়েও ইংরেজীর প্রতি ওদেশের ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ বেশী। জাপানেও তাই। ভারত যদি কখনও ব্রিটিশ শাসনে না থাকতো তবু আজ মাতৃভাষার পরে ইংরেজীর চর্চাই প্রাধান্য পেত এমন অনুমান করা যায়। ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদীদের চাপানো ভাষা, এই যুক্তিটা তা হলে অবান্তর হত। আসলে ওটা পুরোপুরি যুক্তি নয়। ভাষাবিশেষকে সাম্রাজ্যবাদী নাম দেওয়া ঠিক নয়, সেটা ইংরেজী অথবা ফরাসী, রুশ অথবা জাপানী, যে ভাষাই হোক না কেন। বাস্তব ঘটনা এই যে, ইংরেজী আজকের পৃথিবীতে নানা কারণে যতটা ব্যাপ্তি লাভ করেছে অন্য কোনো ভাষা ততটা করেনি। বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে যোগ রক্ষা করবার পক্ষে ইংরেজী আজ বিশেষ সহায়ক বলেই চীন ও সোভিয়েত দেশ সহ পৃথিবীর বহু দেশেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজী একটা বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

ভারতের অবস্থা অবশ্য সর্বাংশে অন্য দেশের মতো নয়। ঐতিহাসিক কারণে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার একটা ভিত্তি আগে থেকেই আছে। ইংরেজ চলে যাবার পরও সেটা অনেক পরিমাণে থেকে গেছে, যেমন থেকে গেছে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের আরও অনেক কিছু। এর বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াটি বোঝা সহজ, কিন্তু বামপন্থী প্রতিক্রিয়া সমান সরব। একথা ঠিক, ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করে এদেশে গত দেড়শ' বছর ধরে একটা বাবু শ্রেণী গড়ে উঠছে। আমরা যারা শিক্ষিত তারা প্রায় সবাই এর অন্তর্গত। আত্মসমালোচনা ভালো, কিন্তু এই সামাজিক আত্মসমালোচনার শক্তিও অনেক পরিমাণে আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহ্য থেকে লাভ করেছি। ইংরেজী ভাষা এদেশ থেকে তুলে দিলেই বাবু শ্রেণী উঠে যাবে এমন সম্ভাবনা কম, বরং অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল গোষ্ঠী এতে আরও শক্তিশালী হবে এমন আশংকাও আছে।

যাই হোক, শিক্ষার দিক থেকে মূল প্রশ্নটা এই। মাতৃভাষার চর্চা আরও বেশী করে হওয়া উচিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মাতৃভাষার সঙ্গে যদি আরও একটি ভাষা যোগ করতে হয়, যাকে আমরা বলব বৃহত্তর যোগাযোগের ভাষা, তবে সেটি কোন ভাষা হবে? একটা ত্রিভাষাসূত্রের কথা আমরা জানি; অহিন্দীভাষীদের জন্য মাতৃভাষা, হিন্দী ও ইংরেজী নিয়ে সেই সূত্র। শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া ভালো। কিন্তু আরও একটি অথবা দুটি ভাষা ছাত্রছাত্রীরা শিখবে। এই রকমই অন্তত গত বিশ পঁচিশ বছর ধরে আমরা চিন্তা করে এসেছি। এটাকে অবাস্তব অথবা ভ্রান্ত চিন্তা বলে সম্পূর্ণ ত্যাগ করবার যথেষ্ট কারণ বোধ করি দেখা দেয়নি।

মুশকিল একটা দেখা দিয়েছে অবশ্য। সেটা এই যে, ভাষাশিক্ষা ব্যাপারটাই অবহেলিত। শুধু ইংরেজী নয়, মাতৃভাষাও ছাত্রছাত্রীরা ভালোভাবে শিখছে না। ভাষাশিক্ষার মান কী করে উন্নত করা যায় সেটাই আমাদের চিন্তার ব্যাপার হওয়া উচিত। আমরা তা করছি না। আমরা ভাষাশিক্ষার মান জেনেশুনে আরও নামিয়ে দিচ্ছি। এখন এমন অবস্থায় পৌঁছন গেছে যে, পাঠ্যবিষয়ের ভিতর ভাষা থাকবে বটে, তবে ঐ বিষয়টিতে পাশ না করলেও চলবে। এটা শিক্ষাবিরোধী নীতি। ভাষা জিনিসটা শ্রদ্ধার

সঙ্গে শিখতে হয়। ভাষার ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি বিকশিত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষার অসম্মান সংস্কৃতির অমর্যাদার সমতুল্য। ভাষা একটা আছে বটে, কিন্তু ওটাতে পাশ না করলেও চলবে, একথা বললে ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রথম থেকেই ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।

এদেশে আরও অনেক বছর পর্যন্ত প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষেই অনেক ছাত্রছাত্রীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হবে। এদের অনেকের পক্ষে একটির বেশী ভাষা ভালো করে শেখা সম্ভব হবে না। উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে যারা পৌঁছবে তাদের পক্ষে অন্তত আরও একটি ভাষা ভালো করে শেখা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। তিনটি ভাষায় সমান দক্ষতা অর্জন অনেকের পক্ষে কঠিন, কাজেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজীর চর্চাই, অন্তত উচ্চশিক্ষার বিচারে, অধিক ফলপ্রদ হবার সম্ভাবনা। বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগটাই যদি লক্ষ্য হয় তবে বাংলার সঙ্গে হিন্দী যোগ করে যতটা ফল লাভ করা যাবে বাংলার সঙ্গে ইংরেজী যোগ করে তার চেয়ে ফল পাওয়া যাবে বেশী।

যাই হোক, এসব ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষায়তনকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়াই ভালো। প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক কোন স্তরে কোন ভাষায় শিক্ষা শুরু হবে, এ নিয়ে অনেক তর্ক হয়েছে। আপাতত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে কিছু বৈচিত্র্য রক্ষা করে ভাষানির্বাচনের ব্যাপারে অভিভাবকদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া যেতে পারে। মাতৃভাষা সহ ভাষাশিক্ষার মান উন্নয়নের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে জরুরী। সরকার যদি সেদিকে আরো বেশী করে দৃষ্টি দেন তবেই সেটাকে সবাই একটা সদর্থক প্রচেষ্টা বলে মেনে নেবে। ভাষাশিক্ষার অনেক নতুন পদ্ধতি দেশ ও বিদেশে সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত হয়েছে। আমাদের স্কুলে ও কলেজে তার সার্থক প্রয়োগের যথেষ্ট আয়োজন নেই। এটা একটা বড় অভাব যেটা সরকারী সহায়তা ছাড়া দূর করা যাবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকারের তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। এখানেই আমাদের ভাষাশিক্ষানীতিরও বিষম ব্যর্থতা।

৪

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা হয়নি, যেমন হয়েছে আধুনিককালে। যদিও এর কারণ আছে তবুও এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি গুরুতর। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের শুধু চরিত্রগঠন হবে তাই নয়, তারা এই বিশ্ব থেকে আনন্দ সংগ্রহ করতে শিখবে। এরই ভিতর দিয়ে ঘটবে মনুষ্যত্বের বর্ধন। জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্বেষণ এবং আত্মপ্রকাশের শক্তি মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় সহায়ক বলে মূল্যবান। আমাদের বহু খণ্ডে খণ্ডিত উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার বাজারমূল্য যাই হোক না কেন, এর সঙ্গে মনুষ্যত্বের যোগ দুর্বল। এই দিক থেকে এর পুনর্বিচার প্রয়োজন।

আমাদের পাঠক্রমে নীতিশিক্ষার স্থান নেই। এই রকম একটা অভিযোগ কখনও কখনও শোনা যায়। প্রাচীনকালে এই অভাবটা পূর্ণ হত ধর্মশিক্ষার ভিতর দিয়ে। এখন সেটা হয় না। কোনো কোনো দেশে ধর্মের স্থান নিয়েছেআইডিওলজি। কিছুদিন আগে চীনে গিয়েছিলাম। ওখানে পাঠক্রমের অনেকটা স্থান অধিকার করে আছে

মার্কসবাদ-মাওবাদ। এরই ভিতর দিয়ে ওদেশের ছাত্রছাত্রীরা শুধু একটা বিশ্বদর্শন লাভ করে তাই নয়, দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা এইসব শিক্ষাও একই সঙ্গে হয়। তবু চীনের দেশপ্রেমে একটা সংকীর্ণতা আছে। চিন্তার স্বাধীনতা ওদেশে শৃঙ্খলিত : আমাদের রাষ্ট্র ঐ রকম ধরাবাঁধা মতবাদে বিশ্বাসী নয়। আমাদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বা মতাদর্শ কোনোটিরই স্থান নেই। অনেকেই মনে করেন যে, আমাদের স্কুলে কলেজে নীতিশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা রাখা আদৌ সম্ভব নয়। ছাত্রছাত্রীরা নীতির নামে কোনো উপদেশ শুনতেও চাইবে না। তবু প্রশ্ন থেকে যায়। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনে নানা নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় অনিবার্যভাবে। জীবনেরই প্রয়োজনে চরিত্রেরও প্রয়োজন। অতএব নীতিশিক্ষা আবশ্যক। জীবন থেকে আহৃত নানা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ করে নৈতিক সমস্যার আলোচনায় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ থাকবে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখবার যোগ্য বিষয়।

আসল বাধাটা অন্যত্র। মামুলী নীতিশিক্ষায় বিশেষ ফল নেই। আমরা অনেকেই নীতিশিক্ষা দেবার অধিকারী নই। সেই অধিকার অর্জন করা সহজ নয়। তবু একটা কথা না বললে শিক্ষা নিয়ে আলোচনা নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকে। মাতৃত্বের যেমন বিদ্যালয়েরও তেমনি একটা আদর্শ রূপ আছে। শিক্ষকের সমস্ত অক্ষমতা নিয়েও সেই কথাটা বারবার স্মরণ করা কর্তব্য। যে-দুটি প্রধান উপাদানে বিদ্যালয়ের আদর্শ গঠিত তার একটির নাম অনুশীলন, অন্যটি আনন্দ। বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুরুত্ব বেশী।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, আমাদের বিদ্যালয় নিরানন্দ। শান্তিনিকেতনে তিনি শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগসাধন করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধিত না হলে শিক্ষা ব্যর্থ কারণ জীবনের মূল লক্ষ আনন্দ। যে-শিক্ষা আমাদের আনন্দের শক্তি দেয় না সে শিক্ষা আমাদের জীবনকে অর্থময় করে না। এই আনন্দের মূল কথা আমাদের মনকে বৃহত্তর কিছুর সঙ্গে যুক্ত করা। শান্তিনিকেতন ছাত্রছাত্রীর মনকে একদিকে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সুরের ঐক্যে মিলিয়েছে, অন্যদিকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিমে প্রসারিত বৃহৎ মানবিক আতিথ্যের একটা আদর্শ তুলে ধরেছে।

এই আনন্দের তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনের যোগ না হলে বিদ্যালয়ের আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে না। সত্য যে কঠিন। এই বিশ্ব যে-নিয়মে বাঁধা তাকে বিজ্ঞানের ভিতর দিয়েই হোক, আর শিল্পের অথবা চারিত্র্যের ভিতর দিয়েই হোক, কঠিন অনুশীলন ছাড়া লাভ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজে নিরলস পরিশ্রমের বিরল উদাহরণ। অনুশীলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সত্যকে পাওয়া যায় না, আনন্দকেও নয়। সহজে লভ্য সাময়িক আরামের জন্য তো বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। যে-আনন্দ জীবনের বহু ক্ষয় ক্ষতি থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারে, বহু ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও প্রাণশক্তিকে অপরাজিত রাখতে পারে, বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে আমাদের অবিচলিত রাখে, তাকে লাভ করবার জন্যই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতীর এক সভাতে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে প্রাক্তন ছাত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তরুণ বয়সে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি যা পেয়েছিলেন তার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, বাইরে যখন উত্তেজনা, আন্দোলন ও কর্মব্যস্ততার ঝড় তখনও মনের গহনে কী করে একটি নিভৃত শান্তির আশ্রয় রক্ষা করা যায়, শান্তিনিকেতন তাঁকে

সেই শিক্ষা দিয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে আজ অনুশীলন ও আনন্দ দুয়েরই অভাব। অথচ এই দুই আপাতবিরোধী তত্ত্বের ভিতর সমন্বয়ের প্রচেষ্টাতেই বিদ্যালয়ের সার্থকতা। শিক্ষার যদি কোনো নীতি থাকে, কোনো ধর্ম থাকে, তবে এই সমন্বয়ই তার সর্বোচ্চ নীতি ও ধর্ম। পূর্ণতা অবশ্য অপ্রাপণীয়। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কী করে কিছু নিয়মিত অনুশীলন এবং কিছু আনন্দের উপকরণ রক্ষা করা যায়, এটা এমনই একটা মৌল প্রশ্ন যাকে কোনো মতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। আমাদের অবস্থা যতই দীন হোক, পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক, তারই ভিতর এই সমন্বয়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

অনুশীলনের সঙ্গে বিনয়ের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। বিনয়কে বলা হয়েছে বিদ্যার ভূষণ। সেই উদ্ধৃতিটির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত যেখানে সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলছেন যে, জ্ঞানসমুদ্রের ধারে তিনি শুধু নুড়ি কুড়োচ্ছেন। আমাদের আহৃত জ্ঞানের তুলনায় অনাবিষ্কৃত রহস্যময় বিশ্ব যে কত বড় তারই আভাস দেওয়া হয়েছে ঐ উপমার ভিতর দিয়ে। তবু উপমাটি যেন বড় স্থাণু, বড় চিত্রার্পিত। নিউটনের বক্তব্যের গভীরে নিহিত একটা গতিময়তা আছে যেটা স্পষ্ট করা দরকার। মানুষের জ্ঞান স্বল্প কিন্তু সে দাঁড়িয়ে নেই, সে চলমান। জ্ঞান যে মানুষের কাছে লভ্য এই ধারণা থেকে আমাদের আত্মবিশ্বাস আসে। আবার আমাদের জ্ঞান যে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ, তার যে নিরন্তর সংশোধনের প্রয়োজন আছে, এই বোধের ভিতর দিয়ে আসে বিনয়। বিদ্যার্থীর পক্ষে এই আত্মবিশ্বাস ও বিনয় দুই-ই আবশ্যক। বিনয় ছাড়া আহৃত বিদ্যার সংশোধন সম্ভব নয়।

এই বিনয়ের সঙ্গে দৃঢ়তার কোনো বিরোধ নেই। যে-মানুষ কোনো কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে জানে না, সুযোগের সন্ধানে অথবা স্তাবকতার বশে সর্বত্র মাথা নত করে, তাকে বিনয়ী বলা যায় না। বিনয় যদি বিদ্যার ভূষণ হয় তবে তার মূলে সত্যের প্রতি একটা সদাগ্রহ থাকে। বিজ্ঞানের সত্য সর্বক্ষণই নতুন তথ্য ও যুক্তির আলোতে নিজেকে সংশোধন করতে আগ্রহী। এই সত্যাগ্রহই বিদ্যার ক্ষেত্রে বিনয়ের রূপে দেখা দেয়। কোনো মতাদর্শ যখন এই বিনয় থেকে ভ্রষ্ট হয় তখনই সেটা সত্যের পথে একটা বিষম বাধা হয়ে দেখা দেয়।

আধুনিক জগতে বিজ্ঞান বলে যে-জিনিসটাকে আমরা জানি সেটা যে ক্রমাগতই বিবর্তিত হয়ে চলেছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরও আজকের আবিষ্কার যে কাল অংশত ভ্রান্ত প্রমাণিত হবেই, এ কথাটা বিশেষত গত কয়েক শ' বছরের ভিতর দিয়ে এমনই স্পষ্ট প্রমাণিত যে, কোনো পণ্ডিত যদি আজ তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে অভ্রান্ততা দাবি করেন তবে বিনা দ্বিধায় তাঁকে আমরা অবৈজ্ঞানিক বলে চিনে নিতে পারি। আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে এই কথাটা আরো একভাবে সত্য। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন যে, সত্যকে বারবার আবিষ্কার করতে হয়, তখন সেই সূক্ষ্ম বোধেব কথাই তার উক্তির মূলে ছিল। আমাদের জীবনের মহত্তম বোধও মৃত শীতল শব্দমাত্রে পরিণত হয়, যদি-না জগতের নিত্য নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত করে বহু ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে বারবার হারিয়ে তাকে আমরা নতুন করে ফিরে ফিরে পাই। বিনয় আমাদের শেখায় যে, সত্যকে একটা স্থায়ী সম্পত্তির মতো লাভ করা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের আরো একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। বিদ্যা ও সংস্কৃতির অনেকখানিই বিশ্ববিদ্যালয়ের চার দেয়ালের বাইরের উন্মুক্ত সমাজের ফসল। সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে ; অধ্যাপকেরা প্রধানত ভাষ্যকার মাত্র। প্রযুক্তিবিদ্যার অনেকখানিই উদ্ভাবিত হচ্ছে, জীবন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং নতুন

সত্যোপলব্ধি হচ্ছে, মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি হয়ে চলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের বাইরে বৃহত্তর সমাজে। কোনো পুরনো সত্য অথবা আদর্শকে বাইরের সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে যথাপূর্ব রক্ষা করতে যে-বিদ্যায়তন অথবা প্রতিষ্ঠান একান্তভাবে নিযুক্ত সে নিজের সত্যকে দিনে দিনে নির্জীব করে তোলে, ইতিহাসের পক্ষে সেটা ক্রমে বর্জনীয় হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অনুশীলনের সঙ্গে সেই বিনয়ের যোগ রক্ষা করা আবশ্যক যাতে বাইরের থেকে শিক্ষা গ্রহণের ধারায় ছেদ না পড়ে। এই যোগ যখন ছিন্ন হয় তখন অনুশীলন তার চরিত্র হারায়, সেখানে অধিষ্ঠিত হয় অহংকার।

দুঃখের বিষয় অনেকে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শকে মেনে নিয়েছেন একটা বিপরীতার্থে। আমার অনেক সহকর্মীকে বলতে শুনেছি, সমাজে যখন এতো অন্যায়, কেউই যখন নিজের কর্তব্য করছেন না, তখন অধ্যাপকদের কাছ থেকে আদর্শের নামে কিছু আশা করা ঠিক নয়। আমাদের যা কিছু ব্যর্থতা তার জন্য সমাজকে দায়ী করে আমরা বিবেকের কাছে দায়মুক্ত হতে চাইছি। সমাজে বহু অন্যায় আছে বটে। উনিশ শতকের সমাজেও অন্যায় কম ছিল না। অজ্ঞতা ও অবিচারে দূষিত সমাজের ভিতরই কিন্তু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে গৌরবের স্থান অধিকার করেছিল। আজও কিছু কিছু অধ্যাপক নিঃসন্দেহে সম্মানের যোগ্য। সমাজের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়ার ভিতর একই সঙ্গে একটা আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং অবিনয়ের ভাব প্রকাশ পায়। আত্মসমালোচনার মধ্যে যে বিনয় আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘবদ্ধ জীবনে তারও প্রয়োজন আছেই। এই দোষে ভরা বেদনাহত সমাজেও শিশুরা জন্মগ্রহণ করছে, চোখে নতুন আলো নিয়ে। তারা বেড়ে উঠছে ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য। তাদেরও দাবি আছে, অধিকার আছে শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু আদর্শের কথা শুনবার, কিছু আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হবার। সেই অধিকারকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যাঁরা যথাসাধ্য কাজ করতে সম্মত তাঁরাই তো শিক্ষক হবার যোগ্য। এ যদি না হয় তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যারও কোনো সমাধান আশা করা যাবে না।

শিক্ষার সমস্যা-২

১

১৯৮৫ সালে রাজনীতির ক্ষেত্রে চমকপ্রদ কিছু সিদ্ধান্তের পাশে পাশে আরো দুয়েকটি বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষভাবে দৃষ্টি পড়েছে। এর ভিতর আছে শিক্ষানীতি ও অর্থনীতি। শিক্ষার সমস্যা নিয়ে শান্তভাবে বিচার বিবেচনা হওয়া প্রয়োজন, কিছু আলোচনা হচ্ছেও। দেশের সামনে কিছু প্রশ্ন হঠাৎ সময়ে অসময়ে নাটকীয়ভাবে দেখা দেয় যেন অগ্নিকাণ্ডের মতো, যেমন আমরা দেখেছি পঞ্জাবের ক্ষেত্রে। আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হয় অবিলম্বে। আবার অন্য এক রকমের সমস্যা আছে যার দ্রুত কোন সমাধান আশা করা যায় না, অথচ দেশের মঙ্গল অমঙ্গলের সঙ্গে যার যোগ গভীর এবং দীর্ঘকালীন, যেমন শিক্ষা। এ নিয়ে একটু ধীরে, একটু তলিয়ে চিন্তা করলে ভাল হয়।

পরিচিত কয়েকটি কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

শিক্ষার যেমন একটা আদর্শের দিক আছে, অর্থাৎ সে মানুষ তৈরি করে, তেমনি তার একটা প্রয়োগের দিক আছে, অর্থাৎ সে কিছু ইতিহাসনির্দিষ্ট কাজের জন্য মানুষ তৈরি করে। ইংরেজ আমলে যে শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশে গড়ে উঠেছিল তারও ঐরকম একটা প্রায়োগিক উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। এ দেশে যে শাসনযন্ত্র সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ছোট বড় মাঝারি নানা স্তরের চাকরিজীবী তৈরি হয়েছে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার গুণে। সেই সঙ্গে পাওয়া গেছে আইনজীবী নতুন আইন আদালতের জন্য, ডাক্তার নতুন চিকিৎসাপদ্ধতির সেবায়, অনিবার্যভাবেই শিক্ষক, নতুন শিক্ষাব্যবস্থাকে চালিয়ে যাবার জন্য যাঁরা অত্যাবশ্যক। আরো পাওয়া গেছে বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদ। তবু প্রধান কথাটা এই যে, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে আধুনিক ভারতের সরকারি শাসনযন্ত্রের জন্য প্রশাসক। প্রথমে নিম্নস্তরে পরে সর্বস্তরে।

আমরা যারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাব্যবস্থার সন্তান তারা আজ ঐ ব্যবস্থাকে নিত্য বিদ্রূপ করতে অভ্যস্ত, আবার সেই সঙ্গে ওটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেও ব্যস্ত। দুয়ে মিলে অবস্থাটা করুণ। অথচ ঐ বিদ্রূপে থাকে অতীতের সত্যের অনাবশ্যক বিকৃতি ; আর আঁকড়ে ধরে থাকার আগ্রহে আছে বর্তমানের সত্যের প্রতি অবজ্ঞা। দু'টো কথাই একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

আমরা ব্যঙ্গ করে বলি, ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার কাজ ছিল কেরানি তৈরি করা। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ইংরেজি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে প্রশাসক এবং শিক্ষক, আইনজীবী ও চিকিৎসাবিদ। এই নতুন শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যা যখন প্রয়োজনের তুলনায় অতি স্ফীত হয়ে উঠল তখন অবশ্য অনেকের পক্ষে এমনকি কেরানির কাজ পাওয়াও দুষ্কর হ'ল। সে কথায় আমরা পরে ফিরে আসব। তার আগে অন্য একটা কথা স্মরণ করতে চাই।

ভারতকে আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মধ্যে বাঁধবার যোগ্য একটা শাসনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকে। ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই এমন এক প্রশাসক গোষ্ঠী যাঁদের মধ্যে ছিল সর্বভারতীয় দৃষ্টি এবং নতুন জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু সচেতনতা। উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি মধ্যবিত্তকে আমরা পাই এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকায়। সেই ভূমিকা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলাদেশের বাইরে আসাম থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বাঙালি ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে, শিক্ষক চিকিৎসাবিদ আইনজীবী হিসেবে। এঁরাই ছিলেন নতুন ইংরেজী শিক্ষার যথার্থ প্রতিনিধি।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ইংরেজী শিক্ষার দিকে প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিল ভারতের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলের প্রধানত হিন্দু উচ্চবর্ণের কিছু মানুষ। এঁরাই প্রশাসন যন্ত্রে এবং বুদ্ধিজীবীর কয়েকটি পেশায় সে যুগে প্রাধান্য পায় স্বাভাবিকভাবেই। ক্রমে ইংরেজী শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র। এক সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন সম্প্রদায়ে, উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণে। এর ফলে নতুন মধ্যবিত্তের একদিকে যেমন আকার এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পেল অন্যদিকে তীব্রতর হয়ে উঠল তার অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ দেখি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, আঞ্চলিক সংঘাতে, জাতিভিত্তিক কলহ ও সংঘর্ষে।

চলতি শিক্ষাব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য উত্তীর্ণ হয়ে এখন সে হয়ে উঠেছে এক জটিল সমস্যা। প্রশাসক তৈরি করা ছিল তার আদি উদ্দেশ্য। আজও এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যাঁরা ডিগ্রী নিয়ে বেরোন তাঁদের

প্রধান কাম্য অফিসের কাজ, সরকারি চাকরি। কিন্তু ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা যত বাড়ে ততই তাদের সবাইকে অফিসের কাজ অথবা সরকারি চাকরি দেওয়া কঠিন এমনকি অসম্ভব হয়ে ওঠে। সীমাবদ্ধ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই তীব্র এবং তিক্ত হয়ে ওঠে। নিম্নবর্ণের নব্যশিক্ষিতদের পক্ষ থেকে দাবি ওঠে সংরক্ষিত চাকরির জন্য। যে সব পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার হয়েছে সম্প্রতি সেখান থেকে ভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে তাড়াবার জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা। একটি কেরানি অথবা আরো অধস্তন পদের জন্য অসংখ্য প্রার্থীর লাইন পড়ে যায়। আজকের শিক্ষার সমস্যার বাইরের প্রকাশ বেকারি এবং সামাজিক দ্বন্দ্বে। তার আন্তরিক অভিব্যক্তি শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতায়।

কেরানি হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন টাইপিংটা শিখে নেওয়া। বস্তুত অধিকাংশ কাজের জন্যই কোনো না কোনো বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষাই বেশি উপযোগী। সরকার সম্প্রতি বলেছেন, ডিগ্রীর সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক ছেদ করা হবে। কথাটার যুক্তিসঙ্গত অর্থ এই। ডিগ্রীর সঙ্গে যুক্ত আমাদের যে শিক্ষাক্রম তাতে ছেলেমেয়েদের মনে চাকরির প্রত্যাশা জাগান হয়, অথচ কোনো বিশেষ কর্মের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হয় না। এই প্রস্তুতিহীন প্রত্যাশা সমস্যাকে আরো জটিল করে তোলে।

আমাদের উনিশ শতকী ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ছিল এইখানে—কারিগরির সঙ্গে তার যোগ ছিল নগণ্য। এ কথাটা যদিও বহুদিন থেকেই নানা রিপোর্টে বলা হয়েছে তবু সমাধানের পথে এখনও যথেষ্ট অগ্রসর হয়নি দেশ। আমরা যেন বস্তুত স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নই যে, দেশের শিক্ষিত মানুষদের ভিতরও অধিকাংশকে তৈরি করে তুলতে হবে অফিসের কাজের জন্য নয়, বরং হাতের কাজের জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সঙ্গে এই সব কাজের কোন ব্যবহারিক সম্পর্ক নেই।

কর্মে নিয়োগ যদি ডিগ্রী অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর না করে তবে যোগ্যতা নির্ধারণ এবং নির্বাচনের জন্য অন্য কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা আবশ্যক। বিশেষ বিশেষ কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যোগ্যতানির্ধারক বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব। পরীক্ষার আগে চাই তার জন্য প্রস্তুতি। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রাম ও শহর জুড়ে এমনভাবে সংগঠিত হওয়া আবশ্যক যেন স্থানকালের প্রয়োজনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটে। সেই সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার ভিতর না হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেটা স্বধর্ম তার মূল কথা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সেদিকেই তাকে আগ্রহী হতে হবে। বৃত্তিশিক্ষা সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে প্রতিবেশিসুলভ মিত্রতার।

বলাবাহুল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সঙ্গে কোনো কোনো কর্ম ও বৃত্তির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিন্ন করা উচিত হবে না। যেমন শিক্ষকতার কাজ। অথবা গবেষণার কাজ। ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে যিনি উত্তীর্ণ হবেন, চিকিৎসার কাজের জন্য তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছেন এটা ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে কি? অবশ্য পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ারের বেলায়ও একই কথা।

এসবই সাধারণভাবে স্বীকার্য। তবু এর পরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশকে একুশ শতকের জন্য তৈরি করে তুলতে হবে। কথাটা একদিক থেকে স্বতঃসিদ্ধ। একুশ শতক তো এখন আর দূরের জিনিস নয়। কিন্তু একবিংশ শতাব্দী বলতে আমাদের মনে এসে পৌঁছয় অন্য এক দ্যোতনা। তার সঙ্গে যোগ আছে প্রাগ্রসর

পশ্চিমী দেশগুলির প্রযুক্তিবিদ্যার। একুশ শতকের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে হবে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে সেই দিকে, এসব কথা শোনামাত্রই দৃষ্টি চলে যায় ঐ প্রাগ্রসর প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে।

সন্দেহ নেই, এটাও প্রয়োজন। তবু দেশের একটা সামগ্রিক চিত্র আমাদের চোখের সামনে ধরে রাখা চাই। একটা কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু একুশ শতকের প্রারম্ভেও গ্রামে বাস করবে। আমরা যে শিল্পনীতিই আজ গ্রহণ করি না কেন, বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে ঐ কথাটা স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

বিজ্ঞান আমাদের চাই, প্রযুক্তিও চাই। কিন্তু প্রযুক্তির মূল্য মানুষেরই জন্য। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামবাসী এবং দরিদ্র সেখানে সেই অধিকাংশের দুঃখ লাঘব হয় এমনভাবেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে নিয়োগ করা আবশ্যক। আমাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাতেও এই কথাটার স্বীকৃতি থাকা জরুরী। তা নইলে আশঙ্কা থাকে, দারিদ্র্য এবং বেকারি দীর্ঘায়ু হবে আর ছোট একটি উচ্চশিক্ষিত গোষ্ঠী দেশের ওপর বোঝার মত চেপে বসে থাকবে। সমস্যাটা এই দিক থেকে দেখে সমাধানের পথ নিয়ে আরো গভীর চিন্তা প্রয়োজন।

২

মায়ের বুকের দুধ শিশুর পক্ষে উপকারী। অথচ আজকাল শিশুরা অনেক সময় মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর নানা কারণ আছে। মায়েরা অসুস্থ হতে পারেন। অথবা বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকতে পারেন। শিক্ষিতা ও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন মায়েদের প্রকাশ্যে স্তন্যদানে সামাজিক সংকোচও যেন বেশি। ভিন্ন ধরনের একটা কারণের কথা আমাকে বললেন শিশু বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার। অশিক্ষিতা এবং অসচ্ছল পরিবারের মায়েদের ওপর এসে পড়ছে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত অভ্যাসের প্রভাব। 'ওঁদের বাড়িতে বাচ্চাকে বোতলে খাওয়ানো হয়, বাজার থেকে কিনে এনে টিনের খাবার দেওয়া হয়। ঐসব খাওয়ালে আমার শিশুটিও হয়তো স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান হবে, জীবনে উন্নতিও করবে বেশি।' এইরকম একটা অস্পষ্ট চিন্তা কাজ করতে শুরু করেছে অভাবের ঘরেও।

এর ফল হয় খারাপ। গরিব মা বাজার থেকে টিনের দুধ হয়তো কিনলেন। অর্থের অনটন, কাজেই তাতে জল মেশালেন বেশি। বুকের শিশু মাতৃস্তন্য থেকে বঞ্চিত হল, আবার বাজারের খাদ্যও ঠিকভাবে পেল না। উচ্চবিত্তদের অনুকরণ করতে গিয়ে নিম্নবিত্তের মানুষের দুর্দশা আরও বেড়ে যায়। কথাটা এই। প্রয়োজন পড়লে বাজার থেকেও কিনতে হবে। কিন্তু প্রকৃতি তার গূঢ় দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যে মাতৃস্তন্য সৃষ্টি করেছে, শিশুর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের জন্য সেটা ভালো। তার প্রতি অবজ্ঞায় কোনও গৌরব নেই। গৌরব বোধ করাটা মূর্খতা। একটা শিক্ষিত কুসংস্কার অশিক্ষিতদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে।

যাঁরা বিত্তবান তাঁদের জন্য ভোগের নানা উপকরণ আসে দেশ দেশান্তর থেকে। গরিব দেশের গরিব মানুষের জন্য আছে অন্য পথ, হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তারই সদ্ব্যবহার করা যথাসম্ভব। এর নাম স্বদেশী। স্বদেশী হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, তবু ওটা প্রয়োজন।

চিকিৎসা দিয়েই ব্যাপারটা আরও একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আমাদের দেশে প্রধান ছিল আয়ুর্বেদ। আধুনিক কালে এসেছে পশ্চিম থেকে ডাক্তারি। হাতের কাছে যেসব গাছ গাছড়া এবং অন্যান্য উপকরণ পাওয়া যেত তাই থেকে যথাসম্ভব ভেষজ তৈরি করবার চেষ্টা করেছেন এদেশের প্রাচীন আয়ুর্বেদজ্ঞ। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত, তার পিছনে আছে বহু গবেষণা। কিন্তু তার কিছু অসুবিধাও আছে, বিশেষত আমাদের মতো গরিব দেশের পক্ষে যেটা উপেক্ষা করবার মতো নয়।

এদেশের উচ্চ পর্যায়ের মেডিক্যাল কলেজ থেকে যাঁরা সসম্মানে পাশ করে বেরোন তাঁদের ভিতর অনেকে বিদেশে গিয়েও ভালো পসার জমাতে পেরেছেন, দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। দেশের ভিতরও বড় বড় হাসপাতালে তাঁদের আমরা পাই। কিন্তু এ দেশেরই গ্রামে তাঁরা উল্লেখযোগ্যভাবে অসহায়। যেসব ঔষধের সঙ্গে তাঁরা সবিশেষ পরিচিত সেসব পল্লীগ্রামে পাওয়া কঠিন। এটা তাঁদের অপরাধ নয়, তবে অবস্থাটা এই। যে চিকিৎসা পদ্ধতি অথবা অস্ত্রোপচারে তাঁরা দক্ষ, বড় হাসপাতালের বাইরে তার প্রয়োগ কঠিন, প্রায়শ অসম্ভব। গ্রামে গ্রামে বড় হাসপাতাল করা যাবে না। পল্লী অঞ্চলে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সে সব জিনিসের সঙ্গে আমাদের আধুনিক ডাক্তার তেমন পরিচিত নন। পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে গেলেও একই সমস্যা। যেসব খাদ্যের কথা মহানগরের শিক্ষিত ডাক্তারেরা বিশেষভাবে বলেন সেসব গ্রামের মানুষের নাগালের বাইরে। গ্রামে যা আছে অথবা সহজে পাওয়া যেতে পারে তারই যথাসম্ভব ব্যবহার করা যাবে কীভাবে সেটাই প্রশ্ন। যে আগ্রহ অথবা যে ধরনের গবেষণায় এই প্রশ্নের উত্তর আশা করা যায়, আমাদের মেডিক্যাল কলেজের পঠনপাঠনের ঝোঁক সেদিকে নয়। আয়ুর্বেদে সেটা ছিল। বিজ্ঞাপনের জোরে যেসব ওষুধ চলে তাদের অনেক সময় একটা গুরুতর অনিষ্টের দিকও থাকে। দীর্ঘদিন পরীক্ষিত ভেষজে সে সম্ভাবনা কম।

পশ্চিমী চিকিৎসা শাস্ত্র ত্যাগ করবার কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার অন্য একটা ধারাও উন্মুক্ত থাকা চাই যেটা দেশমুখী। সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। চীন দেশে একটা হাসপাতালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে দেখেছিলাম, দু'টি ধারা পাশাপাশি আছে, একটি পশ্চিমী অন্যটি চীনের নিজস্ব। দ্বিতীয়টির সহায়ক হিসেবে হাসপাতালের সংলগ্ন জমিতে গাছ গাছড়া চাষের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই সেই হাসপাতাল যেটা ওঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন ভারতীয় ডাক্তার কোটনিসের স্মৃতিতে।

চিকিৎসা নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা গেল। কিন্তু এটা উদাহরণমাত্র। আসল কথাটা আরও ব্যাপক। দেশকে একুশ শতকের জন্য তৈরি করবার প্রস্তাব হয়েছে। অন্তত ঐরকম একটা ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বলা হচ্ছে, আমরা পিছিয়ে আছি, আমাদের এগিয়ে-যাওয়া দেশগুলির সমান হতে হবে। একথা ঠিক যে প্রাগ্রসর দেশগুলির কাছ থেকে আমাদের কিছু শিখবার আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আমাদের প্রয়োগ করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে, এদেশের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে।

প্রযুক্তির যোগ প্রয়োজনের সঙ্গে। ওদেশের প্রযুক্তি তার বিশেষ রূপ লাভ করেছে ওদেশেরই প্রয়োজনের চাপে। আমাদের প্রয়োজন ওদের সঙ্গে অনেকটাই মেলে না। আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন যদি ঘটে এদেশে, তবেই বোঝা যাবে যে আমরা নিজ বুদ্ধিতে চলছি, আমরা স্বনির্ভর। এর বিকল্প নেই। প্রযুক্তি এবং

ভোগ্য বস্তু উন্নত দেশের বাজার থেকে কিনে তাতে খানিকটা ভেজাল মিশিয়ে যথাসম্ভব গ্রহণ করলেই আমরা উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারব এমন নয়। এতে আমাদের আর্থিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতিরই বরং সম্ভাবনা বেশি। উচ্চবিত্ত সমাজের অনুকরণ নয়, আধুনিকতম প্রযুক্তির মুগ্ধ অনুসরণ নয়, আমাদের চাই স্বদেশের সম্পদ ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের বিচারে উপযুক্ত প্রযুক্তি। ইংরেজিতে যার নামকরণ হয়েছে appropriate technology তার সদর্থ সম্ভব এই বিচারে।

এ বিষয়টা নিয়ে আমাদের সাবধানে চিন্তা করতে হবে। কারণ ভুল ঘটতে পারে দুদিক থেকেই। আমাদের অর্থনীতির একটা দিক আছে যেখানে শিল্পোন্নত দেশগুলির যন্ত্র এবং যন্ত্রবিদ্যা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যেমন ভারী শিল্পে। বিদেশের বাজারের জন্যও আমাদের কাজ করতে হয়। সেই সব দ্রব্যের কিছুটা সাবেকী, কিছু নতুন। এদেশের শ্রমের যদিও অল্পভাগই ভারী অথবা রপ্তানি শিল্পে নিযুক্ত তবু পৃথিবীর দিকে আমাদের জানালাটা খোলা রাখতে হবে। তা নইলে বিপদ দেখা দিতে পারে নানা ভাবেই।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ কাজ করছে বড় বড় কারখানায় অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নয়। তারা কাজ করছে গ্রামে গঞ্জে, স্থানীয় উপকরণ নিয়ে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে। এটাই আমাদের অর্থনীতির অন্য দিক, তার বৃহত্তর দিক। সেখানেও উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি প্রয়োজন। দেশ বিদেশের জ্ঞান সেখানেও কাজে লাগানো সম্ভব। যেমন 'সবুজ বিপ্লব' বলে যে ঘটনাকে আমরা চিনেছি তার পিছনে বিদেশী গবেষণার দান অনেকটা। কিন্তু পশ্চিমী কৃষিপদ্ধতি নির্বিচারে এদেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, ও পথে গেলে আরো অনেক মানুষকে বেকার হতে হবে। মার্কিন অথবা সোভিয়েত দেশে জমির তুলনায় মানুষ কম ; আমাদের দেশে মানুষের তুলনায় জমি কম। আরও নানা পার্থক্য আছে। কাজেই চাষের পদ্ধতি এদেশে আর ওদেশে একরকম করা চলবে না।

ভারী শিল্প আমাদের চাই। কিন্তু এদেশের বেরোজগারের সমস্যা দূর করা যাবে না ভারী শিল্প দিয়ে। যেহেতু স্থানীয় উপকরণ নিয়ে স্থানীয় চাহিদা মেটাতে অধিকাংশ মানুষ নানা কাজে নিযুক্ত অতএব আমাদের বিজ্ঞান অথবা সংগঠিত চিন্তাশক্তিকেও নিয়োগ করতে হবে সেই সব কাজের ভিতর এগিয়ে যাবার গতি সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে। সেই আগ্রহ যেন ছড়িয়ে পড়ে এদেশের শিক্ষায় প্রশিক্ষণব্যবস্থায় গবেষণাগারে।

এদেশের সরকারি এবং আধা সরকারি নানা প্রতিষ্ঠান আছে যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল গ্রামোন্নয়নের কাজে সহায়তা করা। কিন্তু শহর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নয়নের কাজে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের অনেকেরই ঐ কাজের জন্য যথার্থ যোগ্যতা নেই। গ্রামে বাস করতে তাঁরা আগ্রহী নন। আর যদি আগ্রহ দেখা যায় তবে সন্দেহ হয় যে গ্রামের রাজনীতিতে তাঁরা বড় বেশি জড়িয়ে গেছেন অথবা অন্য কোনও মতলব আছে। অথচ গ্রামোন্নয়ন একটা বড় কাজ। সেজন্য এমন কর্মী চাই যাঁরা গ্রামের ভাষা জানেন, সেখানকার সুবিধা অসুবিধার কথা ভিতর থেকে বোঝেন, গ্রামবাসীর জন্য যাঁদের মমতা এবং সদিচ্ছা আছে। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরই কি এই কর্মী তৈরি করবার দায়িত্বটা স্থান পেতে পারে না ?

এটা হতে পারে দু'ভাবে। এক, বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সাহায্যে। দ্বিতীয়, সমস্ত শিক্ষিত সমাজের ভিতরই রবীন্দ্রনাথ যাকে পল্লীসংগঠন এবং পল্লীসঞ্জীবন নামে চিহ্নিত করেছিলেন সেদিকে সচেতনতা সৃষ্টি করে।

গ্রামের জন্য ব্যাঙ্ক দরকার। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর এইরকম নির্দেশও দেওয়া আছে

যে, কৃষি এবং ছোট শিল্পকে লগ্নির ব্যাপারে যেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরনটা তৈরি হয়েছে কিন্তু নাগরিক ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ ধাঁচে। 'ব্যাঙ্ক সংস্কৃতি' বলে একটা কথা ইংরেজীতে চালু আছে যার ভাষা এবং রীতিনীতির গড়নটা ঐরকম। গ্রামের মানুষ তার সঙ্গে পরিচিত নয়। কিভাবে তাদের প্রয়োজনের কথাটা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখলে সেটা গ্রাহ্য হতে পারে সেটা তারা জানে না। এ অবস্থায় ব্যাঙ্ক কর্মীর কাজ হবে না শুধু গ্রামবাসীর আবেদনপত্রটা পরীক্ষা করে দেখা। পদ্ধতিগতভাবে ব্যাঙ্ক এবং গ্রামবাসীর ভিতর একটা নির্ভরযোগ্য সেতু তৈরি করবার কাজেও অগ্রণী হতে হবে ব্যাঙ্কের কর্তাদেরই। গ্রাম থেকেই কিছু ছেলেকে বেছে নিয়ে তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা সম্ভব গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কাজের জন্য।

অন্য অনেক দেশে ছেলেদের একটা বয়সে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এদেশে সব ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে যে, ডিগ্রী লাভের আগে কিছুকাল তাদের গ্রামে কাজ করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সেই সময় গ্রামে পাঠানো যেতে পারে শিক্ষার প্রসারের কাজে সহায়তা করবার জন্য। শহরের ছাত্রছাত্রীরাই যে গ্রামে শিক্ষা দানের পক্ষে সবচেয়ে যোগ্য, এমন মনে করবার কারণ দেখি না। তাদের গ্রামে পাঠানো প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তারের কাজের ভিতর দিয়ে শিক্ষা লাভের জন্য, অর্থাৎ নিজেদের শিক্ষাটাকেই আরও সম্পূর্ণ করে নেবার উদ্দেশ্যে। পরবর্তী জীবনে তারা যে ক্ষেত্রেই কাজ করুক না কেন, গ্রামের জীবনের সঙ্গে এই পরিচয় তাদের চেতনার পিছনে যেন কার্যকর থাকে। সমাজের কাছে ঋণ শোধ করবার জন্য এটাও আবশ্যক।

প্রশাসক তৈরি করা একদিন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কাজ ছিল। গ্রামোন্নয়নের জন্য কর্মী এবং দেশের চেতনা তৈরি করা কি আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ঐতিহাসিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না? অন্তত গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের মনে এ বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না। মহানগরীর শ্রেষ্ঠ সন্তান তাঁর একমাত্র বয়স্ক পুত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন শিক্ষা ও পল্লীসংগঠনের উদ্দেশ্যে। তাঁদের কাছে এটাই ছিল স্বদেশীচিন্তার সদর্থ।

৩

এই শতাব্দীর মাঝামাঝি আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকলের ভোটাধিকার, জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশে। পরবর্তী তিরিশ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, শিক্ষার দ্রুত বিস্তার।

আমাদের অনেক সমস্যা কঠিন হয়ে উঠেছে জনসংখ্যার বিরাট বৃদ্ধির ফলে। ১৯৫০ সালের পর পঁয়ত্রিশ বছরে এদেশের জনসংখ্যা হয়ে গেছে দ্বিগুণেরও বেশি। এই বৃহৎ সংখ্যার তলায় চাপা পড়ে গেছে অনেক সদর্থক প্রয়াস। যেমন ধরা যাক, নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপারটা। এদেশে অক্ষরজ্ঞান আছে এমন লোকের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ৬ কোটি, ১৯৮১ সালে সেটা হয়েছে প্রায় ২৫ সোটি। এটাকে কৃতিত্ব বলেই দাবি করা যেত। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে সেটা সম্ভব হল না। ১৯৫১ সালে আমাদের জনসংখ্যা ছত্রিশ কোটির কাছাকাছি। এরপর ঐ সংখ্যাটাকে যদি আমরা ধরুন পঁয়তাল্লিশ অথবা পঞ্চাশ কোটির ভিতর বেঁধে ফেলতে পারতাম তাহলে বলা সম্ভব হত দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা কমছে, পাঁচের ওপর যাদের বয়স তাদের অধিকাংশই সাক্ষরতা অর্জন

করেছে। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে সত্তর কোটি, সেই সংখ্যার বড় অংশটাই নিরক্ষর। জাপানে জনসংখ্যা বাড়ছে বছরে শতকরা একভাগ, সম্প্রতি আরো কম ; ভারতে শতকরা আড়াই ভাগ। চীনে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জোরালো নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নানা কারণে সেটা এদেশে সম্ভব হচ্ছে না। যদি সম্ভব হত তবে অনেক সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যেত। অর্থনীতি, শিক্ষানীতি ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি পরস্পর সম্পৃক্ত। এদের ভিতর কোনো একটিকে এদেশে আলাদাভাবে সফল করে তোলা খুবই কঠিন। সব মিলে ব্যাপারটা জটিল।

যাই হোক, জনসংখ্যার অতিস্ফীতির পাশে পাশে ভারতে শিক্ষার দ্রুত প্রসারও তুচ্ছ করবার মতো নয়। ১৯৫০-৫১ সালের পর তিরিশ বছরে বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় চারগুণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাবৃদ্ধির হার আরো অনেক বেশি। সেখানে বৃদ্ধি ঘটেছে চারগুণ নয়, প্রায় ষোলগুণ।

তবে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশ অথবা ষাটের দশকে ছাত্রের সংখ্যা যত দ্রুত বাড়ছিল পরবর্তী বছরগুলিতে তেমন নয়। সম্প্রতি অনেক কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি কমে গেছে। তারই ফলে একটা প্রশ্ন গত কয়েক বছরে তীক্ষ্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রশ্নটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি নিয়ে।

উচ্চশিক্ষায় কার প্রবেশের অধিকার থাকবে ? কোন শর্তে ? এসব প্রশ্নের, এককথায় উত্তর হয় না। বিষয়টা নানা দিক থেকে বিচার করে দেখা দরকার। তবে একটা মূল কথা সরল সহজভাবে বলা যায়।

সে কথাটা এই : উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উঁচু রাখা জরুরী। তা নইলে উচ্চশিক্ষার মানে হয় না। এটা শুধু আদর্শের কথা নয়। বাস্তব প্রয়োজনের কথা। উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়ে তৈরি হয় শিক্ষক, চিকিৎসক, দক্ষ বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানী। আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যদি বেরিয়ে আসে অপটু ইঞ্জিনিয়ার তবে তাতে সমাজের গুরুতর ক্ষতির আশংকা। যদি তৈরি হয় অযোগ্য ডাক্তার তবে তাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ। যদি পাওয়া যায় নিম্নমানের শিক্ষক ও বিজ্ঞানী তবে বিপদ নতুন প্রজন্মের, আগামী কালের মানুষের। উচ্চশিক্ষার মান যদি উঁচু রাখা না যায় তবে তাতে বিপদ সারা সমাজের। বিপন্ন আমাদের ভবিষ্যৎ।

এটাই তা হলে প্রথম শর্ত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মান উঁচু রেখে যত অধিক সংখ্যায় ছাত্রছাত্রী নেওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত ততটাই নেওয়া উচিত, তার বেশি নয়। সব মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক একদিকে নয়। কারো ঝোঁক যাকে বলে 'থিওরি' বা তাত্ত্বিক অনুসন্ধান সেই দিকে। কারো স্বাভাবিক আগ্রহ এবং দক্ষতা শিল্পেসঙ্গীতে, কারো হাতের কাজে, কারো সমাজসেবায়, কারো বা সাংগঠনিক কাজে। মনুষ্যত্বের বিকাশের বিচারে এর কোনোটাকেই ছোট বলা যায় না, সব পথেই তৈরি হয়েছে শ্রদ্ধেয় মানুষ। তৈরি হবার পথটা সকলের জন্য এক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। সব কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমান সহায়ক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে বেশি মান্য করাটা কুসংস্কার। অনেক কুসংস্কারের মতোই এটাও ক্ষতিকর হতে পারে, ডিগ্রীপ্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের পক্ষেই।

উচ্চশিক্ষার অনেকগুলি ধাপ আছে। উঁচু ধাপে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক ঝোঁক গবেষণা ও তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দিকে। সেইদিকে যাদের আগ্রহ এবং সম্ভাবনা বেশি, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যাপারে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকা উচিত। তবে আরো দুটি কথা

একই সঙ্গে বলে রাখা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে অর্থাভাবে যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, কিন্তু দরিদ্রের ঘরেও যে উচ্চশিক্ষার যোগ্য বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। টাকার জোরে ছেলেমেয়েরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারছে আর অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ গরিব ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষার পথ বন্ধ। এটা যেমন অন্যায় তেমনি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই সঙ্গে আসে একটা দ্বিতীয় কথা। শিক্ষার বিস্তার এবং পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন বাড়বে। সেই উদ্দেশ্যে নতুন বহুমুখী সংগঠনের প্রয়োজন সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। আমাদের কর্মী জনতার একটা বড় অংশ চলে যাবে কর্মক্ষেত্রে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভের আগেই। জীবনে এবং কর্মক্ষেত্রে আরো কয়েক বছর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর কিন্তু অনেকের আগ্রহ জন্মাতে পারে উচ্চতর শিক্ষার জন্য। তখন যাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের পথ সেইসব মানুষের জন্য চিরকালের মতো বন্ধ না হয়ে যায় সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। কর্মক্ষেত্র থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃপ্রবেশের প্রশস্ত পথ চাই। সে কথা চিন্তা করেই উদ্ভাবিত হয়েছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা।

ইংরেজীতে একে বলা হয়েছে 'ওপেন য়ুনিভার্সিটি'। সংসারের কর্মক্ষেত্রে একবার যিনি প্রবেশ করেছেন তাঁর পক্ষে সব কাজ ছেড়ে একটানা দু'তিন বছরের জন্য ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অতএব মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন এবং সংগঠন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পৃথক। যাই হোক, সংগঠনের বর্ণনা নয়, মূল উদ্দেশ্যটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করবার বস্তু। বিদ্যালয়ে পাঠান্তে ছেলেমেয়েরা নির্বিচারে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে দেখা দেয় বৃত্তির সঙ্গে যোগ্যতার অনাবশ্যক অসামঞ্জস্য। অতএব প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশেষ নির্বাচন। কিন্তু সংসারের নানা কর্মে ও বৃত্তিতে যাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন জীবনের প্রথম পর্যায়ে, তাঁরাও যাতে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন কোনো পরবর্তী পর্বে, সেই পথ অবারিত করা সরকার ও শিক্ষা সংগঠনের সামনে একটা বড় কর্তব্য।

সরকারি নয়া শিক্ষানীতিতে জেলায় জেলায় 'মডেল স্কুল' বা আদর্শ বিদ্যায়তন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, বিরুদ্ধ সমালোচনা শোনা গেছে অনেকের মুখে। বিরোধীদের প্রধান বক্তব্য এই যে, মডেল স্কুল মানেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্যে একটা স্তরভেদ, কিছু স্কুল হবে প্রথম শ্রেণীর, কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর।

সরকারি নীতি যাই হোক না কেন, সব স্কুল, সব কলেজ, সব বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একই মানের হয় না। কোনো দেশেই নয়। আমেরিকার সব বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড বা প্রিন্সটনের সমপর্যায়ের নয়, বিলেতে সব অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের মতো নয়, সোভিয়েত দেশে সব মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা ফরাসি দেশে সরবনের সমান নয়। স্কুল কলেজের ক্ষেত্রেও একই কথা। এটাই বাস্তব পরিস্থিতি। উন্নতমানের অধিকাংশ স্কুল এখন বড় বড় শহরে, রাজধানীতে অথবা মহানগরীতে। রামকৃষ্ণ মিশনকে ধন্যবাদ। তাঁরা রাজধানীর বাইরে কিছু ভাল স্কুল চালাচ্ছেন।

প্রশ্নটা তা হলে এই নয় যে, উন্নতমানের কিছু বিশেষ স্কুল থাকবে কি না। প্রশ্নটা এই যে, মহানগরীর বাইরের জেলায় জেলায় কিছু আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার প্রস্তাব

সমর্থনযোগ্য কি না। সব বিদ্যালয়কে একসঙ্গে আদর্শ বিদ্যালয় করে তোলা যাবে না। সেটা অবাস্তব কথা। কিন্তু জেলায় জেলায় কিছু মডেল স্কুল ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। সেটা হবে যুক্তিসঙ্গত কথা।

গ্রামাঞ্চলে অনেক উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে আছে। ভাল স্কুলের সন্ধানে তাদের মহানগরীতে পাঠাতে হবে কেন ? অনেক পরিবারের সেই সামর্থ্য নেই। জেলার ভিতরই ভাল স্কুলের সন্ধান থাকা চাই। জেলায় জেলায় কিছু স্কুল তো আছে, পুরনো সরকারি জিলাস্কুলই হোক বা বেসরকারি বিদ্যালয় হোক, যাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলে এটা সম্ভব। সেই সঙ্গে আরো কিছু প্রয়োজন। সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীদের খুঁজে বের করতে হবে। যেমন বের করা হয়, বের করা প্রয়োজন, সম্ভাবনাময় তরুণ বিজ্ঞানী অথবা খেলোয়াড়। যদি অর্থাভাব এইসব ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষার পথে বাধা হয়, তবে বিশেষ অর্থসাহায্য দিয়ে এদের ভাল স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

এদেশে উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের প্রভেদ আছে প্রাচীনকাল থেকেই। অর্থের ভিত্তিতে একটা নতুন অভিজাতশ্রেণী গড়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনেই। এসবের জন্য জেলায় জেলায় মডেল স্কুলের প্রয়োজন হয়নি। যাঁরা বিত্তবান ক্ষমতাবান তাঁরা সুবিধা করে নিয়েছেন।

এখন যে নতুন প্রস্তাব এসেছে তার বিচার করতে হবে খোলা মনে। এই প্রস্তাবে কিছু শর্ত আরোপ করবার কথা হয়তো আমাদের ভাবতে হবে। কিছু সদিচ্ছাকে কার্যকর করবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, দরিদ্র পরিবারের প্রতিশ্রুতিময় ছেলেমেয়েদের মডেল স্কুলে আকৃষ্ট করবার জন্য চাই বিশেষ ব্যবস্থা, আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা। সরকারি প্রস্তাবের কোনো ধারা এমনও থাকতে পারে যা বর্জনীয়। কিন্তু মূল প্রস্তাবের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে গঠনমূলক, রচনাত্মক।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে বিদ্যালয়ের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। অনিবার্যভাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ভিতর মানের তারতম্যও বেড়ে গেছে। সব বিদ্যালয়েরই উন্নতি কাম্য। কিন্তু অল্প কিছু বিদ্যালয়ই হতে পারে পথপ্রদর্শক। শুধু রাজধানীতে নয়, জেলায় জেলায় তৈরি হচ্ছে একুশ শতকের নেতারা। তাদের জন্য ভালো স্কুল চাই। শিক্ষার প্রসার ছাড়া পথ নেই। কিন্তু শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমস্যা বাড়ে। পথ দেখাবার জন্য কিছু বিশেষ বিদ্যালয়েরও আবশ্যক আছে।

৪

শিক্ষাকে দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত রাখা দরকার। কথাটা যদি সবাই স্বীকার করে নিতেন তবে এ নিয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন হত না। কিন্তু সবাই স্বীকার করছেন না।

গত দশ বছরে শিক্ষার ওপর দলীয় রাজনীতির প্রভুত্ব ক্রমেই বেড়েছে। এটা আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে শিক্ষার সর্বস্তরে। শিক্ষানীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর দলীয় রাজনীতির প্রভাব আগে ছিল না এমন নয়। ছিল ; কিন্তু সদর্পে সেটা সমর্থন করা হত না। কিছুটা গোপন এবং কুণ্ঠিত ছিল সেই হস্তক্ষেপ। বলা বাহুল্য, আমি স্বাধীনতার পরবর্তী যুগের কথাই বলছি। দলীয়তার হাত থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখাই ছিল

স্বীকৃত আদর্শ। এর ব্যতিক্রম ঘটলে বিরোধী দল তার সমালোচনা করেছে। যারা ক্ষমতায় আসীন তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছে যথাসাধ্য। শিক্ষাকে দলীয়তার উর্ধ্বে রাখাই ছিল তাদেরও ঘোষিত উদ্দেশ্য। আজ তা নয়।

আজ অন্য কথা শুনছি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে। যুক্তিটা এইরকম। রাজনীতি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজেরই অংশ। অতএব রাজনীতিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে রাখা সম্ভব নয়। প্রতিটি নাগরিকেরই অধিকার আছে রাজনীতিতে। ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সকলেরই সেই অধিকার আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সেই অধিকার থাকবে আর ভিতরে থাকবে না, এটা একটা অবাস্তব প্রস্তাব। রাজনীতি মানেই দলীয় রাজনীতি, ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই দলবিশেষের সমর্থক। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরেও একই কথা। সেখানেও ব্যক্তি তার দলীয় মতামত দিয়েই চালিত হবে। এটাই অনিবার্য। যে দল ক্ষমতায় আসীন তার পিছনে আছে জনতার অধিকাংশের সমর্থন। এই সমর্থন থেকেই আসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের বিশেষ অধিকার। সেই অধিকারের বলেই শাসক দল শিক্ষার ক্ষেত্রেও শাসন চালায়। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কর্তৃত্ব গণতন্ত্রের পূর্ণতার জন্যই প্রয়োজন। এই ধরনের কথা আমরা শুনছি।

কথাটা বিচার করে দেখা দরকার। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকেও কিছু বাধা নিষেধ মেনে চলতে হবে কি না, তারও ক্ষমতার কিছু স্বীকৃত সীমা থাকা প্রয়োজন কি না, এটাই মৌল প্রশ্ন।

যে দল আজ দিল্লিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই সেই দল সরকার গঠন করেছে। জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চয়ই সে দাবি করতে পারে। ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংবিধানের ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য তাঁরও কিছু ব্যক্তিগত মতামত আছে, দলবিশেষের সঙ্গে যোগ আছে। রাষ্ট্রপতি অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী কি গণতন্ত্রের নামে দলীয় পক্ষপাতিত্ব দিয়েই সর্বক্ষেত্রে চালিত হবার অধিকারী? সুপ্রিম কোর্টেব বিচারক নিয়োগে যদি দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে কি সেটা গণতন্ত্রের নামে সমর্থনযোগ্য হয়ে **ওঠে?** পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভ্য নির্বাচনের বেলায় যদি দলীয় পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন কি সেটাই শাসক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তিতে গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে স্বীকার করে নিতে হবে? এইরকম পক্ষপাতিত্ব ঘটে কি না সেটা প্রশ্ন নয়; যদি ঘটে তবে সেটা গণতন্ত্রের নামে সমর্থনযোগ্য কি না বিচার করে দেখতে হবে। অনাচার তো কতই ঘটে, কিন্তু তাকে অনাচার বলেই চিনে নিতে হবে। তা নইলে সঠিক জনমত গঠন করা যাবে না।

একই প্রশ্ন ফিরে আসে শিক্ষার ক্ষেত্রে। দুয়েকটি সহজ উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক।

ছাত্রের পরীক্ষা নেন শিক্ষক, খাতা দেখেন, নম্বর দেন। শিক্ষকের নিজস্ব রাজনীতি আছে, মতামত আছে। হয়তো আছে ছাত্রেরও। কিন্তু পরীক্ষক হিসেবে যদি শিক্ষক দলীয় মতামতকে প্রাধান্য দেন তবে কি তাঁকে আমরা সৎ পরীক্ষক বলব? ছাত্রের মতামত যদি পরীক্ষকের বিপরীত হয় তবু কি তাঁর কর্তব্য নয় যথাসম্ভব নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার করা? কেউ হয়তো বলবেন, নিরপেক্ষতা সম্ভব নয়। কথাটা কি সত্য?

বিচারকের কাছ থেকে আমরা নিরপেক্ষতা আশা করি; পক্ষপাতিত্ব প্রকট হয়ে উঠলে বলি বিচারের প্রহসন হচ্ছে। ন্যায় বিচারের জন্য কারও খ্যাতি থাকে, কারও থাকে না।

এসবের ভিতর দিয়ে এই বিশ্বাসটাই ব্যক্ত হয় যে, নিরপেক্ষতা বিচারকের কর্তব্য। যেটা একেবারেই সম্ভব নয় সেটা কর্তব্য হতে পারে না। সচেতনভাবে চেষ্টা করলে পক্ষপাতিত্বের অনেকটা ঊর্ধ্বে নিশ্চয়ই ওঠা যায়। আমরা চেষ্টা করব কি না সেটাই প্রশ্ন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতাই শ্রদ্ধেয়।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনাই কি প্রাধান্য পাবে? ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে? ইদানীং দেখা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও দলীয় বিচারটাকেই সুপরিকল্পিতভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাসীন বলেই কি দলীয় পক্ষপাতিত্ব সমর্থনযোগ্য? উপাচার্য দলের আজ্ঞাবাহী হবেন এটাই কি আমরা চাই? এটাই কি গণতন্ত্রের অনিবার্য বিধান?

এইসব তর্কের পিছনে আছে গণতন্ত্র সম্বন্ধেই দুটি বিপরীত ধারণার দ্বন্দ্ব। যাঁরা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁদের চোখে গণতন্ত্রের শেষ লক্ষ্য এই সর্বগ্রাসিতায়। সর্বাত্মক রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন দলের শাসন হয় নিরঙ্কুশ। দলীয় রাজনীতি সেখানে সবকিছু গ্রাস করে নেয়, অবশেষে তার সৌধ তৈরি হয় বিরোধী দলের সমস্ত অধিকারের সমাধির ওপর।

গণতন্ত্রের অন্য এক ধারণা আছে। সেখানে ক্ষমতাসীন দল গণতন্ত্রেরই স্বার্থে নিজের অধিকারের ওপর স্বেচ্ছায় কিছু অঙ্কুশ আরোপ করে। স্বীকার করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনো দলকে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকার দেয় না। উপলব্ধি করে যে, বিরোধী দলের প্রতি ক্ষমতাসীন দলের সেই ব্যবহারই কর্তব্য যে ব্যবহার সে নিজে প্রত্যাশা করবে বিরোধী দলের ভূমিকায়।

গণতান্ত্রিক অধিকার মূল্যবান, তার সুরক্ষা আবশ্যক। একথা স্বীকার্য। একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, রাজনীতির সঙ্গে শিক্ষানীতির আছে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ। বিভিন্ন দলের ভিতর ক্ষমতার লড়াই রাজনীতির প্রধান কথা। দলীয় হারজিতের ভাবনায় অস্থির সেখানে চেতনা, সময়ের ছোট সীমায় আবদ্ধ সেই চিন্তা। শিক্ষানীতিতে এই সব প্রধান কথা নয়। বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক অন্য এক বাস্তবে, যেখানে সময়ের দিগন্ত আরও বিস্তৃত, দলীয় দ্বন্দ্বের আরও ঊর্ধ্বে। রাজনীতির নানা আক্ষেপ শিক্ষানীতিকে ক্রমাগত বিচলিত করে তুললে রাষ্ট্রনীতির তাতে শেষ অবধি কোন সুবিধা হয় কি না বলা কঠিন, কিন্তু শিক্ষার যে তাতে ক্ষতি হয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিক্ষাকে তাই দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে জনমতের একটা ভূমিকা আছে। দলীয় জবরদস্তির বিরুদ্ধে ধিক্কারে সোচ্চার জনমত প্রয়োজন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা সোজাসুজি যুক্ত আছেন, বিশেষত যাঁরা শিক্ষক, তাঁদেরও এ বিষয়ে একটা বিশেষ দায়িত্ব স্বীকাব কবে নিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির প্রতি উদাসীন ছিলেন না। এক্ষেত্রে তাঁর কিছু উক্তি, কিছু প্রতিবাদ, ইতিহাসে বিখ্যাত। অথচ শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণকে তিনি চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব রাজনীতির আলোড়ন থেকে মুক্ত রাখতে। এটা কি শুধুই স্ববিরোধ? ভীরুতা? অতিসাবধানতা? না কি এরও অন্তরালে আছে সত্যের কোনও গভীরতর উপলব্ধি?

শিক্ষার স্বধর্ম ও রাজনীতির ভিতর একটা বিরোধ আছে। সমাজে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলছে। সে দ্বন্দ্ব কখনও জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, কখনও শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর। রাজনীতি সত্যকে দেখতে চায় এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে। এরও জীবনে স্থান আছে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। এই খণ্ডিত সত্য মানুষকে একসঙ্গে ধরে রাখতে পারে না। সত্যের এই খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত অভিব্যক্তির

উর্ধ্বে আছে একটা বৃহত্তর সত্য, তাকেও প্রয়োজন মানুষের মঙ্গলের জন্য। তারই ভিতর দিয়ে অন্য এক ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয় যাকে বাদ দিলে কলহের সুরটাই অতিশয় প্রবল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথাটা বলা যাক। "যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকলপ্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়।" রবীন্দ্রনাথ যখন পশ্চিমের দিকে তাকালেন তখন তিনি সেখানে পেলেন দুই ভিন্ন ইতিহাস। এক যুদ্ধের ইতিহাস, যার প্রচণ্ড প্রকাশ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধে। অন্য এক ইতিহাস, রাষ্ট্রের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বজোড়া জ্ঞানের অনুসন্ধানে, সেবার ব্রতে, সমবায়ী সাধনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ তাকে যুক্ত করেছে বিশ্বজোড়া এই জ্ঞানের সাধনার সঙ্গে। যিনি রাজনীতিতে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত, খণ্ডসত্য তাঁর দলীয় সম্পত্তি ; তাই নিয়ে তাঁর লড়াই। যিনি বিজ্ঞানী এবং শিক্ষক, তিনি জানেন যে সম্পূর্ণ সত্য তাঁর আয়ত্তে নেই, খণ্ডসত্যকে অতিক্রম করতে তিনি সদা আগ্রহী। অতিক্রম করবার এই আগ্রহেই তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী এবং শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমরা যে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারের কথা বলি, শিক্ষকের স্বাধীনতাকে মূল্যবান বলে জানি, তার মূলে আছে এই কথাটাই। শিক্ষা ও রাজনীতির ভিতর সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। কিন্তু এ দুয়ের প্রকৃতি এবং আদর্শের ভিতর একটা অসামঞ্জস্য আছে। আর সেজন্যই শিক্ষাকে রাজনীতির অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষক যদি শিক্ষায়তনের ভিতর দলীয় আজ্ঞা অনুযায়ী চলেন, দলের স্বার্থকেই মহত্ত্ব দেন, তবে তিনিও হয়ে ওঠেন শিক্ষার স্বাধীনতার শত্রু। যেখানে তিনি শিক্ষক সেখানে তাঁকে চলতে হবে শিক্ষার স্বধর্ম অনুসারে। এ যদি হয় তবে শিক্ষার সমস্যার সমাধান কঠিন নয় ; যদি না হয়, তবে কঠিন।

আমাদের সমাজের কিছু কাজ কিছু উদ্দেশ্য দলীয় রাজনীতির ভিতর দিয়ে সিদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু সব কাজ সব উদ্দেশ্য নয়। অনেক কাজে দলীয়তা একটা বাধা, একটা বিঘ্ন। যুদ্ধের সময় দেশ তার ঐক্যকে স্থাপন করে দলীয়তার উর্ধ্বে। যুদ্ধ অবশ্য একটা চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু বিপরীত প্রান্তে আছে অন্য উদাহরণ। সমস্ত সুস্থ সমাজেই এমন কিছু আনন্দের অনুষ্ঠান থাকে যখন সবাই বিভেদ ভুলে গিয়ে আলিঙ্গন করে, আনন্দের ভিতর ঐক্যবদ্ধ হয়। অনুষ্ঠানের বাইরেও মানুষের ভিতর মিলনের একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে। পরিবারে হোক, পল্লীতে হোক অথবা বৃহত্তর সমাজে হোক, এই শক্তি আছে বলেই মানুষের সমাজ নানা বিরোধের ভিতর আজও একেবারে ভেঙে পড়েনি, জীবন সম্পূর্ণ শ্রীহীন হয়নি। শিল্পে এবং বিজ্ঞানে, মানুষের স্বাভাবিক সহৃদয়তায় এবং শুভবুদ্ধিতে, আমরা শেষ অবধি ব্যক্তির সেই পরিচয়টি পাই যেখানে সে শুধু দলবিশেষের নয়, সে মানুষ।

এই মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত রাখা শিক্ষার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। যে রাজনীতির ভিত্তিতে আছে দলীয়তা তার সঙ্গেও পরিচয় থাকা হয়তো দরকার। কিন্তু তা দিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। রাজনীতির সীমাহীন আধিপত্য শিক্ষা এবং মনুষ্যত্ব দুয়েরই বিপর্যয় ডেকে আনে। এদেশে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে গত কয়েক বছরের ইতিহাসের এটাই পরীক্ষিত সত্য।

মানুষের সমাজে একটা অধ্যায় ছিল যখন সংগঠিত অসহিষ্ণু ধর্ম সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সেই সর্বগ্রাসিতাকে মানুষ দুর্ভাগ্যজনক

বলেই জেনেছে। আজ যদি রাজনীতি হতে চায় এক নতুন অসহিষ্ণু ধর্ম তবে তার সেই অসংযত দাবিকেও বলতে হবে সর্বনাশী।

শান্তিনিকেতন ও শিক্ষার দ্বন্দ্ব

শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা পুরনো অভিযোগ বহুদিন থেকে চলে আসছে। ওখানকার আশ্রম ও পরিপার্শ্ব সুন্দর, কিন্তু অবাস্তব। আমাদের হতশ্রী বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে ছাত্রছাত্রীরা বাস্তবের মুখোমুখি হতে শেখে না। এই হল অভিযোগ।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিতৃষ্ণা কবির মনে ছেলেবেলা থেকেই জমে উঠেছিল। বলা বাহুল্য যে-সমাজ ও শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ, শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তন তার অনুকরণে গড়ে তোলা হয় নি। বরং একটা আদর্শকে রূপদান করবার চেষ্টাতেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে আপ্রাণ নিযুক্ত করেছিলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি মৌল ধারণা ছিল। সেইসব ধারণার সঙ্গে অনেকেই অল্পবেশি পরিচিত। প্রকৃতির সঙ্গে সহজ যোগাযোগ মানবশিশুর পক্ষে স্বাভাবিক। সেই যোগ রক্ষা করেই শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রতিদিন নিয়মে বাঁধা অথচ অত্যাশ্চর্য কত ঘটনা ঘটে চলেছে। শুঁয়োপোকা থেকে যেন কোনো যাদুকরের মন্ত্রে প্রজাপতি বেরিয়ে আসছে, পাখিরা আশ্চর্য নিপুণতায় বাসা বাঁধছে, মাটির তলার একটি মাটিরঙের বীজ থেকে হঠাৎ ভোরের আলোর ডাকে সাড়া দিয়ে দুটি ছোট্ট সবুজ রঙের হাত তুলে শিশুগাছ জানিয়ে দিচ্ছে সে জেগে উঠেছে, আকাশের গায়ে সাতরঙা রামধনু আঁকা হচ্ছে, থমথম দুপুরের স্তব্ধতাকে চুরমার করে ঝড় ছুটে আসছে দিগন্ত থেকে। চোখ খুললেই বিস্ময়ের অন্ত নেই। এই সবের সংস্পর্শে শিশুমনের কল্পনা ও কৌতূহল দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। এ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যা কিছু শেখানো যায় সে সবই যান্ত্রিক, বিশ্বের সঙ্গে মানবহৃদয়ের যোগসাধনের শিক্ষা তাতে সম্পূর্ণ হয় না।

শুধু প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতা নয়, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন মানুষের একটি আত্মীয়সমাজ। সেই আত্মীয়তা রক্তের সম্পর্কে স্থাপিত নয়। বরং বিশ্বের নানা স্থান থেকে মানুষ এসে একটি উষ্ণ সহৃদয়তায় সংঘবদ্ধ হবে শান্তিনিকেতনের নীড়ে, এই ছিল কবির আশা। আত্মীয়সমাজের সঙ্গে যোগও শিক্ষার পূর্ণতার জন্য আবশ্যক।

দুঃখের আবরণ ভেদ করে মানুষ আবিষ্কার করতে চাইছে আনন্দকে। এটাই মানুষের শুদ্ধ স্বভাব। আনন্দ থেকেই সৃষ্টি। এইরকম রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। আনন্দ বলতে এখানে বুঝতে হবে মিলনের আনন্দ, পীড়ন করে যে সুখ তার মূলে থাকে স্বভাবের বিকৃতি। শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক জীবনধারায় তাই মেলা ও ঋতু-উৎসবের একটা বিশেষ স্থান আছে। মেলা বলতে শুধু বেচা-কেনা নয়, মানুষে মানুষে মিলনের একটা ক্ষেত্র। ঋতু-উৎসবের মূল কথা, প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে মানুষের হৃদয়কে মিলিয়ে তারই আনন্দিত উচ্চরণ। আমাদের দেশে পুজোপার্বণের অভাব নেই। সেই সবের সঙ্গে কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের ধর্মের একটা যোগ স্থাপিত হয়ে গেছে। সাংবৎসরিক উৎসবকে

সাম্প্রদায়িক ভেদ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত করে শুদ্ধ আনন্দের প্রকাশরূপে তাকে সর্বমানবের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ইস্কুল' নামক জিনিসটাকে তিনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। তাঁর শিক্ষাদর্শের কেন্দ্রে আছে মানুষের আনন্দের সাধনা।

প্রকৃতির সঙ্গে সংলগ্ন এই যে আত্মীয়সমাজ আর উৎসবে অনুষ্ঠানে বৈশিষ্ট্যময় জীবনযাত্রা, আমাদের পরিচিত কলুষিত সংসারের সঙ্গে তার প্রভেদ অনেকখানি। আর এই থেকে আসে সেই পুরনো অভিযোগ, প্রথমেই যার উল্লেখ করেছি। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের তো ছড়িয়ে পড়তে হবে বাইরের জগতে, অন্তত অধিকাংশের পক্ষে আজীবন আশ্রমে বাস সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা কি তাদের প্রস্তুত করতে পেরেছে বাইরের সেই জগতের নানা বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য ?

এখানে মূল প্রশ্নটা আসলে শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমরা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলি। অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলবার একটা ক্ষমতা অধিকাংশ মানুষের ভিতরই থাকে। সেই ক্ষমতাটাকে আরো একটু শিক্ষিত করে তোলাটাই কি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ? না একটা আদর্শের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় ঘটানো, সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে ও পরিপার্শ্বকে নতুন করে রচনা করবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ? শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েরা, যারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে তারা সংগ্রাম করতে পারেনি, এমন প্রমাণ যথেষ্ট নেই। জীবনের নানা ঝড়ঝাপটার মধ্যেও শান্তিনিকেতনের শিক্ষা তাঁকে আত্মস্থ থাকবার শক্তি দিয়েছিল, এইরকম বলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। কথাটা কি একেবারে ভুল ? অক্সফোর্ড হোক নালন্দা হোক, পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থান সংসারের কোলাহল থেকে খানিকটা দূরে। আজকের বাস্তবের অনুকরণে গঠিত হতে পারে না কোনো আদর্শ বিদ্যালয়।

তবু কথা ফুরোয় না, কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। বাঁচবার জন্য একটা জীবিকা চাই। ছাত্রছাত্রীরা যদি আত্মনির্ভর হতে চায় তবে তাদের কোনো না কোনো বৃত্তিতে পটুতা অর্জন করতে হবে। শান্তিনিকেতন কি এদিকে মনোযোগ দিয়েছে ? প্রশ্নটা আরো একটু বিশদভাবে আলোচনার যোগ্য।

(খ)

ব্রিটিশ আমলে এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। উনিশ শতক থেকে শুরু করে দেশের শাসনযন্ত্রে বিভিন্ন স্তরে কেরানী থেকে ডেপুটি পর্যন্ত যেসব কর্মচারী প্রয়োজন হয়েছে তারা এই ইংরেজি স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করা ছেলেমেয়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আরেক কাজ শিক্ষক তৈরি করা। তা ছাড়া ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার এইসবও প্রয়োজন। এদেশের নতুন মধ্যবিত্ত বাবুসম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থারই সন্তান।

কর্মচারী তৈরি করা শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না। উকিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করবার কলেজ এখনো সেখানে হয়নি। সেই অর্থে বিশ্বভারতী একটি অসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। বলা ভালো, শন্তিনিকেতন পরিচিত ছাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে চায়নি। ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় দিয়ে ওখানকার শিক্ষাব্যবস্থা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন শিক্ষাদর্শের সঙ্গে এই ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়েরই সামঞ্জস্য সবচেয়ে বেশি। পরে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতজনকে আমন্ত্রিত করা, পূর্ব ও পশ্চিমের

ভাষা ধর্ম ও ইতিহাসে আগ্রহী কিছু গুণী মানুষের জন্য একটি মিলনক্ষেত্র প্রস্তুত করা, বিশ্বসংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্যের সন্ধান করা, এই ছিল সেদিনের বিশ্বভারতীর একটি প্রধান লক্ষ্য। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল সঙ্গীত সহ তার কলাভবন। তারও মূল সুর সমন্বয় ও সৃজনধর্মিতা।

তবু চাকরির প্রশ্নটাকে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই ডিগ্রীলাভের ব্যবস্থা হল। আর এই উদ্দেশ্যে যোগ স্থাপন করতে হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এইবার শুরু হয়ে গেল শান্তিনিকেতনে দুই অসমঞ্জস ভাবের এক অস্থির সহাবস্থান। ডিগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে গতানুগতিক পাঠ্যবস্তু, পরীক্ষাব্যবস্থা আর চাকরির বাজারের সঙ্গে যোগ একই সূত্রে এইসব এসে গেল। এইসবের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের মূল আদর্শের কোনো মিল ছিল না। শান্তিনিকেতনের মাটি থেকে এরা বিশেষ পুষ্টিলাভ করতেও পারেনি। বিদ্যাভবন বা শিক্ষাভবনের ডিগ্রীসংলগ্ন গতানুগতিক বিভাগগুলি তেমন উৎকৃষ্ট নয়। এদিক থেকে সমালোচকদের অভিযোগ একেবারে অবাস্তব নয়।

তবে কি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় জীবিকার প্রয়োজনের দিকটা উপেক্ষিত ছিল? তাও কিন্তু নয়। রবীন্দ্রচিন্তার এই দিকটা বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টি ঘোরাতে হয় প্রধানত শ্রীনিকেতনের দিকে। সেইখানে গড়ে উঠেছিল পল্লীসংগঠনবিভাগ। চাকরিজীবী নব মধ্যবিত্তের জন্য নয়, পল্লীর দরিদ্র মানুষের জীবিকার প্রশ্ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অন্ত ছিল না। কবির পুত্র নিযুক্ত ছিলেন গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির কাজে। এটা সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের নিজেরই আগ্রহে। কৃষি, সমবায় ও গ্রামীণ শিল্প নিয়ে তিনি যে-পরিমাণ চিন্তা করেছিলেন সেটা তাঁর সমান কোনো কবির কাছে একেবারেই আশা করা যায় না। বস্তুত এসব ক্ষেত্রে তিনি এদেশের অগ্রণী নেতা ও চিন্তকদের ভিতর পড়েন।

এ বিষয়ে তাঁর চিন্তার ধরনটা প্রথমে বুঝে নিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে শিল্পসদনের কথা ধরা যাক। শিল্পসদন হবে একটি উৎপাদনকেন্দ্র যাতে গ্রামের কিছু মানুষ বাঁধাধরা চাকরি পাবে, ববীন্দ্রনাথের পরিকল্পনার মূলকথাটা এইরকম ছিল না। পল্লীবাসী নিজ পল্লীতেই শিল্পকর্মে নিযুক্ত থাকবে। সেখানে তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে উন্নত শিল্পকৌশল। যেমন চাষী নিযুক্ত থাকে কৃষিকর্মে নিজ গ্রামে, সেখানেই উন্নত চাষপ্রথা সম্বন্ধে জ্ঞান, কৌশল ও উপকরণ পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। শিল্পসদনের প্রধান কাজ হল গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যা ও কৌশলের এই সম্প্রসারণ। প্রয়োজনমতো সমবায়ের সাহায্যও নিতে হবে। চাকরির সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রামের আর্থিক সমস্যা দূর করা যাবে না। গ্রামোন্নয়নের জন্য চাই ভিন্ন পথ। শিক্ষা স্বাবলম্বন সমবায়, এইসবের ওপর রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন।

পল্লীসংগঠনবিভাগের কাজে প্রথম দিকে সুফল দেখা গিয়েছিল। রথীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্থানীয় গ্রামীণ শিল্পে কিছু উল্লেখযোগ্য নতুনত্ব দেখা যায়। কিন্তু সেই ধারা স্থায়ী হয়নি। শান্তিনিকেতনী শিল্পদ্রব্য এখন কলকাতায় তৈরি হচ্ছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রীনিকেতন পিছিয়ে যাচ্ছে। শিল্পসদনে আন্দোলন হচ্ছে স্থায়ী চাকরির দাবি নিয়ে। গ্রামে স্বনিযুক্ত বৃত্তি এবং উন্নত ধরনের উৎপাদন নয়, বিশ্বভারতীতে সরকারি টাকায় স্থায়ী চাকরির প্রতি গ্রামবাসীর প্রধান আকর্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 'পল্লীসঞ্জীবনী' সাধনা ব্যর্থতায় আক্রান্ত।

শ্রীনিকেতনের নিজস্ব বিদ্যালয় শিক্ষাসত্র। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই আসছে শহরের পরিবার থেকে।

শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রী প্রধানত গ্রামবাসী। এদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পটভূমি আলাদা। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, এদের শিক্ষা দিতে হবে গ্রামের জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে। তা নইলে শিক্ষার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য থাকবে না, ফলে বিদ্যা আবারও হয়ে উঠবে কৃত্রিম বাইরের জিনিস। কিন্তু শিক্ষাসত্রের আদর্শ রক্ষা কবে শিক্ষাবিতরণ করবার মতো শিক্ষকেরও অভাব আছে। এইখানে অন্য এক দ্বন্দ্ব। শহরের টানটাই বড় হয়ে উঠছে। এটা আশ্চর্য নয়, তবু দুঃখজনক।

(গ)

শিক্ষানীতির সঙ্গে অর্থনীতির একটা সম্পর্ক আছে। সেইদিকে আবারও একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।

আমাদের অর্থনীতি দুই ভাগে বিভক্ত ; দুয়ের ভিতর বিভেদ কিছুতেই দূর করা যাচ্ছে না। একদিকে অনেকটা আধুনিক ধাঁচের সংগঠিত বৃত্তখণ্ড ; অন্যদিকটা পুরনো ধাঁচের, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অসংগঠিত। একদিকে বিমানযান, অন্যদিকে গোরুর গাড়ি। এই ভেদটা আরো বহুকাল চলবে, এর একটা সহজ কারণ আছে। অর্থনীতির আধুনিক বৃত্তখণ্ডে পুঁজির ঘনত্ব বহুগুণে বেশি, অর্থাৎ শ্রমিকপিছু পুঁজি লাগছে অনেকখানি। এক একটি বিমানবন্দরের খরচ অনেক, সেই তুলনায় কর্মী অথবা শ্রমিকের প্রয়োজন কম। আমাদের সীমাবদ্ধ পুঁজি নিয়ে অর্থনীতির আধুনিক খণ্ডে এদেশের বৃহৎ ও দ্রুত বৃদ্ধিশীল শ্রমিকসংখ্যার অল্প অংশকেই নিয়োগ করা সম্ভব। অধিকাংশকে জীবিকা খুঁজতে হচ্ছে অর্থনীতির দরিদ্র ও অসংগঠিত অংশে। কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের মতো অতিপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম এই সাবেকী অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, বৃহৎ শিল্প, বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এইসব নিয়ে অর্থনীতির আধুনিক অংশ। যেটা আধুনিক সেটার প্রচার বেশি ; যেটা সাবেকী সেটার প্রসার বেশি, যদিও তার অনেকখানি বাইরের জগতের চোখের আড়ালে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মনোযোগ প্রধানত অর্থনীতির সংগঠিত এবং আধুনিক অংশের প্রতি নিবদ্ধ। এইখানে অতি বড় অসম্পূর্ণতা। অসংগঠিত এবং সাবেকী অংশকে চলতে হচ্ছে প্রায় শিক্ষাব্যবস্থার সহায়তা ছাড়াই। তার মানে এই নয় যে, গ্রাম থেকে ছেলেরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে না। কিন্তু যারা ঢুকছে তারা বড় বেশি গ্রামে ফিরে যাচ্ছে না, তাদের গন্তব্যস্থল অর্থনীতির আধুনিক বৃত্তখণ্ড। প্রশাসনে অথবা ব্যবসায় ও শিল্পের সংগঠিত যন্ত্রে স্থানলাভ করাই তাদের বাসনা। বস্তুত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা নিজেই একটি বৃহৎ ব্যবসায়বিশেষ। রবীন্দ্রনাথ অন্তত সমস্যার মূল প্রকৃতিটা বুঝতে ভুল করেননি। আমাদের অর্থনীতির অসংগঠিত অংশকে কী করে সংগঠিত করা যায়, সেই পথ খুঁজেছে পল্লীসংগঠনবিভাগ।

সমস্যাটাকে এবার অন্য এক দিক থেকে দেখা যাক। এই শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গভঙ্গের সময় যে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ জন্মগ্রহণ করে এবং শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, এই বিচ্ছেদ রোধ করা প্রয়োজন, শিক্ষার সঙ্গে দেশের মানুষের, দেশের স্বার্থ ও সংস্কৃতির যোগস্থাপন করতে হবে, এইরকম একটা বোধ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ভিতর শক্তির সঞ্চার করেছিল। এরই টানে অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের

মতো মানুষেরা সেদিন আন্দোলনের অংশীদার হন।

তারপর আট দশক কেটে গেছে। জাতীয় শিক্ষার নেতারা যে বিজাতীয়তার বিরোধী ছিলেন তাকে কি রোধ করা গেছে? মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুমাত্র বেড়েছে কি না বলা কঠিন। নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে যদি-বা মাতৃভাষার জন্য একটা বিশেষ সম্মানের স্থান থাকে, পশ্চিমবঙ্গে তেমন কিছু দাবি করা যায় না। কলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্রদের ভিতর নানা কারণে ইংরেজীর আকর্ষণ প্রবল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বিদেশে যাওয়া যদি উদ্দেশ্য হয় তবে বিদেশী ভাষায় দক্ষতাই বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্বের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় অবশ্য কাম্য। স্বদেশপ্রীতি যদি মানুষকে বিশ্ববিমুখ করে তোলে তবে সেটা প্রশংসনীয় নয়। রবীন্দ্রনাথকে তো কিছুতেই বিশ্ববিমুখ বলা যায় না। কিন্তু তিনি জানতেন, অন্য কোনো ভাষাই মাতৃভাষার স্থান নিতে পারে না। যদি নিতে চায় তবে তাতে একদিকে দেশের ভিতর একটা গভীর বিভেদ এনে দেয়, অন্যদিকে আমরা চিত্তের স্বরাজ্য হারাই।

আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে-পরিমাণে মাতৃভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই পরিমাণে দেশের মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন। এমন কি ছাত্রসমাজের অভ্যন্তরেই এখন একটা বিপজ্জনক সাংস্কৃতিক বিভেদ এসে গেছে। বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি যারা প্রবলভাবে অনুরক্ত আর দেশের মাটির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, এই দুই গোষ্ঠী যেন দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত। এটা উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। পারস্পরিক বিতৃষ্ণার আতিশয্যে একদল হয়ে উঠছে "মৌলবাদী", অন্যদল স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। এই সাংস্কৃতিক বিভেদ দেশকে ঠেলে দিচ্ছে এক নৈরাশ্যজনক সংকটের দিকে।

এইসব দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় এপক্ষ অথবা ওপক্ষের উকিল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা তাঁর প্রতি অন্যায়। যদিও তিনি অবস্থাবিশেষে কখনো এদিক আবার কখনো ওদিকের কথাটা জোর দিয়ে বলেছেন, তবু দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে যাবার বুদ্ধি আর ঔদার্যেই তিনি অন্য অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁর নানা বিচ্ছিন্ন উক্তির ভিতর থেকে এই মূল ভাবটা খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। যেমন ধরা যাক একটি বিতর্কিত বষয়: শিক্ষায় ভাষার স্থান। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি।" তিনিই আবার শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে বিদেশ থেকে লিখেছেন, "সেদিনকার খবরের কাগজে পড়লুম মহাত্মা গান্ধী আমাদের মেয়েদের বলেছেন, তোমরা ইংরেজি পড়া বন্ধ কর, সেদিন বুঝেছি আমাদের দেশে দেয়াল গাঁথা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নিজের ঘরকে নিজের কারাগার করে তোলাকেই আমরা মুক্তি বলে মনে করছি।" রবীন্দ্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য তার সমন্বয়ধর্মিতা।

দারিদ্র্যব্যাধি যেমন ভেষজে আরাম করা যায় না, আমাদের অর্থনীতির সব সমস্যা তেমনি শুধু শিক্ষানীতি দিয়ে দূর করা সম্ভব নয়। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাগুরুদের হাতে এত শক্তিসামর্থ্য ছিল না যে তাঁরা বোলপুর থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারেন। তাই বলে পল্লীসংগঠনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তা করেছিলেন সেটা অসার্থক নয়। পরিস্থিতির অবশ্য পরিবর্তন হয়েছে, উপায় নিয়েও নতুন চিন্তা আবশ্যক। আজ যখন পঞ্চায়েতী শাসনের দিন এসেছে তখন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে নিয়ে যেতে হবে পঞ্চায়েতের নেতাদের কাছে। আবার বেসরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানেরও ভূমিকা স্বীকার্য। বাধা আসবে।

রাজনীতিও বাধা হতে পারে। তবু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজের ধারণা আজও মূল্যবান।

রাজনীতিই একমাত্র বাধা নয়। সাংস্কৃতিক বাধাটা তুচ্ছ করবার মতো নয়। একদিকে আমাদের পল্লীসমাজে এখনো চলছে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণেও এসে পৌঁছেছে নতুন বিদেশী সংস্কৃতির ঢেউ, উত্তেজক দ্রুত তালে বাঁধা সংস্কৃতি। বিদেশী বলেই কিছু অশ্রদ্ধেয় নয়। কিন্তু এই নতুন সংস্কৃতির মধ্যে শুধু যে একটা মাদকতা আছে তাই নয়, এর যোগ এমন এক জীবনযাত্রার সঙ্গে, এই দরিদ্র দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা যেটা হতে পারে না। এর আকর্ষণে একদিকে হতাশা বাড়ে ব্যক্তির মনে বলক্ষয়ী ভোগবাদিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, অন্যদিকে বিভেদ বিস্তৃত হয় সমাজের অভ্যন্তরে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন মিলনের ভিতরই মঙ্গল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজ এক নতুন দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। দ্বন্দ্বের স্বরূপ জেনে আমাদের নতুন করে মিলনের পথ খুঁজতে হবে। কিছুই একেবারে ফেলা যাবে না। একটা পূর্ণতার ভিতর কী করে তাকে স্থাপন করা যায় সেটাই প্রশ্ন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধশতাব্দী গত হয়েছে। তবু শান্তিনিকেতনের আজও একটা বাণী আছে। তাকে উপেক্ষা করলে দেশেরই তাতে ক্ষতি। এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি আজও যেসব বিরোধে চিহ্নিত, যেমন বৃত্তিভিত্তিক শিক্ষার সঙ্গে পূর্ণমনুষ্যত্বের জন্য শিক্ষার বিরোধ, পল্লী ও নাগরিকতার দ্বন্দ্ব, দুই অসমন্বিত সংস্কৃতির বৈপরীত্য, এইসব সম্বন্ধে শান্তিনিকেতন আমাদের আরো সদাত্মকভাবে সচেতন ও সমীহিত করে তোলে এবং সমাধানের উপায় বিষয়ে অন্তত কিছু মূল্যবান চিন্তা ও প্রয়াসের সন্ধান দেয়। অভ্যস্ত পদ্ধতিগুলি আজ অসমর্থ। রবীন্দ্রনাথের প্রোজ্জ্বল জীবনদর্শনে বিধৃত শিক্ষাচিন্তা প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি।

তবু রবীন্দ্রপুজো যথেষ্ট নয়। মূল থেকে চিন্তা শুরু করতে হবে। বৃত্তিশিক্ষার সঙ্গে বৃহত্তর শিক্ষাকে কী করে মেলানো যায় এটাই প্রাথমিক প্রশ্ন। এইখানেই মূল দ্বন্দ্ব। এর কোনো একমাত্র কিংবা সর্বকালীন উত্তর নেই। স্থানে কালে দ্বন্দ্ব ও সমাধানের স্বরূপ বদলে চলে। এদেশের এবং এই সময়ের জন্য সমাধান আমরা এখনও খুঁজে পাইনি।

৫

ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন

মার্ক্সের মূল্যায়ন

আধুনিক যুগের গোড়ায় যুক্তি ও বিজ্ঞানে বিশ্বাসী যে আন্দোলনের শুরু সেই আন্দোলনেই মার্ক্সীয় চিন্তাধারারও উৎপত্তি। এই নতুন যুক্তিমুখী আন্দোলনের আদি প্রবক্তাদের অনেকেই ধর্মে অবিশ্বাসী ছিলেন না। বরং বিজ্ঞান ও ধর্মের ভিতর একটি রেখা টেনে দিয়ে তাঁরা দুয়েতেই বিশ্বাস রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আঠারো শতকের জড়বাদী দার্শনিকেরা এই ব্যবস্থা মানতে চাইলেন না। তাঁরা বললেন যে, অজ্ঞতাই ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়।

এই ধর্মবিরোধী যুক্তিবাদী চিন্তাই মার্ক্সও গ্রহণ করেছিলেন। পুরাতন সমাজের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, সব সমালোচনার প্রথমেই প্রয়োজন ধর্মের সমালোচনা। মানুষের চিন্তার ইতিহাসে মার্ক্স এক মহান নাস্তিক।

অথচ ধর্মেরই একটি মূল সমস্যা রূপান্তরিত হয়ে ফিরে এল মার্ক্সের চিন্তায়। ভগবানের নির্দেশ অথবা নিয়ম অমান্য করে মানুষের পতন, পাপের ফলে ঈশ্বর ও মানুষের ভিতর বিচ্ছেদ, ইহুদী ও খ্রীষ্টধর্মের এটি একটি আদি প্রত্যয়। এই বিচ্ছেদবোধ পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় যুগে যুগে ফিরে এসেছে নানা প্রসঙ্গে বিবিধ রূপে। উনিশ শতকের গোড়ায় জার্মান দার্শনিক চিন্তায় একে আমরা পাই এক বিশেষ বেশে। যে সব নিয়ম সমাজকে ধারণ করে থাকে মানুষেরই চেতনায় তাদের উদ্ভব ; অথচ মানুষ তাদের আপন বলে চিনতে পারে না। এমনি ভাবে স্রষ্টা মানুষ ও তার সৃষ্টির ভিতর বিরোধ দেখা দেয়। এই বিচ্ছেদকে অতিক্রম না করে মানুষের মুক্তি নেই।

মার্ক্স সমস্যাটা দেখলেন অন্যভাবে। দ্বন্দ্বের মূল খুঁজতে হবে মানুষের খণ্ডিত চেতনায় নয়, বরং সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার গঠনে। উৎপাদনের যন্ত্রগুলি মানুষেরই শ্রমে সৃষ্ট ; অথচ এদের স্বত্বাধিকার অল্পসংখ্যক মানুষের ভিতর সীমাবদ্ধ। এখানেই সামাজিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। মূলধনের উপর সমাজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটবে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকের শ্রম ও তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার ভিতর যোগ নেই ; শ্রমিক তাঁর নিজের সৃষ্টিকেও আপন বলে গ্রহণ করতে পারে না। এই বিচ্ছেদের অবসান হবে সাম্যবাদী সমাজে। বিপ্লবের পথেই শুধু এই বাঞ্ছিত পরিণতি সম্ভব।

ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি বিশেষ যুগের অভিজ্ঞতাই মার্ক্সের চিন্তায় তীক্ষ্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। শিল্পবিপ্লবের গোড়ার যুগে নতুন শিল্পব্যবস্থার নিয়মকানুনে শ্রমিকশ্রেণী ছিল সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত, তাকে সে আপন বলে গ্রহণ করতে পারেনি। তা ছাড়া সে যুগে মজুরি ছিল স্বল্প ; শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি রাষ্ট্রের ব্যবহার ছিল সহানুভূতিহীন। মার্ক্স এই অন্যায়কে

ব্যঙ্গ করেছেন, শ্রমিকশ্রেণীকে দিয়েছেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা।

তারপর পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সাম্যবাদী দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধনতন্ত্রেরও ইতিমধ্যে চরিত্র পালটেছে। এ যুগের নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তবেই আজ মার্ক্সের মূল্যায়ন সম্ভব।

শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্সের জন্মভূমি জার্মানিতে শ্রমিকের জীবনে যে-সচ্ছলতা এসেছে, মার্ক্সের জীবদ্দশায় সেটা ছিল অকল্পনীয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়, একথা আর বলা চলে না। সাম্যবাদী সোভিয়েত দেশেও গত পঞ্চাশ বৎসরে শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রশংসনীয় উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু মার্ক্সের আদি প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে লেনিন যে-দল গঠন করেছিলেন পরবর্তী কালে স্তালিনী নেতৃত্বে সেই দলই বিচারহীন অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বিপ্লবের এই অধঃপতন মার্ক্সবাদী তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। স্তালিনী বিভীষিকাকে সাময়িক অঘটন বলে ছেড়ে দিলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সোভিয়েত ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশে শ্রমিকের স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে শিল্প পরিচালনার বাঞ্ছিত যোগসাধন হয়নি। বরং শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট দেশেও এক নতুন আমলাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। মার্ক্সবাদীরা বলে থাকেন যে, পুরনো ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তির পরোক্ষ প্রভাবেই এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সাম্যবাদী দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি ভেঙ্গে দেবার পরও যদি এই মনোবৃত্তি ছিন্নমূল লতার মতো ধীরে ধীরে অবসন্ন না হয়ে বরং পূর্ব ও পশ্চিমে দেশে দেশে প্রাণবন্ত হয়েই উঠে থাকে, তা হলে সন্দেহ করতে হয় দ্বন্দ্বের শিকড় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই নয়, আরও গভীরে। বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশের ভিতর সাম্প্রতিক সংঘাতও মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে অপ্রত্যাশিত। ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করলেই মানুষে ও শুভে বিচ্ছেদ দূর হয় না।

যে-খণ্ডসত্যকে মার্ক্স তাঁর বিশেষ যুগের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, শিল্পীর মন নিয়ে তাকে তিনি বাস্তবের চেয়েও বৃহৎ করে এঁকেছিলেন। শ্রেণীবৈষম্য ও অন্যায়ের প্রতি আমাদের মনকে তিনি সজাগ করেছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু মার্ক্সেরও মূল্যায়ন প্রয়োজন খণ্ডকালের সীমাতেই। নয় তো তাঁকে সেই ভগবানের আসনেই বসানো হবে যে-ভগবানকে তিনি আসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীবাদ কি অচল ?

সত্যের যেমন স্তরভেদ আছে গান্ধীজীর অহিংসাতত্ত্বেরও তেমনই ছিল। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগে গান্ধীর শিক্ষা এ দেশের অধিকাংশ নেতা মেনে নিয়েছিলেন শুধু আংশিকভাবে ও কয়েকটি সহজ ব্যবহারিক কারণে।

এ শতাব্দীর গোড়ায় সন্ত্রাসবাদীদের আশা ছিল যে, তাঁরা বিদেশী শক্তির কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানবেন। কিন্তু জার্মানি বা জাপান কারও কাছ থেকেই আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া গেল না। সে যুগে বিদেশী অস্ত্রসংগ্রহের চেষ্টা ও তাতে ক্রমাগত অসাফল্যের কথা মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে গভীর

হতাশার সুরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা অনেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন বিদেশ থেকে অস্ত্র সাহায্যের সম্ভাবনা ম্লান হয়ে এল অন্যদিকে তেমনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে সন্ত্রাসবাদী চিন্তাকে উৎসাহিত করবার মতো ফাটল দেখা গেল না।

এ অবস্থায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবার চিন্তার অবাস্তবতা অস্বীকার করা কঠিন ছিল। সশস্ত্র অভ্যুত্থান সফল হবার সম্ভাবনা সে দেশেই বেশী যেখানে সৈন্যবাহিনীর একটি ক্ষমতাবান অংশের আনুগত্য থেকে দেশের সরকার বঞ্চিত, অথবা দেশের শাসনযন্ত্র কোনো বড় যুদ্ধের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ছে এবং বিপ্লবীরা যথেষ্ট অস্ত্রসংগ্রহের পথ তৈরী করে নিতে পেরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ভারত যখন মোটামুটি অক্ষত অবস্থাতেই বেরিয়ে এল তখন দূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া এ দেশের সন্ত্রাসবাদীদের বড় কোনো ভরসা অবশিষ্ট রইল না। এই অবস্থাতেই গান্ধী এলেন তাঁর অহিংস প্রতিরোধের প্রস্তাব নিয়ে। বাস্তব রাজনীতির বিচারে গান্ধীর সেই প্রস্তাবকে সেদিন অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

সেদিনের পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের খানিকটা মিল আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী আজও সরকারের প্রতি অনুগত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা কাটিয়ে আমাদের শাসনযন্ত্র এখনও মোটামুটি অটুট। অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় ভারতের শাসনযন্ত্রের কাঠামো শক্ত। এ দেশে অতিবাম যে-সব রাজনীতিক দল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অথবা গৃহযুদ্ধের পথে ক্ষমতা দখলের চিন্তা করেন, সীমান্তে একটি বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে তাঁদের এখনও মনের আড়ালে লালন করতে হয়। নয়তো তাঁদের চিন্তা অবাস্তব। অরাজকতার পথে এ দেশে বিপ্লবী ও স্থায়ী সরকার গঠন করবার চিন্তায় বাস্তববুদ্ধির পরিচয় নেই, আছে শুধু দুর্মর বিপ্লববিলাস। গান্ধীনেতৃত্বের প্রথম যুগে যেমন নেহরু, আজাদ প্রমুখ নেতারা অহিংসাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ না-করেও গান্ধীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন আজও তেমনই হিংসাত্মক বিপ্লবের পথ বর্জন করবার জন্য কোনো ধর্মনীতি প্রয়োজন হয় না, বাস্তববুদ্ধির আলোতেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব।

দুই

গান্ধীর রাজনীতিক চিন্তার আরও একটি স্তর ছিল। ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে হিংসাত্মক আন্দোলন ব্যর্থ হবে এই পরিসীমিত সিদ্ধান্তের ঊর্ধ্বে তিনি তাঁর বক্তব্য স্থাপন করেছিলেন। (প্রসঙ্গত লক্ষ করা আবশ্যক যে, রাজনীতিক চিন্তাকে ছাড়িয়ে একটি তৃতীয় স্তর আছে যেখানে ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির শর্ত গান্ধী আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই শেষ স্তরের সমস্যা এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়।)

গান্ধী বিশ্বাস করতেন যে, অসত্যের ব্যবহারে কোনো মহৎ কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। অথচ হিংসাত্মক আন্দোলনের উপায় হিসাবে অসত্যের ব্যবহার অনিবার্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কার্যক্রম, যথা প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও গণবিক্ষোভ, পরিচালিত হয় দিবালোকে ও সর্বজনসমক্ষে। হিংসাত্মক আন্দোলনের একটি বড় অংশ গড়ে ওঠে লোকচক্ষুর আড়ালে, অন্ধকার গোপন সুড়ঙ্গে। এই গোপন আন্দোলনে অসত্যকে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। অথচ মিথ্যাচারণই যেখানে আন্দোলনের ধর্মস্বরূপ সেখানে পারস্পরিক বিশ্বাসে একদিন ফাটল দেখা দেবেই, কারণ সত্য ছাড়া পারস্পরিক বিশ্বাসের

কোনো ভিত্তি নেই। গান্ধী তাই তাঁর আন্দোলনে সত্যের প্রতি আগ্রহকে প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। সত্যের প্রয়োজন শুধু পরকালের মুখ চেয়ে পুণ্যার্জনের জন্য নয়। সত্য ছাড়া সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস সম্ভব নয়। হিংসা থেকে যে-মিথ্যার উদ্ভব এবং সেই জীবনবিপন্নকারী মিথ্যা থেকে আতঙ্কগ্রস্ত যে-অবিশ্বাস, তার ভয়াবহ বিষাক্ত বাষ্প কোনো সংগঠনে বা সমাজে ছড়িয়ে পড়লে যে-অবস্থার সৃষ্টি হয় তারই নাম সম্ভবত নরক। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও এই একটি প্রশ্নে মতৈক্য খুঁজে পেয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শোচনীয় পরিণতি রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে তীক্ষ্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: "মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

কথাটা অন্যভাবে বলা যাক। হিংসাত্মক আন্দোলন কোনো অবস্থায় ক্ষমতালাভে বা রাষ্ট্রযন্ত্র করায়ত্ত করার দ্বন্দ্বে সফল হতে পারে; কিন্তু সেই সাফল্যও ঝুটা সাফল্য। হিংসা ও মিথ্যাকে আশ্রয় করে যে-সংগঠন গড়ে ওঠে তাতে অবিশ্বাস ও অত্যাচার এমনই অনিবার্য যে, বিপ্লবের মহৎ আদর্শকে পাঁকের তলায় টেনে নামিয়ে তবে বিপ্লবীরা ক্ষমতায় আসীন হন। গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে সাক্ষ্যের অভাব নেই। রুশদেশে ক্ষমতালাভের জন্য লেনিন এমন একটি দল গড়ে তুলেছিলেন যার গতিবিধি ছিল গুপ্তঘাতকের মতোই গোপন এবং যার অভ্যন্তরে গণতন্ত্র রক্ষার চেয়েও গোপনীয়তা রক্ষা লেনিনের নির্দেশ অনুসারে প্রধান স্থান লাভ করেছিল। এই নতুন দলের চরিত্র সম্বন্ধে লেনিন তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে ("What Is To Be Done?") স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন:

"Secrecy is such a necessary condition for such an organization that all other conditions must all be subordinated to it." লেনিন ঠিকই বুঝেছিলেন। হিংসাত্মক আন্দোলনের অন্য সব শর্তের উপর প্রধান শর্ত গোপনীয়তা রক্ষা। এর পরিণাম আজ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ। লেনিনের দল রাষ্ট্রক্ষমতালাভের সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু স্তালিনী যুগে যদি বিপ্লবের সমস্ত মহৎ আদর্শকে ব্যঙ্গ করে পারস্পরিক অবিশ্বাস একটা বিভীষিকার মতো দল ও দেশকে গ্রাস করে থাকে তো গান্ধীবাদী বিচারে অন্তত সেটা অপ্রত্যাশিত নয়, বরং তার বিপরীত ঘটনাই হতো বিস্ময়ের কারণ।

গান্ধীর অহিংসাতত্ত্বকে 'অবাস্তব' বলে যাঁরা বাস্তববুদ্ধির গৌরব দাবী করেন তাঁদের এই কথাগুলি ভেবে দেখা প্রয়োজন। সমালোচকরা বলেছেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলন যদি-বা কিছু পরিমাণে সাফল্য অর্জন করে থাকে, হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে তাও সম্ভব হতো না। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর ভিতর ন্যায় ও গণতন্ত্রবোধ যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, হিংসার ব্যবহারে প্রতিপক্ষ যেখানে সম্পূর্ণ বিবেকবর্জিত, সেখানে অহিংস আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। গান্ধীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমালোচনার উত্তর আবারও সম্ভব দুটি ভিন্ন স্তরে।

অহিংস আন্দোলনের মূল কথা অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ। শাসকের অন্যায় চেষ্টা যতই প্রচণ্ড হোক-না কেন, সম্পূর্ণ অসহযোগের সম্মুখে শাসক অসহায়। কোনো অন্যায় ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারে না যদি আপামর জনসাধারণ মৃত্যুপণ করে সমস্ত সহযোগিতা থেকে অহিংসভাবে বিরত থাকেন। আদর্শ অহিংসা সর্বজয়ী। যদি বলা যায় যে, আদর্শ

অহিংসা সাধারণ মানুষের শক্তির অতীত, গান্ধীবাদী তা হলে তাঁর বক্তব্য রাখবেন একটি নিম্নতর স্তরে। গান্ধী বলেছেন অন্যায়ের বিরোধিতাই কর্তব্য ; যদি অহিংস প্রতিরোধ সম্ভব না হয় তো অহিংসা থেকে বিচ্যুত হয়েও অন্যায়ের বিরোধিতা করা শ্রেয়। কিন্তু একথাটা বিস্মৃত না হওয়াই ভালো যে, হিংসাত্মক প্রতিরোধের কতকগুলি কুফল আছে এবং শুধু উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে এই কুফল থেকে অব্যাহিতি পাওয়া যায় না। এটাই বাস্তব কথা। এর বিপরীত চিন্তা খণ্ড দৃষ্টি বা সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে অবাস্তব। হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে তবু এই সাবধানবাণী মনে জাগ্রত রাখাই ভালো যাতে যুদ্ধের ভিতর শান্তির শর্ত আমরা সততার সঙ্গে বারবার উচ্চারণ করে যেতে পারি। এটা বিশুদ্ধ অহিংসাতত্ত্ব নয়, বরং অসম্পূর্ণ জগতে সেই বিশুদ্ধ তত্ত্বের খণ্ডিত প্রতিফলন।

তিন

দলীয় রাজনীতির দৃষ্টিতে রাষ্ট্রক্ষমতার কর্তৃত্ব পরম অভীষ্ট। এই একটি অভীষ্টের কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ করে রাজনীতিক দলগুলি অবশেষে বিশ্বাস করে বসেন যে, সমাজের সকল মঙ্গল সাধনের জন্য প্রথম প্রয়োজন দলের পক্ষ থেকে শাসনযন্ত্রের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন। এই কাজটি তাঁদের এমনই অত্যাবশ্যক মনে হয় যে, অন্য সকল নীতিকে বিপন্ন করে ক্ষমতার সংগ্রাম প্রধান হয়ে ওঠে। গান্ধী রাজনীতিতে ক্ষমতার সংগ্রামকে সংযত করতে চেয়েছেন গঠনমূলক কর্মের সঙ্গে তার সংযোগ স্থাপন করে।

যুদ্ধের সময় জাতি যেমন একটি নিঃসংশয় লক্ষ্য খুঁজে পায়, অর্থাৎ শত্রুর সংহারই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দেয়, সমাজকে ভাঙার নেশায় যাঁরা মাতেন তাঁদেরও দৃষ্টিতে তেমনই একটি আপাতস্বচ্ছতা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে। শেষ বিচারে এটি অবশ্য অলীক স্বচ্ছতা : ভাঙবার উপায় উদ্ভাবনে যে-বিপ্লবীরা শাণিত বুদ্ধির পরিচয় দেন, বিপ্লবের পরবর্তী সমাজ সম্বন্ধে তাঁদেরই চিন্তা আবার অবাস্তব কল্পনায় মোহাচ্ছন্ন। হিংসাত্মক বিপ্লবের শেষ ফলাফলের সঙ্গে তাই আদি প্রত্যাশার মিল থাকে না। তবু একথা স্বীকার্য যে, বিপ্লবীর কাছে যতদিন ভাঙবার কাজটাই প্রধান ততদিন তাঁর কর্মে ও বক্তব্যে এমন একটা দ্বিধাহীন ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়, গণতান্ত্রিকের পক্ষে যেটা অনায়াসলভ্য নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই দুর্বলতার প্রতিষেধক হিসাবে গঠনমূলক কর্মের একটি বিশেষ মূল্য আছে। এরই ভিতর দিয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে যুক্ত হবার পথ খুঁজে পান। তাঁর নিজস্ব বক্তব্যটিও চেতনায় একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে এবং বাস্তব ও আদর্শনিষ্ঠার ভিতর কর্মের সেতু স্থাপিত হয়। গান্ধীজী সমাজসংগঠনে চরকাকে যে বিশিষ্ট স্থান দিতে চেয়েছিলেন তার সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ ধারণা সম্ভবত অমূলক নয় যে, আমরা গঠনমূলক কাজকে যে পরিমাণে উপেক্ষা করেছি অবাস্তব বৈপ্লবিক কল্পনাও সে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে আমরা সমবায়ে অপটু, সাম্যবাদী আন্দোলনে উৎসাহী।

গান্ধীর গঠনমূলক পরিকল্পনায় গ্রামের প্রতি একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। গান্ধী প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, দ্রুত শিল্পায়নের বিশেষত প্রথম যুগে আর্থিক সম্পদ ও রাজনীতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় নগরে নগরে। তিনি দেখেছিলেন যে, গ্রামে গ্রামে মানুষ তৃষ্ণার জল ও সামান্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, ক্ষুধায় অবসন্ন পাখীর মতো অসহায়। যে-সমাজে একদিকে ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণ, আর অন্য দিকে কোটি

কোটি মানুষ আত্মবিশ্বাস ও সংগঠনশক্তি থেকে এমন সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত, সেখানে স্বরাজ অথবা লোকরাজ সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্লবের পর প্রবল কয়েকটি দেশ যেমন দুর্বল দেশের উপর তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম করেছিল এবং এর একমাত্র স্বীকৃত প্রতিকার যেমন উপনিবেশগুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতির উদ্যোগ, গান্ধীও তেমনই বিশ্বাস করতেন যে, দেশের ভিতর কলকারখানার কেন্দ্রগুলির শাসন ও শোষণ থেকে গ্রামকে রক্ষা করার একমাত্র পথ গ্রামোদ্যোগ ও গ্রামরাজ। আধুনিক নাগরিক সভ্যতায় যে-জাতের মানুষ সৃষ্টি হয় তিনি তাঁদের বোধ হয় একটু ভয়ের চোখেই দেখতেন। তাঁদের যুক্তিবাদী মন অর্থ ও ক্ষমতাকেই জীবনে পরমলভ্য বলে সহজে গ্রহণ করে, আর যান্ত্রিক দক্ষতা ও ক্ষমতালিপ্সার যোগাযোগে সমাজের উপর তাঁদের একাধিপত্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। নগরভিত্তিক কোনো অর্থবান শ্রেণী অথবা প্রবল রাজনীতিক দলের পক্ষে সংগঠন শক্তিতে দুর্বল গ্রামের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন সহজ। এই বিপদের প্রতিকার সম্ভব গঠনমূলক কর্মের পথে। গ্রামে গ্রামে মানুষকে স্বায়ত্তশাসন ও আর্থিক স্বাবলম্বনে অভ্যস্ত করলেই গণতন্ত্রের দেশজোড়া ভিত্তি স্থাপিত হবে। গান্ধীর উক্তিতে কখনও কখনও কলকারখানার প্রতি বিরূপতা অতিরিক্ত জোরের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর চিন্তা সমগ্রভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও একথা আজ আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে স্পষ্ট যে, গ্রামের অর্থনীতি সুস্থ না হলে দেশের অর্থনীতিও সুস্থ হবে না এবং গ্রামে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি নির্জীব থাকলে অতিস্ফীত আমলাতন্ত্রের নিষ্পেষণে অথবা ওপর থেকে চাপানো গণকমিটির অত্যাচারে দেশময় গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

চার

নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছাড়া গঠনমূলক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। গান্ধী নিয়মের ভক্ত ছিলেন। আবার তিনিই ছিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের মহান নেতা। নিয়ম পালন ও নিয়ম ভঙ্গের ভিতর সামঞ্জস্যবিধান গান্ধীর চিন্তার একটি অতি উল্লেখযোগ্য দিক।

নিয়ম পালনকে গান্ধী কতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও মতবাদে তা সুস্পষ্ট। প্রশ্নটি একটি নৈতিক সমস্যার আকারে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু অতীতের কোনো প্রতিশ্রুতি যদি আজ আমার স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা বলে আমি অনুভব করি তবে সেখানে আমার কর্তব্য কি? এই প্রশ্নের দু-দিক থেকে উত্তর সম্ভব। কেউ বলবেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে নানা অপ্রত্যাশিত পথে; অতীতের কোনো অন্ধ প্রতিশ্রুতিকে জীবনে অগ্রগতির পথে অটল বাধা বলে মেনে নেওয়া যায় না। আবার কেউ বলবেন যে, প্রতিশ্রুতির মর্যাদা যদি রক্ষিত না হয় তো মানুষে মানুষে পারস্পরিক বিশ্বাস ভেঙ্গে পড়ে, সমাজে সহযোগিতার ভিত্তি দুর্বল হয়। চিন্তা না করে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়া ভুল, কিন্তু একবার প্রতিশ্রুতি দানের পর আপন বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই কর্তব্য। প্রথম মতের সমর্থনেও দু-একজন মহাপুরুষের নাম করা সম্ভব। কিন্তু গান্ধী ছিলেন ঐ দ্বিতীয় মতের মানুষ।[১] বাক্‌সংযম ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা, সময়ানুবর্তিতা, সাংগঠনিক নিয়ম পালন—এই সবই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ সত্যনিষ্ঠ জীবনের অঙ্গ। নিজের আশ্রমে তিনি নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিয়েছেন; নিয়ম ভঙ্গ হলে পুত্রকেও অব্যাহতি দেননি।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিশ্রুতি রক্ষা বা আশ্রমের নিয়ম পালনের মতোই বৃহত্তর সমাজে আইনের প্রতি আনুগত্যও একটি মৌল নৈতিক প্রশ্ন। নিয়মের জোরে যে-সমাজ শাসিত হয় না গায়ের জোরেই তাতে পারস্পরিক দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি হয়। নিয়মের রাজত্ব চূর্ণ হলে প্রতিষ্ঠিত হয় গুণ্ডার রাজত্ব। আইন অনেক সময় অন্যায় হয়; কিন্তু গুণ্ডার রাজত্বে নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা পায় না। অতএব প্রশ্ন, যে-আইনকে আমি অন্যায় মনে করি তার প্রতি আমার কর্তব্য কি? এই প্রশ্নটিরও দু-রকম উত্তর সহজেই মনে আসে। বলা যেতে পারে যে, যে-আইনকে আমি অন্যায় মনে করি সে আইন ভঙ্গ করাই আমার নিঃশর্ত কর্তব্য। কিন্তু এই মতের বিপদ আছে। সাধারণ মানুষ বহু পরিমাণে স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেহেতু আত্মপ্রবঞ্চনায় আমরা অনেকেই অল্পবেশী অভ্যস্ত, অতএব যে-আইন আমাদের স্বার্থের বিরোধী তাকেই অন্যায় ভেবে নিতে আমাদের খুব বিলম্ব হবার কথা নয়। স্বার্থ ছাড়াও আছে নানা অন্ধ বিশ্বাস। প্রতিটি ব্যক্তিই যদি তাঁর স্বার্থ অথবা অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে আইনের বিরোধ দেখা দিলেই আইন অমান্য শুরু করেন, তা হলে অনিয়মের রাজত্ব এবং তার ফলে আরও বহুগুণে বৃহত্তর অন্যায় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। অতএব দ্বিতীয় মত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, আইন মেনে চলাই কর্তব্য, যদিও আইনের পরিবর্তনও আমরা আইনসঙ্গত উপায়ে দাবী করতে পারি। কিন্তু সর্বাংশে বা সর্ববিস্থায় এই মতও গ্রহণ করা কঠিন। যে নিয়মকে আমি সর্বান্তঃকরণে অন্যায় বলে জানি সে নিয়ম ভঙ্গ করবার কোনো নৈতিক অধিকারই কি আমার নেই? যে-সমাজে আইন পরিবর্তনের আইনসঙ্গত পথ খোলা নেই সেখানে কি কর্তব্য?

অর্থাৎ, ব্যক্তিকে আইনভঙ্গের নিঃশর্ত অধিকার দেওয়া নীতির দিক থেকে নিরাপদ নয়, আবার আইন মেনে চলবার নিঃশর্ত কর্তব্যও স্বীকার করা যায় না। এই নৈতিক সমস্যার সমাধান সহজ নয়। কিন্তু গান্ধীর সমাধান স্পষ্ট। তিনি বলেছেন যে, যিনি আইনভঙ্গ করতে চান আইনভঙ্গের দণ্ডও তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে হবে। এই একটি শর্তেই শুধু আইনভঙ্গের নৈতিক অধিকার তিনি দাবী করতে পারেন। রাষ্ট্রের রচিত আইন যিনি ভঙ্গ করতে চান তাঁকে নিজের বিবেক ও সমাজের কাছে এই প্রমাণ রেখে যেতে হবে যে, তিনি কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে নয়, বরং দশের কল্যাণের জন্যই আইনভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রেমের পরিচয় যেমন দুঃখবরণে, আইনভঙ্গকারীর কল্যাণবুদ্ধির প্রমাণও তেমনই স্বেচ্ছায় দণ্ডগ্রহণে। এই সূক্ষ্ম অথচ সরল সিদ্ধান্তটি বর্তমান যুগের রাজনীতিক চিন্তায় গান্ধীবাদী বিচারের একটি মহৎ অবদান।

মার্ক্সীয় বিচারে অবশ্য এই গান্ধীবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে না হওয়া সম্ভব। মার্ক্সবাদী বলবেন যে, রাষ্ট্রের বিধান শ্রেণীনিরপেক্ষ নয়। ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর ভিতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব মৌলিক ও অনিবার্য। ধনতান্ত্রিক দেশে আইন প্রণীত হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্র চালিত হয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে। সর্বপ্রকারে এই আইনের বিরোধিতা করা শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক অধিকার। শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈপ্লবিক অধিকারের উপর কোনো শর্ত আরোপ করা প্রকারান্তরে ধনিকশ্রেণীকে সমর্থনেরই তুল্য।

এই শব্দগুলির একটা মাদকতা আছে; কিন্তু মার্ক্সীয় মত সর্বাংশে সত্য নয়। সমাজে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যা-কিছুতে এক শ্রেণীর লাভ তাতেই অন্য শ্রেণীর ক্ষতি নয়। এমন কাজও আছে যাতে সারা সমাজই লাভবান হয়, আবার এমনও কিছু আছে যাতে সারা সমাজের, অর্থাৎ সমাজের অংশ হিসাবে ধনিক ও শ্রমিক উভয়েরই ক্ষতি। বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতিতে শুধু শ্রেণীবিশেষ লাভবান হয়নি।

আজ থেকে একশত বৎসর আগে এক নতুন যুগের প্রভাতে জাপানের সম্রাট মেইজি শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে, সমস্ত পৃথিবী থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করে তাঁর দেশকে উন্নত করা হবে। তারপর জাপানী সরকারের অদম্য চেষ্টায় বিশ শতকের শুরুতেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর হয়, কৃষি ও শিল্পে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল দ্রুত প্রয়োগ হতে থাকে। উনিশ শ' ত্রিশের যুগের জাপানী জঙ্গী নেতাদের ক্ষমা না করেও সম্রাট মেইজির সিংহাসনারোহণের শতবর্ষ পরে আজ বলা যায় যে, শিক্ষা বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারে জাপান তাঁর শপথ রক্ষা করেছে। জাপানী সরকার বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রসারের জন্য যা করেছেন তাতে 'উন্নতি" হয়েছে শুধু শ্রেণীবিশেষের নয়, বরং সারা জাতির।

যে-কথাটা সম্ভবত আরও স্পষ্ট তা হলো এই যে, এমন বিপদও আছে যাতে বিপন্ন হয় সমাজের অংশ বিশেষ নয় বরং সারা সমাজ। এই আণবিক যুগে দাঁড়িয়ে এ কথাটা বিস্মৃত হবার মতো বড় ভুল আর নেই। ছোট ছোট যুদ্ধে ধনিকশ্রেণীর অংশবিশেষ কখনও লাভবান হয়েছে ; কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধে যদি পৃথিবী ধ্বংস হয় তাতে লাভ কার ? ক্ষতি নয় কার ? কাজেই পৃথিবীকে সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করা শ্রেণী এবং জাতি নির্বিশেষে সকলের কর্তব্য। মজুরকে শুধুই মজুর হিসাবে দেখা তাঁকে ছোটো করা। তিনি পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, এক কথায় মানুষ। এমন কিছু আদর্শ আছে যা শ্রেণীবিশেষের সম্পত্তি নয়। শ্রেণীর পরিচয়ে নয় বরং মানুষ বলেই তাকে আমরা মূল্য দিই, মানুষের উত্তরাধিকার বলেই তাকে বাঁচাতে চাই। এ কথাটা তথ্য হিসাবেও সত্য নয় যে, হিটলারী শাসনে লাভ অথবা ক্ষতি হয়েছিল শুধু ধনিকের অথবা শ্রমিকের। নাৎসীবাদের বীভৎসতাকে আমরা ঘৃণা করি মনুষ্যত্বের বিচারে।

গান্ধী অন্যায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি। শ্রেণী বিশেষের অন্যায়কে তিনি মেনে নিতেও বলেননি। বরং অন্যায়ের প্রতিরোধ না-করাটাই তিনি অন্যায় মনে করেছেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের এটা মূল কথা। কিন্তু দ্বন্দ্ব যদি অনিবার্য হয় তবু সেই দ্বন্দ্বের ভিতরও আমাদের উপায় সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন কি না সেটাই প্রশ্ন। সমাজকে সামগ্রিক বিনাশ থেকে বাঁচতে হলে, মনুষ্যত্বের আদর্শকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হলে, বিপক্ষের প্রতি হিংসাই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে না। গান্ধী দ্বন্দ্ব অস্বীকার করেননি ; তিনি দ্বন্দ্বকে নীতি দিয়ে বাঁধতে চেয়েছেন। এ চেষ্টাকে যদি অবাস্তব বলা হয় তো আবারও স্মরণ করা ভালো যে, নীতিহীন দ্বন্দ্বে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে এ আশাও কাল্পনিক।

পাঁচ

গান্ধী যুগধর্ম মেনে চলেননি। একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে তাঁর মতো বুদ্ধিমান লোক বোঝেননি যে, এ যুগে শিল্পের দ্রুত প্রসার অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু নাগরিক সভ্যতার প্রসারের ফলে মানুষ যে সামাজিক ও আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তার সম্বন্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করাই তিনি তাঁর কর্তব্য মনে করেছেন। যে-সুরে তিনি তাঁর কথা বেঁধেছেন তাতে যুক্তিবাদী মননশীলতা উৎসাহিত হয় না। যে-পৃথিবীতে একদিকে মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল হবে আর অন্যদিকে বিজ্ঞান মানুষের হাতে এনে দেবে অপরিমিত শক্তি, সেই পৃথিবী সম্বন্ধে তিনি শংকিত ছিলেন। যে-যুগকে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি বহু সংকটের ভিতর দিয়ে সে-যুগে যেদিন অতীত হবে সভ্যতা যদি তখনও বাঁচে তবে

গান্ধীর "অরণ্যে রোদন" আজকের বহু নাগরিক কোলাহলকে অতিক্রম করে সেদিনও মানুষের মর্মে একটি শাশ্বত বাণীর মতো ধ্বনিত হতে থাকবে। আর ইতিমধ্যে গান্ধীর দুয়েকটি নীতি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা রক্ষা করলে সমাজে কল্যাণবৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

গান্ধী ও মাও

বুদ্ধ ও গান্ধীর নাম এদেশে একসঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এতে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হলেও গান্ধীবাদের সমসাময়িক তাৎপর্য ঢাকা পড়ে যায়। জন্মান্তরের চক্র থেকে মানুষ কি করে মুক্তি পেতে পারে প্রাচীন ঋষিদের ভাবনা ছিল তাই নিয়ে। গান্ধীবাদের বিচার প্রয়োজন আজকের আর্থিক ও রাজনীতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায়।

এযুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা সম্ভবত এই যে, পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশ জুড়ে প্রাচীন, কৃষিপ্রধান, অনুন্নত সমাজে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে আর তারই মাঝে শুরু হয়েছে বৃহদাকার শিল্প গঠনের উদ্যোগ। এমনই একটা ভাঙ্গাগড়ার ভিতর গান্ধীর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে।

গান্ধী লক্ষ করেছিলেন, সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে একটা প্রবল ঝোঁক। আধুনিক শিল্প ও বিজ্ঞান এই ঝোঁকটাকে আরও শক্তিশালী করেছে। আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীকে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিল মূলত আধুনিক শিল্পপ্রধান সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধে।

এ যুগে বৃহৎ শিল্পের পরিচালকদের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা, পূর্বে কখনও তা দেখা যায়নি। আজকের রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র সমস্ত সমাজকে যেমন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অতীতে কখনও তেমন সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্র যদি স্বৈরাচারী হয় তো সেই স্বৈরাচার আজ সহজেই সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। আধুনিক সমাজ যদিও নানাদিক থেকে প্রাচীন সমাজের তুলনায় উন্নত তবু আজকের নৈর্ব্যক্তিক, হৃদয়হীন, অতিকায় প্রতিষ্ঠানের অবিচার সংবেদনশীল মনের কাছে কম অসহনীয় নয়। এই অবিচার প্রতিরোধের কোনো সহজ উপায় আমরা এখনও উদ্ভাবন করতে পারিনি। সাম্যবাদের কথা আমরা বলি বটে, কিন্তু তার সফল রূপায়ণের সূত্র আমরা জানি না। শিল্প ও মূলধন রাষ্ট্রায়ত্ত করলেও রাষ্ট্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের বাঁধন শিথিল হয় না বরং দৃঢ়তর হয়।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে গান্ধীর বিদ্রোহ অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, আজ চীন থেকে ফরাসীদেশ ও আমেরিকা অবধি ধনতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বহুদেশ জুড়ে তরুণের যে বিদ্রোহ সেটাও মূলত এই আমলাতন্ত্র ও মানবতার স্পর্শহীন অতিস্ফীত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। এই নতুন প্রতিবাদের ভাষা যাই হোক না কেন, এর সঙ্গে গান্ধীবাদ তথা নৈরাজ্যবাদের কোথাও একটা মর্মের যোগ আছে।

গান্ধী অবশ্য জানতেন যে, নিয়ম ছাড়া কোনো সুস্থ সমাজ অথবা প্রতিষ্ঠান চলে না ; সাধারণ জীবনে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করে চলবার শিক্ষাই তিনি দিয়েছেন। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও মানুষের নৈতিক কর্তব্য। একথাটা গান্ধী অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করেছিলেন। প্রতিবাদকে কিভাবে সার্থক করে তোলা যায় এই মূল প্রশ্ন

নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। এই চিন্তার ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি যে-সব প্রত্যয়ে উপনীত হন তারই গুণে গান্ধীবাদকে সমসাময়িক সমস্ত নৈরাজ্যবাদের ভিতর সবচেয়ে পরিণত বলা যেতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্র ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীভূত বিপুল শক্তির তুলনায় ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যে-মানুষ নির্ভীক, ভয়ের বন্ধন থেকে নিজেকে যিনি মুক্ত করেছেন, তিনি সেই মুহূর্তেই অন্তরে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। গান্ধী দর্শন এই অর্থে জড়বাদ থেকে স্বতন্ত্র। এই-যে আদর্শ সমাজে পৌঁছবার আগেই কল্পনায় আদর্শকে প্রত্যক্ষ করবার শক্তি, এই-যে বহির্জগতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই অন্তরে স্বাধীনতা অর্জনের সামর্থ্য, এরই জোরে মানুষ জড় জগতের অংশ হয়েও তার ঊর্ধ্বে। গান্ধী শিখিয়েছেন যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম প্রয়োজন অভয়। আর অন্তরে নির্ভয় হবার পর দ্বিতীয় প্রয়োজন অন্যায়ের সঙ্গে অহিংস অসহযোগ।

এই দ্বিতীয় কথাটি নিয়ে খানিকটা আলোচনা আবশ্যক। "চার অধ্যায়" উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে।" গান্ধী যখন এদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন তখন আমরা যে গায়ের জোরে ইংরাজের অত্যন্ত অসমকক্ষ ছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গান্ধী এসে আমাদের নতুন পথ দেখালেন। তিনি শেখালেন যে, অত্যাচারীর অত্যাচারও সম্ভব হয় না অত্যাচারিতের সমর্থন ছাড়া ; অতএব অহিংস অসহযোগের সাহায্যে অত্যাচারের অবসান সম্ভব।

গান্ধীর এই শিক্ষা শুধু সেদিনের ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। মার্কিন দেশে ক্ষমতাবান শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনে এই নৈতিক অসহযোগের শিক্ষাই দিয়েছেন মার্টিন লুথার কিং। আরও একটি উদাহরণ দিই। বাহুবলে বহুগুণে শক্তিশালী সোভিয়েত সৈন্যদল যে মুহূর্তে দুর্বল চেকোস্লোভাকিয়াতে প্রবেশ করেছে সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়েছে যে, অহিংস অসহযোগের পথেই আজ পূর্ব ইয়োরোপের মুক্তি সম্ভব।

শিল্পে অনুন্নত কোনো কোনো দেশে অবশ্য সংগ্রামের অন্য একটি পথও আছে। এই দ্বিতীয় পথের প্রধান ব্যাখ্যাতা বর্তমান যুগে চীনের নেতা মাও সে-তুং। মাও-এর বিপ্লবপদ্ধতি শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রযোজ্য নয়। যে-দেশ গ্রামপ্রধান, যেখানে আধুনিক যানবাহনের ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ, যেখানে সমাজজীবনে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে আর অসন্তুষ্ট কৃষকদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেবার পথও খোলা আছে, সেখানে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি সম্ভব। গান্ধী ও মাও উভয়েই নগরে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ লক্ষ করেছিলেন। এর প্রতিকার হিসাবে গান্ধী চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন ও আর্থিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে। আর মাও বিপ্লবীদের শিখিয়েছিলেন গ্রামের সশস্ত্র ফৌজের সাহায্যে নগর অবরোধ করে অবশেষে ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি করায়ত্ত করতে।

গান্ধীবাদের সমসাময়িক মূল্যায়নে এই দুই পথের তুলনা মূল্যবান। মাও প্রদর্শিত পথের দু'টি ভিন্ন পরিণাম সম্ভব। হয় "গ্রামের" সশস্ত্র ফৌজ "শহরের" সৈন্যের হাতে পরাজিত হবে, যেমন চীনের গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে চিয়াং কাইশেকের সৈন্যদের হাতে বিপ্লবী কম্যুনিস্ট ফৌজ পরাস্ত হয়েছিল, নয়তো গ্রামের ফৌজ শহর, অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র, দখল করবার পরে তাদেরই হাতে রাষ্ট্র আবারও অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হবে, বিপ্লবের আদি নেতা যদি ব্যর্থতা স্বীকার করতে না চান তো আবারও তাঁকে বিপ্লব ঘোষণা করতে হবে নতুন আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। চীনের বর্তমান ইতিহাসের শিক্ষা এই।

গান্ধী জানতেন যে, হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের অবসান ঘটবে না। তাই গঠনমূলক কাজ এবং অন্যায়ের সঙ্গে অহিংসা অসহযোগের পথই তিনি নির্দেশ করে গেছেন। যে উদ্যম ও সংগঠন শক্তি নিয়ে বিপ্লবীরা ভাঙবার কাজে নেমেছেন তার অর্ধাংশ গড়বার কাজে নিযুক্ত হলে সমাজের মুক্তির পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হতো। এ যুগের ইতিহাসে একটি দুষ্ট চক্র বার বার আবর্তিত হয়ে চলেছে। স্বৈরাচার ও বিপ্লব, বিপ্লব ও স্বৈরাচার, জন্মান্তরের চক্রের মতোই এই বেদনাদায়ক ঘটনা পরিক্রমা থেকে কি করে সমাজ মুক্তি পেতে পারে গান্ধীজী সেই সমস্যা নিয়েই চিন্তা করে গেছেন। গান্ধীবাদের সমসাময়িক তাৎপর্য এখানেই।

* "গান্ধীবাদের সমকালীন মূল্যায়ন" শীর্ষে বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত খণ্ডিত ভাষণের পূর্ণ পাঠ।

গান্ধী ও সংসদীয় গণতন্ত্র

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় পর্বের এখানে পরিসমাপ্তি। নতুন এক অধ্যায়ের আরম্ভে দাঁড়িয়ে আমাদের আজকের ভাবনাচিন্তা।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে প্রথম থেকেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এই শাসনতন্ত্রের নানা ত্রুটিবিচ্যুতির কথা সমালোচকরা বলেছেন। তবু এটাই আমাদের স্বীকৃত বিধান। বস্তুত সংসদীয় গণতন্ত্রের অবিচল প্রতিষ্ঠা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসেব অধুনা পরিসমাপ্ত অধ্যায়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চীন ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ইরান অথবা মিশর পর্যন্ত প্রাচ্যের এই বিশাল ভূখণ্ডে অন্য কোথাও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার তুলনীয় উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভারতকে এই সময়ে বহু ঝড়-ঝাপটা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহ হত্যাকাণ্ড যার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু এই সবের ভিতর দিয়েও, সামান্য ছেদ সত্ত্বেও, সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাকে আমরা ইতিহাসের একটি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ পর্বে অক্ষুণ্ণ রেখেছি। প্রতিবেশী অনেক রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনায় এটা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

সংসদীয় ও বহুদলীয় গণতন্ত্র চিরকালীন কোনো ব্যবস্থা নয়, অজর অথবা অমর নয়। এর যেমন একদিন উদ্ভব হয়েছে, অনুমান করা যায় তেমনি কোনো একদিন অন্ত ঘটবে। অন্তত এর রূপ ও চরিত্রের পরিবর্তন অনিবার্য। তবু এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য যে-জন্য একে আমরা মূল্যবান মনে করি।

রাজনীতিতে সর্বক্ষণ ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে। গণতন্ত্র এই দ্বন্দ্বকে কিছু স্বীকৃত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। এই ব্যবস্থা যখন ভেঙে পড়ে তখন ক্ষমতার দ্বন্দ্ব রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধের পথে ঠেলে দেয় সমাজকে। গণতন্ত্রে সম্ভব ক্ষমতার অহিংস হস্তান্তর। এটাই প্রথম কথা। আরো একটা কথা আছে।

আধুনিক সমাজ কিংবা আধুনিক মানুষের চিন্তা ও জীবনচর্চা কোনো একটি শাস্ত্র দিয়ে সামগ্রিকভাবে শাসিত নয়। নানা মানুষের এখানে নানা মত। একই ব্যক্তি জীবনের

বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের জীবন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে নানা ভাবে। এরই ভিতর দিয়ে গঠিত হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য, চিন্তার স্বকীয়তা, গণতান্ত্রিক বিন্যাসের যেটা বিশেষ ঐশ্বর্য। স্বভাবতই একের ক্রিয়াকলাপে অন্যের সঙ্গত অধিকার যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেটা দেখা দরকার। এ কথাটা মেনে নিয়েও গণতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মূল্য দেয়, স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষা করে যথাসম্ভব।

গণতন্ত্রের ভিতর যে সব গুণের সমাহার লক্ষ করা যায় তার তালিকায় এই সব কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ক্ষমতার হস্তান্তর, এই সবের জন্য শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ও অধিকার রক্ষিত হয় বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। আমরা ভারতে অন্তত নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছি। দেশের জন্য কাম্য অন্যান্য যে সব উদ্দেশ্য আছে, যেমন আর্থিক উন্নতি, সামাজিক সুবিচার এবং উচ্চনীচ অসাম্যহ্রাস, গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামোর ভিতর এইসবের জন্য মানুষের প্রচেষ্টা রূপলাভ করবে, এটাই আমাদের আশা।

গান্ধীর প্রধান পরিচয় অহিংসার অসামান্য ব্যাখ্যাতা ও প্রয়োগকর্তা রূপে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য তিনি বহুবার বহুরূপে স্বীকার করছেন। এ বিষয়ে তাঁর মূল যুক্তিটি সরল। তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ হবে বিবেকবান। কিন্তু বিবেক বস্তুটি ব্যক্তির অন্তরের ব্যাপার। অতএব গান্ধী মূল্য দিয়েছেন ব্যক্তিকে। আমরা যখন কোনো কাজ করি বাধ্য হয়ে অথবা অন্য পাঁচজনের অনুকরণে শুধু, তখন সে কাজ ঠিক-ভুল যাই হোক না কেন, তার পিছনে কোনো সক্রিয় বিবেক নেই। যন্ত্র নির্ভুলভাবে কাজ করে যেতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের বিবেক নেই। শুধু ব্যক্তি-মানুষই হতে পারে বিবেকবান। সমাজের অন্য দশজনের গৃহীত বিশ্বাস যদি আমি সত্য বলে অনুভব না করি তবে আমাকে একলাই চলতে হবে। অপরের প্রশ্নহীন অনুসরণ নয়, আবার স্বেচ্ছাচারও নয় ; নিজের হৃদয়কে শুদ্ধ রাখা এবং সেই শুদ্ধ হৃদয়ের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করাই ব্যক্তির কর্তব্য, এই ছিল গান্ধীর বিশ্বাস। এই অর্থে তিনি ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সমাজপরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থা, এই যদি হয় গণতন্ত্রের দুই মৌল প্রত্যয়, তবে গান্ধীর স্থান গণতন্ত্রের সপক্ষে এটাই ধরে নিতে হয়। এই অর্থে তিনি গণতন্ত্রের সমর্থনে মতপ্রকাশ করেছেন। অহিংসা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিয়ে যে গণতন্ত্র, গান্ধীবাদ তাকে পুষ্ট করেছে।

অথচ সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু স্পষ্ট এমন কি কঠোর মন্তব্য আছে, যাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। হঠাৎ যখন আমরা ঐসব বাক্যের সম্মুখীন হই তখন আশ্চর্য লাগে, চিন্তার কারণ ঘটে। সেটাই আবশ্যক।

গান্ধীরচনার ভিতর একটি মূল গ্রন্থ 'হিন্দ স্বরাজ'। এই গ্রন্থটিতে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্বন্ধে দু'টি মর্মান্তিক শব্দ উচ্চারণ করেছেন, 'বন্ধ্যা' ও 'বারাঙ্গনা'। এই শব্দ দু'টি সহ 'হিন্দ স্বরাজ' প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি পরে কখনো মতপরিবর্তন করা প্রয়োজন মনে করেননি, যদিও দ্বিতীয় শব্দটি তিনি প্রত্যাহার করতে রাজী হয়েছিলেন সৌজন্যের খাতিরে। যাই হোক, গান্ধী কী বলতে চেয়েছিলেন সেটাই বিবেচ্য। মনে রাখতে হবে যে গান্ধী যদিও ঐ বাক্যটি প্রয়োগ করেছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সম্বন্ধে তবু যুক্তির দিক থেকে আলোচ্য সবদেশেরই সংসদীয় ব্যবস্থা।

'বন্ধ্যা' শব্দটি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। পার্লামেন্ট অথবা সংসদে ভালোমন্দ নানারকম আইন পাশ করা হয়। আমরা হয়তো বলি, সংসদ অথবা সংবিধান অস্পৃশ্যতা

অথবা পণপ্রথা তুলে দিয়েছে। অথচ কথাটা বস্তুত সত্য নয়। পণপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত যদি যথেষ্ট প্রবল না হয়, তবে আইন প্রণয়ন করলেও সেটা কার্যকর হয় না। অস্পৃশ্যতা দূর করবার জন্য প্রয়োজন নতুন সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতি তৈরি না হলে আইন দিয়ে অস্পৃশ্যতা দূর করা যায় না। সমস্ত মৌল সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধেই একথা খাটে। কোনো মৌল পরিবর্তনের জননী নয় সংসদ অথবা পার্লামেন্ট। যে-পরিবর্তনের জন্য জনমত প্রস্তুত ও সংগঠিত, সেই পরিবর্তনই জন্মলাভ করে; নয়তো আইনকানুন নিষ্ফল। আর দেশকে কোনো শুভকর্মের জন্য প্রস্তুত করবার কাজটাও সংসদের ভিতর বৃদ্ধিলাভ করে না। সেটা ঘটে দেশময় সার্থক প্রচেষ্টার ফলে, বড় কোনো সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবে। মননশীল মানুষ, সার্থক শিল্পী, দক্ষ সংগঠক, নিঃস্বার্থ কর্মী, এঁদের সকলেরই তাতে অবদান থাকে। এঁরাই প্রকৃতপক্ষে নতুনের জন্মদাতা। যেখানে এই বৃহত্তর শক্তি উপস্থিত সেখানেই কিছু ঘটে। শুধু সংসদের শক্তিতে বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় না। গান্ধীর দৃষ্টিতে বিবেকী ব্যক্তি এবং জাগ্রত লোকশক্তিই প্রকৃত স্রষ্টা।

এর পর আসছে 'বারাঙ্গনা' শব্দটি। ভোটে জয়লাভ ক'রে যখন যে-দল আসে, সংসদ অথবা পার্লামেন্ট তখন তারই প্রভুত্ব মেনে নেয়। অথচ এই জয়লাভ সম্পূর্ণ নৈতিক উপায়ে ঘটে না। এর পিছনে থাকে টাকার খেলা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আরো নানা দুর্নীতি। অবশ্য জনমত একান্তভাবে টাকার বাধ্য অথবা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত, এমন কথা বলা ঠিক হবে না। শাসক দলও তো পরাজিত হয়, বিরোধী দল ভোটে জিতে ফিরে আসে ক্ষমতায়। জনগণের একটা বিচারশক্তি আছে, যাকে অবহেলা করা ভুল। কিন্তু গান্ধী যে কথাটা ঐখানে জোরের সঙ্গে বলতে চেয়েছিলেন সেটাও সত্য, তাকে অস্বীকার করা যায় না। গান্ধী সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে। শুধু সংসদ থাকলেই হল না, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়। সব কিছুকেই অপবিত্র করে তোলে স্বার্থসর্বস্ব ভ্রষ্টাচার। রাজনীতির একটা মূল ব্যাপার ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। সংসদীয় গণতন্ত্র কিছু নিয়ম বেঁধে দেয় বটে, কিন্তু দুর্নীতি সহজে ঠেকানো যায় না। সক্রিয় সচেতন সংঘবদ্ধ জনমতের একটা ভূমিকা চাই, দুর্নীতির প্রতিরোধের জন্য শুধু সরকার অথবা সংসদের উপর নির্ভর করে থাকাটা অবাস্তব।

আধুনিক যুগের গোড়ায় মাকিয়াভেলি প্রমুখ চিন্তানায়কেরা বুঝিয়েছিলেন যে সুনীতির বাধ্যতা থেকে মুক্তি দিতে হবে রাজনীতিকে। এযুগে রাজনীতিকে গ্রাস করছে দুর্নীতি। হিংসা ও মিথ্যাচারের নগ্নরূপ আমরা দেখেছি, হিটলার ও স্তালিন থেকে শুরু করে ক্ষমতালিপ্সু ডিকটেটরদের সর্বগ্রাসী রাজনীতিতে। সংসদীয় গণতন্ত্রে একটা ভদ্রতার মুখোশ থাকে। কিন্তু সেখানেও রাজনীতি মানেই তো কূটনীতি। তাতে কোনো নীতির বালাই নেই। মাকিয়াভেলির বিপরীত প্রান্তে দাঁড়ালেন গান্ধী। যে-রাজনীতি নীতিশূন্য, সমাজের পক্ষে তা মারাত্মক। জনগণের নামে যে রাজনীতি চলছে তাকে নীতির অধীনতা থেকে মুক্তি দিলে তাতে অবশেষে জনগণেরই অকল্যাণ।

সেই সঙ্গে আরো দুয়েকটি কথা গান্ধী অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। গান্ধী দেখেছিলেন, রাজধানী ক্রমে গ্রাস করে নিচ্ছে সমগ্র সমাজকে। ক্ষমতার লড়াই যে আজ সমাজের বুকের উপর অত্যাচারের মতো চেপে বসেছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে ক্ষমতার অতিকেন্দ্রিকতা। গ্রামসভার হাতে যথাসম্ভব ক্ষমতা ন্যস্ত করতে হবে। এই রকম গান্ধী চেয়েছিলেন। রাজ্য সরকার নয়, গ্রাম সমাজেই হবে ক্ষমতার ভিত্তি। এটা সহজ কথা নয়। কারণ গ্রামের ওপর বোঝা হয়ে

চেপেছে শুধু সরকারি শাসনযন্ত্র নয়, সেই সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং দলীয় রাজনীতি। আমলা এবং ব্যবসায়ীর কর্তৃত্ব অথবা জবরদস্তির সঙ্গে গ্রামসমাজ পরিচিত অনেকদিন থেকেই। দলীয় রাজনীতির অত্যাচার বেড়ে উঠেছে সম্প্রতি। ত্রিমূর্তিতে ক্ষমতার প্রকাশ, কখন কোন মূর্তি প্রধান হবে সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর।

দলীয় রাজনীতির অবশ্য একটা আদর্শগত বক্তব্য থাকে। ক্ষমতার লড়াইটা চলে সেই আদর্শের নামে। রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর দলের কর্তৃত্ব চাই, আদর্শের রূপায়ণের জন্য। এটাই বক্তব্য। ক্ষমতা দখল অথবা ক্ষমতা রক্ষাটাই কার্যত লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এটাই বাস্তব ঘটনা। ক্ষমতালাভের পথে যদি কোনো নীতি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তবে সেই নীতি বিসর্জন দেওয়া দলের কর্তব্য। দলের সভ্যের পক্ষে নীতির চেয়েও দল বড়। যাতেই দলের স্বার্থরক্ষা হয় সেটাই শ্রেয়। দলের শেষ লক্ষ্য নয় গ্রামস্থ ক্ষমতা, রাষ্ট্রিক ক্ষমতাই লক্ষ্য। বিভিন্ন দলের আসল লড়াইটা রাজধানীতে। সেই লড়াইয়ে জেতার জন্য গ্রামের উপর কর্তৃত্বটাও জরুরী। এমনি করে উঁচু মহলের রাজনীতির কলহ এসে ধাক্কা দেয় গ্রামের সমাজে। সুস্থ গ্রামীণ জীবনের পক্ষে সেটা একটা বড় বিঘ্ন।

পল্লীজীবন আজ জীর্ণ অজস্র দৈন্যে ও অশিক্ষায়। গ্রামীণ সমাজ ব্যাধিমুক্ত নয়। এর ভিতরে আছে বহু বিরোধ এবং অবিচার। তার সঙ্গে যখন দলীয় রাজনীতির মারফৎ আরো একটা বাইরের জটিলতা এসে যুক্ত হয় তখন অবস্থা আরো কঠিন হয়ে ওঠে। তবু তাঁর বাঞ্ছিত সমাজের ভিত্তি হিসেবে গান্ধী বেছে নিয়েছিলেন গ্রামকেই। গান্ধীর ধারণাটা আবারও সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে একটা আত্মীয়সমাজের আদর্শ আছে। নানা অবিচার, কুসংস্কার এবং অশিক্ষায় যতই আচ্ছন্ন হোক না কেন, তবু এটাই গ্রামসমাজের নিজস্ব আদর্শ। গান্ধী একথাই বিশ্বাস করতেন, যেমন করতেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রামসমাজের নব সংগঠনের জন্য যে প্রচেষ্টা, তার ভিতরও ঐ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা প্রয়োজন। শহরের ক্ষমতার লড়াই যখন গ্রামে এসে পৌঁছায় তখন তার সঙ্গে আসে নাগরিকতার শ্রেষ্ঠভাগ নয়, বরং তার নিকৃষ্ট ভাগ। গ্রামের সেবা করতে যাঁরা আসবেন তাঁরা কি হবেন এবিষয়ে সচেতন? নাগরিক স্বার্থের, দলীয় দ্বন্দ্বের ও কর্তৃত্বের প্রলোভনের আবর্জনা দূরে সরিয়ে রেখে তাঁদের আসতে হবে। তবেই তাঁরা গ্রামের সেবার যোগ্য হবেন।

গান্ধী তাই জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এই কথাটাই বলে গিয়েছিলেন এক জরুরী বার্তায়। তাঁর প্রস্তাব, কংগ্রেস দল ভেঙে দাও। যাঁরা গ্রামের সেবা করতে চান তাঁরা যেন সেই কংগ্রেসের নামে সেখানে না যান, রাজধানীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে যে কংগ্রেস দল। তাঁদের যেতে হবে গ্রামে, "লোক সেবক" এই পরিচয় নিয়ে। এইখানে গান্ধী আবারও সংসদীয় গণতন্ত্রকে অতিক্রম করে গেলেন। তিনি সংসদ বর্জনের ডাক দিলেন না। তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ সংসদীয় ক্ষমতায় আরূঢ়। তিনি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেননি। সংসদীয়গণতন্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। সীমাবদ্ধ তবু সেই প্রয়োজন। আরো নীচে, আরো ধীরে স্থাপিত হবে এদেশের বৃহৎ সমাজের স্থায়ী এবং প্রশস্ত ভিত্তি। স্থাপিত হবে গ্রামে। সেই সংস্থাপনের কাজ হবে কোন পথে?

নগর থেকে আমলারা যাবে গ্রামে। যাবে সেই ব্যবসায়ীরা, অর্থই যাদের দেবতা এবং প্রভু। সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে দলীয় রাজনীতির সেই ধ্বজাধারীরা যাদের হৃদয়ের ভূমি থেকে যেন উৎখাত হয়েছে বিবেক, সেখানে দেবতার আসনে দলীয় স্বার্থ। এদের দ্বারা গ্রামের সংগঠন সম্পূর্ণ হবার নয়। সেই সংগঠনের মূল কথাটাই এরা কেউ

জানে না।

গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবহার ও বিধান। তারই ফলশ্রুতি দলীয় রাজনীতি। কিন্তু পরিবার যেমন রাজনীতি দিয়ে চালিত হয় না, আদর্শ গ্রামেরও ভিত্তিভূমি হতে পারে না দলীয়তা। অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই—সত্যাগ্রহের পথে। বহুদলীয় ব্যবস্থা নয়, একদলীয় রাজনীতিও নয়, গান্ধীর মতাদর্শের সঙ্গে মেলে নির্দলীয় 'লোকনীতি'। গ্রামসমাজের যেটা আদর্শরূপ—জাতিভেদ ও শ্রেণীবিরোধ থেকে মুক্ত, আত্মীয়-ও-বান্ধব সমাজ— তাকে সৃষ্টি করা যাবে না, বৃহত্তর মানবসমাজের ভিত্তিতে তাকে সংস্থাপন করা সম্ভব হবে না দলীয়তার পথে। সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বন নয় কোনো বিশেষ দল। তাঁর অন্তিম আনুগত্য নিবদ্ধ নিজস্ব বিবেকে এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসে।

এইখানে গান্ধী সংসদীয় গণতন্ত্রকে অতিক্রম করে গেলেন। রেখে গেলেন ভবিষ্যতের সমাজের অন্য এক চিত্র। ভবিষ্যতের মানুষকে ডাক দিয়ে গেলেন, অন্য এক পথে। এটাই গান্ধীমার্গ। আজকের রাজনীতিবিদ বলবেন অসম্ভব, এ অসম্ভব। গান্ধী বলবেন, এ ছাড়া সমাজের মুক্তি অসম্ভব।

গান্ধী ও ঈশ্বর

কৈশোরে নাস্তিক্যের প্রান্ত ছুঁয়ে পরবর্তীকালে গান্ধী প্রবেশ করেছিলেন তীব্র আধ্যাত্মিক আকুলতায়। তবে যে-ভাবে কোনো কোনো যোগী পুরুষ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন বলে আমরা শুনেছি, গান্ধীর জীবনে সে রকম অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় না। এ বিষয়ে তাঁর দাবী ছিল সংযত এবং বিনীত। "তাঁকে আমি দেখিনি, তাঁকে আমি জানি না ; তাঁর প্রতি বিশ্বের যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসকে আমি আপন করে নিয়েছি।" কথাগুলি পাই গান্ধীর আত্মজীবনীতে।

ঈশ্বরের ব্যক্তিস্বরূপে তাঁর আস্থা ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যদিও তিনি মানুষের ভিতর ভগবানকে অনুভব করেছেন, তবু একথাও তিনি বলেছেন, "ঈশ্বরকে আমি ব্যক্তিরূপে ভাবি না। আমি মনে করি, সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বর এবং তাঁর নিয়ম অভিন্ন। তিনি ও তাঁর নিয়ম সর্বত্র বিরাজ করছে এবং সব কিছু চালিত করছে।" এসব বিষয়ে দুয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে অবশ্য কিছু প্রমাণ করা কঠিন। একই ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এমন অনেক কথা বলেন যার নানা অর্থ করা সম্ভব। তবু এ কথাটা ধরে নিলে ভুল হবে না যে, গান্ধীর কাছে ঈশ্বরের অন্বেষণ মানেই হল ঈশ্বরের নিয়মের অন্বেষণ। তিনি চাননি শুধু এক মুহূর্তের কোনো দৈবী অভিজ্ঞতা ; তিনি চেয়েছিলেন সেই নিয়ম, সেই অনন্য পন্থা সম্বন্ধে সম্যক বোধ, যার দ্বারা জীবনের সকল কর্মে চালিত হওয়া সম্ভব।

কী সেই অনন্য পন্থা ? গান্ধী এই প্রতীতিতে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঈশ্বরের নিয়ম মানেই প্রেমের নিয়ম, সত্যের আহ্বান। তিনি লিখেছিলেন, "এই প্রেমের বিধান মানেই হল সত্যের বিধান।" তাঁর দৃষ্টিতে প্রেম এবং সত্য অভিন্ন। তবু সত্য শব্দটিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। কেন ?

তিনি নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। মানুষের ভাষায় প্রেম শব্দটির অর্থের হেরফের বড় বেশি। ঈশ্বর এবং তাঁর নিয়ম বলতে নিঃসংশয়ে এমন কিছু বোঝায় যা সঙ্কীর্ণ নয়, সীমাবদ্ধ নয়। সত্য শব্দটিতে সেই দ্যোতনা আছে। সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবে প্রেম পরম মহত্ত্ব লাভ করে। সত্য থেকে যে-প্রেম বিচ্ছিন্ন তাতে সেই বিশুদ্ধতা নেই, আছে বন্ধন। গান্ধীর পছন্দ ছিল 'অহিংসা' শব্দটি। ঐ শব্দটিতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, কারো প্রতি বিদ্বেষ থাকা চলবে না। প্রেমে এই ভাবটা যতো না পরিস্ফুট, অহিংসায় আরো বেশি। ঐতিহ্যের গুণেই হোক, অথবা যে-কারণেই হোক, অহিংসার তেমন অর্থবিকার ঘটেনি, ভাব প্রকাশের বাহন হিসেবে ঐ শব্দটি আরো নিরাপদ। গান্ধীর এই রকম মনে হয়েছিল। যাই হোক, সঠিক ভাবটি প্রকাশ করাই হল উদ্দেশ্য। একবার যদি অর্থ পরিষ্কার হয় তারপর প্রেম, অহিংসা, সত্য সব নামই সমান। এর পরও প্রশ্ন উঠতে পারে, সত্যের সঙ্গে ঈশ্বরকে সমার্থক করা হল কেন ? গান্ধীর অন্বিষ্ট ছিল সেই সত্য যাতে জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারিণ করা যায় আর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়। যাকে আমরা জড় জগৎ বলে জানি তার নিয়ম নিয়ে জীবনের পরম লক্ষ্য স্থির করা যায় না। যে অনুভূতির গভীরে সেই লক্ষ্যকে উপলব্ধি করা যায় সেইখানে যোগ ঈশ্বরের সঙ্গে গান্ধীর সত্যের।

নিরীশ্বরবাদীদের সঙ্গে গান্ধীর পার্থক্য এখান থেকেই বোঝা সহজ। গান্ধী তো ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেননি ; নিরীশ্বরবাদীরা বলবেন, তবে আর ঈশ্বরের কথা টেনে আনা কেন ? ঈশ্বরকে বাদ দিলে থাকে প্রকৃতি। যে প্রেম প্রকৃতি থেকে সঞ্জাত, প্রকৃতির স্পর্শে সে বার বার মলিন হয়ে যায়। গান্ধী একটা আদর্শ প্রেমের কথা বলছিলেন। তাকে কখনও আমরা সম্পূর্ণ করে পাব না। তবু তাকেই আমরা লক্ষ্য বলে মেনে নেব। এটা যেন দেহী মানুষের দেহকে অতিক্রম করে যাবার সংগ্রাম। আমরা কখনও সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারব না। তবু এই সংগ্রামেই মহত্ত্ব। সেই বিশুদ্ধ প্রেম, সেই সত্যকে, গান্ধী নাম দিয়েছিলেন ঈশ্বর। যাঁকে তিনি কখনও সম্পূর্ণ দেখেননি, কিন্তু যাঁকে তিনি জীবনের চেয়েও মূল্যবান বলে জেনেছেন। দুটি কথা একসঙ্গে মনে রাখতে হবে। ঈশ্বরকে প্রেম থেকে আলাদা করে ভাবলে ঈশ্বরও হয়ে পড়েন শীতল, কঠিন, প্রেরণাহীন। আবার প্রেমকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে প্রেম হারায় তার শুদ্ধ দিব্যতা।

গান্ধী বলছেন, জ্যামিতিতে এমন কিছু ধারণা আছে, যেমন বিন্দু, যাকে ছোঁওয়া যায় না কিন্তু যা কাজে লাগে ; ঈশ্বরও সেই রকমই। গান্ধীর ঈশ্বর-ভাবনার একটা বৈশিষ্ট্য এই থেকে ভালোভাবে বোঝা যায়। গান্ধীর আগ্রহ ছিল মূলত তত্ত্বে নয়, প্রয়োগে। ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরের নিয়মকে গান্ধী জানতে চেয়েছিলেন কোনো দার্শনিক সমস্যার সমাধানের জন্য নয়, বরং আমৃত্যু অনুশীলনের ভিত্তি হিসেবে। দার্শনিকরা ব্যাখ্যা খুঁজেছেন ; গান্ধী চেয়েছেন প্রয়োগ। একবার কোনো এক খ্রীস্টান যাজক গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে এদেশে কী ভাবে কাজ করা ভালো হবে সে বিষয়ে পরামর্শ চান। গান্ধী বলেন, আপনার ধর্ম আপনি পুরোপুরি অনুসরণ করে যান। কিন্তু দেখবেন প্রেমকে যেন করে তুলতে পারেন একটা "কার্যকরী শক্তি"। প্রেমই খ্রীস্টধর্মের অথবা সর্ব ধর্মের মূল তত্ত্ব, একথা বলে তিনি থেমে যাননি। প্রেমকে করে তুলতে হবে একটা চালক শক্তি, এই কথাটার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। গান্ধীর আগ্রহ ছিল কর্মে।

খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে গান্ধীর কোনো কোনো বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। সে কথাটা এখানে সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যাক। মানুষের সেবার জন্য মিশনারী যাজকেরা

যে কাজ করতেন শিক্ষা অথবা নিরাময়ের ক্ষেত্রে, গান্ধী সে কাজকে মূল্য দিয়েছেন। কিন্তু ধর্মান্তকরণের ব্যাপারে তাঁর সংশয় এমন কি আপত্তি ছিল। রামমোহনের সঙ্গে গান্ধীর এখানে মিল আছে। ইংরেজ তখন ক্ষমতার অধিকারী। শাসকশ্রেণী যে ধর্মাবলম্বী তার প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে শাসিতদের মধ্যে, যার সঙ্গে ঐহিক প্রলোভন জড়িত। ধর্মের মূল বস্তুর চেয়ে সেটাই অনেক সময় বড় হয়ে ওঠে। ধর্মান্তরকরণ যেখানে ঈশ্বরের নামে অথচ ঈশ্বরের জন্য নয়, সেখানে তাকে সমর্থন করা যায় না। সামাজিক এবং রাজনীতিক ভেদাভেদ এবং অন্যান্য জটিলতাও এর ফলে বেড়ে যাওয়া সম্ভব।

গান্ধীর আরো একটা বক্তব্য ছিল এ বিষয়ে। তিনি মনে করতেন, সব বড় ধর্মের ভিতরই সত্য ও প্রেমের কথা আছে। মূল আদর্শের খোঁজে অন্য কোনো ধর্মে যাবার প্রয়োজন হয় না। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করতে হবে। কিন্তু নিজের ধর্মের ভিতর থেকেই খুঁজে নিতে হবে সেই আদর্শ যাকে ভিত্তি করে মানুষের সেবা করে যাওয়া সম্ভব। সত্যের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো অর্থ নেই। বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে গান্ধীর সঙ্গে মিশনারিরা সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি।

মিশনারি প্রসঙ্গ ছেড়ে আবার মূল কথায় ফিরে আসা যাক। গান্ধী জোর দিয়েছিলেন তত্ত্বকথার ওপর নয়, কর্মের ওপর। তিনি যে ঈশ্বরজ্ঞান চেয়েছিলেন তাকে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন নিজের জীবনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে। জ্ঞানই মুক্তি, এই রকম যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে জ্ঞানের সার্থকতা তার নিজেরই ভিতর। অন্য একটা সুর স্পষ্ট করে শোনা গেল আধুনিক যুগের শুরু থেকে। ফ্রান্সিস বেকন বললেন, জ্ঞানই শক্তি। বিজ্ঞানের ফল প্রযুক্তি। বিজ্ঞান মানুষকে দেয় সেই ক্ষমতা যার দ্বারা প্রকৃতিকে সে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারে। গান্ধীর কাছেও জ্ঞান অথবা সত্যই শক্তি। কিন্তু এ হল অন্য এক জ্ঞান, অন্য এক শক্তি।

অবশ্য এদেশে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে শক্তির কল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর নির্ভর নতুন কথা নয়। যোগ এবং তন্ত্রে সেটা মূল কথা। কিন্তু যোগীরা অনেকেই চেয়েছেন ব্যক্তিগত মুক্তি। গান্ধী তাঁর বোধিলব্ধ শক্তিকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন মানুষের বৃহত্তর সমাজে। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে গান্ধী যে যুগে কাজ করেছেন, যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, সে সবই অন্যজাতীয়। কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা কঠিন। যাকে তিনি সত্যের নিয়ম বলেছেন, সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময়েই তাঁকে নতুন পথ তৈরি করে নিতে হয়েছে। এজন্য নিজের জীবন নিয়ে তিনি করেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এটা কিছু আকস্মিক নয়, যে তাঁর আত্মজীবনীর নামকরণ হল, "সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা"। নিজে পরীক্ষা না করে আপ্তবাক্য গ্রহণ করবার মানসিকতা গান্ধীর ছিল না।

সত্যের নিয়ম তিনি কীভাবে বুঝেছিলেন, কীভাবে সেটা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, সেই আলোচনাতে এবার আসা যাক।

গান্ধী চেষ্টা করেছিলেন প্রেম অথবা অহিংসার শক্তিকে নানাভাবে কাজে লাগাতে। প্রেমের একটা আদর্শ রূপ আছে। তার কথা আরম্ভেই বলেছি। সত্যাগ্রহীকে সেটার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, নিজের অনুশীলনের ভিত্তি হিসেবে। কিন্তু প্রেমের যেটা লৌকিক রূপ তা থেকেও তার শক্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারি। সমস্ত অপূর্ণতা নিয়েও সেই প্রেমই সমাজকে বেঁধে রেখেছে। জীবনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে স্নেহপ্রীতি। আমরা

নানা বস্তুর প্রলোভনে আন্দোলিত থাকি বলে প্রেমের শক্তি সম্বন্ধে এই গোড়ার কথাটাও নতুন করে শিখবার প্রয়োজন হয়।

অথচ বিদ্যুতের মতই প্রেমের এই মৌলিক শক্তির কার্যকারিতা বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া কঠিন নয়। একটি শিশুকে যদি জন্মের মুহূর্ত থেকে বঞ্চিত করা যায় স্নেহের স্পর্শ থেকে, তবে তার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, আর যদি সে বাঁচে তবু মানুষ হয়ে বাঁচে না। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও এটাই পরীক্ষিত সত্য। তাই সমস্ত দণ্ডের ভিতর এক অসহনীয় দণ্ড নিঃসঙ্গ কারাবাস। সেই ভাগ্যহত ব্যক্তিকে জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণ যতোই দেওয়া হোক না কেন, মানুষের ঘনিষ্ঠতা, স্পর্শ এবং কণ্ঠস্বর থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে তার পক্ষে মনের স্থৈর্য অথবা সুস্থতা রক্ষা করা কঠিন। প্রেমহীন পরিবারও কারাবাসের মতো। প্রেমের শক্তিতেই সমাজ রক্ষা পায়। বহু হিংসা ও বঞ্চনা আমরা চারিদিকে দেখি বটে। কিন্তু হিংসা অথবা বঞ্চনার জোরে সমাজ বেঁচে নেই। যদিও কারো কারো ভিতর প্রেমের শক্তি নির্জীব, তবু এটাই মেনে নিতে হবে, মানবতার একটি মূল উপাদান ভালোবাসা। এই প্রেম কল্পনা নয়, একে সত্য বলে জানতে হবে।

সব মানুষের ভিতরই একটা তেজ থাকে, শক্তি থাকে। সাধারণত তাকে আমরা শুদ্ধরূপে পাই না, বহু অশুদ্ধ উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে প্রবাহিত হয় সেই শক্তি। কিন্তু তাকে অনুশীলনের ভিতর দিয়ে ক্রমে শুদ্ধ করে নেওয়া যায়। এই শুদ্ধ তেজকেই গান্ধী বলছেন আত্মার শক্তি অথবা সত্যের শক্তি। আবার একেই বলা যায় প্রেমের শক্তি। এটাই সঙ্কল্পের শক্তি হয়ে আমাদের নিযুক্ত করতে পারে নানা কাজে। গান্ধী একে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন প্রধানত দুই ধারায় ; এক, গঠনমূলক কাজে ; দ্বিতীয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে। গঠনমূলক কাজের উদাহরণ পাওয়া যাবে শিক্ষায় এবং গ্রামসেবায়। এর উদ্দেশ্য সহযোগিতা এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তি নির্মাণ। গঠনমূলক কাজ আর অন্যায়ের প্রতিরোধ, এ দুয়ের ভিতর গান্ধীর দৃষ্টিতে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। একটিকে বলা যেতে পারে অন্যটির জন্য প্রস্তুতি। কিন্তু সে আলোচনায় এখন আমরা যাব না। অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য গান্ধী যে পদ্ধতি সৃষ্টি করেন, সেটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে, সত্যাগ্রহ। অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য আত্মার শক্তিকে সংগ্রহ ও প্রয়োগ করার পদ্ধতি সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহের একটি মূল কথা হল অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ। যদিও অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করাও অন্যায়, তবু অন্যায়কারীর প্রতিও আমাদের ভালোবাসা রক্ষা করতে হবে। অহিংসার নিয়ম এই যে, কারো প্রতি হিংসা করা চলবে না, অন্যায়কারীর প্রতিও নয়। এটা হঠাৎ অসম্ভব মনে হতে পারে, আমরা সবাই কিন্তু এটা ছোটো সীমার ভিতর করে থাকি। মা যখন ছেলের অন্যায়ের পথ রোধ করে দাঁড়ান তখনও ভালোবাসা রক্ষা করেই প্রকাশ পায় তাঁর সেই বিবোধিতা। আমরা যাদের যথার্থ ভাবোবাসি তাদের প্রতি এই রকম আচরণই করে থাকি। এটা মনুষ্যত্বের নীতি। ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করবার কথা বুদ্ধ বলেছেন। খ্রীস্টের প্রেমের বাণীর সঙ্গেও আমরা পরিচিত। গান্ধীর বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, পরিবারের অথবা সম্প্রদায়ের ছোটো সীমা থেকে উদ্ধার করে তিনি সমাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে সেই নীতি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

সত্যাগ্রহীর দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনটি মূল ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এক, অন্যায় আত্মনির্ভর নয়, সে পরজীবী। দ্বিতীয়, কোনো মানুষই মানবতাশূন্য নয়। তৃতীয়, মানুষের নির্জীব মানবতাকে জাগিয়ে তোলা যায় ত্যাগের ভিতর দিয়ে, স্বেচ্ছায় আঘাত

গ্রহণের ভিতর দিয়ে। এই কথাগুলির সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

গান্ধী বলছেন, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আমরা অন্যায়ের সঙ্গে সহযোগিতা করি বলেই অন্যায় সম্ভব হয়। শোষণ সম্ভব হয় না যদি শোষিত সবাই শোষণকারীর আজ্ঞা পালন করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হয়। এই অর্থেই বলা হয়েছে যে, অন্যায় পরজীবী। সত্যাগ্রহীর প্রথম কর্তব্য অন্যায় শর্ত গ্রহণ না করা, অন্যায় পরজীবী। সত্যাগ্রহীর প্রথম কর্তব্য অন্যায় শর্ত গ্রহণ না করা, অন্যায় নিয়ম অমান্য করা, তাতে যত আঘাতই আসুক না কেন। অসহযোগ অনেক ক্ষেত্রে কঠিন কাজ। কিন্তু অসহযোগ যদি সম্পূর্ণ হয় তবে সাফল্য সুনিশ্চিত। অন্যায়কারীর ইচ্ছা সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ সেই ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার উপায় আর তখন থাকে না।

সব মানুষের ভিতরই মানবতা, অর্থাৎ মানবিক প্রেম ও সহানুভূতির সম্ভাবনা বর্তমান। এ বিষয়টা একটু আগেই একবার আলোচনা করা হয়েছে। মানুষ মানুষের দুঃখ বেদনায় সহানুভূতি বোধ করে এটাই স্বাভাবিক, এটাই মানুষের ধর্ম। সত্যাগ্রহী দুঃখ বরণের দ্বারা অন্যায়কারীর ভিতরও সেই মানবতাকে উজ্জীবিত করেন। সত্যাগ্রহীর মনে যদি হিংসা থাকে তবে স্বভাবতই তিনি একাজে সফল হবেন না। ভয়ে নয় নির্ভয়ে, হিংসায় নয় অহিংসভাবে, সত্যাগ্রহী সংগ্রাম চালিয়ে যান। অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ ও দুঃখবরণই হল তাঁর অস্ত্র। এটাও একরকম যুদ্ধ, তবে এ যুদ্ধ ত্যাগ এবং অহিংসার শক্তি নিয়ে।

প্রশ্ন উঠেছে, সত্যাগ্রহীরও তো বিচারে ভুল থাকতে পারে। যেটাকে তিনি অন্যায় মনে করছেন, এমন তো হতে পারে যে সেটা তাঁরই বোঝার ভুল। গান্ধী স্বীকার করছেন যে, সব মানুষেরই ভুল হতে পারে, সত্যাগ্রহীরও। তিনি বলছেন যে, অহিংস প্রতিরোধ এই কারণেও শ্রেষ্ঠ। যদি কোনো ভুল থাকে তবু সত্যাগ্রহীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে তিক্ততা থাকে না। জয়ে এবং পরাজয়ে উভয় ক্ষেত্রেই একটা সদিচ্ছার সৌন্দর্য থাকে।

আবার বলা হয়েছে যে, অহিংস প্রতিরোধেও এক ধরনের জুলুম আছে; এতে প্রতিপক্ষের উপর দৈহিক বলপ্রয়োগ করা হয় না সত্য, কিন্তু মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। কথাটা বিচার করে দেখা যেতে পারে। অহিংস প্রতিরোধও যেহেতু এক ধরনের যুদ্ধ, অতএব এতে শক্তির প্রয়োগ আছে। তবে গান্ধী এটাও বলেছেন যে, বিবাদ থাকলে প্রথমেই অসহযোগের দিকে যাওয়া উচিত নয়, আলোচনার পথেই যথাসম্ভব বিবাদের মীমাংসা করে নেওয়া সমীচীন। অন্য সব উপায় ব্যর্থ হলে তবেই সত্যাগ্রহী ব্যবহার করবেন তাঁর শেষ অস্ত্র। যদি সত্যাগ্রহী সত্যের নিয়ম অনুযায়ী নিজেকে চালিত করতে সক্ষম হন তবে প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। সেই পরিবর্তনে প্রতিপক্ষেরও কোনো হীনতা নেই। তবে মানুষের সব প্রচেষ্টার মতোই এখানেও সত্যাগ্রহীর কোনো ত্রুটি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আন্দোলনের পরিণামেও সেই ত্রুটি প্রতিফলিত হবে। পরবর্তী কোনো পর্যায়ে তারই সংশোধনের জন্য হয়তো নতুন করে সংগ্রাম শুরু হবে। মূল কথাটা তা হলে এই। অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য অস্ত্র চাই। কিন্তু সে অস্ত্র এমন হওয়া চাই যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ তার পরিণামে আবার নতুন অন্যায়ের সৃষ্টি না হয়। হিংসার চক্র হিংসা দিয়ে শেষ করা যায় না। গান্ধী অহিংস প্রতিরোধের পথ ও পদ্ধতি তৈরি করলেন। তাতে কতটা সাফল্য আসবে সেটা নির্ভর করবে পরিপার্শ্ব এবং প্রয়োগকর্তার যোগ্যতার ওপর। যেমন সমাজকে তেমনি নিজেকেও সত্যাগ্রহী ক্রমশ শোধন করে চলেন। সব সত্যশোধনেরই এটা স্বাভাবিক নিয়ম।

গান্ধী বলেছেন, তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। ভাষা দিয়ে বাণী রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত

ছিলেন না এমন নয়। বস্তুত তাঁর ভাষায় এমন পরিচ্ছন্নতা, এমন দার্ঢ্য এবং মাধুর্যের সমন্বয় ছিল যে, অনেকের কাছেই সেটা বিস্ময়ের বস্তু। তবু তিনিই বলবার অধিকারী ছিলেন যে, ভাষা নয়, তাঁর জীবন দিয়েই তিনি বাণী রচনা করেছেন। অহিংস যুদ্ধের তিনি শুধু তাত্ত্বিক অথবা ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্তত অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী তার অক্লান্ত প্রয়োগকর্তা। সেই অহিংস যুদ্ধেই তিনি প্রাণদান করেছিলেন। এমন নির্ভীক যোদ্ধা বড় দেখা যায় না। কিন্তু সেটাও প্রধান কথা নয়। প্রধান কথাটা বুঝতে হয় আমাদের যুগের পরিপ্রেক্ষিতে।

হিংসার যুদ্ধে মানুষ বহু শতাব্দী ধরে অভ্যস্ত। যতদিন মানুষের হাতে অস্ত্র ছিল সামান্য, ততদিন সেই যুদ্ধ ভয়াবহ হলেও মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। ক্রমে মানুষের হাতে এল হিংসার এমন অস্ত্র যে, তার ব্যবহারে যদি সংযম না আসে, যদি শতাব্দীব্যাপী হিংসায় অভ্যস্ত মনের সঙ্গে সংযোগ ঘটে নব আয়ত্ত ধ্বংসের শক্তির, তবে মানুষের সভ্যতার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এলেন গান্ধী। হিংসার পথ ছাড়া কি অন্য পথ আছে? গান্ধী বললেন, আছে। তাঁর জীবন দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখালেন যে, হিংসাই একমাত্র পথ নয়। আণবিক বোমা যখন ধ্বংসের মূর্তি নিয়ে দেখা দিল ইতিহাসের ভয়ার্ত রঙ্গমঞ্চে, গান্ধী তখন মানুষের কাছে তুলে ধরলেন বহু কষ্টে অর্জিত তাঁর এই মৃত্যুঞ্জয়ী আশার বার্তা, অন্য পথ আছে। ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মের নেতারা বলেছেন, এ যেন ভগবানের বাণী। তাঁর জীবন মানুষের কাছে দৈব আশীর্বাদ। গান্ধী ঈশ্বরকে দেখেননি। কিন্তু বহু মানুষের এই বিশ্বাস, ঈশ্বরই তাঁর ভিতর দিয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

গান্ধীর ভাষায় একটি পরিচিত শব্দ ফিরে ফিরে আসে, অহিংসা। রবীন্দ্রনাথের বাণীতে সেই শব্দটি, আনন্দ। এইখানে তাঁদের পার্থক্য। আবার এখানেই তাঁদের মিলও বটে। অহিংসারও মূলে আছে আত্মার যোগ। তাই থেকে আনন্দ। যে হেতু এঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় বহু বৈসাদৃশ্য, একজনের কর্মের ধারা আশ্রম থেকে প্রবাহিত হয়েছে রাজনীতির দিকে, অন্যজন রাজনীতিকে আশ্রমের বাইরে রাখতেই চেয়েছেন, চিন্তা করেছেন এঁরা নিজ নিজ পথে স্বাধীনভাবে, সে জন্য এঁদের ধ্যানধারণায় অমিল অপ্রত্যাশিত নয়। আশ্চর্য হতে হয় এঁদের চিন্তার সাদৃশ্যে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর চারিত্র ও কণ্ঠস্বর স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। সত্যের উচ্চারণ স্বভাবত বৈচিত্র্যে বিধৃত। কোথাও সাদৃশ্যে কোথাও-বা পরিপূরকতায় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কর্ম আমাদের পরম সম্পদ।

১

একটা মিল প্রথমেই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী দু'জনেরই নির্বাচিত কর্মক্ষেত্র ছিল পল্লীর প্রাঙ্গণে। সেইখানে তাঁরা বিশ্বকে আহ্বান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্ম

সেই কলকাতা মহানগরীতে, ভারতের তদানীন্তন রাজধানী এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর বলে যার খ্যাতি ছিল সেইকালে। গান্ধী তাঁর প্রথম যৌবনের কয়েকটি বছর কাটিয়েছিলেন লন্ডনে ও ভারতের পশ্চিমপ্রান্তের বৃহত্তম নগরে। অর্থাৎ, কলকাতা এবং বোম্বাই যদি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রধান কর্মস্থান হত তবে সেটা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু জীবনের ঠিক মধ্যবিন্দুতে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রম ও কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন শান্তিনিকেতন এবং সুরুলের গ্রাম। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসংগঠন নিয়ে বীরভূমের ঐ পল্লীপরিবেশে চলল চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁর অক্লান্ত সাধনা। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধী তাঁর আশ্রম স্থাপন করলেন প্রথমে সবরমতিতে, পরে সেবাগ্রামে। যদিও রাজনীতির স্বাভাবিক কেন্দ্র রাজধানী, তবু গান্ধী তাঁর কর্মের কেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করলেন গ্রামে।

আরো একটা মিল এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের আশ্রম ছিল না শুধু শাস্ত্রচর্চা ও যোগাভ্যাসের জন্য। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন, "শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ।" যাঁরা তাঁকে প্রধানত কবি ও সঙ্গীতকার বলেই জানেন তাঁদের কাছে এই উক্তি মনে হবে বিস্ময়কর। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। উভয়েরই কর্মে ও আদর্শচিন্তাতে এ বিষয়টি একটা বড় স্থান অধিকার করে ছিল।

রবীন্দ্রনাথ যাকে চিহ্নিত করেছিলেন পল্লীসঞ্জীবন শব্দটি দিয়ে, সে-বিষয়ে তাঁর চিন্তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার কিছু মূল বৈশিষ্ট্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। এই সব বৈশিষ্ট্য বহুপরিমাণে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন অনিবার্য। তবু অতীতের সঙ্গে যোগ রেখেই বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহাসিক সূত্রটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর নিজের চিন্তাও স্থির হয়ে থাকেনি তবু তাতেও একটা অন্তঃস্রোত এবং ধারাবাহিকতা আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি, জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা ঐক্যসূত্র আছে।" অনুরূপ বাক্য গান্ধীর লেখা থেকেও উদ্ধার করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাসের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে রাষ্ট্রনীতি এবং সমাজনীতির মধ্যে একটা দূরত্ব ছিল, রাষ্ট্র সমাজকে গ্রাস করতে পারেনি। রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ চলেছে, এক রাজবংশের পতন এবং অন্য বংশের অভ্যুত্থান ঘটেছে, রাজধানীতে পালাবদল দেখা গেছে, দেশী বিদেশী নানা জাতি নানা শক্তি সেখানে পর্যায়ক্রমে প্রভুত্ব করেছে। কিন্তু এসবই উপরতলার ইতিহাস। রাষ্ট্রনীতির নাটকীয়তা ইতিহাসের কাহিনী হিসেবে যতই চাঞ্চল্যকর ও আকর্ষণীয় হোক না কেন, ভারতীয় সমাজের স্থায়িত্ব অথবা তার মূল সংগঠন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে অন্যত্র।

রবীন্দ্রনাথ এই যে 'রাষ্ট্রতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্রে'র মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন এবং বিষয়টার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এর একটা বিশেষ কারণ ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে, মধ্যবিত্তসহ সাধারণ ভারতবাসী ক্রমেই সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। এতেই আমরা প্রকৃত অর্থে এদেশীয় ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছি এবং আমাদের আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস,

সম্মানবোধ সবই নষ্ট হচ্ছে, এই উপলব্ধি তাঁর ভিতর দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন, "সরকার বাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাব-নিবারণের আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই, এই রকম ধারণা মনে বদ্ধমূল হতে দেওয়াতেই আমরা নিজের দেশকেই যথার্থভাবে হারাই।" এরই বিরুদ্ধে দেশবাসীকে তিনি সতর্ক করতে চেয়েছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত ভাষণ ও প্রবন্ধে, 'স্বদেশী সমাজ' নামে যেটি পরিচিত। বাংলা ১৩১১ (ইংরেজী ১৯০৪) সালে রচিত সেই প্রবন্ধটির মূল চিন্তা যে তাঁকে শুধু সাময়িকভাবে অধিকার করেনি বরং এটা যে তাঁর একটি স্থায়ী ভাবনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি যে আরও পঁচিশ বছর পরে, বার্ধক্যে উপনীত হয়েও, তিনি সেই যৌবনকালের চিন্তার 'মর্মকথা' আবারও নিবেদন করেছেন : "রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান ; সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।...পাশ্চাত্য রাজার শাসনে এইখানে ভারতবর্ষ আঘাত পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজ্য শাসন তাকে অধিকার করলে।" যদিও রবীন্দ্রনাথ সেদিনের একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে 'রাষ্ট্রতন্ত্র' ও 'সমাজতন্ত্র'র ভিতর পার্থক্য করেছিলেন তবু তার সার্থকতা সে-কালেই সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের সমকালীন বিচার-বিশ্লেষণেও এর ব্যবহার অসঙ্গত হবে না।

গ্রামীণ সমাজের দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব এবং চিত্তের খর্বতার সঙ্গে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তবু তাঁরা পল্লীতেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন ভারতীয় সমাজ-আদর্শের মূলসূত্রটি, মূল্যবান বলে তাকে জানাতে চেয়েছিলেন। এর কারণ আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। মূল কথাটা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধেই পরিষ্কারভাবে বলেছেন। "মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ-স্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।... আমরা যে-কোন মানুষের যথার্থ সংস্রবে আসি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসি।... ইহার ভালমন্দ দুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন-কি তদপেক্ষাও বড়—ইহা প্রাচ্য।" পল্লীসমাজ মানেই হল আত্মীয়সমাজ অথবা প্রতিবেশিসমাজ। প্রতিতুলনায় রাষ্ট্র একটি হৃদয়হীন যন্ত্র। যখন এই যন্ত্রের কাছ থেকে কিছু সহায়তা লাভের সম্ভাবনা থাকে তখনও সে যন্ত্রই। এই উপলব্ধি ছিল গান্ধীরও। তিনি বলেছিলেন, "The individual has a soul, but the state is a soulless machine." ব্যক্তির হৃদয় আছে, আত্মা আছে, রাষ্ট্রের আত্মা নেই। নগরে যোগ হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বণিকশক্তির। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র।"

মানুষের সঙ্গে মানুষের কিছু সম্পর্ক থাকে যাকে বলা চলে প্রয়োজনের সম্পর্ক অথবা ব্যবসায়িক সম্বন্ধ। সেখানে এক মানুষ অন্য মানুষের কাছে মূলত একটি 'কার্যসাধনের কল'। আবার অন্য এক সম্বন্ধ আছে যাতে প্রয়োজনও হয়তো মেটে, কিন্তু প্রয়োজনের অধিক কিছু পাওয়া যায়। অপর মানুষকে যখন আমরা ব্যক্তি বলে মানি অতএব তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, অপরের দুঃখে নিজের দুঃখ এবং গৌরবে গৌরব বোধ করি, তখন লোকসংগ্রহের অন্য এক প্রতিষ্ঠাভূমিকে স্বীকার করা হয়। নগরের কর্মক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সম্বন্ধটাই প্রধান। পল্লীতে আত্মীয়সম্বন্ধ বড় হয়ে ওঠে। স্বদেশী সমাজে আত্মীয়সম্বন্ধের প্রাধান্য : "প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ-দ্বারা শোধন করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিতে পারি।" রবীন্দ্রনাথ এইভাবে ভারতীয় সমাজকে চিহ্নিত করেছিলেন। এই সমাজের অন্যান্য ত্রুটি যাই থাকুক না কেন এর একটা বিশেষ

মূল্য তিনি স্বীকার করেছিলেন। যে-হেতু পল্লীজীবনে এই মূল্যবান মানবিক সম্পর্ক দারিদ্র ও অশিক্ষায় বিকৃত, অতএব শিক্ষার সংস্কার ও গ্রামোন্নয়নকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বড় কাজ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। আত্মীয়-এবং-প্রতিবেশী সম্পর্ককে ভিত্তি করে যে ঘনিষ্ঠ সমাজ, আদর্শগতভাবে তারই নাম পল্লীসমাজ। একে সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে দিলে "মানবসম্বন্ধের মাধুর্য" অন্য কোনো আধারে রক্ষা করা যাবে না। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। তাঁর দৃষ্টিতে "মাতৃভূমির যথার্থ স্বরূপ গ্রামের মধ্যেই।" গ্রাম্যজীবনের মালিন্যের প্রতি অবজ্ঞাবশত যদি আজ পল্লী সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমরা সচেষ্টা না হই, তবে নতুন প্রযুক্তির বাহনে চেপে লক্ষ্মী কখনও আমাদের সংসারের দুয়ারে এসে দাঁড়ালেও আমাদের ঘরের ভিতর তাঁর জন্য আমরা আসন পেতে দিতে পারব না।

এ থেকেই এসে যায় দ্বিতীয় প্রশ্ন, পল্লীসমাজের শ্রীবৃদ্ধি কী করে সম্ভব ? একদিন ছিল যখন গ্রামের সম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রামত্যাগী হতেন না, পল্লীই তাঁদের বাসস্থান ছিল। ধনীর একটা দায়িত্ব সেদিন ধর্মে স্বীকৃত ছিল। ধর্মের সেই অনুশাসন সকলে সমানভাবে মানতেন এমন নয়। তবু গ্রামসমাজে যাঁরা বিত্তবান তাঁদের বিত্ত নানাপ্রকার দানের ভিতর দিয়ে সমাজের সেবায় নিযুক্ত হত। যেমন ধনীর ধনদান তেমনি যাঁরা বিদ্বান তাঁদের বিদ্যাদানের একটা দায়িত্ব ছিল। গৃহীর দায়িত্ব ছিল নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী দক্ষিণা দেবার। রাজধর্ম এই ব্যবস্থারই পরিপোষক ছিল। কিন্তু রাজার উপর গ্রামের সমাজ একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না। "যাহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে ; কিন্তু কেবল আংশিকভাবে, বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না তাহা নহে, কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত তিনিও তেমনই দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।" এইভাবে দেশের সমাজের অভ্যন্তরেই সেই ব্যবস্থা ছিল যার দ্বারা সমাজ নিয়ত রক্ষা পেত এবং পুষ্ট হত। রাজশক্তির উপর সেই সমাজ অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল না।

আধুনিক যুগের দুয়ারে পৌঁছে অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। যাঁরা ধনবান ও বিদ্বান তাঁরা গ্রামত্যাগী হতে শুরু করলেন। এবার তাঁরা হলেন শহরবাসী। গ্রামের উদ্‌বৃত্ত ধন আর গ্রামে নিযুক্ত রইল না, পুঞ্জীভূত হল শহরে। এইখানেই গ্রামসমাজের দুর্দশার সূচনা। এই দুঃখ অন্তরে বহন করেই রবীন্দ্রনাথ পল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি অবশ্য জানতেন যে এই প্রত্যাবর্তনই যথেষ্ট নয়। গ্রামোন্নয়নের একটা স্থায়ী উপায় তিনি খুঁজছিলেন, এ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বেই।

ব্রিটিশ আমলে জমিদারেরা যখন দলে দলে নগরবাসী হলেন তখন আমাদের পুরনো ব্যবস্থার একটা দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ল। সেকালে দান দাক্ষিণ্যের প্রথা থাকাতে এদেশের সাধারণ গ্রামবাসী নিজেদের সমবেত শক্তির উপর নির্ভর করবার জন্য কখনও যথেষ্ট প্রস্তুত হয়নি। পল্লীর সংকট নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে এই অভাবটাই রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে অনুভব করলেন। কোনো দয়াদাক্ষিণ্যে অথবা শুধু সরকারি সহায়তায় গ্রামের দুর্দশা দূর করা যাবে না। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে তিনি লিখলেন : "আজ ধনীরা শহরে এসে ধনভোগ করছে বলেই গ্রামের সাধারণ লোকেরা আপন ভাগ্যের কার্পণ্য নিয়ে হাহাকার করছে। তাদের বাঁচবার উপায় যে তাদেরই নিজের হাতে একথা বিশ্বাস

করবার শক্তি তাদের নেই। সমবায়নীতির দ্বারা এই সত্যকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা আমাদের আজকের দিনের কর্তব্য।" বস্তুত সমবায় শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ একটা বৃহৎ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন। সেটা নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

ভারতীয় সমাজের ভিত্তিতে চাই স্বনির্ভর গ্রাম, শহরের শোষণ থেকে গ্রামকে মুক্ত করতে হবে এবং সেজন্য গ্রামবাসীর কাছে তুলে ধরতে হবে সমবায়ের পথ, এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী দু'জনের চিন্তাতেই সমানভাবে উপস্থিত। এটাকে তাঁরা বলেছিলেন সত্যের পথ। সত্য শব্দটার বিশেষ ব্যবহার দু'জনের লেখাতেই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' বিষয়ে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞান হোক, মানুষ যে গভীর দুঃখ ভোগ করে তার মূলে সত্যের ত্রুটি।" মানুষকে মানুষের কাছ থেকে যা কিছু বিচ্ছিন্ন রাখে তাতে পূর্ণ সত্য নেই। সেই দৃষ্টি সত্যদৃষ্টি যার সাহায্যে বিচ্ছিন্ন মানুষ বৃহত্তর যোগের ভিতর দিয়ে সার্থকতা অর্জন করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের দিকে তাকালেন। সেখানে দেখলেন যে, একদিকে রাষ্ট্রতন্ত্র আর জঙ্গী জাতীয়তাবাদ দেশে দেশে বিরোধ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বময় একটা মহাযজ্ঞ চলছে। সবদেশের জ্ঞানীগুণীরা যেখানে মিলিত হচ্ছেন সেইখানে মানুষের যথার্থ অগ্রগতি ঘটছে। রাষ্ট্রনীতিতে তিনি দেখলেন সত্যের ত্রুটি, জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যের পূর্ণতা।

বিশ্বের জন্য যে কথা সত্য গ্রামের জন্যও তাই। আত্মশক্তিতে তখনই বিশ্বাস স্থাপন করা সহজ হবে সমবায়ের শক্তি যখন গ্রামবাসীকে আকৃষ্ট করবে। বিচ্ছিন্নভাবে যারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল তারাও নিজ নিজ শক্তিকে সমবেত করতে পারলে তাদের এগিয়ে যাবার পথ তৈরি হয়। "সমবায়নীতি মনুষ্যত্বের মূলনীতি, মানুষ সহযোগিতার জোরেই মানুষ হয়েছে।" গ্রামে গ্রামে যদি দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে হয়, গ্রামের মানুষকে যদি স্বাধীন ভাবে সমাজজীবনের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হয়, তবে যেমন জ্ঞানে তেমনি কর্মে বিচ্ছিন্নতা ত্যাগ করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাকে গ্রামের ভিতর প্রবাহিত হতে দিতে হবে। কৃষি হোক, স্বাস্থ্য হোক, আনন্দের উপায় হোক, সমস্যার সমাধানের জন্য মনের ভিতর মিলনের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সমবায়নীতির অন্য একটা দিক আছে যেটা প্রধানত ব্যবসায়িক কর্মসম্বন্ধীয়, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এজন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নানা রকম প্রতিষ্ঠান, নানা ব্যবস্থা, উদ্‌ভাবিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "সমবায়তত্ত্ব একটা আইডিয়া, একটা আচার নয় ; এইজন্য বহু কর্মধারা এর থেকে সৃষ্ট হতে পারে।" সহযোগিতার উদ্দেশ্যটাই প্রধান, প্রতিষ্ঠানের নানা রূপভেদ সম্ভব। কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী সমবায়ের সংগঠন ও পরিধির স্তরভেদ হয়। যেমন "কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার।" অর্থাৎ, একটি গ্রাম নিয়ে কাজ শুরু হলেও তাকে বৃহত্তর বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত করা আবশ্যক।

অনুপুঙ্খের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে মূল কথাতে ফিরে আসা যাক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মোট কথাটা এই, "যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি ভাবের ক্ষেত্রে তেমনি কর্মের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সত্যের উপলব্ধি ঐক্যবোধে নিয়ে যায় এবং ঐক্যবোধের দ্বারাই সকল প্রকার ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হয়।"

২

গ্রামোন্নয়ন অথবা পল্লী সংগঠনের প্রশ্নে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের গভীর সাদৃশ্য সত্ত্বেও বক্তব্যের ঝোঁকে খানিকটা পার্থক্য ছিল, সেটা এবার আলোচনার ভিতর আনা যেতে পারে। আত্মনির্ভরতা এক জিনিস, স্বয়ম্ভরতা অন্য জিনিস। প্রথমটি দুজনেই সমানভাবে চেয়েছেন। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে গান্ধীর বক্তব্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে আত্মশক্তির উপর জোর দিয়েছেন, অন্যদিকে বাইরের জগতের সঙ্গে দেবার এবং নেবার পথ উন্মুক্ত রাখবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। গান্ধী সেই পথ বন্ধ করতে চেয়েছেন এমন নয়। তিনিও তো বলেছেন, গ্রাম নিজেকে দেশের জন্য সমর্পণ করবে, দেশ বিশ্বের জন্য। তিনিও জানালা খোলা রাখতেই আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবু ফিরে ফিরে তাঁর কথার অন্য একটা ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের জীবনধারণের যে সব উপকরণ অত্যাবশ্যক সে সবের জন্য আমাদের স্বয়ম্ভর হতে হবে। একথা তিনি বলেছেন শুধু দেশের কথা ভেবেই নয়, গ্রামের কথা মনে রেখেও। কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি রূপে যে মণ্ডলী স্থাপনের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল তাকে তিনি দেখেছিলেন গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের স্তম্ভ হিসেবে। গান্ধীর মনেও একই কথা ছিল। কিন্তু গ্রামসমষ্টিকে আর্থিকভাবে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করবার উপর বেশি করে জোর দিয়েছিলেন গান্ধী।

আরো তলিয়ে ভাবতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় এই রকম। গান্ধী দেখেছিলেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বণিকতন্ত্রের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে গ্রাম। জীবনধারণের অত্যাবশ্যক সামগ্রীর জন্য গ্রাম যদি বাইরের মুখাপেক্ষী থাকে, আবদ্ধ হয়ে যায় কোনো জটিল সম্পর্কে, তবে শ্বাসরোধকারী সরকারী যন্ত্রতন্ত্র এবং বণিকের অধীনতা থেকে গ্রামকে মুক্ত রাখা যাবে না। এই রকম গান্ধীর মনে হয়েছিল। কাজেই তিনি চেয়েছিলেন যে, বাইরের সম্বন্ধটা গড়তে হবে এমনভাবে যেন হঠাৎ আক্রমণ এলে, অন্যায়ের প্রতিরোধের চেষ্টায় বাইরের সম্পর্ক কাটিয়ে গ্রামসমাজ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। সারা দেশের বেলায় আমরা যেমনভাবে চিন্তা করে থাকি, অর্থাৎ বাইরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের নানা সূত্র থাকবে তবু অর্থনীতিটা এমন হওয়া চাই যে যুদ্ধের সময় দেশ অত্যাবশ্যক উপকরণের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করবে না, গ্রামের ক্ষেত্রেও গান্ধী অনেকটা ঐভাবেই চিন্তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণায় ঝোঁকটা অন্যদিকে। যেমন দেশ তেমনি গ্রামসমাজ প্রাচীর তুলে বিশ্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবে, এমনি করে মানবসমাজ নিজেকে খণ্ডক্ষুদ্র করে রাখবে, এই বিপদটাই রবীন্দ্র-চেতনায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

উনিশ শ' বিশের কাছাকাছি বছরগুলিতে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের এই পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটা বিশেষ কারণে। আসলে ঐ সময়ে তাঁদের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতাই বিপরীতদিকে দুজনকে আকর্ষণ করেছিল। গান্ধী তখন দেশকে প্রস্তুত করছেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য। আর রবীন্দ্রনাথ তখন তৈরি হচ্ছেন এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যেখানে ভারত এবং বিশ্ব একটা অবারিত আতিথ্যের মধ্যে মিলিত হতে পারবে। গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মতভেদের ভিতর বিশুদ্ধ নীতির দ্বন্দ্ব খুঁজতে গেলে একটু ভুল থেকে যায়, পরিস্থিতিগত পার্থক্যটাও বিবেচনার ভিতর রাখা আবশ্যক।

বিজ্ঞান ভাবনার ক্ষেত্রেও এই দুই সার্থক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বার বার বিজ্ঞানশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন। 'পল্লীপ্রকৃতি'তে তিনি

বলছেন, "বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।" লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার বিজ্ঞপ্তিতে তিনি লিখেছিলেন : "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার।" দুটি কথা লক্ষ করবার মতো। এদেশের মানুষের মনে এমন অনেক কুসংস্কার আছে যার ফলে একদিকে আসে মিথ্যা ভেদাভেদ, সামাজিক যোগসাধনের পথে যেটা বাধা, আর অন্যদিকে মানুষ নানা দুর্বোধ দুর্বিপাকের ভয়ে অন্তরের তেজ হারিয়ে ফেলে। কৃষির উন্নয়নের কাজে রবীন্দ্রনাথ আরো বুঝেছিলেন যে, উৎপাদনের শক্তি বাড়াতে হলে বিজ্ঞানের সহায়তা অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞানের প্রয়োজন জীবনের নানা স্তরে। বিজ্ঞান একই সঙ্গে মানুষকে নিয়মের দ্বারা শাসিত এবং আশার দ্বারা আশ্বস্ত করে।

এবার গান্ধীর কথায় আসা যাক। আধুনিক বিজ্ঞানের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে ঝোঁক। গান্ধীর স্বভাবে ঐ গুণটি ছিল। কোনো কথা যখন তাঁর কাছে মূল্যবান মনে হয়েছে তখন তিনি সেটা নিয়ে বেশি দার্শনিক তর্কে না গিয়ে সেটাকে প্রয়োগের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। বারবারই ছোটবড় নানা ব্যাপারে এটা তাঁর জীবনে দেখা গেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। রাসকিনের বই, Unto This Last, পড়ে ভালো লাগলো গান্ধীর। ঘটনাটি তিনি আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমেই বইটির প্রায়োগিক তাৎপর্য তিনি তিনটি সূত্রের আকারে লিখে ফেললেন। তারপর বেশি বাক্যব্যয় না করে তিনি ঐ চিন্তা কর্মে পরিণত করতে উদ্যোগী হলেন। সংক্ষেপে তিনি লিখেছেন : "I arose with the dawn, ready to reduce these principles to practice," এটা ছিল তাঁর জীবনের একটা বড় পরীক্ষা। তাঁর সারা জীবন জুড়েই ছিল ছোট বড় আরো নানা পরীক্ষা।

একথা বলা হয়েছে যে, গান্ধী ছিলেন যন্ত্রের বিরোধী। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, আবার ভুলও নয়। তিনি নিজে বলেছেন, যন্ত্রের বিরোধী হব কী করে ! মানুষের দেহটাই তো হল এক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র। তবে একথাও তিনি যোগ করেছেন, যন্ত্র যখন মানুষের উপর চেপে বসে তখন আমি যন্ত্রের বিরোধী। ঐটাই গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন যান্ত্রিকতার বিরোধী। তবু এ ব্যাপারে দুজনের আবারও ঝোঁকের একটা পার্থক্য আছে। আধুনিক যন্ত্র—বৃহৎ যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্প—এমন এক সমাজ তৈরি করতে চলেছে যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে নগরে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, শাসনযন্ত্রে। এতে মানবিক সম্পর্কগুলি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ নিজেই হয়ে যাচ্ছে একটা যন্ত্র অথবা যন্ত্রের দাস। এ অবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যাকে শুধু তার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে গ্রহণ করাটা মানুষের কর্তব্য নয়, বরং মনুষ্যত্বের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যন্ত্র ও প্রযুক্তিকে নতুনভাবে নির্মাণ করাই জরুরী। গান্ধী এই ভাবে চিন্তা করেছিলেন। এই চিন্তা ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে। এতোদিন প্রযুক্তি এগিয়ে গেছে নিজ অন্ধগতিতে, আর সমাজ নিজেকে বদলে নিয়েছে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আজ কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, সমাজের আদর্শ কেন পাবে না অগ্রাধিকার ? প্রযুক্তিকে কেন নিয়ন্ত্রণ করা হবে না তারই সঙ্গে মিল রক্ষা করে ? এই নতুন চিন্তায় আছে গান্ধীর প্রভাব। তাঁর মূল চিন্তা ও আশংকাকে আজ শুধু অতীতমুখী বলে সরিয়ে রাখা যায় না।

জীবনযাত্রায় সরলতা ও সংযমের কথা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনই বলেছেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-জীবনে একদিন এইসব গুণের প্রশ্নাতীত প্রাধান্য ছিল। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সরল আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "ব্রহ্মকে

পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ বিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়।" বিশ বছর পর তাঁকেই বলতে শুনি, "মানুষের মনে ধনভোগ করার ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছাকে কৃত্রিম উপায়ে দলন করে মেরে ফেলা যায় না। সেই ইচ্ছাকে বিরাটভাবে সার্থক করার দ্বারাই তাকে তার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে।" বলা বাহুল্য, আধুনিক যুগের আন্তরিক বাসনার সঙ্গে এই দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিরই সামঞ্জস্য বেশি। তবে মনে রাখা ভালো যে, রবীন্দ্রনাথ এই উক্তিটি করেছিলেন সমবায়নীতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। অর্থাৎ ধনীর নয়, দরিদ্র সমবায়ীর উন্নত জীবনযাত্রার ইচ্ছাটাকেই এখানে সমর্থন করা হয়েছে।

দারিদ্র্যকে গান্ধীও আদর্শ করে তোলেননি। তাঁর সেই স্মরণীয় উক্তি উদ্ধৃত করার প্রয়োজনও হয় না, ক্ষুধার্তের কাছে ঈশ্বরও দেখা দিতে পারেন শুধু অন্নদাতৃরূপে। তিনি সেই গ্রামই চেয়েছিলেন যেখানে সকলের জন্য শ্রমের সুযোগ আছে, অন্নবস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা ও আরোগ্যের উপায় আছে। কিন্তু ভোগের বাসনার সপক্ষে কোনো উক্তি গান্ধীর লেখায় খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীতে আবারও এখানে কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি ও সভ্যতা মানুষের হাতে যে শক্তি দিয়েছে, বাহ্যপ্রকৃতির উপর যে কর্তৃত্ব দিয়েছে, তার ফলে শক্তি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর অপরিমিত ভোগের ইচ্ছা বেড়ে চলেছে। ভোগের কোনো উপকরণই আর মানুষকে স্থায়ীভাবে তৃপ্ত করে না, আরো নতুন উপকরণের জন্য শুরু হয় কাড়াকাড়ি। গান্ধীর দৃষ্টিতে এটা আধুনিক সভ্যতার একটা বিষম ব্যাধি। ভোগের বৃদ্ধির দ্বারা এর নিরাময় সম্ভব নয়, সংযমের দ্বারাই সম্ভব। প্রেম এবং ভোগের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। ভোগের দৃষ্টিতে সবই উপকরণ ; মানুষকে ভোগের দৃষ্টিতে দেখলে সেও হয়ে ওঠে একটা উপকরণবিশেষ। সভ্যতা যখন ভোগের তৃষ্ণাকে প্রবল করে তোলে তখন তাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মার যোগ খর্ব হয়, ভালোবাসাও পরিণত হয় পণ্যে। তা ছাড়া পৃথিবীতে যতদিন দারিদ্র অবশিষ্ট আছে ততদিন প্রয়োজনের অধিক ভোগের মধ্যে একটা কুশ্রীতাও আছে। এইসব কথা রবীন্দ্রনাথের কাছেও গ্রাহ্য ছিল। কিন্তু গান্ধী তাঁর বাক্যে ও জীবনে এই কথাগুলি ব্যক্ত করেছেন অনেক বেশি প্রবলতার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ভোগের বাসনাকে সংযত করতে চেয়েছেন প্রধানত সৌন্দর্যবোধের দ্বারা, গান্ধী নৈতিকতার দ্বারা। তবে গান্ধীর নৈতিকতাও ছিল না শুষ্কনীতিবোধ, তার উৎস ছিল প্রেমের শক্তিতে।

এই প্রেমের শক্তিতে বিশ্বাসের উচ্চারণে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভিতর বিস্ময়জনক মিল লক্ষ করা যায়। এক অবিশ্বাসী যুগের কাছে একই প্রত্যয় তাঁরা প্রকাশ করেছেন প্রায় একই ভাষায়। হিংসা ও বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যস্ত মানুষকে তাঁরা বলেছেন, সৃষ্টি যে আজও ধ্বংস হয়ে যায়নি, মানুষ যে বেঁচে আছে, এতেই প্রমাণিত হয় যে প্রেমের শক্তি পরাস্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথাটা শোনা যাক :

"The perpetual process that is going on in the world around us is a struggle for the victory of love...if victory were not always being achieved by goodness and beauty, then long before this, everything would have been devastated. We are then faced with this great fact of the existence of the Universe. This one fact, that there is still life, proves that life can be and is victorious over death...This great idea of love, always fighting the sin we have in the heart of

our humanity, is the reason why we should not despair over sin."

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আর্জেন্টিনাতে ১৯২৪ সালে। অপ্রেমের সঙ্গে সংগ্রাম চলেছে প্রেমের। বিশ্বের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে মৃত্যু এখনও জয়ী হয়নি। এরই পাশে রাখা যাক গান্ধীর কয়েকটি বাক্য :

"The fact that there are so many men still alive in the world shows that it is based not on the force of arms but on the force of truth or love. Therefore, the greatest and most unimpeachable evidence of the success of this force is to be found in the fact that, in spite of the wars of the world, it still lives on...Little quarrels of millons of families in their daily lives disappear before the exercise of this force...History does not and cannot take note of this fact."

এই শেষ বাক্যটি লক্ষ করবার মতো। জগতে যত কলহ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ, সেই সব লিখিত থাকে ইতিবৃত্তে। যে স্নেহ, প্রীতি, সহযোগিতা নিঃশব্দে মানুষের সমাজকে রক্ষা করে চলেছে তার ইতিহাস নেই, হতে পারে না। কথাগুলি আছে গান্ধীর হিন্দ স্বরাজ-এ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ-এর বছর পাঁচেক পরেই যার রচনাকাল।

গান্ধীর এক প্রিয় শিষ্যা রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, দুজনের ভিতর পার্থক্য কোথায়? সেটা ১৯২৯ সালের শেষ দিকের কথা। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : According to the Upanishad the reconciliation of the contradiction between *tapasya* and *ananda* is at the root of creation—and Mahatmaji is the prophet of tapasya and I am the poet of ananda."

প্রেমের প্রকাশ কখনও তপস্যায়, কখনও আনন্দে। এদের অভিন্ন বলা ভুল, এদের ঐক্য অস্বীকার করাও ভুল। সত্যের এই দুই ভিন্ন প্রকাশ।

৩

যদিও গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তবু আদর্শসমাজে নগরেরও প্রয়োজন আছে একথা তাঁরা অস্বীকার করেননি। গান্ধী বলেছিলেন,

"In my picture of the rural economy the cities would take their natural place."

পল্লীভিত্তিক সমাজেও নগরের একটা স্বাভাবিক স্থান থাকবে। রবীন্দ্রনাথের কথা, "আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করি নে যে, গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকম সংস্কার···যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত।"

বস্তুত নগরের পরিবেশে এমন কিছু চিন্তা ও আদর্শ গড়ে উঠেছে যাকে প্রয়োজন মতো শোধন করে যত্নের সঙ্গে মানবজাতির ক্রমবর্ধমান ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া আবশ্যক। এর কিছু পাওয়া যাবে বিজ্ঞান শিক্ষায়, যার খানিকটা আলোচনা আগেই করা গেছে। আরো কিছু আছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, যাকে স্বার্থসর্বস্বতা থেকে উদ্ধার করে রক্ষা করা প্রয়োজন। ব্যক্তির বহুমুখী সম্ভাবনা সম্বন্ধে নগরই আমাদের বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছে। আমরা জেনেছি যে, মানুষের বৃত্তি অথবা বিশ্বাসের জগতের

সীমানা একান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায় না জন্মসূত্রে। নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিকে অর্জন করতে হয় তার স্বকীয় সত্যানুভূতি।

এইসব কথা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীতেও খুঁজে পাওয়া যায় স্মরণীয় রূপে।

প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। সে দায়িত্ব তিনি কিছুকাল যথাসাধ্য সুচারুভাবে পালন করেছিলেন। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়েই আবার তিনি নিজের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে আরো গভীরভাবে পরিচিত হন। ক্রমেই তাঁর কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোনো বাইরের ধর্মই তাঁর অন্তরের ধর্ম হতে পারে না। ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব পথে সত্যকে লাভ করে, সত্যোপলব্ধির অন্য কোনো যথার্থ উপায় নেই। শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা। ঐতিহ্যশাসিত প্রাচীন সমাজে শিল্পীর প্রায়শ কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল না, শিল্পকর্ম ছিল ঐতিহ্যের একান্ত অনুবর্তী। রবীন্দ্রনাথের কাছে কিন্তু শিল্পকর্ম সর্বোপরি শিল্পীর নিজস্ব ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

ছবিটা এবার এইভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। সমাজের ভিত্তিতে থাকবে স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম। বিজ্ঞান ও সমবায়কে ভিত্তি করে তৈরি হবে গ্রামের আর্থিক উন্নয়নের পথ। গ্রামের সঙ্গে যোগ থাকবে শহরের, কিন্তু সেই যোগ হবে না আধিপত্য ও অধীনতার, শোষক ও শোষিতের। সেই যোগের ভিতর দিয়ে অবিরত চেষ্টা চলবে এক নতুন সমন্বয়ের। গ্রামের ভিত্তিতে আছে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ। দারিদ্র্যের মলিন স্পর্শ থেকে মুক্ত করে একে রক্ষা করতে হবে। শহরের স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে বাঁচিয়ে গ্রহণ করতে হবে বিজ্ঞানের আগ্রহ আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য। একটা ঐক্যের মধ্যে এইসব উপাদানকে সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। কিন্তু এটাই আগামী যুগের যথার্থ কাজ, তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন প্রধানত শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে, আর গান্ধী বিবেকী মানুষের বিচারবুদ্ধি নিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথের 'একলা চলো রে' গানটি ছিল গান্ধীর একান্ত প্রিয়। সমাজের সেবা করা ব্যক্তির কর্তব্য। কিন্তু সেই সেবার পথ বেছে নেবে ব্যক্তি নিজে। যদি সে পথ স্বেচ্ছায় নির্বাচিত না হয় তবে তার কোনো নৈতিক মূল্যই নেই। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে কোনো আদর্শ সমাজ একেবারেই সম্ভব নয়। হরিজন পত্রিকার পাতায় তিনি দ্বিধাশূন্য ভাষায় বলেছিলেন, ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। কথাটা তাঁর ভাষাতেই শোনা যাক :

"If the individual ceases to count, what is left of society? Individual freedom alone can make a man voluntarily surrender himself completely to the service of society...No society can possibly be built on a denial of individual freedom."

ব্যক্তি তার বিবেকের অনুসরণ করবে। এজন্য যদি তাকে সমাজের ঐকমত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় তবে সেটাই হবে তার কর্তব্য। একই সত্য কি তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের কাছে দেখা দিতে পারে? গান্ধীর উত্তরে আবারও কোনো দ্বিধা নেই। তিনি বলেছেন : "Does not God Himself appear to different individuals in different aspects?...there is nothing wrong in everyone following Truth according to his lights. Indeed it is his duty to do so."

আসল প্রশ্ন, সত্যের জন্য আমরা কতটা মূল্য দিতে রাজি আছি? ব্যক্তির সততার সর্বশেষ পরিচয় তার বিদ্বেষমুক্ত নির্ভীকতায়, তার দুঃখবরণের আগ্রহে। সর্ববিধ ভয় জয়

করা ছিল গান্ধীর জীবনের তপস্যা, যেমন জীর্ণতাকে জয় করাতেই ছিল রবীন্দ্রনাথের আনন্দ। এই দুই পথে ঘটেছিল দুজনের ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য উন্মোচন।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের ভিতর বহুবার মতবিরোধ ঘটেছে। প্রতিবার তাঁদের ভিন্নতাকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন অকপটভাবে, সুস্পষ্ট ভাষায়, অথচ পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রক্ষা করে। এমন বিদ্বেষহীন বিরোধের উদাহরণ কোনো দেশেই বড় দেখা যায় না। নাগরিকতার শ্রেষ্ঠ ফল যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাকে রক্ষা করেই এঁরা গ্রামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমস্ত সাময়িক দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন সত্যের প্রতি আগ্রহকে। এ আমাদের বিরল সৌভাগ্য যে, এঁদের আমরা পেয়েছিলাম একই কালে। তা নইলে সত্যের ভিন্নমুখী আহ্বানের এমন শোভন সহাবস্থান আমাদের দেখা হত না। যেখানে এঁরা ভিন্ন আর যেখানে অভিন্ন, দুয়ের ভিতর দিয়েই সত্যকে আমরা পাই আরো সমগ্রভাবে।

আমৃত্যু রক্ষা করে গেছেন দুজনই মানুষের প্রতি মৃত্যুহীন বিশ্বাস। গান্ধী বলেছিলেন—

"There are chords in every human heart. If we only know how to strike the right chord, we bring out the music."

আর রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে তো আমরা সবাই পরিচিত ; "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ"। এখানেও কথার সুরে একটু পার্থক্য আছে। একজন যেন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলছেন, তুমি বাজাতে শেখো। অন্যজন বলছেন বিশ্বকে উদ্দেশ করে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। শোনার যোগ্য বাণী রেখে গেছেন দুজনই। আমরা যদিও তাঁদের কতবার ব্যর্থ নমস্কারে বিদায় দিয়েছি, তবু তাঁরা বার বার আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সেই বিশ্বাসের কী প্রত্যুত্তর আমরা দেব ?

রবীন্দ্রনাথ ও যুক্তিবাদ

যুক্তিবাদের একটা মূল কথা এই রকম। বিশ্বের ঘটনা সকল যদি আকস্মিকতার ওপর নির্ভর করত, এসবের ভিতর যদি কোনো 'নিয়মের রাজত্ব' না থাকত, তবে কিসের থেকে কী হচ্ছে সে বিষয়ে বিচারবিবেচনার কোনো ভিত্তিই থাকতো না। সে ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ হত নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্ব নিয়মের দ্বারা চালিত। আর মানুষের ভিতর আছে সেই বুদ্ধি বা মননের শক্তি যা দিয়ে নিয়মকে বোঝা যায়, বিশ্বের নিয়ম ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। বহির্বিশ্বের নিয়ম আর মানুষের অন্তর্নিহিত যুক্তি এ দুয়ের ভিতর আছে এক আশ্চর্য সামঞ্জস্য।

বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম জানবার জন্য বুদ্ধির অনুশীলিত প্রয়োগকেই বলি বিজ্ঞান। এযুগে বিজ্ঞান বলতে এই বোঝায়। যুক্তির দ্বারা আহৃত জ্ঞানকে নানা উদ্দেশ্যে আমরা প্রয়োগ করি, সঠিক প্রয়োগের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। অন্যান্য প্রাণীদের ভিতর দেখি অন্ধ প্রবৃত্তির প্রাধান্য। উদ্দেশ্যের উপযোগী উপায় ও পরিকল্পনা সচেতনভাবে

উদ্‌ভাবন করে মানুষ। পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন হয় কার্যকারণজ্ঞান। প্রকৃতির নিয়মে আছে সেই জ্ঞানের বাস্তব ভিত্তি, আর যুক্তিতে আছে নিয়ম-অনুসন্ধানের শক্তি। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারালে মানুষ হয়ে পড়ে অন্তরে অন্তরে অসহায়। তাই থেকে তার বিপত্তি বেড়েই চলে। যুক্তিনির্ভরতা থেকে আসে বিজ্ঞান ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। এই সবই হল যুক্তিবাদীর মূল প্রত্যয়।

রবীন্দ্রনাথকে যদিও বিশ্বের লোক ভাবুক কবি বলেই জানে তবু যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনার আশ্চর্য মিল চোখে পড়ে। একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে, এই জন্যে এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে ; শরণাগত হবার জন্য সে একেবারে ব্যাকুল।" আবার বলেছেন, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চা।"

যুক্তিবাদী বলে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের খ্যাতি আছে। কয়েকটি মূল সূত্রের ভিতর তাঁর পরিণত বয়সের ধ্যানধারণাকে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। এই রকম একটি সূত্রে বলা আছে : "Rising out of the background of the law-governed physical nature, the human being is essentially rational." রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে, "বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে", এবং "এই নিয়মের 'পরে অধিকার প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত", তখন এইসব কথার সঙ্গে যুক্তিবাদের মিল স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের উপর রবীন্দ্রনাথ যে এতটা জোর দিয়েছিলেন তার কিছু বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর চারিদিকে তিনি দেখেছিলেন এক কুসংস্কারগ্রস্ত জগৎ। কুসংস্কার থেকে জন্ম নিয়েছে ভয় ও নির্দয়তা। আরাধ্য হয়ে উঠেছে নানা সাম্প্রদায়িক ও ভৌগোলিক "অপদেবতা"। পরাস্ত হয়েছে মানুষের মহত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, আর এই কাজে বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে সহায় বলে জেনেছিলেন। এই কারণেই তিনি বুদ্ধিকে "মোহমুক্ত" ও "সতর্ক" রাখতে বলেছিলেন। রবীন্দ্রভাবনার এই দিকটি উপেক্ষণীয় নয়।

তা ছাড়া ছিল দারিদ্র্যমোচনের প্রশ্ন। বিশেষত গ্রামবাসীর দারিদ্র্যদূরীকরণের কাজ যৌবন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে ভাবিত করেছে। এবিষয়ে তিনি কেবল দূরদর্শী দার্শনিক চিন্তায় আবদ্ধ থাকেননি। কৃষিকর্মের প্রায়োগিক দিক পর্যন্ত তাঁর কর্মধারা প্রসারিত হয়েছে। এইখানে আবারও বিজ্ঞান হয়েছে তাঁর সহায়। বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরতা ছাড়া দারিদ্র্যমোচনের উপায় নেই। তাঁর এই বিশ্বাস এতোটাই গভীর ছিল যে, নিজের পুত্রকে তিনি বিদেশে পাঠান কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। বিজ্ঞানের শক্তির অপব্যবহার হয় একথা অবশ্য তিনি জানতেন। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করতে হবে শুভকর্মে, দরিদ্র মানুষের মঙ্গলসাধনের জন্য। "বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।" এইরকম তিনি বলেছিলেন।

কাজেই যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বড় দিক। এসব বাদ দিয়ে রবীন্দ্রদর্শনকে দাঁড় করাতে গেলে ভুল হয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন এখানেই আবদ্ধ নয়। তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো কিছু পাই যা যুক্তিবিরোধী অবশ্য নয়, তবু যুক্তিবাদের পরিচিত সীমানার মধ্যে পড়ে না।

(খ)

যুক্তি ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হল তাতে জোর পড়েছে প্রয়োগের ওপর। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির একটা 'সংগ্রাম' চলছে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে সেই শক্তি যা দিয়ে পরিপার্শ্বের ওপর সে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করছে। আধুনিক যুগের প্রথম থেকেই এই কথাটার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: বিজ্ঞান হল শক্তি। যুক্তি ও বিজ্ঞান মানুষের হাতে এনে দেয় সেই শক্তি যার সাহায্যে প্রকৃতি ও সমাজকে সে ক্রমশ বদলে নিতে পারে তার সচেতন ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী।

সেই সব দেশকেই এযুগে আমরা 'উন্নত' বলে মানি যারা প্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর। প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য আধুনিক রাষ্ট্র যে এতোটা উঠে-পড়ে লেগেছে, তার কারণ এই নয় যে, এযুগের নেতারা বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট। বরং কারণটা এই যে, যুদ্ধাস্ত্র আর ভোগ্যবস্তু দুয়েরই উৎপাদনে প্রযুক্তির ভূমিকা খুবই শক্তিশালী। শুধু রাষ্ট্রনীতিতে নয়, জনমানসেও বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটাই আজ বিশেষ মূল্যবান ও আকর্ষক।

যে-প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি এযুগে প্রাধান্য লাভ করেছে, 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাকে আমরা অনেকেই অভিন্ন বলে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি। যুক্তিবাদও যুগধর্মের এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। দুনিয়াটাকে বদলানোই হল মানুষের প্রধান কাজ, এটা শুধু মার্কসীয় দর্শনের কথা নয়। একালের যুক্তিবাদী দর্শনের সাধারণ ঝোঁক এইদিকে। শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কি যাই থাকুক না কেন, যুক্তি ও বিজ্ঞান এযুগে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের উপায় হিসেবেই সমাদৃত।

এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যবান, তবু অসম্পূর্ণ।

প্রকৃতির ওপরই হোক আর অপর মানুষের ওপরই হোক, কর্তৃত্বটাই যেখানে প্রধান কথা অথবা প্রয়োজনসিদ্ধিই উদ্দেশ্য, সেখানে ভেদবুদ্ধি প্রখর। আমাদের ভাষায় আত্মপর ভেদ বলে একটা কথা আছে, অর্থাৎ আপন থেকে অপরকে আমরা ভিন্ন করে দেখি। কিন্তু এই ভেদবোধ নিয়ে মানুষ তৃপ্ত নয়। মানুষের মনের গভীরে মিলনের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই আকাঙ্ক্ষা কখনো পূর্ণ হয়, কখনো হয় না। অপূর্ণতার দুঃখকে অনিবার্য জেনেও মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, জীবনতৃষ্ণার মতোই সে শাশ্বত।

মিলিত হতে পারলে আমরা খুশী হই। এই মিলনের আনন্দের সঙ্গে জৈব সুখের একটা প্রভেদ আছে। জৈব সুখের পিছনে কোনো 'বাস্তব' প্রয়োজন থাকে, সেই প্রয়োজন মিটলে আমরা সুখ অনুভব করি। মিলনের আনন্দ প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আত্মার প্রসার বলেই তাতে আমরা প্রসন্ন হয়ে উঠি। সাধারণ অভিজ্ঞতায় এই দুই বস্তু মিলেমিশে যায়, এদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যেমন শিশুর কাছে মা জীবনধারণের সহায়, আবার মায়ের সঙ্গে তার একটা আত্মিক যোগের মাধুর্যও আছে।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের ভিতর এই রকমের একটা দ্বৈত লক্ষ করা যায়। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা নানা প্রয়োজন মেটাবার উপাদান লাভ করি। তাই প্রকৃতির শক্তিকে আমরা ভৃত্য হিসেবে পেতে চাই। আবার প্রকৃতির অসীমতার ভিতর মানুষের চেতনা নিজেকে প্রসারিত করবার একটা ক্ষেত্র খুঁজে পায়. সেখানে ব্যক্তিমানুষের চেতনা বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আনন্দিত। সেই আনন্দকে যখন 'আধ্যাত্মিক' বলা হয় তখন তার

মানে এই নয় যে, প্রকৃতির নিয়মকে সে খণ্ডন করছে। তার মানে এই যে, নিতান্ত জৈব প্রয়োজননির্ভর সুখের সঙ্গে সেই আনন্দের একটা গুণগত পার্থক্য আছে।

কথাটা আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রার্থনাভাষণে বহুবার বহুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একবার শুনে নেওয়া যাক। "রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে, 'দেখো'। সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে...

"আলোক যে দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়।...দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে সে কী অদ্ভুত জিনিস! তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি!...

"এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরো হিসাব ওই টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?...

"তাই আমি বলছি, এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, 'একটি চরম দেখা, একটি পরম দেখা আছে, সেটি তোমার মধ্যেই আছে।'...

"তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি।...আমি বলছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা...

"আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে, 'তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যেরকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো'।"

প্রকৃতিকে অতিক্রম না করেও কবি এইখানে প্রকৃতির অন্তরে অন্য এক জ্যোতি খুঁজে পেয়েছেন। দুটি কথার ওপর তিনি একই সঙ্গে জোর দিচ্ছেন: যে-আনন্দের অথবা মুক্তির কথা বলা হচ্ছে তাকে পাবার জন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে বসতে হয় না, কিন্তু তাকে ভোগের মধ্যে কিংবা প্রতিদিনের প্রয়োজনের মধ্যেও ধরা যায় না। আমাদের সত্তায় নিহিত এক শক্তি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথ ধরে বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত অসীম শক্তিকে যখন চেতনার মধ্যে গ্রহণ করে তখন সেই মিলন হয় অন্য সকল ফল নিরপেক্ষভাবে আনন্দময়, তাতে আছে এক পরম মুক্তির বিস্ময়।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের মঙ্গলবোধের ভিত্তি। আমরা যখন বিশ্বের দিকে শুদ্ধ ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকাই তখন সেই দেখাতেই মঙ্গল, তাকেই কবি বলেছেন নির্মল হয়ে দেখো, তাতেই আনন্দ। এই দেখাতে বিশ্বের কোনো নিয়মকে অস্বীকার করা হচ্ছে না। অথচ এটা বিশ্বকে শুধু নিয়মস্বরূপ দেখাও নয়। মানুষের ভিতর যেমন আছে যুক্তি, যাতে বিশ্বের নিয়মকে চিনে নেওয়া যায়, তেমনি আবার আছে সেই প্রথম চোখ মেলে চাইবার প্রত্যাশাহীন বিস্ময়বোধ, সেই অহৈতুকী প্রীতির শক্তি, যাতে ধরা পড়ে বিশ্বের আনন্দরূপ।

যুক্তি প্রতিদিনের জীবনে বার বার পরাস্ত হয়, তবু সে সত্য। মানুষের বিশ্বপ্রীতি ভয়ে ও বিদ্বেষে বারবার খণ্ডিত হয়, তবু সে মনুষ্যত্বের এমনই এক অঙ্গ যাকে অস্বীকার করে মানুষের মুক্তি নেই। কবি বলছেন: "আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে,

তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি।...বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়।"

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ কখনো বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে চলেনি। আবার তাঁর বিজ্ঞাননিষ্ঠাও অধ্যাত্মভাবনার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়নি। যুক্তির যেমন একটা বিশ্বজাগতিক ভিত্তি আছে, শুদ্ধ প্রেমের ক্ষেত্রেও সেই কথাই সত্য। কোনো সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য দিয়ে ছোটো করে দেখলে তাকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। বিজ্ঞান বিশ্বকে জানতে চায়। তার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানী বিশ্বকে জেনেছে সম্পূর্ণভাবে বা কখনো জানবে। কিন্তু জ্ঞানের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কোনো সীমাকেই চরম বলে মানতে সে রাজী নয়। আত্মার প্রসারের ক্ষেত্রেও একই কথা। বিশ্বকে আমরা কখনো স্থায়ী আত্মীয়ভাবে পাই কি না পাই, কোনো সীমাকেই শেষ বলে মেনে নিয়ে মানুষের আত্মার মুক্তি নেই।

গান্ধী 'soul force' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আত্মশক্তি। রবীন্দ্রনাথের কথাই আমরা এখন বলছি। যুক্তি ও প্রেম উভয়কেই তিনি আত্মশক্তির অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন। মানুষের অন্তরে এর নিবাস। মহাবিশ্বের সঙ্গে কোথাও এর মিল আছে। তা নইলে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে দাঁড়াবার সব চেষ্টাই অর্থহীন হত। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস।

(গ)

যদি বলা হয়, এই আত্মশক্তি অতি অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই আছে, তবে তাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করাই হয়, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে তাকে স্বীকার করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, সব মানুষের ভিতরেই তাকে পাওয়া যায় সম্ভাবনারূপে, মানুষের ধর্ম সেটা। মহাপুরুষদের ভিতর তার উজ্জ্বল প্রকাশ কিন্তু বিশ্বজন যে তাঁদের মহাপুরুষ বলে চিনে নিতে পেরেছে তাতে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে সেই মহত্বের একটা সায় সাধারণ মানুষও নিজেদের অন্তরে খুঁজে পেয়েছে?

মানুষের এই সুপ্ত সম্ভাবনার প্রমাণের জন্য মহামানবদের দ্বারস্থ না হলেও চলে। প্রমাণ ছড়িয়ে আছে আমাদেরই চোখের সামনে পৃথিবীর শিশুদের ভিতর। মহাপুরুষদের বাণীর ব্যাখ্যা অনেকেই করেছেন। শিশুদের কথা রবীন্দ্রনাথের মতো করে ক'জন বলতে পেরেছেন!

নিঃসন্দেহে ভালোমন্দ সব সম্ভাবনাই শিশুর ভিতর আছে। শিশুরা সরলভাবে হিংসুটে হয়, নির্মম হয়। কিন্তু মানুষের হিংসা অথবা নির্মমতার এমনিতেই তো প্রমাণের অভাব নেই, সেজন্য শিশুদের সাক্ষ্য জরুরী নয়। তাদের কাছ থেকে অন্য কিছু বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। মানুষের কিছু মূল্যবান সম্ভাবনা, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সব ঢাকা পড়ে যায়, শিশুদের ভিতর সেইসব আমরা অনায়াসে দেখি। তাই তো শিশুরা আমাদের জ্ঞানী করে তোলে।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যতই সংসারে লিপ্ত হয়ে পড়ি, সংসারে নানা স্বার্থে ও প্রয়োজনে যতই জড়িয়ে যাই, ততই জগতটাকে আমরা সেই সব প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে অভ্যস্ত হই। এক রকমের উদ্দেশ্যনির্ভর ব্যবহারিক জানা আমাদের কাছে

একমাত্র জানা হয়ে ওঠে। শিশুরা এই সাংসারিক প্রয়োজনের জালে তেমন আবদ্ধ হয়নি বলেই পৃথিবীটাকে অন্য এক দৃষ্টিতে সহজে দেখতে পারে, অন্য এক সরল বিস্ময় ও আনন্দে মুহূর্তে মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে ওঠে, প্রকৃতির নানা স্পর্শে গন্ধে ধ্বনিতে অন্য একভাবে অনায়াসে সাড়া দেয়। অতি তুচ্ছ কারণে শিশু যখন খুশী হয়ে ওঠে, দু'হাত তুলে নাচে, তখন বয়স্কদের চোখে সেটা অর্থহীন মজার ব্যাপার মনে হয়, কারণ সংসারের কোনো পরিচিত প্রয়োজনের সঙ্গে মেলানো যায় না। তবু এই অহেতুক আনন্দে আছে মানুষের জন্মগত অধিকার, যে-অধিকার ক্রমশ হারাতে হারাতে সে বয়স্ক হয়ে ওঠে। শিল্পী ও সন্তদের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, শিশুর দৃষ্টি তাঁরা বয়স্ক জীবনেও রক্ষা করতে পারেন। সংসারের দাহক অভিজ্ঞতা অতিক্রম করে সেই দৃষ্টিতে যোগ হয় সারল্যের সঙ্গে অন্য এক সহ্যশক্তি ও গভীরতা।

সংশয়বিদ্ধ একটি প্রশ্ন বহুদিন ধরে আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। মানুষকে আমরা ভালোবাসব কেন? যে-মানুষকে সংসারে আমরা অহরহ দেখি সে কি ভালোবাসার যোগ্য? বিশেষ বিশেষ মুনষকে ভালোবাসা যায়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মনুষ্যপ্রজাতিকে নিয়ে। মানুষের মতো নীচ, অকৃতজ্ঞ, স্বার্থপর, নির্দয় জীব কি আর দ্বিতীয় আছে? পোষা কুকুরের প্রতি প্রেম রক্ষা করা বরং অপেক্ষাকৃত সহজ। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি রক্ষা করবার কি কোনো যুক্তি আছে?

যুক্তিবাদীরা মানুষে মানুষে সহযোগিতার কথা বলে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যই একরকমের সহযোগিতা নিশ্চয়ই আবশ্যক হয়ে পড়ে। সেই সহযোগিতার জন্য প্রেমের প্রয়োজন হয় না মানবপ্রেমের তো নয়ই। স্বার্থের স্বীকৃতির ভিত্তিতে ব্যবসায়িক সংগঠন গড়ে ওঠে। ব্যবসায়ীরা খদ্দেরের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে। তারা মানবপ্রেমিক একথা বলা যাবে না। আবারও মূল প্রশ্নটায় ফিরে আসতে হয়। মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাসের এই মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার স্তূপীকৃত উদাহরণকে উপেক্ষা করে কীভাবে এই বিশ্বাস রক্ষা করা যায়, সবার উপরে মানুষ সত্য?

যুক্তিবাদী এবার প্রমাণ খুঁজবে মানুষের কিছু অক্ষয় কীর্তির মাঝে। যতই নীচ ও নির্দয় হোক মানুষ, এই জীবটি তবু কয়েক হাজার বছরে এমন কিছু রচনা করে গেছে যাতে তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি উপেক্ষা করা কঠিন। কিছু অস্ফুট ধ্বনি থেকে যাত্রা শুরু করে সে ক্রমে সৃষ্টি করেছে শুধু ভাষা নয়, কাব্য ও সাহিত্য, ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে অমর সঙ্গীত। তার অন্য সব কৃতি যদি আমরা ভুলে যাই তবু ঐ সঙ্গীতই মানুষকে এক অতুলনীয় জীব বলে চিহ্নিত করে দেয়। গণিতে বিজ্ঞানে দর্শনে শিল্পের আরো অজস্র প্রকাশে মানুষের আশ্চর্য পরিচয় ছড়িয়ে আছে। বিশ্বমানবের এই সব কীর্তি অস্বীকার করা যুক্তিহীন। মানুষের এই সৃজনশীলতা থেকেই তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু আশা হয়তো রক্ষা করা সম্ভব।

এই পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায় যুক্তির হাত ধরে। তারপর আরো কিছু কথা থাকে যেখানে যুক্তি ও অধ্যাত্মভাবনার সীমারেখা মুছে যায়।

মানুষকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁরা তো শুধু মানুষের কীর্তির জন্যই তাকে ভালোবাসেন না। দোষেগুণে মিশ্রিত পরিচয় ব্যক্তিমানুষের, মানবজাতির। অথচ আমরা যখন কাউকে ভালোবাসি তখন তো তার কিছুটা বাসি না এমন হয় না। ঐ রকমের বাছবিচার সমালোচকের শোভা পায়, স্নেহ কিংবা প্রেমের ধর্ম নয় লক্ষ সেটা। পরীক্ষক ছেলেকে বেশি নম্বর দিয়েছে বলে মা ছেলেকে বেশি ভালোবাসবে এতে মাতৃস্নেহের পরিচয়

নেই। যেমন পীড়িত সন্তানের প্রতিই মায়ের ভালোবাসা বেশী হয় তেমনই দুঃখতপ্ত মানুষের আর্তিনাশের জন্য মানবপ্রেমিক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। গুণের পরিমাপ নয় বরং অভেদানুভূতিই প্রেমের প্রধান কথা।

বিশ্বকে আমরা প্রেমের দৃষ্টিতে দেখব কেন, এ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে এর পর আমাদের প্রবেশ করতে হয় নিজেরই অন্তরে। সেখানে খুঁজে পাই সেই শিশুটিকে যে এই বিশ্বকে একদিন দু'হাত মেলে ভালোবাসতে চেয়েছিল। সংসারের তাপে দগ্ধ, ছলনায় বিভ্রান্ত হয়ে দিনে দিনে সে বদলে গেছে। তবু নিজেরই অন্তর থেকে আমরা জানি, মানুষের মনের গভীরে আজও আছে অন্য এক আকাঙ্ক্ষা, যাকে সে আজ হয়তো শুধু বিদ্রূপের ভাষাতেই স্বীকার করতে সাহস পায়। সেই আকাঙ্ক্ষাকে নিজের অন্তরে অনুভব করি বলেই জানি সেটা মানুষেরই অন্তরের কথা। ভিতর থেকে এই কথাটা যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়ে ওঠে ততক্ষণ সেটা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু একবার যখন অনুভূতির ভিতর সে প্রত্যক্ষ হয় তখন আর তাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। বিশ্বকে আমরা ভালোবাসব বিশ্বের মুক্তির জন্য নয়, নিজেরই মুক্তির জন্য। আমাদের বিদ্বেষে বিশ্ব কতটা পোড়ে কে জানে, কিন্তু আমরা পুড়ি, ভিতরে ভিতরে খাক হয়ে যাই।

বাইরের প্রমাণে সব সংশয় কাটে না। 'সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপকে' পৃষ্ঠভূমিতে রেখে বিশ্বকবি যখন বলেন, 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি', তখন বাইরের কোনো ঘটনার সাক্ষ্যের ওপর সে বিশ্বাস দাঁড়িয়ে নেই। তার প্রতিষ্ঠা কবির অন্তরে। যুক্তি সেই বিশ্বাসের সামনে যদি বা সংশয়গ্রস্ত তবু শ্রদ্ধাবনত।

রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতিকে সেই ভাষায় প্রকাশ করতে, সেই আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জ্বল করে তুলতে, অবিশ্বাসীর যুক্তিও যাকে পরিহাস করতে কুণ্ঠিত হয়। মানুষের চেতনা আজ বিবর্তনের যে-স্তরে এসে পৌঁছেছে তাতে যুক্তি ও বিজ্ঞানকে ত্যাগ করা যাবে না, অধ্যাত্মবোধকেও নয়। এ দুয়ের ভিতর যথার্থ সমন্বয় সাধনের শক্তি আমাদের সকলের নেই, রবীন্দ্রনাথের ছিল স্মরণীয়ভাবে। শুধু তাঁর জন্মদিনে নয়, তিনি স্মরণীয় সভ্যতার সংকটের দিনে।

আনন্দের সন্ধানে রাসেল

সংশয় থেকে যাত্রা ক'রে সত্য জ্ঞানে পৌঁছানো যায় কিনা, এই ছিল ফরাসী দার্শনিক দেকার্তের সমস্যা। আর অবিশ্বাস থেকে শুরু ক'রে আনন্দে পৌঁছবার পথ খুঁজেছেন সারাজীবন, এ যুগের মহান চিন্তাবিদ রাসেল।

রাসেলের এই দীর্ঘ অন্বেষণের মূলে শুধু দার্শনিক কৌতূহল নয়, বরং তাঁর জীবনের একটি অতি ঘনিষ্ঠ সমস্যা জড়িত ছিল। শৈশব থেকে তিনি ছিলেন অসুখী। যৌবনে বহুবার আত্মহত্যার চিন্তা তাঁর মনে উঁকি দিয়েছে। এমন কি তিনি যখন বিবাহিত, সন্তানের পিতা, এবং ব্যক্তিগত জীবনে বাহ্যত সুখী, তখনও তাঁর মনের গভীরে একটা

বিপুল নৈর্ব্যক্তিক নৈরাশ্য অনড় বোঝার মতো চেপে বসে ছিল। তাঁর বয়স যখন প্রায় ষাট তখন তিনি লিখেছেন : "I have derived from my children at least as much instinctive satisfaction as I anticipated...But while my personal life has been satisfying my impersonal outlook has become increasingly sombre. My activities continue from force of habit, and in the company of others I forget the despair which underlines my daily pursuits and pleasures. But when I am alone and idle, I cannot conceal for myself that my life had no purpose. ...I find myself involved in a vast mist of solitude." (June 11, 1931). ১৯৩১ সালে তাঁর অসুখের অন্যতম কারণ ছিল পৃথিবী সম্বন্ধে, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, হতাশা। কিন্তু এর অতিরিক্ত, আরও গভীর, কিছু কি ছিল না ?

প্রথম যৌবনের সংশয় ও বেদনা থেকে রাসেল আত্মরক্ষা করেছিলেন গণিত শাস্ত্রকে আঁকড়ে ধ'রে। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ আবারও তাঁর মনে একটা প্রচণ্ড তোলপাড় সৃষ্টি করল। সমাজ ও সভ্যতার সমস্যা তাঁকে অত্যন্ত গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল।

বিপর্যয়ের শুরুতেই মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভয়ানকভাবে পালটে গেল। তিনি লিখেছেন : "I had supposed that most people liked money better than anything else, but I discovered that they liked destruction even better[২]"

অর্থাৎ অধিকাংশ ইংরেজ যুক্তিবাদীর মতো রাসেলও পূর্বে বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে টাকা অথবা সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ; কিন্তু স্তম্ভিত হ'য়ে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, টাকার চেয়েও মানুষকে বেশী টানে বিশুদ্ধ ধ্বংসের উন্মাদনা। কেন এমন হয়, কি ক'রে মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, এটাই হ'য়ে উঠল রাসেলের প্রধান চিন্তা।

গভীর চিন্তার পর রাসেল কয়েকটি সরল প্রত্যয়ে এসে পৌঁছলেন। তিনি লিখলেন : "I became for the first time deeply convinced that Puritanism does not make for human happiness. Through the spectacle of death I acquired a new love for what is living. I became convinced that most human beings are possessed by a profound unhappiness venting itself in destructive rages, and that only through a diffusion of instinctive joy can a good world be brought into being." রাসেল এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, প্রবৃত্তিকে পীড়ন ক'রে মানুষকে সমাজে বাঁচতে হয়। প্রবৃত্তির এই পীড়নের ফলে মানুষ অসুখী ; আর এই অসুখই মানুষকে হন্যে ক'রে তোলে, অপরকে পীড়নের ভিতর মানুষ সুখ খোঁজে। এই সময় তিনি Principles of Social Reconstruction নামে একটি বই লেখেন। মানুষের মনের ঝোঁকগুলিকে এখানে সৃজনধর্মী (creative) ও সংরক্ষণধর্মী (possessive) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালোবাসে, শিল্পে নিজেকে প্রকাশ করে, অথবা কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করে, তখন তার ভিতর সৃজনধর্মিতার প্রাধান্য। আবার মানুষ যখন স্বধন রক্ষায় চিন্তিত কিংবা নিজের অথবা অপরের নিগ্রহে নিযুক্ত, তখন তাঁর মন সংরক্ষণধর্মী। সেই সমাজই ভালো যেখানে মানুষের মন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে নিজেকে প্রকাশ করবার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত নয়, যেখানে জ্ঞান মুক্ত, আর প্রেম মানুষে-মানুষে নির্ভয় বন্ধনের সেতু।

মানুষের প্রকৃতির উপর যখনই জোর ক'রে কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয় তখনই দেখা দেয় তার বিকৃতির সম্ভাবনা। অতএব প্রবৃত্তির উপর জোরজবরদস্তি যতটা কম করা যায় ততই ভালো। কথাটা আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার। রাসেল জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মিল কিন্তু জানতেন যে একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত হ'তে গেলে বন্য থেকে যাবার ভয় আছে। মিল বুঝেছিলেন যে, অনুশীলনের ভিতর দিয়েই চরিত্র গঠন হয় ; অতএব তিনি লিখেছিলেন : "Nearly every respectable attribute of humanity is result, not of instinct, but of victory over instinct." এ সব কথা নিশ্চয়ই রাসেলের অজানা ছিল না। কিন্তু সত্যের এপিঠ ওপিঠ আছে। রাসেল সত্যের ওপিঠটা জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

তিনি একথা বলা প্রয়োজন মনে করলেন যে, প্রচলিত সমাজ ও সংস্কার মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে বেঁধেছে, যেটা মানুষের সুখ অথবা সমাজের ভবিষ্যৎ কোনো দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় নয়। এইসব অশুভ বন্ধনের ভিতর কিছু হল বাহ্য, আবার কিছু গুহ্য। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে যান্ত্রিকতার অত্যাচার, আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে অতীন্দ্রিয় শংকা, রাসেল যাকে বলেছেন "metaphysical fears"। এইসব বাধানিষেধ থেকে রাসেল মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

আধুনিক সমাজে যান্ত্রিকতার আধিপত্য। মানুষকে এখানে বাঁধা হয়েছে যন্ত্রের তালের সঙ্গে। রাসেল মনে প্রাণে বৈজ্ঞানিক। অথচ যন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি এমন বাক্যও উচ্চারণ যা গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আধুনিক যান্ত্রিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজের একটা চিরকালের ঝোঁক : ক্ষমতার কোনো কেন্দ্রে সংহত হবার প্রবণতা। এই অতিকেন্দ্রিকতার বিপদ রাসেলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। Power: A New Social Analysis নামক গ্রন্থে রাসেল বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এই বইটি সম্বন্ধে রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "এই পুস্তকের বক্তব্য আমার গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় ; আমি আশা করেছিলাম যে, বইটি আরও বেশী লোকে পড়বে।" এই পুস্তকের মূল কথাটি রাসেলের ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি : "I argued that power, rather than wealth, should be the basic concept of social theory, and that social justice should consist in equalization of power to the greatest practicable degree." ধনতান্ত্রিক সমাজে ধন অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ; সাম্যবাদী সমাজে রাজনীতিক ক্ষমতা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শক্তি, একটি দল অথবা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে সংহত হয়েছে। দুই-ই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ। দুই-ই অসাম্যের কারণ। ক্ষমতার এই অতিকেন্দ্রিকতার ফলে স্বাধীনতার সংকট ও নানারকম নিষ্ঠুরতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

রাজনীতিক মহলে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে রাসেলের প্রতি প্রসন্ন অথবা ক্রুদ্ধ হয়েছে। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। রাসেলের যা মনে হয়েছে, জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা না করেই তিনি তা অকপটে বলেছেন। তাঁর হো চি-মিনকে ভালো লেগেছে ; লেনিনকে ভালো লাগেনি। রুশবিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা সুস্পষ্ট ; আবার ভিয়েতনামের যুদ্ধের ব্যাপারে বিরোধিতাও অক্লান্ত। তাঁকে সাম্যবাদী বলা যেতে পারে ; কিন্তু অত্যন্ত বিশেষ অর্থেই তিনি সাম্যবাদী ছিলেন। ঐ নামে যেসব ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে তার কোনোটিকেই তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে পারেননি। আবার মার্কিন সমাজের প্রতিও তিনি ছিলেন অতিশয় বিরক্ত। কিন্তু রাসেলের মূল চিন্তার পক্ষে এসব কথা গৌণ। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি নিজেই লিখেছেন : "I have imagined myself

in turn a liberal, a socialist, or a pacifist, but I have never been any of these things." আসলে তাঁর মতের গায়ে কোনো রাজনীতিক তকমা চাপাবার চেষ্টা করাই ভুল। তিনি কি ভেবেছিলেন সেটাই প্রধান কথা। মূলত রাসেল চেয়েছিলেন মানুষ যেন নির্ভয়ে জ্ঞানের অন্বেষণ করতে পারে আর আনন্দের ভিতর দিয়ে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে।

তাঁর মতে মানুষের মুক্তির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হ'ল অন্ধ সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত। খৃষ্টধর্মে যে "আদি পাপ"-এর তত্ত্ব আছে, রাসেল তার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে আদি পাপের ধারণা মানুষের মনের প্রাচীন হিংস্রতাকে একটা সম্ভ্রান্ত কুসংস্কারের সাহায্যে আরও শক্তিশালী ক'রে তুলেছে। এ যুগের কোনো কোনো আন্দোলনে আবার ভগবানের বিধানের পরিবর্তে কল্পনা করা হয়েছে 'ইতিহাসের' বিধান ; এবং তারই নামে নিষ্ঠুরতার এক নতুন অধ্যায় অনেকের কাছে শ্রদ্ধেয় হয়েছে।

শিক্ষানীতিতেও রাসেল একটা অহেতুক কঠোরতার প্রাধান্য লক্ষ করেছিলেন। তা ছাড়া নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাপবোধ প্রেমের আনন্দকে তিক্ত ক'রে তুলেছে। এসব বিষয়ে রাসেলের ধারণা ছিল প্রচলিত ধারণা থেকে একেবারেই পৃথক।

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনায় রাসেল লিখেছেন : "It is reverence towards others that is lacking in those who advocate machine-made cast-iron systems." ব্যক্তিত্বের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা নেই তাঁরাই ছাঁচে-ঢালা মানুষ তৈরী করতে চান। খানিকটা বাধ্যবাধকতা ও নিয়মকানুন ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না, একথা রাসেল জানতেন। কিন্তু একথাটার ওপর তিনি জোর দিতে চাননি। Principles of Social Reconstruction নামে বইটিতে পাই তাঁর অনবদ্য গদ্যের আরও একটি উদাহরণ : "The man who has reverence will not think it his duty to "mould" the young. He feels in all that lives, and most of all in children, something sacred, indefinable, unlimited, something individual and strangely precious, the growing principle of life, an embodied fragment of the dumb striving of the world." মানুষের, বিশেষত শিশুর, বিকাশোন্মুখ মনের প্রতি শ্রদ্ধাকে রাসেল শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন।

মার্কিন দেশে যৌনচিন্তার প্রচণ্ডতায় রাসেল বিরক্ত বোধ করেছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও তজ্জনিত প্রবৃত্তির অবদমনকেই তিনি এর জন্য দায়ী মনে করেন। পাশ্চাত্ত্য জগতে এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার প্রথম যুগে আতিশয্য অবশ্যম্ভাবী, একথাও রাসেল বলে যান। তবু নৈতিক গোঁড়ামি থেকে যৌনচিন্তাকে মুক্ত করা প্রয়োজন বলে তাঁর মনে হয়। এ বিষয়ে রাসেলের মতামত এক সময়ে শুধু বিতর্কই নয়, প্রচণ্ড বিক্ষোভেরও সৃষ্টি করেছিল। বিবাহিত জীবনের বাইরে পারস্পরিক সম্মতি সহ যৌন সম্পর্ক স্থাপন রাসেল সব সময় গুরুতর অপরাধ মনে করতেন না। কিন্তু যৌনচিন্তা আমাদের মনকে অধিকার ক'রে থাকবে এটাও তিনি কখনও চাননি, কারণ যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য মনের একটা বন্ধনবিশেষ। Marriage and Morals পুস্তকে তিনি একদিকে যেমন লিখেছেন, "Joy of life depends upon a certain spontaneity in regard to sex." অন্যদিকে তেমনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যোগ করেছেন "I wish to repeat, as emphatically as I can, that I regard an undue preoccupation with this as an evil." রাসেলের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, শুধু নিষেধের

দ্বারা নয় বরং যৌন আকাঙ্ক্ষার পাশে লোকহিতচিন্তা ও জ্ঞানচর্চার মতো সদর্থক প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেই জীবনে সাম্য আনা সম্ভব।

রাসেল শুধু প্রচলিত আচারবিচারের বিরোধী একজন সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন দার্শনিক। সমাজের বহিরঙ্গে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে, মানুষ সম্বন্ধে এমন অগভীর ধারণা রাসেলের নিশ্চয়ই ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত হতাশা ও বেদনার ভিত্তি ছিল অস্তিত্বের আরও গভীরে। সমাজকে ছেড়ে মানুষের চলে না ; কিন্তু মানুষের একটা দিক আছে যেখানে সে নিঃসঙ্গ। মানুষ সামাজিক হ'য়েও সমাজসর্বস্ব নয়। অন্তত রাসেল ছিলেন না।

জীবনে বহুবার রাসেল নিজেকে অনেক মানুষের ভিতর একাকার ক'রে দেবার আগ্রহ বোধ করেছেন ; কিন্তু তাঁর সংশয়ধর্মী বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বসচেতন মন তাঁকে ঐ মাতলামিতে ডুবতে দেয়নি। রাসেল লিখেছেন : "Throughout my life I have longed to feel that oneness with large bodies of human beings that is experienced by the members of enthusiastic crowds...Always the sceptical intellect, when I have most wished it silent, has whispered doubts to me, has cut me off from the facile enthusiasms of others, and has transported me into a desolate solitude." যে-মধ্যযুগীয় মন সমবেতভাবে হাঁটু গেড়ে ব'সে মুক্তির তাৎক্ষণিক স্বাদ অনুভব করে, অথবা যূথবদ্ধ হ'য়ে বিধর্মীর বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়ে, তার সঙ্গে রাসেলের নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। ক্রুশের পরিবর্তে ঝাণ্ডাকেও তিনি গ্রহণ করতে পারেননি।

একক সাধক হিসাবেও ভগবানকে মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ কথাটাও তিনি কখনও যুক্তির ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, আবার কখনও অত্যন্ত করুণ এবং বেদনার্ত স্বরে বলেছেন। যুক্তির দিক থেকে ভগবানের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ তিনি খুঁজে পাননি। ভগবানে বিশ্বাসের আশ্রয় হারাতে তাঁকে অসহনীয় যন্ত্রণাবোধ করতে হয়েছে ; তবু যুক্তিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। প্রিয়াকে লিখিত একটি পত্রে তিনি বলেছেন : "The centre of me is always and eternally a terrible pain—a searching for something beyond what the world contains, something transfigured and infinite—the beatific vision—God— I do not find it, I do not think it is to be found."

যে বিশ্বাস তাঁর তাপিত জীবনে শীতল করুণাধারার মতো বর্ষিত হ'তে পারত, তার আশ্রয় থেকে তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করেছেন। অথবা বলা ভালো যে, এ বিষয়ে তাঁর যুক্তিবাদী মনের কাছে কোনো গত্যন্তর ছিল না। তাঁর যুক্তি এ প্রশ্নে নিরপেক্ষতার ভূমিকা গ্রহণ করেনি, বরং ভগবানের অস্তিত্বের বিপক্ষেই স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছে। ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে রাসেল পৃথিবীতে অসংখ্য অন্যায়কে মেলাতে পারেননি ; আর বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে তাঁর মনে হয়েছে। অতএব রাসেলকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়েছে যে, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বজগতের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই ; জগৎ আছে, কিন্তু কোনো জগদীশ্বর নেই।

মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জগতের কোনো নিগূঢ় আত্মিক সম্পর্ক নেই জেনেও স্পিনোজা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমন একটি বিশ্বজোড়া সমন্বয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন যে তাতেই তাঁর বুদ্ধি ও আত্মা তৃপ্ত হয়েছিল। কিন্তু যে সমন্বয়দৃষ্টি স্পিনোজাকে শান্তি

দিয়েছিল তাও রাসেলের কাছে গ্রহণীয় হল না। তিনি লিখেছেন : "What Spinoza calls "the intellectual love of God" has seemed to me the best thing to live by, but I have not had even the somewhat abstract God that Spinoza allowed himself to whom to attach my intellectual love." এ বিষয়ে রাসেলের দ্বিধার কারণ তিনি স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর বৃহৎ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন : "Spinoza thinks that if you see your misfortunes as they are in reality, as part of the concatenation of causes stretching from the beginning of time to the end, you will see that they are only misfortunes to you,not to the universe, to which they are merely passing discords heightening an ultimate harmony. I cannot accept this; I think that particular events are what they are, and do not become different by absorption into a whole. Each act of cruelty is eternally a part of the universe; nothing that happens later...can confer perfection on the whole of which it is a part." নিজের দুঃখকে যদি-বা উপেক্ষা করা যায়, অন্যের প্রতি অন্যায় কোনো বিশ্বদৃষ্টিতেই মেনে নেওয়া যায় না। এই মুহূর্তের একটি অমার্জনীয় অবিচার অনাগত ভবিষ্যতের কোনো সুবিচারের ফলে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারায় না। প্রতিটি অন্যায় নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের বুকে কাঁটার মতো জেগে থাকে। বিশ্ব জগতে এমন কোনো সমন্বয় নেই যাতে হৃদয় মুগ্ধ হয়। স্পিনোজার বিরুদ্ধে রাসেলের সমালোচনার বঙ্গানুবাদ না-হলেও এটাই মর্মার্থ।

রাসেলের সমস্যা তা হ'লে এই। আনন্দ তাঁর জীবনের লক্ষ্য, তিনি মুগ্ধ হতেই ব্যাকুল। অথচ তিনি অবিশ্বাসী, তাঁর যুক্তি তাঁকে সংশয়বাদী করেছে। অবিশ্বাস থেকে শুরু করে কি আনন্দে পৌঁছানোর কোনো পথ আছে? জনতার ভিতর তিনি নিজেকে হারাতে পারলেন না ; ভগবানে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও তিনি কোনো পরম সুন্দরের মহিমা খুঁজে পেলেন না। তবে তিনি কি নিয়ে বাঁচবেন?

রাসেলের জীবনদর্শন কি আত্মবিরোধী নয়? স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ভিত্তিতে তিনি জীবনকে স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব মানুষের মহত্তম আদর্শ এবং আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিষ্করুণ একথা জানবার পর কি জীবনকে কোনো সরল, সহজ আনন্দের সুরে বাঁধা যায়? সহজ আনন্দের দু'টি স্তর আছে ; এক, শিশুর মন, আর দ্বিতীয়, সাধকের দৃষ্টি। যে-বিশ্লেষণী বুদ্ধি জগতে অসঙ্গতি খুঁজে পায়, যে-ন্যায় অন্যায় চেতনা এই অসঙ্গতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তা তো আমাদের শিশুর স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে, আবার সাধকের জগতেও প্রবেশাধিকার দেয় না। এই সংশয় বুদ্ধির প্রতি যদি আমাদের বিশ্বস্ত থাকতে হয় তো তার মূল্য হিসাবে অশান্তিকে মেনে নেওয়াই কি সঙ্গত নয়? আর এই বুদ্ধিকে যদি আমরা উত্তীর্ণ হই, তারপরও কি কালহীন বিশ্বে কোনো বিকট অসামঞ্জস্য রাসেলের অভ্যস্ত বেদনার্ত অট্টহাস্যের মতো অনন্ত শূন্যকে ব্যাপ্ত করে ধ্বনিত হতে থাকে? রাসেল যুক্তিবাদী, এই দুই বিকল্পের কোনো একটিকে বেছে নেওয়াই কি যুক্তির কথা নয়?

কিন্তু রাসেল একটি তৃতীয় পথ অনুসরণ করলেন। সেটি করুণার পথ।

পৃথিবীতে ন্যায় নেই ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের প্রতি করুণা নেই ; মানুষের মহত্তম সাধনায় সাফল্যের কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি নেই। ব্রহ্মাণ্ডের এই নির্মমতার বিরুদ্ধে মানুষের দৃপ্ত বিদ্রোহের পতাকা হবে, মানুষের প্রতি মানুষের করুণা। A Free Man's

Worship শীর্ষক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে রাসেল লিখেছেন : "United with his fellow men by the strongest of all ties, the tie of a common doom, the free man finds that a new vision is with him always, shedding over every daily task the light of love...One by one as they march, our comrades vanish from our sight, seized by the silent orders of omnipotent Death...Be it ours to feel that, where they suffered, where they failed, no deed of ours was the cause." রাসেল জানতেন যে, মৃত্যু যতদিন আছে দুঃখ ততদিন অনিবার্য। জগতের নিয়মে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কাজেই অমরতা তিনিও দাবি করেননি। তিনি চেয়েছিলেন দুঃখে ক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ লাঘব করতে।

'ভগবান' বুদ্ধ ভগবান সম্বন্ধে মৌন ছিলেন। রাসেলও করুণাকে তাঁর পথ এবং পাথেয় বলে গ্রহণ করলেন।

এ পথের শেষে কি তিনি আনন্দে পৌঁছেছিলেন ? জানি না ; শুধু জানি যে, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি এমন কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, অপার্থিব আনন্দ ও করুণতম বেদনার সংমিশ্রণে যা অবিস্মরণীয়। চুরানব্বুই বছরের বৃদ্ধ রাসেল তাঁর আত্মজীবনীর মুখবন্ধে লিখেছেন : "Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life; the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind...I have sought (love) because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. This is what I sought, and this is what—at last—I have found...With equal passion I have sought knowledge...A little of this, but not much, I have achieved...Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart...I long to alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer." কথা শুনে চমকে উঠতে হয়। রাসেল বলছেন যে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি অবশেষে সেই অলৌকিককে লাভ করেছেন যে-অধরা শুধু কবি ও সাধকের কল্পনায় ধরা দেয়। প্রেম ও জ্ঞানের হাত ধরে তিনি স্বর্গেরই দিকে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের আর্তনাদ তাঁকে সেই স্বর্গে স্থির থাকতে দেয়নি। বেদনায় বিদ্ধ হয়ে তিনি সংসারে ফিরে এসেছেন।

রাসেল—যুক্তিবাদী রাসেল—আনন্দের স্বর্গে পৌঁছেছিলেন, একথা কি সত্য ? অবিশ্বাস্য। কিন্তু রাসেল মিথ্যা বলেছেন, এও তো বিশ্বাস করা যায় না।

রামমোহন রায়

১

যদি ভারতের উনিশ শতকী নবজাগরণের জন্মবৃত্তান্ত এবং তার পরিণত আশা একই বৃন্তে প্রত্যক্ষ করতে চাই তবে আমাদের চোখ ফেরাতে হয় রামমোহনের দিকে।

রামমোহনের জন্মের মাত্র কিছুকাল আগে বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন স্থাপিত হয়েছে। ১৮১৪-১৫ সালে তিনি যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আসেন ততদিনে সারা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাতেই তাঁর জীবন ও চিন্তাধারার পর্যালোচনা আবশ্যক।

ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে। রামমোহন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ, যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুর অথবা প্রসন্নকুমার ঠাকুর, এই নতুন মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। Bengal Herald নামে যে পত্রিকা তাঁরা প্রকাশিত করেন তার পাতায় এর প্রমাণ আছে। ১৮২৯ সালের ১৩ জুন তারিখের একটি সম্পাদকীয়তে এই ইতিহাসসচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে অষ্টম হেনরী এবং ক্রমওয়েলের মধ্যবর্তীকালে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করে এবং নতুন যুগের সৃষ্টিতে নেতৃত্বদান করে, সে সম্বন্ধে ঐ সম্পাদকীয়তে পরিচ্ছন্ন উল্লেখ আছে। সামাজিক মুক্তির সম্প্রসারণে মধ্যবিত্তের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। স্পেন অথবা পোল্যান্ডে যে অনুরূপ কোনো শ্রেণী ঐ সময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি এবং সেই কারণে ঐসব দেশে সামাজিক মুক্তিরও তেমন সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি, এইসব কথার ইঙ্গিত আমরা পাই ঐ সম্পাদকীয়তে। ১৮২৯ সালের চিন্তা হিসেবে এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ আশ্চর্য রকমের স্বচ্ছ ও প্রাগ্রসর।

রামমোহন স্বভাবতই এই নতুন মধ্যবিত্তের বিকাশ ও বৃদ্ধি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এটাই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে, এই নতুন শ্রেণীর মানুষ এমন ভাবেই তার সামাজিক ভূমিকা পালন করবে যাতে এই শ্রেণীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারা সমাজেরই এবং বিশেষত দরিদ্র চাষীরও অবস্থার উন্নতি হয়। এই প্রসঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা এসে যায়। সরকার ও জমিদারদের ভিতর এই বন্দোবস্তের ফলে নতুন মধ্যবিত্তের সুবিধা হয়। নতুন জমিদারেরা কিন্তু প্রজাদের উপর খাজনার বোঝা বাড়িয়ে চললেন। অর্থাৎ সরকার জমিদারের কাছে কতটা দাবী করতে পারবেন সেটা স্থির হয়ে গেল, কিন্তু জমিদার প্রজার কাছ থেকে কতটা আদায় করতে পারবেন তার কোনো সীমা নির্ধারিত হল না। এতে রামমোহনের আপত্তি ছিল। তিনি সরকার ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে এই সুপারিশ করেন যে, জমিদার এবং দরিদ্র কৃষক বা রায়তের ভিতরও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনুরূপ একটা ব্যবস্থাই প্রবর্তন করা প্রয়োজন যাতে খাজনার বোঝা এইভাবে বাড়ানো নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ক্রমাগত খাজনা বাড়িয়ে নয়, উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করেই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্পদবৃদ্ধির প্রয়াস করতে হবে।

রামমোহন ছিলেন বেন্থাম, জেমস মিলের সমসাময়িক মানুষ। এঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল। মতামতের আংশিক মিলও লক্ষ করা যায়। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নে তৎকালীন ব্রিটিশ লিবারেলদের মতামত যতটা অনমনীয় ছিল রামমোহনের তেমন

ছিল না বলেই মনে হয়। ১৮৩০ সালে রামমোহন পশ্চিমযাত্রা করেন এবং ১৮৩৩ সালে তাঁর মৃত্যু অবধি পাশ্চাত্য দেশেই, প্রধানত ইংল্যান্ডে থাকেন। সে সময়ে ঐ দেশে সমাজতান্ত্রিক নেতা রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং চিন্তার বিনিময় হয়। ওয়েন খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী ছিলেন, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তো ছিলেন বটেই। বেন্থাম, জেমস মিল, রামমোহন এই সকলের সঙ্গেই ওয়েনের মতপার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এখানে যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হল এই, জেমস মিলের মতো লিবারেলদের সঙ্গে ওয়েনের বিরোধ ছিল সমাজতন্ত্র নিয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্ন নিয়ে, ধর্ম নিয়ে নয়। আর রামমোহন আপত্তি তুলেছিলেন ওয়েনের ধর্মবিরোধিতার বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্র বিষয়ে মতামত নিয়ে নয়। বরং তাঁর চিঠিপত্র থেকে এরকমই মনে হয় যে, রবার্ট ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক কাজকর্মে তিনি সদিচ্ছা ও মানবিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন। রবার্ট ওয়েনকে ১৮৩২ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে লিখিত তাঁর পত্রে তিনি জানান তাঁর "best wishes for the success of your system if founded upon the precepts of christianity" এবং পরের বছরে ওয়েনের পুত্রকে লিখিত বিখ্যাত পত্রে ব্যক্ত করেন তাঁর আকাঙ্ক্ষা "to see you and your father crowned with success in your benevolent undertakings."

অর্থাৎ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তাঁর অবস্থান সচেতনভাবে স্বীকার করে নিয়েও রামমোহন এমন নীতির সন্ধান ও সমর্থন করেছিলেন যাতে মধ্যবিত্তের ক্রিয়াকর্মে ও উদ্যোগে সমস্ত সমাজ তৎসময়ে উপকৃত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার মেনে নিয়েও তিনি সেই অধিকারকে বৃহত্তর ধর্ম ও আদর্শের অধীন রাখতে চেয়েছেন। সংক্ষেপে, বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকার করেও তাঁর প্রয়াস ছিল সেই পরিস্থিতিতে আবদ্ধ হয়ে না পড়া। বরং সেই পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো আদর্শ সম্ভব মতো সম্মুখে রেখে চলতে চেয়েছিলেন তিনি।

২

রামমোহনের নামের সঙ্গে তাঁর ধর্মচিন্তা অচ্ছেদ্য। এই বিষয়টি এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

যে ভারতবর্ষে তাঁর জন্ম সে দেশের সঙ্গে ইংল্যান্ডের একটা বড় পার্থক্য এই যে, ভারত বহু ধর্মের দেশ, ইংল্যান্ডে এক ধর্ম প্রধান। ধর্মকে অবলম্বন করে কিছু গুরুতর সমস্যা রামমোহন স্বদেশে লক্ষ করেছিলেন। এক হল, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর সদ্ভাবের অভাব। ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর সময় থেকেই রাজনীতির সূত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠে। শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গেও মুসলমানদের সংঘাত দেখা দেয়। বিরোধ ছিল সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও। হিন্দুধর্মের ভিতর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ এবং জাতিভেদজনিত অসাম্য রামমোহনকে চিন্তিত করে। তাছাড়া হিন্দুধর্ম ছিল কুসংস্কারে এবং সতীদাহের মতো অমানবিক আচারে জর্জরিত। এরই ভিতর এলো খ্রীষ্টধর্মের চ্যালেঞ্জ এবং যুক্তিবাদী দর্শনের আহ্বান। এই যুক্তিবাদ রামমোহনের কাছে এসে পৌঁছয় প্রথমে ইসলামীয় সূত্রে, মুতাজিলা ঐতিহ্য থেকে, পরে পাশ্চাত্য দর্শনের মাধ্যমে।

এই সবের ভিতর রামমোহনকে নিজস্ব পথ বেছে নিতে হল। এ ব্যাপারে তাঁর চিন্তা সাবধানে বুঝবার চেষ্টা করতে হবে, কারণ সেই চিন্তা স্থির হয়ে থাকেনি। তাঁর ত্রিশ বছর

বয়সের চিন্তা আর চল্লিশোত্তর ভাবনা ঠিক এক নয়।

রামমোহনের প্রথম জীবনের ধর্মচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় 'তুহ্ফাৎ-উল-মুওআহ্হিদিন' নামে পুস্তকটিতে। এখানে দেখি যে তিনি বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলিকে যুক্তিবাদের সাহায্যে বিচার করতে চাইছেন। বলছেন যে, প্রতি ধর্মে কিছু সার বস্তু থাকে এবং সেই সঙ্গে থাকে আরো কিছু যা অসার এমন কি অনিষ্টকর। বিভিন্ন ধর্মের ভিতর ভিন্নতা দেখা দেয় বাহ্য আচার এবং ভ্রান্ত কুসংস্কার নিয়ে; বিভিন্ন ধর্মের মিল তাদের সত্যবস্তুতে। যেখানে মিল সেখানেই তাদের সর্বমানবীয় এবং যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি। সেটাই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণীয়।

ধর্মবিচার এবং ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে একটা মূল প্রশ্ন এখানে এসে যায়। দুটি ভিন্ন মনোভাব নিয়ে এই বিচারে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। আমরা নিজেদের কোনো বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত না ভেবে সব ধর্মকেই বাইরে থেকে বিচার করতে পারি। ধর্মবিচারের একটা দ্বিতীয় পথও আছে। নিজেকে ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ কোনো বিশেষ ধর্মের অন্তর্গত বলে মেনে নিয়ে আমরা সেই ধর্মের ভিতর এমন কী আছে যা শ্রেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় তার অন্বেষণ করতে পারি, অন্যান্য ধর্মকে আমরা সেই দৃষ্টিতে বিচার করে দেখতে পারি এবং ভিন্ন ধর্মের ভিতর যা কিছু শ্রেষ্ঠ তারই সাহায্যে নিজ ধর্মের শোধন ও উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হতে পারি।

রামমোহনের প্রথম জীবনে অর্থাৎ 'তুহ্ফা' শীর্ষক পুস্তকে যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা প্রায় সম্পূর্ণত যুক্তিবাদী এবং সেখানে তিনি সব ধর্মকে বাইরে থেকে দেখে বিচারপ্রয়াসী। কিন্তু কলকাতায় বসবাস শুরু করবার পর তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায় সেটা এই বাহ্যবিচারের উপর নির্ভরশীল নয়। তাতে অন্য একপ্রকার অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য। বেদ-উপনিষদকে অবলম্বন করে তিনি এবার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠভাগ আবিষ্কার করতে চাইছেন, তারই সঙ্গে মিলিয়ে খ্রীষ্টধর্মের বিচার করছেন এবং স্বধর্মের সংস্কারের জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন।

এই ব্যাপারটা তৎকালীন প্রগতিবাদীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ডিরোজিও গোষ্ঠীভুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুধর্মের প্রতি বিরক্ত হয়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বলেছিলেন, "Rammohan's memory we cannot but venerate"। কিন্তু সেই সঙ্গে যোগ করেছিলেন, "It is impossible for us not to regret that he so hastily considered the rejection of Hinduism to be incompatible with his patrotism" (Calcutta Review, Vol III, 1845) রামমোহন নিজে সমস্যাটি বুঝেছিলেন অন্যভাবে। হিন্দুধর্মকে ত্যাগ করে তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারবেন না; অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে স্বজাতির অভ্যন্তর থেকেই তাঁকে করতে হবে সত্যশোধনের প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে আরো দুটি কথা যোগ না করলে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে না।

একজাতীয় দেশপ্রেম আছে যাতে আত্মসমালোচনার বড়ই অভাব। এই সংকীর্ণ দেশপ্রেম নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির কোনো ত্রুটিই স্বীকার করতে রাজী নয়। হিন্দুধর্মের কোনো দিকে কোনো ন্যূনতা আছে, আমাদের সংস্কৃতি কোনো অংশে দুর্বল, এমন কথা শুনলেই এই দেশপ্রেমিকরা প্রতিবাদ করা কর্তব্য মনে করেন। রামমোহনের ভিতর এজাতীয় সংকীর্ণতা ছিল না। হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের তুলনামূলক বিচারে তিনি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত ছিলেন। এরই ফলে ভিন্ন সংস্কৃতি ও ভিন্ন ধর্ম থেকে প্রয়োজনীয়

শিক্ষা গ্রহণ করে স্বধর্ম ও নিজ দেশের সংস্কৃতির রূপান্তরে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে।

রামমোহনের বিচারে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তার ক্ষেত্রে বেদই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সমাজের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, যে নীতিশিক্ষা প্রয়োজন সেই শিক্ষা খ্রীষ্টধর্মে আরো সংহত আকারে পাওয়া যায়। চন্দ্রশেখর দেবের স্মৃতিচারণে এই রকম একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। রামমোহন সেখানে বলেছেন, "If religion consists of the blessings of self-knowledge and of improved notions of God and his attributes and (if) a system of morality holds a subordinate place, I certainly prefer the Vedas. But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of morality but in a scattered form. (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃঃ ১৪০)। রামমোহন লক্ষ করেছিলেন যে পুণ্যকর্ম বলতে হিন্দু প্রথমেই বোঝে যাগযজ্ঞ, পূজোআর্চা, আচার-অনুষ্ঠান—সমাজসেবা অথবা প্রতিবেশীর হিতসাধক কাজ তেমন নয়। তিনি লিখেছিলেন, "Christians understand by works action of moral merit, whereas Hindus use the term in their theology only to denote religious rites and ceremonies" (The English Works of Raja Rammohan Roy, ed Kalidas Nag and Debajoti Burman, Part II, p. 100) খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে তুলনায় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এইরকম সমালোচনামূলক মন্তব্য করতে আমাদের অনেকেরই দেশপ্রেমে বাধে। রামমোহন কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি প্রীতি রক্ষা করেই এসব কথা বলতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মব্যাখ্যাতা মাত্র নন, ধর্মসংস্কারক ; তাঁর সমালোচনা সংস্কারেরই সহায়ক। হিন্দুসমাজে সমষ্টিগত উপাসনার প্রচলন তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন, একক উপাসনার পরিপূরকরূপে। শুধু নিজের চিত্তকে মুক্ত ও জ্ঞানোজ্জ্বল করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না, চারদিকের অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করতে তিনি তাঁর শক্তি নিযুক্ত করেছিলেন। আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে তিনি হিন্দুসম্প্রদায়কে চালিত করতে চেয়েছিলেন বৃহত্তর সমাজসেবার দিকে ; একই প্রচেষ্টা আরো পরে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় বিবেকানন্দের শিক্ষার ভিতর।

রামমোহন যদিও হিন্দুধর্মের ও সমাজের ভিতর থেকেই কাজ করতে চেয়েছেন তবু প্রথম জীবনের বৃহত্তর সমন্বয়ের আদর্শ তিনি শেষ অবধি ত্যাগ করেননি। হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর বিরোধ তিনি অতিক্রম করেছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে। হিন্দুসমাজের ভিতরে কাজ করেও সমস্ত সাম্প্রদায়িক সীমা অতিক্রম করতেই তিনি আগ্রহী ছিলেন। তিনি জানতেন যে, প্রতিটি ব্যক্তির মানবপরিচয় মূল্যবান। মানুষের সংস্কৃতিকে আরো ভালোভাবে জানা, মানবজাতির হিতসাধন করা, এটাই ছিল তাঁর বৃহত্তর লক্ষ্য। আঠারো ও উনিশ শতকে যে মানবতাবাদী এবং মানবিক সংস্কৃতিতে আগ্রহী চিন্তার আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশের কিছু মনীষীর ভিতর দেখা দেয় তারই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রামমোহন। তৎকালেই তিনি সেই হিসেবে স্বীকৃতিও লাভ করেছিলেন। রামমোহনের জীবনের শেষভাগে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে একজন ফরাসী ভারতবিদ্যাবিদ সেই মানবধর্মী চিন্তার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলিয়ে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত উল্লেখযোগ্য। লেখক বলছেন, "ঠিক যেমন তিনি (রামমোহন) স্বয়ং বিপুল আগ্রহ সহকারে মানবসভ্যতা সম্পর্কে বৃহত্তর, মহত্তর ও দৃঢ়তর অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য ইউরোপীয় সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় ব্রতী হয়েছেন, আমরা ইউরোপীয়রাও

একইভাবে মানবজাতি সম্পর্কে বৃহত্তর ও উচ্চতর ধারণা অর্জন করার জন্যই এসিয়ার সভ্যতা ও জ্ঞানবিজ্ঞানসমূহের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছি ; কারণ মনুষ্যত্বের কোনো বিভাগ নেই।" (দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ১৯৮৩, পৃঃ ৫২৪-২৫)* । এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৩

সমাজসংস্কারক হিসেবে রামমোহন স্বকালে ও স্বদেশে অগ্রগণ্য হলেও সেখানে তিনি একা ছিলেন না। কিন্তু যুগসচেতন বিশ্বমানবতার বোদ্ধারূপে তৎকালীন ভারতে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় অন্য কাউকে দেখি না। দেশপ্রেম আরো অনেকের মধ্যে ছিল, কিন্তু দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার ভিতর অবিরোধ স্থাপনে তিনি অদ্বিতীয়। যুক্তিবাদী অথবা ধার্মিক হিসেবে উল্লেখযোগ্য নামের অভাব নেই। কিন্তু এ দুয়ের ভিতর সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রামমোহন।

তাঁর আজীবন সাধনার মূল্য বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এখানেই। যে যুগে, যে শ্রেণীতে ও যে দেশে তাঁর জন্ম সেই যুগ, শ্রেণী ও দেশের প্রতি তাঁর মমতা ছিল। কিন্তু এই সবে তিনি আবদ্ধ থাকেননি, সব কিছুকে গ্রহণ করেও তিনি অতিক্রম করে গেছেন। এখানেই একটি মৌল প্রশ্ন দেখা দেয়। সীমাকে মমতার সঙ্গে গ্রহণ করেও তাকে অতিক্রম করবার এই শক্তি কোথা থেকে আসে ? আমরা সকলেই ব্যক্তি হিসেবে ক্রমপ্রসরমাণ নানা বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। যতক্ষণ ছোট বৃত্তের সঙ্গে বৃহত্তর বৃত্তের স্বার্থের সংঘাত নেই, ততক্ষণ সমস্যা দেখা দেয় না। কিন্তু সংঘাত প্রায়শই ঘটে, আর তখনই আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই। আমাদের ব্যক্তিগত অথবা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থের যদি বিরোধ দেখা দেয় তবে আমরা কোনটিকে ত্যাগ করব, কোনটিকে রক্ষা করব, এবং কেন ? আমাদের ভিতর যাঁরা আত্মশক্তিতে বড়, যাঁরা শ্রদ্ধেয়, তাঁরা কোন শক্তির বলে স্থির করেন যে, ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত অথবা নিতান্ত স্থানীয় স্বার্থকেই সেখানে ত্যাগ করতে হবে, বৃহত্তর বৃত্তের কাছে আত্মোৎসর্গ করেই ক্ষুদ্রতর বৃত্তের সার্থকতা ?

এ প্রশ্নের একটি উত্তর এই যে, যুক্তিই এই দ্বন্দ্বের ভিতর মানুষের পথপ্রদর্শক। রামমোহনের উত্তর এতো সরল ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ধর্ম ও যুক্তির পরস্পরনির্ভর একটা সংযোজন, যেজন্য রবার্ট ওয়েনের ধর্মত্যাগী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারেননি। মূল প্রশ্নটির প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করা যাক। ব্যক্তির বৈষয়িক স্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর মানবসমাজের স্বার্থের যদি দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তবে কোন যুক্তিতে ব্যক্তি তাঁর বৈষয়িক স্বার্থ ত্যাগ করতে চাইবে ? বলা হয়ে থাকে যে, সমাজের স্বার্থের হানি হলে তাতে ব্যক্তির বৈষয়িক স্বার্থ অবশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যক্তিসমষ্টির কাছে এ যুক্তি আদরণীয়, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কাছে এটা গ্রহণীয় হবে কেন ? সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেও নিজের বৈষয়িক স্বার্থ গুছিয়ে নিয়েছেন এমন লোকের তো অভাব নেই। বলা যেতে পারে যে, উচ্চতর আদর্শের জন্য নিজের ছোট স্বার্থ ত্যাগ করে মানুষ একটা গভীরতর তৃপ্তি লাভ করে। এই তৃপ্তি অথবা উচ্চতর আদর্শের উপলব্ধি কিন্তু বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধি থেকে ভিন্ন বস্তু। রামমোহনের দৃষ্টিতে এর যোগ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সঙ্গে। যুগ যুগ ধরে পরীক্ষিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সংগ্রহ ঘটে শাস্ত্রে। এই অর্থে শাস্ত্র শ্রদ্ধেয়। তবু রামমোহন ধর্মের সঙ্গে আবার যুক্তিকেও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করতে

চেয়েছেন। কেন?

যুক্তি যথেষ্ট নয়; আবার যুক্তি মূল্যবান। দু'টি কথা একই সঙ্গে বলা আবশ্যক। এক সর্বব্যাপী সন্দেহ অথবা সংশয়বাদের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে যুক্তি, এইরকম রামমোহনের মনে হয়েছিল। কাজেই যুক্তি যথেষ্ট নয়। আবার যা কিছু ধর্ম অথবা আধ্যাত্মিকতা অথবা শাস্ত্রীয় বচনের বেশে আসে তাই আধ্যাত্মিক নয়, তার কিছু শুধুই বঞ্চনা। কাজেই যুক্তির সাবধানী দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা না করলে বিপদ আছে। যুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতা হাত ধরাধরি করে চলবে, যা কিছু সংকীর্ণতা তা থেকে আমাদের পথ দেখিয়ে নেবে বৃহত্তরের দিকে, উচ্চতর আদর্শের দিকে।

রামমোহনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এখানে আবারও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। যে দেশে তাঁর জন্ম তার গ্রামের সঙ্গে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আবার বাণিজ্য ও প্রশাসনের কেন্দ্র কলকাতা নগরীর সঙ্গেও তাঁর ঘটেছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তিনি লক্ষ করেছিলেন কলকাতায় যুক্তিবাদের অভ্যুত্থান। যুক্তিবাদের সদর্থক দিকের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তবু তিনি এটাও দেখেছিলেন যে, গ্রামের মানুষ যদিও হৃতদরিদ্র ও নিরক্ষর তবু তারা তেমন নীতিভ্রষ্ট নয় যেমন নগরের মানুষ। নগরবাসীদের সম্বন্ধে রামমোহন লিখেছেন যে, এদের অধিকাংশ হল "far inferior, in point of character, to the peasants" (দ্রষ্টব্য, B. N. Ganguli, Gandhi's Social Philosophy, chapter 9, Vikash, Delhi, 1973)। ধর্ম কত সহজে কুসংস্কারের দিকে ঝোঁকে এটা যেমন তাঁর জানা ছিল তেমনি যুক্তিবাদ কত সহজে মানুষকে আদর্শভ্রষ্ট স্বার্থসর্বস্বতার দিকে নিয়ে যায় সেটাও তিনি অভিজ্ঞতার ভিতরই পেয়েছিলেন। ধর্ম ও যুক্তির যে-সমন্বয়ের চিন্তা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তার পিছনে ছিল এই বাস্তব অভিজ্ঞতা।

তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের শেষ সমাধান অবশ্য খণ্ড খণ্ড সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বারা হয় না। কাজেই তর্ক চলে। যাঁরা ভগবানে অথবা ধর্মে বিশ্বাসী নন তাঁদের ভিতরও কি আমরা কখনও কখনও মহৎ আদর্শনিষ্ঠার উদাহরণ দেখি না? এর উত্তরে যে কথা বলা চলে তা এই। আত্মার আলোতে অনেকে স্বভাবত বেষ্টিত থাকেন, যেমন থাকে শিশুরা। সচেতন না হয়েও সেই আলোতে পথ দেখা সম্ভব। আধ্যাত্মিক সচেতনতার তবে প্রয়োজন কী? আলো যদি অচঞ্চল হয় তবে সচেতনতার প্রয়োজনও ঘটে না, যেমন বায়ু যদি সদা নির্মল থাকে তবে সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হওয়া অনাবশ্যক। যাঁরা স্বভাবত উচ্চতম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কাছে ধর্মপ্রচার করা নিষ্প্রয়োজন। অন্যদের কাছে এর প্রয়োজন আছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। আরো একটা কথা আছে। নীতিবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ যেমন এক বস্তু নয় তেমনি নীতিবোধ এবং আধ্যাত্মিক আনন্দের আস্বাদও অভিন্ন নয়। যে নীতিবোধ আধ্যাত্মিক আনন্দের সঙ্গে যুক্ত নয় তাতে সমাজের প্রয়োজন হয়ত মেটে না, কিন্তু মানুষের মুক্তি তাতে সম্পূর্ণ হয় না।

রামমোহনের উপলব্ধির জগতে আধ্যাত্মিকতার যে একটা বিশেষ স্থান ছিল সে কথা সুস্পষ্ট। এই উপলব্ধির আলোতে তিনি যথাসাধ্য তাঁর পরিণত ধ্যানধারণা রচনা করেছিলেন। রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মী উইলিয়ম অ্যাডাম বলেছিলেন, "Love of freedom was perhaps the strongest passion of his soul" (রামমোহন সমীক্ষা, পৃঃ ৩৬৫)। যে মুক্তি তিনি নিজের জন্য চেয়েছিলেন সব মানুষের জন্যই আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন সেই গভীরতর সম্পূর্ণতর মুক্তি, আত্মার জ্যোতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি

জানিয়ে, যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে নয় বরং তাকে সাবধানে সঙ্গে নিয়ে। এমন জাগ্রত সমাজচেতনার সঙ্গে এমন আধ্যাত্মিক মুমুক্ষার সংযোগ বিরল ঘটনা। এই বিরল সংযোগই কিন্তু ভারতীয় নবজাগরণের কেন্দ্রস্থিত আদর্শ। যদিও নবজাগরণের ধারা বারবার বিচিত্র পথে এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরে গেছে তবু যেন কোনো অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে সেই ধারা কিছু নতুন ভাষা ও উচ্চারণ নিয়ে, সময়ের পলিমাটি বহন ক'রে, আবারও মূল আদর্শের দিকেই ফিরে আসতে চেয়েছে।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৮৬)

মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারা প্রসঙ্গে

১

যেমন পশ্চিমে তেমনি ভারতেও উনিশ শতকের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এদেশে কোনোটির উদ্ভব বেদ উপনিষৎ অথবা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে, পাশ্চাত্য উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোনোটি যুক্ত, কোনোটি বা জড়বাদী। এই বৈচিত্র্য অস্বাভাবিক নয়।

দর্শনের উচ্চশিখর থেকে নানা পথে প্রবাহিত হয়ে এইসব ধারা যখন আমাদের কালে সমাজচিন্তার সমতলভূমিতে প্রবেশ করেছে তখন বৈসাদৃশ্যের পাশে পাশে এদের ভিতর কিছু উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্যও উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা স্মরণীয়। রাজনীতিতে একদিন তাঁর স্থান ছিল গান্ধীর বিপরীত মেরুতে। সেই ব্যবধান কখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তবু সমাজ ও রাজনীতির কিছু মৌল সমস্যা নিয়ে তাঁর শেষ জীবনের সিদ্ধান্ত গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়।

মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার প্রধান প্রধান কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। রায়ের চিন্তাধারার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

মার্ক্সের চিন্তাকে যেমন বলা হয় মার্ক্সবাদ অথবা দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, মানবেন্দ্রর বিশিষ্ট চিন্তাকে তেমনি বলা যায় মানববাদ অথবা মানবতাবাদ। তবে মানববাদে পৌঁছবার আগে জীবনের এক মধ্যবর্তী পর্যায়ে তিনি ছিলেন মার্ক্সবাদী।

সেই পর্যায়ের একটি ইংরাজী বইয়ের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত, বাংলায় বইটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'যুগান্তরের পথে ভারত'। বইটি যখন প্রকাশিত হয় মানবেন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। মাত্র কয়েক বছর আগে তিনি মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছেন। বইটি লেখা হয়েছিল দ্রুত, বিশেষ রাজনীতিক কারণে। তবু ঐ অনতিদীর্ঘ পুস্তকটিতে যে পাণ্ডিত্য এবং সেই সঙ্গে তথ্য ও যুক্তিকে সাজাবার যে ক্ষমতা দেখা গেছে তাকে নিঃসন্দেহে অসাধারণ বলা যেতে পারে।

বইটির সঙ্গে যাঁরা তেমন পরিচিত নন তাঁদের সুবিধার্থে কয়েকটি প্রধান কথা সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

মোগল যুগ থেকে ব্রিটিশ যুগ অবধি ভারত-ইতিহাসের ধারার একটা ব্যাখ্যা বইটিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের সমাজের ভিত্তিতে ছিল প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক প্রথায় চালিত কিছু গ্রামসমাজ। এই সব গ্রামসমাজ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিবর্তন সম্ভব ছিল, সেটা কিছু পরিমাণে ঘটেওছিল। কিন্তু মোগল আধিপত্যের ফলে দেশীয়

সামন্ততন্ত্রের ওপর চেপে বসে এক বিদেশী সামন্ততন্ত্র। তার উদ্ভব হয়নি নিচের গ্রামসমাজ থেকে, তাকে বসানো হয়েছে ওপরের রাজধানী থেকে। ঐ বিদেশী ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সংঘর্ষ আমরা দেখি সে যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য যুদ্ধে, ভারতময় সকলের স্মৃতিতেই যেগুলি আছে। মোগল ও রাজপুতের সংঘাত তারই অন্যতম উদাহরণ।

যাই হোক, ভারতের এই সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ঘটল পশ্চিমী বণিকতন্ত্রের আক্রমণে। ভারতের বর্তমান যুগের শুরু এইভাবে। এর বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উল্লেখ্য। মার্ক্স আমাদের শিখিয়েছেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শ্রেণীর পতন ঘটে। ভারতে তাই হল বটে, কিন্তু এদেশের সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটেনি এদেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংঘাতের ফলে।

ভারতে সে সময়ে কোনো দেশীয় বণিকশ্রেণী ছিল না এমন নয়। ছিল, আর তারাই হয় তো একদিন এদেশ থেকে সামন্ততন্ত্রকে হটাতো। কিন্তু তার আর সময় হল না, তার আগেই ব্যাপারটা অন্যভাবে ঘটে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নেতৃত্বে। সেই কোম্পানি বাহাদুরই আবার এদেশের মধ্যবিত্তকে ঠেলে দিল দীর্ঘকালের জন্য, তার স্বাভাবিক পরিণতির পথ থেকে অনেক দূরে, অন্য এক জমিদারী বন্দোবস্তের দিকে। ইউরোপের ইতিহাসে বুর্জোয়ার যে বৈপ্লবিক ভূমিকা দেখা দিয়েছিল ভারতে সেটা ঘটতে পারেনি। এদেশে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল এইভাবে যার প্রধান নির্ভর জমি এবং সরকারী চাকরী।

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে কিন্তু এদেশেও শিল্পের উন্নতি শুরু হল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সেটা চলছিল ধীরে, যুদ্ধের ধাক্কায় তার গতি হল দ্রুত। যুদ্ধের সময় বিদেশী শাসকশ্রেণীর দেশ থেকে সাগর পেরিয়ে শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের বাজারে এনে ফেলা সহজ ছিল না। কাজেই এদেশের শিল্প তখন একটা অভাবিত সুবিধা পেয়ে গেল। ভারতের নিজস্ব বুর্জোয়াশ্রেণীর বিবর্তনের এটা অতএব একটা নতুন অধ্যায়।

রায়ের ঐ বইটি প্রকাশিত হয় জেনিভা থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির অল্প কিছুকাল পরে, ১৯২২ সালে। ভারতের রাজনীতিতে তখন তোলপাড় চলছে। ঐ রাজনীতিক সন্ধিক্ষণে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া ছিল মানবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। বইটা লেখা হয়েছিল ঐ কারণে।

কিছুদিন আগেই কংগ্রেসের ভিতর নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের বিবাদ ঘটে গেছে। রায় অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলেন তাঁর নিজস্ব মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। নিজস্ব বলছি এই জন্য যে, মার্ক্সবাদীরা সবাই আবার একমত ছিলেন না। লেলিনের সঙ্গেই মানবেন্দ্রনাথের মতের পুরো মিল ছিল না।

যাই হোক, মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পরিস্থিতিটা দাঁড়াল এইরকম। নরমপন্থীদের বিশ্বাস করা যায় না। ওদের কোন বৈপ্লবিক ভূমিকা নেই। ওদের সঙ্গে বিদেশী সরকারের যে বিবাদ সেটা তো ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের বিবাদ নয়, সেটা প্রধানত এক ধনিকশ্রেণীর সঙ্গ আর এক ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত। ভারতীয় বুর্জোয়া ব্রিটিশ বুর্জোয়াকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাইবে ঠিকই, কিন্তু বিদেশী ধনিকশ্রেণীর চেয়েও তার বড় শত্রু স্বদেশের শ্রমিকশ্রেণী। কাজেই বিপদ দেখলেই ভারতীয় বুর্জোয়া বিদেশী বুর্জোয়ার সঙ্গে আপস করবে। নরমপন্থীদের হাতে স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে আন্দোলন মাঝপথেই আটকে যাবার বিপদ আছে।

আর চরমপন্থী ? তাদের কি বিশ্বাস করা যায় ? সেখানেও রায় এক বিপদ দেখলেন।

চরমপন্থীরা লড়তে চায় বটে। কিন্তু লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে ওরা গ্রহণ করেছে এক প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা। ওদের মুখে শুধু প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের স্তবগান। ওরা বিদেশীকে খতম করতে প্রস্তুত, কিন্তু দেশের ভিতর যত কুসংস্কার তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা নেই চরমপন্থীদের ধ্যানধারণায়। সম্প্রতি আবার আন্দোলনের নেতৃত্ব গিয়ে পড়েছে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর হাতে। তিনি তো পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বিরোধী, যন্ত্রসভ্যতারই বিরোধী। তদুপরি তিনি আবার অহিংসায় বিশ্বাসী। এই সব মত নিয়ে স্বাধীনতাসংগ্রামে জেতা অসম্ভব, আবার জিতলে নতুন উন্নতর সমাজ গড়ে তোলা আরো অসম্ভব।

এই সংকটের ভিতর তা হলে পথ কী? এ অবস্থায় চাই শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব নেতৃত্ব এবং নিজস্ব মতবাদ। শ্রমিকশ্রেণী বলতে রায় এখানে ভাবছেন কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নমধ্যবিত্তের কথা। বুর্জোয়াশ্রেণীকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেবার সময় এখনও আসেনি। তাদেরই পাশে পাশে গড়ে তুলতে হবে এই শ্রমিকশ্রেণীর নতুন নেতৃত্ব ও নিজস্ব আন্দোলন। এই আন্দোলনের চাপে যদি বুর্জোয়াশ্রেণী সঠিক পথে থেকে যায় তো ভালো। নয় তো অবস্থা বুঝে শ্রমিকশ্রেণীকেই এগিয়ে যেতে হবে। জাতীয় স্বাধীনতা চাই, আরো চাই শ্রমিকের স্বাধীনতা। শ্রমিকশ্রেণীর দাবী হবে, সকলের ভোটের অধিকার, শিল্পে শ্রমিকসমিতির নিয়ন্ত্রণ, জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ। স্বরাজ বলতে এসবই বোঝায়, শুধু অল্প কিছু মানুষের সুবিধা বোঝায় না। এই দাবী এবং মতবাদ নিয়ে, ভাবালু চরমপন্থীদের ভ্রান্তি ত্যাগ করে, গান্ধীবাদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, শ্রমিক-কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্তদের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তুলবার সময় এসে গেছে। সংকট কাটাবার অন্য পথ নেই। বুর্জোয়াদের একক নেতৃত্ব সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নানা কারণে ভারতে একটা উত্তেজনাপূর্ণ সময় দেখা দিয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তারই ইঙ্গিত বহন করছিল। এ অবস্থায় কী করা যায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতই দেশপ্রেমিকদের মনে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ দেশের অবস্থার যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার কিছুটা পরিচয় দেওয়া গেল। মার্ক্সবাদীরা সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে রাজনীতির প্রোগ্রাম ও রণকৌশল গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ ঐ মুহূর্তে রাজনীতির পথপ্রদর্শন করতে গিয়ে ভারতীয় ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি সব কিছুর ওপর আলোকপাত করে যেভাবে তাঁর যুক্তি বিস্তার করেছিলেন তাতে তাঁর মননশীলতার একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ হিসেবে তুলনীয় অন্য লেখা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

২

মানবেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে কয়েকটি ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। সে বিষয়ে এবার কিছুটা আলোচনা করা দরকার। তথ্যঘটিত ছোট ছোট ভুলের কথা আমি বলছি না, তাতে মূল সিদ্ধান্তের তেমন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু আমরা যখন বড় আকারে যুক্তি বিস্তার করি তখনও এমন কিছু কথা কখনও কখনও বিবেচনার বাইরে পড়ে যায় যার গুরুত্ব আছে। সেই সব কথা তারপর বিবেচনার ভিতর আনতে গেলে ভাবনাচিন্তার কাঠামোটাই অল্পবেশী

বদলে ফেলতে হয়। মানবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও ঐরকম ঘটেছিল। ফলে তাঁর চিন্তা কখনও একই জায়গায় আটকে থাকেনি।

মানবেন্দ্রনাথকে যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়ে ভারতের বিপ্লবের পথ নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছিল মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, লেনিনকেও তেমনি চিন্তা করতে হয়েছিল আরো কয়েক বং ার আগে রুশদেশে। সেখানে তখন চলছে স্বৈরতন্ত্রী জারের শাসন। তিনিও এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, তাঁর নিজ দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করে তুলবার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় না বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে, সাম্যবাদী বিপ্লবের কথা তো ভিন্ন। লেনিনের আশংকা ছিল যে, রুশ বুর্জোয়াশ্রেণী আপস করে বসবে মাঝপথে সামন্ততান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর সঙ্গে। অতএব সাম্যবাদী বিপ্লবের জন্য তো বটেই এমন কি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে তুলবার প্রয়োজনেও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব আবশ্যক। এর পরবর্তী ইতিহাস সবাই জানেন। ১৯১৭ সালের শেষে রুশদেশে পুরনো শাসকশ্রেণী পরাস্ত হল, অক্টোবর বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হল।

রুশদেশও ছিল শিল্পের দিক থেকে এক পিছিয়ে পড়া দেশ। সেখানে ছিল ভারতের মতো এক দরিদ্র নিপীড়িত কৃষকশ্রেণী। কিন্তু ১৯১৭ সালের রুশদেশের সঙ্গে যুদ্ধপরবর্তী ভারতের এক জায়গায় ছিল একটা বড় অমিল। রুশ সরকার যুদ্ধে ভেঙ্গে পড়ছিল সেদিন। আর ব্রিটিশ সরকার ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এলো বিজয়ী হয়ে। ঐ অবস্থায় কোনো হিংসাত্মক বিপ্লবে ব্রিটিশ সরকারকে পরাস্ত করা ভারতে সেদিন ছিল প্রায় অসম্ভব কাজ। এ দিক থেকে ভারত এবং রুশদেশের অবস্থা তুলনীয় ছিল না।

ভারতে গান্ধীবাদ যে সেদিন গৃহীত হয়েছিল তার অন্যতম কারণ এইটাই। গান্ধীর কাছে অহিংসা একটা নীতির প্রশ্ন ছিল বটে। কিন্তু রণকৌশলের দিকটাও তাঁর মনে ছিল না এমন নয়। ১৯০৯ সালে লন্ডনে বসে হিংসার পথে বিশ্বাসী কিছু বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ঘরোয়া আলোচনা হয়। যুদ্ধের সাজে সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে সাধারণ অবস্থায় ভিতর থেকে হিংসাত্মক উপায়ে পরাস্ত করা কত কঠিন সেটা সেদিন তিনি তাঁর যুক্তির ভিতর রেখেছিলেন। 'হিন্দ স্বরাজ' গ্রন্থেরই এক জায়গায় তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতে গান্ধীর অহিংসার পথ যাঁরা মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা যে সবাই অহিংসাকে শুদ্ধ নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়। অনেকেই ব্যাপারটাকে মনে মনে রণকৌশলের দিক থেকেও ভেবে নিয়েছিলেন। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তা সেদিন যথেষ্ট সতর্ক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরে হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সোবিয়েত লাল ফৌজের অগ্রগতি যতদূর, ইউরোপে সাম্যবাদী বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটল মোটের ওপর ততদূরই। চীনদেশ এবং এশিয়ার আরো কিছু দেশে জাপানী সৈন্যের পশ্চাদপসরণের পর তাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র বিপ্লবীদের কাজে লাগল। সাম্যবাদ কতটা এগোলো আর কোথায় গিয়ে থেমে গেল এইসব নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে রায়ের কাছে কতগুলি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে উঠলো, যেমন হল আরো অনেকের কাছে। ফ্রান্স অথবা ইতালিতে যে সাম্যবাদীরা ক্ষমতায় আসতে পারল না আর পূর্ব জার্মানি অথবা চেকোস্লোভাকিয়ায় পারল, তার কারণ এই নয় যে প্রথমোক্ত দেশগুলিতে কম্যুনিস্ট দল অথবা আন্দোলন তুলনায় দুর্বল ছিল। আসলে হিংসাত্মক বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে না শুধু দলের নিজস্ব সংগঠনশক্তির ওপর, নির্ভর করে আন্তর্জাতিক অবস্থা এবং ঐরকম আরো কিছু বিশেষ পরিস্থিতির ওপর। হিংসাত্মক

আন্দোলনের সাফল্যের পূর্বশর্তগুলি ভারতে সেদিন উপস্থিত ছিল না। 'যুগান্তরের পথে ভারত' বইটিতে এই বিষয়ে চিন্তার কোনো ছাপ নেই। রুশ বিপ্লবের সাফল্য সম্ভবত রায়ের মনে তখনও মোহ বিস্তার করে ছিল।

এবার দ্বিতীয় কথায় আসা যাক। ঐ বইটিতে রায় সামাজিক ও রাজনীতিক চিন্তার বিবর্তন বুঝতে এবং বোঝাতে চেয়েছেন বাস্তব অবস্থা বিশেষত সমাজের আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে। যেমন ধরা যাক, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। এটার যোগ আছে বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব এবং বৃদ্ধির সঙ্গে। দেশের ভিতর বাণিজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটা একটা আর্থিক ভিত্তি খুঁজে পায়। আবার সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রয়োজন হয় জনগণের সমর্থন। এইভাবে গড়ে ওঠে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ভিত্তি করে নতুন জাতীয়তাবাদ। ভারতে মধ্যবিত্তশ্রেণীই আধুনিক জাতীয়তাবাদের জনক। জাতীয় ঐক্যের আদর্শ প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ঐতিহ্যে খুঁজতে গেলে ভুল করা হবে, বিষয়টা দেখতে হবে ঐতিহাসিক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এই কথাটা মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর বিশের দশকের লেখায় বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর ঐ বিশ্লেষণে আমাদের সামনে কিছু নতুন চিন্তা খুলে যায়, একথা মেনে নেওয়া ভালো।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়। আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একটা বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে ঠিকই, আর এই শিল্পবাণিজ্যকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে বুর্জোয়াশ্রেণী। অতএব এটাই হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র স্বীকার্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা, একথা বললে বোধ করি সমাজবিজ্ঞানের ওপর একটু বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকায় এক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র আজও গড়ে ওঠেনি, একটা কুণ্ঠিত চেষ্টা চলছে পশ্চিম ইউরোপে এইমাত্র। বহুদেশে খণ্ডিত ইউরোপে তবু শিল্পবাণিজ্যের বহু উন্নতি সম্ভব হয়েছে। সারাভারত এক হলে বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে ভালো কথাই ; বহুধা বিভক্ত হলেও শিল্পবাণিজ্য আটকে থাকত এমন নয়। ভারতীয় ঐক্যের সঙ্গে বাণিজ্যের সম্পর্ক স্বীকার্য, কিন্তু এর ব্যাখ্যাকারী ক্ষমতা বড় বেশি বাড়িয়ে দেখা ঠিক নয়।

প্রাচীন ভারতে আসমুদ্রহিমাচলের একটা ধর্মীয় এবং কাব্যময় কল্পনা ছিল। এর পিছনে আর্থিক কিংবা বাস্তব ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল না। রায় বলছেন, ভৌগোলিক আধার থাকলেই জাতীয় ঐক্য লব্ধ হবে এমন নয়। ইতিহাসের বাস্তববাদী ব্যাখ্যায় ভূগোলের বেশি কিছু চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য একটা কথাও মনে রাখা ভালো। জাতীয় ঐক্যের ধারণায় রূঢ় বাস্তবের বেশি কিছু থাকে, অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনা। সেটাই ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠে। সেই ঐতিহ্য প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক সময়ে এসে মানুষের চেতনার দরজায় টোকা দেয়। সেটাও একরকমের বাস্তব। আর্থিক পরিস্থিতি দিয়ে গড়া নয় সেই বাস্তব, তবু আর্থিক পরিস্থিতির ওপরও তার প্রভাব এসে পড়ে।

কথাটা মানবেন্দ্রনাথ অন্য একভাবে পরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি শেষ অবধি জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী তবু তিনি মেনে নিয়েছিলেন যে, মানুষের চিন্তাভাবনার নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে, অন্তর্নিহিত বেগ আছে। চিন্তা ও বাস্তবের মধ্যে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া চলে। চিন্তার ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাসে তার ভূমিকা বুঝতে হলে যেমন বাস্তব পরিস্থিতির দিকে চোখ রাখতে হয় তেমনি চিন্তার ভিতরকার নিজস্ব গতিপ্রকৃতিকেও ধারণার মধ্যে আনতে হয়। আমাদের আজকের ভাষা ও কল্পনার কিছু

আজকের মানুষের এবং পরিস্থিতির সৃষ্টি বটে, কিন্তু অনেকটাই অতীত থেকে পাওয়া।

প্রশ্নটা আমাদের বামপন্থী রাজনীতিতে ফিরে এসেছিল অন্য একভাবে। ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের সভায় নেহরু এক বার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন, "তোমরা তো জানোই সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে আমার আগ্রহ প্রবল। এখন প্রশ্ন কোন ভাষায় আমরা সমাজতন্ত্রের কথা এদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব ? কোন ভাষায় বললে অতীতের স্মৃতি আর বর্তমানের পরিস্থিতি সব জড়িয়ে কথাটা এদেশের সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গিয়ে ধ্বনি তুলতে পারবে ?" সহজেই অনুমান করা যায় কোন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি এই কথাগুলি সেদিন বলছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথও নিজের মতো করে এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন চিন্তার ভিতর খুঁজতে হবে নতুন চিন্তার বীজ। নতুন চিন্তাধারা যদি প্রাচীন চিন্তার কোনো ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারে তবে তার শক্তিবৃদ্ধি হয় না, মানুষের চেতনায় তার মূল প্রসারিত হয় না। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এইরকম ঘটে। ঐতিহ্য থেকে রস আহরণ করে তবেই নতুন চিন্তা জনমানসে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতে পারে। এ সব তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তবে তিনি সতর্ক ছিলেন। নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখা চাই। ভাষা খুঁজতে গিয়ে বক্তব্য হারিয়ে ফেললে চলবে না।

কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্যেরও ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছিল। বিশের দশকেও মার্ক্সবাদী হিসেবে তিনি অবশ্যই জানতেন যে, জাতীয়তাবাদই যথেষ্ট নয়, যেমন জানতেন রবীন্দ্রনাথও মার্ক্সবাদী না হয়েও। কিন্তু তিরিশের দশকে জার্মানিতে নাৎসীশক্তির অভ্যুত্থানের পর জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্বন্ধে তিনি আরো তীব্রভাবে সচেতন হলেন। প্রথম যৌবনে দেশ থেকে বাইরের পথে যখন তিনি পা বাড়িয়েছিলেন তখন তিনি নিজে ছিলেন জাতীয়তাবাদী। এবার তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হল জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করা। স্বভাবতই ভারতে এসব কথা জনপ্রিয় হবার মতো নয়। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ চিন্তার ক্ষেত্রে নির্ভীক ছিলেন, যেমন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে। অনেকে বলবেন যে, জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার কোনো বিরোধ নেই। জাতীয়তাবাদ সোপানমাত্র আন্তর্জাতিকতার পথে। এ নিয়ে তর্ক ছেড়ে দিয়ে বাস্তব ঘটনা দেখা যাক। জাতীয়তাবাদের নামে এমন কাজ বারবার করা হয়েছে যেটা বিশ্বের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী ; যেমন জাপান আক্রমণ করেছে চীনকে। এটা বাস্তব ঘটনা, তত্ত্ব দিয়ে এই ঘটনা মুছে দেওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ ঐ অবস্থায় জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছেন, জাতীয়তাবাদকে বলেছেন ভৌগোলিক অপদেবতা। মানবেন্দ্রনাথও প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু এখানেই তিনি থেমে থাকেনি। তিনি বললেন যে, একটা সামষ্টিক শক্তিকে দেবতা বানিয়ে তার কাছে ব্যক্তিকে বলি দেওয়াটাই অপরাধ। এ কথা যদি জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সত্য হয় তবে শ্রেণীসংহতি সম্বন্ধেও সত্য। সেই শ্রেণী যদি শ্রমিকশ্রেণী হয় তবু একই কথা মানতে হবে। সবার উপরে মানুষ সত্য। জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠলেই চলবে না ; শ্রেণীবাদকেও অতিক্রম করতে হবে। আবারও আপত্তি উঠবে। কেউ কেউ বলবেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে মানুষের সর্বোত্তম স্বার্থের বিরোধ অসম্ভব। তবু ঘটনা হল এই যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের নামে এমন কাজ করা হয়েছে, এমন নীতি গৃহীত হয়েছে, যেমন স্তালিনী আমলে এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই, যেটা মানুষের আদর্শের বিপরীত। কোনো নীতি সম্বন্ধেই শেষ প্রশ্ন এই নয় যে,

সেটা কোনো বিশেষ জাতি অথবা শ্রেণী অথবা সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রয়োজন কি না শেষ প্রশ্ন এই যে সেটা মানুষের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন মানুষের ধর্মের কথা। মানবেন্দ্রনাথ বললেন নবমানবতাবাদের কথা। এখানেই মার্ক্সবাদ থেকে তাঁর নিষ্ক্রমণ। তাঁর ভাষা ও বক্তব্য দুয়েরই বিবর্তনে একটা নবপর্যায় উন্মোচিত হল এইভাবে। এইখানে শুরু নতুন কিছু জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান।

প্রশ্ন উঠবে, মনুষ্যত্বের আদর্শ বলতে আমরা কী বুঝি? মানবপন্থীরা বলবেন, ব্যক্তিমানুষের ভিতর যে অজস্র সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশই হল মানবাতাবাদীর লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষ ভালো খেয়ে পরে সুস্থ দেহে থাকবে, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে যে আনন্দআস্বাদন করা যায় তা লাভ করবে, বুদ্ধি এবং চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের যে ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য তাতে তার অধিকার যথাসম্ভব বিস্তৃত হবে, শিল্পসাহিত্যের ভিতর দিয়ে যে নান্দনিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয় তা থেকেও বঞ্চিত থাকবে না। এইভাবে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতার ভিতর দিয়েই সমাজের পূর্ণতা। প্রশ্ন তবু থেকে যায়। মানুষের বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিতরও বৈপরীত্য থাকে। সব সম্ভাবনার একই সঙ্গে পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। এই সব বৈপরীত্যের মধ্যে পথ খুঁজে নেওয়া যাবে কোন সূত্র ধরে? এ প্রশ্ন আপাতত মুলতুবি রেখে অন্য একটা জরুরী জিজ্ঞাসায় যাওয়া যাক।

রাজনীতির একটা বড় সমস্যা মানবেন্দ্রনাথকে শেষ জীবনে ক্রমশই পীড়িত করছিল। হয় তো অনেক আগেই এর শুরু, কিন্তু তাঁর চিন্তার অভিব্যক্তির শেষ পর্যায়ে এটা বড় হয়ে উঠল। সমস্যাটা রাজনীতিতে দুর্নীতি নিয়ে। তিনি রাজনীতি শুরু করেছিলেন একটা আদর্শ নিয়ে, আরো কিছু মানুষের মতো তিনিও আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির পথ ধরে আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া কতটা সম্ভব? যদি সেটা সম্ভব না হয় তবে তো প্রচলিত রাজনীতিও একটা ব্যবসা মাত্র, বিবেকবান মানুষের তাতে রুচি থাকবার কথা নয়! অতএব রাজনীতিকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত করাটাই একটা বড় প্রশ্ন। কী করে সেটা সম্ভব? মানবেন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে সমস্যাটা বুঝবার চেষ্টা করলেন। আজকের রাজনীতি হল মূলত বিভিন্ন দলের ভিতর ক্ষমতার জন্য লড়াই। আর এরই ফলে রাজনীতি হয়ে উঠেছে দুর্নীতি। অথচ দলীয় গণতন্ত্রকে রাজনীতির একমাত্র এবং অনিবার্য রূপ মনে করবার কোনো কারণ নেই। গণতন্ত্রের কিছু আদর্শ শ্রদ্ধেয়, কিন্তু দলীয়তা রাজনীতির অথবা গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য নয়। একদলীয় নয় কিন্তু নির্দলীয় গণতন্ত্রের আদর্শ মানবেন্দ্রনাথের শেষ জীবনের চিন্তার একটি প্রধান অঙ্গ।

এই সব চিন্তাভাবনার ভিতর দিয়ে গান্ধী এবং মানবেন্দ্রনাথের ধারা জীবনের শেষ প্রান্তে যেন কিছু সামঞ্জস্যের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। কিছুটা, কিন্তু সর্বাংশে নয়।

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, বাণিজ্য ও শিল্পকে আশ্রয় করে যে সভ্যতা গান্ধীর সামনে অনাবৃত হয়েছিল, নিজের আদর্শ ও জীবনবোধের সঙ্গে গান্ধী তার অসামঞ্জস্য লক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে, এই নতুন সমাজে ক্ষমতা ছড়িয়ে নেই লোকালয়ে লোকালয়ে, কেন্দ্রীভূত হয়েছে বিশেষত নগরে। আধুনিক প্রযুক্তি এই কেন্দ্রীকরণকেই সুদৃঢ় করেছে। তিনি আরো দেখেছিলেন যে, নাগরিক সভ্যতায় মানুষের ভোগতৃষ্ণার সীমা নেই, তার মন অধিকার করে আছে অর্থ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, যেন এরই অন্তহীন সঞ্চয়ের ভিতর দিয়ে লাভ হবে অন্তহীন চরিতার্থতা। তাঁর মনে হয়েছিল যে, ক্ষমতার কাড়াকাড়ি এবং ভোগের তৃষ্ণা যতদিন প্রবল থাকবে ততদিন সমাজ থেকে হিংসা ও

দুর্নীতি সরানো যাবে না। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, সামাজিক বিন্যাসে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অবসান চাই, আর মানুষের বিশেষত বিত্তবান মানুষের ভোগবাদী মনোভাবকেও সচেতনভাবে সংযত করা আবশ্যক।

মার্ক্সবাদী মানবেন্দ্রনাথ জানতেন যে, ভোগবাদবিরোধী দর্শনকে সমাজের উঁচুশ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করেছে নিচুশ্রেণীকে সংযত রাখবার জন্য। ভোগবাদবিরোধী দর্শনের প্রতি তাই তাঁর একটা বিরোধিতা ছিল। সেই বিরোধিতা তিনি কখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করেননি। ঈশ্বরে নয়, তিনি বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন যুক্তিতে, যে যুক্তি সুখের ভিতরই সদর্থ খুঁজে পায়। গরীবের জন্য যে রুটিই প্রথম প্রয়োজন একথা গান্ধীও জানতেন এবং অত্যন্ত স্মরণীয় ভাষায় বলে গেছেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করে মানুষ তার ভিতরের শক্তিকে অন্য এক রূপ দিতে পারে, যার প্রকাশ সেবা এবং প্রেমে। এরই আলোতে আমরা অবশেষে চিত্তের বিভিন্ন প্রবৃত্তির ভিতর সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে পাই। এই সব কথা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনদর্শনে গুরুত্ব পায়নি। বস্তুত এসব কথায় তিনি বিপদের আশংকাই দেখেছেন। এই শিকড় থেকেই বেড়ে ওঠে সেই ধর্ম যাকে অবলম্বন করে দীর্ঘকাল ধরে পুরোহিতশ্রেণী বিভ্রান্ত করেছে সাধারণ মানুষকে। মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় এই কথাটাই থেকে গেছে। কিন্তু ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন, সেই সঙ্গে চাই বিবেকহীন রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সংগঠিত জনমত, এই প্রতীতিতে গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ পরস্পর কাছাকাছি এসেছিলেন। গান্ধীর দৃষ্টিতে নীতির ভিত্তিভূমি, অহিংসা তথা সত্য ; রায়ের দৃষ্টিতে, যুক্তি অতএব সত্য।

৩

নবমানববাদী আন্দোলনে পথপ্রদর্শক হবেন কারা ?

সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে আসবার পথে স্বাভাবিক নেতৃত্ব ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। মার্ক্স এই শিক্ষা দিলেন যে, ধনতন্ত্র থেকে সাম্যবাদের পথে আন্দোলনের স্বাভাবিক নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর। পৃথিবীর কোনো দেশে আজ ধনতন্ত্র, কোনো দেশে সমাজতন্ত্র। কিন্তু আধুনিক সব সমাজে দেখি ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সেই ঝোঁক, গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ দুজনের চোখেই যেটা মনে হয়েছে বিপজ্জনক, অতএব বিরোধের যোগ্য। কিন্তু এই বিরোধিতায় কে নেতৃত্ব দেবে ? সমাজের অভ্যন্তর থেকে এমন কোনো বিশেষ শ্রেণীর কি উদ্ভব হয়েছে যার কাছ থেকে নেতৃত্ব আশা করা যায় ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণের প্রতিরোধী আন্দোলনে ? এমন কোনো বিশেষ শ্রেণী কি আছে যার কাছ থেকে নেতৃত্ব প্রত্যাশিত দুর্নীতি ও হিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ?

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য জন্ম হয়নি কোনো বিশেষ শ্রেণীর। এই মূল্যবোধের সংগ্রাম নয় পুরনো কোনো অর্থে সুনির্দিষ্ট শ্রেণীসংগ্রাম। এ মূল্যবোধ যারই কাছে শ্রদ্ধেয় তিনিই এই সম্ভাবিত আন্দোলনের অংশীদার। মানবেন্দ্রনাথ যে নিম্নমধ্যবিত্ত এবং চাষী মজুরের কথা বলেছিলেন তারা হয় তো যোগ দেবে এ সংগ্রামে, যেমন দিয়েছে পোল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণী সে দেশের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। কিন্তু তবু এই নতুন আন্দোলনের কোনো সংস্থাপিত রূপ নেই, পতাকা নেই, শ্রেণীগত সীমানা নেই। কোথাও এতে আন্দোলিত হচ্ছে যুবসম্প্রদায়, কোথাও নতুন যুগের নারী। কোথাও সরকারি ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে অসীম সাহসে কাজ করে যাচ্ছে কিছু নবচিন্তক। এ

সংগ্রাম সর্বমানবের। মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদের সঙ্গে এর সুর মেলে। যেমন মেলে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সঙ্গে। এঁদের কারো চিন্তাই অন্যের সঙ্গে অভিন্ন নয়। কিন্তু এ এক অন্য আন্দোলন, যেখানে চিন্তার বৈচিত্র্য অপরাধ নয়।

মানবেন্দ্রনাথের ধ্যানধারণার সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক তার সজীবতা, তার বিচিত্র বিবর্তন। চিন্তা নয়, চিন্তাধারা ; তাতে পরিবর্তন আছে আর সেই সঙ্গে ধারাবাহিকতা, মুক্ত চিন্তার যেটা স্বাভাবিক ধর্ম। বিশের দশকের সেই বৈজ্ঞানিক মার্ক্সবাদ কত সরল ছিল। যুক্তিবাদের একটা স্তর আছে যেখানে মনে হয়,ভাবালুতা ত্যাগ করে বাস্তব পরিস্থিতির আলোতে সমস্যার পরিচ্ছন্ন সমাধান খুঁজে নেওয়াটাই কর্তব্য। অথচ অনন্য কোনো বাস্তব পরিস্থিতি নেই, কোনো বাস্তব পরিস্থিতিতেই লুকিয়ে নেই সমস্যার কোনো অনন্য সমাধান। আছে শুধু স্তর ও সম্ভাবনার সমাহার। মানুষের চেতনার পটভূমিতে কত দৃশ্য এবং অদৃশ্য লিপি লিখে রেখে গেছে অতীত। তারই সঙ্গে মিলিয়ে ব্যক্তিচৈতন্য এবং বাস্তব পরিস্থিতিকে আমরা চিনি, যুক্তি এবং বিবেকের ভাষা গড়ে ওঠে, মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনার নতুন পাঠ তৈরি হয়।

বিচিত্র সেই পাঠ ; বিবিধ তার ব্যাখ্যা। শিক্ষা ও সংশোধন চলবে। কোন মূল্যবোধের দিকে আমরা চালিত হচ্ছি, সেটাই প্রধান কথা।

মানবেন্দ্রনাথ রায় : জাতীয়তাবাদ থেকে মার্ক্সবাদ

বিশ শতকে জাতীয়তাবাদ থেকে মার্ক্সবাদের পথে যাত্রীর অভাব হয়নি। তবু মানবেন্দ্রনাথের পরিক্রমা এরই মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়, ঘটনার বৈচিত্র্যে ও চিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতে। এ যুগের একটি প্রধান ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েও তিনি এক ব্যতিক্রমী পুরুষ। যে পথে অনেকেই কিছুদূর গিয়ে চলবার শক্তি হারিয়ে থেমে গেছেন, তিনি সেখানে শেষ অবধি এগিয়েই চলেছেন, চরৈবেতি চরৈবেতি। সেই স্মরণীয় যাত্রা আলোকিত হয়েছে তাঁর অজস্র লেখায়।

মানবেন্দ্রনাথের লেখার পরিমাণ এত বেশি এবং সেই সব লেখা পৃথিবীর দূর দূরান্তে নানা দেশে ও বিভিন্ন ভাষায় এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে তার সম্পাদনার কাজ অতি দুরূহ। সৌভাগ্যের কথা, এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের মতো একজন পণ্ডিত চিন্তাশীল ও সম্পাদনার কাজে অভিজ্ঞ বিবেকী ব্যক্তি। ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা নয়, বরং সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

এতেও অন্তত ছ' সাতটি বেশ বড় আকারের ভল্যুম দরকার। প্রথম ভল্যুমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানবেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবনের পাঁচটি বছর, ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত।° ১৯১৭ সালে তিনি ত্রিশ বছরে পা দিয়েছেন। অর্থাৎ ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের ভিতর তাঁর কাজকর্ম ও চিন্তাভাবনার পরিচয় পাই সম্পাদিত এই গ্রন্থটিতে। এই সময়টা রায়ের জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর চিন্তা ও কর্মের প্রবাহ একটা বড়

রকমের চাঞ্চল্যকর বাঁক নিয়েছে এই বছরগুলিতে। মানবেন্দ্রনাথের জীবনে এক সন্ধিক্ষণ এটা বড় পরিবর্তন তাঁর জীবনে একাধিকবারই এসেছে, তাঁর চিন্তাধারা একটি প্রশস্ত নদীর মতো পথ তৈরি করে এগিয়ে গেছে। তবু ঐ প্রথম বাঁকটির একটা বিশেষ ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি আমাদের যুগের ইতিহাসে।

১৯১৭ সালে মানবেন্দ্রনাথ যখন মেক্সিকোতে পদার্পণ করেন তখনও তিনি মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হননি। বরং তাঁকে বলা যেতে পারে বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক। জার্মানি থেকে অস্ত্রসংগ্রহ করে ইংরেজশাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১৫ সালে তিনি ভারত থেকে বেরিয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়া ও চীনে জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর মনে হয় অস্ত্রসংগ্রহের ব্যবস্থা পাকা করতে হলে তাঁকে জার্মানি পর্যন্ত যেতে হবে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধে যোগ দেয়নি। ১৯১৬ সালে মানবেন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন জার্মানি যাবার সুযোগের সন্ধানে। সেই সুযোগ আসবার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানির বিরুদ্ধে। মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে তখন সে দেশে বাস করা নিরাপদ রইল না, তিনি পালিয়ে পাশের দেশ মেক্সিকোতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে পৌঁছবার পরও অস্ত্রসংগ্রহের পরিকল্পনা তিনি সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করেননি, মেক্সিকোতে কিছু জার্মান চরের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও হয়েছিল। কিছুদিনের ভিতরেই কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন যে, জার্মানি থেকে অস্ত্রসংগ্রহ করে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবার পথ বন্ধ।

মেক্সিকোতে তিনি ছিলেন আড়াই বছর, ১৯১৭ সালের জুন থেকে আরম্ভ করে ১৯১৯ সালের শেষ অবধি। প্রথম দিকে তাঁর প্রধান কাজ হল, সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ সোস্যালিস্ট দল সংগঠন আর সেইসঙ্গে ভারতের সপক্ষে জনমতগঠন করা। এই সময়ে স্প্যানিশ ভাষায় লিখিত তাঁর একটি বইয়ের নাম, La India, Su Pasado, Su Presente Su Porvenir (India: Her Past, Present and Future). প্রকাশকাল ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাস। মানবেন্দ্রনাথের রচনা সংকলনের প্রথম ভল্যুমে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তখন পর্যন্ত রায় যদিও সমাজতন্ত্রী তবু মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেননি। ১৯১৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মেক্সিকোতে এসে উপস্থিত হলেন মাইকেল বোরোদিন, ইনি ছিলেন লেনিনপন্থী এবং নবপ্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল বা কমিন্টার্নের প্রতিনিধি। অতি দ্রুত রায়ের সঙ্গে বোরোদিনের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। আর এই সময় থেকেই শুরু হয় মানবেন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা ও কর্মকাণ্ডের এক নতুন পর্যায়। কমিন্টার্নের সূত্র ধরেই কিছুদিনের ভিতর আমন্ত্রণ এলো লেনিনের কাছ থেকে।

১৯২০ সালে রায় ইয়োরোপে গিয়ে পৌঁছলেন। কয়েক মাস জার্মানিতে কাটিয়ে প্রবেশ করেন মস্কোতে। সেখানে অংশ গ্রহণ করেন কমিন্টার্নের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে। জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিবেচনায় লেনিনের প্রস্তাবের পাশে পাশে মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবও আলোচিত হয়, দুটি প্রস্তাবই কিছু সংশোধনসহ কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এর পর নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে মানবেন্দ্রনাথ অল্প সময়ের ভিতরই নেতৃত্বের উচ্চ আসনে পৌঁছে যান।

তাঁর এই সময়কার বেশ কয়েকটি লেখা রচনা সংকলনের প্রথম ভল্যুমে স্থান পেয়েছে। ১৯২২ সালে প্রকাশিত India in Transition নামে পুস্তকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব লেখায় যে মানবেন্দ্রনাথকে আমরা পাই তিনি মার্ক্সবাদী। তাঁর

১৯১৮ সালের রচনার সঙ্গে ১৯২০ কিংবা ১৯২২ সালের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ অনেকখানি। একই গ্রন্থে এইসব রচনা পাশাপাশি স্থান পেয়েছে বলেই প্রভেদটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটি এইদিক থেকেও আকর্ষণীয়।

এই বিষয়টি আরো একটু আলোচনা করে নিলে ভালো হয় । ১৯১৮ অবধি যে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক আর ১৯২০ সালে যিনি সকলের সামনে আবির্ভূত হলেন মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক হিসেবে, এ দুয়ের ভিতর মিল কতটা আর অমিল প্রধানত কোথায় ?

মানবেন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। নরেনের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। তাঁর জীবনে ১৯০৫ একটি অবিস্মরণীয় বছর। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে কিশোর নরেনের ইতিমধ্যে যোগ ঘটে গেছে। সে যুগের অন্যান্য স্বদেশভক্তদের মতো তাঁরও চেতনা ও আদর্শ গঠিত হয়েছিল বঙ্কিম বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের প্রভাবে।

উনিশ শতকের শেষভাগে এঁদের মুখে সাম্যের আদর্শের কথা বার বার শোনা গেছে। আচণ্ডাল সমস্ত ভারতবাসীকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছিলেন বিবেকানন্দ তাঁর আবেগময়ী ভাষায়। তারও আগে স্বচ্ছ সুন্দর রচনায় সাম্যের কথা লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। "এই সংসারে একটি শব্দ সর্বদা শুনিতে পাই—'অমুক বড় লোক—অমুক ছোট লোক'।" এই দিয়ে যে প্রবন্ধটি শুরু তার শেষে বলা হয়েছে, "সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।" আর এই "সাম্য" প্রবন্ধের মাঝখানে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকের অবস্থা নিয়ে লিখেছেন, "যাঁহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধার চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন। সাম্যতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া সে বৈষম্য না দেখাইলে কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।"

কাজেই মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হবার আগেই মানবেন্দ্রনাথ এক প্রকারের সাম্যতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাঁর অবস্থান ছিল নরমপন্থীদের বিপরীত প্রান্তে। জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণের যোগ কম এই ধারণার জন্যও তাঁকে মার্ক্সবাদের দ্বারস্থ হতে হয়নি।

উনিশ শতকের শেষদিকে অরবিন্দ তীক্ষ্ণ ভাষায় ঐসব কথা বলে গেছেন। ১৮৯৩-৯৪ সালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দের কিছু প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অরবিন্দ তখন লিখেছেন, "The Congress represents not the mass of the population but a single limited class...I should not hasitate to call it our new middle class." আরো বিস্ময়কর, প্রোলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার কথাও অরবিন্দ সেই সময়েই উল্লেখ করেছেন। এইসব চিন্তার তরঙ্গ তরুণ নরেন্দ্রনাথের চেতনায় ধাক্কা দেয়নি এমন বিশ্বাস করা যায় না।

এক রকমের শোষণতত্ত্বও নরেন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। বিশেষত বিদেশী শাসকশ্রেণী কীভাবে ভারতকে শোষণ করেছে, এ বিষয়ে উনিশ শতকে দাদাভাই নওরোজী থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত পর্যন্ত প্রখ্যাত লেখকদের চিন্তাধারার প্রভাব ছিল সে সময়ে সুবিস্তৃত। মার্ক্সবাদ গ্রহণ করবার আগেই মানবেন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক শোষণ বিষয়ে অনেকটা পড়াশুনো ও চিন্তা করেছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তাঁর লেখাতে সেই প্রমাণ আছে।

তাঁর জাতীয়তাবাদী পর্যায়েও মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বচেতন ছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো

উইলসনকে ১৯১৭ সালে তিনি যে খোলা চিঠি পাঠান তাতে সেই বিশ্বসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মানি সাহায্য গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি যখন দেশ-বিদেশে যাত্রা শুরু করলেন তখন তাঁর মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গ্রহিষ্ণু চেতনাসম্পন্ন মানুষের মন বিশ্বমুখী হয়ে পড়বে এটা অপ্রত্যাশিত নয়।

অতএব সাম্যের আদর্শই হোক, শোষণের তত্ত্বই হোক কিংবা বিশ্বসচেতনতাই হোক, এই সবের জন্য মানবেন্দ্রনাথের মন আগে থেকেই তৈরি ছিল। তবু যে বোরোদিন তথা মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচয় এবং কমিন্টার্নের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তাঁর চিন্তার জগতে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে পরাস্ত জার্মানি থেকে ভারতের মুক্তিসংগ্রামের জন্য অস্ত্রসংগ্রহের সম্ভাবনা অন্তত অনেকদিনের জন্য লুপ্ত হল। ভারতীয় বিপ্লবীদের একটি আশার স্তম্ভ যেন ভেঙে পড়ল। ঠিক সেই সময়ে কমিন্টার্নের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে মানবেন্দ্রনাথ লাভ করলেন এক নতুন বিশ্বদৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে এক নতুন আশার আলো। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সহায়তা পাবে কমিন্টার্ন তথা বিপ্লবী সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছ থেকে। জার্মানি হয়তো ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। কমিন্টার্ন গুরুত্ব দেবে তো? না কি কমিন্টার্নের দৃষ্টি কেড়ে নেবে ইয়োরোপ? আর এশিয়া তথা ভারত অবহেলিত থেকে যাবে? ১৯২০ সালে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করলেন এ কথাটা বোঝাতে যে, এশিয়া তথা ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামকে অবহেলা করা ভুল হবে। এশিয়ার বিপ্লব জয়যুক্ত না হলে ইয়োরোপেও হবে না।

একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী আরো ধারালো হয়ে উঠল। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য সম্বন্ধে সচেতনতা তো আগে থেকেই ছিল। সাদা আমলার জায়গায় কালো আমলা এলে তাতে দরিদ্রের কোনো লাভ নেই, এই বোধটা নতুন নয়। কিন্তু মার্ক্সবাদের প্রভাবে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব মানবেন্দ্রনাথ মেনে নিলেন। রাজনীতি ও সংগ্রামনীতির বিশ্লেষণে এটা একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

কিন্তু শুধু রাজনীতি নয়, মার্ক্সবাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল মানবেন্দ্রনাথের সংস্কৃতিবিষয়ক চিন্তায়। যেমন ধরা যাক, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা। বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিকদের চোখে প্রাচীন ভারতের চিত্রটি গৌরবোজ্জ্বল। মার্ক্সবাসী তত্ত্ব মানবেন্দ্রনাথকে এবার প্রতিষ্ঠিত করল প্রাচীন ঐতিহ্যের কঠোর সমালোচকের ভূমিকায়। অনেক পুষ্পিত বাক্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ অনুশাসনের পিছনে আছে শ্রেণীস্বার্থের শঠতা, এই রকম একটা বোধ এবার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাধান্য লাভ করল। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্ক্সবাদে যাত্রার পথে এটাই হয়তো মানবেন্দ্রনাথের চিন্তার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

১৯১৮ সালে যখন তিনি ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লিখিত বইটি লিখেছেন তখনও এ দেশের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। তাই ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি সেখানে সংশয়হীন ভাষায় বলতে পেরেছেন : "The superior philosophical, religious and ethical character of this ancient civilization is generally accepted by the world." ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র স্বীকৃত, এই সরল বিশ্বাস প্রকাশ করতে তিনি সংকোচবোধ করেন না। বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, তাঁর দেশের প্রতি মেক্সিকোতে তিনি অনেক সহানুভূতি লক্ষ করেছেন, কিন্তু ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, "glorious history", বিষয়ে অজ্ঞতা থেকে গেছে। এ দেশের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় মানবেন্দ্রনাথ লক্ষ

করেন সাম্য ও সহযোগিতার প্রশংসনীয় প্রয়াস। অন্যান্য অনেক ভারতপ্রেমিকের মতোই দারিদ্র্য ও অসাম্য সম্বন্ধে সচেতন থেকেও স্বদেশের একটা ভাবমূর্তিকে প্রণাম জানাতে সেইসময় পর্যন্ত তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ১৯২২ সালে প্রকাশিত *India in Transition* নামে বইটিতে তিনি লেখেন : "Advocates of Hindu orthodoxy consciously or unconsciously desire to keep the people in the darkness of ignorance and submission." অর্থাৎ জেনে হোক অথবা অজান্তে হোক, হিন্দু ঐতিহ্যবাদীদের উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকারে আর অধীনতার বন্ধনের ভিতরে ফেলে রাখা।

মানবেন্দ্রনাথ যেমন জাতীয়তাবাদকে একদিন অতিক্রম করে গিয়েছিলেন তেমনি মার্ক্সবাদেও চিরকাল আবদ্ধ থাকেননি। এই নিষ্ক্রমণের পর্যায়গুলি আমাদের যুগের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ, কাজেই সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। লেনিনের মৃত্যুর কয়েক বছর পর কমিন্টার্ন তথা মস্কোর অধীনতা মেনে নেওয়া রায়ের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। মার্ক্সবাদের কিছু মৌল তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তও তিনি ক্রমে পরিত্যাগ করেন। এর ভিতর আছে শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংহতির নামে এক রকমের অসহিষ্ণুতা প্রশ্রয় পায়, মানুষের বুদ্ধিকে সেটা শৃঙ্খলিত করে। তাঁর এই প্রত্যয় দৃঢ় হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে, যখন সোভিয়েত নেতারা যুদ্ধজয়ের পরেও স্বদেশে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার খোলা হাওয়া প্রবেশ করতে দিলেন না।

মানবেন্দ্রনাথ এর পর নিজের মার্ক্সবাদী পরিচয় পর্যন্ত মুছে দিলেন। কিন্তু তাই বলে পুরোনো চিন্তায় কখনো ফিরে যাননি। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্ক্সবাদের পথ ধরে তিনি অবশেষে উত্তীর্ণ হলেন নব মানবতাবাদে। এ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য বিশেষত ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা তিনি শেষজীবন পর্যন্ত রক্ষা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ দেশে বুদ্ধির মুক্তি ও সামাজিক মুক্তির জন্য এই সমালোচনা আবশ্যক। তবে প্রাচীন ঐতিহ্যে সবই অশ্রদ্ধেয় নয়, কিছু মূল্যবান মানবিক উপাদান আছে সেখানেও, একথা তিনি বলতে ভোলেননি।

মানবেন্দ্রনাথ ও নবমানবতাবাদ

মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে তখন তিনি মার্ক্সবাদ ত্যাগ করে নবমানবতাবাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। এই যাত্রাপথে কয়েকটি ছোটো স্টেশন তিনি দ্রুত অতিক্রম করে যান। পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক বা সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক মতবাদের সারাৎসার নিয়ে কিছু দিন তাঁকে বিচার-বিবেচনা করতে দেখি। ইতালীর দুই নেতা সারাগাত ও নেন্নিকে নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এইসব কোনো মতবাদেই তাঁর বুদ্ধি বিশ্রামস্থান খুঁজে পায়নি। নবমানবতাবাদে এসে তবেই তিনি শান্তি লাভ করেন। এর কিছু কারণ আছে।

মানবেন্দ্রনাথ কর্মে ও চিন্তায় দুঃসাহসিক ছিলেন। প্রথম জীবনে কর্মের দুঃসাহসিকতাই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য, তবু অতুলনীয় নন। জীবনমৃত্যু-পায়ের-ভৃত্য এইরকম একটা ভাব স্বাধীনতাসংগ্রামের অগ্নিযুগে আরো বহু স্মরণীয় মানুষের ভিতর দেখা গেছে। অবশ্য রায়ের অক্লান্ত পৃথিবীপরিক্রমার সঙ্গে নির্ভীকতার সংযোগে উনিশ শ' তিরিশ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবন একটা বিশেষ চরিত্র লাভ করেছিল যেটা অবিস্মরণীয়। তবু স্বীকার করা আবশ্যক যে, ভূ-পরিক্রমাই নয়, একালে যেটা ক্রমেই সহজ হয়ে উঠেছে, বরং সেই সঙ্গে মননের দুঃসাহসিকতাই মানবেন্দ্রনাথকে অনন্য করে তুলেছে। মানুষের ভিতর দিয়ে একটি অক্লান্ত সৃজনশীল চেতনার শক্তি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে, একথা ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা জানি। সেই শক্তিকে আমারই যৌবনে একটি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে, সীমাবদ্ধ সময়ের রঙ্গমঞ্চে, এমন অসাধারণ ভূমিকায় এত কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এটাকে সৌভাগ্য বলেই মানি।

তরুণ বয়সে জাতীয়বাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনিও শিখেছিলেন দেশকেদেবীরূপে পুজো করতে, তাঁরও চেতনায় তরঙ্গ তুলেছিল 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত। অথচ পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথের শুধু নামেরই পরিবর্তন হয়নি, চিন্তা ও বিশ্বদর্শনেরও এমনই রূপান্তর ঘটল যে, মানবেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন জাতীয়তাবাদের এক শক্তিমান সমালোচক। বলা বাহুল্য, মার্ক্সবাদের প্রভাবে তাঁর চিন্তার এই বিকাশ সম্ভব হয়। সে যুগে মার্ক্সবাদীদের ভিতরও উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল। এই সব গোষ্ঠীর ভিতর জার্মানিতে এবং অন্যত্র যারা জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে সব চেয়ে মুক্ত, তাদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় ঘটে। ইউরোপে তখন চলেছে নাটকীয় পটপরিবর্তনের যুগ। বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জার্মানিতে নাৎসী আন্দোলনের অভ্যুত্থান। ভারতের নানা ঘটনাতেও তাঁর এই নতুন বিচারধারা পুষ্টিলাভ করে।

মনে রাখা ভালো যে, এ-দেশের আরো একজন মহান পুরুষ প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী যুগে জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করেন, দেশে ও বিদেশে, সুস্পষ্ট ভাষায়। তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর তৎকালীন যে-সব বক্তৃতা Nationalism নামে পুস্তকে প্রকাশিত হয় তা থেকে এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্রনাথ মার্ক্সবাদী ছিলেন না, বরং উপনিষদের বাণীর স্পর্শ আছে তাঁর বিশ্বচেতনায়। কিন্তু তাঁরও চিন্তার এক উত্তরণ দেখি—১৯০৫ সালের উন্মাদনা ও স্বপ্নময়তা থেকে অন্য এক স্বচ্ছতায়। আর এখানেও প্রভাব আছে কিন্তু তৎকালীন অভিজ্ঞতার—রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ, জাপানের আগ্রাসী অভিযান, ভারতে সংকীর্ণ বিদেশীবিদ্বেষ, পৃথিবীময় সাম্রাজ্যবাদী ক্রূরতা।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে patriotism বা স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা এক বস্তু, আর nationalism বা জাতীয়তাবাদ অন্য বস্তু। প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি, দেশের মাটির জন্য মমতা, প্রকৃতিপ্রেম, এই সব মানুষের চেতনার সঙ্গে জড়িত প্রাচীনকাল থেকে। জাতীয়তাবাদের যোগ আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ক্ষমতা। জাতীয়তাবাদের

নামে সমাজকে সংগঠিত করে তোলা হয়েছে ক্ষমতালাভের জন্য, ক্ষমতার বিস্তারের জন্য, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বের জন্য। সমাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। যে স্বাভাবিক প্রীতি সমাজের মৌল বন্ধন তারই সঙ্গে যোগ স্বদেশপ্রেমের। ক্ষমতার সঙ্গে যোগ আধুনিক জাতীয়তাবাদের।

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা মানবেন্দ্রনাথ লাভ করেননি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তবুও এঁদের চিন্তার মিল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। জাতীয়তাবাদে আশ্রয় পায় এক ধরনের সামষ্টিক অহংকার। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য জাতি হয়ে ওঠে বূহ্যবদ্ধ। বূহ্যবদ্ধ অহংকারের ভিতর দিয়ে জন্মলাভ করে সেই অসহিষ্ণুতা, স্বাধীন চিন্তার পক্ষে যা বিপজ্জনক ; বেড়ে ওঠে সেই বিজাতিবিদ্বেষ, বিশ্বশান্তির পক্ষে যা ধ্বংসাত্মক। জাতীয়তাবাদের নামে এই সংঘবদ্ধ সমষ্টির পুজো মানবেন্দ্রনাথের কাছ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য মনে হল। জীবনের এক পর্যায়ে যিনি ছিলেন নিজে জাতীয়তাবাদী, পরিণত বয়সে তিনিই হয়ে উঠলেন সেই বহুবন্দিত মতাদর্শের কঠোর সমালোচক। এর ফলে তিনি বহু লোকের কাছে নিন্দিত হয়েছেন, কারণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাই সেদিন প্রবল ছিল, আজও তাই। তবু সত্যকে তিনি যখন যেভাবে উপলব্ধি করেছেন সেইভাবেই তাকে ভয়শূন্য চিত্তে উচ্চারণ করেছেন।

এই শতাব্দীর বিশের দশকে ভারতে মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রসারে মানবেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। কিন্তু এখানেও তাঁর মধ্যযৌবনের চিন্তাকে তিনি অতিক্রম করে গেছেন প্রৌঢ়তার প্রান্তে এসে। জাতীয়তাবাদ যদি অগ্রাহ্য হয় সমষ্টির পুজো বলে, শ্রমিকশ্রেণীকেই তবে পতাকা ও সঙ্গীত সহ পুজো করা যাবে কোন্ যুক্তিতে? স্বদেশপ্রেম আর জাতীয়তাবাদ যেমন এক বস্তু নয়, দরিদ্রের প্রতি আত্মীয়তাবোধ আর মার্ক্সবাদও তেমনি অভিন্ন নয়। জাতির মতোই শ্রেণীও একটি সমষ্টিবিশেষ। শ্রমিকশ্রেণী এর ব্যতিক্রম নয়। মার্ক্সবাদের নামে এই সমষ্টিকে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে, এর যোগ ঘটেছে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সঙ্গে। এখানেও গড়ে উঠেছে এক ব্যূহবদ্ধ স্বার্থপরতা, অহংকার, অসহিষ্ণুতা। সমষ্টির সর্বগ্রাসী দাবির চাপে ব্যক্তির স্বাধীনতা আবারও বিপন্ন। শ্রেণীসংগ্রামের নামে এক যৌথ উত্তেজনাকে স্থাপন করা হয়েছে যুক্তির উর্ধ্বে, তাকে চালনা করা হচ্ছে রাষ্ট্র কিংবা দলবিশেষের স্বার্থে। মানবেন্দ্রনাথ ক্রমে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।

মার্ক্সবাদ ত্যাগ করবার পর ইউরোপীয় সোশ্যাল ডেমক্র্যাটিক চিন্তাধারাকে যে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি তার কারণও নিহিত এইখানেই। তাঁর মনে হয়েছিল, পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি তত্ত্বগতভাবে মার্ক্সবাদের বাইরে যেতে পারেনি, শ্রেণীতত্ত্বের সীমানার মধ্যেই তাঁরাও ঘুরপাক খাচ্ছে। এই ধরনের সামষ্টিক চিন্তার সঙ্গে গণতন্ত্রকে মেলানো যাবে না। গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে জাতীয়তাবাদ এবং মার্ক্সবাদ দুয়েরই সমালোচনা চাই। সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রকেও অতিক্রম করে যেতে হবে। প্রচলিত সমাজতন্ত্র আবদ্ধ হয়ে আছে রাষ্ট্রতন্ত্র আর শ্রেণীভিত্তিক তত্ত্বের শৃঙ্খলে।

এইভাবে নিজেরই চিন্তার জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে করতে মানবেন্দ্রনাথ পথ তৈরি করেছেন। এরই ফলে তিনি সমভাবে ধিক্কৃত হয়েছেন জাতীয়তাবাদী ও মার্ক্সবাদী মহলে। জাতীয়তাবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেনি এমন তো নয়। তবু সেই আকর্ষণ তাঁকে বাঁধতে পারেনি। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি উচ্চ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তবু সেই স্বীকৃতিকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে গেছেন। প্রশংসা অথবা ধিক্কার নয়, সত্যের

সন্ধানকে তিনি প্রধান বলে জেনেছিলেন। এইখানে স্মরণীয় তাঁর জীবনের শেষ পর্বে উচ্চারিত সেই প্রত্যয় : "Quest for freedom and search for truth constitute the basic urge of human progress." স্বাধীনতা ও সত্যের সন্ধানই মানুষের অগ্রগতির মূল প্রেরণা। সেই প্রেরণাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন শুধু বাইরের ইতিহাসে নয়, নিজেরই চেতনার গভীরে।

(খ)

জাতি অথবা শ্রেণীবিশেষের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করাই যদি আমাদের উচ্চতম কর্তব্য না হয় তবে একটা প্রশ্ন নতুন করে ফিরে আসে। আমাদের আদর্শ ও আনুগত্যের সর্বশেষ ভিত্তি কোথায়? ধার্মিক তার আনুগত্য স্থাপন করে ঈশ্বরে। রায়ের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। একদিকে ব্যক্তি আর অন্যদিকে মনুষ্য প্রজাতি বা মানবতাই হতে পারে আমাদের আদর্শ ও আনুগত্যের সর্বশেষ ভিত্তি ও আধার। এখানে কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন।

ব্যক্তির মূল্য নিয়ে অলোচনা শুরু করা যাক। রায় লিখেছেন : "A political system and an economic experiment which subordinate the man of flesh and blood to an imaginary collective ego, be it the nation or a class, cannot possibly be the suitable means for the attainment of the goal of freedom. ...it is not freedom to sacrifice the individual at the altar of an imaginary collective ego. Any social philosophy or scheme of social reconstruction which does not recognise the sovereignty of the individual...can have no more than a very limited progressive and revolutionary significance." অর্থাৎ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে স্থান দিতে হবে সব রাজনীতিক ব্যবস্থা, সব আর্থিক পরিকল্পনার কেন্দ্রে। জাতিই হোক শ্রেণীই হোক, কোনো কাল্পনিক যৌথ অহং-এর কাছেই ব্যক্তিকে বিসর্জন দিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না মানুষের স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে। ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে পূর্ণ হবে বা কোনো বৈপ্লবিক আদর্শ। আমাদের অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায় মার্ক্সের সেই স্মরণীয় উক্তি যেখানে তিনি চেয়েছেন এক নতুন সমাজ, "an association in which the free development of each is the condition for the free development of all." সমগ্রের মুক্তির শর্ত বলে যেখানে স্বীকৃত প্রত্যেকের মুক্তি। স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনুরূপ কথা বলেছেন গান্ধীও তাঁর ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে : "No society can possibly be built on a denial of individual freedom." ব্যক্তির মুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে কোনো সৎ সমাজ সম্ভব নয়।

ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্যর এই-যে স্বীকৃতি একে একটি নির্ভরযোগ্য সমাজদর্শন ও বিশ্বদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। দর্শনের ক্ষেত্রে অবশ্য শেষ উত্তর পাওয়া কঠিন। তবু কিছু প্রশ্ন যদি আমাদের চেতনায় জাগে তবে সেটাই লাভ। সচেতনতাই হয়ে ওঠে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। ব্যক্তিস্বাধীনতা মূল্যবান কেন? এই সরল প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়। মনে রাখা প্রয়োজন, ব্যক্তিই চেতনার আধার। সুখ অথবা দুঃখ তো শব্দমাত্র নয়, বিমূর্ত ধারণা নয়। ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অনুভূতি নেই। যুক্তি অথবা বিবেক সম্বন্ধেও একই কথা। ব্যক্তিকে আশ্রয় করেই যুক্তি ও বিবেকের প্রকাশ ঘটে। অতএব স্বাধীনতা বলতে বুঝতে হবে ব্যক্তিচেতনায় বিধৃত

স্বাধীনতা। তা যদি না হয় তবে বহু অত্যাচারকেই কোনো কাল্পনিক সত্তার গৌরব রক্ষার্থে সমর্থনযোগ্য মনে হবে আর অত্যাচারিত মানুষ পরাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষাই হারিয়ে ফেলবে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে নানা ধরনের ব্যাখ্যা বা থিওরী আছে। এই রকমের এক থিওরীতে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের উৎপত্তি এক সামাজিক চুক্তি থেকে। এই ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তবে এর ভিতর দিয়ে একটা ভাব ফুটে উঠেছে। কথাটা এই যে, স্বাধীনভাবেই যদি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে স্বাধীনভাবে আলোচনার ভিতর দিয়ে তার পরিবর্তনও ন্যায়সঙ্গত। রাষ্ট্রই হোক অথবা অন্য যে-কোনো ব্যবস্থাই হোক, মানুষই তার স্রষ্টা, মানুষের স্বার্থকে ভিত্তি করেই তার যৌক্তিকতা। আছে বলেই সমর্থনযোগ্য নয় কোনো সামাজিক নিয়ম, সব কিছুই বিচার করে দেখা যেতে পারে। যে-নিয়মের স্রষ্টা মানুষ, তাকে পরিবর্তন করবার স্বাধীনতাও মানুষেরই আছে। এই রকম একটা দৃষ্টিভঙ্গীই মানবেন্দ্রনাথ গণতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে আবশ্যক মনে করেছিলেন।

স্বাধীন আলোচনার ভিতর দিয়ে নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান গঠন করবার কাজটা শুরু করতে হবে একেবারে তলা থেকে। তলার প্রয়োজনে ধাপে ধাপে গড়ে উঠবে ওপরের প্রতিষ্ঠানগুলি। সংবিধান ও আর্থিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এইরকম একটা ছবি মানবেন্দ্রনাথ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। যে-সমাজে আমরা বস্তুত বাস করি তার চরিত্র কিন্তু অনেক পরিমাণেই এর বিপরীত। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ওপরতলায়। সেখান থেকেই নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তলার মানুষের জন্য। অধিকাংশ মানুষকে এসবই বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। স্বাধীন আলোচনর ভিতর দিয়ে তার পরিবর্তনের পথ খোলা নেই। মানবেন্দ্রনাথ এই ব্যবস্থাটা পালটাতে চেয়েছিলেন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতান্ত্রিক সংগঠন, সমবায়ের পথ,এইসব তাঁর কাম্য ছিল। এ পথে অগ্রসর হতে সময় লাগতে পারে। তবু এটাই পথ। এটাকেই পথ বলে মানুষ যদি চিনে নিতে পারে তবে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত।

তা নইলে স্বাধীনতা বিপন্ন। পুরনো বৈপ্লবিক পথে কাজ হবে না। মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন : "Freedom does not necessarily follow from the capture of political power in the name of the oppressed and exploited classes and abolition of private property in the means of production." শোষিত নিপীড়িত জনগণের নামে কোনো দল ক্ষমতা দখল করতে পারলেই অথবা উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই স্বাধীন সমাজের লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে মানুষ, এ ধারণা নির্ভুল নয়। এর প্রমাণ ছড়িয়ে আছে এ যুগের ইতিহাসে। বিপ্লবের ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্মলাভ করেছে নতুন আমলাতন্ত্র, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে দলের হাতে, আবারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অত্যাচারের যন্ত্র, স্বাধীনতার স্বপ্ন অবাস্তব থেকে গেছে, মানবেন্দ্রনাথের জীবনকালেই এই সব তিনি দেখে গেছেন। এই সব থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আশা হারান নি।

জাতি নয় শ্রেণী নয়, স্বাধীনতার মূলাধার ব্যক্তি। সমাজকে গড়ে তুলতে হবে তলা থেকে। এগোতে হবে সমবায় ও গণতন্ত্রের পথে। এই কথাগুলি বলা হল। এবার ফিরে আসতে হবে মানবতার প্রত্যয়ে। আসলে ব্যক্তি থেকে শুরু করলে তবেই মানবতায় পৌঁছনো যায়। তা নইলে মানুষ আটকে পড়ে জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী এই সবের বন্ধনে। ব্যক্তিসত্তায় ফিরে গিয়ে তবেই আরোহণ করা যায় বিশ্বমানবের পরিচয়ে। এইরকম

মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। এই শতাব্দীর সংঘবদ্ধ হিংসার দ্বন্দ্ব থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন 'মানুষের ধর্ম'-এর প্রতি। আর মানবেন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন নবমানবতাবাদের ব্যাখ্যাতা।

মানুষের মুক্তির কিছু সাংস্কৃতিক পূর্বশর্ত আছে। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর নবমানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রূপগ্রহণের আরো অনেক আগে থেকেই। বিশের দশকে ইউরোপে বসে যখন তিনি ভারতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করছিলেন, বিপ্লবের কর্মপন্থা নিয়ে চিন্তা করছিলেন, তখনই একটা জিনিস তিনি বিশেষভাবে লক্ষ করেন। ভারতের নরমপন্থীদের সঙ্গে তো রায়ের মতামতের মিল ছিল না স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু চরমপন্থীদের ক্ষেত্রেও তিনি শংকিত হবার কিছু বড় কারণ দেখতে পান। হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে কিংবা দেশ থেকে বিদেশী শাসন উৎখাত করবার ব্যাপারে যাঁরা বৈপ্লবিক বলে চিহ্নিত তাঁরাও কিন্তু সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার বিচারে অনেকেই ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। রায় লক্ষ করলেন যে, সাংস্কৃতিক প্রশ্নে নরমপন্থীদের চেয়েও চরমপন্থীরা আরো বেশি অতীতমুখী, চিন্তার গোঁড়ামিতে আবদ্ধ। এঁদের হাতে ক্ষমতা যদি আসে তবু দেশে সাংস্কৃতিক অতএব সামাজিক মুক্তি আসবে না।

ইউরোপের পরিস্থিতিতেও একই সমস্যা অন্য রূপে দেখা দিয়েছিল। জার্মানিতে স্বৈরতন্ত্রী সামরিক ঐতিহ্য নাৎসী আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল। লেনিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতায় এসেছিল এমন এক দেশে যেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল। এসবই মানবেন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে। ক্রমে তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন যে, ক্ষমতা দখলের রাজনীতি প্রধান কথা নয়, বরং সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিপ্লবই সমাজের স্থায়ী উন্নতির মৌল শর্ত। তাঁর জীবনের শেষ ভাগে এদিকেই তিনি বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

মানবতাবাদের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন চাই স্বয়ংশাসিত বিকেন্দ্রিত ও সমবায়ী সমাজ, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন মানুষের সৃজনীশক্তিতে বিশ্বাস, যুক্তিনির্ভরতা ও নৈতিক বোধ। সেই সঙ্গে বাঞ্ছনীয় হচ্ছে রাজনীতিরও একটা রূপান্তর।

(গ)

লেনিনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের কিছুটা মতবিরোধ ঘটেছিল তৎকালীন রাজনীতির একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটা এই, বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সম্পর্ক কী হবে? এই তর্কের অনুপুঙ্খ পর্যালোচনায় আমরা প্রবেশ করব না। তবে এ বিষয়ে দু-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সাম্যবাদী শ্রমিক আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সপক্ষে অন্তত দুই ধরনের যুক্তি ছিল। প্রথম কথা, জাতীয় সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী; সেদিক থেকে এই সংগ্রাম প্রগতিশীল অতএব সমর্থনযোগ্য। দ্বিতীয় কথা, জনগণের ভিতর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। সাম্যবাদী দল এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বস্তুত জনগণ থেকেই বহু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

অন্য পক্ষেও বলবার মতো কিছু কথা ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানবেন্দ্রনাথ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর আগের

অবস্থায় নেই। বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি ক্রমশ হটে যাচ্ছে। আজ হোক কাল হোক, দেশী ধনিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শাসকের ভূমিকা থেকে বিদায় নেবে। ১৯৪৭ সালে ক্ষমতার হস্তান্তর তাই মানবেন্দ্রনাথের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল না, বরং তাঁর প্রত্যাশার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল স্বীকার করতে হয়।

ক্ষমতার হস্তান্তরের আগেই ভারতে শ্রমিক শ্রেণীকে কী করে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আর সাংগঠনিক দিক থেকে যথাসম্ভব শক্তিশালী ও আত্মনির্ভর করে তোলা যায়, এটাই ছিল মানবেন্দ্রনাথের কাছে সেই বিশের দশক থেকেই প্রধান প্রশ্ন। শ্রমিক আন্দোলন জাতীয় সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, এই রকম কোনো বিপদ তিনি বড় করে দেখেননি। বরং বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধি ও চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, বৃহত্তর সামাজিক মুক্তির সংগ্রামের জন্য সে প্রস্তুত হবে না, এটাই ছিল মানবেন্দ্রনাথের দুশ্চিন্তা। তিনি জোর দিয়েছিলেন চেতনা গঠনের ওপর। শেষ পর্যন্ত এটাই তাঁর কাছে মৌল কাজ বলে মনে হয়েছে।

লক্ষ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতা লাভের পরও ঐ পুরনো তর্ক খানিকটা নতুন আকারে এদেশের বামপন্থী আন্দোলনে অদ্যাবধি থেকেই গেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্গে কম্যুনিস্ট দলের সম্পর্ক কীরকম হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে এখনো বামপন্থীদের ভিতর মতবিরোধ আছে। এক দল মনে করে যে, কংগ্রেসের সরাসরি বিরোধিতা করাটাই উচিত কাজ, তা নইলে জনগণের মনে কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহ থেকেই যাবে। অন্য দল মনে করে, কংগ্রেসের ভিতর যারা প্রগতিশীল তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম চালাতে হবে রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে, সরাসরি কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গেলে রাজনীতির চালে ভুল হবে, জনগণের কাছ থেকে সাম্যবাদী শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। দুই দলের ভিতর মিল চোখে পড়ে এক জায়গায়। জাতিভেদ ও অন্যান্য যেসব কুসংস্কার জনগণের ভিতর ব্যাপ্ত সেই সবের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন চালাবার চেষ্টা নেই কম্যুনিস্ট কার্যক্রমে, এটাই বাস্তব রাজনীতি।

জাতীয়তাবাদী ও সাম্যবাদী দলের ভিতর সম্পর্ক নিয়ে এই-যে তর্ক, এটা প্রধানত রাজনীতির কৌশল নিয়ে তর্ক। আসলে লেনিনবাদের অনেকটাই রণনীতি ও কৌশল নিয়ে চিন্তাভাবনা। মানবেন্দ্রনাথ এককালে এই চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সম্ভবত সেটাই ছিল অনিবার্য। কিন্তু ক্রমে তাঁর মনে সন্দেহ জমে উঠল। প্রত্যেক সৎ সাম্যবাদীই যাত্রা শুরু করে একটা বড় লক্ষ্য নিয়ে, সেটা মানুষের মুক্তির লক্ষ্য। দলীয় হারজিতটাই শেষ কথা নয়। এই হারজিতের খেলার একটা উম্মাদনা আছে। সেটাই যখন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তখন সমাজের সামনে দেখা দেয় নতুন এক বিপদ। বিপন্ন হয় মানুষের মুক্তির লক্ষ্য।

দলীয় রাজনীতির প্রধান কথা ক্ষমতার জন্য লড়াই। যদিও প্রতিটি দলের ইস্তাহারে বড় বড় আদর্শ ও প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত হতে থাকে অবিরাম, তবু প্রত্যেকেরই প্রধান উদ্দেশ্য সরকারি শাসনযন্ত্রের ওপর কর্তৃত্ব। আমাদের যুগে একদিকে যেমন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষমতা দখলের লড়াই নানাবিধ দুর্নীতির সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করবার কথা বলা হয়েছে, তার সপক্ষে জোরালো যুক্তিও আছে। কিন্তু সমস্যা এই যে, রাজনীতি থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিদায় নেয়নি, বিদায় নিয়েছে নীতিবুদ্ধি বা নৈতিকতা। এই নিয়ে নতুন করে চিন্তা করবার সময় এসেছে। কিছু মৌল চিন্তা ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে। বিকেন্দ্রিত সমাজ ও মানুষের

মুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রাজনীতিরও পুনর্গঠন আবশ্যক।

মানবেন্দ্রনাথ শেষ জীবনে দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন নির্দলীয় গণতন্ত্রে। লক্ষ করতে হবে যে, বহুদলীয় গণতন্ত্রের বদলে যাঁরা একদলীয় ব্যবস্থা চান তিনি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। নির্দলীয়তাকেই তিনি বিকল্প হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। অনেকের মনে হয়েছে, এটা অবাস্তব চিন্তা। পথ কোথায়? গান্ধীজীও শেষজীবনে এইরকমই একটা বিকল্পের কথা ভেবেছিলেন। বিষয়টা বিচার করে দেখা দরকার।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণের উল্লেখ করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে, সেটা ঘটে নানাভাবে। দলীয় সংগঠন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অন্যতম উপায়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়তার কথা বলা হয় বটে, তবে গণতন্ত্র দুর্বল আর কেন্দ্রীয়তা প্রবল এই ঝোঁকটাই প্রধান। দল যদি হয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের যন্ত্র তবে সেই লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে অতিকেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁকটাই বার বার দেখা গেছে, অন্য কিছু আশা করা অবাস্তব। একই সঙ্গে বেড়ে ওঠে আরো এক বিপদ। ক্ষমতার লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে ঘটে নৈতিকতার অবক্ষয়। দল হয়ে ওঠে দুর্নীতির বাহন। প্রতিটি দলই বিপক্ষের দুর্নীতিগ্রস্ততাকে ধিক্কার দেয়, আর তারই অনুকরণ করে চলে। দলীয় রাজনীতির বাস্তব অবস্থা, দুর্নীতিপরায়ণতা। দলাদলির আতিশয্যে ঘটে যুক্তির বিকাশ নয়, বরং যুক্তির বিকার।

এইসব স্বীকার করে নিয়েও অনেকে মনে করেন, দলীয় ব্যবস্থা অনিবার্য, এমন কি স্বাভাবিক। মার্ক্সবাদীরা বলেন, সমাজ যেহেতু শ্রেণীবিভক্ত অতএব তারই প্রতিফলন হিসেবে বহুদলীয় ব্যবস্থাই স্বাভাবিক। শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিফলিত হয় দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।

এ বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তার একটা মূল সিদ্ধান্ত আমরা আগেই আলোচনা করেছি। শ্রেণীর যে ব্যূহবদ্ধ সংগ্রামী চেহারা মার্ক্সবাদী ধারণায় প্রগতির সহায়ক, আসলে তার সঙ্গে বেশি দূর পর্যন্ত গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য নেই। মানবেন্দ্রনাথ ফিরে গিয়েছিলেন ব্যক্তির মৌলতায়।

যে-কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই মতামতের পার্থক্যের স্থান থাকবে, নয় তো সেটা গণতন্ত্রই নয়। কিন্তু মতের বৈচিত্র্য এক জিনিস আর দলীয়তা অন্য জিনিস। বন্ধুসমিতিতেও মতের পার্থক্য থাকে। কিন্তু তাতে দলীয়তা দেখা দেয় না। কোনো একটি প্রশ্নে সভ্যগণ একভাবে বিভক্ত, অন্য এক প্রশ্নে অন্যভাবে বিভক্ত। এটাই স্বাভাবিক। এক শ্রেণীভুক্ত সব মানুষই একই মতাবলম্বী হবে এটা স্বাভাবিক নয়। আয়কর সম্পর্কিত কোনো প্রশ্নে যারা একমত তারাই যে আবার বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত অন্য এক প্রস্তাবেও একমত হবে এমন কি কোনো স্থিরতা আছে? সম্পত্তির উচ্চতম সীমা নিয়ে যাদের ভিতর মতের মিল অছে তাদের ভিতরও ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নে, যেমন আস্তিক্য আর নাস্তিক্যের আলোচনায়, মতের পার্থক্য ঘটতেই পারে। সংসদে শাসক দলের ভিতর যে মতামতের ঐক্য দেখা যায় সেটা অনেক সময় স্বাধীন বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বরং জোর করে চাপানো। দলের স্বার্থে এটা প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু এটাই যে গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যক এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। বিকল্প গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা মানবেন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন।

এই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে থাকবে লোকসমিতি বা গণসমিতি। নির্দলীয় গণতন্ত্রের

আবশ্যিক শর্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ছোটো পরিধির পল্লী ও মণ্ডলের ভিত্তিতে গঠিত হবে তলাকার লোকসমিতি। ঐসব নির্দলীয় সমিতির সঙ্গে জনগণের নানা ধরনের ঘনিষ্ঠ যোগরক্ষার ব্যবস্থা করাও কঠিন হবে না। ধাপে ধাপে সংগঠিত হবে শাসনব্যবস্থার ওপরের স্তরগুলি। গণতান্ত্রিক আলোচনার স্থান থাকবে সর্বস্তরে। অনুমান করা যায় যে, বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে সাময়িকভাবে গঠিত হবে নানা গোষ্ঠী। কিন্তু ক্ষমতা নিয়ে যেন-তেন-প্রকারে দলবদ্ধ লড়াইয়ের কোনো সদর্থ থাকবে না এই সংগঠিত গণতন্ত্রে। জোর পড়বে শিক্ষার ওপর। এর সঙ্গে যোগ রেখে গড়তে হবে নতুন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা। মানবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সামবায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য। শিক্ষিত জনমত ও সংগঠিত গণতন্ত্রই সমাজ ও অর্থনীতিকে সমবায়ী ব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

বিশেষ ও তিরিশের দশকে এমন কি চল্লিশের গোড়াতেও মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন গান্ধীর কঠোর সমালোচক। শেষজীবনে গান্ধীর প্রতি তাঁর বিরূপতা ক্রমে ক্ষয় হয়ে আসে। এটা আকস্মিক নয়। রাজনীতি ও অর্থনীতির যে-পরিকল্পনা মানবেন্দ্রনাথ তুলে ধরেন তার সঙ্গে গান্ধীর অনেকটাই মিল ছিল। দু'জনেই সমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তলা থেকে। রাজনীতিতে নৈতিকতার আবশ্যক আছে, এই গভীর প্রত্যয়েও দু'জনের ভিতর শেষ বয়সে একটা সেতু তৈরি হচ্ছিল। তবে একই সঙ্গে কিছু অমিলও থেকে গেছে।

(ঘ)

মানুষ নীতি মেনে চলবে কেন? নৈতিকতার ভিত্তি কোথায়? মানবেন্দ্রনাথের মনে নৈতিকতার ভিত্তি যুক্তিতে। প্রাচীনপন্থীদের মতে নৈতিকতার ভিত্তি ধর্মে বা ঈশ্বরবিশ্বাসে। কতটা গুরুতর এই পার্থক্য?

এমন অনেকে আছে যারা বলে, জ্ঞানী মানুষ হয়তো যুক্তির আলোতেই সদাচারের মূল নীতিগুলি বুঝতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তেমন পারে না। সাধারণের জন্য ধর্ম বা ঈশ্বরবিশ্বাস চাই, তা নইলে নীতি রক্ষা পাবে না। মানবেন্দ্রনাথের কাছে এই যুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। তিনি এখানেই দেখবেন বিপদের আরম্ভ। কী সেই বিপদ?

বিপদটা শুরু হয় ব্রাহ্মণতন্ত্র বা পুরোহিততন্ত্র থেকে। তারপর আরো গভীরভাবে সংক্রামিত হয় সমাজে ও সংস্কৃতিতে। নীতির ভিত্তি যদি নিহিত থাকে এমন কোথাও যেখানে পৌঁছতে পারবে না সাধারণ মানুষ, ভালোমন্দের বিচারে যদি ব্রাহ্মণ বা ধর্মযাজকের অধিকার বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হয়, তবে তো জনসাধারণের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় তাদের আত্মবিশ্বাস। আর সেই সঙ্গে তৈরি হয়ে যায় সমাজের ওপর এক বিশেষ গোষ্ঠীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের শাস্ত্রীয় অনুমোদন। যাজকশ্রেণী এই শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না এমন কথা বিশ্বাস করবার কি কোনো কারণ আছে? ইতিহাসের সাক্ষ্য কি এই নয় যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে পুরোহিততন্ত্র, আর নিঃশব্দে দণ্ডভোগ করেছে সাধারণ মানুষ? মানুষ স্বার্থপর হয়, এতে আশ্চর্য কিছু নেই। পুরোহিতশ্রেণী স্বার্থপর হবে না এইরকম আশা করাই ভুল। এক্ষেত্রে বিপদ আরো বড়। শাসন ও শোষণ যখন শাস্ত্রের অনুমোদন নিয়ে চলে তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা আরো কঠিন হয়। নীতিবিচারের অধিকার থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করবার এই ফল। যুক্তিতে অধিকার আছে সব মানুষের। যুক্তিই মানুষের সাধারণ ধর্ম।

মানবেন্দ্রনাথ নৈতিকতার বিচারে যুক্তি ছাড়া আর কিছুই মেনে নিতে রাজী নন।

যারা ধর্মে বিশ্বাসী তারা যুক্তিতে বিশ্বাস রাখে না, একথা সব সময় ঠিক নয়। এটা অতিসরলীকরণ। যেমন ধরা যাক রামমোহন রায়ের কথা। তিনি নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্ম এবং যুক্তি দুয়েতেই তিনি বিশ্বাস রক্ষা করেছিলেন। অথবা ধরা যাক গান্ধীর কথা। তিনি ধর্ম ত্যাগ করেননি। যুক্তিকেও কিন্তু তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তায় একটা বিশেষ স্থান দিয়েছিলেন। একথাটা আমরা অনেক সময় মনে রাখি না, কাজেই একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক। গান্ধী বলেছেন : "My belief in the Hindu Scriptures does not require me to accept every word and every verse as divinely inspired. ...I decline to be bound by any interpretation, however learned it may be, if it is repugnant to reason or moral sense." অর্থাৎ, হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রতি যদিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল তবু তিনি ধরে নিতে রাজী নন যে শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য অভ্রান্ত। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে, শাস্ত্রের কোনো নির্দেশ যদি যুক্তিবিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ হয় তবে সেই নির্দেশ তিনি মেনে নিতে রাজী নন।

মানবেন্দ্রনাথ জড়বাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। রামমোহন বা গান্ধীর মতো তিনি একই সঙ্গে ধর্ম ও যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজী নন। তর্কের ধারাটা এখানে লক্ষ করা দরকার। গান্ধী শাস্ত্রের নির্দেশ অগ্রাহ্য করবেন যদি সেটা যুক্তিবিরোধী হয়। তাই যদি হয় তবে শাস্ত্রের প্রয়োজন কোথায়? যুক্তির উপর নির্ভর করাই কি যথেষ্ট নয়। রামমোহন অথবা গান্ধীর কাছে কিন্তু এই উত্তরটাও শেষ কথা নয়। কেন নয়? শাস্ত্রে যা-কিছু আছে সবই একই স্তরের কথা নয়। রামমোহনের কাছে উপনিষদের কিছু কথা বিশেষ শ্রদ্ধেয়, আবার কিছু কথা তেমন নয়। শাস্ত্রে একদিকে আছে বহু শতাব্দীর মহত্তম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, যাকে প্রকাশ করা হয়েছে কালোত্তীর্ণ ভাষায়। তাকে উপেক্ষা করা ভুল। আবার অন্য দিকে আছে যুগবিশেষের কুসংস্কার এবং সংকীর্ণ স্বার্থে চিহ্নিত কিছু মতামত। তাকে মেনে নেওয়া ভুল।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সপক্ষে রামমোহন তুলে ধরেছিলেন শাস্ত্রেরই এক বিখ্যাত বচন : "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য না কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। / যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥" কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করে সিদ্ধান্তে আসা কর্তব্য নয়। বিচার যুক্তিহীন হলে ধর্মহানি ঘটে। কিন্তু একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শাস্ত্রের যেটা শ্রেষ্ঠ ভাগ তার প্রতি অশ্রদ্ধা নিয়ে যুক্তির উপর নির্ভর করতে গেলে তাতেও বিপথে যাবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

যুক্তিবর্জিত ধর্ম যে বিপজ্জনক একথা স্বীকার করা গেল। রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত হবেন না। কিন্তু ধর্মবর্জিত যুক্তি, আধ্যাত্মিক অনুভব থেকে বিচ্ছিন্ন যুক্তি, নিরাপদ নয়, একথাটা কি মেনে নেওয়া যায়? মানবতাবাদের সঙ্গে এই প্রত্যয়ের কি মৌল বিরোধ আছে? তর্কটা অবশেষে এইখানে এসে ঠেকে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বার্থের সম্পর্কের ভিতর একটা দ্বৈত আছে। অন্যকে না হলে আমার চলে না, আবার অন্যে আমার প্রতিযোগী। অতএব মানুষে-মানুষে যে-সম্পর্ক তাতে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা একই সঙ্গে বর্তমান। সুনীতির নিয়মগুলি তৈরি হয় সহযোগিতার প্রত্যয়ের ওপর। যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় যে, সহযোগিতার কিছু নিয়ম আছে যাতে সমাজের সামগ্রিক হিতসাধন হয়। এইরকম একটি নিয়ম, সত্যবাদিতা। আবার যুক্তি দিয়ে একথাও বোঝা যায় যে, এই সব নিয়ম ভেঙে, অন্যের স্বার্থের হানি ঘটিয়ে, ব্যক্তিবিশেষ নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে নিতে পারে। এটাকেই আমরা দুর্নীতি বলি।

যেমন, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কেউ নিজের স্বার্থ গুছিয়ে নিতে পারে। সেই প্রতারণা যদি ধরা না পড়ে তবে সাংসারিক অর্থে প্রতারক শাস্তিলাভ করে না। অন্যের ক্ষতিকে যদি কেউ নিজেরই ক্ষতি বলে মনে করে তবে সে প্রতারণার পথ থেকে নিবৃত্ত হবে। এখন প্রশ্ন এই, অন্যের ক্ষতিতে নিজেরই ক্ষতি এ-কথাটা কি শুধু যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়? পারস্পরিক প্রতারণার পথে অগ্রসর হলে অবশেষে সমগ্র সমাজেরই ক্ষতি অনিবার্য, এই কথাটা অবশ্য যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের কাছে তার এই মুহূর্তের লাভ বড় মনে হতে পরে। জাতির সঙ্গে জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যায়। এক জাতিকে লুণ্ঠন করে অন্য জাতি ধনবান হয়। মানবজাতির সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে এটা সমর্থনযোগ্য না হতে পারে। কিন্তু জাতিবিশেষের লাভটাই যদি সেই জাতির কাছে বিবেচনার যোগ্য মনে হয় তবে যুক্তি দিয়ে কি অন্য কিছু বোঝানো যাবে? প্রশ্ন ওঠে।

এসব নিশ্চয়ই যুক্তিকে বর্জন করবার যুক্তি নয়। বরং এইরকম প্রশ্নের ভিতর দিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারি যুক্তির কার্যকারিতার কোনো বিশেষ সীমা আছে কি না। স্বীকার করা প্রয়োজন যে, যুক্তির ভিতরই একটা সর্বজনীন ভাব আছে, সাধারণীকরণের দিকে অনিবার্য ঝোঁক আছে। এক ব্যক্তির সুখ মূল্যবান আর অপর ব্যক্তির সুখ মূল্যবান নয়, এমন কথা শুদ্ধ যুক্তি মানতে চাইবে না। কিন্তু শুদ্ধ যুক্তির এই সর্বমানবিক পরামর্শকে কার্যকরী করতে হলেও কি যুক্তির অধিক আরো কিছু প্রয়োজন হয়ে পড়ে না?

যুক্তির অতিরিক্ত একটি বস্তু অবশ্য প্রকৃতিই মানুষের ভিতর স্থাপন করেছে, তাকে আমরা বলি সহানুভূতি অথবা ভালোবাসা। কিন্তু প্রকৃতির সহজ দান হিসেবে মানুষ যে সহানুভূতি অথবা প্রেমের শক্তি লাভ করে তারও তো সীমা আছে। কত সহজে সেই সহানুভূতি কুঁকড়ে যায়। ভয়ে লোভে কুসংস্কারে পঙ্গু হয়ে পড়ে। তবু আশা রক্ষা করতে হয়। বিশ্বাস রাখতে হয় যে, যুক্তি ও সহানুভূতি পরস্পর হাত ধরাধরি করে মানুষকে সীমাভাঙার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মানবতার দিকে এই রকমই একটা অগ্রগতি নিশ্চয়ই রামমোহন ও মানবেন্দ্রনাথ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, সকলেই নিজ নিজ ভাবে চেয়েছিলেন। সত্যকে এঁরা সবাই ঠিক একই চোখে দেখেননি, একই নামে ডাকেননি। আর এটাই তো স্বাভাবিক। মানুষের ভিতর যে-শক্তি তাকে মুক্তির পথে, বিশ্বমানবতার অভিমুখে নিয়ে যায় তাকে কী নামে ডাকা যায়? সে কি প্রেম? সে কি যুক্তি? সে কি এমনই এক শক্তি নয় যাতে যুক্তি ভালোবাসা সবই মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়? মানবেন্দ্রনাথ তাকে যুক্তি বলেছেন, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বলেছেন। তিনিও তো মাঝে মাঝেই এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যার পর আর তর্ক চলে না। দূরদৃষ্টিতে দেখেছেন তাঁর আদর্শ পূর্ণতা লাভ করবে, "by the collective endeavour of spiritually emancipated moral men."

তিনি বলেছেন, আত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ এই সব মানুষেরা যুক্ত হবে এক মুক্ত পৃথিবী গড়বার প্রতিজ্ঞায়। এর পর তর্ক বৃথা। লক্ষ্য ঠিক থাকলেই হল।

এক জীবনে মানবেন্দ্রনাথ বহু পথে ঘুরেছিলেন। তবু লক্ষ্য ঠিক ছিল। স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কৈশোরে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। তারপর সারাজীবন পথ চলেছিলেন, তাঁরাই ভাষায়, "a tormented soul in search of freedom," মুক্তির সন্ধানে এক বেদনার্ত আত্মা।

বিনয় কুমার সরকার : দ্বন্দ্ব ও "শক্তিযোগ"

কোনো আন্দোলনের প্রভাবে ক'জন স্মরণীয় মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সেটা যদি তার ঐতিহাসিক মূল্য বিচারে বিবেচ্য হয় তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালের আন্দোলনের মতো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙালির মনে ঐ সালটিতে যে মন্থন সৃষ্টি হয়েছিল তার ভিতর থেকে উঠে এসেছিলেন অরবিন্দ ও মানবেন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ মানুষ। বিনয় সরকারও ঐ সালটিকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে একটি পরম মুহূর্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই অর্থে তাঁকে ১৯০৫-এর যুগসন্তান বলা চলে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও বিনয়কুমার সরকার উভয়ের জন্ম ১৮৮৭ সালে। অর্থাৎ দু'জনেরই জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে অতিসম্প্রতি। মানবেন্দ্রনাথ বিষয়ে অন্যত্র লিখেছি। এখানে প্রসঙ্গ বিনয়কুমার।

বিনয় সরকারের বিদ্যার পরিধি ছিল অসামান্য। তাঁর তুল্য পণ্ডিতব্যক্তি সহসা চোখে পড়ে না। এদেশে যাঁরা পাঠ্যপুস্তক ও নোটবই লিখে হাত পাকিয়েছেন অথবা ধার করা মতবাদের ব্যাখ্যা ও ভাষা রচনায় অভ্যস্ত হয়েছেন, বিনয় সরকারের চিন্তার প্রচণ্ড উচ্ছলতা তাঁদের কাছে অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়েছে। তাঁর ভাষা আমাদের সাধু লেখকদের আদব কায়দা মেনে চলত না, তাঁর চিন্তাও গতানুগতিকতার বাধ্য নয়। অতএব এদেশীয় সমাজে বিনয় সরকার বিদ্বান হয়েও সর্বত্র পূজিত ছিলেন না।

বিদেশের পণ্ডিত সমাজে কিন্তু তিনি আশ্চর্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। The Sociology of Races, Cultures and Human Progress নামে তাঁর গ্রন্থটি আলোচনা করতে গিয়ে জর্মান সমালোচক লিখেছেন : 'Professor Sarkar reminds us in many ways of our Oswald Spengler on account of startlingly manysided erudition and flexibility with which his scholarship traverses in a powerful manner all the regions and epochs of human culture.' ঐ সময়ে জর্মানিতে স্পেঙ্গলারের খ্যাতি ছিল অসামান্য। এই দুই পণ্ডিতের তুলনার ভিতর দিয়ে বিনয় সরকারের প্রতি জর্মান সমালোচকের বিপুল শ্রদ্ধাই যে প্রকাশ পেয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আবার The Positive Background of Hindu Sociology নামে পুস্তকটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ফরাসী সমালোচক বলেছেন : 'Dr. Benoy Kumar Sarkar, well-known in all the countries of Europe as one of the best representatives of modern Indian thought in the fields of sociology and education, is veritably an encyclopaedic spirit.' এখানেও মনে রাখতে হবে যে, ফরাসী চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের ইতিহাসে 'encyclopaedia' শব্দটি একটি বিশেষ অনুরণন সৃষ্টি করে। বস্তুত ইউরোপ ও

আমেরিকায় বিনয় সরকার পণ্ডিত হিসেবে যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এ দেশে তার তুলনা সহজে পাওয়া যাবে না। একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় তিনি স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা করতে পারতেন। আর তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রটি অনায়াসে প্রসারিত ছিল বিশ্বময়।

এ আমার সৌভাগ্য যে আমি একদা সরকার মহাশয়ের ছাত্র ছিলাম এবং তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যখন আমি পড়াতে শুরু করি তখনও সাময়িকভাবে তিনিই বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি বিদেশে যাত্রা করেন। সেখানেই অল্পকালের ভিতর ১৯৪৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এইভাবে জীবনের শেষ পর্যায়ে কয়েক বছর তাঁকে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনার আগে ব্যক্তি মানুষটির একটু পরিচয় দিয়ে নেব।

ছাত্র হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার কথাই প্রথমে বলব। অধ্যাপক সরকার আমাদের এমন একটি বস্তু শেখাতে চেষ্টা করে গেছেন এদেশে যার একান্ত অভাব। তাঁর পড়ানোর ধরনটাই ছিল অন্যরকম। তিনি অল্প কথা নিপুণভাবে গুছিয়ে বলতে পারতেন না, অথবা সে চেষ্টাই করতেন না। ক্লাসে যা তিনি বলতেন তা যথাযথ টুকে নিলে ভালো 'নোট' তৈরি হত না। আমাদের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেওয়াটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। চিন্তার ক্ষেত্রেও যে সাহস বলে একটা বস্তু আছে, সাহসী হওয়া যে প্রয়োজন, একথাটা এমনভাবে অন্য কোনো অধ্যাপকের কাছে পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। তাঁর মতামতের সমালোচনা করতেই তিনি আমাদের উৎসাহিত করতেন, সেই সমালোচনা দুর্বল হলে তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন আমরা যেন খুব জোরের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে বলি।

১৯৪৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়াতে শুরু করি। তখন বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বিনয় সরকারের আচরণ উল্লেখযোগ্য। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন দেখি অধ্যাপক সরকার আমার ক্লাসে শেষ বেঞ্চিতে বসে আছেন। পুরো ঘণ্টাটাই তিনি ক্লাসে ছিলেন। আমার পড়ানো নিয়ে পরে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও অধ্যাপক সরকার তরুণদের সঙ্গে এমন একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন যেটা সব দেশেই দুর্লভ, বিশেষত এদেশে।

অধ্যাপক সরকারের ভাবনাচিন্তা নিয়ে এবার সংক্ষেপে দু'এক কথা বলা যেতে পারে। Weltanschauung শব্দটি তিনি খুব ব্যবহার করতেন। তাঁর বিশ্বদৃষ্টি একাধিক গ্রন্থে বহু পৃষ্ঠা জুড়ে বিবৃত হয়েছে। The Sociology of Races, Culturs and Human Progress গ্রন্থটির কথা আগেই বলেছি। বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির ভিতর দ্বন্দ্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : 'Eur-America had been challenging Asia for about a century. It was not possible for Asia to accept that challenge for a long time. It is only so late as 1905 in the event at Port Arthur that Eur-America has learned how at last Asia intends to retaliate. Naturally the challenge is twofold: political and cultural. ...The reply from Asia is accordingly being offered in two fields of revolt: military and scientific.' এশিয়ার পুনরভ্যুত্থানকেই বিনয় সরকার তাঁর বিশ্বদর্শনে রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন মূলত শক্তির উপাসক। তাঁর মতে মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি হল আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে মানুষ পুরনো ঐতিহ্য

ভাঙে, নতুন সংস্কৃতি স্থাপন করে। ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এক জাতির ভাষা ও ভাবনা অন্য জাতির ভাষা ও ভাবনার ভিতর প্রবেশ করে, সংস্কৃতির ঘটে রূপান্তর। এই প্রক্রিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছে। এর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যেমন ভারতে তেমনি সারা বিশ্বে। বিশুদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতীয় সংস্কৃতির কল্পনা অবান্তর। একদিকে দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার সংগ্রাম, অন্য দিকে পারস্পরিক দান-প্রতিদান, দুই-ই সত্য।

বিনয় সরকার দেশবাসীর সামনে এই কথাটা জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন, আমাদের শক্তিশালী হতে হবে আর শক্তিশালী হবার জন্যই অন্যের কাছ থেকে যা-কিছু প্রয়োজন গ্রহণ করতে হবে। পৃথিবীকে বুঝতে হবে, জাগতিক পরিস্থিতিকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতর পার্থক্য টেনে যাঁরা বলেন যে, ভারতবাসী আত্মায় বিশ্বাসী আর পশ্চিমের মানুষ জড়বাদী অথবা ভোগবাদে বিশ্বাসী, বিনয় সরকার তাঁদের সেই ধারণা ভ্রান্ত বলে অগ্রাহ্য করেছেন। এইখানেই ভারতীয় ঐতিহ্যের বহু প্রবক্তার সঙ্গে তাঁর প্রভেদ। তিনি বলতেন, সব দেশের মানুষই দেহ ও আত্মা দুয়েতেই বিশ্বাসী। ঐহিক চিন্তা প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির একটা প্রধান অংশ ছিল, একথা তিনি বারবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। এদেশের প্রাচীন ইতিহাসে বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা ও সামরিক অভিযানের ভিতর প্রাণশক্তির উল্লেখযোগ্য প্রকাশকে তিনি অভিনন্দন জানাতে ইতস্তত করেননি। অত্যন্ত জাগতিক অর্থেই "চরৈবেতি" কথাটি তাঁর প্রিয় ছিল।

বিনয় সরকারের দর্শনে রাজসিকতার প্রাধান্য লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন : "Two master passions have made man here there and everywhere both in the East and the West. These are, first, love, and second war, or first, war and second love." এই জীবনদর্শন অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে, এর অপব্যাখ্যা নিশ্চয়ই সম্ভব। তবু এই তামসিকতার দেশে একজন রাজসিক পণ্ডিতের প্রয়োজন ছিল।

(খ)

বিনয় কুমার সরকারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর ভাবনাচিন্তা নিয়ে নতুন করে কিছুটা আলোচনা ও বিতণ্ডা শুরু হয়েছে। নিজের মতামত তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলতে ভালোবাসতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবৎকালে কিছু তর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পুরনো সমালোচনা আজ আবারও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

বিনয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ, তিনি নাকি মতামতের ক্ষেত্রে ফাসিস্তপন্থী ছিলেন। অভিযোগটি অন্যায়। যারা ফাসিস্ত তারা পর মত সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়। ভিন্ন মত সম্বন্ধে যারা অসহিষ্ণু নয় তাদের ফাসিস্ত বলে চিহ্নিত করবার অর্থ হয় না। বিনয় সরকার নিজের মতামত জোরের সঙ্গে বলতেন, কিন্তু ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন বিপরীত মতটাও প্রবলভাবে বলতে। তিনি ছিলেন চিন্তার ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী। এর পর তাঁকে ফাসিস্ত বলা যায় কী করে ? অধ্যাপক সরকার ছাত্রদের ভিতর মতবাদের ঐক্য চাইতেন না, যুক্তিতর্কের ভিতর দিয়ে নিজ নিজ মত বলবার সাহসটাই ছিল তাঁর কাছে মূল্যবান। দ্বন্দ্বেরর ভিতর দিয়ে প্রগতি ঘটে ; সকলক্ষেত্রেই, মতবাদের ক্ষেত্রেও, এইরকম তিনি বিশ্বাস করতেন। যাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ কর্তব্যে নিযুক্ত তাঁরা এই গুণটি অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের কাছ থেকে শিখে নিতে পারলে ভালো হয়।

ঐ অভিযোগ তবে বিনয় সরকারের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছিল কেন? শেষ পর্যন্ত অভিযোগটা দাঁড়ায় না, তবু তার কিছু কারণ অবশ্য ছিল। বিনয় সরকার ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সন্তান। দেশবিদেশে তিনি অনেক ঘুরেছেন, সারা বিশ্বের জ্ঞানে ছিল তাঁর আগ্রহ। কিন্তু জাতীয়তাবাদ তিনি ত্যাগ করেননি। এইখানে সমবয়স্ক মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তফাত। বিনয় কুমার ছিলেন এক বিশ্বমুখী জাতীয়তাবাদী। "স্বদেশসেবকের পক্ষে চাই বিশ্বদক্ষতা", এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সেই সঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। তাঁর চিন্তাভাবনায় শক্তিযোগের একটা বড় স্থান ছিল। সে যুগে যারা ফাসিস্ত বলে পরিচিত হয়েছিল তাদের ভিতরও পাওয়া যায় জাতীয়তাবাদ ও কোনো-একটা-অর্থে শক্তি অথবা সংঘবদ্ধ ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ। শুধু ইয়োরোপে নয়, তৎকালীন এশিয়াতেও ঐ যোগাযোগটা চোখে পড়ে, বিশেষভাবে উঠতি শক্তি জাপানের মধ্যে। বিনয় সরকার জাপানকে বাহবা দিয়েছেন। এইরকম কিছু কারণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বিপজ্জনক মনে হয়েছে।

আসলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কোনো প্রচলিত মতবাদের সঙ্গেই পুরোপুরি মেলে না। ফাসিস্তপন্থীরা ছিল জাতীয় শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী, নিজ জাতির শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অহংকৃত। এ ব্যাপারে বিনয় সরকারের ঝোঁকটা লক্ষ করবার যোগ্য। স্বদেশে তিনি ছিলেন সবচেয়ে হীনজাতি বা 'পারিয়া'র বন্ধু ও গুণগ্রাহী। যারা অশিক্ষিত, সমাজের নীচুতলায় যাদের বাস, তাদের ভিতরও যে মনুষ্যত্বের অভাব নেই, তারাও যে নীতির দিক থেকে মানুষের মর্যাদার অধিকারী, এই কথাটা তিনি বারবার নানাভাবে বলেছেন। আর ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য তিনি চেয়েছেন বিশ্বের দরবারে সাম্যের অধিকার—শ্রেষ্ঠত্ব নয়, সাম্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বিনয় সরকারের বেশ বড় রকমের অমিল ছিল। সে সময়ে এইরকম একটা ধারণা ক্রমে জোরালো হয়ে উঠেছিল যে, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে দেখা যায় অধ্যাত্মবাদী ও সংসারবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য, আর পাশ্চাত্য সমাজ ও সংস্কৃতি ভোগবাদী, সংসারনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ। ম্যাক্স ম্যুলার থেকে অ্যানি বেসান্ট ও ভগিনী নিবেদিতা পর্যন্ত অনেকেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে বৈপরীত্যের এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, এ দেশীয় অনেক পণ্ডিতেরও এতে বিশ্বাস ছিল। বিনয় কুমার তরুণ বয়সে যদি-বা এই তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তবু সেই আকর্ষণ টেকেনি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে ১৯১১ সালের পর গবেষণার ফলে স্বদেশের অন্য এক ভাবমূর্তি তাঁর সামনে আকার গ্রহণ করে। "ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী, ততখানি সাম্রাজ্যবাদী—যতখানি ইওরোপ। আবার ইওরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মবাদী—যতখানি ভারতবর্ষ।" খুব জোরের সঙ্গে এই কথাটা বলে তিনি প্রচলিত ধারণাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন।

এখানেও আবার বিনয় সরকারের মতবাদের কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে, বিনয় কুমার প্রথমে ছিলেন ভাববাদী, পরে বস্তুবাদী হয়ে ওঠেন। ঐভাবে দেখলে কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সুবিচার করা হয় না।

তরুণ বয়সে বিনয় সরকারের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাব পড়েছিল। সেই প্রভাব একেবারে ক্ষয় হয়ে যায়নি কখনো। জাতীয়তাবাদ ত্যাগ না করে একরকমের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে তিনি বিবেকানন্দকে মেলাতে চেয়েছিলেন, অধ্যাপক সরকারের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এইখানে। বিবেকানন্দের চিন্তা ও চারিত্রের ভিতর যে-জিনিসটা বিনয় কুমার মূলবস্তু বলে গ্রহণ করেছিলেন সেটা এই অবসরে একবার দেখে নেওয়া যাক। "The

key to Vivekananda's entire life...is to be found in his sakti-yoga, energism, the vigour and strength of freedom.'' এই যে "শক্তিযোগ", অধীনতা ত্যাগ করে স্বাধীন হবার চেষ্টা, বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, এটাকে বিনয় সরকার চিনে নিয়েছিলেন মানবপ্রকৃতির এক মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে। শুধু প্রাচ্যের মানুষ বা পাশ্চাত্যের মানুষ নয়, সব মানুষেরই এই বৈশিষ্ট্য। এই শক্তির সাধনা জীবনের কোনো একটা প্রকোষ্ঠে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্র সেটা ছড়িয়ে পড়তে চায়। আর শক্তির সাধনাই হল বিনয় সরকারী দৃষ্টিতে মানুষের অধ্যাত্মসাধনা। মানুষ যখন সংসারে নিযুক্ত, অর্থ যেখানে তার কাম্য, তখনও যদি সে ভয়ের জড়ত্ব ত্যাগ করে, বীরের মতো সংগ্রাম করে, তবে সেটা তার আধ্যাত্মিকতারই প্রকাশ।

বিনয় সরকার তাই বলছেন, "মানুষকে জীবনের ক্ষেত্রে বাড়াইয়া তুলিতে যে পারে সেই বড় লোক, মহাপুরুষ, পরমহংস।'' আবার বলছেন, "আমার বিবেচনায় মানুষের সবকিছুই আধ্যাত্মিক।...ধনবিজ্ঞান আমার মেজাজে আধ্যাত্মিক বিদ্যা।" মানুষ যে-পরিমাণে জড়জগতের অধীন সে পরিমাণেই মানবিক পরিস্থিতির জড়বাদী ব্যাখ্যা যথার্থ প্রযোজ্য ; কিন্তু যে পরিমাণে সে সচেতনভাবে জড়জগতের ওপর নিজের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী সেই পরিমাণে মানুষ উদ্যোগী বলেই আধ্যাত্মিকও বটে। বিনয় সরকারের মতবাদ আমরা গ্রহণ করি বা না করি, সেটাকে এক কথায় ভাববাদী, বা জড়বাদী কখনই বলা যাবে না।

বিনয় কুমার বুঝেছিলেন যে, প্রাচ্যের মানুষকে আধ্যাত্মিক কিন্তু সংসারবিমুখ বলার ভিতর একটা বিপদ আছে। এতে করে সংসারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের আধিপত্যই স্বাভাবিক, এমন কি ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিতে হয়। বিনয় সরকার দেখাতে চেয়েছিলেন যে, প্রাচ্যের তৎকালীন অধীন অবস্থা একটা সামাজিক ঘটনা, এর কারণ খুঁজতে হবে পরিবর্তনশীল বিশ্বপরিস্থিতির ভিতর, প্রাচ্যের কোনো চিরস্থায়ী সংসারবিমুখতার ভিতর নয়। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ভারতের সেই ভাবমূর্তি যেটা সংসারের দ্বন্দ্বে দেশকে দেবে এগিয়ে যাবার শক্তি ও প্রেরণা।

অন্যান্য বহু মতবাদের মতোই বিনয় কুমার সরকারের ধ্যানধারণা গঠিত হয়েছে কিছু সাময়িক লক্ষ্যের প্রভাবে, প্রয়োজনের চাপে। যে-দেশে মানুষ সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়েছে সেখানে চাই সংসারমুখী আধ্যাত্মিকতা। এটাই জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অতএব স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমগ্র বিশ্বের সংকটটা আজ কিন্তু পৌঁছে গেছে অন্য এক স্তরে। ভোগবাদ আর যুদ্ধনিষ্ঠা দিয়ে তাকে ঠেকানো যাবে না। আধ্যাত্মিকতারও অন্য স্তর আছে। এসব কিছু বিনয় সরকারের চিন্তায় অস্বীকৃত নয়। কিন্তু তিনি হতে চেয়েছিলেন বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ সমাজবিজ্ঞানী। ভবিষ্যতের কোনো কল্পচিত্র তাঁর ধ্যানধারণায় বিশিষ্ট স্থান লাভ করেনি। মার্ক্স কিংবা অরবিন্দের সঙ্গে এইখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। শক্তিযোগী তবু বহুত্ববাদী, স্বদেশনিষ্ঠ কিন্তু বিশ্বসচেতন, বস্তুনিষ্ঠ এবং আধ্যাত্মিক,এইসব দ্বন্দ্ব নিয়ে বিনয় কুমার সরকারের চিন্তাধারা।

ভীমরাও রামজী আম্বেডকর

'হিন্দু হয়ে আমি জন্মেছি, হিন্দু হয়ে মরব না।' এই ছিল বাবাসাহেব আম্বেডকরের সংকল্প। জীবনের শেষ বছরে বহু অনুগামীকে নিয়ে বাবাসাহেব বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু আরো অনেক আগেই হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবার সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

অথচ এই সংকল্পে তিনি সহসা পৌঁছননি। অনুমান করা যায়, তাঁর ভিতর একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল দীর্ঘকাল। ১৯৩০ সালে নাগপুরে এক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন যে, উচ্চবর্ণের মানুষের শত অত্যাচার সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ত্যাগ করবেন না। এরপর কিছুকালের মধ্যেই কিন্তু মত পালটালেন।

হিন্দধর্মের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু হিন্দুত্ব কাকে বলে ? আম্বেডকরের নিজের মনেই এ বিষয়ে দু'টি ভিন্ন ধারণা পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল। অমরাবতীতে ১৯২৭ সালে এক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, হিন্দুত্বের গৌরববৃদ্ধিতে কত মানুষ তাঁদের সাধনার ফল যোগ করে গেছেন, যাঁদের মধ্যে অছেন বশিষ্ঠের মতো ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের মতো ক্ষত্রিয়, হর্ষের মতো বৈশ্য, আবার তুকারামের মতো শূদ্র। এই যে হিন্দুত্ব যা দেয়াল দিয়ে ঘেরা নয়, যা গ্রহিষ্ণু সহিষ্ণু চলিষ্ণু, এর পাশে আবার আছে আরেক হিন্দুসমাজ যেখানে অনুদার ব্রাহ্মণ্যবাদের একাধিপত্য। ধর্ম সেখানে আচারের দেয়ালে ঘেরা আর উচ্চনীচের বিভেদ সেখানে মানবতার অধিকারকে পদে পদে নির্লজ্জভাবে খণ্ডিত করে চলেছে। 'আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে একে আমি কিছুতেই মেলাতে পারছি না', এই বলে ব্রাহ্মণ্যবাদে আশ্রিত হিন্দুধর্মকে আম্বেডকর ত্যাগ করেছিলেন। হিন্দুদর্শনে যে সব উচ্চভাবের কথা বলা হয়েছে বাবাসাহেব সেই সবের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সর্বজীবে শিবদর্শন আবার কোটি কোটি মানুষকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে ঠেলে রাখার ভিতর যে আত্মবিরোধ ও নৈতিক শঠতা আছে, ভীমরাও রামজী আম্বেডকরের কাছে সেটা ঘৃণ্য ও অসহ্য মনে হয়েছিল।

রামজী তাঁর পিতার নাম, ভীমরাও-এর জন্ম হয়েছিল মহার পরিবারে, জন্মসূত্রে তিনি অস্পৃশ্য। বিদ্যালয়ে তাঁকে সংস্কৃত পাঠ করতে দেওয়া হয়নি, কারণ নীচকুলে জন্ম, শাস্ত্রপাঠে তাঁর অধিকার নেই। অথচ ভীমরাও আম্বেডকরের স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল অসাধারণ। সৌভাগ্যের কথা বরোদার মহারাজার আনুকূল্য তিনি লাভ করেছিলেন, যার ফলে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যেতে পেরেছিলেন। সেখানে অর্থনীতি রাষ্ট্রদর্শন সমাজবিজ্ঞান-সহ বহু বিদ্যায় তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেন। অল্পবয়সেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন কলম্বিয়া ও লন্ডন দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তা ছাড়া লন্ডনে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন।

এত বিদ্যা সত্ত্বেও অস্পৃশ্যতার কালিমা তাঁর ঘুচল না। দেশে ফিরবার পর বরোদা রাজ্যে সামরিক সচিবের পথে তিনি নির্বাচিত হন মহারাজার উদার নীতির ফলে। কিন্তু দেশীয় সমাজ তাঁকে গ্রহণ করল কই ? বরোদায় পৌঁছবার পর কোনো হোটেলেই তাঁকে থাকবার স্থান দেওয়া হল না, কারণ তিনি নীচজাতের মানুষ। সীডেনহাম কলেজে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে তিনি নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কলেজেরই কিছু অধ্যাপক আপত্তি তুললেন ; অধ্যাপকদের জন্য যে জলের পাত্র নির্দিষ্ট ছিল তা থেকে আম্বেডকর

জল নিতে পারবেন না, কারণ তাঁর স্পর্শে পাত্র অপবিত্র হবে। বোম্বাই নগরে উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানে যদি ধর্মীয় আচারের নামে মনুষ্যত্বের অবমাননা এতদূর যেতে পারে তবে দেশের অন্যত্র কী আশা করা যায় ?

যে অবিচার ও অপমান আবাল্য ব্যঙ্গ করছিল বাবাসাহেবকে, তিনি জানতেন যে তাঁর দেশবাসী অগণিত দুর্ভাগা মানুষকে ততোধিক সহ্য করতে হয় অহরহ। তিনি আরো জানতেন যে এই নির্যাতন, এই বিবেকহীনতা, দেশময় চলছে শাস্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয়েই। উচ্চবর্ণের ভিতর মুষ্টিমেয় মানুষ একে অন্যায় বলে মানে, অধিকাংশের আচরণে আছে এর প্রতি নিঃশব্দ সমর্থন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেশীয় সমাজে সমর্থন পায় না, বরং প্রতিবাদকে মনে করা হয় ধৃষ্টতা, যার দণ্ডবিধানে সমাজ মুহূর্তে হিংস্র হয়ে ওঠে। প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে সেই হিংস্রতার পরিচয় পেয়েছিলেন আম্বেডকর বারবার।

পূর্ববর্তী হিন্দু সমাজসংস্কারকদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ। এঁদের অনেকেই স্মরণীয় ও বরণীয়। এঁরা প্রতিবাদ করেছেন সতীদাহের বিরুদ্ধে, সমর্থন করেছেন বিধবাবিবাহ, আন্দোলন করেছেন স্ত্রীশিক্ষার জন্য। এঁদের সঙ্গে আম্বেডকরের পার্থক্য আছে। উদাহরণ হিসেবে বিধবাবিবাহের কথা ধরা যাক। আম্বেডকরের মনে হয়েছে, এইসব সংস্কারের আধার পরিবার। হিন্দুসমাজসংগঠনের মূলে আছে যে জাতিভেদপ্রথা তার ওপর সরাসরি আঘাত আসছে না এই রকম সংস্কারে। ঐখানে আঘাত হানতে চেয়েছিলেন আম্বেডকর। প্রকৃত অর্থে তাঁর পূর্বসূরী নন রামমোহন বা রানডে তাঁর পূর্বসূরী মহাত্মা ফুলে।

রামমোহন ঠিকই জাতিভেদপ্রথার সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ডে সেটা প্রাধান্য পায়নি, বরং এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে যেন খানিকটা দুর্বলতাই ধরা পড়ে। জাতিভেদ ভাঙবার জন্য নিম্নবর্ণের মানুষকে নিয়ে কোনো আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন না। পরবর্তী যুগের উচ্চবর্ণের নেতারাও ঐ পথে বড় অগ্রসর হননি। এইখানে আম্বেডকরের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নিম্নবর্ণের মানুষের মুক্তি সম্ভব সংগঠিত আত্মশক্তির ভিতর দিয়ে। উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে দয়া অথবা দান হিসেবে নিম্নবর্ণের মুক্তি আসবে না।

সাম্যবাদী যেমন বিশ্বাস করেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর শৃঙ্খল ভাঙবার জন্য ধনিকের দয়ার ওপর নির্ভর করা ভুল, জাতীয়তাবাদী নেতারা যেমন ক্রমে এই সিদ্ধান্তেই আসনে যে বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না, জনগণের সংঘবদ্ধ শক্তি এজন্য আবশ্যক, সেই ভাবেই বাবাসাহেব আম্বেডকরও অস্পৃশ্য মানুষের মুক্তির জন্য স্বাবলম্বী ও সংগ্রামী আন্দোলনের প্রয়োজনে বিশ্বাসী ছিলেন। যেহেতু জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল প্রধানত উচ্চবর্ণের নেতাদের হাতে, অতএব "বহিষ্কৃত"দের জন্য তিনি স্বতন্ত্র নেতৃত্ব ও স্বতন্ত্র সংগঠন চেয়েছিলেন। এইখানেই জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ছিল তাঁর মূল পার্থক্য।

একটা জায়গায় অবশ্য তুলনাটা ঠিক খাটে না। বিপ্লবী সাম্যবাদীর লক্ষ্য ধনিকশ্রেণীর বিনাশ। সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন দেশ থেকে বিদেশী শাসকদের বিতাড়ন। নিম্নবর্ণের লক্ষ্য উচ্চবর্ণের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া। তবু এটাও একটা সংগ্রাম। যেহেতু উচ্চবর্ণের হাতেই ছিল ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকার অতএব ভাগ করা মানেই, অন্তত কিছু পরিমাণে, ক্ষমতা ত্যাগ করা। আম্বেডকর দাবি করেছিলেন

অস্পৃশ্যদের জন্য দেশের আইনসভায় সংরক্ষিত আসন। এটাও যথেষ্ট নয়। আইনের প্রণয়নেই নয়, প্রয়োগেও অবিচার থাকে। দেশের যাঁরা প্রশাসক তাঁরা যদি সবাই উচ্চবর্ণের মানুষ হন তবে আইন ভালোমন্দ যাই হোক না কেন, কার্যত আইনের প্রয়োগ ও বিচারব্যবস্থায় পক্ষপাতিত্ব থেকে যায়। কাজেই প্রশাসনেও অস্পৃশ্যদের অংশগ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এইসবের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আম্বেডকর চেয়েছিলেন। জাতিবিশেষের জন্য বিশেষ সুবিধা নয়, বরং সকলের জন্য সমান অধিকারটাই লক্ষ্য। তবে ঘোরতর অসাম্য থেকে সাম্যের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে প্রথম পর্যায়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা দরকার হয়ে পড়ে।

আইনের গুরুত্ব তিনি মানতেন। তবু একথাটাও তিনি জানতেন যে, শুধু আইনের জোরে মানুষে মানুষে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সে জন্য প্রয়োজন আরো কিছু। ১৯৪৩ সালে রানডের স্মৃতিসভায় এক বিখ্যাত ভাষণে আম্বেডকর বলেছিলেন, মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয় না আইনের জোরে, সেজন্য চাই সমাজে অন্য এক শক্তি, জাগ্রত বিবেক, সংগঠিত নীতিবোধ। হিন্দুসমাজে এরই পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি চেয়েছিলেন চাতুর্বর্ণ্যের যুক্তিনির্ভর মৌল সমালোচনা।

এই সমালোচনার কয়েকটি প্রধান কথা এবারে তুলে ধরা যাক।

গীতায় বলা হয়েছে, গুণ ও কর্মের বিভাগের দ্বারা ভগবান চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেছেন। এই তত্ত্বের সঙ্গে কিন্তু বাস্তব অবস্থান মিল নেই। হিন্দুসমাজে ব্যক্তির বর্ণ ও জাতি নির্ধারিত হয়ে চলেছে জন্মের দ্বারা, গুণের দ্বারা নয়। ব্রাহ্মণকুলে যার জন্ম সে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ছেলে শূদ্র। জন্মসূত্রেই আম্বেডকর বিদ্যালয়ে সংস্কৃতপাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, গুণগত যোগ্যতার তো তাঁর অভাব ছিল না। আজকের চাতুর্বর্ণ্য ব্যক্তির গুণগত যোগ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোনোকালে অন্য অবস্থা ছিল কি না তা নিয়ে নানা কথা সম্ভব। কিন্তু চাতুর্বর্ণ্যের সমালোচক আক্রমণ করছেন আজকের বাস্তব ব্যবস্থাকে। গীতায় উক্ত তত্ত্বের সঙ্গে এই বাস্তবের সম্পর্ক নেই। প্রচলিত জাতিভেদপ্রথার কোনো তাত্ত্বিক সমর্থন যুক্তিসঙ্গত নয়।

এরপর আসে দ্বিতীয় কথা। বর্ণভেদ যদি গুণ ও কর্মের বিভাগের ওপরই কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত হত তাতে কি সেটা সমর্থনযোগ্য হত ? আম্বেডকর বলছেন, তা হলেও সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। কিছু মানুষ আবদ্ধ থাকবে কায়িক শ্রমে, তাদের জ্ঞানচর্চার অধিকার থাকবে না ; কিছু মানুষ থাকবে জ্ঞানচর্চা নিয়ে, তাদের কায়িক শ্রম করতে হবে না ; গুণ ও কর্মের এইরকম বিভাগ ভালো নয়। বৌদ্ধিক ও কায়িক শ্রমের ভিতর বিচ্ছিন্নতাকে গান্ধী অথবা টলস্টয় সুব্যবস্থা মনে করেননি, মনে করবার যথেষ্ট কারণও নেই। সামরিক কলাকৌশল প্রয়োগ করবার অধিকার ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। আম্বেডকর চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের বিশেষভাবে স্থান হোক, জাতিধর্মনির্বিশেষে সব মানুষের জন্যই সেই সুযোগ ও অধিকার থাকুক। বৈশ্য শুধু বাণিজ্য নিয়ে থাকবে, বিদ্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিষ্প্রয়োজন, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ভিতর এমন স্থায়ী বিরোধ দেশের প্রগতির সহায়ক নয়। একথা ব্যাখ্যা করে বলাটাও আজ বাহুল্য। গুণ ও কর্মের বিভাগ কিছুদূর পর্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত, কিন্তু এই বিভাগের যে আতিশয্য বর্ণভেদ ও জাতিভেদে প্রশ্রয় পায় সেটা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে অতিশয় হানিকর।

জাতিভেদ ব্যবস্থার আরো এক কুফল এই যে এতে করে দেশের ভিতর বৃহত্তর ঐক্যের

ধারণা স্ফূর্তি পায় না, জাতপাতের চিন্তাটাই প্রধান হয়ে ওঠে। দেশের সামনে যখন এমন কোনো বিপদ দেখা দেয় যেটার বিরুদ্ধে কোনো বর্ণবিশেষের একক চেষ্টাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হয় বর্ণনির্বিশেষে সমবেত প্রয়াস, তখন ঐ ভেদবুদ্ধি সর্বনাশ ডেকে আনে। এই কথাটার ওপরও আম্বেডকর জোর দিয়েছিলেন। বর্ণভেদ ও জাতীয় সংহতির মধ্যে একটা বিরোধ আছে। আর এই বিরোধটা শুধু রাষ্ট্রীয় স্তরে দেখা দেয় এমন নয়, গ্রামে গ্রামে এটা ছড়িয়ে আছে এবং চোখের সামনে গৃহযুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে।

জাতিভেদে মানবতার একটা অপমান শাস্ত্রীয় সমর্থন পায়, দৈনন্দিন অভ্যাসের সেটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চনীচ ভেদ সব সমাজেই আছে। কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদ শুচিতা সম্বন্ধে সামাজিক ধারণাকে যে সূক্ষ্ম অংন্ধ সর্বব্যাপী কুসংস্কার করে তুলেছে অন্য কোনো ধর্মে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। বর্ণহিন্দুর রন্ধনশালায় কুকুর ঢুকলে খাদ্যবস্তু কিছুই অপবিত্র হয় না, অস্পৃশ্য মানুষ ঢুকলে সবই অপবিত্র হয়। অস্পৃশ্যের ছায়া পর্যন্ত অপবিত্র। এটা যে মনুষ্যত্বের অতি বড় অপমান একথা সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজ স্বীকার করে না, যেমন না কি কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বিভেদমূলক আচরণে বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গরা কোনো অপরাধ দেখে না।

গত চল্লিশ বছরে অস্পৃশ্যতার প্রকোপ কিছুটা কমেছে। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুর প্রতি উচ্চবর্ণের একটা গভীর অবজ্ঞা থেকেই গেছে। সব মানুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমান মনে করবার অভ্যাস আমাদের সমাজে নেই, সংবিধানে সমানাধিকারের স্বীকৃতি সত্ত্বেও। মন্দিরে অন্ত্যজদের প্রবেশের অধিকার নেই, এ নিয়ে আমরা লজ্জিত নই। এই অধিকারভেদ আমাদের বিব্রত করে না। পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দুরাও এ ব্যাপারে নির্বিকার। আমাদের ভিতর এমন কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, জাতিভেদ ভারতের অন্যত্র আছে, পশ্চিমবঙ্গে উঠে গেছে। কিন্তু এটাই কি ঘটনা ? নিম্নবর্ণের মানুষকে কি আমরা আপন জন বলে ভাবি ?

সংবিধানে বলা হয়েছিল, দশ বছরের ভিতর নিরক্ষরতা দূর করা হবে। চল্লিশ বছর কেটে গেল, নিরক্ষরতা দূর হল না। অথচ উচ্চশিক্ষার অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা বৃহৎ সংখ্যায় দেশের সীমানা পার হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষই উচ্চবর্ণ। উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়েরাই প্রধানত কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়। অনেক সমস্যা আছে সেখানেও, ডিগ্রী লাভের পর বেরোজগারির বিপদ। তবু একটা কথা অস্বীকার করা যায় না। এদেশের সরকার উচ্চশিক্ষার বিস্তারের দিকে যতটা মনোযোগ দিয়েছে, নিরক্ষরতা দূর করবার কাজে ততটা নয়। চীনের তুলনায় আমবা উচ্চশিক্ষার প্রসারে পিছিয়ে নেই, কিন্তু সাক্ষরতার ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে আছি। আসলে এদেশে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের প্রতি একটা গভীর অবহেলা দীর্ঘকাল ধরে সমাজের চেতনায় প্রোথিত। এরই ফলে নীচুজাতের মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান কখনো প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি। অনুসূচিত জাতিসমূহের ভিতর নিরক্ষরতার প্রাদুর্ভাব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও এতদিন ধরে থেকেই গেছে। আম্বেডকর যে জাগ্রত বিবেকের কথা বলেছিলেন তা যদি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যেত তবে এটা ঘটত না। এরাজ্যে অন্ত্যজদের আমরা ততটা হিংসা করি না যতটা অবজ্ঞা করি। রাজনীতির কারণে ওদের আমরা সাধ্য অনুযায়ী ব্যবহার করেছি কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিইনি।

যদি সেই মর্যাদা দেওয়া হত তবে আম্বেডকরের কয়েকটি দাবি সহজেই মেনে নেওয়া

যেত। সনাতনপন্থী হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণই পুজোপার্বণে পৌরোহিত্য করবার অধিকারী। এই অসাম্য কেন ? সকলেরই শাস্ত্রপাঠ ও অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে, শাস্ত্রে কার কতটা অধিকার জন্মেছে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে, যাঁরা সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ তাঁরাই পৌরোহিত্য করবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, এটাই তো যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে যাদের আন্তরিক সায় নেই তারা আসলে জাতিভেদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। অধিকারের যে সাম্য আম্বেডকর চেয়েছিলেন সেটাই ন্যায়সঙ্গত। বিবাহের প্রশ্নেও একই বিচারধারা গ্রাহ্য হওয়া উচিত। মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতিভাবের বিস্তার জাতপাতের সীমানা দিয়ে খণ্ডিত হওয়া দুঃখজনক। যে ধর্ম এই অনুদারতাকে সমর্থন করে তার সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ আছে। বিবাহযোগ্যতার বিচারে জাতপাতের সীমা যত লঙ্ঘন করা যাবে ততই সামাজিক সাম্য ও ঐক্য বিস্তার লাভ করবে।

বিবাহ ও পৌরোহিত্যের অধিকার সম্বন্ধে এই প্রত্যয়গুলি অধিকাংশ বাঙ্গালী কি মেনে নিতে পেরেছে ? যদি না পেরে থাকে তবে জাতপাতের প্রভাব থেকে বঙ্গের হিন্দুসমাজ মুক্ত একথা বলা যাবে না। আসলে জাতিভেদ সারা ভারতের সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গ এখনও মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠেনি।

অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আর্থিক উন্নতির বিষয় নিয়ে আম্বেডকর আলোচনা করেছিলেন। এখানে দুটি জিনিসের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। এক, শিক্ষা ; দ্বিতীয়, জমির পুনর্বণ্টন, অর্থাৎ, ক্ষেতমজুর ও দরিদ্রতম চাষীদের ভিতর উদ্বৃত্ত জমির বণ্টন। ক্ষেতমজুরদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের মানুষ। দেশের জনতার এরা এক বৃহৎ অংশ। এজন্য বাবাসাহেব জমির পুনর্বণ্টনের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। সরকারী চাকরিতে বা প্রশাসনে সংরক্ষিত পদের জন্য দাবি মূলত রাজনীতিক দাবি। রাজনীতিক বলেই সেটা অগ্রাহ্য এমন নয়। তবে তার চেয়ে আরো মৌল প্রয়োজন হল দলিতদের জন্য শিক্ষার বিশেষ সুযোগসুবিধা। গ্রামে গ্রামে সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া জাতের ভিতর থেকে প্রতিশ্রুতিময় ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করতে হবে, তাদের জন্য প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষার স্তর পর্যন্ত বিশেষ সহায়তার সবরকমের ব্যবস্থা করতে হবে। অনুসূচিত জাতির ভিতরও অবশ্য কিছু সমৃদ্ধ পরিবার আছে, বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থার ভিতর তাদের স্থান দেওয়া প্রয়োজন নয়। পারিবারিক আয়ের দিক থেকে যারা দরিদ্র আবার সামাজিক অবস্থানের বিচারেও যারা সবার নীচে তাদের এই দ্বিবিধ প্রতিকূলতার সমষ্টিগত বাধাটাকে ভাঙবার জন্যই শিক্ষার ক্ষেত্রে সজাগ নীতি সবচেয়ে প্রয়োজন।

আম্বেডকরের জীবন এ ব্যাপারে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারে। তাঁর বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল একদিকে বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও-এর সহৃদয় বিবেকবান সহায়তা, অন্যদিকে বাবাসাহেবের নিজস্ব মেধা ও আত্মোন্নতির জন্য নিরলস উদ্যোগ ও অনুশীলন। আজকের নিম্নবর্ণের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্যও একদিকে যেমন সমাজের পক্ষ থেকে বিশেষ ও ব্যাপক সহায়তার প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের নিজস্ব উদ্যোগ ও অনুশীলনও সমানভাবে আবশ্যক। তা যদি না হয় তবে নিম্নবর্ণের অসংখ্য মানুষের ভিতর থেকে কেবল বিশেষ সুবিধাভোগী ছোটো একটি গোষ্ঠী তৈরি হবে। আর সংরক্ষণ-আশ্রিত এই গোষ্ঠীর ভিতর যদি বাবাসাহেবের জীবন থেকে প্রাপ্ত স্বাবলম্বন ও অক্লান্ত অনুশীলনের প্রেরণা কার্যকরী না হয় তবে তার ফলে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর ভিতর দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ যতটা বাড়বে সমাজের সামগ্রিক উপকার ততটা

হবে না। মনে রাখতে হবে যে, স্বাবলম্বন ও সামগ্রিক উন্নতিই ছিল আম্বেডকরের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজনীতির দ্বন্দ্বটাকেই প্রধান করে তুললে ভুল করা হবে।

আম্বেডকর ও গান্ধীর ভিতর বিরোধ তৎকালীন ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ এই দুই বিরাট পুরুষের ভিতর কোথাও একটা গভীর মিল ছিল যেটা ঢাকা পড়ে যায় খণ্ড খণ্ড বিরোধের কোলাহলে। গান্ধীজীকে ভবিষ্যতের মানুষ মনে রাখবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধের প্রবক্তা ও নায়ক হিসেবে। আম্বেডকর অহিংসাকে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেননি, যেমন করেননি জবাহরলাল নেহরু এবং আরো অনেকে। কিন্তু অহিংসার প্রতি যে তাঁর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল সেটা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। যে সব গণআন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যেমন ১৯২৭ সালে মহাড়ের আন্দোলন, তার ইতিহাস থেকেই সেটা সুস্পষ্ট। মহাড়ের আন্দোলন যখন উত্তেজনার তুঙ্গে তখন উচ্চবর্ণের পক্ষ থেকে কিছু উদ্ধত মানুষ আন্দোলনকারীদের আক্রমণ করে ও দৈহিকভাবে আঘাত করে। আন্দোলনকারী মহারদের প্রতিআক্রমণের শক্তি ছিল, অনেকের সামরিক শিক্ষাও ছিল। শুধুমাত্র আম্বেডকরের দৃঢ় নিষেধের ফলেই হিংসার বদলে সেদিন হিংসার প্রয়োগ ঘটেনি। তাঁব ভাষা মসৃণ ছিল না, কিন্তু হৃদয়ে ওদার্য ছিল।

হিংসার পথে যে বাবাসাহেব আস্থাস্থাপন করেননি তার একটা মূল কারণ আছে। হিংসার দ্বারা ভয় সৃষ্টি করা যায়, হিংসা দিয়ে হিংসা জাগানো যায়, কিন্তু মানুষের বিবেককে জাগ্রত করা যায় না। আম্বেডকর বিশ্বাস করতেন, চেতনার গভীরতর পরিবর্তন ছাড়া সমাজের মুক্তি সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি রুশবিপ্লবেরও স্মরণীয় সমালোচনা করে গিয়েছিলেন। হিংসাত্মক বিপ্লবের ফলে শুধু ক্ষমতার হস্তান্তর হয়, হৃদয়ের পরিবর্তন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাঠমাণ্ডুতে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'কম্যুনিস্ট ব্যবস্থা হিংসার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ব্যবস্থার ব্যর্থতার চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ধরুন কাল যদি ঐ দেশে ডিক্টেটরশিপের পতন ঘটে তারপর কী হবে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তারপর ওদের নিজেদের ভিতর আবারও মারামারি শুরু হয়ে যাবে।' আম্বেডকরের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁর মৃত্যুর পঁয়ত্রিশ বছর পর গভীর অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন বলেই মনে হয়। চেতনার যে পরিবর্ত্তনের ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন সেটা যে হিংসার পথে ঘটে না, রুশ দেশেও ঘটেনি, একথা তিনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন।

আম্বেডকর যদিও হিন্দুধর্ম ও চাতুর্বর্ণ্যের কঠোর ও অক্লান্ত সমালোচক ছিলেন তবু ধর্মের প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেননি। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেও তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেন অন্য এক ধর্মে, বৌদ্ধধর্মে। প্রশ্ন ওঠে, ধর্মকে কেন তাঁর আবশ্যক মনে হয়েছিল। ধর্ম মানুষকে এমন কী দিতে পারে যা সামান্য যুক্তি থেকে লাভ করা কঠিন? আম্বেডকর নানা সময়ে এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলেছেন। অতি সংক্ষেপে দুয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করে বলা যাক।

মানুষ শুধু স্বার্থের গণনা থেকে পরস্পর আবদ্ধ থাকে না, আরো গভীর কোনো বন্ধন সমাজকে ধরে রাখে। ধর্ম মানুষকে দেয় সেই সংঘবদ্ধতার শক্তি, যাকে হারালে সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। ধর্ম মানুষকে আরো দিতে পারে এক অদম্য আশা। যুক্তির কাছ থেকে

পাওয়া যেতে পারে বিশেষ উদ্যোগে সাফল্য ও ব্যর্থতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু হিসেব। কিন্তু উৎসাহ নিয়ে বাঁচবার জন্য, কোনো মহৎ উদ্যোগে আত্মনিয়োগের জন্য, দরকার হয় অন্য এক প্রেরণা, বেহিসেবী আত্মত্যাগ, মৃত্যুঞ্জয়ী আশা, ধর্ম থেকে যা লাভ করা যায়। বৌদ্ধধর্মে আম্বেডকর বিশেষভাবে দেখেছিলেন, প্রজ্ঞা, সমতা ও করুণার সমন্বয়, যেটা তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সেই প্রজ্ঞায় যুক্তি নির্ভর আশ্রয় পায় ; সেই সমতায় আম্বেডকর দেখেছিলেন জাতিভেদবিরোধী তাঁর সমস্তপ্রয়াসের প্রকৃষ্ট সমর্থন ; সেই করুণায় তিনি দেখেছিলেন মানুষের শুদ্ধতম বিবেকের অব্যর্থ ভিত্তি।

বাবাসাহেব আম্বেডকরকে অবশ্য আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করব ধর্মের ব্যাখ্যাতা হিসেবে নয়। তিনি নিজে একবার বলেছিলেন, ইতিহাসের মঞ্চে কিছু মহাপুরুষ অবতীর্ণ হন ঝাড়ুদারের ভূমিকায়, সমাজে স্তূপীকৃত আবর্জনা সাফ করবার কাজে তাঁরা নিযুক্ত হন। ঐরকম একটা ভূমিকাই ভীমরাও বেছে নিয়েছিলেন। হিন্দু ঐতিহ্যের যে দিকটা মানবতার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছে, পরিণত হয়েছে অসাম্যদুষ্ট কুসংস্কারগ্রস্ত বুদ্ধিহীনতায়, তারই বিরুদ্ধে এক বদ্ধসংকল্প সংগ্রামী সমালোচক হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে এদেশের নেতারা যখন ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরব প্রচারে আগ্রহী আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল কারণ বলে শনাক্ত করতে ব্যস্ত, তখন আম্বেডকরে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অন্য এক সুর। বাইরের শক্তির ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া ভুল, তাতে ভিতরের অন্যায় ও মূঢ়তা প্রশ্রয় পায়। সেই মূঢ়তা আজও সদর্পে চলছে। আম্বেডকর বললেন আমাদের দুর্বলতা ও দুর্দশার প্রধান কারণ আছে আমাদের ভিতরে, এদেশের সমাজ ও মননের সংকীর্ণতায়, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের অন্যায়ে, অন্ত্যজের অধিকারহীনতায়, ব্রাহ্মণ্যবাদের বিচারহীন অসাম্যপীড়িত ঔদ্ধত্যে।

এইসব কথা সেদিন এদেশের অনেক মানুষের পছন্দ হয়নি। আবার কিছু মানুষ তাঁর বিদ্রোহের ভঙ্গী দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁর চিন্তাকে গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা করেনি। আজও তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর বছরে দেখি এদেশের মানুষের একাংশ তাঁর প্রতি অনাগ্রহী, নিতান্ত সৌজন্যের বশে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে দূরে ঠেলে রাখতে অভ্যস্ত। অন্য কিছু মানুষ তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাসময়, সেই উচ্ছ্বাসে কোনো বৌদ্ধিক প্রজ্ঞা নেই। অথচ ভীমরাও রামজী আম্বেডকর যে প্রশ্নটা তুলে ধরেছিলেন সেটা মৌল প্রশ্ন, উপেক্ষায় অথবা উচ্ছ্বাসে তার প্রতি কিছুতেই সুবিচার হয় না।

মনুস্মৃতিকে যিনি একদিন অগ্নিতে সমর্পণ করেছিলেন তিনিই বিশ বছর পরে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করলেন। সকল ভারতীয়ের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা সেই সংবিধানে ঘোষিত হল। তবু ভীমরাও আম্বেডকর জানতেন যে, তাঁর জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে আরো অনেক দেরি। সংবিধান রচনার কাজ যখন সমাপ্ত তখন তিনি বললেন, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ভারতের নাগরিকেরা গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করবে, কিন্তু সামাজিক ও আর্থিক অসাম্যের সঙ্গে আমাদের গণতান্ত্রিক বিধানের একটা অন্তর্বিরোধ থেকেই যাবে। এই বিরোধ যদি দ্রুত দূর করা না যায় তবে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। শান্তিপূর্ণ পথে, তবু দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে, মনুষ্যত্বের জয়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মন্ত্র তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। বিভক্ত ভারত নয়, তিনি কামনা করেছিলেন ঐক্যবদ্ধ ভারত, আর সেই ঐক্যকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে।

জীবৎকালে যে-সব বিবাদ ও বিতর্কে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন সেইসব পার হয়ে আজ তাঁর জীবনের স্বপ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল তাঁর কাছে প্রিয়, এই তিনের সমন্বয় তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মের শেষ লক্ষ্য। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সামাজিক সাম্যের জন্য অসমাপ্ত সংগ্রামে জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য বাবাসাহেব আম্বেডকর এক নমস্য মানব।

উল্লেখপঞ্জী

১। শ্রীমতী মীরা চৌধুরীর খাতায় স্বাক্ষর করে গান্ধী লিখেছিলেন : "Never make a promise in haste. Having once made it fulfil it at the cost of your life."

২। এই উদ্ধৃতিটি ও পরবর্তী অধিকাংশ উদ্ধৃতি রাসেলের আত্মজীবনীর দ্বিতীয় ভল্যুম থেকে গৃহীত।

৩। সিলেক্টেড ওয়ার্কস অফ এম. এন. রায়, ভল্যুম ওয়ান (১৯১৭-২২) (সং) শিবনারায়ণ রায়, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, দিল্লী।

৬

স্মৃতি

কানুদা

বিমল ঘোষ। আমাদের কানুদা। এল আই সি-তে কাজ করতেন। কিন্তু আমাদের কাছে সেটা ওঁর পরিচয় ছিল না। এমন কাছের মানুষ, এমন অকৃত্রিম বন্ধু জীবনে বেশি পাইনি। সেটাই ছিল ওঁর পরিচয়।

১৯৪৭ সালে, দেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন আগে, আশুতোষ কলেজে আমার কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ঐরকম সময়েই কানুদার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ইতিহাসও শুরু। আমরা দু'জনেই তখন অবিবাহিত। পরে কানুদার বিয়ে হয় ভারতীর সঙ্গে। আশুতোষ কলেজে ভারতী ছিল আমার প্রিয় ছাত্রীদের একজন। আমিই কানুদার সঙ্গে ভারতীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। সেই সবই আজ স্মৃতি। আজ কানুদা নেই।

সন্তোষ, নির্মল, কল্যাণ, মিহির, রণজিৎ, প্রভাকর এদের নিয়ে আমাদের এক বন্ধু গোষ্ঠী ছিল। এদের অধিকাংশই তখন মার্ক্সবাদী। প্রভাকর আর আমি ছিলাম অন্যমতের। কানুদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ঐ বন্ধু গোষ্ঠীতে। উনি নিজেও তখন মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী।

কানুদার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। উনি একটা বিশেষ কৌতূহল নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। সেটা পরে শুনেছি। ওঁর তখন ধারণা, মার্ক্সবাদ যদি কেউ মেনে না নেয়, তবে দু'টো কারণেই শুধু সেটা সম্ভব, মস্তিষ্কের অভাব অথবা সততার অভাব। কানুদা আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন, আমি এ দু'য়ের কোন প্রকারের মানুষ। প্রায় বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়েই উনি আমার কাছে চলে এসেছিলেন। কানুদার ভিতর আমি কখনই সদিচ্ছার অভাব দেখিনি।

আমরা সবাই ছিলাম আড্ডাবাজ। কিন্তু কানুদার সঙ্গে আমার আলোচনা হ'ত বিশেষ ধরনের। পাঁচজনের আড্ডার মধ্যে তো আমরা ছিলামই। তাঁর বাইরেও বিশেষভাবে চলতো আমাদের দু'জনের একান্ত আলোচনা। তার যেন শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, ঘরে বসে, পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে, পথে হাঁটতে হাঁটতে, কফি হাউসে, চায়ের দোকানে। ব্যক্তিগত কথাবার্তা প্রাধান্য পেত না। চিন্তায় বিশ্ব পরিক্রমাটাই প্রধান কথা। আলোচনার একটা বড় বিষয় ছিল রাজনীতি।

তখনও কম্যুনিস্ট দুনিয়ায় ফাটল দেখা দেয়নি, অন্তত সেটা সাধারণের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সেদিনকার কম্যুনিস্ট আন্দোলন ছিল সোবিয়েত ভক্তিতে আচ্ছন্ন। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো লোকেরা ছিলেন ব্যতিক্রম। সোবিয়েত দেশের প্রতি অবিচল আনুগত্যই তখনও কমিউনিজমের প্রধান কথা।

কানুদা ছিলেন প্রথমদিকে মানবেন্দ্রনাথের প্রতি অনুরক্ত। যুদ্ধের সময় সোবিয়েত দেশের দিকেই ছিল ওঁদের সক্রিয় সমর্থন। বিশ্বযুদ্ধের শেষে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তার পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্ক্সবাদ আর সোবিয়েত রাজনীতি থেকে তিনি অনেকখানি দূরে সরে যান। কানুদা তবু রয়ে গেলেন সোবিয়েত সমাজব্যবস্থার সমর্থক। কিছু সংশয়ের সঙ্গে হয়তো উনিও লড়ছিলেন, কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ দেখা দেয়নি। আমি যখনকার কথা বলছি তখন কম্যুনিষ্ট দলের প্রতি কানুদার সহানুভূতি জোরালো।

কাজেই আমাদের তর্কটা ছিল প্রবল। তাতে উত্তেজনা ছিল কিঃ তিক্ততা ছিল না কখনই। কানুদার ভিতর এই গুণটি আমি শেষ অবধি দেখেছি। তর্কের ভিতর উত্তেজিতভাবে অনেক কথা বলতেন। কিন্তু সে যেন এক রকম নিরাসক্ত উত্তেজনা। তর্কের ভিতর দিয়ে উনি প্রতিপক্ষের কথা বুঝতেই চেষ্টা করতেন। শত তর্কেও আমাদের বন্ধুত্বের গায়ে আঁচড় পড়তো না। কানুদার এই আশ্চর্য গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছে।

কানুদার মতামত ধীরে ধীরে পালটে গিয়েছিল। হঠাৎ বদলায়নি। বদলেছে অনেক বছর ধরে, ক্রমে ক্রমে।

সোবিয়েত দেশ নিয়ে আলোচনায় কয়েকটা মোটা কথা আমি ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। সব দেশের সব ব্যবস্থারই কিছু দোষগুণ আছে। সোবিয়েতের বেলায়ও তাই। দোষগুণ দুই-ই দেখে, তথ্য যাচাই করে, একটা বিশেষ ব্যবস্থার সমর্থক কেউ হতে পারেন। কিন্তু মোহ থাকবে কেন? বুদ্ধিকে সতর্ক রাখা চাই। সোবিয়েত দেশকে কল্পনায় স্বর্গরাজ্য করে তোলা হচ্ছে, একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, এইখানেই ছিল আমার প্রধান আপত্তি। চল্লিশের দশকের শেষভাগে অথবা পঞ্চাশের প্রথম দিকে কানুদার সঙ্গে আমার এইসব আলোচনা যখন চলছিল, স্তালিনী আমল তখনও চালু।

সোবিয়েত দেশ সম্বন্ধে সেদিনকার অনেক ভ্রান্ত ধারণা ক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছে। তারপর চীন নিয়ে নতুন মোহ সৃষ্টি হতে দেখেছি। আরো পরে কিউবা নিয়ে। এইসব দেখে মনে হয়েছে, আমরা অনেকেই মোহে জড়াতে ভালোবাসি। কোনো দেশকে তীব্রভাবে হিংসা করব, কোনো দেশকে মুগ্ধভাবে ভালোবাসব, এইরকম একটা নেশা বোধ হয় আমাদের টানে। আমি বলতে চেয়েছি, আমাদের অন্তিম আনুগত্য জমা থাক কিছু আদর্শের জন্য। বাস্তবে কোথাও সেইসব আদর্শ রূপায়িত হবার ধারে কাছেও আমরা পৌঁছইনি। ভালো মন্দ দেখেশুনে যা চাই নানা দেশ থেকে খুঁজে নিতে হবে। পৃথিবীর কিছু দেশের বেলায় চরম সন্দেহপ্রবণতাকেই বাস্তব বুদ্ধি বলে মানবো, আর অন্যকিছু দেশের প্রতি আমরা ভক্তি গদ্‌গদ হব, এটা আমার কাছে সত্যানুসন্ধানের পথ বলে মনে হয়নি।

এইসব যুক্তিতেই যে কানুদার মতের পরিবর্তন ঘটেছিল এমন নয়। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধি এবং সর্বোপরি সততাই তাঁকে নতুন চিন্তার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি চাইছিলেন, দেশে কাজকর্ম হোক। দেশের উন্নতি হোক। তাঁর ক্রমেই মনে হচ্ছিল যে, প্রচলিত বামপন্থী চিন্তা আমাদের ক্রুদ্ধ হতে শিখিয়েছে, কাজ করতে শেখায়নি। দেশের বর্তমান অবস্থায় কীভাবে আর্থিক উন্নতির দিকে যথাসম্ভব অগ্রসর হতে হবে সেই পথ দেখায়নি। এমনকি আমাদের চিন্তার ঝোঁকটাই সেদিকে যায়নি। বামপন্থী চিন্তায় তিনি ক্রমেই কেমন যেন একটা অবাস্তবতা আর কপটতা দেখতে পেলেন।

রাজনীতির বাইরেও কানুদার সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা চলত আরো নানা বিষয়

নিয়ে। এর ভিতর ছিল কিছু আধা-দার্শনিক বিষয়। যেমন যুক্তিবাদ। এটা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দর্শনের সূত্র ধরে আমাদের আলোচনায় চলে এসেছিল। তাছাড়া, ছবি অর্থাৎ চলচ্চিত্র, যে বিষয়ে কানুদার জ্ঞান এবং আগ্রহ ছিল আমার তুলনায় অনেক বেশি ; আমি তো প্রায়ই কিছুই জানতাম না, এখনো জানি না।

মানবেন্দ্রনাথ যুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই বিশ্বাসের মূলে ছিল জড়বাদী দর্শন। তাঁর সঙ্গে আমার দার্শনিক চিন্তার খানিকটা অমিল ছিল। যাই হোক, কানুদার সঙ্গে আমার আলোচনা হ'ত জড়বাদ নিয়ে ততো নয়, বরং মানুষের আদর্শ চিন্তায় যুক্তির স্থান নিয়ে। আমার বক্তব্য ছিল এই যে, যুক্তির কাজ হ'ল তথ্য থেকে সঠিকভাবে সিদ্ধান্তে আসা, অথবা লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপায় নির্ধারণ করা। লক্ষ্যের ভিতরও একটা উচ্চ-নীচ ভেদ থাকতে পাবে। অর্থাৎ যাকে এক সময় আমরা লক্ষ্য বলি তাও উচ্চতর কোনো লক্ষ্যের পথে উপায় বিশেষ হতে পারে। কিন্তু আমাদের উচ্চতম লক্ষ্য অথবা মৌল আদর্শ অন্য কিছুর জন্য উপায় অথবা উপকরণ বলেই মূল্যবান নয়, তার মূল্য স্বাশ্রয়ী, নিজের ভিতরই নিহিত। প্রত্যক্ষ অনুভবের ভিতর দিয়ে সেই মূল্য সম্বন্ধে আমরা প্রত্যয় লাভ করি।

মনে আছে একদিন ধর্মতলার মোড় থেকে হাজরার মোড় পর্যন্ত হেঁটে আসতে আসতে এইসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কানুদা বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ অনুভব থেকে যে মূল্যবোধ, সেটাও কি আমরা পাই না যুক্তিরই সাহায্যে ? আমি বলেছিলাম, যুক্তি শব্দটা আমরা কোন অর্থে ব্যবহার করছি তারই উপর প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে। বিশ্লেষণী বুদ্ধি আর প্রত্যক্ষ অনুভব এক জাতের বস্তু নয়। দু'টো ভিন্ন জিনিসের জন্য যুক্তি নামে একটা অভিন্ন শব্দ ব্যবহার করলে শেষ অবধি কিছুই আর পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। কানুদা জোরের সঙ্গে এরপর কিছু বলেননি। এসব বিষয়ে তিনি মন খোলা রাখতেন। আমার কথা হয়তো বা উনি মেনে নেননি, হয়তো কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

চলচ্চিত্রের ব্যাপারে উনিই ছিলেন বক্তা, আমি শ্রোতা। নানা ধবনের শিল্পের ভিতর পার্থক্য তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন। যেমন গান আর কবিতার প্রকাশের মাধ্যম এক নয়, একটাতে সুর অন্যটাতে শব্দ, কাজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধরনটাও ভিন্ন। তেমনই একটা উপন্যাস পড়া আর তাকে ছবি হিসেবে দেখা এক ব্যাপার নয়। প্রত্যেকটি মাধ্যমের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে। নিজস্ব সম্ভাবনা আছে। নিজস্ব সীমা আছে। এইসব কথা তত্ত্ব হিসেবে এবং উদাহরণ দিয়ে তিনি বলতেন। চলতি চলচ্চিত্র থেকেই সেইসব উদাহরণ নেওয়া হ'ত প্রধানত। অন্যতম উদাহরণ ছিলেন সত্যজিৎ। চলচ্চিত্রে ওঁর এই আগ্রহ শেষ অবধি ছিল। ওঁর কাছ থেকে আমার যথেষ্ট শেখা হয়নি। সেটা আমারই শূন্যতা।

১৯৭০ সালের পর অনেকটা সময় আমি কলকাতার বাইরে কাটিয়েছি। কলকাতায় এলে কানুদার সঙ্গে দেখা হ'ত। এই যোগাযোগ রক্ষার কৃতিত্ব প্রধানত ওঁরই। শেষ জীবনে অনেকটা সময় তিনি শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের ভিতর কাটিয়েছেন। তবু তারই ভিতর যথাসাধ্য যোগাযোগ রেখে গেছেন। এজন্য ওঁর কাছে সর্বদাই আমি কৃতজ্ঞ বোধ করেছি।

কানুদার বন্ধুত্বের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বন্ধুর কাছ থেকে, অন্তত আমার কাছ থেকে, তাঁর কোনো জাগতিক সুবিধার প্রত্যাশা ছিল না। অপর সব ব্যবহারিক ফল নিরপেক্ষভাবে বন্ধুভাব যে আপনি মূল্যবান, অন্য কোনো উদ্দেশ্যের উপায় হিসেবে নয়

বরং তার নিজস্ব গুণে সে পরম কাম্য, কানুদা তাঁর আচরণের ভিতর দিয়ে সেটা স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। কোনো দর্শনের ভিতর দিয়ে সম্ভবত তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেননি। তিনি একে পেয়েছিলেন সহজ বোধের মতো করে। আমরা ক'জন এ জিনিস পাই অথবা পেয়ে রক্ষা করতে পারি? সংসারে নানা মালিন্যের ভিতর কানুদা এই মূল্যবোধকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা করেছিলেন।

অরুণকুমার সরকার

১৯৭৯ সালের শেষদিকে অরুণকুমার সরকার অবসর গ্রহণ করেন সরকারী চাকরি থেকে। তখন তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ। অবসরগ্রহণের পর দু'মাসের ভিতরেই তিনি চিরবিদায় নেন। জীবনের ঐ শেষ কয়েক মাসে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাঁর কণ্ঠে কাতরতা ছিল না, যদিও কঠিন কর্কটরোগে তাঁর দেহ তখন বিধ্বস্ত। মৃত্যুকে পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি অনায়াসে স্বধর্ম পালন করেছেন এবং আশ্চর্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে বন্ধুত্বকে আসনে বসিয়েছেন। এমন গুণবান অথচ নিরহংকার মানুষ আমি বড় দেখিনি।

চাকরির ক্ষেত্রে অরুণ শ্রদ্ধা অর্জন করেন এমন একজন কর্মকর্তা হিসেবে, দুর্নীতির ছায়া যাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কাজের বাইরে বন্ধুদের ভিতর ছিল অন্য পরিচয়। তাঁর মৃত্যুর পর সমসাময়িক এক কবিবন্ধু লিখেছেন, 'আমাদের কৈশোর ও যৌবনকে যেন তারই কাছে জমা রেখেছিলাম আমরা।' কোনো আশ্চর্য যাদুবলে কৈশোরের বন্ধুত্বপ্রিয়তাকে তাঁর জীবনে, আর যৌবনের আবেগকে কবিতায়, রক্ষা করতে পেরেছিলেন অরুণ, প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত অবধি। অথবা, বলা ভালো, এতে ছিল না কোনো যাদু, ছিল শুধু যাদুর চেয়ে বিস্ময়কর অসামান্য এক সিদ্ধি। এ বিষয়ে মাত্র দুটি কথা বলাই আপাতত যথেষ্ট হবে।

অরুণ সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাংসারিক যে-উচ্চাভিলাষ অথবা স্বার্থবুদ্ধিতে চেতনার সরল সৌকুমার্য আমরা ধীরে ধীরে হারাই, বন্ধুত্বকেও পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হই এবং বহুবিধ ঈর্ষা ও গ্লানিকে বাস্তববুদ্ধির সমার্থক বলে বিবেচনা করি, অরুণের মন উচ্চাকাঙ্ক্ষাজনিত সময়ের সেই ক্ষয় ও বিকৃতি থেকে মুক্ত ছিল। অতএব তাঁর কৈশোর জীর্ণ হয়নি।

প্রথম যৌবনেই অরুণ সরকার সেই মানবতাবাদের দ্বারা আকৃষ্ট হন, যুক্তিতে যার আস্থা আছে। অথচ একথা তাঁর আবাল্যলালিত কাব্যবুদ্ধির কাছে অজ্ঞাত ছিল না যে, একটি গভীর আবেগ অথবা প্রেমই আমাদের চৈতন্যকে প্রাত্যহিকতার মলিনতা এমন কি অর্থহীনতা থেকে ত্রাণ করতে সক্ষম। অরুণের কবিতায় ও মননে এই দ্বৈত এক অসাধারণ অদ্বৈতে পরিণতি লাভ করে। ভালোবাসাকে অরুণ ভাবালুতার প্রাকৃতিক আবরণ থেকে উদ্ধার করে কাব্যে আহরণ করতে পেরেছিলেন ; যৌবনের আবেগ সেখানে তার স্বাভাবিক পচনশীলতা থেকে মুক্ত।

ভাবালুতাহীন শুদ্ধ আবেগ অরুণের কবিতার মূল বস্তু। পদ্মের কোমলতার কেন্দ্রে

একটি মণির কাঠিন্য, সেই সন্নিবেশকে প্রকাশ করার যোগ্য সুবিন্যস্ত ধ্বনিময়তা ও শব্দ নৈপুণ্য তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। নিঃশ্বাস সংযত ক'রে ধীরে ধীরে পড়তে হয় ; 'নির্জনে বেদনাস্থির স্তব্ধতার আলো-অন্ধকারে/ কথাগুলো নিয়ে আমি ছুঁড়ে দিই নিস্তরঙ্গ জলে।" যেন এক আশ্চর্য শূন্যতা থেকে আকার লাভ করছে ছন্দ-ও-ধ্বনিময়তার উপাদানে গঠিত শুদ্ধ আবেগের একটি শাব্দিক আধার। কখনো-বা কবি বলেন, 'সে-কোন নারীকে আমি ভালোবেসে ক্ষয়ে যেতে পারি ?' কিন্তু পর মুহূর্তেই শুনি, 'সে নারী কবিতা ? কথা ? অশরীরী শব্দের ব্যঞ্জনা ?' নারী ও কবিতা একাকার হয়ে যায়।

অরুণের যুক্তিধর্মী মন তাঁকে সুধীন্দ্রনাথের নিকটে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিশুদ্ধ আবেগ তাঁকে জীবনানন্দের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর ছন্দোময়তায় বিষ্ণু দের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বুদ্ধদেবের অন্তরঙ্গদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। অথচ অরুণের রচনার পরিমাণ প্রায় দুঃখজনকভাব অল্প। অতি নিপুণ কিছু গদ্যরচনা বাদ দিলে, 'দূরের আকাশ' (১৯৫২) এবং 'যাও উত্তরের হাওয়া' (১৯৬৫) এ-দুটি কবিতার বইই প্রধান। তিনি ছিলেন প্রধানত কবির কবি। বন্ধুরা অরুণকে ভুলবে না। আর উত্তরকাল যদি তাঁকে বিস্মৃত হয় তবে সেই ক্ষতি বাংলা কবিতার।

এযুগের বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব ও আইয়ুবের ভিতর একটি অপ্রকাশিত তর্ক আছে। পত্রালাপে তর্ক। আমি পড়িনি ; তবে দু'জনের মুখেই কিছু কিছু শুনেছি। সেখানে আইয়ুবকে পাই, প্রগতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করছেন যে মানুষ ধীরে ধীরে জ্ঞানের বৃহত্তর দিগন্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে, অগণিত অন্যায়কে অতিক্রম করে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে মানুষের সমাজ তবু বহুতর মানুষের জন্য অধিকতর ন্যায়ের অভিমুখেই চলেছে। এমন ধরনের আশাবাদে বুদ্ধদেবের মন সায় দেয়নি। বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, মানুষের আয়ু বেড়েছে, ক্রীতদাসপ্রথা আধুনিককালে ধিকৃত, মানুষের অধিকার অন্তত মৌখিকভাবে স্বীকৃতিলাভের পথে, এসব কথা তিনি জানতেন। কিন্তু মানুষের মনে শান্তি কি বেড়েছে ?

শান্তি কি সম্ভব ? এমন কি কাম্য ? বুদ্ধদেব নির্বাণ চাননি। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কবিতা তাঁকে টানত না। যুবতী স্ত্রী যেমন স্বামীর বৈরাগ্যসাধনাকে ভয় করে, বুদ্ধদেব তেমনই সাধুকবিকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারতেন না। জীবনকে যিনি অন্তরে পরম মধুময় বলে লাভ করেছেন, কবিতার মধুতে কি তার আর তেমন প্রয়োজন আছে ?

আধুনিক যুগ যাকে বিশেষভাবে শিল্প বলে জানে, গান্ধীজীর তাতে প্রয়োজন ছিল না। রাত্রির তারকাখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মানুষের শিল্পকে নগণ্য মনে হয়েছে। ভজন ও অনাবিল আকাশ, এই তো যথেষ্ট। বুদ্ধদেবের কাছে প্রকৃতি উন্মোচিত করেছে অন্য এক পরিচয়। যদি বা সে জননী তবু অপচয়ে বিবেচনাহীন, রমণীয় হ'লেও পচনশীল, অতএব বিশ্বাসঘাতক, তিক্ত ও কদর্য ; শিল্পে রূপান্তরিত হয়ে তবে সে মধুর ও সুন্দর। শিল্পের জন্যই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

দিবা ও রাত্রি দুই জ্বলন্ত কাষ্ঠ। এতে জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হচ্ছে। সাধু চান চিত্তকে এমন ভাবে তৈরি করতে যাতে এই দাহ তাঁকে স্পর্শ করবে না। শিল্পী রাতদিন দগ্ধ হন এবং সেই জ্বালাকে শিল্পে প্রকাশ করেন।

এই সাধুসন্তের দেশে এযুগের বুদ্ধদেব নির্বাণের চেয়েও সেই তৃষ্ণাকেই বরণীয় ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, কাব্যে যার ফলশ্রুতি।

৭

হে মহাজীবন, হে মহামরণ

মানুষ ! মানুষ !!

ছোটবেলায় নানা দৃশ্য যেমন গভীরভাবে মনে অঙ্কিত হত এখন আর তেমন হয় না। তবু সেদিনের কথা স্পষ্টই মনে পড়ে। ১৩ই মার্চ, ১৯৬৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে তাঁর অফিসঘরে একদল যুবক বন্দী করে রেখেছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব কথা সমস্বরে উচ্চারণ করছিলেন যা লিপিবদ্ধ করতে প্রবৃত্তি হয় না। ডঃ সেনের সঙ্গে অন্যান্য যে অধ্যাপকেরা ছিলেন আমিও তাঁদের একজন। বিক্ষুব্ধ যুবকদের কলহ যদিও উপাচার্যের সঙ্গেই তবু আমার বিরুদ্ধেও ওঁদের আক্রোশ তীক্ষ্ণস্বরে ধ্বনিত হচ্ছিল। মার্ক্স লেনিন ও গান্ধী সম্বন্ধে আমার মতামতের উল্লেখ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। আমার একাধিক প্রবন্ধে ওঁরা স্পষ্টতই ক্রুদ্ধ। আমাকে পুড়িয়ে মারবার ভয় দেখানো হচ্ছিল।

আমি খুব সাহসী লোক নই। চেষ্টা করলেও সম্ভবত শল্যচিকিৎসক হতে পারতাম না, কারণ রোগীর আর্তনাদ আমাকে কেমন বিমূঢ় করে ফেলে। তবে ব্যক্তিগত মৃত্যুর চিন্তা বহুকাল যাবৎই আমাকে তেমন ভীত করে না। কাজেই সেই সন্ধ্যার দৃশ্য দেখছিলাম অনেকটা নিরাসক্ত দর্শকের মন নিয়ে। আমার মনে পড়ছিল কয়েক শতাব্দী পূর্বের ইয়োরোপের ইতিহাসের এক হিংস্র অধ্যায়ের কথা। এক ধর্মমতের মানুষ সেদিন পরম উৎসাহে অপর মতের মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছে। তারপর যুগের পরিবর্তন হয়েছে; ভলতেয়র থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল পর্যন্ত অনেকেই অবিস্মরণীয় ভাষায় পরমত-সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু মানব প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন সহজে হয় না। বিপ্লবের নামে সেদিন আবারও মানুষকে জীবন্ত পোড়াবার ধ্বনি শুনছিলাম। আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম সেই মনকে যে-মনের গভীরে এই জিঘাংসার জন্ম।

যে-যুবকেরা সেই সন্ধ্যায় আমাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুবাক্য উচ্চারণ করছিলেন তাঁরা যে আদর্শবাদী এতে আমার সন্দেহ নেই। প্রেমই এঁদের হিংসাকে এমন কুণ্ঠাহীন করেছে। ইয়োরোপে যে ধর্মান্ধ মানুষেরা একদিন বিধর্মীকে পুড়িয়ে মেরেছিলেন তাঁরাও নিঃসন্দেহে আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন। প্রবল হিংসা ও আদর্শপ্রেমের এই সংমিশ্রণেই মানুষ অন্যান্য জীবের চেয়ে রহস্যময় ও ভয়ংকর। মানুষের মনে হিংসা ও প্রেমের এই মিশ্রণকে যদি না বুঝি তো মানুষকে বোঝা হয় না।

১

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, জীবনধারণের জন্য যতখানি হিংসার প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকটা বেশী পরিমাণ হিংসাই মানুষের প্রকৃতিতে আছে। এর কারণ সহজ। মানুষের মনের গভীর স্তরে জমা হয়েছে এক দীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকার, যখন মানুষ ছিল অজ্ঞ, ভীত, মারণাস্ত্রে দুর্বল। সেই বিপদসংকুল গণনাতীত দীর্ঘযুগের উত্তরাধিকারী আজকের পৃথিবীর মানুষ। যে-বর্বর অতীতকে আমরা বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় পিছনে ফেলে এসেছি আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতে তার আধিপত্য আজও অব্যাহত। মানুষের মনে সহজাত হিংসার পরিমাণ এ যুগের প্রয়োজন দিয়ে নির্ধারিত হয়নি। এ যুগ আমাদের শিখিয়েছে নতুন ভাষা। পুরাতনী হিংসাকে আমরা প্রকাশ করি এই নতুন ভাষায়।

অন্তর্ঘাতী হিংসায় মানুষ অন্যান্য বহু জীবকেই ছাড়িয়ে যায়। কলকাতার উপকণ্ঠে যেখানে আমার বাস, সেখানে মানুষে মানুষে খুনোখুনি লেগেই আছে। আমাদের বাড়ির পিছনে ধানক্ষেত। রাতে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। পাড়ার কুকুরের সঙ্গে শেয়ালের মাঝে মাঝে লড়াই লাগে। এক আধটা শেয়াল কখনও কখনও মারা যায়। কিন্তু কোনো কুকুর অন্য কুকুরকে খুন করেছে এমন চোখে পড়েনি। মানুষ যদি পারস্পরিক হিংসায় কুকুরের স্তরে উন্নীত হতে পারতো তাহলে আমাদের অঞ্চলে শান্তি বৃদ্ধি পেত।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মনুষ্য জাতির ভিতর অন্তর্ঘাতী হিংসার এই আধিক্যের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। মানুষের তুলনায় অন্য বহু জীবের দন্ত ও নখরের শক্তি বেশী, অর্থাৎ আঘাত করবার প্রকৃতিদত্ত সামর্থ্য তাদের অধিক। এসব জীবের হিংস্রতা যদি প্রধানত স্বজাতির বিরুদ্ধে চালিত হত তা হলে এতদিনে সম্ভবত এরা জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সৃষ্টির আদিপর্বের মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল জীব বলেই অধিক পরিমাণ পারস্পরিক হিংসা সত্ত্বেও জাতি রক্ষা করতে পেরেছে। আদিযুগে তাই মানুষের অন্তর্ঘাতী হিংসাকে সংযত করবার তাগিদ ছিল কম।

বিপদ দেখা দিল যখন মানুষের দুর্বল দন্ত ও নখরের সঙ্গে যোগ হল তার নিজেরই হাতে গড়া সেই মারণাস্ত্র, যুগের পর যুগ যার ধ্বংসাত্মক শক্তি বেড়েই চলেছে। প্রাক্‌সভ্যতা যুগে মানুষের প্রাণী হিসাবে দুর্বলতা ও হিংসার ভিতর যে স্বাভাবিক ভারসাম্য ছিল সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হ'ল। এ অবস্থায় মানুষের আদিম জিঘাংসাকে সামাজিক বাধা নিষেধ দিয়ে ক্রমশ সংযত ক'রে তবেই কোনো প্রকারে আত্মঘাতে মৃত্যুর হাত থেকে মানুষ নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছে। যে-পরিমাণে বিজ্ঞান মানুষের হাতে মারবার শক্তি বেশী ক'রে তুলে দিয়েছে সে-পরিমাণে হিংসার বিরুদ্ধে সামাজিক বাধা নিষেধের প্রয়োজনও বেড়েছে।

আমার বক্তব্য তবু এই নয় যে, অহিংসার মূলে আছে শুধু নেতিবাচক নীতি। মানুষের বৃহত্তম নৈতিক বিধানগুলির একটি নিম্নমাত্রা আছে যেখানে শুধু শুনি 'না', আবার একটি ঊর্ধ্বমাত্রা আছে যেখানে শুনি 'হাঁ'।

২

মানুষ সেই আশ্চর্য জীব যার হিংসার যেমন সীমা নেই তার প্রেমও তেমনই বাধা মানে না। কাকপক্ষীও শোকসভা করে; কিন্তু শুধু মানুষই পারে সকল মানুষের হয়ে সজ্ঞানে

ক্রুশবিদ্ধ হতে। মানুষই পারে এই আত্মত্যাগের কাছে যুগে যুগে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াতে।

সাংসারিক কর্মকাণ্ডে আমরা পরস্পরের সঙ্গে নানা সম্পর্কে আবদ্ধ। পদমর্যাদা নিয়ে ব্যক্তি যেখানে ব্যক্তির সম্মুখীন সেখানে তার দাবিদাওয়া, দায়িত্ব ও অধিকারের প্রশ্নটাই বড়। কিন্তু পদমর্যাদার বাইরেও মানুষের একটা অস্তিত্ব আছে। একথা জীবনের সাধারণ সময়ে হয়তো আমরা ভুলে থাকি ; তবু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে, প্রেম অথবা মৃত্যুর লগ্নে কিংবা কোনো শিশুতীর্থে, সেই সত্য আমরা স্মরণ করি। মানুষের মনের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে যেখানে সকল মানুষই সকলের স্বজাতি। এই স্বজাতির সঙ্গে যুক্ত হবার একটা বাসনা মানুষের মনের গভীরে আছে। এটা যদি মানুষের চিরন্তন বাসনা না হত তবে পৃথিবীর সকল মহৎ ধর্মে একটি বৃহৎ ভ্রাতৃত্বের সুর এমন শতাব্দীর পর শতাব্দী অবিরত ধ্বনিত হত না। মানুষের এই প্রীতি সম্ভবত হিংসার চেয়েও মৌলিক। মানুষ প্রীত হয় কারণে ও অকারণে ; কারণে, অর্থাৎ, স্বার্থের যোগাযোগে ; আবার অকারণে, অথবা অপরের ভিতর নিজেকে আবিষ্কার করবার ফলাকাঙ্ক্ষাহীন আনন্দে। হিংসার কারণ ভয়, যদিও যুগান্তরের পুঞ্জীভূত ভয়কে এই মুহূর্তের স্বার্থ নিয়ে সব সময়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

মানুষকে স্বার্থান্বেষী, সামান্য জীব হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এটা মানুষ সম্বন্ধে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ধারণা। মানুষের আদিম হিংসা স্বার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায় ; আবার তার ভ্রাতৃত্ববোধ সম্বন্ধেও সেই একই কথা সত্য। হিংসা যদি স্বার্থবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে না যেত তো এ যুগের বিশ্বজোড়া রক্তাক্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন হত। মানুষই সেই জীব যে হিংসা পুষে রাখে এবং অতীতের হিংসা নিয়ে অন্ধের মতো ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে। অন্যান্য জীবের ভিতর এটা কদাচিৎ দেখা যায় ; মানুষের ইতিবৃত্তে এটা নিত্যকার ঘটনা। আবার মানুষের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণের প্রকাশও অপূর্ব। মানুষের মন চায় মানুষের মন ; আর এই স্বাভাবিক আকর্ষণ যে মানুষের আদর্শ কল্পনায় স্থান পেয়েছে শুধু তাই নয়, ইতিহাসও এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে। স্বাদেশিকতার কবি ও দার্শনিক স্থাপন করতে চেয়েছেন এক জাতি, এক প্রাণ, একতা। জাতীয়তাবাদ মানুষের স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্ববোধেরই আংশিক প্রকাশ, বহু ক্ষেত্রে বিকৃত প্রকাশও বটে। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিতর পৃথিবীজোড়া যে ঐক্যবন্ধন, তাও অনুরূপ উপাদানে গড়া। যে-আদর্শ মানুষকে সাময়িক স্বার্থের ওপারে নিয়ে যায় তাকে ছাড়া মানুষ অসম্পূর্ণ। কিন্তু সেই আদর্শকে যখন স্থানে কালে সীমাবদ্ধ কোনো বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন ক'রে দেখা হয় তখনই বিপদ। ইতিহাসে বিকৃত আদর্শের প্রভাব অপরিসীম।

৩

মানুষের একটা দিক আছে যেটা কালে আবদ্ধ, বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার আর একটি দিক আছে যেখানে সে নিত্যকালের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে উন্মুখ। যে-মানুষ কালকে অতিক্রম করতে চায় তাকে বাদ দিয়ে যে-মানুষ কালে আবদ্ধ তাকেও বোঝা যায় না ; কারণ এ দুয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের ইতিহাস বিবর্তিত।

এ যুগে সাম্যবাদ মানুষের মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। আদর্শ সাম্যবাদী

সমাজে মানুষ বাইরের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে সৃষ্টিশীল কর্মের সূত্রে, শুদ্ধ মনুষ্যত্বের পরিচয়ে। মধ্যযুগের মানুষ স্বর্গের কল্পনায় বিভোর ছিল। সাম্যবাদ তথা নৈরাজ্যবাদ এ যুগের "উটোপিয়া" অথবা লৌকিক স্বর্গকল্পনা। মানুষের যে-মন আদর্শে সাড়া দেয় তাকে বাদ দিয়ে শুধু সাময়িক স্বার্থবুদ্ধি দিয়ে সাম্যবাদের আবেদন ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ভুল। মার্ক্সবাদী অবশ্য বিশ্বাস করেন যে তাঁর আদর্শের বনিয়াদ ইতিহাসের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়। কিন্তু ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী এই বিশ্বাসের যেমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, পৃথিবীতে আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এই ধারণারও তেমনই যুক্তিতে ভিত্তি নেই। আমরা যা প্রাণপণে চাই তাকে অবশ্যম্ভাবী বলে ভাবতে ভালোবাসি। আদর্শকে প্রাণপণে চাইতে পারায় মানুষের মহত্ত্ব। আদর্শের জন্য কর্মে এবং সেই কর্মে সামান্য সাফল্যেও মানুষের গৌরব। কিন্তু আমাদের দৃষ্টির সীমার ভিতর কোনোদিন সেই আদর্শ তার সম্পূর্ণতায় রূপায়িত হবে এই কল্পনাকে বিজ্ঞানসম্মত মনে করাটাই অবৈজ্ঞানিক। কাল ও কালাতীতের পারস্পরিক আকর্ষণেই আদর্শের সৃষ্টি।

তরুণ মার্ক্স একদিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, কর্মবিভাগই কর্মবন্ধন। তিনি দেখেছিলেন যে, শ্রমবিভাগ একদিকে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির জন্য অপরিহার্য ; আবার অন্যদিকে কর্মকে খণ্ড খণ্ড করে বাঁধাধরা নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ ক'রে মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর এই ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে এক কঠোর বন্ধন। জীবিকার জন্য এই ব্যবস্থায় আমাদের ঢুকতে হয়। তারপর চলে কাজের দিনে আমাদের বন্দীদশা। মার্ক্স তাঁর তরুণ বয়সের কোনো কোনো পুস্তকে এই ভাবটি সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী কালে যদিও কর্ম বিভাগের চেয়েও উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্নটিই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছিল তবু তাঁর তরুণ বয়সের সেই চিন্তা তিনি কখনও বিস্মৃত হননি। তাঁর আদর্শ সাম্যবাদী সমাজে কর্মবিভাগ থেকে তিনি ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছেন। সেখানে একই মানুষ "সকালে শিকার করবে, দুপুরে মাছ ধরবে, বিকালে মাঠে গরু চরাবে এবং সন্ধ্যায় আহারের পর (সাহিত্যদর্শনাদি) আলোচনা করবে।" কথাগুলি মার্ক্স নিজেই লিখেছিলেন। বাস্তব বুদ্ধিকে এখানে অতিক্রম করে গেছে কামনা শক্তি। মার্ক্সের নাম কণ্ঠে নিয়ে প্রথমে রুশ দেশে এবং পরে আরও একাধিক দেশে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। রুশ দেশে শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ হয়েছে অর্ধশতাব্দী আগে। কিন্তু মালিকানা লোপ পেলেই কর্মবিভাগ লোপ পায় না। কর্মবিভাগের ভিত্তি উৎপাদন ব্যবস্থার আরও গভীরে। তাই রুশ দেশেও কর্মবিভাগ ও কর্মবন্ধন তেমনই অব্যাহত যেমন অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশে। সেই সঙ্গে আছে নিয়মশৃঙ্খলা, রাষ্ট্র ও আমলাতন্ত্র। এখান থেকে সেই কল্পিত সাম্যবাদে যাবার পথ মার্ক্সই কি জানতেন? কিন্তু সেই স্বর্গ যে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে এই বিশ্বাসে মার্ক্সবাদী অটল। ইতিহাসের বিশ্লেষণ অনুষঙ্গ মাত্র ; বিশ্বাসের এই অটলতা আসে কালাতীত আদর্শের আকর্ষণ থেকে।

ধনতন্ত্র আদর্শ ব্যবস্থা নয় একথা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। বিশ শতকের "উটোপিয়া" সাম্যবাদী সমাজ। আমার কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদল সোভিয়েত পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতি অনুরক্ত। অন্যদল মূলত নৈরাজ্যবাদী। এঁরা জানেন যে, সোভিয়েত দেশের শ্রমিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিতর বিচ্ছেদ সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে এক অতি স্ফীত আমলাতন্ত্র। ওদেশের চাষীর সঙ্গে যৌথ খামারের আজও মনের মিল হয়নি। শিল্পী সাহিত্যিকের স্বাধীনতা ওখানে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারে অতিশয় খণ্ডিত। এ সব তথ্য প্রথম দলের বন্ধুরাও হয় তো সম্পূর্ণ অস্বীকার করবেন না। তবে

ওঁরা যুক্তি ফাঁদবেন যে, এ সবই ধনতান্ত্রিক সমাজচেতনার প্রলম্বন মাত্র। এ যুক্তিতে প্রকৃত অবস্থার কিছু তারতম্য হয় না। মোট কথা হিংসাত্মক বিপ্লবের আগুনে সমাজের বহিরঙ্গের যে অংশটা বিনাশ করা যায় তাতে অসাম্যের গভীরতর কারণ নির্মূল হয় না। বরং সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্রে অসাম্য নতুন সমর্থন খুঁজে পায়। তা ছাড়া দলীয় ক্ষমতার কাড়াকাড়ির প্রশ্ন বাদ দিলেও আর্থিক পরিকল্পনার রূপায়ণে কয়েকটি কঠিন সমস্যা এড়ানো যায় না। অধস্তন সমস্ত সংগঠনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে যথাযথ রূপদান করা কঠিন। এই কারণে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে একটা ঝোঁক দেখা দেয়। অথচ কেন্দ্রে ক্ষমতা যতই বৃদ্ধি পায় ততই অধস্তন সংগঠনগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিকল্পনার গুণাগুণ যাই হোক-না-কেন সেটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনা মনে হয়। পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ এতেও আবার অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। এ সমস্যার বিভিন্ন সমাধান সম্ভব এবং কোনো সমাধানই কার্যত সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। সাম্যবাদের এই বাস্তব চিত্রের সঙ্গে আদর্শ চিত্রের পার্থক্য বিস্তর। কিন্তু ভক্ত সাম্যবাদী এই বিকৃত বাস্তবের পিছনে এক অবিকৃত আদর্শের আসন্ন অভ্যুদয় নিয়ত অনুভব করেন।

৪

"উটোপিয়া"র একটি বিপদ আছে। মিথ্যা ধর্মের মতোই এ যুগের "উটোপিয়া" প্রেমের প্রচণ্ড শক্তিকে হিংসার দাসে পরিণত করেছে।

মানুষের মনের আদিম হিংসাকে সভ্যতা বহু যত্নে নানা বাধা নিষেধ দিয়ে সংযত ক'রে রাখে। যে-স্বার্থ শুধুই ব্যক্তিগত সেই ক্ষুদ্র স্বার্থের এত জোর নেই যে সভ্যতার স্বীকৃত বাধা নিষেধকে সে সদর্পে ও প্রবলভাবে অস্বীকার করে। আদর্শের নামে যখন হিংসাকে আহ্বান করা যায় তখনই সেই বিস্ফোরক শক্তির সৃষ্টি হয় যাতে সমস্ত নীতি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আমরা যখন একটি বড় ধারণাতে সমগ্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সেই আদর্শকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি স্থূল বাধাকে চরম বাধা ব'লে কল্পনা করি তখন সেই বাধা অতিক্রমের জন্য কোনো উপায়কেই আর নীতির দিক থেকে অগ্রাহ্য ব'লে মেনে নিতে পারি না। অতি বড় অন্যায় কর্মকেও তখন এত বড় একটা উদ্দেশ্য লাভের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে হয়। ঈশ্বরকে যতক্ষণ জগতের ঊর্ধ্বে অথবা ভক্তের অন্তরের জিনিস ভাবা যায় ততক্ষণ জাগতিক কলহে তাঁকে টেনে নামানো হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে যখন বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক ক'রে দেখা হয় এবং শত্রুমিত্র সেই সূত্রে নির্ধারিত হয়, তখনই বিপদের শুরু। সাম্যবাদী প্রচেষ্টাকে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব এমনই একটা ধর্মযুদ্ধের ব্যাপার ক'রে তুলেছে। শ্রেণী বিশেষই যদি পরম উদ্দেশ্য সাধনের পথে চরম বাধা হয় তবে তাকে সর্বপ্রকারে উচ্ছেদ করাই প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য ও উপায়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনায় তাই এ কথাটা প্রথমেই মনে রাখা আবশ্যক যে, কোনো স্থূল বাধাই আদর্শ সিদ্ধির পথে শেষ বাধা নয়। বিধর্মীকে আগুনে পুড়িয়ে ধর্মকে বিপন্মুক্ত করা যায়নি। হিংসাদ্বারা কখনও কোনো ফললাভ হয়নি এমন নয়। অহিংসা উচ্চতর নীতি হলেও আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য বলপ্রয়োগকে এক কথায় অন্যায় বলা যায় না। কিন্তু হিংসাদ্বারা কদাচিৎ দেশের কোনো স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়। বরং হিংসাকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করলে তারই ফলে শেষ উদ্দেশ্য সাধনের

পথে নতুন বাধা সৃষ্টি হয়। প্রতিক্রিয়াশীলদের নিধনের জন্য যে-অস্ত্র শানিত হয়েছে তাতেই আবার বিপ্লবীরা পরস্পরকে বিনাশ করেছেন। হিংসাকে পরিবর্তনের প্রধান অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলে পুরনো ব্যবস্থা যদি-বা ভাঙ্গে নতুন ব্যবস্থার মূলে হিংসা ও সন্দেহই থেকে যায়। এরই ভিত্তিতে স্বৈরাচারের নতুন সৌধ সৃষ্টি হয়।

প্রগতি নিশ্চয়ই কাম্য। বিজ্ঞানের অনুশীলন চাই, কারণ পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের সাহায্যে ধনোৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করা বাঞ্ছনীয়। শ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের ঘনিষ্ঠতা আবশ্যক, কারণ তা নইলে শ্রমে উৎসাহ আশা করা যায় না। উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসাম্য যত কমানো যায় ততই ভালো। এ সবই স্বীকার্য এবং এজন্য দেশজোড়া পরীক্ষানিরীক্ষা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতর্ক সংগ্রাম ও গঠনধর্মী কর্ম প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কঠিন সত্যটাও মনের এক কোণে জেনে রাখাই ভালো যে, সমাজ কখনও সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না ; মানুষের জীবনে দুঃখেরও কখনও অবসান ঘটবে না।

প্ল্যাটোর মতোই প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীরা দেহ ও আত্মার ভিতর বিভেদ করতেন। তাতে অপর সত্যাসত্য যাই ব্যক্ত হোক না কেন একটা মূল বিশ্বাস স্পষ্ট হত। মানুষের মনের মহত্তম অংশ একটি আদর্শের ধ্যানে অভ্যস্ত, যে-আদর্শ দেহ ও কালের সীমাবদ্ধতায় কখনও পূর্ণতা লাভ করে না। আত্মার অমরত্বের কথা বাদ দিলেও এই বিশ্বাসটিই অবশিষ্ট থাকে। আমাদের এই বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আত্মাকেও দেহেরই একটি গুণ মাত্র ভাবতে শিখেছি। অর্থাৎ, মানুষ যখন মহাকাশের যাত্রী হতে পেরেছে, একদিন যা কল্পনা ছিল আজ যখন তা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে, তখন মানুষের ক্ষমতার কোনো সীমাই আমরা আর মানতে রাজী নই। বাইরের সমস্ত বাধা সম্বন্ধে মানুষ, বিশেষত তরুণেরা, আজ অধৈর্য। অথচ বহিঃপ্রকৃতির উপর আমাদের কর্তৃত্ব যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, মানুষের অন্তরের আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করার পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। প্রকৃতির শক্তিকে আমরা চালনা করতে শিখেছি, কিন্তু হিংসার শক্তি এখনও অজিত। টেস্ট টিউবে ভ্রূণ সৃষ্টি সম্ভব কি না বিজ্ঞানের এই সাময়িক প্রশ্ন বাহ্য। এই মাটির আধারে দুঃখকে জয় করা যাবে কিনা বুদ্ধের সেই চিরকালের প্রশ্নই তুলছি। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের আয়ু বেড়ে চলেছে, কিন্তু সুখ কণামাত্র বেড়েছে কি না সন্দেহ। বরং এ যুগের বিজ্ঞান মিথ্যা আশার ছলনায় মানুষের মানসিক স্থৈর্যকে বিপর্যস্ত করেছে। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের গতি নেই ; কিন্তু অবাস্তব আশাও বিপদের কারণ হয়। কাজেই ধৈর্য ছাড়া উপায় কি ?

আমাদের মনের যে-ছদ্মবেশী হিংসা সব ভাঙতে চায় সে বলে যে, বিরাট ভাঙ্গনের ভিতর দিয়ে সম্ভব সমাজের মহৎ মুক্তি। কিন্তু এটা পাগলামি। ইয়োরোপে গত দু'শ বছরে যে-দেশগুলিতে বিপ্লবের ধ্বনি সবচেয়ে বেশী শোনা গেছে তারা অন্যদেশের তুলনায় কিছু বেশী এগিয়ে যায়নি। ব্যক্তির নিঃসঙ্গ অন্তরে হয় তো কখনও মুক্তি আসে প্রেমের প্রলয়ের ভিতর দিয়ে। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে পতনই সম্ভব সহসা, স্থায়ী উন্নতি ঘটে ধীরে ধীরে অপূর্ণতার সীমারেখা ধরে।

ধর্ম

সনাতন ধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যায় এমন একটা সংশয়হীনতা আছে, যা আমার কাছে অতিপরিচিত প্রবাদের মতন জীর্ণ মনে হয়। অতএব ধর্মচিন্তার বিপরীত মেরু থেকে আলোচনা শুরু করা যাক।

বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান ঘটনা 'শিল্প বিপ্লব', অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির দ্রুত পরিবর্তন ও পুনর্গঠন। এ যুগের আরম্ভে ভারত বিদেশীর কাছে পরাজিত হয়েছে। এদেশের প্রাচীনপন্থীরা এজন্য অধর্মের অভ্যুত্থানকে দোষী করেন ; আবার বিদেশীরা এতে তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ পান। ধর্মের প্রভাব যদিও অস্বীকার করা ভুল, যদিও স্বীকার করা ভাল যে আধুনিক যুগের গোড়াতেই ইউরোপ ধর্মের সংস্কারে বিপুল উদ্যম নিয়ে এগিয়ে গেছে আর আমরা নব জাগরণের প্রচেষ্টায় বহু পরিমাণে বিফল হয়েছি, তবু ঐ সব তর্কের এপারে প্রত্যক্ষ সত্য এই যে, শিল্প ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্বের শক্তিতেই ইয়োরোপ একালে বিশ্বকে পদানত করেছে। ব্যক্তিবিশেষের হয়তো 'দৈবশক্তি' থাকে ; কিন্তু সেই দৈবশক্তির সাহায্যে আজকের পৃথিবীতে কোনো দেশ দাঁড়াতে পারে না। সেজন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের শক্তি।

আমাদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বহুভাবে বিজ্ঞানচিন্তার পরিপন্থী। অবশ্য বিজ্ঞানের সঙ্গে 'বিশুদ্ধ' ধর্মচিন্তার বিরোধ নেই, একথা বলা হয়। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। তবু যে কথাটা দীর্ঘ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না সেটা হলো এই যে, যাঁরা বিশুদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করেন, তাঁরাও প্রায়শই বিচারহীন আচারের দাসত্ব মেনে নেন। প্রেমের দৃষ্টিতে সকল মানুষের মৌলিক ঐক্যের তত্ত্ব বাক্যে প্রকাশের পরও খুব কম হিন্দুই চণ্ডাল অথবা মুসলমানের সঙ্গে কায়ে ও মনে দূরত্ব রক্ষা করেন না।

আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা আছে। যে বিজ্ঞান আধুনিক সমাজকে বহু পরিমাণে গঠিত করেছে তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ব্যবহারিক ফল লাভ। আধুনিক যুগের গোড়া থেকেই বেকন থেকে মার্ক্স পর্যন্ত বহু চিন্তানায়ক একথা নানাভাবে বলে গেছেন। অর্থাৎ 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞান ও 'বিশুদ্ধ' ব্রহ্মোপলব্ধির ভিতর আমরা সমন্বয় সম্ভাবনা স্বীকার করি কি না, সেটা বিচার করাই যথেষ্ট নয়। বরং জাগতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কোনো সমাজ স্বভাবতই নিয়তির দ্বারস্থ হয় অথবা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে সেই সমস্যার সমাধানে যত্নবান হয়, সেটাই বিচার্য। আমাদের সামাজিক জীবনে এই অর্থে এখনও বিজ্ঞানের ভিত্তি দুর্বল। যিনি পেশার দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক, তিনিও প্রায়ই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা চালিত হন না। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, স্মরণীয়ভাবে, এই কথাটি বলেছেন নেহরু। আমাদের আচরিত ধর্ম, ব্যবহারিক অর্থে, বিজ্ঞান চেতনাকে অবসন্ন করে রেখেছে। এই দুর্বলতা থেকে দেশের চিত্তকে উদ্ধার করা যায়নি সনাতন ধর্মের নামে।

আধুনিক মন তাই ভগবানের প্রতি বিরূপ। অথচ এই বিরূপতাতেই আবার একটি নতুন প্রশ্নের সূচনা।

নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে জীবনের দিকে তাকালে যে ঘটনার চেহারা পালটে যায়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে প্রাথমিক প্রতীতির জন্য ধর্মালোচনার প্রয়োজন হয় না।

জীবনের সাধারণ ও সহজগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকেই এটা বোঝা যায়। যে সব ঘটনায় আমরা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিচলিত, সময়ের ব্যবধানে সে-সবই ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কালের দূরত্বে যখন ঘটনাকে আমরা জৈবিক ক্রোধ ও হতাশা অথবা সাফল্যের অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে অবলোকন করি, তখন জ্ঞান ও অনুভবের একটা রূপান্তর ঘটে। অনাসক্তদৃষ্টিজনিত এই রূপান্তরের ফলে সত্যের কোনো হানি হয় না। বরং একথাই আমরা মনে মনে জানি যে, জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যর্থতা যদি কালের শক্তিতে এমন করে শুদ্ধ, ধৌত ও তিক্ততা থেকে মুক্ত না হতো তবে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত।

জীবনধারণের একটা দৈনন্দিন গ্লানি আছে। আমরা প্রত্যেকেই মানুষের হৃদয়হীনতা, কপটতা, অকৃতজ্ঞতা, এমন কি অকারণ বৈরিতায় আহত। অথচ এই আহত চেতনা নিয়ে জগৎকে অথবা মানুষকে আমরা যে রূপে পাই, সেটাই তার একমাত্র অথবা সর্বাপেক্ষা সত্য রূপ নয়। জীবনকে সহনীয় ও মানুষকে গ্রহণীয় করবার জন্য জগতের অন্য একটি রূপ উপলব্ধির শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন হয়। ধর্ম একদিন অকারণ প্রেমের শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষকে এই শক্তি দান করতে চেয়েছিল। ধর্মের এই সান্ত্বনাই অগণিত মানুষের জীবনকে বহু শতাব্দী ধরে সহনীয় করেছে।

কুসংস্কারকে মনুষ্যত্ববিকাশের পথে বাধা বলে স্বীকার করা যায়, ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায় ; কিন্তু শুধু প্রাণধারণের গ্লানি থেকে জীবনকে মুক্ত করবার প্রয়োজন তবুও ফুরোয় না। যাঁরা মনে করেন যে, বৈষয়িক লাভের সাহায্যে এই প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব, তাঁরা এ বিষয়ে সত্য জানেন না। আমাদের মনের একটি অংশ আমরণ ভালোবাসা চায়। আমরা যতই ধনলাভ করি না কেন, যতই স্তাবকের দ্বারা পরিবৃত হই না কেন, তাতে ভালোবাসা লাভ হয় না। আমাদের এই চাওয়াটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি, বিদ্রূপ করতে পারি, এমন কি হনন করতেও উদ্যত হতে পারি ; কিন্তু তবু সে তৃষ্ণার মতনই আমরণ আমাদের সঙ্গী। মৃত্যুর মুহূর্তেও আমরা সেই তৃষ্ণার বারি কামনা করি।

অলৌকিক প্রেম অথবা করুণার শক্তিতে আমরা যখন বিশ্বাস হারাই তখনও জীবনকে বিবেকের দংশন ও ভালোবাসার পরাজয়ের অপমান থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন শেষ হয় না। এ যুগের বহু মানুষ এক বিকল্প বিশ্বাসের সাহায্যে এই অপূর্ণ বাসনার সংকট থেকে রক্ষা পেতে চাইছেন। নতুন বিশ্বাসটি হলো এই যে, আমাদের সমস্ত ব্যর্থতা ও মানুষের সকল বিচ্যুতির জন্য দায়ী মূলত 'সমাজব্যবস্থা' নামে একটি বস্তু। এই বিশ্বাসের জোরে মনের সঞ্চিত ক্লেশকে একটা বৃহত্তর হিংসা ও সংহতি বোধে রূপান্তরিত করা যায়। যদি সমাজব্যবস্থাকে সকল অন্যায়ের মূল কারণ হিসাবে দেখি তো অপর মানুষের প্রতি একপ্রকার তীব্র ঘৃণা অথবা সহানুভূতি বোধ করা সম্ভব হয়। অপর ব্যক্তি যদি এই সমাজব্যবস্থার ধারক হন, তবে তাঁকে ঘৃণা করা তো অপরাধ নয়ই, বরং কর্তব্য। যদি তিনি এই সমাজব্যবস্থার শিকার, তবে তাঁকে সমব্যথী হিসাবে গ্রহণ করা সহজ। নিজেকে যদি বিপ্লবী মনে করি তবে এই সমব্যথীদের সঙ্গে সংগ্রামী ঐক্য বোধ করাও স্বাভাবিক। যে-ক্রোধ অথবা অসূয়া, ক্ষুদ্র কলহরূপে, জীবনকে তিক্ত করতে পারত তা যখন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে চালিত হয়, তখন ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির এই বৃহৎ সামাজিক রূপান্তরে একটা সিদ্ধির আস্বাদ লাভ করা যায়, যেটা অধার্মিকের পক্ষে ধর্মোন্মাদনার সমতুল।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আবশ্যক। কিন্তু সমস্ত অন্যায় ও অসুখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে বিশেষ একটি সমাজব্যবস্থার কল্পনা এ যুগের নতুন পৌত্তলিকতা। মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা ভগবানের অস্তিত্বের পক্ষে বহু যুক্তির

অবতারণা করেছিলেন। এইসব যুক্তিতে সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় ছিল। তবু ভগবানে বিশ্বাস, মূলত যুক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল না। বস্তুত যুক্তির দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। এ যুগের বিশ্বাস, সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সাহায্যে জীবনকে গ্লানিমুক্ত করা যাবে। এর সপক্ষেও যুক্তির বিস্তার কম হয়নি। তবু যুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয় আধুনিক যুগের এই নতুন বিশ্বাস।

ধর্মের যেমন একটা ভয়াবহ দিক ছিল, আধুনিক যুগের এই যুক্তিহীন বিশ্বাস অথবা দুরাশারও তেমনই একটা বিপজ্জনক পরিণাম আছে। এই বিশ্বাসের যূপে আমাদের শতাব্দীতে যত মানুষ বলি হয়েছে, ধর্মান্ধতার প্রাচীন ইতিহাসেও তার তুলনা বিরল। বিজ্ঞান যেমন বিশ শতকে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়, বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজের পুনর্গঠন যেমন আজ আমাদের একটি বড় কর্তব্য, জড় জগৎ ও সমাজব্যবস্থার কাছ থেকে মাত্রাহীন প্রত্যাশাও তেমনই এ যুগের প্রধান কুসংস্কার। এরই বিকল্প রূপ—রাষ্ট্রপূজা। ঈশ্বরের 'মৃত্যু'কে যখন আমরা মনে মনে স্বীকার করে নিই, তখন ঘাতক যুক্তির বিরুদ্ধে মানুষের স্বভাবিক ধর্মীয় আবেগ প্রতিশোধ খোঁজে এক নতুন জড়বাদী অসহিষ্ণুতায়। এই অসহিষ্ণুতা ধর্মান্ধতার সহোদর। এর বিকৃতি ঘটে সেই ব্যক্তিপূজায়, যা বিজ্ঞানচিন্তার এমনই বিপরীত যে, তুলনায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে বৈজ্ঞানিক ও নিরাপদ বোধ হয়।

শুধু এই কারণেই পুনরায় ধর্মে, অর্থাৎ দেশ ও কালের অতীত কোনো বিধাতায়, বিশ্বাস স্থাপনের প্রশ্ন ওঠে না। সুবিধা অসুবিধার যোগফলের ওপর বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কিন্তু ভগবানকে যদি-বা ত্যাগ করা সম্ভব, জীবনধারণের সংগ্রামের পাশে জীব ও জগতের প্রতি একটি অকারণ করুণা ও বিস্ময়বোধকে স্থান দেওয়া ছাড়া মুক্তির উপায় নেই। এই বিস্ময়বোধের যাদুতেই জীবন প্রাত্যহিকতার স্পর্শে মলিন ও ক্রমশ অসহনীয় হয় না। এই করুণার প্রভাবেই জীবকে অস্থির অন্যায়কারী জেনেও আমরা তার ভিতর একটা বিফল অন্বেষণের বেদনা অনুভব করি। যখন জগৎকে বিস্ময়বোধের এবং জীবকে অহেতুকী প্রীতির যোগ্য বিবেচনা করা যায়, তখন উভয়ই এমন একটি নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয় যার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ নেই, কিন্তু নিছক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে যা স্বতন্ত্র। এই যদি ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের ভিত্তি হয়, তবে এই সমন্বয়ে আধুনিক মানুষের প্রয়োজন আছে।

পল্লী ও নগর (১৯৭৩)

ধর্ম ও যুক্তি

১

ক

ধর্ম এবং যুক্তির ভিতর একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। কখনো এরা সমন্বয়ে পৌঁছয়, কখনো নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর একটা বাইরের রূপ আছে, একটা ভিতরের রূপ। সংসারে কিছু মানুষ ধর্মবিশ্বাসী, কেউ বা ধর্মকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এটা বিভেদের বাহ্যরূপ। মনের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তিবাদের যে বিতর্ক দেখা দেয়, সংশয়ের ঝড় ওঠে, সেটা বাইরের রূপ। কারো ক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস জয়ী হয়েছে, কেউ হন নিরীশ্বরবাদী।

দুটোই বিশ্বাসের এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু বিশ্বাসেরই নয়, দ্বন্দ্বেরও মূল্য আছে। মনের ভেতর যে সংশয় আমাদের অস্থির করে, তারও নিজস্ব মহত্ত্ব আছে। যাঁরা চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মচেতনাসম্পন্ন, তাঁদের অনেকেরই মানসলোক একটা তীব্র দ্বন্দ্বের দ্বারা সমৃদ্ধ। বিশ্বাস ও সংশয় দুয়েরই মূল্য আছে। এদের কী করে মেলানো যায়, সেটাই সমস্যা।

বিষয়টা স্পষ্ট করবার জন্য দুয়েকটি উদাহরণ যথেষ্ট। বেরট্র্যাণ্ড রাসেল এ-যুগের প্রখ্যাত নাস্তিক বলে পরিচিত। কিন্তু কী গভীর বেদনায়, কত তীব্র অন্তরদ্বন্দ্বে, সেই নাস্তিক্য বিধৃত, আমরা অনেকেই সে-কথা মনে রাখি না। ১৯১৬ সালের ২৩শে অকটোবরের একান্ত ব্যক্তিগত একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—The centre of me is always and eternally a terrible pain....a searching for something beyond what the world contains, something transfigured and infinite—the beatific vision—God. I do not find it, I do not think it is to be found...'ঈশ্বরের অনস্তিত্বের এই ঘোষণা এমন আর্তনাদের ভাষায় এখানে ধ্বনিত হয়েছে যে, সিদ্ধান্তের চেয়েও তার পিছনে যে-বেদনা আছে সেটাই স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। এ কোনো আত্মসন্তুষ্ট নিরীশ্বরবাদ নয়। আবার নিশ্চিত নিঃসংশয় ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের মন্দিরভাষণ থেকে কয়েকটি বাক্য শোনা যাক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে, তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি।' রাসেল অথবা রবীন্দ্রনাথ, কে কখন কোন্ সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, সেটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। চেতনার ভিতরে যে দ্বন্দ্ব তাঁরা আজীবন বহন করেছেন, তার তাৎপর্য গভীর। সিদ্ধান্তের চেয়েও জিজ্ঞাসার গুরুত্ব বেশি, প্রশ্নই চেতনাকে দেয় গতি। প্রশ্নের গভীরতায় বিশ্বাসও গভীরতা পায়।

ধর্ম ও যুক্তির যে দ্বন্দ্ব তার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এরপর উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে ধর্ম ও যুক্তি দুয়েরই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোনোটিরই বিনাশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। দ্বন্দ্ব দুই রকমের হয়। একরকমের দ্বন্দ্ব বিনাশাত্মক ; অর্থাৎ একপক্ষের সম্পূর্ণ বিনাশই সেখানে লক্ষ্য। আরো একরকমের দ্বন্দ্ব আছে। সেখানে ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে দুই পক্ষের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু কোনো পক্ষই বিনষ্ট হয় না। বরং দুই পক্ষই সম্ভবত দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয়। এই রকমের দ্বন্দ্বকে বলা যেতে পারে সমন্বয়মুখী। কোনো বিশেষ দ্বন্দ্বকে আমরা, কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি সেটা জরুরি প্রশ্ন। কারণ সমগ্র দৃশ্যপটই দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভর করছে।

সম্প্রতি কম্যুনিস্ট-শাসিত সমাজেও ধর্মের প্রতি নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। পৃথিবী থেকে ধর্মবিশ্বাসীরা দূর হয়ে যাবেন, এমন ধরনের নাস্তিক্যের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবার বাস্তব সম্ভাবনা নেই। যুক্তিবাদীরাও থেকেই যাবেন। এঁদের সবাইকে পাশাপাশি বাস করতে হবে। সহাবস্থান যেখানে অনিবার্য সেখানে পরস্পরকে বুঝাইবার একটা ঐকান্তিক প্রয়াস বাঞ্ছনীয় এমনকি আবশ্যক। শ্রদ্ধাহীন সহবাসের মতো বিড়ম্বনা কমই আছে।

ধর্মের যাঁরা মিত্র তাঁরা নিশ্চিতভাবে যুক্তির শত্রু, এর রকমের কোনো প্রত্যয় থেকে আলোচনা শুরু করা অন্যায় হবে। যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী, তাঁরা সবাই যুক্তিবিরোধী নন। অনেকেই যুক্তির প্রয়োজন মানেন। অন্তত যুক্তির প্রতি একটা উভয়বলতা, একই সঙ্গে মান্যতা ও সাবধানতা, তাঁদের ভিতর উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। এই ব্যাপারটা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করা দরকার।

রাজা রামমোহন রায় ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে কোনোমতেই যুক্তিবিরোধী বলা যায় না। বরং যুক্তিবিচারের একটা ধারা তাঁর চিন্তায় ও কর্মে প্রত্যক্ষ। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ববিষয়ে আলোচনায় যুক্তির সুর সুস্পষ্ট। তাঁর সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ বর্জন যাই করি না কেন, একথা মেনে নিতে হয় যে, বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যে এমন যুক্তিধর্মী লেখা বেশি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভিতরও একটা স্পষ্ট যুক্তিবাদী প্রত্যয় লক্ষণীয়, এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

এইমাত্র যে উভয়বলতার উল্লেখ করা হয়েছে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ। 'রাজযোগ' নিয়ে আলোচনায় বিবেকানন্দ বলেছেন—'We find one fact held in common by all the great teachers of religion the world ever had. They all calim to have got their truths from beyond...The Yogi teaches that the mind itself has a higher state of existence, beyond reason, a superconscious state, and when the mind gets to that higher state,then this knowledge, beyond reasoning, comes to man.' অর্থাৎ চেতনার একটা স্তর আছে, যেটা যুক্তিকে অতিক্রম করা যায়। ধর্মের সত্য বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সেই স্তর থেকেই লাভ করা যায়। তবে কি মেনে নিতে হবে যে, যুক্তিবিচারের অধিকারের বাইরে ধর্মের প্রতিষ্ঠা? বিবেকানন্দ কিন্তু সেকথাও বলছেন না। বরং আশ্চর্য এক বিপরীত উক্তি আমরা তাঁর মুখে শুনি। 'যুক্তি ও ধর্ম' (Reason and Religion) এই নামে ইংল্যাণ্ডে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন : 'Is religion to justify itself by the discoveries of reason, through which every other science justifies itself? Are the same methods of investigation, which we apply to sciences and knowledge outside, to be applied to the science of Religion? In my opinion this must be so, and I am also of the opinion that the sooner it is done the better. If a religion is destroyed by such investigation it was then all the time useless, unworthy superstition; and the sooner it goes the better ...All that is dross will be taken off, no doubt, but the essential parts of religion will emerge triumphant out of this investigation.'—উপরের উদ্ধৃতি দুটি কি পরস্পরবিরোধী? নাকি দুইয়ের ভিতর সামঞ্জস্য সম্ভব? সেই আলোচনায় পরে অগ্রসর হওয়া যাবে, আপাতত একটি কথাই বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন যুক্তিকে ত্যাগ করা চলবে না। যুক্তির আলোতে ধর্মেরও বিচার চাই। সেই বিচারের ভিতর দিয়ে ধর্ম শুদ্ধ হয়ে উঠবে, যা-কিছু কেবলই কুসংস্কার, তা সবই পরিত্যক্ত হবে। এমনই হওয়া আবশ্যক। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন—'বেদের যতখানি অংশ যুক্তিযুক্ত, আমি ব্যক্তিগতভাবে ততখানি গ্রহণ করি।'

অতএব রামমোহন থেকে শুরু করে গত শতকের ধর্মজিজ্ঞাসার ধারায় যুক্তির প্রয়োজন বারবার স্বীকৃত হয়েছে। এমন কারো মনে হতে পারে যে, পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের সঙ্গে রফা করবার জন্য এদেশের উনিশশতকী ধর্মসংস্কারকরা যুক্তিকে এক অনিচ্ছুক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু একথা বললে রামমোহনের মতো মানুষের প্রতি অবিচার করা হয়। কোনো এক আন্তরিক প্রেরণা থেকেই এঁরা ধর্ম ও যুক্তির ভিতর সামঞ্জস্যস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, এই প্রেরণা একান্তভাবে আধুনিক এমন বলা যাবে না। রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে অন্ধভাবে কোনো বিনিশ্চয়ে উপনীত হওয়া কর্তব্য নয়; যুক্তিহীন বিচারে সত্যলাভ হয়

না ; বরং ধর্মহানি ঘটে। বুদ্ধি ও বিচারকে ত্যাগ করে বিবেক গঠিত হতে পারে না। এই প্রত্যয় বুদ্ধ, বৃহস্পতি কিংবা আদি শঙ্করের মতো প্রাচীনদের বাণীতে বারবার বহুরূপে ধ্বনিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভিতরই কোথাও এর স্থান আছে, এ-কথা মেনে নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ভালো।

অর্থাৎ ধর্ম ও যুক্তিকে অনড়ভাবে দুই বিপরীত শিবিরে স্থাপন করে একরকমের অন্ধ ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সার্থক আলোচনার তাতে সম্ভাবনা অল্প। যদিও এই দুয়ের পার্থক্য স্বীকার্য, মতের সম্পূর্ণ ঐক্য যদিও আশা করা যায় না, তবু ধর্ম ও যুক্তির ভিতর সংলাপের প্রয়োজন আছে। এদের সংলাপ ফলপ্রসূ হতে পারে, এই বিশ্বাস অমূলক নয়। সব সার্থক আলোচনারই ন্যূনতম শর্ত হল, নিজের প্রতি বিশ্বস্ততা আর অপরের প্রতি সামান্য সহানুভূতি।

সহানুভূতির সঙ্গে স্বানুভূতির বিরোধ নেই। এদের যোগ ছিন্ন হলে ব্যক্তির উচ্চারণে সততা থাকে না। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে গেলে আর্ষবাক্য যতই সহায়ক হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত নিজের উপলব্ধির প্রতি বিশ্বস্ততার বিকল্প নেই। আমারই চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অনিবার্যভাবে সীমাবদ্ধ এই আলোচনা, সেই সীমা অতিক্রম করবার অধিকার আমার নেই। ভূমিকায় এই স্বীকারোক্তি করে নেওয়া সঙ্গত।

খ

বিশ্বের কয়েকটি প্রধান ও বহু আলোচিত ধর্মে ঈশ্বর থেকে শুরু হয় ধর্মের কথা। আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, বাইবেলের আরম্ভেই পাই এই বাক্য। আল্লার নাম নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে কোরানের বাণী। ঈশ্বর ছাড়া ধর্মের ভিত্তি নেই। যাঁদের এই ধারণা তাঁদের কাছে নাস্তিক, অধার্মিক, নিরীশ্বরবাদী, এইসব শব্দ সমার্থক। অন্য রকমের প্রত্যয়ের ওপরও ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সে কথায় পরে যাব।

যুক্তি অথবা দার্শনিক বিচার দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবার চেষ্টা বহুদিন থেকেই চলেছে। আমরা সেই ইতিহাসে ঢুকব না। আঠারো শতকে ইউরোপে যখন যুক্তিবাদের জোয়ার এল, সেই সময়কার একটু উল্লেখ তবু আবশ্যক। সে সময়ে পাশ্চাত্যদেশে যুক্তি ও ঈশ্বরচিন্তার ভিতর সমন্বয়সাধনের এক তাৎপর্যময় প্রয়াস দেখা যায়, বাঙলাদেশের প্রাগ্রসর ধর্মচিন্তায় উনিশ শতকে যার প্রভাব এসে পৌঁছেছিল।

সতেরো শতক থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্রুত হয়ে উঠল আর তারই সঙ্গে যোগ নতুন যুক্তিবাদের। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে বাঁধা। সবকিছুই চলমান আর বিশ্বের অংশস্বরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কিছুই নিয়মের বাইরে চলে না। সৌরমণ্ডলের সূর্যসহ পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ যে পরস্পর সম্পর্কে যুক্ত, এই যোগের সূত্রগুলি যে গণিতের ভাষায় যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায়, অযুতনিযুত বৎসর ধরে সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে এই নিয়মই যে ঘোষিত হয়ে চলেছে, এই আবিষ্কার মানুষের চেতনায় একটা দিব্য বিস্ময়ের মতো এসেছিল। সৌরমণ্ডলের যে ছবি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর অভ্যন্তরেও দেখা গেল যেন তারই প্রতিচ্ছবি। আবার সৌরমণ্ডলও যে-বিশ্বজগতের অতিক্ষুদ্র অংশ, সেই মহাবিশ্বে আছে নিয়মের রাজত্বের সীমাহীন সম্প্রসারণ।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাওয়া গেছে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা। অতি প্রকাণ্ড, অতি সূক্ষ্ম এক যন্ত্রের মতো চলেছে এই মহাবিশ্ব, যার ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতিটি অঙ্গ যেন

এক বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। মানুষের তৈরি কোনো নিখুঁত যন্ত্রের মতোই এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে প্রভেদ এইখানে যে জ্যোতির্মণ্ডলের প্রকাণ্ডতায়, পরমাণুর ক্ষুদ্রতায়, তার সর্বব্যাপী গূঢ় সামঞ্জস্যের অব্যর্থ নৈপুণ্যে, মহাবিশ্ব এক অতুলনীয় পরমাশ্চর্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ভিতরই প্রচ্ছন্ন আছে স্রষ্টার পরিচয়।

ধর্ম নিয়ে একটি সংলাপ (Dialogues Concerning Natural Religion) রচনা করেছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক হিউম। সেই সংলাপের অংশবিশেষ এইরকম : 'Look round the world, contemplate the whole and every part of it; you will find it to be nothing but one great machine, subdivided into an infinite number of lesser machines... All these various machines, and even their most minute parts, are adjusted to each other, with an accuracy which ravishes into admiration all men who have ever contemplated them. ...the Author of nature is somewhat similar to the mind of man, though possessed of much larger faculties, proportional to the grandeur of the work which he has executed.' —এইভাবে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে একটা যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে। যুক্তিটা মূলত এই : মহাবিশ্ব যন্ত্রের মতো চলেছে। এর অভ্যন্তরে এতই সামঞ্জস্য, অগণিত অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এতই সূক্ষ্ম যোগাযোগ ও পরস্পরনির্ভরতা, যে এ সবের পেছনে একটা তুলনাতীত শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধি ও সৃষ্টিকৌশল নেই—এমন ভাবা যায় না। ঈশ্বরই স্রষ্টা, অতি সূক্ষ্ম নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই জগতের স্রষ্টা।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা কিন্তু যুক্তিবাদী গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের অনুবর্তী, কার্যকারণের সূত্রে বাঁধা, একথা বৈজ্ঞানিক মানবেন, যেহেতু বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধানই বৈজ্ঞানিকের সাধনা। নিয়ম যদি না থাকত, তবে তো নিয়মের অনুসন্ধান অর্থহীন হত। কিন্তু জগতের এবং জাগতিক নিয়মসমূহের স্রষ্টা হিসাবে জগদীশ্বরের কল্পনা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে আবশ্যক নয়। কোনো-কোনো বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর মানেন, কেউ-কেউ মানেন না। যাঁরা মানেন না, তাঁদের সেই কারণে বৈজ্ঞানিক সাধনায় কোনো অসুবিধা ঘটে এমন দেখা যায় না। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে উপকল্প বিজ্ঞানের পক্ষে অনাবশ্যক। রামমোহন বলেছিলেন, বিভিন্ন ধর্মের ভিতর যেখানে মিল, যেখানে সামঞ্জস্য, ধর্মের মূলবস্তু সেইখানেই, যেখানে অমিল, ধর্মের সারবস্তু সেখানে নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এইরকম বিচার অন্যায় হবে না। নিয়মে বিশ্বাস আছে সব বিজ্ঞানচর্চায়, সেটা বিজ্ঞানের সার। ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ভিতর বিভেদ আছে ; সেটা বিজ্ঞানের সারবস্তু নয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা এসে যায়। রামমোহন নিজে ব্রহ্মবিশ্বাসী ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি বহু বৎসর যাবৎ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, মূলত প্রকৃতির নিয়মেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তিনিও অবশ্য একসময় বলেছিলেন,—'জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা।' সেই সঙ্গে যুক্তিবাদী হিসেবে তিনি যোগ করেছিলেন, জগদীশ্বর 'কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অনুরোধে কোনো নিয়ম অতিক্রম করেন না।' এখানেই একটা মৌল প্রশ্ন আবার এসে যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস যদি বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে অত্যাবশ্যক না হয়, আর জগতের নিয়মের কারণস্বরূপ প্রকল্পিত জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনাও যদি নিরর্থক হয়, তবে বাস্তব দৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রয়োজন কোথায় ? প্রকৃতিবিজ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের যে কল্পনা, তার মূল্য সম্বন্ধে তাই

থেকেই যায়।

আজকাল অনেকে বলছেন যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড়পদার্থ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণায় একটা গভীর পরিবর্তন এসে যাচ্ছে, চেতনা ও জড়পদার্থের ভিতর দূরত্ব ক্রমেই যেন মুছে যাচ্ছে। কেউ কেউ এইখানে ঈশ্বর-বিশ্বাসের এক নতুন ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছেন। মূল প্রশ্ন তবু থেকে যায়। গণিতই এই বিজ্ঞানের ভাষা। অর্থাৎ যা পরিমাপ করা যায়, তাই নিয়ে বিজ্ঞানের কাজকর্ম। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানীর ধ্যেয় বিশ্বের একটা মৌল ভেদ আছে। ঈশ্বর অপরিমেয়। শিখধর্মের ভাষায় তিনি 'অকাল' অর্থাৎ কালাতীত। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিধির ভিতর এই ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব? প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বর প্রকৃতির ঊর্ধ্বে এবং তিনি সর্বশক্তিমান। প্রাকৃতিক শক্তির বাইরে এরকম কোনো ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে প্রমাণ করা যায়—একথা যুক্তিবাদী মানবেন না।

ঈশ্বর থেকেই ধর্মচিন্তা শুরু করতে হবে এমন কোনো বাধ্যতা কিন্তু নেই। অন্তত ভারতীয় ঐতিহ্যে ভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম ঈশ্বরচিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দুঃখ আছে, এই সত্য থেকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুরু হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক সম্ভব; দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কঠিন। সংশয়বাদীরাও দুঃখের অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসংশয়।

প্রেয়োবাদীদের লক্ষ্য, যথাসম্ভব সুখের বর্ধন। যা কিছুতে মানবসমাজে সুখের সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটে, সেটাই নীতি হিসেবে গ্রাহ্য, সুনীতি। নিরীশ্বরবাদীরা বহুকাল থেকেই সুখবাদ বা প্রেয়োবাদের প্রতি আকৃষ্ট। আবার বঙ্কিমচন্দ্রও এই সুখবাদ থেকে আলোচনা শুরু করে ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-নামে দীর্ঘ আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ে, 'ধর্ম কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলছেন, 'ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে, অন্য উপায় নাই।' সুখবাদ থেকে আলোচনা আরম্ভ করবার একটা সুবিধা এই যে এতে করে ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদীরা একত্রে যাত্রা করতে পারেন। তবে সেই যাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হবে—এমন কোনো কথা নেই।

একরকমের সুখ আছে যা ইন্দ্রিয়নির্ভর। জৈবসুখের এটাই ভিত্তিভূমি। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' যাঁরা বলেন, তাঁদের কথা শুরু হয় ঐ ভিত্তি থেকে। কিছু অবস্থা জৈবসুখের অনুকূল, কিছু প্রতিকূল। প্রতিটি ব্যক্তি স্বভাবত এমন চেষ্টাই করে থাকে, যাতে অবস্থা যথাসম্ভব নিজ সুখের অনুকূল হয়।

প্রেয়োবাদী দর্শনে মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। এই মতবাদ কি মানুষকে সুখের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে?

প্রেয়োবাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর মূল সমালোচনা যেটা শোনা যায় তা হল এই যে, সুখেরও প্রকারভেদ আছে। নানা রকমের সুখের ভিতর গুণগত তারতম্য আছে, কাজেই তাদের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে সর্বাধিক সুখ নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, গুণবিভাগের তাত্ত্বিক আলোচনায় সরাসরি না গিয়ে বরং সংসারের বাজারটা প্রথমে একবার ঘুরে এলে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত সম্ভবত আরো একটু নির্ভরযোগ্য হবে। শেষ অবধি বিচার অনিবার্যভাবে সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে তবে ভূমির স্পর্শ থেকে আরম্ভ করাই ভালো।

প্রেয়োবাদী প্রত্যয় মেনে নিলে একটা মূল সমস্যা এইরকম। প্রতি ব্যক্তি নিজ-নিজ

সুখবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত। কিন্তু এক ব্যক্তির সুখবৃদ্ধির চেষ্টায় অন্যব্যক্তির সুখের হানি ঘটতে পারে। সামগ্রিকভাবে সমাজের সুখবৃদ্ধিই সুনীতির উদ্দেশ্য। কোনো বিশেষ মানুষের নয়, বরং সকল মানুষের সুখের যোগফল বৃদ্ধি করাই সমাজের কর্তব্য। যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত, সেখানে সকলের সুখের ব্যবস্থা কী করে হবে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কথা পরপর বলা সম্ভব।

মানুষের অনেক কাজই ব্যক্তিগত স্বার্থে হয়ে থাকে। এইরকম সব কাজই অপরের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এমন নয়। পারস্পরিক স্বার্থে আবদ্ধ হয়ে আমরা এমন কাজ করি, যে-সব কাজ সকলের পক্ষেই কমবেশি লাভজনক। যেমন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের অনুসরণ করে। তবু এই ক্রয়বিক্রয়ের ভিতর দিয়ে সকলেরই কমবেশি স্বার্থসিদ্ধি হয়। উভয়পক্ষের স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব বলেই উভয়পক্ষই বাজারে উপস্থিত হয়। অবশ্য বিক্রেতা অন্যায়ভাবে ক্রেতাকে ঠকাতে পারে, তেলে ভেজাল তার এক উদাহরণ। এইরকম অন্যায় ঠেকাবার জন্য রাষ্ট্রকে আইন তৈরি করতে হয়, অন্যান্য ব্যবস্থাগ্রহণও আবশ্যক হয়ে ওঠে। আইন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সমাজে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চাই, যে পরিবেশের ভিতর বিভিন্ন মানুষের স্বার্থসন্ধানী চেষ্টা মোটের ওপর ক্ষতিকর না হয়ে হিতকর হবে। স্বার্থবুদ্ধিকে উপযুক্ত আইন ও প্রতিষ্ঠান দিয়ে ঘিরে দিতে পারলেই আমরা বাঞ্ছিত সমাজের যথাসম্ভব কাছাকাছি চলে যাব। এককালে প্রেয়োবাদীরা এইরকম বলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এমন আইন ও প্রতিষ্ঠান কি রচনা করা সম্ভব, যাতে ছিদ্র নেই, পাপের প্রবেশপথ নেই ? আইনের ভিতরও ত্রুটি থেকেই যায়। তাছাড়া আইনের উদ্দেশ্য ভালো হলেও স্বার্থসন্ধানী মানুষ আইন ফাঁকি দেবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করে। সমস্যাটা আসলে আরো গভীর। ফাঁকির সব পথ যদি বন্ধ করা যেত তবু কিন্তু সেটা বাঞ্ছনীয় অবস্থা হত না। নিশ্ছিদ্র আইন এবং আইনের প্রহরী দিয়ে বেষ্টিত সেই সমাজ হয়ে উঠত একটা বৃহৎ কারাগার।

যদি স্বার্থবুদ্ধি অথবা বাইরের নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান অথবা এ দুই-এর কোনো প্রকার সমাবন্ধের দ্বারা মানুষের দুঃখনিবারণ সম্ভব হত, তবে ধর্মের প্রয়োজন সহজেই অস্বীকার করা যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। বাইরের কোনো নিয়ম ও ব্যবস্থাই বিবেক ও সদিচ্ছার বিকল্প হতে পারে না। এইখানেই অনেকে ধর্মের প্রয়োজন দেখেন। স্বার্থান্বেষী মানুষকে কর্তব্যবোধে ও পরার্থচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ধর্মের একটা ভূমিকা আছে, এইরকম অনেকে বলেন। ধর্মের সপক্ষে এটাই সরল যুক্তি। মানুষের সমাজকে একসঙ্গে ধরে রাখবার জন্য স্বার্থ অথবা ব্যক্তিগত সুখের অন্বেষণের অধিক কিছু মূল্যবোধ আবশ্যক। ধর্ম এই সমাজধারক মূল্যবোধের আধার।

এমন অনেক যুক্তিবাদী আছেন, যাঁরা এইরকম মূল্যবোধের প্রয়োজন অস্বীকার করবেন না। কিন্তু এজন্য ধর্মের দ্বারস্থ হতেও সম্মত হবেন না। শুধু ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের অন্বেষণ নয়, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, অপরের দুঃখে দুঃখবোধ—এইসবও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই পরার্থমুখী বৃত্তির বিকাশ ও প্রয়োগের ভিতর দিয়ে একরকমের গভীর সুখ অনুভব করা যায়। স্বার্থপরতাই সুখলাভের শ্রেষ্ঠ পথ নয়। ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, স্বার্থেরও স্তরভেদ আছে। উচ্চতর সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক উচ্চতর স্বার্থ। যুক্তিবাদী এই পর্যন্ত স্বীকার করবেন। কিন্তু তিনি হয়ত বলবেন যে, যুক্তিই আমাদের এই উচ্চতর স্বার্থের পথে চালিত করতে পারে। এজন্য ধর্মের পরিভাষা নিষ্প্রয়োজন।

নাম অথবা পরিভাষা দিয়ে তর্ক আপাতত স্থগিত থাক। মূল কথাটার দিকে আবারও দৃষ্টি ফেরানো যাক। এইমাত্র যাকে মানুষের উচ্চতর সুখ ও স্বার্থ বলা হল, কীভাবে তার সাধন সম্ভব? বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, এই পথেই মানুষের সুখও পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য প্রয়োজন—অনুশীলন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাষা। এইখানে দাঁড়িয়ে তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যার অনুপুঙ্খে আমরা প্রবেশ করব না।

সমাজসংস্কারক ও বিপ্লবী দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত অনুশীলনের চেয়েও সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্ব বেশি। সাম্যবর্ধক একটা সামাজিক কাঠামো, আইনের শাসন ও মানুষের কিছু বিধিবদ্ধ অধিকার, এইসব প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তের স্বার্থবুদ্ধি নয়, মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি আরো মৌল ও মূল্যবান। একথা স্বীকার করে নেবার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, এসবই কি যথেষ্ট?

এই শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরিবর্তন যদিও কাম্য তবু শাসনব্যবস্থার কোনো অবস্থান্তরই শেষ অবধি মানুষের আশা পূর্ণ করে না। কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনই সুখ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সোভিয়েত সাম্যবাদী দেশে আজ শিক্ষার বিস্তারের পরও ধর্মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠেছে। এর নিশ্চয়ই একাধিক কারণ আছে। বাইরের তন্ত্র, শাসন ও উপকরণের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের আশানুরূপ হিতসাধন ঘটে না, এই কষ্টার্জিত উপলব্ধি সম্ভবত ধর্মের প্রতি আগ্রহবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। চেতনার স্তরেও পরিবর্তন আবশ্যক।

এখানে একটা আপত্তি অনুমান করা যায়। চেতনার পরিবর্তন তো আপনি ঘটে না, সেটা ঘটে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে, অতএব বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তনটাই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এইরকম একটা কথা অধিকাংশ জড়বাদীর মুখে শোনা গেছে। কথাটা কিন্তু অর্ধসত্যের বেশি কিছু নয়। চেতনার ভেতরই একটা শক্তি আছে, বেগ ও গতি আছে, যেটা তাকে স্তর থেকে স্তরান্তরে ঠেলে দেয়। পরিস্থিতি কখনো এই গতির পথে সহায়ক হয়, কখনো প্রতিবন্ধক। কিন্তু কোনো বাধাই শেষ অবধি এই গতিকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করতে পারে না। আবার বাইরের কোনো সহায়তায়ও সাফল্য পূর্ণতা লাভ করে না। বাস্তব উপকরণের সাহায্য নিয়ে তবেই মানুষের মুক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব, এই চিন্তা অবস্থাবিশেষে এমন-কী প্রতারক হয়ে ওঠে। উপরকরণই আবদ্ধ করে, উপকরণের হাত থেকেও চেতনার মুক্তি প্রয়োজন।

মানুষের ধর্ম এই, সে নিজেকে বারবার অতিক্রম করে যায়। এই অতিক্রমণের ব্যাপারে যুক্তির ভূমিকা যে সহায়ক হয় একথা স্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য একটা কথাও আছে। যুক্তির একক শক্তিতে মানুষের বিশ্ববোধ ও মূল্যবোধের উল্লম্ফন ঘটে না। অন্য কোনো পথে ব্যক্তির চেতনায় নতুন অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির উদয় ঘটে। যুক্তি নিজস্ব বিচারপদ্ধতিতে তাকে শনাক্ত করে, মূল্য ও স্থায়িত্ব দেয়। এমনকি গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উচ্চতর সৃজনশীল কাজে এইরকম লক্ষ করা গেছে। শিল্প ও ধর্মের বেলায় এটা আরো স্পষ্ট। স্বজ্ঞা ও যুক্তির যুগ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার পথে এইভাবে যে ব্যাপারটা ঘটে তার পরিচয় দিতে গিয়ে পরিভাষা নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়, তর্কেরও তাই শেষ নেই। ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াটা বুঝে নেওয়াই আসলে জরুরি। যুক্তির ভূমিকার গুরুত্ব আছে। স্বজ্ঞার নাম নিয়ে অনেক মিথ্যা দাবি ও অন্ধসংস্কার এসে পড়ে। যুক্তি সেখানে প্রয়োজনীয় দ্বাররক্ষী আবার আলোচনার মূল্যবান মাধ্যম। কিন্তু স্বজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যুক্তি সত্যের পথে বেশি দূর আরোহণ করতে পারে না।

সুখদুঃখের প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা সুনীতিদুর্নীতির বিষয় ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। গোড়ার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। চার্বাক সুখ চেয়েছিলেন ; বুদ্ধ চেয়েছিলেন দুঃখ দূর করতে। অথচ চার্বাক ও বুদ্ধের ভিতর পার্থক্য অনেক। বুদ্ধ দুঃখের কারণ খুঁজেছিলেন মানবপ্রকৃতিতে এবং বিশ্বপ্রকৃতির কিছু মৌল বৈশিষ্ট্যে। চার্বাকের মতে সুখের চাবি আছে বাইরের সম্পদে, বাহ্য পরিস্থিতিতে। এ যুগের প্রেয়োবাদীরা জগতে সুখের বৃদ্ধি চান। চার্বাকের সঙ্গে এঁদের কিছুটা মিল আছে। মার্কসবাদীরা alienation অর্থাৎ 'পারক্য' বা বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা বলেন। দুঃখের আলোচনায় এইখানে অন্য একটা মাত্রা যোগ হয়েছে। সমাধানের চিন্তায় তবু পুরনো প্রশ্নটাই থেকে গেছে। মার্কসীয় ধারণায় বিচ্ছিন্নতাবোধের মূল কারণগুলি পাওয়া যাবে মানুষ্যসমাজের বাহ্য অবস্থায়। Towards Marx পুস্তকে প্রবীণ মার্কসবাদী অধ্যাপক সুশোভন সরকার যথার্থই বলেছেন : 'Marx thought that the root of alienation lay not in the nature of man, not in his ideas, but in the concrete conditions of social life. The corollary follows that, by changing social life, in an appropriate way, man can overcome alienation.' মার্কস দুঃখের মূল খোঁজেননি মানবপ্রকৃতিতে অথবা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো বৈশিষ্ট্যে। দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ নিহিত আছে বাহ্য সামাজিক অবস্থায়। কাজেই বহু জড়বাদীর এই বিশ্বাস যে সামাজিক ব্যবস্থার যথাযোগ্য পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে সুখের প্রতিষ্ঠা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের দূরীকরণ সম্ভব। এই বিশ্বাসকে কিন্তু নিত্যসত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না।

দারিদ্র্য যে অনেক দুঃখের কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র্য দূর হলেও দুঃখ দূর হয় না। সমাজে বহু অন্যায় ব্যবস্থা আছে, যার অবসান আবশ্যক। দুঃখ দূর হোক বা না হোক, অন্যায়কে সমর্থন করা যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন এ যুগের এক প্রধান কীর্তি. এদেশের এক প্রধান কর্তব্য। এসবই স্বীকার্য। কিন্তু তারপরও একথাটা মেনে নেওয়াই ভালো যে, দুঃখের ও বিচ্ছিন্নতাবোধের কোনো সমাজসর্বস্ব ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। সমাজের কোনো প্রকার পরিবর্তনেই দুঃখের সমস্ত মৌল কারণ দূর করা সম্ভব নয়। এ কথাটা না বোঝা অবধি এই বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের অবস্থাটা ঠিক বোঝা হয়ে ওঠে না। ধর্মান্ধতা থেকে যেমন পারলৌকিক মোহের সৃষ্টি হয়, দুঃখনাশের সমাজসর্বস্ব পথের প্রতিশ্রুতিও তেমনি একরকম লৌকিক মোহের কারণ হয়ে ওঠে। একটি মোহ অন্যটিকে ব্যঙ্গ করে চলেছে।

গ

মানুষের সুখদুঃখের অনেকটা প্রেম, জরা ও মৃত্যুতে আশ্রিত। সমাজের কোনো পরিবর্তনের ফলেই মানুষকে অমর করা যাবে না, গৃহে-গৃহে প্রিয়জনের মৃত্যুকে রোধ করাও সম্ভব হবে না। মানুষের আয়ু অবশ্য আরো দীর্ঘ করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রেম নেই, সেখানে আয়ুর দীর্ঘতায় সান্ত্বনা সামান্যই। জরা ও মৃত্যু আছে শুধু দেহেরই নয়, ভালবাসারও। একদিন যে-ভালবাসা ছিল উষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত, ক্রমে সে তার উষ্ণতা হারায় ; অভ্যস্ত প্রিয় সম্ভাষণ হয়ে ওঠে যান্ত্রিক, সততাশূন্য ও অর্থহীন। দুটি প্রেমকে জরা গ্রাস করে না একই গতিতে, একটি ক্ষয়িষ্ণু হৃদয়ের অনিবার্য শীতলতার সাক্ষী হয়ে

থাকে অন্য এক অসহায় ও বেদনাবিদ্ধ ভালোবাসা। মানুষের অনেক কঠিনতা ও অনেক কান্নারই মূল এইখানে।

জরা ও মৃত্যুর বাইরেও ব্যর্থতার অন্ত নেই। মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোনো বাহ্য কৌশলেই অসামঞ্জস্য দূর করা যায় না। আমরা প্রত্যেকেই যেমন অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, তেমনি আকাঙ্ক্ষা করি নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যের স্বীকৃতি। সেই মূল্য সম্বন্ধে নিজের বিচার আর অপরের বিচারের ভিতর মিল হয় না। যদি-বা স্বীকৃতি আসে, তবু কতবার দেখা যায় তারও পিছনে আছে স্বীকৃতিদাতারই স্বার্থ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগ অপূর্ণ থেকে যায়।

এসব কিছুই ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, প্রকৃতির এইরকমই নিয়ম। আমরা এসব জানি আর মনে-মনে সাবধান হয়ে উঠি, কিন্তু সাবধানতায়, অন্তরে-অন্তরে আমরা আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। আধুনিক মনের এক প্রধান যন্ত্রণা—একাকিত্ব। যুক্তি দিয়ে একে ঠেকানো যায় না, বাইরের সাফল্য দিয়েও নয়। আমরা তাই বিস্মিত হই না, যখন রাসেলের আত্মজীবনীতে পাঠ করি এই স্বীকারোক্তি : 'Always the secptical intellect, when I have most wished it silent, has whispered doubts to me. Underlying all occupations and all pleasures I have felt since early youth the pain of solitude.' যুক্তি কিংবা সতর্ক বুদ্ধির অভাবে নয়, বরং তার প্রভাবেই, রাসেল নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রথম যৌবন থেকেই। একাকিত্বের যে বেদনা তিনি অন্তরে বহন করেছিলেন, সেটা নিতান্ত ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা নয়। বরং তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, সেই বেদনাকে তিনি একটা সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আরো অগণিত মানুষ শুধু ক্ষতবিক্ষত হয়, অসহ্য কষ্টে বিকৃত হয়, অন্তরের সেই বোবা যাতনায়।

আধুনিক সুখবাদের ভিত্তিতেই সংলগ্ন হয়ে আছে একটা অনিবার্য সমস্যা। প্রেয়োবাদ শিক্ষা দেয় সুখদুঃখের ব্যাপারটাতে হিসেব করে চলতে, হিসেব করে দুঃখ এড়াতে এবং সুখ বাড়াতে। কিন্তু এই হিসেবী দৃষ্টিভঙ্গিই আবার স্নেহপ্রেমের শক্তিকে একেবারে মূলে দুর্বল করে দিতে পারে। প্রয়োগবাদী জীবনদর্শনের প্রভাবে আমরা অতিমাত্রায় কৌশলে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি পদ্ধতিনির্ভরতায় ও সাফল্যের আকাঙ্ক্ষায়। কিছু বাহ্য সাফল্য হয়তো ঐভাবে লাভ করা যায়। কিন্তু আমাদের চেতনা হারায় অন্য এক গুণ। সাফল্যের আকাঙ্ক্ষাতেই আমরা প্রতিবেশী ও সহকর্মীর কাছ থেকে ভিতরে-ভিতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, আমাদের সংবেদনশীলতা সংকীর্ণ হয়ে আসে। যেখানে কৌশলের প্রশ্নটা প্রধান, সেখানে সবকিছুই হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যসাধনের উপকরণস্বরূপ। এর ফলে বিশ্বের সঙ্গে ঘটে আমাদের অনাত্মীয়তা। ব্যক্তির সত্তাকে গ্রাস করে নেয় এমন এক শূন্যতাবোধ যাকে কোনো কৌশলেই আর ঠেকানো যায় না। আধুনিক সুখবাদ ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টি যদিও নিজেকে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বলে দাবি করে তবু এইভাবে মানুষকে সে শেষ অবধি অস্তিত্বের এক গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই সংকট এ যুগে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। একে ছোটো করে দেখা ভুল। বাইরের সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও মানুষকে এতে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছে আত্মহননের দিকে। এটা সার্বিক বিনাশের পথ। এরই ভিতর থেকে আবার ঠেলা দিয়ে উঠছে এমন একটা প্রশ্ন, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার যেটা এক মূল প্রশ্ন। বিশ্বের সঙ্গে আন্তরিক পারক্যবোধের সীমা কি অতিক্রম করা যায় না ? এই অতিক্রমণের পথে কি মানুষ লাভ করে না অন্য এক

সত্য ? সেই সত্যই কি অবশেষে মানুষকে ভয় ও বিনষ্টি থেকে রক্ষা করে না ?

স্বার্থ ও সাংসারিক উদ্দেশ্যনির্ভর যে-দৃষ্টি, সেটাই একমাত্র দৃষ্টি নয়। একরকমের নিরাসক্ত দৃষ্টিতেও বিশ্বের দিকে তাকানো যায়। স্পিনোজো সেইভাবে তাকাতে চেয়েছিলেন। তাঁকে কেউ-কেউ ঈশ্বরমত্ত বলেছেন। এই বর্ণনা সঙ্গত বলে মনে হয় না। বরং একরকমের শুদ্ধ যুক্তিনির্ভর আধ্যাত্মিকতার স্বাক্ষর তাঁর চিন্তায়। সেইভাবে তাকিয়ে তিনি দেখেছিলেন বিশ্বময় সামঞ্জস্য, কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য নেই, নিয়মের কোনো ব্যত্যয় নেই। আমরা ক্ষুব্ধ হই, কাতর হই, কারণ আমাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। কিন্তু যদি ভাবি যে, এই বিশ্ব তো আমার জন্য হয়নি, যদি ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বিশ্বের অন্তহীন পথপরিক্রমার দিকে তাকাই, তবে বিশ্বজোড়া সামঞ্জস্যময়তা আমাদের অন্য এক বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। চিত্তকে যে-মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগত বাসনা থেকে মুক্ত করে, সেই মুহূর্তে অন্য এক অপ্রত্যাশিত অনাস্বাদিত আনন্দে চিত্তের সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সাংসারিক সুখদুঃখের সঙ্গে এই আনন্দের মৌল প্রভেদ আছে। এইখানেই আমরা আধ্যাত্মিকতা ও চিত্তশুদ্ধির যে-ধারণা পাই তার সঙ্গে যুক্তির কোনো বিরোধ নেই।

আপত্তি উঠতে পারে, সাংসারিক আকাঙ্ক্ষাবর্জিত এই দৃষ্টি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের ভিতর নয়। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'জ্যামিতিক' প্রমাণের ভিতর আবদ্ধ করে স্পিনোজা তাঁর বিশ্বদৃষ্টিকে যে বিশেষ রূপ দিয়েছেন, সেই দার্শনিক উচ্চতা ও প্রসার নিশ্চয়ই অসামান্য। কিন্তু সাংসারিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বজগতের দিকে তাকানোটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, আর কিছুই স্বাভাবিক নয়, এই ধারণা সংসারী মানুষের একটা অভ্যস্ত সংস্কার। আসলে মনুষ্যপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর যে-সম্পর্ক তাতে স্বাভাবিকভাবেই নানা উপাদান মিশ্রিত হয়ে আছে। শিশু জন্ম থেকেই সংসারী হয়ে ওঠে না। সে শিশুর দৃষ্টি নিয়েই বিশ্বের দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টিতে একটা সরল বিস্ময় আছে। ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে সাবধানী হতে শেখে। শিশুরও চেতনা মিশ্র উপাদানে গঠিত। একদিকে সে সবকিছুকে সহজে আপন করে নেয় ; অন্যদিকে সে খামখেয়ালি, অনায়াসে নিষ্ঠুর। বড়ো হয়ে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক আচারে আর হিসেবি সতর্কতায় সে অভ্যস্ত হয়। হিংসাকে সে গোপন করতে শেখে, আর সেই সঙ্গে সবকিছুকে আপন করবার শক্তিও সাবধানতার আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যায়। তবু বিশ্বের প্রতি ঐ সহজ বিস্ময়বোধ এবং আত্মার আত্মীয়তাবোধ সাংসারিকতার শত আক্রমণেও মানুষের মন থেকে একেবারে লুপ্ত হতে চায় না। অতিসাধারণ মানুষের ভিতরও এইসব কিছু-কিছু থেকে যায়।

শৈশবই মনুষ্যত্বের জনক। ধর্মের সঙ্গে এর একটা গূঢ় সংযোগ আছে। যীশুখ্রীষ্ট শিশুদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখতে বলেছিলেন। সেটা শুধু বাইরের দ্বার নয়, ভিতরের দ্বারও। সংসারী মন পৃথিবীকে চেনে লাভক্ষতির হিসেব দিয়ে। বয়স্কদের জীবনের অনেকখানি জুড়ে আছে ঐ হিসেবি মন। তবু এরই ভিতর আমরা কখনো কখনো অকারণে আনন্দিত হয়ে উঠি। শুধু চোখ মেলে আলোর দিকে চাওয়ার মধ্যেই একটা চির নতুনের আনন্দ আছে। 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।' আসলে শৈশব শুধু একটা বিশেষ বয়সেরই নাম নয়, একটা প্রতীকী অর্থেরও দ্যুতি আছে ঐ শব্দের মধ্যে। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে। দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে।' এইসব গান যে আমাদের মনের ভিতর কোথাও একটা স্পন্দন জাগাতে

পারে, তাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্য এক অনুভূতির পৃথিবী এখনও আমাদের মধ্যে মৃত নয়। শৈশব ও কৈশোরের উপাদানে গঠিত এই পৃথিবী, উপেক্ষিত হয়েও মূল্যবান। এ যদি না থাকত, সংসার তবে ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। সংসার বেঁচে আছে এক উপেক্ষিত অকারণ প্রেমের অলক্ষিত সিঞ্চনে। এরই অভাবে সমৃদ্ধির মধ্যেও আমরা শুনি হাহাকার, জাগতিক সাফল্যের মধ্যেও দেখি বিস্তৃত এক ব্যর্থতাবোধ।

শৈশব যদিও জড়ত্বনাশী, তবু মানুষের ধর্ম এই দিয়ে পূর্ণ হয় না। শিশুর ভিতর যে অকারণ আনন্দ ও বিস্ময়ের শক্তি আছে, সে মূল্যবান হয়েও আত্মরক্ষায় অসমর্থ। নিজের ভিতর যে অমূল্য সম্পদ আছে, শিশু তাকে মূল্যবান বলে চেনে না। মনুষ্যত্বের রক্ষার জন্য তাই শৈশবকে অতিক্রম করে যেতে হয়। শিশুর মধ্যে স্থিরতা নেই, সহজে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সংসারের নানা কাঠিন্য ও সমস্যার ভিতর দিয়ে আশা ও উদ্যম রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হয় অন্য এক দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও সাধনা। মানুষের কত শ্রেষ্ঠ প্রয়াস তো ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আমাদের ভিতর যাঁরা সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, তাঁদেরও মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্রূপের কণ্টকের মুকুট। এইসব সাময়িক অথচ অনিবার্য ব্যর্থতা ও ধিক্কারের ভিতরও বিশ্বাস রক্ষা করা যাবে কোন্ শক্তিতে ?

মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রয়াস তা ব্যক্তিবিশেষের কর্মে আবদ্ধ নয়। তার সঙ্গে যোগ আছে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের। আজকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কাজের পিছনে আছে অতীতের বহু বিজ্ঞানীর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পর্যায়ক্রমে সাধনা। যে ভাষায় আমরা নিজেকে প্রকাশ করি, সেই ভাষা কণায়-কণায় গড়ে উঠেছে বহু প্রজন্মের ভিতর দিয়ে। কালের পরীক্ষায় কিছু রক্ষা পেয়েছে, কিছু পরিত্যক্ত। যে-সব আদর্শ আজ আমাদের অনুপ্রাণিত করে তার পিছনেও আছে দীর্ঘযুগ ধরে অনেক মানুষের সাধনা ও আত্মত্যাগ। কোনো বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সমসাময়িক মানুষের কাছে প্রশংসা ও ধিক্কার যাই লাভ করুন না কেন, তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি সমকালকে অতিক্রম করে যায়। মনে-মনে তাঁরা যুক্ত হন বৃহত্তর এক সত্তার সঙ্গে। সেই সত্তা যে মানুষের সমগ্র ইতিহাসকেই ব্যাপ্ত করে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারও পিছে আরো কী আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠনের সঙ্গে মানুষের আদর্শের যোগ কতখানি—সেবিষয়ে তর্ক সম্ভব। তার কোনো মীমাংসা আশা করা যায় না। প্রমাণ-অপ্রমাণের সম্ভাবনাশূন্য সেই তর্কে আমরা আপাতত প্রবেশ করছি না। যে-কথা অনেকখানি নিঃসংশয়ে তবু বলা যায়, সে কেবল এই : ইতিহাসের ধারায় বাহিত যা-কিছু শক্তি সবই সঞ্চারিত হয়েছে মানুষে। মানুষের অন্তরে তার অধিষ্ঠান। আধ্যাত্মিকতার যে ধারণা এইসব নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে মানবতাবাদের বিরোধ থাকবার কথা নয়। বেদান্ত বিষয়ে ১৮৯৬ সালের এক বক্তৃতায় বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন : 'যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই ধর্ম যদি তাহার সহায়ক না হয়, তবে তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন নাই। ...প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে সে-ই নাস্তিক।' এইখানে মানবতাবাদীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিল উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বের অনন্ত বিস্ময়করতা, নিয়মে বিধৃত নিপুণ সামঞ্জস্য আর ভ্রান্তিশীল মানুষের বহু নিদারুণ ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তীর্ণ হবার অদম্য প্রয়াস, এইসব মিলে উদ্‌ভাসিত হয় কারুণ্যে ও লাবণ্যে মিশ্রিত অন্য এক জগৎ, যাকে মূল্য দিতে শিখে আমরা জীবনের মূল্য খুঁজে পাই। এর বেশি অতিপ্রাকৃত যা-কিছু দাবি করা হয়,

সেইসব ছাড়াই ধর্ম সম্ভব। ধর্মের নামে প্রবঞ্চনার নিদর্শন তো ইতিহাসময় ছড়িয়ে আছে। তবু যে মানুষ ধর্মের কাছে ফিরে-ফিরে গেছে সেটাকে কেবলই কুসংস্কার বললে মানুষের প্রতি অন্যায় করা হয়। সাংসারিক ও নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের ঊর্ধ্বে মানুষের উচ্চতর আদর্শ ও প্রয়াসের যদি কোনো আশ্রয় থাকে, তবে তাকেই মহত্তর অর্থে ধর্ম বলা যেতে পারে। এই ধর্ম মানবধর্ম। সম্প্রদায়বিশেষকে ধারণ করে এর কাজ সম্পূর্ণ হয় না। বরং মনুষ্যজাতির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যক্তিকে ধারণ করে এই ধর্ম। যে ধর্মে এ কাজ হয় না তার সঙ্গে যুক্তির বিবাদ থাকাই ভালো। শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নিঃস্বার্থ যুক্তির বিরোধ নেই।

২

ক

ধর্মের মূলে একটা বিচিত্র সংকট আছে। সে বিষয়ে সবাই সচেতন নয়। বিশ্বাসের সারল্য ধর্মের এক প্রধান উপাদান। সেই সরলতা মূল্যবান। তবু বয়স্ক প্রজ্ঞার জন্য আরো কিছু প্রয়োজন। প্রথমে সহজ বিশ্বাসের ভিতরও যে সত্য আছে সেই কথাটা ধরে সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া যাক। তারপর ধর্মসংকটের চরিত্র নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে।

এ কথা আবারও ব্যাখ্যা করে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্ম বলতে সর্বত্র ঈশ্বরবিশ্বাস বোঝায় না, বরং মুক্তি অথবা নির্বাণ সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণাই আরো মৌল। সাংসারিক সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে অন্য এক আনন্দ বা দুঃখনিবৃত্তি ভারতীয় ধর্মের মূল কথা।

অভিজ্ঞতার এই যে অন্য স্তর, এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে কিছু অতিরিক্ত ভেদমূলক চিন্তা সমাজে এসে গেছে। এমন মনে করা হয় যে, উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা শুধু ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব। আমাদের ধরাছোঁয়ার মধ্যেই কিন্তু অনুভূতির নানা স্তর আছে। বিভিন্ন স্তরের অনুভূতির ভিতর গুণগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মুক্তি বলতে যে অভিজ্ঞতা বোঝায়, অন্তত কিছু পরিমাণে সেটা সাধারণেরও লভ্য। ধর্মকে কতিপয় অসাধারণ মানুষের পথ বলে মেনে নেওয়া, অথবা অধিকাংশ মানুষ পরীক্ষায় ফেল করেও কয়েকজন মহান্তের মধ্যস্থতায় কোনোক্রমে পাশ করে যাবে এই রকম বিশ্বাস করা, ধর্মের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক। বাস্তব ঘটনা এই যে, একই মানুষ অভিজ্ঞতার একাধিক স্তরে বাস করে, তবে অনেক সময় মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে সে মূল্যবান বলে চিনে নিতে পারে না। ধর্ম যদি কিছু পরিমাণেও সাধারণ মানুষের জীবনে এই মূল্যবোধের সংস্থাপনে সাহায্য করে তবেই ভবিষ্যতের সমাজের দৃষ্টিতে সেই ধর্ম মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। ধর্মকে সাধারণের লভ্য করতে গিয়ে যদি তাকে কুসংস্কার করে তোলা হয়, তবে সেই যুক্তিহীন ধর্মকে বিবেকানন্দের ভাষায় "unworthy superstition" বলে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়। ধর্মের সঙ্গে যুক্তির মেলবন্ধনের প্রয়োজন এইখানেই।

ধর্মের মূলে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আছে, এ দেশের ভক্তিআন্দোলনের সন্তরা তাকে বলেছেন, প্রেম। শুধু এ দেশের নয়, সবদেশের ধর্মেই এটা একটা প্রধান কথা। আধ্যাত্মিক প্রেমের কিছু বিশেষ লক্ষণ আছে। এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যে বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে পাই 'agape' শব্দটি, সেটা 'eros' থেকে পৃথক। ঐতিহ্য আশ্রিত শব্দ ক্রমে অতিশয় রহস্যাবৃত হয়ে

পড়ে। এই আবরণ থেকে উন্মুক্ত করে বিষয়টা সহজ ভাবে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার।

আধ্যাত্মিক প্রেম জৈব উদ্দেশ্য দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়, সারা জগতে ছড়িয়ে পড়াই তার স্বভাব। বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা যেমন বিশ্বের প্রতি প্রসারিত এও সেইরকম। যে প্রেমের এই গুণ নেই, ঈর্ষা যার ছায়া, তাকে বিশ্বপ্রেম বলা যাবে না। সন্তরা বলেছেন, সকল জগৎ "আমাতে" এসে মিলেছে, অথবা ভাষান্তরে, "তাতে" মিলেছে। বিশ্বের সঙ্গে এই একাত্মবোধ, এই মিলনমুক্তি আধ্যাত্মিক ভাবের বৈশিষ্ট্য। সন্তদের প্রেম, বিশ্বপ্রেম।

প্রথম দৃষ্টিতে একে অবাস্তব মনে হতে পারে। বিশ্বপ্রেম সাধারণের লভ্য নয়, এইরকম বোধ হতে পারে। কিন্তু বিশ্বকে জানবার ইচ্ছা যেমন মানবশিশুর মনে সুপ্ত থাকে, যদিও কয়েকজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের ভিতর তার বিশেষ বিকাশ ঘটে, বিশ্বকে ভালোবাসার ইচ্ছাও সেইরকম। সদর্থক ধর্মবিশ্বাসের সহজ ভিত্তি বলে একে চিনে নেওয়া যায়। আমাদের সকলের জীবনেই মাঝে মাঝে এইরকম মুহূর্ত আসে যখন সকলের প্রতি আমরা শুভেচ্ছা বোধ করি। আমরা যখন সাংসারিকতায় লিপ্ত, তখন যে-ব্যক্তি আমাদের সাংসারিক স্বার্থের সহায়, তাকেই ভালো চোখে দেখি, আর যে-ব্যক্তি বিরোধী তাকে মন্দ ভাবি। কিন্তু এমন মুহূর্তও আসে যখন আমরা আর স্বার্থের জালে তেমনভাবে আবদ্ধ নই। বিদ্বেষমুক্ত সেইসব মুহূর্তে মনে আর কোনো তিক্ততা থাকে না। এ যদি না হত তবে সংসার থেকে উত্থিত বিষাক্ত বাষ্পের মতো গ্লানিতে অনেক আগেই মানুষের মৃত্যু হত। মনের একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে, তিক্ততা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার, সহজ আনন্দে বিশ্বের দিকে ফিরে তাকাবার। এই শক্তি দুর্বল হয়ে গেলে অন্য কোনো সুখই মানুষকে বাঁচাতে পারে না। একে তাই বিশেষ মূল্য দিয়ে রক্ষা করা আবশ্যক।

ধর্মে এর স্বীকৃতি আছে। বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে এক-একটি দিন চিহ্নিত থাকে যখন শত্রুমিত্র নির্বিশেষে , অভ্যস্ত ভেদাভেদ ভুলে, সবাই সবাইকে আলিঙ্গন করবে এইরকম বিধি। মিলনের উৎসবও অবশ্য অনেক সময় তার গূঢ় অর্থ হারিয়ে প্রাণহীন আচারে পরিণত হয়। কিন্তু সে কথা ভিন্ন। মূল ভাবটাকে নতুন করে বুঝে নেওয়া দরকার। স্বার্থ ও ভেদাভেদ অতিক্রম করে শুদ্ধ মিলনের একটা আনন্দ আছে। সাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতাকে সেটা অতিক্রম করে যায়। তাঁর কম বয়সের এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "হৃদয় আজি মোর কেমন গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।" আরো বহু বছর আগে নানক বলেছিলেন, "না কো বৈরী ন হী বেগানা।/সগল সংগ হম কো বন আই ॥" শুদ্ধ মিলনের এই-যে অনুভূতি একে আধ্যাত্মিক অনুভূতি বললে অসঙ্গত হয় না।

বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার যে অভিজ্ঞতা, তার আরেকটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য। এতে নিজের ভিতর একটা ভয়শূন্যতা এবং বিশেষ শক্তির সঞ্চার অনুভব করা যায়। ছোটো ছোটো দেয়ালগুলি যখন ভেঙ্গে যায় আর বৃহত্তর এক সত্তার সঙ্গে আমরা মিলিত হই, তখন এটা ঘটে। অবশ্য ক্রোধের আবেশেও দেহে অন্য এক রকমের শক্তি আসে। ধর্মের ভাষায়, ক্রোধের সেই শক্তিকে যদি বলি দানবিক, তবে আধ্যাত্মিক মিলনের শক্তিকে বলতে হয় দিব্য। এসব কিছুই প্রকৃতির বাইরে ঘটে না। প্রকৃতির ভিতরই বিভিন্ন স্তর আছে। আর বিভিন্ন স্তরের গুণগত পার্থক্যকে স্বীকার করবার জন্য ভাষার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

মনে রাখা ভালো যে, প্রকৃতিতে এই সবই মিলে মিশে যায়। কখনো তৈরি হয়, যাকে রবীন্দ্রনাথ শেষজীবনে বলেছেন, "মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ।" বুদ্ধের শিক্ষা, অতন্দ্র থাকতে

হবে। অতন্দ্রতার বিকল্প নেই। সন্দেহগ্রস্ততা নয়, যা আমাদের শুধুই ক্লান্ত করে। বরং সেই সজাগতা যাতে মিথ্যা বিশ্বাসে আমরা ধরা পড়ি না, তবু বিশ্বের সঙ্গে যোগের আনন্দকে সহজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিই। আনন্দ ও অভয় আধ্যাত্মিক অনুভবের দুটি প্রধান লক্ষণ।

খ

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে চিত্তের সেই "আত্যন্তিক সুখ" ও স্থিতির কথা বলা হয়েছে, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ", অর্থাৎ, যাকে লাভ করে অপর কোনো লাভকেই তার অধিক মনে হয় না। সেই অবস্থায় দুঃখানুভূতি থাকে না এমন নয়; তবু কঠিন দুঃখবোধেও চিত্ত আর অতিশয় বিচলিত হয় না, "যস্মিন্ স্থিতো না দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।" ব্যক্তির পক্ষে এটাই তো মোক্ষলাভ। কিন্তু মোক্ষ এবং ধর্ম এক বস্তু নয়। যিনি মোক্ষ লাভ করেছেন তিনি সংসারের ঊর্ধ্বে একটি স্থিতি লাভ করেছেন। তবু ধর্মাচরণের জন্য সংসারে প্রত্যাবর্তন আবশ্যক। দুঃখতপ্ত জীবের সেবা এবং সমাজজীবনে নীতির পরিপোষণ ধার্মিকের কর্তব্য।

শিল্পের সঙ্গে ধর্মের একটা প্রধান পার্থক্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা ভালো। শিল্প অথবা সাহিত্যের স্বাদকে ব্রহ্মস্বাদের সহোদর বলা হয়েছে। এইখানে ধর্মের সঙ্গে তার মিল। কিন্তু শিল্পীকে আর্তজীবের সেবা করতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। যদি তিনি আর্তের সেবা করেন তবে তিনি সাধুর কিছুটা কাছাকাছি চলে আসেন। সাধুরই কিন্তু সেটা স্বধর্ম, শিল্পী এব্যাপারে স্বাধীন। শিল্পীকে সেবাধর্মের নিয়ম মেনে চলতে হবে—এমন কোনো কথা নেই।

সাংসারিকতার ঊর্ধ্বে আরোহণ আর তারপর সংসারে অবরোহণ, এ দুয়ের কোনো একটি বাদ পড়লেই ধর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই অর্থে ধর্ম সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংসারকে একেবারে ত্যাগ করে মোক্ষ যদি-বা সম্ভব, ধর্ম নয়। সমাজ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে; ধর্মও পরিবর্তনহীন নয় ঈশ্বর যদি বা কালাতীত, ধর্ম কালের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রভাব গিয়ে পড়ে ধর্মব্যবস্থার ওপর। সামাজিক অন্যায়ও ধর্মের সমর্থন খোঁজে। এই থেকে দেখা দেয় ধর্মের বহু জটিলতা। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তোলা যুক্তিশীল সমালোচনার অন্যতম কর্তব্য। ধর্মের অধঃপতন রোধ করবার জন্য এই সমালোচনার প্রয়োজন আছে। এদেশে রামমোহনের মতো লোকেরা এই কাজটা করতে চেয়েছেন ধর্মের ভিতর থেকে। আর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত লোকেরা করেছেন বাইরে থেকে। ধর্মের স্বাস্থ্যের জন্য এইসব সমালোচনা উপকারী।

বিজ্ঞানীর কিছু মূল বিশ্বাস আছে, যেমন, বিশ্বজগৎ নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানী সহজে সরবেন না। কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব তত্ত্ব তৈরি হচ্ছে, তাদের ক্রমাগত বিচার চলেছে এবং সংশোধন হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসীর কিছু মূল প্রত্যয় আছে, অহিংসা প্রেম এই সব নিয়ে। তার ওপর ভিত্তি করে শাস্ত্র ও সামাজিক বিধান তৈরি হচ্ছে, অন্তত শাস্ত্রকারদের দাবি এইরকম। ধর্মের মূল প্রত্যয় সহজে বদলাবার নয়। কিন্তু সামাজিক বিধানগুলির বিচার ও পরিবর্তন প্রয়োজন। পাঁচ বছরের ছেলের জন্য যে-বিধান তৈরি হয়, পঁচিশ বছরে সে সব প্রযোজ্য নয়। অবশ্য পাঁচ

বছরের ছেলের পক্ষেও প্রচলিত বিধানে ভুল থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলি যদি নির্ভুলও হয় তবু পঁচিশ বছরের জন্য ভিন্ন বিধান প্রয়োজন হবে। হাজার বছর আগের সমাজের জন্য যে বিধান ছিল, আজকের সমাজে সে সব চলবে না। প্রজাকে রাজা সন্তানের মতো দেখবেন, এই অনুশাসন কোনো এক যুগে হয় তো তেমন মন্দ ছিল না। অন্য এক যুগে পৌঁছে তবু বলা প্রয়োজন হয়, প্রজাই হবে রাজা।

ধর্মের ব্যাপারে মুশকিলটা এই যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার কিছু কিছু স্বীকৃত পদ্ধতি আছে, কিন্তু ধর্মীয় বিধানের জন্য তেমন কোনো পরিষ্কার বিচারপদ্ধতি নেই। উপরন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের ভেতরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার ফলে ধর্মের সামাজিক অপপ্রয়োগের সমূহ সম্ভাবনা। বিষয়টা এইখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা অনুচিত হবে না।

সাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর গুণগত পার্থক্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। অভিজ্ঞতার গুণগত ভেদ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে, যেমন দোকানদারির সঙ্গে কাব্যরসানুভূতির পার্থক্য। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা দেয় যেটা কাব্যে অনুপস্থিত। কবিরা শাস্ত্রকারদের মতো সরাসরি সামাজিক বিধান প্রণয়নের কাজে অগ্রসর হন না। শাস্ত্রকার অভিজ্ঞতার প্রকল্পিত ভেদকে ভিত্তি করে সামাজিক স্তরভেদকে নায্যতা দিয়েছেন এমন উদাহরণের অভাব নেই। এছাড়া আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ভিতর একটা রহস্যের ভাব আছে, যেটাকে নানাভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। সেই ভাবটি যদি নেশার মতো যুক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলে তবে শেষ অবধি তাতে আধ্যাত্মিকতারও ক্ষতি, সমাজেরও। আবার বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার অনুভবের মধ্যে যে শক্তিসঞ্চারী গুণ দেখা যায়, তার অপপ্রয়োগ সহজ। এইসব প্রলোভন ঠেকানো কঠিন। বলা বাহুল্য, এ জাতীয় বিপদ ধর্মেই সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানেরও অপপ্রয়োগ ঘটে, রাজনীতির তো বটেই। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শ আর বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্য বড় ভীষণ হয়ে ওঠে। সেইজন্য সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

১৯৪৩ সালে রানডের ১০১তম জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এক বক্তৃতায় আম্বেডকর হিন্দুধর্মের ভেতর অসামঞ্জস্য নিয়ে কিছু স্মরণীয় মন্তব্য করেন। একদিকে বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলে মানা হয়েছে। সকল জীবের মধ্যেই পরমাত্মার বিকাশের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুদর্শনে সাম্যের একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তি আছে। অন্যদিকে মনুর বিধানে সামাজিক অসাম্য অতি কঠোরভাবে বিধিবদ্ধ। আম্বেডকর বলেছেন, "The Hindu philosophers had both their philosophy and their Manu held apart in two hands, the right not knowing what the left had." চূড়ান্ত দার্শনিক সাম্য এবং প্রচণ্ড সামাজিক অসাম্যের এই সুপ্রাচীন সহাবস্থানে আমরা এমনই অভ্যস্ত যে, এ দুয়ের অসামঞ্জস্য আমাদের বিব্রত করে না, এমনকি আমরা তা লক্ষ করতেও ভুলে গেছি।

বলা বাহুল্য, অসাম্য সব সমাজেই আছে। কিন্তু হিন্দুসমাজে এই অসাম্য যেভাবে আছে, একরকমের বিকৃত ধর্মের সহায়তা ছাড়া সেটা সম্ভব হত না। শুচিতা সম্বন্ধে এক মানবতাহীন ধারণা এই সমাজের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। শূদ্রের স্পর্শমাত্রে, এমনকি তার সান্নিধ্যে, ব্রাহ্মণ অপবিত্রতায় আক্রান্ত হয়, এমন হৃদয়হীন এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে অপমানজনক ধারণা ধর্মীয় গ্লানি ও কুসংস্কার ছাড়া সম্ভব হত না। হিন্দুর বহু মন্দিরে নিচুজাতের মানুষের প্রবেশ নিষেধ, কারণ তাতে না কি মন্দির অপবিত্র হবে।

অথচ ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত, সারা পৃথিবীই ঈশ্বরের মন্দির। সেই মন্দিরের ভিতরই শূদ্রের বাস, তা হলে পৃথিবী তো অপবিত্র হয়েই আছে। মানুষের তৈরি দেওয়ালে গাঁথা কয়েকটি মন্দিরকে যদি পবিত্র রাখতে হয় তবে তার উপায় অন্য। আসলে আমাদের মন্দির অপবিত্র করে তুলবে শূদ্রের এতটা শক্তিসামর্থ্য নেই; মন্দির নিত্য অপবিত্র হচ্ছে উচ্চবর্ণের কিছু মানুষের কুসংস্কারে, অহমিকায় ও লুব্ধতায়। সেই অপবিত্রতা যে আমাদের হিন্দুসমাজে আজও সমর্থিত হয়ে চলেছে, এটাই অতি লজ্জাজনক বাস্তব ঘটনা।

শুচিত-অশুচিতার এই প্রশ্নটা হিন্দুর ধর্মে যেমন আছে, মুসলমানের ধর্মে তেমন নেই। মুসলমান সমাজেও আমীর আর গরীবের পার্থক্য প্রকট। কিন্তু সেখানে মানুষের স্পর্শে মানুষ এমন অশুচি হয়ে ওঠে না। এদেশে কোটি কোটি হিন্দু যে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে, সেটা প্রধানত মুসলমান শাসকের অসিবলের কাছে নতি স্বীকার করে নয়, বরং অনেকখানি হিন্দুসমাজের নিতান্ত অপমানজনক বৈষম্যের তাড়নায়। উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আজ তথাকথিত নিচুজাতের হিন্দুদের বিদ্রোহ মাথা তুলে উঠেছে। বঙ্গদেশে যে বর্ণসংঘর্ষ এখনো তেমন প্রবল নয়, তার একাধিক কারণ আছে। একটা কারণ সম্ভবত এই যে, নিচুজাতের যে বাঙ্গালিরা এই বিদ্রোহে আজ অংশ নিতে পারত, তারা বহুসংখ্যায় অনেক আগেই মুসলমান হয়ে গেছে। জাতি সংঘর্ষের অনেকখানি বিদ্বেষী শক্তি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ নিয়ে বাংলাদেশটাকেই দুভাগ করে ফেলেছে। মনে রাখা ভালো যে, উঁচুজাতের হিন্দুর কাছে মুসলমানও ছিল অস্পৃশ্য। তারা যে হিন্দুর সঙ্গে একই রাজ্যে বাস করতে চায়নি, সেজন্য শুধু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অবশিষ্ট বাংলাদেশে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে, জাতিভিত্তিক দ্বন্দ্ব দুর্বল। কিন্তু সেই সংঘর্ষ এইখানেও ক্রমে জোরালো হয়ে উঠছে। শহরবাসী উঁচুজাতের হিন্দুরা সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন নয়, এমনকি অনেকটা আত্মসন্তুষ্ট। কিন্তু এটা একরকম নির্বোধের স্বর্গে বাস। হিন্দু ধর্ম ও সমাজের একটা আমূল পরিবর্তন ছাড়া সংকট এড়ানো যাবে না। এই সামাজিক সংকটের পটভূমিকা উপেক্ষা করে হিন্দুধর্মের একতরফা মাহাত্ম্যকীর্তন অযৌক্তিক।

শুচিতা-অশুচিতার ভেদ নিয়ে যে-প্রশ্নটা হিন্দুসমাজকে ভিতর থেকে বিভক্ত করেছে, খ্রীষ্টান চেতনায় সেটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে অন্যভাবে। খ্রীষ্টধর্মে একটা গভীর পাপবোধ আছে: একদিকে ঈশ্বরের পুত্র নিষ্পাপ যীশু খ্রীষ্ট, আর অন্যদিকে পাপী মানুষ। এ থেকে কিছু অনুতপ্ত নিরহংকার মানুষ আমরা পাই বটে। কিন্তু পাপবোধের তাড়না থেকেই আবার একরকমের আত্মনিগ্রহ এবং নির্দয়তা বেড়ে ওঠে। যারা নিজেকে কশাঘাত করতে অভ্যস্ত তারা অন্যকেও মাত্রাহীন আতিশয্যে অকাতরে কশাঘাত করে।

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভাব ও সংহতিবোধ মুসলমান ধর্মের একটা বড় জিনিস। হিন্দুর সংহতি ততটা স্বাভাবিক নয়; অনেকটা ইসলামী সংহতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। একক সাধকের একান্ত ভজন ও আরাধনা হিন্দুর ধর্মসাধনায় অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। মুসলমানের ধর্মে সাম্প্রদায়িক উপাসনার স্থান তুলনায় বেশি। পৃথিবীর সব মুসলমান একই দিকে মুখ ঘুরিয়ে আল্লার জয়গান করছে, এ থেকে একটা সামূহিক ঐক্যবোধ প্রবল হয়ে ওঠে। অবশ্য মুসলমানদের ভিতরও ছোটো বড় নানা সম্প্রদায় ও তাদের বিভেদ আছে। তবু মোটের ওপর মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ঐক্যবোধ হিন্দুর চেয়ে বেশি। শিখদের ভিতরও সাম্প্রদায়িক সংহতি উল্লেখযোগ্য।

এর ভালোমন্দ দুদিকই আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংহতিবোধের তুলনামূলক বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়। ধর্ম সাধারণভাবে এইরকম সংহতিবোধের সহায়ক হয়, একথাই

স্বীকার্য। যেখানে যুক্তিবাদী ঐতিহ্য কোনো না কোনো কারণে দুর্বল, সেখানে এই সংহতিবোধের ভিতর একটা উগ্র অসহিষ্ণুতা সহজেই এসে পড়ে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর বিরোধ বৃদ্ধি পায়। ধর্মীয় কারণ যোগ হলে বিরোধের হিংস্রতা আরো বাড়ে। ভারতীয় উপমহাদেশে এর তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে যত রক্তপাত আমাদের চোখের সামনে ঘটেছে তত আর সম্ভবত অন্য কিছুতে নয়। এই উপমহাদেশর অনেক বুদ্ধিমান ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষ যদি এই কারণে ধর্মের বিরুদ্ধে বিরক্তি বোধ করেন তবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

তবু এই ধরনের হিংস্রতা ও রক্তপাতের জন্য ধর্মকে দায়ী করবার আগে অন্য দুয়েকটি কথা বিবেচনা করে দেখা উচিত, তা নইলে বিচারে ত্রুটি থেকে যায়। মানুষের অবচেতনায় একটা হিংস্রতা আছে যার কোনো ধর্ম নেই। হিটলার ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না, স্তালিন তো নিশ্চয়ই নয়। এঁরা যে-পরিমাণ বর্বরতা ও রক্তপাতের জন্য দায়ী, এ যুগে তার তুলনা পাওয়া কঠিন। জঙ্গী জাতীয়তাবাদকে সাধারণ অর্থে ধর্মের সঙ্গে সমার্থক ধরা যায় না। কোনো কোনো দেশে এই রকম সমীকরণ করা হয়েছে বটে, কিন্তু সব দেশে নয়, কোনো দেশেই সম্পূর্ণ ভাবে নয়। বিশ্বমানবের সঙ্গে ঐক্যবোধ এক জিনিস ; আর মানবজাতির এক খণ্ডিত অংশের সঙ্গে ক্রুদ্ধ সংহতিবোধ বিপরীত জিনিস। যূথবদ্ধ অন্ধ অহংকার এ যুগে কেবল মাত্র ধর্মের নামেই সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কথা বললে ইতিহাসের সাক্ষ্যকে অমান্য করা হবে। ধর্মের ভয়াবহ অপব্যবহার সম্ভব এ কথা অবশ্য স্বীকার্য এবং এ সম্বন্ধে সাবধান থাকা প্রয়োজন। নিরীশ্বরবাদও যে সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতার ঊর্ধ্বে নয়, সে কথাও বিনয়ের সঙ্গে মনে রাখা ভালো। বুদ্ধ যে অহিংসার ওপর জোর দিয়েছিলেন, ঈশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদের ওপরে নয়, তার কিছু ভালো কারণ ছিল।

গ

এদেশে শুভচিন্তক বহু মানুষের ভেতর একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, সব ধর্মেরই সার কথা এক ও অভিন্ন। এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। নানা ধর্মের বাহ্য বিধানে তো পার্থক্য আছেই, যেমন কোনো ধর্মে বিশেষ বিশেষ শর্তে চার স্ত্রী গ্রহণ করা যায়, কোনো ধর্মে যায় না। এইসব পার্থক্য তুচ্ছ বা অগভীর মনে হতে পারে। কিন্তু ধর্মের মেজাজে ও মূল বিশ্বাসেও বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আমরা আগেই দেখেছি যে, ঈশ্বরবিশ্বাস কোনো কোনো ধর্মে মৌল বস্তু, কিন্তু সব ধর্মে নয়। আবার যে সব প্রধান ধর্ম ঈশ্বরবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সব ধর্মের ভিতরও ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণায় ভিন্নতা আছে। খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে 'ট্রিনিট্যারিয়ান' ধারণা আছে, মুসলমানের কাছে সেটা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এইসব পার্থক্যের বিশদ আলোচনায় আমরা যাব না। কিন্তু একটা বিষয়ের প্রতি তবু বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কিছুক্ষণ আগে যে-ধরনের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা গেছে, অন্তত বিবেকবান মানুষের পক্ষে তাকে আদর্শভ্রষ্টতার সমস্যা বলে চিনে নেওয়া কঠিন নয়। অন্য কিছু সূক্ষ্ম সমস্যা কিন্তু আছে, যার মূলে পাওয়া যাবে আদর্শভ্রষ্টতা নয়, বরং আদর্শেরই দ্বন্দ্ব। শ্রীমুকুন্দীলাল শ্রীবাস্তবের সম্পাদিত 'জ্ঞান শব্দ কোষ'-এ ইংরেজি dilemma-র পরিভাষা দেওয়া হয়েছে 'ধর্ম-সংকট'। শব্দটি অর্থবহ।

অধ্যাত্মচিন্তার গভীর স্তরেও 'ডিলেমা' আছে। যেমন জীবনের গভীরে তেমনি ধর্মজীবনে কিছু মৌল সংকট, কিছু আদর্শের দ্বন্দ্ব, দেখা যায়। বিভিন্ন ধর্মে এই দ্বন্দ্বের প্রধান রূপ বিভিন্ন। কুসংস্কার যদিও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায়, 'ধর্মসংকট' যায় না। বরং এ বিষয়ে চিন্তনের ফলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে আমাদের বোধ গভীরতা লাভ করে, তুলনামূলক ধর্মের পাঠ অন্য এক বৈচিত্র্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। দুয়েকটি উদাহরণের ভিতর দিয়ে বিষয়টি এবার ব্যাখ্যা করা যাক।

প্রাচীন ইহুদী ধর্ম ও পরবর্তীকালে ইসলামের একটি প্রধান আদর্শ হল, ন্যায়বিচার। এই ন্যায়বিচারের মূলকথা, অপরাধ ও দণ্ডের ভিতর তুল্যমূল্যতা। রক্তের বদলে রক্ত চাই, চাই আমাদের পরিচিত এই ধ্বনি যতই ক্ষমাহীন মনে হোক না কেন, ন্যায়বিচারের প্রাচীন ধারণার সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে। হত্যাকারীর জন্য চাই মৃত্যুদণ্ড, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। "He that smiteth a man, so that he die, shall be surely put to death." "Eye for eye, tooth for tooth."—এই হল ঈশ্বরের আদিষ্ট নিয়ম। দয়া বা করুণার কথা সেখানে নেই এমন নয়, তবু কঠোর ন্যায়বিচারের সুরটাই প্রাধান্য পেয়েছে। এর প্রতিধ্বনি আছে কোরানের সেই অংশে যেখানে চৌর্যের শাস্তি হিসাবে চোরের হাত কেটে ফেলবার কথা বলা হয়েছে।

ন্যায়দণ্ডের পাশাপাশি আশ্চর্যভাবে শোনা গেল করুণার বাণী। ইহুদী ঐতিহ্যের ভিতরই জন্ম নিয়েছিলেন যীশু খ্রীষ্ট। বাইবেলের পুরনো বিধানের সঙ্গে তিনি পরিচিত। সেই বিধান তিনি ভাঙতে আসেননি, বরং পূর্ণ করতে এসেছেন। ম্যাথুকথিত সুসমাচারের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি যীশু বলছেন, "Think not that I am come to destroy the law; or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil." আমাদের বিস্মিত করে একই অধ্যায়ে কিছুক্ষণ পরেই তিনি বলেন : "Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth: But I say unto you, that ye resist not evil; but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also." যীশুর উচ্চারণে কোন অস্পষ্টতা নেই। তোমরা শুনেছ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত এই কথা, কিন্তু আমি বলছি, প্রতিরোধ করো না, বরং যদি কেউ তোমার এক গালে আঘাত করে, তাকে অন্য গাল এগিয়ে দাও।' হিংসাকে জয় করতে হবে ক্ষমা দিয়ে, যীশুর এই বাণী।

আদর্শের দ্বন্দ্বটা এর চেয়ে স্মরণীয়ভাবে বলা সম্ভব ছিল না। এ কোনো তুচ্ছ উভয়সংকট নয়। কেউ হয় তো বলবেন, বিচার ও দণ্ডের চেয়ে ক্ষমাই নিশ্চিতভাবে উচ্চতর ধর্ম। এইভাবে বললে কিন্তু সংকটের সমাধান অতি বেশি সরল করে ফেলা হয়। এতে দ্বন্দ্বের গভীরতর তাৎপর্য বোঝা হয় না। সম্যক দৃষ্টি নিয়ে তাকালে দেখা যায়, দ্বন্দ্বটা অটলভাবে, অনিবার্যভাবে, বাস্তবে প্রোথিত। বিশ্বপ্রকৃতি একদিকে নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, প্রতিটি কার্যের পরিণাম নিয়মের দ্বারা কঠিনভাবে নির্ধারিত। অন্যদিকে সৃষ্টি আনন্দে বিধৃত, প্রেমের ভিতর দিয়েই সেই সত্য আবিষ্কার করা সম্ভব, প্রেম ছাড়া পথ নেই। বিশ্বজগতের এই যে দ্বৈত, তারই প্রতিফলন সংসারেও। ন্যায়বিচার ছাড়া সমাজ রক্ষা পাবে না। আবার প্রেম ছাড়া গতি নেই। ধর্মের এই এক মূল রহস্য।

এই রহস্য ইসলামেও স্বীকৃত। কোরানে যে আল্লার বন্দনা করা হয়েছে, তিনি একদিকে পরম করুণাময়, 'রাহ্‌মানির রাহীম' করুণাময়, অন্যদিকে তিনি শেষবিচারের দিনের সর্বশক্তিমান বিচারপতি, 'মালেকে য়াওমিদ্দীন'। ক্ষমা ও ন্যায়ধর্মের এই সংযোগ

সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম সচেতনতা না থাকলে মানুষের নৈতিক জীবন তার গতি ও গভীরতা হারায়।

ভারতীয় কোনো কোনো আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে ধর্মসংকটের অন্য একদিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বোধিবৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট সত্যান্বেষী সিদ্ধার্থ মারের প্রচণ্ড আক্রমণ ও নানা প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেটা ছিল কঠিন পরীক্ষা ; কিন্তু তাতে কোনো নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। মারের আক্রমণ সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করাই তো প্রশ্নাতীত কর্তব্য। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর সিদ্ধার্থ অন্য যে প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন সেটা কিন্তু এক মৌল প্রশ্ন। সিদ্ধার্থ এখন দুঃখের কারণ জেনেছেন, দুঃখকে অতিক্রম করবার পথও। সে পথে একাই ভ্রমণ করা তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু সংসারে আরো সংখ্যাতীত দুঃখতপ্ত মানুষ আছে, যারা বোধি থেকে বঞ্চিত। বুদ্ধ কি তাদের পথের সন্ধান দেবার জন্য সংসারে ফিরে যাবেন ? তিনি সেই দুঃখী মানুষদের ভিতরেই ফিরে গিয়েছিলেন। এটাই বুদ্ধের করুণা। যিনি স্বচ্ছন্দে নির্বাণে প্রবেশ করতে পারতেন, তিনি দুঃখে আবদ্ধ মানুষদের পথ দেখাবার জন্য থেকে গেলেন। এদেশের ধর্মের ঐতিহ্যে এটা এক স্মরণীয় ঘটনা।

মুক্তিপথের সন্ধানে ব্যাকুল সাধক সংসার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধ্যানে প্রবেশ করেন, নিজেকে নিয়ে কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, এটা কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। কিন্তু পথের সন্ধান পাবার পর তিনি সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন কিনা, এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থেকে যায়। এই দ্বিধা অনেকের কাছে অর্থহীন, এমন কি হৃদয়হীন, মনে হতে পারে। মানুষের মাঝে ফিরে আসবার বিরুদ্ধে যুক্তি কোথায় ? জীবে দয়াই তো স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু এইভাবে দেখলে আসল প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়ানোই হয় না। সমস্যার মূল খুঁজতে হবে অন্যত্র।

প্রত্যেক মানুষকেই কি নিজের মুক্তির পথ নিজেই খুঁজে নিতে হয় না ? স্বোপলব্ধ সত্যের আলোতে সাধক নিজের জীবনচর্যা নিজে নির্ধারিত করে নেন। আর সেটাই অন্যের কাছে একটা উদাহরণস্বরূপ হয়ে ওঠা সম্ভব। মুক্তির পথে কেউ কি কারো জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে ? এইরকম কিছু প্রশ্ন, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব এদেশের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে অবিস্মরণীয় ভাবে আঁকা হয়ে আছে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিবেকানন্দের জীবনেও একটা মুহূর্ত এসেছিল যখন তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল যে, তিনি একক মুক্তির পথে অগ্রসর হবেন, না পীড়িত মানুষের সেবার জন্য সংসারে থেকে যাবেন। দ্বিতীয় পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন।

আর্তের সেবায় সাধক আত্মনিয়োগ করবেন কি না, আসল প্রশ্ন সেটা নয়। তিনি ধর্মগুরু হয়ে সংসারে ফিরে আসবেন কি না, সেটাই প্রশ্ন। আর এ প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, জীবনদর্শনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও। গুরু যিনিই হোন, যীশু খ্রীস্ট অথবা মহামতি মার্কস, সেই ভূমিকার কিছু সাধারণ পরিণাম এড়ানো কঠিন। গুরুকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, সেটা তাঁর কাম্য হোক না হোক। প্রতিষ্ঠানের ভিতর সাংগঠনিক নিয়ম, অতএব নিয়মানুবর্তিতার বাধ্যবাধকতা আর সাংগঠনিক ঐক্যরক্ষার কিছু যান্ত্রিক পদ্ধতি অনিবার্য ভাবে এসে যায়। সেই সঙ্গে দেখা দেয় সংগঠনের ভিতর পদাধিকার নিয়ে নানা সমস্যা। সাধক কিংবা সত্যসন্ধানী যখন সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন অজ্ঞ মানুষকে পথ দেখাতে, তখন পথ-দেখাবার বাইরেও এইরকম অন্য এক ইতিহাসের কোপপাত হয়। এই পরিণামের সঙ্গে আমরা পরিচিত—ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির ফলে।

তবু একে ঠেকানো যায়নি।

গৌতম বুদ্ধ কি চেয়েছিলেন কোনো সংগঠিত ধর্মসম্প্রদায়? এ বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। অনুবর্তীদের জন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন এই অন্তিম উপদেশ—আত্মদীপ হও। অর্থাৎ, নিজ আত্মার আলোতে পথ চিনে চলো। এটা গুরুবাদ নয়। তবু তিনি গুরু হয়েই উঠেছিলেন। প্রধান প্রধান সব ধর্মেই এইরকম হয়েছে।

সংসারে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটা বুঝতে হবে এই সমগ্র ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। কোনো বুদ্ধই কি সংসারে ফিরে আসতে পারেন ধর্মগুরু না হয়ে? তিনি কি ধর্মগুরু হতে পারেন সংগঠন ও সম্প্রদায় সৃষ্টি না করে? সংগঠিত ধর্ম কি লালন করে না অসহিষ্ণুতা ও দুর্নীতি? এরপরও হয়তো প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তটাই সঠিক। কিন্তু সিদ্ধ মানবের সেই মুহূর্তের ঐ দ্বিধাটাকে এরপর আর তুচ্ছ বলা যাবে না, সেটা চিহ্নিত হয়ে থাকবে এক নতুন ঐতিহাসিক মহত্ত্বে।

ঘ

ধর্মের বিবর্তনে যুক্তির ভূমিকা অতএব গুরুত্বপূর্ণ দুই দিক থেকে। বাইরের দিক, যেখানে সংগঠনের প্রশ্নটা বড়, আর ভিতরের দিক, যেখানে অধ্যাত্মচেতনার উন্মোচনটাই প্রধান কথা। এইসব আগেই ইঙ্গিত করা আছে। আরো দুয়েকটি কথা এইবার যোগ করা যাবে। সাংগঠনিক আধ্যাত্মিক দুই সংকটের ভিতর দিয়ে ধর্মকে পথ কেটে যেতে হয়।

প্রথমে সংগঠনের কথা। স্যাঁ সির্মঁর পুরনো বিশ্লেষণ খানিকটা বদলে বলা যায়, সমাজ ও ধর্মের বিবর্তনে দুটি পর্যায় ঘুরে ঘুরে আসে; এক পর্যায়ে সংগঠনের প্রাধান্য, অন্য পর্যায়ে প্রতিবাদ। সমাজ সংগঠনের জন্য ধর্মের প্রয়োজন হয়, অন্তত এইরকমই ঘটেছে। কিন্তু সংগঠন যতই প্রবল হয়ে ওঠে, ততই তার ভিতর দুর্নীতি জমে ওঠে। বৃহত্তর সমাজের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের একটা যোগ গড়ে ওঠে। এটাই স্বাভাবিক। ন্যায়বিচারের প্রশ্ন ধর্মের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু বৃহত্তর সমাজের ক্ষমতার কাঠামোকে উপেক্ষা করে কোনো বিধানকেই কার্যকর করা সম্ভব নয়। কাজেই প্রতিযুগে সেই সময়ের ক্ষমতার বিন্যাসকে মেনে নিয়েই ন্যায়নীতির বিধান রচিত হয়। ধর্ম বলে বটে, বিচারকে দয়ার স্পর্শ বিনম্র কর, হিংসাকে সংযত কর। কিন্তু সেই সংযমের সীমানাও নির্ধারিত হয়ে যায় ক্ষমতার স্বীকৃত কাঠামো দিয়ে। তাছাড়া, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিতর কিছু নিজস্ব দুর্নীতি দেখা দেয়, তাকে পরানো হয় পুষ্পিত বাক্যের মুখোশ। প্রাচীন ধর্মের আরেক দোষ, সে আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে। দুর্নীতির চেয়েও এই আচারসর্বস্বতা সমাজের উন্নতির পথে বড় বাধা।

ধর্ম ও সমাজের এই জীর্ণতার ছবি আমাদের কাছে পরিচিত। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধরনটাও কম পরিচিত নয়। প্রতিবাদী আন্দোলনের রূপভেদ আছে, কোথাও ভক্তি প্রধান, কোথাও যুক্তি। যুক্তি ও বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিলে নাস্তিক্য দেখা দিতে পারে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রামচন্দ্র ভরতকে আন্বীক্ষিকী সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আন্বীক্ষিকী নাস্তিক্যের দিকে নিয়ে যায়, প্রাচীনদের এই সন্দেহ একেবারে অমূলক ছিল না। প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে অনেক সময়েই প্রাধান্য দেখা গেছে ভক্তির। এদেশে মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের বহু প্রসিদ্ধ সাধক সমাজের নিচুস্তর থেকে

এসেছেন। অবশ্য এইরকম সবসময়ে ঘটেছে, এমন নয়।

গৌতমবুদ্ধের জন্ম রাজবংশে। এ যুগে ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা অধিকাংশই উচ্চবর্ণের। এই আন্দোলনে ভক্তি ও যুক্তির সমন্বয়ের দিকে ঝোঁক উল্লেখযোগ্য। রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট প্রতিবাদেও ভক্তি ও যুক্তির একটা নতুন সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা গেছে। সেটা ঘটেছে এক নতুন অর্থনৈতিক যুগসন্ধিতে, যার প্রভাব এসে পড়েছে এই প্রতিবাদী আন্দোলনে। এখানে লক্ষ করা যেতে পারে যে, ধর্মের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবাদ দেখা দেয় ধর্মের ভিত্তিতেই। নতুন আন্দোলনের নেতারা পুরনো ধর্মের মূলে ফিরে যান। তাঁদের যুক্তি শুরু হয় সেইখান থেকে।

প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় নতুন সংগঠন। সংগঠন-প্রতিবাদ-সংগঠন, এইভাবে বললে একটা চক্রাকার গতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অধ্যাত্মচেতনার ভিতর অগ্রগতির ধারণা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সেইদিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যাক্।

অধ্যাত্মচেতনার একটা লক্ষণ এই যে, এতে ধরা পড়ে বিশ্বের সমগ্রতার প্রতি ব্যক্তিসত্তার একটা সাড়া। রাম শ্যাম অথবা যদু সম্বন্ধে আমরা কী ভাবছি সেটা এখানে তেমন প্রাসঙ্গিক নয়, মানুষ সম্বন্ধে কী ভাবছি সেটাই প্রাসঙ্গিক। আমরা বিশেষ বিশেষ ভালো অথবা মন্দ জিনিস কী ভাবে গ্রহণ করছি সেটা মূল প্রশ্ন নয়। ভালোয় মন্দে মিশ্রিত এই সমগ্র বিশ্বটাকে আমরা কীভাবে গ্রহণ করছি সেটাই আরো মূল কথা।

এই পৃথিবীর কিছুটা আমাদের জানা, অনেকটাই অজানা। জানা অজানায় মেশানো মহাবিশ্বের প্রতি মানুষের একটা অন্ধ ভয় আছে, আবার একটা পরিব্যাপ্ত প্রেমও আছে। আদিম অধ্যাত্মচেতনায় এই ভয় এবং প্রেম মিলে মিশে গেছে। সমালোচকরা বলেন, ধর্মের ভিত্তিতে ভয়টাই হল আসল। ঈশ্বরকে মানুষ তৈরি করে নিয়েছে তার ভয়ার্ত চিত্তের প্রার্থনা জানাবার জন্য। কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ভয় এবং প্রেম দুইই আছে ধর্মের ভিত্তিতে। ভয়ের কুজ্ঝটিকার ভিতর থেকে রূপ গ্রহণ করেছে অন্য এক আলোকিত বিস্ময়।

বিশ্বের প্রতি মানুষের যে অন্ধ ভয় তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। আমাদের জৈব সত্তা নানা দিক থেকে সতত বিপন্ন। একটি মানুষকে সংকটে ফেলবার জন্য বন্যা, ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের মতো বড় কোনো দুর্ঘটনার প্রয়োজন হয় না। অতি তুচ্ছ কারণ থেকে অঙ্গহানি ঘটে, মনের স্থৈর্য ভেঙ্গে চুরমার হয়। ব্যাধি, জরা, মৃত্যুর হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই। সব সুখই অনিশ্চিত। কাজেই বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি মানুষের শৈশব থেকেই একটা ভীতি থাকা স্বাভাবিক। বিশ্বের প্রতি প্রেমের কারণটাই বুঝিয়ে বলা কঠিন। প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা সুখকর অনেক কিছু পাই বটে, কিন্তু এইসব খণ্ড খণ্ড সুখকর বস্তুকে অতিক্রম করেও তারায় ভরা আকাশের প্রতি, অন্ধকার রাতের প্রতি, জগৎজোড়া এই অন্তহীন নাট্যের প্রতি মানুষের একটা অকারণ প্রেম আছে।

আদিম বিশ্বচেতনায় ভয়ের ভাবটার প্রাধান্য ছিল। তাই থেকে মানুষের সংস্কৃতিতে বহু নিষ্ঠুর আচার-অনুষ্ঠান এসে গেছে। আমরা মাঝে মাঝেই চারিদিকে অসংখ্য ডাইনীর অস্তিত্ব আজও অনুভব করি, আর তাদের কিছুতেই মেরে শেষ করে উঠতে পারি না।

এই যে তামসিক ভয়ের শাসন, এ থেকে চেতনাকে ক্রমে মুক্ত করা আধ্যাত্মিক উন্নতির এক প্রধান শর্ত। আর এইখানেই যুক্তি ও বিজ্ঞানের একটা বড় ভূমিকা দেখা দেয়। আমাদের কালে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও অরবিন্দের পরিণত দর্শনে এ কথা স্বীকৃত। যে আধ্যাত্মিকতা যুক্তিকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়নি তার একটা দুর্বলতা থেকে যায়।

বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে অন্ধ ভয়ের প্রভাব থেকে নিজেকে সে সহজে মুক্ত করে নিতে পারে না। আধ্যাত্মিকতার নামে একটা প্রচণ্ড তামসিকতা তখন মানুষকে অধিকার করে বসে, অন্ধকারকেই আলোক বলে ভ্রম হয়। এইখানে যুক্তির প্রয়োজন। বিবেকানন্দ যখন বলেছিলেন যে, যুক্তি দিয়ে ধর্মের যে-অংশকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়, তাকে মিথ্যা বলে মেনে নেওয়াই ভালো, তখন তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পক্ষে একটি অতি মূল্যবান কথাই বলেছিলেন।[১]

শুদ্ধ বিজ্ঞানের মূলে আছে বিশ্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। এ থেকে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা সংসারের নানা প্রয়োজনে লাগে। কিন্তু বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসা সংসারের প্রয়োজন দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। তেমনি শুদ্ধ ধর্মের মূলে আছে বিশ্বের প্রতি প্রেম। সে প্রেমও জৈব প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যায়। এই অতিরিক্ত জিজ্ঞাসা ও অতিরিক্ত প্রেমের ভিতর কোনো বিরোধ নেই। যদিও সংসারের অভ্যস্ত হিসেবে এদের প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে হয়, তবু এরা সংসারকে রক্ষা করে আছে।

সাংসারিকতার এমন শক্তি নেই যে সংসারে সঞ্জাত লোভ ভয় ও ক্রোধকে সে যথেষ্ট সংযত করতে পারে। ধর্ম, যদি সে সত্যধর্ম হয়, তবে সেই শক্তি তাতে আছে। সেই ধর্মে সংগঠনের চেয়েও চেতনার প্রাধান্য ; সেই চেতনায় ভয় নয়, প্রেমের প্রাধান্য। যে অনাসক্তি ও চিত্তশুদ্ধির কথা ধর্মে বলা হয়, আধ্যাত্মিকতাকে ভয় থেকে মুক্ত করার জন্যই তার প্রয়োজন। সেই আধ্যাত্মিকতা যদি অন্য ভয় জয় করবার পর যুক্তিকে ভয় করে, তবে জানতে হবে যে সেটা শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা নয়।

৩

ক

মানুষের জন্যই এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে, একথা মনে করা সম্ভবত একটা মোহ। এমন কোনো মোহ না রেখেও কিন্তু বিশ্বকে ভালবাসা যায়। সাংসারিক প্রত্যাশাহীন এই নির্মোহ ভালবাসা মানুষের মনে একটা বিশেষ রসের সঞ্চার করে, যাকে অন্য কোনো সুখের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, তবু যাকে বলা হয়েছে আনন্দ। এযুগে রবীন্দ্রনাথের গানে ও ভাষণে এই আনন্দের কথা বারবার আমরা শুনেছি। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, এই বচনটি যে রবীন্দ্রনাথের এত প্রিয় ছিল তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তাঁর নিজস্ব কোনো বিশেষ অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি তিনি শুনেছিলেন উপনিষদের ঐ শব্দগুচ্ছে। অথচ কবির ভিতর বেদনাবোধও কত যে তীব্র ছিল সে কথায় আমরা পরে আসব।

এই বিশ্বকে মানুষ নানা ভাবে দেখে, নানা ভাবে জানে। আমরা যখন সংসারে আবদ্ধ তখন একে দেখি সাংসারিক উদ্দেশ্য নিয়ে। বস্তুর সেই সব গুণই তখন আমাদের কাছে গ্রাহ্য, সংসারে যে-সব প্রয়োজন লাগে। যেমন বস্তুকে তেমনি ব্যক্তিকেও তখন আমরা ঐ ভাবেই চিনি। কাকে দিয়ে আমাদের কী দরকার, কখন কার কাছে কোন কাজে যেতে হবে, তাই দিয়ে সম্পূর্ণ হয় ব্যক্তির পরিচয়। এইভাবে একটা প্রয়োজনের জগৎ তৈরি হয়ে যায়, আর সব কিছুকেই আমরা সাজিয়ে নিই, সব কিছুরই মূল্য ঠিক হয়ে যায় ঐ ব্যবহারিক প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে। বাজারে যেমন প্রত্যেক জিনিসের একটা বাজারদর নির্দিষ্ট হয়, এটাও সেই রকম। এই হল আমাদের ব্যবহারিক জগৎ। এতে প্রত্যেক বস্তুর ও ব্যক্তির পরিচয় নির্ধারিত হচ্ছে স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

অন্যের ক্ষেত্রে এই পরিচয় দিয়ে কাজ তো চলে যায়। কিন্তু নিজের জন্য এই পরিচয়টাকেই কি আমরা যথেষ্ট মনে করি ? যাদের আমরা কাছের মানুষ—অন্তরঙ্গ—বলে জানি, অন্তত তাদের কাছ থেকে কিন্তু এর অতিরিক্ত কিছু আশা থাকে আমাদের, অন্য এক পরিচয়, অন্য কোনো মূল্য। বাইরের জগতে ভালবাসা আর সাংসারিক স্বার্থ জট পাকিয়ে যায় ঠিকই, ভিতর থেকে আমরা তবু এদের আলাদা বলে অনুভব করি। যদি দেখি কেউ আমাদের অন্তরঙ্গতা দেখাচ্ছে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে, বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তবে সেটাকে আমরা বলি কপট ভালোবাসা। ঐ রকম স্বার্থাশ্রিত ভালোবাসায় আমাদের ভিতরের নিঃসঙ্গতা পূর্ণ হয় না। আমরা চাই অন্য এক প্রীতি, হৃদয় থেকে যে বলতে পারে, তোমার কাছ থেকে আমি অন্য কিছুই চাই না, তোমাকেই চাই, তুমি থেকো এইটুকুই চাই। অর্থাৎ, যাকে আমরা সত্যি ভালোবাসি তার অস্তিত্ব—শুধু অস্তিত্বই—আমাদের আনন্দিত করে। সে যদি অন্য কোনো উপহার নিয়ে আসে তবে সেটা উপরি পাওনা। সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, এটাই একটা মধুর প্রাপ্তি। "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে। তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥" শুদ্ধ ভালোবাসার ভাষা এই। দুটি সত্তার মিলনের অনুভবই এখানে একমাত্র কথা।

বিশ্বকেও এই দৃষ্টিতে দেখা যায়। সেও পারে শুধু অস্তিত্বের চমৎকারিত্ব দিয়েই আমাদের রোমাঞ্চিত করতে। সতর্ক 'আমি'-র সীমানা ভেঙ্গে বৃহতের সঙ্গে তখন ঘটে একাত্মতার অনুভব। বিশ্বপ্রকৃতি তো আমাদের জৈব প্রয়োজনে নানা কাজে লাগে ঠিকই। নিতান্ত লৌকিক অর্থেই প্রকৃতি আমাদের বাঁচায় এবং মারে। কিন্তু এইসব লাভক্ষতির বাইরেও বিশ্বের অন্য এক আকর্ষণ ও বিস্ময়করতা আছে। তারই স্পর্শে কবির উচ্চারণ হয়ে ওঠে প্রার্থনার মতো। "এই যে ধরণী চেয়ে বসে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে।" কী সেই মাধুরী ? সেই মাধুর্যের মূলে আছে, শুদ্ধ সত্তার সঙ্গে শুদ্ধ সত্তার মিলনের অনুভূতি। কার কাছে প্রার্থনা, "ইহার মাধুরী বাড়াও হে ?" সেই ঈশ্বরের কাছে যিনি কবিরই অন্তঃস্থিত এক প্রেমের শক্তির অন্য নাম। সেই শক্তি আছে মানুষেরই ভিতর, মানুষ তাকে পেয়েও হারায়, হারিয়ে আবার খোঁজে।

শংকরের বেদান্তদর্শনে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে প্রতিতুলনায় পারমার্থিক সত্যের কথা বলা হয়েছে। সেই দর্শন এবং তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের অভিমত যাই হোক না কেন, একটা কথা বোধ হয় মেনে নেওয়া দরকার। সাংসারিক স্বার্থের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমাদের প্রয়োজনের মাপে যেমন জগৎটাকে একভাবে জানা যায়, তেমনি আবার স্বার্থশূন্য শুদ্ধ ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে বিশ্বকে অন্য একভাবে লাভ করা যায়। এই দুয়ের ভিতর প্রভেদ এমনই আশ্চর্য যে, সাংসারিক দৃষ্টির সঙ্গে প্রতিতুলনায় অন্যটিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বলা অসঙ্গত নয়।

এই অন্য দৃষ্টি সম্বন্ধে এবার তিনটি কথা অতি সংক্ষেপে পর পর বলে নেওয়া যাক।

প্রথম কথা, আধ্যাত্মিকতা সব মানুষের ভিতরই অল্পবিস্তর আছে ; তবে অনেকের ভিতরই এটা সুপ্ত, আত্মসচেতন নয়। যেমন কাব্যশক্তি কোনো মানুষের মধ্যে বিশেষ মাত্রায় থাকলে তবেই তাঁকে কবি বলা হয়, আধ্যাত্মিক শক্তির বেলাতেও সেইরকম। অল্প মানুষকেই আমরা আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন বলে জানি।

দ্বিতীয় কথা, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সহাবস্থানই মানুষের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। এই দুয়ের ভিতর প্রায়ই একটা কলহ অথবা ভুল বোঝাবুঝি দেখা যায়। সামগ্রিক জীবনবোধের দিক থেকে কিন্তু কোনোটাই ত্যাজ্য নয়। আসলে এদের সম্পর্ক

একই সঙ্গে দ্বান্দ্বিক অথচ পরিপূরক। ব্যবহারিক দৃষ্টি সত্যমিথ্যার সংজ্ঞাটাকে এমনভাবেই নির্ধারিত করে নেয় যে, আধ্যাত্মিক অনুভবকে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অতএব অবাস্তব, এইরকম বোধ হয়। আবার আধ্যাত্মিক দর্শনও ব্যবহারিক ধারণাগুলিকে নিতান্তই সাময়িকপ্রয়োজননির্ভর, অতএব আপেক্ষিক, খণ্ডিত, পরস্পরসামঞ্জস্যহীন ও অসত্য মনে করে। ব্যবহারিক জ্ঞান ছাড়া যে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব নয় এটা বোঝা সহজ। সেই সঙ্গে কিন্তু অন্য একটা কথাও আছে, যেটা বুঝতে একটু সময় লাগে। শুধু সাংসারিকতা দিয়ে সংসার রক্ষা পায় না। মানুষের ভিতর একটা অকারণ আনন্দ ও নিঃশব্দ ক্ষমার শক্তি আছে সেটা না থাকলে সাংসারিকতা থেকে উত্থিত ক্ষোভ ও হিংসার সঞ্চিত বিষে সংসার কিছুদিনের ভিতর ছারখার হয়ে যেত। সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ভিতর একটা নিত্য আরোহণ অবরোহণের ধারা চলেছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই যেটা মানুষকে ক্রমাগত প্রাণদান করে।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলে আসছে একটা তৃতীয় কথা। শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সত্যকে সাংসারিক দৃষ্টিতে যতই 'অবাস্তব' মনে হোক না কেন, যুক্তি দিয়ে তাকে খণ্ডন করা যায় না। প্রত্যাশার ব্যর্থতা থেকেই কোনো ধারণাকে আমরা ভ্রান্ত বলে পরিত্যাগ করে থাকি। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জগৎ সম্বন্ধে যেসব চিন্তাভাবনা তৈরি হয়ে ওঠে, সেই সবই জাগতিক সাফল্য বা ব্যর্থতা দিয়ে ভ্রমমুক্ত বা ভ্রমযুক্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। আধ্যাত্মিকতায় ব্যর্থতা নেই। ক্ষমা থেকেও যদি আমাদের কোনো প্রত্যাশা থাকে তবে সেই ক্ষমা শুদ্ধ নয়। প্রত্যাশাহীন ক্ষমায় অনিবার্যভাবে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। বলা বাহুল্য, শুদ্ধ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি একটা লক্ষ্য বা আদর্শ মাত্র। যুক্তিও একটা লক্ষ্যই। তাকে যে আমরা জীবনে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারি না তাতে তার মূল্য কমে না।

যুক্তি দিয়ে যেসব বিশ্বাসকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় ধর্মের মৌল প্রত্যয় তার পরিধির ভিতর পড়ে না। কাজেই শুধু ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার পক্ষ থেকে যুক্তিকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই। একথা ধর্মে কখনো স্বীকৃত হয়েছে, আবার কখনো হয়নি। স্বীকৃতির বিভিন্ন রকমের উদাহরণ পৃথিবীর নানা ধর্ম থেকে দেওয়া কঠিন নয়। দৃষ্টান্ত বাড়াতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে, কাজেই একটি দৃষ্টান্তই এখানে দেওয়া যাচ্ছে। দৃষ্টান্তটি খ্রীষ্টধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে। 'Summa Contra Gentiles' নামে বিখ্যাত গ্রন্থে খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু সেন্ট টমাস একুইনাস বলেছেন :

> Although the truth of the Christian faith surpasses the capacity of the reason, nevertheless that truth which the human reason is naturally endowed to know cannot be opposed to the truth of the Christian faith.

মূল কথা, আধ্যাত্মিক সত্য যুক্তিকে অতিক্রম করে যায়, কিন্তু যুক্তির সঙ্গে তার বিরোধ থাকতে পারে না। এই প্রতিজ্ঞার গূঢ় অর্থ খ্রীষ্টীয় সমাজে সব সময় অনুধাবন ও অনুসরণ করা হয়নি। কিন্তু সেটা ভিন্ন কথা। আসল কথা, যুক্তি দিয়ে যদি কিছু খণ্ডন করা যায় তবে সেটা আধ্যাত্মিক সত্যের অংশ হতে পারে না। উদাহরণত বলা যায় যে, চোরের কী শাস্তি হওয়া উচিত এ নিয়ে যুক্তিতর্কের অবকাশ অবশ্যই আছে, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে বিচারের পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু, পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়, এই রকমের বাক্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায় না। যে-প্রেমের কোনো "হেতু" নেই সেই অহৈতুকী প্রীতি যুক্তির অতিরিক্ত, কিন্তু যুক্তিবিরোধী নয়।

তবু যে যুক্তি ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কলহ দেখা যায় তার একাধিক কারণ আছে।

একটি কারণ খুবই সহজ। ধর্ম অথবা আধ্যাত্মিক সত্যের নামে এমন অনেক কথা উপস্থিত করা হয় যে-সব আসলে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার পরিধির ভিতর পড়ে না। এই রকমের অনেক অনুশাসন শাস্ত্রের অনুমোদন নিয়ে আসে এবং তারপর যুক্তির ঊর্ধ্বে একটা প্রতিষ্ঠা দাবি করে বসে। যুক্তির দৃষ্টিতে এই দাবি অমান্য। এইসব ক্ষেত্রে গান্ধীর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

> My belief in the Hindu Scriptures does not require me to accept every word and every verse as divinely inspired...I decline to be bound by any interpretation, however learned it may be, if it is repugnant to reason or moral sense.

অর্থাৎ, কোনো কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে বলেই সেটা আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত এমন মনে করবার কারণ নেই। যদি কোনো অনুশাসন মানুষের যুক্তি নৈতিকবোধের বিরুদ্ধে যায় তবে সেই বিধান যতই পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, তাকে মেনে নেওয়া উচিত নয়।

এ থেকেই অন্য একটা কথা এসে পড়ে। কোনো বচন শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে এটাই যদি তাকে গ্রহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি না হয়, তবে শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার প্রয়োজন। সেই বিচার একই সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সতর্ক হবে। শ্রদ্ধাপূর্ণ এইজন্য যে, কিছু আধ্যাত্মিক সত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করে প্রধান প্রধান ধর্মে স্থান পেয়েছে। সতর্ক এইজন্য যে, সংসারের নানা স্বার্থ শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভের জন্য লুব্ধ। তাছাড়া কোনো মানুষই ভ্রান্তির সম্ভাবনার ঊর্ধ্বে নয়। কাজেই শাস্ত্রের বৃহৎ অবয়বের ভিতর যেসব বচন ও অনুশাসন স্থান পেয়েছে তাদের ভিতরও ভালোমন্দের ভেদ থেকেই যায়।

বিশেষত এযুগে, আঠারো শতক থেকে শুরু করে, শাস্ত্রের এইরকম সশ্রদ্ধ ও সতর্ক পাঠের বহু উদাহরণ আছে। বাইবেল নিয়ে এইরকম কাজ হয়েছে। উপনিষৎ নিয়েও হয়েছে। ধর্ম ও যুক্তির ভিতর যাঁরা সেতু বাঁধতে চাইবেন তাঁরা সব ধর্মের ক্ষেত্রেই এইরকম শাস্ত্রবিচারে আগ্রহী হবেন। যদি কোনো ধর্মে এই কাজ তেমনভাবে শুরু না হয়ে থাকে তবে ধরে নিতে হবে যে, সেই ধর্ম এখনো আধুনিক যুগে এসে পৌঁছায়নি।

কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। ধর্মের সঙ্গে যুক্তিতর্ককে মেলাবার কথা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও বলা আছে। কিন্তু তার সঙ্গে আধুনিক বিচারপদ্ধতির পার্থক্য উপেক্ষা করা যায় না। পনেরো বছর আগে, ১৯৭৩ সালে, ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে কিছু ধর্মালোচনার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তখন মনুসংহিতা থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে শোনালেন :

"আর্ষং ধর্মোপদেষঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ ॥"

অর্থাৎ, বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা যিনি ঋষিদের ধর্মোপদেশকে অনুসন্ধান করেন তিনিই ধর্ম জানেন, অন্যে জানে না। এখানে তর্ক অর্থাৎ যুক্তিপ্রয়োগের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রকেই সমর্থন করতে হবে, শাস্ত্রের বিরোধিতা করা যাবে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচার এরকম নয়। যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য খণ্ডন করতে হবে এমন সংকল্প ঠিক নয়, আবার প্রতিটি বাক্য সমর্থন করতে হবে এমনও নয়। ঐরকম কোনো পূর্বসংকল্প ত্যাগ করেই বিচার আরম্ভ করতে হবে। আগেই বলেছি, সেই বিচার হবে সশ্রদ্ধ অথচ সতর্ক।

রামমোহন লক্ষ করেছিলেন যে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে গৃহীত নানা ধর্মশাস্ত্রের ভিতর কিছু মিল আছে, আবার অমিলও আছে। যদি প্রতিটি মানবগোষ্ঠী এইরকম প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিচার আরম্ভ করে যে, নিজ সমাজে গৃহীত শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন করে যেতে হবে, তবে ধর্মালোচনায় বাদবিসম্বাদ বাড়বে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে পারস্পরিক প্রীতিতে আবদ্ধ করবার কাজ কঠিন হয়ে উঠবে। এইখানেই রামমোহনের যুক্তিশীলতার সঙ্গে আজকের দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দিকে প্রসারিত অসহিষ্ণু মৌলবাদের গভীর দ্বন্দ্ব। প্রথমটা ছিল সমন্বয়সন্ধানী, দ্বিতীয়টা সাম্প্রদায়িক বিভেদবুদ্ধি দিয়ে চালিত। রামমোহন প্রধান প্রধান ধর্মের সেই সব তত্ত্ব ও উপদেশের ওপরই জোর দিতে চেয়েছিলেন যেখানে বিরোধের নয়, ঐক্যের দিকটাই প্রধান। অবশ্য সব ধর্মকে এক অভিন্ন তত্ত্বে এনে মেলাতে হবে, এমন পূর্বসংকল্পও অসঙ্গত। তবে যুক্তিবিচারের ফলে বিভিন্ন ধর্ম ক্রমশ একটা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মানবিক ঐক্যের দিকে অগ্রসর হবে, এরকমই আশা করেছেন ধর্মের উদার ব্যাখ্যাতারা।

তুলনামূলক ধর্মবিচারও যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যাকে বলা হয়েছে স্বানুভূতি বা স্বোপলব্ধি। এর অভাবে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক পাঠ হয়ে ওঠে নিতান্ত যান্ত্রিক। ধর্মবিচারে এই সবই আবশ্যক : যুক্তি, স্বোপলব্ধি, বিভিন্ন শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা। অনেকে অবশ্য বলেছেন, যুক্তি অথবা স্বোপলব্ধির ওপর নির্ভরতায় ধর্মের বিচারে 'অরাজকতা' এসে যায়। সে সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। তবে অন্ধ অসহিষ্ণু আচারসর্বস্বতাকে অতিক্রম করবার এটাই পথ। এতে যদি গোষ্ঠীগত সংহতি কিছুটা শিথিল হয়, যদি ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ধর্মবিচারে আরো একটু পরিষ্কারভাবে শোনা যায়, তবে তাই ভালো।

খ

যুক্তি সম্বন্ধে কিছু ধর্মবিশ্বাসীর মনে যেমন একটা সন্দিগ্ধতা আছে, ধর্ম সম্বন্ধেও তেমনি যুক্তিবাদীদের মধ্যে একটা সংশয়গ্রস্ততা আছে। এই নেতিবাচক মনোভাবের প্রধান কারণ অবশ্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতির প্রবেশ, যে-সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। অন্য কয়েকটি সংশয়কেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা মৌল উপাদান হল বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ। এই অনুভূতির ফলে পৃথিবীকে বদলাবার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে যায়। অথচ পৃথিবীকে বদলানো দরকার। কিছু যুক্তিবাদীর এই এক আপত্তি।

বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধকে কোনো এক স্তরে এদেশের ভাষায় বলা যেতে পারে, মোক্ষানুভূতি। মোক্ষ ও ধর্মের ভিতর পার্থক্য আছে। মোক্ষানুভূতি নিয়ে সাধক যদি জগৎ থেকে দূরে সরে যান, তবে ধর্মাচরণ সম্পূর্ণ হয় না। ব্যক্তি যখন বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ নিয়ে বিশ্বের কর্মে নিযুক্ত হন, তখনই ধর্ম সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এইসব স্বীকার করে নেবার পরেও কিন্তু যুক্তিবাদীর সমালোচনায় চিন্তার যোগ্য বস্তু থেকে যায়।

ভারতীয় ঐতিহ্যে মোক্ষলাভের লক্ষ্যটাই বড় হয়ে উঠেছে আর ধর্মকর্মের ব্যাপারটা, যান্ত্রিক ও আচারসর্বস্ব হয়ে গেছে। উনিশ শতকে এদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধর্মচিন্তার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। ধর্ম নিয়ে সেই সময়ে

যাঁরা সবচেয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন তাঁদের চিন্তায় কথাটা ধরা পড়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বিবেকানন্দ ও রামমোহনের উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে তপন রায়চৌধুরীর একটি ইংরেজী বই প্রকাশিত হয়েছে যার বিষয়বস্তু, উনিশ শতকের বাংলার চোখে ইউরোপ (Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal)। তিনি যথার্থই বলেছেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভিতর একটা প্রভেদ বিবেকানন্দ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ধরতে পেরেছিলেন। সেই প্রভদটা হল এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান আগ্রহ মোক্ষে, পাশ্চাত্যের আগ্রহ ধর্মে। ("The West was dominated by its pursuit of dharma, while the central concern of Indian culture is moksha.") বিবেকানন্দের এই অন্তদৃষ্টি তুলনামূলক ধর্মপর্যায়ের একটি মূল্যবান ফল। রামমোহন আরো বহুদিন আগে অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের প্রাচীন ধর্মে অতি প্রাজ্ঞ উক্তি আছে, কিন্তু হিতকর্ম বলতে এদেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানই প্রাধান্য পায়। সেই তুলনায় খ্রীষ্টান সংস্কৃতিতে হিতকর্মের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক আরো বাস্তব ও মানবিক। এইরকম নিরপেক্ষ হিতাকাঙ্ক্ষী সমালোচনায় অনেকে অসন্তুষ্ট হন, অল্প লোকই একে গুরুত্ব দেন। অথচ দেশীয় অহংকার থেকে যদি আমরা স্বদেশের ধর্মাচারের দুর্বলতা সম্বন্ধে অন্ধ থাকাই কর্তব্য বিবেচনা করি তবে তাতে দেশেরই ক্ষতি। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, একদিকে মোক্ষের চিন্তা আর অন্যদিকে জাতিভেদ ও সামাজিক অসাম্য বিষয়ে বিবেকহীন ঔদাসীন্য, এই দুয়ের অসামঞ্জস্য এদেশের সমাজের এক লজ্জাজনক বৈশিষ্ট্য।

তবে মনে রাখতে হবে যে, ধর্মের গ্লানির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ ধর্মের ভিতর থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। রামমোহন বিবেকানন্দ ও গান্ধী সকলেই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ধর্মবিশ্বাস তাঁদের কর্মোদ্যমকে দুর্বল করেনি। বরং ধর্ম থেকে তাঁরা একটা বিশেষ শক্তি লাভ করেছিলেন। অন্তত এই রকমই তাঁরা বোধ করেছিলেন। অর্থাৎ, এঁরা একই সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসী আবার এদেশের ধর্মীয় ঐতিহ্যে যে-দুর্বলতা আছে সে সম্বন্ধে সচেতন। গান্ধীর জীবনের প্রথম দিকের রক্ষণশীলতা পরে ক্রমেই কেটে গেছে। যদিও এঁদের সাফল্য সীমাবদ্ধ তবু অন্য কেউ যে মোটের উপর আরো বেশি সফল হয়েছিলেন এমন বলা কঠিন।

সমাজকে ত্যাগ করে ধর্মকর্ম সম্পূর্ণ হয় না, একথা মেনে নেবার পর ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কের প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। গান্ধীজী আস্তিক্যে বিশ্বাসী ছিলেন ; মানবেন্দ্রনাথ নাস্তিক্যে। দু'জনেই রাজনীতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। শেষ জীবনে দু'জনেই দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাবার পক্ষপাতী হন। রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক রক্ষা করা আবশ্যক, এই বিশ্বাস মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মনে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে। গান্ধীর এই রকম বিশ্বাস ছিল প্রথম থেকেই। যিনি ধর্মবিশ্বাসী তাঁকে রাজনীতি ত্যাগ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। এইখানেই একটা প্রশ্ন এসে যায়। গান্ধী ধর্ম ও নৈতিকতার ভিতর বিরোধ দেখেননি, বরং দেখেছেন সদর্থক একটা যোগ। কাজেই রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণ করবার সময় ধর্মকে ত্যাগ করে চলতে হবে এমন প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য। তবে কি ধর্ম ও রাজনীতির ভিতর কোনো সীমারেখা রক্ষা করবার প্রয়োজন নেই ?

এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু কথা বলা যায়, গান্ধীবাদী দৃষ্টিতেও যেসব কথা গ্রহণযোগ্য মনে হবে। যাঁরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে চান তাঁদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে

দূরে থাকাই ভালো। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির মধ্যে কোনো গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। মোহাম্মদের যুগে যদি বা অন্যরকম ছিল তারপর অবস্থা বদলে গেছে। ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করবার পক্ষে আসলে দুই প্রান্ত থেকে দু'রকম যুক্তি আছে, দু'টিই সঙ্গত যুক্তি। অধঃপতিত ধর্ম একরকমের অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, যা থেকে রাজনীতিকে মুক্ত রাখা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। আবার উন্নত আধ্যাত্মিকতা কিছু মানুষকে সাধারণের চোখে এমন একটা শ্রদ্ধার আসন দেয়, দলীয় রাজনীতির সংস্পর্শ থেকে যাকে রক্ষা করাই সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। এই শ্রদ্ধার স্থান লাভ করবার জন্য কাউকে ঈশ্বরবিশ্বাসী হতেই হবে, এমন কথা বলা যায় না। রাসেল নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উচ্চপদে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সতর্ক বাণী উচ্চারণের ও প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার নৈতিক অধিকার তিনি লাভ করেছিলেন। অনুমান করা যায় যে, দলীয় রাজনীতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়লে এই বিশেষ মর্যাদা তিনি অর্জন করতে পারতেন না। এদেশে বিদেশে কোনো কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতার ক্ষমতাসীন রাজনীতিক দলের নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে এত স্পষ্টত আগ্রহী যে, তাঁদের বাণীর নিরপেক্ষতায় জনসাধারণের আস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। ধর্ম যদি সমাজে তার নৈতিক স্থানটি অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় তবে রাজনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে সতর্কভাবে অনেকটা দূরত্ব রক্ষা করাই শ্রেয়।

ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের আরেক অভিযোগ এই যে, ধর্ম মানুষকে অদৃষ্টবাদী করে তোলে। ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হন, সবই যদি তাঁর ইচ্ছায় ঘটে, তবে মানুষের উদ্যোগ কি নিরর্থক হয়ে ওঠে না? এদেশের দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক এত বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার ভিতর সদাসর্বদা বাস করতে বাধ্য হয় যে, তাদের পক্ষে অদৃষ্টবাদী হওয়া বিস্ময়কর নয়। তবে ধর্মের সঙ্গে অদৃষ্টবাদের সম্পর্কের ভিতর একটা 'প্যারাডক্স' বা কূটাভাস আছে। একটা তুলনা টেনে সেটা দেখানো যায়। বিজ্ঞান বলে যে, বিশ্বের প্রতিটি ঘটনারই একটা কারণ আছে, ঘটনাপ্রবাহ কার্যকারণে আবদ্ধ। এই থেকে মনে করা যেতে পারত যে, সমস্ত ভবিষ্যৎই তবে অতীত দিয়ে নির্ধারিত, যা ঘটবার তা ঘটবেই। যা অবধারিত তাকে স্বীকার করে নেওয়াতেই মুক্তি, এইরকম কথা বিজ্ঞানমনস্কতার সীমার ভিতরই বহুকাল থেকে শোনা গেছে। অথচ বিজ্ঞান ও নিয়তিবাদের ভিতর নিশ্চয়ই কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। বরং বিজ্ঞানকে বিশেষত আধুনিক যুগে মানুষের নিজস্ব উদ্যোগের সহায়ক হিসেবেই দেখানো হয়। বিজ্ঞানের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে মানুষ আরো উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঐ রকমই হওয়া সম্ভব। ধর্ম মানুষকে অনিবার্যভাবে অদৃষ্টবাদী করে না। বরং আধ্যাত্মিকতা থেকে এক ধরনের নির্ভরতা ও প্রেরণা লাভ করা সম্ভব যাতে মানুষের উদ্যোগ বাড়ে। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে আর্থিক উন্নয়নের নতুন যুগে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম মানুষকে উদ্যোগী হতে সাহায্য করেছে। আসলে ধর্ম মানুষকে কর্মে উৎসাহী করবে কিনা, সেটা অনেকখানি নির্ভর করে বৃহত্তর সামাজিক পরিস্থিতির ওপর।

প্রত্যাশা অথবা ফলাকাঙ্ক্ষা ছাড়া কর্মে উৎসাহ থাকে না, ধর্মের সমালোচনায় এইরকম একটা কথাও শোনা গেছে। প্রথম দৃষ্টিতে এই আপত্তিকে যতটা সারবান মনে হয় ততটা, সে আসলে নয়। কর্ম সম্পাদনের জন্য কিছু উপকরণের প্রয়োজন হয়, সেইসব পাওয়া না গেলে বাধা পড়ে, এই পর্যন্ত স্বীকার করা যায়। কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা বেশি হলে কাজ

ভালো হয়, একথা মেনে নেওয়া যায় না। যেসব শিক্ষক অথবা কর্মী বেশি আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরাই বেশি ভালো শিক্ষক ও কর্মী হন, অভিজ্ঞতা এমন কথা বলে না। ভালো শিক্ষক পড়াতে ভালোবাসেন, সেটাই তাঁর প্রধান পুরস্কার, অর্থ ও খ্যাতির আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কলহ ও ব্যর্থতাবোধ বাড়ে। কর্মকে কর্ম বলেই ভালোবাসতে না পারলে সেটাকে শেষ পর্যন্ত শাস্তি বলে মনে হয়। ফলাকাঙ্ক্ষার চাঞ্চল্যে নয়, একাগ্র আত্মনিযুক্তিতে কর্মের উৎকর্ষ বাড়ে।

সংগ্রাম ও শান্তির বৈপরীত্যে আশ্রিত একটি কূটাভাসের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অধর্ম অথবা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কোরাণে ও ভগবদ্‌গীতায় কর্তব্য বলে মান্য করা হয়েছে। অথচ সময়ে আবদ্ধ কোনো যুদ্ধই মানুষের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। ধর্মকে তাই রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও অনাসক্তির কথা বলে যেতে হয়। অনাসক্ত সংগ্রামের তত্ত্বে কোনো আত্মখণ্ডন নেই, বরং সমস্যার গভীরতার ইঙ্গিতই আছে। যুদ্ধের চাঞ্চল্য যদি মানুষের আত্মাকে গ্রাস করে নেয় তবে শেষ বিচারে সেটাই মনুষ্যত্বের পরাভব।

ইউরোপে মধ্যযুগীয় বদ্ধসমাজের সঙ্গে রেনেসাঁসের মুক্তসংস্কৃতির বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ কেউ ধর্মের সমালোচনা করেছেন। ধর্ম মানুষকে শেখায় ঈশ্বর অথবা মোক্ষের ভিতর আত্মবিলোপের সাধনা, মূল্য দেয় না ব্যক্তির আত্মস্বাতন্ত্র্যকে, এইরকম কারো কারো মনে হয়েছে।

পনেরো শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে পশ্চিম ইউরোপের চেতনায় পৃথিবীর দিগন্তটা হঠাৎ অনেকখানি প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নাগরিক সভ্যতা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। বিজ্ঞান প্রবলভাবে ধাক্কা দিচ্ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধর্মের দ্বারা সুরক্ষিত পুরনো ধারণার বদ্ধ কপাটে। প্রাচীন গ্রীকদর্শন ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল ইসলাম। আর এইসব মিলে ইউরোপের চিন্তায় ও কল্পনায় এসে পৌঁছেছিল এক ঐতিহাসিক সৃজনধর্মিতা। এইসবই এখন পরিচিত তথ্য। তবে মনে রাখা ভালো যে, রেনেসাঁসের ঐ যুগটা নাস্তিক্যের যুগ ছিল না। চিন্তার জগতে জড়বাদী দর্শনের প্রভাব বিস্তার হতে তখনো অনেক দেরি। ধর্মীয় চিন্তায় পরিবর্তন আসছিল ঠিকই, কিন্তু রেনেসাঁসের যুগের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে পাই নতুন জীবনবোধ আর ধর্মীয় প্রেরণার এক উজ্জ্বল সমন্বয়। সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকলার দিকে তাকালেই এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। ধর্মের সঙ্গে জীবনবোধের বিরোধটা রেনেসাঁস অনেকখানি ভেঙ্গে দিয়েছিল এইখানে তার মূল কৃতিত্ব।

পরবর্তী যুগে ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ আর আত্মবিলোপের পথে টেনে নিয়ে গেছে ধর্ম ততটা নয়, যতটা আগ্রাসী এক রাষ্ট্রসর্বস্বতা। বিশ শতকে পৌঁছে তার চরম প্রমাণ পাওয়া গেল ব্যক্তিত্বগ্রাসী সংস্কৃতিগ্রাসী হিটলারী নাৎসীতন্ত্রে আর স্তালিনী বলশেভিক সমাজতন্ত্রে। এই সমাজতন্ত্র কিন্তু ইহসর্বস্ব।

অন্য একভাবে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশকে এযুগে খর্ব করে চলেছে বৃহৎবাজার সভ্যতা। এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উল্লেখযোগ্য বিশেষত এই কারণে যে, বাণিজ্যের বিস্তারই এক সময়ে ব্যক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল শিল্প সংগঠনের অন্য এক যুগ। বৃহৎ শিল্পসংগঠন আর প্রকাণ্ড বাজার মিলে অবস্থাটা পাল্টে দিয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে বলা হয় যে, বাজার চলে ক্রেতার অভিরুচি অনুযায়ী। কিন্তু বাস্তবে ক্রেতার অভিরুচিটাই অনেকখানি গঠিত হয়ে যাচ্ছে এমন এক ছাঁচে যেটা তৈরি হচ্ছে অতিকায়

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সুবিধা অনুসারে। এ যুগে ব্যক্তিত্বনাশী শক্তি বলতে রাষ্ট্র আর বাজারই প্রধান। এজন্য ধর্মকে এককভাবে দায়ী করা অযৌক্তিক।

ধর্ম মানুষকে কতটা এক ছাঁচে তৈরি করবে সেটা স্বভাবতই নির্ভর করে সেই ধর্ম ও সমাজের প্রকৃতির ওপর। ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে তো স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বলে আর কিছু রইল না, এই বলে যে তর্ক শুরু হয় তাতে মূল প্রশ্নটা ঠিক ভাবে হাজির করা হয় না। মোক্ষ নয়, মোক্ষে পৌঁছবার পথ নিয়ে চিন্তা শুরু করা দরকার। সেই পথ এক নয়, অনেক। আর নানা মানুষ নানাভাবে অগ্রসর হন। সেই ভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বে কত পার্থক্য! আসলে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রুচি নিয়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে, যাত্রা শুরু করে। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় থাকে বহু বৈচিত্র্য। সেই সব অভিজ্ঞতার ভিতর থেকেই মুক্তির পথের সন্ধান করতে হয়। আধ্যাত্মিকতা ব্যক্তিত্বনাশী, এইভাবে কথা তুলে লাভ নেই। নিজস্ব উপলব্ধির মূল্যের কথাটাই বেশি জরুরী। আধ্যাত্মিক স্বোপলব্ধি কখনো যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেই উপলব্ধিতে ব্যক্তি বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে নতুন করে পায়। এটাকে ব্যক্তিত্বের বিলোপ বললে ভুল হয়।

এই সঙ্গে একটা সাবধানী বাক্য যোগ করা ভালো। 'অনন্য' অভিজ্ঞতার নেশাও মানুষকে ধ্বংসের পথে টানতে পারে। সেই বিধ্বংসী আকর্ষণ এতই দুর্নিবার হয়, তার পিছনে মিথ্যা যুক্তি এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। কোনো সহজ পথে এর সমাধান আছে এমন জানি না। কিসে ব্যক্তিকে ক্রমে সবল করে তোলে, ব্যক্তিত্বকে বিকাশের পথে নিয়ে যায়, আর কোন আকর্ষণ তাকে দুর্বল ও আবদ্ধ করে ফেলে, সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ছাড়া উপায় নেই।

আরো মৌল একটা সংশয়ের কথা এরপর দূরে ঠেলে রাখা যায় না। কেউ নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলতে পারেন, বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতাকেই লক্ষ্য বলে মেনে নিতে হবে কেন? বিশ্বকে বিরোধী শক্তি বলে ধরে নেওয়াই তো বেশি বাস্তবসম্মত। ঈশ্বরহীন বিশ্বে ব্যক্তিকে তার পথ খুঁজে নিতে হবে। ধর্মবিশ্বাসী কি মানুষকে সেই বিদ্বেষী চিন্তার স্বাধীনতা দিতে রাজী আছেন? এর উত্তরে বলতে হয়, সেই স্বাধীনতা ব্যক্তির থাকাই উচিত। কোনো ব্যক্তিকে তো জোর করে বিশ্বপ্রেমে ঠেলে তোলা যায় না। তাঁকে তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আসলে প্রেম ও বিদ্বেষ, বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, দুয়েরই সমস্ত বিশ্বকে গ্রাস করে নেবার শক্তি আছে। ধর্মবিশ্বাসী শুধু এটাই চাইতে পারেন যে, অবিশ্বাসীর পাশে পাশে বিশ্বাসীকেও তাঁর নিজ মত ও নিজ পথ অনুসারে স্বেচ্ছায় চলতে দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্বেষী যদি বৈরভাবে বিশ্বের পুজো করতে চান তো ধর্মবিশ্বাসীর তাতে বাধা দেবার অধিকার নেই।

স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে, বিশ্ববিদ্বেষ নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। সত্যমেব জয়তে, এই তাত্ত্বিক বাণী কি আমাদের পরিচিত জীবনে প্রতি মুহূর্তেই খণ্ডিত হয়ে চলছে না? এ জগতে কোনো প্রত্যাশারই কি মূল্য আছে? আমদের ভিতর যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যাঁরা স্বাভাবিক প্রতিভা এবং অবিচল অনুশীলনের দ্বারা প্রায় পূর্ণমনুষ্যত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়েছেন, তাঁরাও জীবনে যে-পরিমাণ দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তাতে জগতের বিধান সম্বন্ধে নিরাশ বোধ না করাই কঠিন। যাঁরা মানবহিতৈষী তাঁদেরও শত্রুর অভাব নেই, যাঁরা দয়াবান তাঁদের প্রতিও মানুষ নির্দয়। যে-বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মাইকেল মধুসূদন একদা বলেছিলেন, সর্বকালের এই মহত্তম বাঙ্গালী ("the greatest Bengali that ever lived"),

তিনিও দীর্ঘ পরোপকারী জীবনের ক্লান্ত সন্ধ্যায় পিতাকে গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছিলেন, "সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকরণে যে আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম।" (২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল)। যে রবীন্দ্রনাথ একদিন পরম সারল্যে বলেছিলেন, " এই বসুধার/ মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার/ তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত/ নানাবর্ণগন্ধময়", তাঁরই জীবনের শেষপ্রান্তে এক অসাধারণ আবেগকম্পিত গানে 'মানবপুত্রের' মুখ থেকে যখন শুনি, "এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা", তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কবির দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরমপিতার প্রতি উচ্চারিত খ্রীষ্টের ঐ নিদারুণ উক্তির কোথাও মিল ছিল। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় গ্যয়তের লেখায় তরুণ হ্বের্থেরের মর্মন্তুদ সেই প্রশ্ন : "And if the God from heaven found the cup too bitter for his human lips, why should I exalt myself and act as if it tasted sweet to me?" স্বর্গ থেকে আগত ঈশ্বরপুত্রের ওষ্ঠেও যদি জীবনের স্বাদ এমন অসহ্য তিক্ত ঠেকেছিল, তবে আমি কোন উল্লাসে কী করে বলব যে জীবন মধুর ?

অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্বেষের সপক্ষে কারণের অভাব নেই। বিপক্ষে তবু ভাববার মতো একটি কথা আছে। বিশ্বের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে মানুষ নিজেই ক্ষতবিক্ষত হয়, নির্বিকার বিশ্ব তার নির্ধারিত পথ ধরে চলে। জীবনের প্রতি বিদ্বেষের শতসহস্র যতই কারণ থাকুক না কেন, তাতে বিদ্বিষ্ট বিশ্বের কোনো শান্তি অথবা সংশোধন হয় না, যন্ত্রণা ভোগ করে বিদ্বেষী মানুষ। একথা জেনে আমরা আবার এই অনাদি অনন্ত জগৎধারার দিকে তাকাই। আমরা জানি, এর বিরুদ্ধে অভিমান করা অর্থহীন। চোখে পড়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়, আমাদের মন তখন করুণায় ভরে ওঠে। সেই করুণার দৃষ্টিতে যখন মানুষের এই চলমান মহাসংসারকে দেখি তখন তাকেও মনে হয় এক মহাকাব্য—মহাভারতের মতো। সেই কাব্যে হিংসা লোভ মিথ্যা কিছুরই অভাব নেই, তবু সে মহাকাব্য।

প্রত্যাশা থেকে বিদ্বেষ আসে, প্রত্যাশাহীন দৃষ্টি মনকে মুক্ত করে। ঈশ্বরচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন, "সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম।" নির্লিপ্ত দৃষ্টি ছাড়া সেই ক্লেশের হ্রাস হয় না। যেহেতু সংসার ত্যাগ করা মানুষের সাধারণ ধর্ম হতে পারে না, কাজেই সংসারের ভিতরই যথাসম্ভব মুক্তির পথ খোঁজা ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্য পথ নেই। সংসারে বাস করে বিশ্বের প্রতি বিদ্বেষমুক্ত দৃষ্টিতে তাকানো কত কঠিন, আমরা সবাই সে কথা জানি। বারবার আমরা আকণ্ঠ তিক্ততায় ডুবি, বারবার মুক্তি খুঁজি। আমরা যে প্রত্যেকেই মুক্ত হতে পারব, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু পথের সন্ধান ত্যাগ করা যায় না।

ভগবানের কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন ছিল : "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?" ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, জীবনই অবশেষে সকলের বিচার করে। তবে সব বিচারের শেষে, ক্ষমা ছাড়া উপায় কী ? যাকে আমরা ক্ষমা করি না, ক্ষমাহীনতার বজ্রবন্ধনে সে-ই আমাদের আবদ্ধ করে। ক্ষমা ছাড়া মুক্তি নেই।

সাংসারিক যুক্তির অভ্যস্ত ভাষা এটা নয়। কিন্তু বিচার ও ক্ষমার যে-দ্বন্দ্ব ধর্মের ভিতর একটা বিশ্বস্ত ভাষা খুঁজে পেয়েছে, সেটা যুক্তির কাছেও অবোধ্য নয়। তার ভিতরও একটা সীমাভাঙ্গার শক্তি আছে, তাকে সাংসারিকতায় আবদ্ধ থাকতে হবে এমন কোনো

নিয়ম নেই। সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিক নিষ্কাম যুক্তির কথা বলেছিলেন। ধর্ম ও যুক্তি এইভাবে কাছাকাছি চলে আসে। এই যোগটাই মঙ্গলজনক। তবে একেও কোনো চিরকালীন সমন্বয়ের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করা ভুল। চিরকালীন সমন্বয় হয়ে ওঠে ভঙ্গীসর্বস্ব। সংসার ও মুক্তির ভিতর যে অন্তহীন আরোহণ-অবরোহণ জীবনের প্রাণবস্তু, তারই মধ্যে ধর্ম ও যুক্তিকে স্থান করে নিতে হবে।

যুক্তি ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আলোচনা স্বভাবতই বহুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অতিশয় সরল করে ফেলবার ঝুঁকি নিয়েও অবশেষে মোটকথাটা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যাক। মানুষের স্বভাবে আছে একটা গভীর দ্বৈত, একই সঙ্গে সে মহত্ত্বে ও নীচতায় চিহ্নিত। সেই দ্বন্দ্ব যেমন প্রতিফলিত হয়েছে ধর্মে তেমনি বিজ্ঞানে। দুয়েরই একটা আদর্শরূপ আছে। আবার দুয়েরই বিকৃতি হয়ে ওঠে কঠিন দুশ্চিন্তার কারণ। বিজ্ঞানের যেটা আদর্শরূপ তার মূলে পাই শুদ্ধ জিজ্ঞাসা, আধ্যাত্মিকতার মূলে শুদ্ধ প্রেম। বাস্তবে বিজ্ঞান তবু যুক্ত হয় নানা সাংসারিক প্রয়োজনের সঙ্গে, যার ফলে একদিকে সে হয়েছে ঐহিক উন্নতির সহায়, অন্যাদিকে খুলে গেছে বিচিত্র অপব্যবহারের পথ। এযুগে বিজ্ঞানের সবচেয়ে উল্লেখ্য অপপ্রয়োগ ঘটেছে যুদ্ধের আয়োজনে আর ভোগবাদের আতিশয্যের উপায় উদ্‌ভাবনে। ধর্মকেও নেমে আসতে হয় সংসারে। তার যোগ ঘটে ভয় লোভ হিংসার সঙ্গে। কদর্য সেই বিকৃতি।

বিজ্ঞানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা গেছে সমাজহিতৈষী নানা মানুষের পক্ষ থেকে। ধর্ম ও অহিংসার দৃষ্টি থেকে যে প্রতিবাদ, তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। ধর্মের বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আরো সুপ্রাচীন। তার অনেকখানি এসেছে ভক্তি আন্দোলনের ভিতর থেকে। কিন্তু যুক্তির ভিত্তিতে ধর্মীয় অধঃপতনের যে বিচারনির্ভর সমালোচনা, তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। এমনি করে ধর্ম ও যুক্তি হয়ে ওঠে পরস্পরের সংশোধক ও পরিপূরক। যেখানে বিকৃতি, সেখানে এদের দ্বন্দ্ব। তার ঊর্ধ্বে, মৈত্রীপূর্ণ সহাবস্থান। এই দ্বন্দ্ব এবং মৈত্রী, দুয়েরই মূল্য স্বীকার্য।

মানুষের কিছু মৌল দুঃখ আছে যেসব কোনো কৌশলেই দূর করা যাবে না। এরই ভিতর শুদ্ধ প্রেম ও জিজ্ঞাসা আমাদের মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। যদিও এই সমবায় দুঃসাধ্য, তবু সেই লক্ষ্যের বিকল্প নেই। লক্ষ্য না ব'লে পথ বলাই ভালো। সেটাই ধর্মেরও ভাষা। সেই পথ গিয়ে পৌঁছেছে অকূল মোহানায়, তখন পথের অভ্যস্ত নিয়মগুলিও বাধা হয়ে ওঠে। যে সব আচারে আমরা পরিহিত, সবই সেখানে পরিত্যাগ করতে হয়।

এইখানে এসে ভাষাও আমাদের প্রতারণা করে। কিছু বোঝাতে চাইলেই উপমা আবশ্যক, অথচ কোনো উপমাই লক্ষ্যভেদী নয়, দ্ব্যর্থতাহীন নয়। বলবার যোগ্য কত কথাই তো বলে ওঠা যায় না। রচনার স্বচ্ছতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন যে-রাসেল, আর ধর্মের ভাষাকে যিনি স্বভাবতই সন্দেহের চোখে দেখতেন, তাঁরও মুখ থেকে শুনি এই কথা। তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাই স্মরণযোগ্য এই বাক্যটি :

> "The things one says are all unsuccessful attempts to say something else—something that perhaps by its very nature cannot be said."[২]

যা বলা হয় সে সবই অন্য কোন কথা বলবার অসফল চেষ্টা—যে কথা সম্ভবত কিছুতেই বলা যায় না। জীবনের পরম লগ্নে এইরকমই বারবার ঘটে। যুক্তি আমাদের অসম্ভবের এই স্বীকৃতির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। এর পর অধিক তর্ক নিষ্ফল। বিতর্ক

মূল্যবান, তবু থামতে জানাও চাই।

শিল্পচিন্তা

আবু সয়ীদ আইয়ুবের স্মৃতিতে

মনুষ্যত্বের দু'টি মৌল বৈশিষ্ট্য, দুই মূল প্রবৃত্তি শিল্পকর্মে এসে মিলেছে। এদের ব্যাখ্যা করতে গেলে একেবারে গোড়ার কথা দিয়ে শুরু করতে হয়।

১

জীব হিসেবে মানুষের এক বৈশিষ্ট্য, সে কারিগর। তার দেবতাদের মধ্যে একজন হলেন বিশ্বকর্মা।

আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর আছে তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখ, থাবার জোর, লাফাবার শক্তি। এসব দিক থেকে মানুষের ক্ষমতা অতি সামান্য। এমন কি দ্রুত পলায়নের শক্তিতেও সে অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সমকক্ষ নয়। কিন্তু মানুষের আছে একটি বিশেষ ক্ষমতা। সে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্র অথবা উপকরণ নির্মাণ করে নিতে পারে। এই দিয়ে মানুষ পুষিয়ে নিয়েছে জীব হিসেবে অনেক দুর্বলতা। আত্মরক্ষার উপায়, বাসস্থান, পরিবহণ, কৃষি ও শিল্প, সব কিছুর পিছনেই আছে কারিগরী কৌশল। আমাদের ভাষায় শিল্প শব্দটির দু'টি অর্থ, যার একটির যোগ প্রত্যক্ষভাবেই কারিগরির সঙ্গে।

অন্যান্য জীব প্রকৃতির কাছে থেকে জন্মসূত্রে যা পেয়েছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট। মানুষের আছে উদ্‌ভাবনী শক্তি। কারিগর মানুষ চলে সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে, পরিপার্শ্বকে সে ক্রমাগত সংশোধন করে নিতে চায় নিজের পরিকল্পনা অনুসারে। এ কাজ করতে গিয়ে তাকে আয়ত্ত করতে হয় নতুন কলা ও কৌশল। পরিপার্শ্বের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সে নতুন করে গড়ে। প্রকৃতির অপূর্ণতাকে সে মেনে নিতে চায় না। মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনে চলে প্রকৃতির সংশোধন ও সংযোজন। শিল্পের যোগ এই সংযোজনী প্রবৃত্তির সঙ্গে।

২

মানুষের আরেক বৈশিষ্ট্য তার আত্মপ্রকাশের শক্তি, তার ভাষা। অন্যান্য জীবেরও এই শক্তি আছে অল্প পরিমাণে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

জৈবিক স্তর থেকেই আবারও কথাটা শুরু করা যাক। ভয়, ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন আকর্ষণ, এইসব জৈবভাবের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। এই সবের ভিতর দিয়ে জীবনের কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এক একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ বিশেষ ধরনের, তার যোগ বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্গে। খিদে পেলে শিশু কাঁদে, তাই দেখে মা স্তন্য দেন। বড় হয়েও অভাবে পড়ে মানুষ বিলাপ করে, হয়তো তাতে অন্য মানুষের সহানুভূতি জাগে,

হয়তো সহায়তা লাভ হয়।

অর্থাৎ, ভাষা কাজ করে। স্বার্থ প্রেম দ্বন্দ্ব মিলিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এই সব আবেগের প্রকাশের ভিতর দিয়েই সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের আত্মপ্রকাশ। এই শক্তিতে কখনো আমরা অপরকে কাছে টানতে চাই, কখনো দূরে সরিয়ে দিই, কখনো কিছু মানুষকে কাছে টানি আর একই সঙ্গে অন্য কিছু মানুষকে দূরে সরাই। আমাদের জৈব স্বার্থের সঙ্গে, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে, এই সব কাজের যোগ আছে। সব সময়ে যে শব্দপ্রয়োগ করতে হয় এমন নয়। আকারে ইঙ্গিতেও কাজ হয়।

শব্দকে আশ্রয় করে ভাব প্রকাশ করতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে অনেক সময় এই কাজটা আমাদের সচেতনভাবে করতে হয় না, আমরা যে আত্মপ্রকাশ করছি এটা আমাদের খেয়ালের ভিতর থাকে না। আকারে ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করতে গেলে আরো সচেতনভাবে সেটা করতে হয়। তখন তাকে আত্মপ্রকাশ বলে চিনে নেওয়া সহজ। অন্তত দর্শকের দৃষ্টিতে তাই। এইখানে নাটকের শুরু।

কারিগরি আর আত্মপ্রকাশ এই দুই এসে মিলেছে শিল্পে। বিশুদ্ধ শিল্পে কারিগরির চেয়ে আত্মপ্রকাশের ভাবটাই প্রধান। তবে জৈব স্তর থেকে শিল্পের স্তরে পৌঁছবার পথে এইসব শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

৩

গোড়ার কথায় আবারও ফিরে আসা যাক।

আত্মপ্রকাশের জৈব উদ্দেশ্য এই, এতে কাজ হয়, অন্তত কাজ হবে বলে প্রত্যাশা থাকে। আমরা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু বলি তখন তাতে সাহায্যের প্রত্যাশা থাকে, হয়তো সাহায্য পাওয়া যায়। আমার ছেলেটি হারিয়ে গেছে, একথা বলবার পর প্রত্যাশা থাকে যে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীরা আমাকে সাহায্য করবে ছেলেটিকে খুঁজে বের করতে, সাধারণত এই প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজও হয়।

কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন ঐ রকম কোনো প্রত্যাশা ছাড়াই আমরা কথা বলি, আবেগমিশ্রিত তবু প্রত্যাশাহীন কথা। শুধু কথা বলেই কখনো মন ভারমুক্ত হয়। আমরা প্রিয় বন্ধু মারা গেছে, একথা যখন নানাভাবে ছোটবড় ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে বলি, তখন এমন কোনো প্রত্যাশাই থাকে না যে শ্রোতারা সাহায্য করবে সেই বন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে।

দুঃখী মানুষ দুঃখের কথা বলছে। প্রেমাস্পদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা। এই আর্ত নিবেদনের পিছনে একমাত্র প্রত্যাশা শ্রোতার সহানুভূতি, অন্য প্রত্যাশা নেই। অর্থাৎ এই নিবেদনের ভিতর দিয়ে পরিপার্শ্বের কোনো পরিবর্তনই ঘটছে না, ফিরে আসছে না প্রেমাস্পদ, ফিরে আসছে না প্রত্যক্ষত হারিয়ে যাওয়া কিছুই। তবু এই বলা। বলার ভিতর দিয়ে মনের ভার নেমে যাচ্ছে। দুঃখে যখন কেউ পাষাণমূর্তি হয়ে থাকে তখন বন্ধু হিসেবে আমরা চিন্তিত হই। আমরা চাই, কিছু বলুক, কাঁদুক, মনের ভাবটা কথার ভিতর দিয়ে, কান্নার ভিতর দিয়ে নেমে যাক।

সেই কথা, সেই কান্না, যাতে পৃথিবীর কোনো পরিবর্তনই হচ্ছে না বাহ্যত, সমস্ত কারিগরি উদ্দেশ্যের বাইরে যেটা, তাতে মন ভারমুক্ত হয় কেন ? কী ভাবে ? যাতে কোনো কার্যসিদ্ধি হচ্ছে না সেই আত্মপ্রকাশে কিসের স্বস্তি ?

এর একটা নঞর্থক ব্যাখ্যা আছে, আর একটা সদর্থক।

যেটা ভিতরের তাকে বাইরে আনবার একটা বেগ মানুষের ভিতর সঞ্চারিত হয় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় জৈব উদ্দেশ্যে। বাইরে আনবার পর সেই বেগটা প্রশমিত হয় প্রকৃতিরই নিয়মে। এটা ঘটে দেহে ও মনে উভয় স্তরে। নিতান্ত দৈহিক স্তরে এর উদাহরণ দেওয়া সহজ, যেটা ভিতরে জমে উঠেছে সেটাকে বের করে দিয়েই ভারমুক্তি।

মনের ক্ষেত্রেও এই রকম একটা ব্যাপার ঘটে। মনে কথা জমে ওঠে, কথা বলেই ভারমুক্তি। কোনো অভিজ্ঞতা, বিশেষত মনে দাগ কাটে এমন অভিজ্ঞতা, আমরা বাইরে প্রকাশ করতে চাই। এর পিছনেও জৈব উদ্দেশ্য উপস্থিত। কিন্তু উদ্দেশ্যের অপেক্ষা না রেখেই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়ে যায়। এমনও হয় যে, একটা কথা প্রকাশ না করাই উচিত, প্রকাশ করবার বেগটা তবু দেহেমনে সঞ্চারিত হতেই থাকে। আমরা বলি, 'কথাটা নিজের কাছেই রাখতে পারবি তো, না পেট ফুলে উঠবে!' কারো সম্বন্ধে বলি, ওর পেটে কথা থাকে না।

একটা গল্প আছে, অনেকেই জানেন। মানুষটাকে বলা হয়েছিল একটি কথা কাউকে না জানাতে। বেচারা অবশেষে মাটিতে গর্ত করে সেই গর্তে মুখ রেখেই কথা বলেছিল। এ যেন গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে পেটের ভার লাঘব করবার মতো ব্যাপার।

প্রকাশ করে আমরা স্বস্তি পাই। স্নায়ুতে ও মনে যে বেগটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মতো জমে ওঠে, দেহমন থেকে সেটাকে নামিয়ে দিই। প্রায় ভূত তাড়াবার মতো ব্যাপার। নঞর্থক দিক থেকে ব্যাখ্যা এই।

কিন্তু এটাই সব নয়। আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়ে একা মানুষ অনেকের সঙ্গে যুক্ত হয়। একে বলা যেতে পারে, একাকিত্ব থেকে মুক্তি। বলা যেতে পারে, যোগের আনন্দ। এটাই সদর্থক ব্যাখ্যা।

অনেক সময় এই যোগের ভিতর দিয়ে ব্যবহারিক লাভ হয়। দশজনের সহায়তায় কার্যসিদ্ধি হয়। কিন্তু কার্যসিদ্ধির কথা এখন বলা হচ্ছে না। এইরকম ব্যবহারিক লাভ যেখানে নেই সেখানেও যোগের ভিতর দিয়ে মনের অভাব দূর হয়। ছোটো 'আমি'র সীমা ছাড়িয়ে যখন একের মন দশের ভিতর প্রসারিত হয় তখন তাতেই একটা বন্ধনমুক্তি ঘটে, আনন্দ লাভ হয়। নিতান্ত জৈব প্রয়োজনের বাইরেও আত্মপ্রকাশের অথবা আত্মিক প্রসারের একটা আনন্দদায়িনী শক্তি আছে।

বস্তুত মানুষের ভিতর স্বাভাবিকভাবেই দু'টি বিপরীত ভাব লক্ষ করা যায়। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা।' মানুষের ভিতর একটা সহজ প্রবৃত্তি আছে, সব কিছুর ভিতর নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, ছোটো আমিকে আরো বড় কিছুর ভিতর হারিয়ে ফেলবার। কিন্তু আবার আছে একটা সাবধানী বুদ্ধি, যেটা একই সঙ্গে আমাদের নিরাপত্তা এনে দেয় এবং অভ্যস্ত দেয়ালের ভিতর আবদ্ধ করে। সেই আবদ্ধতার ক্লেশ থেকে মুক্তি পাই, চিত্তকে যখন প্রসারিত করি। সেটা সহজ আনন্দ।

৫

আত্মপ্রকাশ যখন ঘটে জৈব স্তরে তখন সেটা প্রকৃতিজ এবং অসচেতন। আমরা সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়ে হাই তুলি না। তেমনি আমরা যখন ক্রোধে ফেটে পড়ি অথবা কাউকে দেখে হঠাৎ খুশি হই, তখনও সেটা সচেতন সিদ্ধান্তের ফলে নয়।

কিন্তু অভিনেতা যখন অভিনয় করেন সেটা সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই করেন। সেটা শিল্প। শিল্প এই অর্থে প্রকৃতিজ নয়, বরং প্রকৃতির অনুকরণ অথবা প্রতিকরণ। সেটা সচেতন।

এই অনুকরণের ইচ্ছাটা আসে কেন ? কী এর উদ্দেশ্য ?

অসচেতন ভাষা যেমন আবেগমিশ্রিত ভাষা, শিল্পের সচেতন অনুকরণও তেমনি আবেগমিশ্রিত অনুকরণ। এর পিছনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয়। অনেক কারণেই এটা ঘটে আর মানুষের চেতনার একাধিক স্তরে শিল্পকে আমরা পাই।

আমরা যখন কোনো বস্তুর প্রতিকৃতি সৃষ্টি করি তখন যেন সেই বস্তুটিকেই, অর্থাৎ তার প্রাণের আধারটিই সৃষ্টি করি। যে জিনিস আমরা সৃষ্টি করি তার উপর আমাদের অল্পবেশি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। দূর থেকে যেটা আমাদের কাছে হয়তো ভয়ের বস্তু হয়েছিল, সৃষ্টির ভিতর দিয়ে তারই উপর আমাদের কিছুটা অধিকার এসে যায় এবং আমরা সেই পরিমাণে ভয়মুক্ত হই।

প্রতিকৃতির সঙ্গে মূলবস্তুর একরকম অভিন্নতার কল্পনা মানুষের ভিতর স্বাভাবিক। এই কারণেই কোনো শ্রদ্ধেয় মানুষের ছবিতে আমরা পদাঘাত করতে পারি না। ছবিটা আমাদের কল্পনায় শুধু একটা জড়বস্তু হয়ে থাকে না, তাতে ব্যক্তিত্ব স্থাপিত হয়। কুশপুত্তলিকা দাহ করে আমরা যেন মূল ব্যক্তিটিকেই বিনষ্ট করি। দেবীর মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তাঁর আরাধনা করি।

দূর থেকে যেটা আমাদের আবেগকে মথিত করে তার উপর কল্পনায় আমিত্বের অধিকার স্থাপন করা শিল্পসৃষ্টির এক মূল উদ্দেশ্য।

আবার শিল্পী নিযুক্ত হতে পারেন সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটাবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে। রাজনীতিক আন্দোলনে বক্তা বক্তৃতা দেন শ্রোতাদের মধ্যে এমন একটা আবেগের হাওয়া সৃষ্টি করবার জন্যই যেটা তাঁর দল অথবা দেশকে নিয়ে যাবে এক অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। সাহিত্যিকও তেমনি সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, শিল্পী আঁকতে পারেন ছবি কিংবা রচনা করতে পারেন গান ও নাটক, একটা বাস্তব উদ্দেশ্য মনে রেখে। বাহ্য উদ্দেশ্যে আশ্রিত এইরকম শিল্পসাহিত্যকে বলা হয়ে থাকে প্রচারশিল্প অথবা প্রচারসাহিত্য। এ যুগের শিল্পে-সাহিত্যে এর স্থান নগণ্য নয়। এর উদ্দেশ্য একটা বাস্তব লক্ষ্যে পৌঁছানো, একটা কাজ করিয়ে নেওয়া, সামাজিক নীতি অথবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন ঘটানো। কারিগরিতে যেমন একটা বাহ্য পরিকল্পনা থাকে, সংশোধনী কিংবা সংযোজনী বুদ্ধি থাকে, এখানেও সেই রকম। শিল্পীর অভিপ্রায় যদি প্রকাশ্যে অনুচ্চারিত থাকে তবু শিল্পকর্মের বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে তার সামাজিক ও প্রায়োগিক তাৎপর্য।

বাস্তব বহির্মুখী লক্ষ্য আছে কাজেই প্রচারশিল্পের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সহজ। তার চেয়ে বোঝা কঠিন, শিল্পের জন্য শিল্প। অথচ দুয়েরই তুলনা আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি প্রকৃতিতে। আবেগের প্রাকৃত প্রকাশে একদিকে আছে একটা জৈব উদ্দেশ্য, বাস্তব

প্রত্যাশা। আবার অন্যদিকে আছে বাস্তব উদ্দেশ্যের অতিরিক্ত আত্মপ্রকাশের নিজস্ব আনন্দ। অসচেতন প্রকৃতিতে আছে এই দ্বিত্ব। এই দ্বৈতের প্রতিবিম্ব পাই সচেতন শিল্পের স্তরেও।

প্রকৃতির একটা অভ্যস্ত উপায়, যে পথে জীবকে সে আকৃষ্ট করতে চায় সে পথে কিছু আনন্দ বিছিয়ে দেয়। খিদে পেলে আমরা খাই তাতে খিদের কষ্ট মেটে। কিন্তু এটাই সব নয়। খাবার একটা উপরি তৃপ্তিও আছে। বাঁচার জন্য খাওয়া, প্রকৃতির উদ্দেশ্যের ভিতর এটাই প্রাথমিক। কিন্তু ঐ যে উপরি তৃপ্তির কথা বলা হল তারই টানে মানুষ জৈব প্রয়োজনকে অতিক্রম করে খাদ্যবস্তুকে একটা শিল্প করে তোলে। শুধু বাঁচার জন্য আর খাওয়া নয় তখন, খাবার আনন্দের জন্যই খাওয়া।

শিল্প ব্যাপারটাও ঐরকম। শিল্পীর আত্মপ্রকাশ শুধু সামাজিক বাস্তব প্রয়োজনে নয়। বিশুদ্ধ শিল্পে আছে একটা স্বাশ্রয়ী আনন্দের সন্ধান। শিল্পসৃষ্টির বিভিন্ন প্রেরণার ভিতর এটাকে স্বীকার করে নিতে হয়।

কথাটা আরো একটু সাবধানে বলা যেতে পারে। প্রকাশের আবেগ অনেক সময় শিল্পীর মনে ভূতের মতো চেপে বসে। প্রকাশটা সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত তখন আর স্বস্তি নেই। যেমন কবিতার একটা লাইন হঠাৎ হয়তো মনের ভিতর গুনগুনিয়ে উঠলো, কবিতাটাকে সম্পূর্ণ না করা অবধি সেটা একটা উপদ্রবের মতো থেকে যায়। শিল্পী তখন ব্যস্ত আনন্দের সন্ধানে নয়, মনের ভিতর এই যে একটা বেগ সঞ্চারিত হল সেটাকে মন থেকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত মন অস্থির। অবশ্য এখানেও শিল্পকর্ম কম্পন্ন হবার পর একটা বিশেষ তৃপ্তি আছে। কিন্তু ঐ তৃপ্তির প্রত্যাশায় কাজটা শুরু হয়েছিল এমন নাও হতে পারে।

শিল্পীর দিক থেকে ব্যাপারটা এইরকম। কিন্তু শিল্পের ভোক্তাদের বেলায় একটু অন্য রকম। শিল্পের ভোক্তারা সেই অস্থিরতার ভিতর দিয়ে যান না, যেমন যেতে হয় শিল্পীকে। ভোক্তাদের কাছে ভোগের তৃপ্তিটাই প্রধান। তারই প্রত্যাশায় তাঁরা পয়সা দিয়ে শিল্পবস্তু কিনতে প্রস্তুত। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে। তবু ধরে নিতে হয়, যিনি ভোক্তা তাঁর দৃষ্টিতে ভোগের আনন্দই প্রধান। অতএব আনন্দের সন্ধানে শিল্প। অন্য ভাষায় একে বলা যেতে পারে, শিল্পের জন্য শিল্প। অর্থাৎ শিল্পের বাইরে তার অন্য উদ্দেশ্য নেই।

যাঁরা সাধু তাঁরা এতে সন্তুষ্ট হবেন না। প্রচারধর্মী শিল্পসাহিত্যে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরাও নন। এই দু'য়ের চোখেই, যদিও ভিন্ন ভিন্ন কারণে, শিল্পের জন্য শিল্প ব্যাপারটা একটা বিলাস।

সাধু বলবেন, ভোগের অন্বেষণটা প্রধান হলে বিপদ। জীবনের লক্ষ্য সেটা হতে পারে না। লক্ষ্য হবে, চিত্তশুদ্ধি এবং সমাজের হিত। প্রচারধর্মী সাহিত্যের প্রবক্তা বলবেন, সমাজের নীতি এবং ব্যবস্থার পরিবর্তনটাই আসল কথা। সাহিত্যের অন্য উদ্দেশ্যও থাকা সম্ভব, কিন্তু যদি কোনো সাহিত্যকর্ম এদিক থেকে সার্থক না হয় তবে তার মূল্য কমই। 'শিল্পের জন্য শিল্প' কাগজের ফুলের মতোই জীবন থেকে, জীবনের গভীরতর সমস্যা থেকে, বিচ্ছিন্ন।

এইসব আপত্তি নিশ্চয়ই গুরুতর। একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

৬

চিত্তশুদ্ধি দিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

আগেই দেখেছি, আত্মপ্রকাশের ফলে মন ভারমুক্ত হয়। জৈব অথবা প্রাকৃত স্তরে এটা ঘটে স্বাভাবিকভাবে। শিল্পে একটা নির্মিত আবেগকে নিষ্কাশন করা হয়, এতেই ভারমুক্তি ঘটে। কেউ হয়তো শিল্পের সমর্থনে বলবেন, এই তো চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু সাধুর অভিযোগ এত সহজে খণ্ডন করা যাবে না।

সাধু যে চিত্তশুদ্ধির কথা বলেন সেটা চিত্তের আরো স্থায়ী পরিবর্তন, স্থায়ী শুদ্ধতা। শিল্প উপভোগের ভিতর দিয়ে সেই রকম স্থায়ী শুদ্ধতা কি আসে ? জৈব স্তরে এটা ঘটে না একথা আমরা জানি। ক্রোধ প্রকাশের ভিতর দিয়ে সাময়িকভাবে হয়তো রাগটা পড়ে যায়, যেমন খেলে খিদে মেটে। কিন্তু খিদে যেমন আবার ফিরে আসে, ক্রোধও তেমনি। এতে প্রকৃতির কোনো স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে না। শিল্পের বেলায় কী বলব ?

সেখানে ব্যাপারটা আরো একটু জটিল। জৈব আত্মপ্রকাশের সঙ্গে শিল্পের একটা মূল পার্থক্য এবার আরো একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখতে হবে।

প্রত্যেকটি মূলভাবের একটা নিজস্ব রূপ আছে। যেমন ক্রুদ্ধ মুখ ও কণ্ঠস্বর একরকম, ভীত অথবা প্রীত মুখ ও কণ্ঠস্বর অন্যরকম। জৈব স্তরে মানুষ যখন ক্রোধ অথবা প্রীতি প্রকাশ করে তখন সেই ভাবের বিশেষ চেহারা নিয়ে সে সচেতনভাবে চিন্তা করে না, আপনি সেটা এসে যায়।

কিন্তু শিল্পী সৃষ্টি করেন সচেতনভাবে। তাকে সচেতন সাধনার ভিতর দিয়ে রূপ সৃষ্টি করতে হয়।

সঙ্গীতের কথা ধরা যাক। এদেশের শিল্পীরা দীর্ঘ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে জেনেছেন বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিশেষ রূপ, বিভিন্ন ভাব কিংবা মেজাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক। ছবির বেলাতেও ঐরকম ব্যাপার আছে। লাল আর সবুজের ভিতর দিয়ে একই মেজাজ প্রকাশ পায় না। নৃত্যের মতোই চিত্রেরও বিভিন্ন রেখার আছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা। নন্দলাল বসু বস্তুর প্রাণছন্দের কথা বলেছেন। বিভিন্ন আবেগে দেহের ছন্দের তারতম্য ঘটে। এইরকম আরো নানা উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। মূল কথাটা এই, শিল্পীকে সচেতন নিষ্ঠার সঙ্গে রূপের সন্ধান করতে হয়।

এজন্য প্রয়োজন ভাব ও বস্তুকে একটু দূরে থেকে দেখা। তবেই তার বিশেষ রূপটি সচেতনভাবে লক্ষ করা যায়, ঘনিষ্ঠভাবে চিনে নেওয়া যায়। এই যে একটু দূরত্ব সৃষ্টি করে দাঁড়ানো, ভালোবেসে দূর থেকে দেখা, যেমন ছবি তুলতে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়াতে হয়, এরই ফলে জৈব আবেগের সঙ্গে শিল্পজ আবেগের একটা মৌল প্রভেদ হয়ে যায়।

দূরত্বের ফলে যে জৈব ভাবের একটা পরিবর্তন ঘটে, এটা অবশ্য জীবনের কিছু সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই স্পষ্ট। যেমন, 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি'র আস্বাদ ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন। ছেলেবেলাকার কিছু তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা, সেই মুহূর্তে যেটা আমাদের উত্তেজিত করেছিল, কালের দূরত্ব পেরিয়ে স্মৃতির ভিতর দিয়ে যখন ফিরে আসে তখন তাতে আর সেই উত্তেজনা নেই। অথচ তাতে একটা সত্য ও সৌন্দর্য আছে। এরই সঙ্গে যোগ শিল্পীর অভিজ্ঞতার।

বিদ্বেষ যেমন প্রেমেরই এক আহত রূপ, আমাদের বহু জৈব আবেগের পিছনে তেমনি আছে জৈবতাকে অতিক্রম করে যাবার একটা অন্ধ আকুলতা। দূরত্ব রক্ষা করে তাকালে

তবে সেটা চোখে পড়ে। সব শিল্পেই এটা সমান ভাবে ঘটে এমন নয়। তবু শিল্পের স্বভাবের ভিতরই আছে তার সম্ভাবনা। শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বলা হয়েছে। অভিন্ন নয়, তবু সহোদর। একে আমরা চিত্তশুদ্ধি বলব কিনা সে প্রশ্ন আপাতত তোলা থাক। কিন্তু জৈব অভিজ্ঞতা থেকে শিল্পবোধ ভিন্ন বস্তু, একথা মেনে নিতেই হয়।

সব শিল্প মহৎ শিল্প নয়। তবে শিল্পের কিছু সামান্য লক্ষণ আছে। মানুষের মনে সাধারণত নানা বিরোধী কিংবা বেখাপ ভাবের বিশৃঙ্খলা চলে। শিল্পে রূপদান করতে গিয়ে ছোটবড় বিবিধ ভাবকে প্রধান ভাবের অধীনে আনতে হয়। সেই প্রধান ভাবের সঙ্গে অংশের সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবেই রূপ নির্বাচন সম্ভব। এই সামঞ্জস্যবিধান করতে গিয়ে শিল্পী হয়ে ওঠেন স্রষ্টা।

যেমন শিল্পী তেমনি সমঝদার ভোক্তা, পাঠক অথবা শ্রোতাও আর নিছক প্রাকৃত স্তরের মানুষ থাকেন না। সঙ্গীতের কথাই আবার ধরা যাক, বিশেষত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। সমঝদার শ্রোতা জৈব আবেগে আপ্লুত হন না। বিশেষ ভাব অথবা মেজাজ, বিশেষ রাগরাগিণী, যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা হল কিনা, শিল্পীর নিজস্বতা কোথায় কীভাবে প্রকাশ পেল, এইসব শ্রোতার সূক্ষ্ম বিচারের ভিতর এসে যায়। এরই সঙ্গে মিলিত হয়ে তবে আসে আবেগ। কাব্য অথবা সাহিত্যবিচারেও ছন্দ, শব্দচয়ন, চরিত্রচিত্রণ, সমগ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য, এইসব ভাবনার ভিতর রাখতে হয়। তা নইলে শিল্প অথবা সাহিত্যের মূল্যায়ন যথার্থ হয়না। অর্থাৎ শিল্পীই হোন আর শিল্পের ভোক্তাই হোন, একজন দরদী বিচারক তাঁর ভিতর থাকেন, নয়তো সেটাকে শিল্পবিচার বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে এসে যায় আরো একটা প্রশ্ন। শিল্পী তাঁর নিবেদন রাখেন শ্রোতা, দর্শক কিংবা পাঠকের কাছে। এ যুগে ক্রেতা হিসেবে এঁদের প্রভাব আছে। অন্য এক যুগে রাজা-মহারাজারা ছিলেন শিল্পের সংরক্ষক। তাঁদের রুচিকে সন্তুষ্ট করতে হত। কিন্তু শিল্পীর নিবেদন কি শুধু এই বাইরের ক্রেতা আর সংরক্ষকদের উদ্দেশে ?

প্রত্যেক খাঁটি শিল্পীর নিজের ভিতরই একজন বিচারক ও ভোক্তা থাকেন। তাঁরই কাছে শিল্পীর প্রথম নিবেদন। তাঁর বিচারের সঙ্গে যদি বাইরের রায় মেলে তো শিল্পী সন্তুষ্ট। যদি না মেলে তো গোলমাল দেখা দেয়। হয়তো শিল্পী তারপরও নিজের কাছেই বিশ্বস্ত ; হয়তো তিনি আপস করেন। শিল্পীর সঙ্গে শ্রোতার একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। তাঁর নিজের ভিতরই অধিষ্ঠিত যে ঊর্ধ্বতর সত্তার কাছে শিল্পকর্ম নিবেদিত, কোনো খাঁটি শিল্পী তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন না। সাধক গায়কের মতো শিল্পীর একাকিত্ব সেইখানে। শিল্পী শুধু বাইরের সমর্থন, বাইরের সহানুভূতি চান না। তাঁর নিজেরই এক ঊর্ধ্বতর সত্তার সমর্থনে শিল্পী আশ্বস্ত হন, সহানুভূতিতে দ্রবীভূত হন।

৭

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে কিছু উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক নীতির পরিবর্তন ঘটাবার অভিপ্রায়ে। এই অত্যন্ত কার্যকর উদ্দেশ্যের বাইরেও শিল্পসাহিত্যের কোনো স্থায়ী ভিত্তি অথবা মনুষ্যত্বের বিচারে কোনো গভীর প্রয়োজন আছে কিনা, সেটাই এবার বিবেচ্য।

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যই শিল্পসাহিত্যকে যাঁরা নিযুক্ত করতে চান তাঁদের জন্য প্রথমেই একটা প্রশ্ন এসে পড়ে, আদর্শ সমাজে তা হ'লে শিল্পসাহিত্যের স্থান

কোথায় ? প্রয়োজন কী ? শিল্পসাহিত্যকে হয় আদর্শসমাজ থেকে অনাবশ্যক বলে বহিষ্কার করতে হয়, নয়তো একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, সমাজের পরিবর্তনের জন্যই শুধু নয়, তার বাইরেও শিল্পসাহিত্যের কিছু স্বকীয় মূল্য আছে।

একথা ঠিক যে, আদর্শসমাজ এখনও অনেক দূরের কথা। কিন্তু যতদিন সেই স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের কাজটাকে কি সাহিত্যের একমাত্র অথবা প্রধান কাজ বলে মেনে নিতে হবে ? এটাই কি মানবতার কথা ?

বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সমাজে পরিবর্তন ঘটাবার কাজে শিল্পসাহিত্যের প্রভাব সত্যি কতটা ? পরিবর্তন ঘটে নানা শক্তির সংঘাতের ভিতর দিয়ে। যুদ্ধ ও আর্থিক সংকট, বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতন, বিজ্ঞানের নব নব যুগান্তকারী উদ্ভাবন, এই সবের ভিতর দিয়ে সমাজ ও ইতিহাস কীভাবে বদলে চলে আমরা তা দেখছি চোখের সামনেই। মানুষের মন ও সমাজ নিয়ে নতুন চিন্তার প্রভাবও লক্ষ করা গেছে আমাদের যুগে। সাহিত্যের ক্রান্তিকারী ভূমিকাকে কখনো কখনো অতি বড় করে ভাবা হয়েছে, সেটা সম্ভবত কল্পনাবিলাস। বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রশ্নে সাহিত্যের প্রভাব স্বীকার্য। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র। আর সাহিত্য যখন রাজনীতির পতাকার নীচে এসে দাঁড়ায় তখন চারিদিকে চাঞ্চল্য নিঃসন্দেহে বাড়ে ; কিন্তু সমাজের দুঃখ তাতে কমে কিনা, মনুষ্যত্বের গৌরব বাড়ে কিনা, সে বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে।

এইসব বিতর্কের তলে চাপা পড়ে যায় যে কথাটা সেটা আরো ধীরভাবে বুঝতে হবে। আন্দোলন করে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায় ; আন্দোলন আবশ্যক। কিন্তু মানুষের জীবনে দুঃখের এমন কারণও আছে সমাজের কোনো পরিবর্তনই যাদের স্পর্শ করতে পারে না। এই রকম কিছু দুঃখে সান্ত্বনা যুগিয়েছে সাহিত্য প্রাচীনকাল থেকে। জীবনের সেই নিভৃত স্থানে সাহিত্যকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আহ্বান করব কিনা এটাই মূল প্রশ্ন।

মানুষের কিছু মৌল দুঃখের কেন্দ্রে আছে প্রেম ও মৃত্যু। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের আয়ু বাড়বে, দারিদ্র্যের বীভৎসতা আশা করা যায় ক্রমে দূর হবে। কিন্তু এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যাতে সেইসব মানুষেরা চিরজীবী হবে যাদের আমরা ভালোবাসি। মৃত্যু আছে, অতএব বিরহ আছে। মৃত্যু প্রেমাস্পদেরই নয়, মৃত্যু হয় প্রেমেরও। এমন ব্যবস্থা নেই যাতে প্রেমকে নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। আজকের উত্তপ্ত আবেগ, উষ্ণ প্রেম, একদিন ধীরে ধীরে শীতল হয়ে যায়, মৃতদেহের শীতলতার চেয়েও সেটা ভীষণ হতে পারে। সব প্রেম একই কালে মৃত্যুর দুয়ারে এসে পৌঁছয় না। একটি মৃত প্রেমের শিয়রে বসে থাকে সান্ত্বনাহীন কোনো প্রেমিক। এই রিক্ততার মরুভূমি বিস্তৃত হয়েই চলেছে।

মানুষের মন প্রসারিত হয় শুধু অন্য মানুষের দিকেই নয়। মানুষ ভালোবাসতে চায় জীবনকে। অথচ পৃথিবী চলে তার নিজের নিয়মে, মানুষের ভালোবাসার দাবীর সঙ্গে যার মিল হয় না। এই মুহূর্তে পৃথিবী স্নিগ্ধ, পরমুহূর্তে সে হিংস্র অথবা উদাসীন। আন্দোলন করে হৃদয়ের ক্ষত দূর করা যায় না।

এইসব অনিশ্চয়তার পরিচয় পেয়ে মানুষ কখনও খুব সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু তাতেও সমস্যার শেষ হয় না। সতর্ক হওয়া মানেই প্রেমকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। সেই প্রেমহীন জীবন, বিস্বাদ। এমন বিস্বাদ জীবনকে সতর্কভাবে রক্ষা করবারও মানে হয় না।

এই এক মৌল সমস্যা, বাইরের আইনকানুন অথবা প্রতিষ্ঠানের কোনো পরিবর্তনের

ভিতর দিয়ে যার অন্তে পৌঁছানো যায় না।

একটি উর্দু শের-এ বলা হয়েছে, 'গুনে গুনে মদের পেয়ালা যে ওষ্ঠে তোলে কিছুই তো তার পান করা হল না, আত্মবিস্মরণ যদি ঘটে তবেই মানি সে পান করেছে।' সতর্কতায় মুক্তি নেই, আত্মবিস্মরণেও সর্বনাশ ঠেকানো যায় না। জীবনের বর্ণগন্ধ-মনোহরতা রক্ষা করবার আশায় পৃথিবীকে আমরা প্রাণপণে ভালোবাসি, 'বসুধার মৃত্তিকার পাত্র' ভরে আকণ্ঠ পান করি মদিরা। সেই ভালোবাসাই আবার আমাদের ঠেলে দেয় নৈরাশ্যের দিকে। আমরা সাবধানী হয়ে উঠি। তখন আমাদের জীবনের মূল থেকে সাবধানতাই রস শুষে নেয়।

সতর্কতা আর আত্মবিস্মৃতি নিয়ে এই যে অস্তিত্বের উভয়সংকট, সঙ্গীত অথবা সাহিত্য এ থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে না। তবু শিল্পের দরদী উচ্চারণে একটা সান্ত্বনা আছে। আমাদের ব্যর্থ সাধনের কথা অন্তঃস্থিত এক উচ্চতর সত্তার কাছে নিবেদনের মধ্যেই আছে কিছু সান্ত্বনা। সাহিত্যের একমাত্র কাজ নয়, এমন কি প্রধান কাজও হয়তো নয়, নীতিপ্রচার কিংবা বাইরের কোনো পরিবর্তনসাধন। কোলাহলের বাইরে দেখি সাহিত্যের একটি স্থায়ী আসন। প্রেমের মুগ্ধতা আর নৈরাশ্যের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সংকটের রূপময় চিত্রণ কিংবা উচ্চারণের ভিতর দিয়ে শিল্প রেখে যায় মনুষ্যত্বের এক বিপন্ন মহিমার চিরন্তন স্বাক্ষর।

বিশুদ্ধ শিল্পের মূল তাই অন্য এক বাস্তবতায়। তার রসের শেষ নেই। মানুষের মুগ্ধ লোচন আর অশ্রান্ত রোদনের মতোই সে অন্তহীন।

৮

চিত্তশুদ্ধি নিয়ে যে প্রশ্নটা তোলা ছিল আবার সেখানে ফিরে আসা যাক।

মোক্ষ অর্থে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা। কখনো কখনো এমন একটা তন্ময়তার বোধ আমরা লাভ করি যেখানে হিংসা ক্রোধ ভয় এইসব জৈব আবেগের ছায়া নেই। ক্ষণস্থায়ী হলেও এই বোধই আমাদের কাছে মোক্ষের ইঙ্গিত এনে দেয়।

বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের মুহূর্তে আমাদের কোনো অভাববোধ থাকে না। এমন কি সেই অনুভবকে প্রকাশ করবার চিন্তাও তখন থাকে না। প্রত্যাবর্তনের কোনো মুহূর্তে হয়তো সেই পলাতক অনুভবটিকে আমরা শিল্পের ভিতর বাঁধবার কথা চিন্তা করি।

সেই বোধ থেকে প্রত্যাবর্তন ঘটে নানা পথে। সাধারণ মানুষ শুধু একটি অস্পষ্ট স্মৃতি নিয়ে সংসারে ফিরে আসে। কিছু অসাধারণ মানুষ ফিরে আসেন করুণার পথে, সংসারে নিজেদের নিযুক্ত করেন সেবার কাজে।

শিল্পীমাত্রেরই এই অভিজ্ঞতা লাভ হয় এমন নয়। কারো হয়, কারো হয় না। কারো জীবনে এটা প্রধান অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, কারো থাকে না। শিল্পী অভিজ্ঞতার যে স্তরেই থাকুন না কেন, তাঁর প্রধান লক্ষণ হল, তিনি সেই স্তরের ভাবকে রূপদান করতে আগ্রহী হন। রূপের প্রতি এই আগ্রহই শিল্পীর স্বধর্ম।

সাধুর আগ্রহ মোক্ষের প্রতি। মোক্ষানুভূতি থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সাধু যদি মানুষের সেবার জন্য সংসারে প্রবেশ করেন তবেই তাঁকে পরিপূর্ণভাবে ধার্মিক বলা যায়। ধর্ম আর মোক্ষ এক বস্তু নয়। মোক্ষের সঙ্গে সেবাধর্মের যোগ স্থাপিত না হলে সেটা পরিপূর্ণ ধর্ম নয়।

আগেই দেখেছি, ভয় ক্রোধ ইত্যাদি জৈব আবেগ থেকে মুক্ত মোক্ষানুভূতি। একেই বলা সম্ভব চিত্তশুদ্ধি। এই চিত্তশুদ্ধি সাধু রক্ষা করতে চান যথাসাধ্য। সাধুও শিল্পী হতে পারেন। কিন্তু সাধুকে শিল্পী হতে হবে এমন নয়। চিত্তশুদ্ধি কিন্তু সাধুর জন্য চাই। সাধুত্বের এটা এক স্থির লক্ষ্য। শিল্পীর এটা স্থির লক্ষ্য না হতেই পারে।

সাধারণ মানুষ এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। শিল্পীর কাছ থেকে সাধারণের এই প্রত্যাশা নেই যে তিনি ত্যাগী হবেন। কোনো সাধু সম্বন্ধে যদি শোনা যায় যে তিনি লোভী তবে আমরা তাঁর সাধুত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলি। সাধু বলে আর তাঁকে স্বীকার করি না। কোনো ওস্তাদ গায়ক অথবা অভিনেতা অথবা কবি সম্বন্ধে যদি শোনা যায়, তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা আছে, তবে আমরা অচিরাৎ এই সিদ্ধান্তে আসি না যে তিনি আসলে শিল্পী নন।

শিল্পী যদিও কিছু দূরত্ব রক্ষা করে নিরীক্ষণ করেন, সেই ভাবের বিশেষ রূপটি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যদিও এর ভিতর দিয়ে জৈব আবেগের কিছু ঊর্ধ্বে তিনি ওঠেন সাময়িকভাবে, তবু তাঁর জন্য জৈবভাবে প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ নয়। বস্তুত শিল্পী যে ভাবটি প্রকাশ করেন, তিনি একই সঙ্গে তাতে অংশত আবদ্ধ এবং অংশত তা থেকে মুক্ত। যে সাংসারিক আবেগের উপকরণ নিয়ে শিল্পী তাঁর সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত সেই উপকরণ যদি তাঁকে মুগ্ধ করে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সাধুর কাছে সেটাই ভয়ের কথা। শিল্পীর পথ সাধুকে হয়তো কখনো আকর্ষণ করে, তবু সে সম্বন্ধে তিনি সতর্ক। বুদ্ধ এবং মোহম্মদ চিত্র এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে সতর্ক ছিলেন।

সাধু হবার বিপদ এই, তিনি সংসার থেকে সরে যেতে পারেন। শিল্পী সংসারে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারেন, 'হাসির মায়ামৃগীর পিছে' নয়ননীরে ভাসবার খেলাটাই তাঁকে পেয়ে বসতে পারে। তবে সাধু সংসার ত্যাগ করবেনই এমন কোনো কথা নেই। শিল্পী সংসারে আসক্ত হবেন এমনও কথা নেই।[৩]

উত্তরণের শর্ত

বাক্‌ এবং অর্থ যেমন পরস্পর সম্পৃক্ত, প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধও তেমনি। এই সম্পর্কটাকে উপেক্ষা করলে বাক্য তার অর্থ হারায়, প্রতিষ্ঠান তার মূল্য। আদর্শ সমাজ নিয়ে আলোচনায় অনেক সময় বাইরের প্রতিষ্ঠানের দিকটাই লক্ষ করা হয়; 'সংসদীয় গণতন্ত্র', 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা', এইসব নিয়ে তর্ক চলে। মূল্যবোধের কথাটা উপেক্ষিত থেকে যায়। এর অবশ্য কিছু কারণ আছে।

প্রতিষ্ঠান জিনিসটা বাইরের বলেই তার চেহারা বর্ণনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মূল্যবোধ যেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে, তা নিয়ে আলোচনা করতে অসুবিধা বোধ হতে পারে। আরো একটা ব্যাপার আছে। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক স্তরভেদের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের পরিচিত করিয়েছেন। সবাই অবশ্য একমত নন; ভুলেরও

সম্ভাবনা খুবই। তবুও এ বিষয়ে আলোচনার কিছু পরিচিত উল্লেখবিন্দু আছে। মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সেই পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

এইরকমের কিছু কথা মনে হতে পারে। কিন্তু আসল বাধা অন্যত্র। আমরা বাইরের সঙ্গে ভিতরের যোগ ঘটাবার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছি। ফলে কিছুরই আর অর্থ থাকছে না। ভিতরের সঙ্গে বাইরেকে মিলিয়ে দেখা দরকার।

মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অন্বেষণটা বাইরে শুরু হলেও শেষ অবধি প্রত্যয়ের ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় চেতনার ভিতরে।

১

আকাঙ্ক্ষার নানা স্তর আছে। এ আমরা সবাই জানি। তবু বিষয়টা ভেবে দেখবার যোগ্য। এ ব্যাপারে চিন্তার পরিচ্ছন্নতা এলে আরো নানা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

সামান্য একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক। যেমন, খাদ্য ও পানীয়। নিতান্ত জৈব স্তরে এর প্রয়োজন। ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার জন্য খাদ্য ও পানীয় চাই। দেহধারণের জন্য এটা দরকার। কিন্তু খাদ্যে শুধু খিদে মেটে, পেটের জ্বালা দূর হয়, তা তো নয়। তার অতিরিক্ত একটা সুখ, রসনার সুখ, সেইসঙ্গে পাওয়া যায়। রসনার সুখের সন্ধানে রান্না নিয়ে হরেক রকম পরীক্ষা চলে। উদ্ভাবিত হয় নানা রকমের রসুই। এটাই হয়ে ওঠে সংস্কৃতির একটা শাখা। ফরাসী রসুই, চীনে রান্না, মোগলাই, আরো কত রকম। পানীয়েরও আছে কত বিচিত্র রূপ। জৈব স্তর ছাড়িয়ে খাদ্য ও পানীয় পৌঁছে যায় আভিজাত্যের অন্য এক স্তরে।

এর বিরুদ্ধেও আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অতি ভোজনে অসুখ বাড়ে। পৃথিবীর ধনী দেশে, ধনবানদের ভিতর, ভোজনের অতিশয্যই দৈহিক পীড়া এবং মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিকিৎসকদের কাছে স্বীকৃত। পানীয়ঘটিত দুর্ঘটনার কথা সবাই জানেন। এসবের দুষ্ট ক্রিয়া শুধু দেহের ওপরই নয়, আক্রান্ত হয় মনও। খাদ্যে ও পানীয়ে যখন মানুষ আসক্ত হয়ে পড়ে তখন মনের পক্ষে সেটা একটা বন্ধনদশা। সুখের সন্ধানে যার শুরু তার পরিণতি এক বিশেষ ধরনের অসুখে।

অর্থব্যয় করে মানুষ নিজের মনকে শৃঙ্খলিত করে। সেই শৃঙ্খলকেই আবার কেউ অলংকার জ্ঞান করে। দামী গয়না নিয়ে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে দামী খাদ্য, ধূম্র ও পানীয় নিয়েও সেইরকম। এইসব হয়ে ওঠে আভিজাত্যের মাপকাঠি। দরিদ্র মানুষ শাকান্ন থেকে যে তৃপ্তিলাভ করে ধনী সেটা পায় না বিলাসী আহার্য অথবা পানীয় থেকে, কিন্তু এই সবের অভাবটা ধনীর কাছে বড়ই দুঃখজনক মনে হয়।

মনের এই শৃঙ্খলিত অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। সরল আহারেই খুঁজে পাওয়া যায় দেহের স্বাস্থ্য, রসনার স্বাদ, মনের মুক্তি। খাদ্য ও পানীয়ের বিবর্তনে এটা তৃতীয় স্তর। দারিদ্র্যের অতি দীন আহার্য বাধ্যতামূলক, কুখাদ্যেও কেউ অভ্যস্ত হয়। আতিশয্য ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সারল্যে প্রত্যাগমন রুচি ও মননের অন্য এক অবস্থা। খাদ্য ও পানীয় উদাহরণ মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল, পরিচিত জীবনের মাঝখানে এনে চেতনা-ও-আকাঙ্ক্ষার স্তরভেদ দেখানো। যে-তিনটি স্তরের কথা বলা হল, এদেশের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাষায় তাদের তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক বলে চিহ্নিত করা সহজ। কেবল বাইরের লক্ষণ দিয়ে চেতনার স্তরনির্ধারণ করতে গেলে অবশ্য ভুলের সম্ভাবনা

থেকেই যায়।

এই সঙ্গে বুঝে নিতে হবে আরো একটা কথা। প্রতিটি স্তরের ভিতরই প্রচ্ছন্ন আছে সেই শক্তি যার সাহায্যে আরোহণ করা যায় পরবর্তী স্তরে। তামসিক অবস্থাতেও থাকে সেই প্রাণশক্তির বীজ ও সুখের আকাঙ্ক্ষা যাতে মানুষকে ঠেলে দেয় রাজসিকতার দিকে। রাজসিকতাও একটি স্থির অবিকল ভাব নয়। তাতে আছে নানা রঙের খেলা। কখনো জয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, কখনো ভোগের। আবার রাজসিকতার ভিতর থেকেই দেখা দেয় কখন বিষয়ে সেই সচেতনতা যাতে ক্রমে উদ্ঘাটিত হয় মুক্তির নতুন দিগন্ত।

২

যে গুণত্রয়ের বিষয়ে বলা হল তাদের কোনো একটিকে শুদ্ধরূপে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া কঠিন। বরং মিশ্ররূপেই এদের আমরা পেয়ে থাকি। তবে কোথাও একটির অথবা অন্যটির প্রাধান্য। প্রাধান্যভেদেই গুণভেদ; যেমন শৃগালের তুলনায় সিংহের ভিতর রাজসিকতার প্রাধান্য। আরো একটি কথা যোগ করা দরকার। প্রতিটি গুণের ভিতরই এমন কিছু আছে যেটিকে প্রাণীর প্রয়োজন, অতএব যার মূল্য স্বীকার্য। তামসিকতার ভিতরও বোধ করি এমন একটি অন্ধ প্রাকৃত প্রেম আছে যার মূলোচ্ছেদ হলে প্রাণীর চলে না। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ যে অনিবার্য এমন কোনো কথা নেই। অনেকেই আটকে থাকে এক স্তরে। তবে মানুষকে এবং তার ইতিহাসকে যখন আমরা সমগ্রভাবে দেখি তখন একটা চলমানতাই চোখে পড়ে। বাবুই পাখি যুগের পর যুগ একই ভাবে বাসা বেঁধে চলেছে। এই অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি ইতিহাস নয়। ইতিহাসে একটা গতিশীলতা আছে। এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাত্রার সব চেষ্টা সফল হয় না। তবু সেই চেষ্টার একটা বিশেষ মূল্য স্বীকার করি, এমন কি ব্যর্থ চেষ্টাও মূল্যহীন নয়।

রবীন্দ্রনাথের একাধিক উপন্যাসে পাওয়া যাবে তামসিক অথবা রাজসিক চরিত্রের পাশে একটি সাত্ত্বিক মানুষ। তলস্তয়ের উপন্যাসেও এইরকম দেখা যায়। এইসব চরিত্রের বৈপরীত্যে ও ঘাতপ্রতিঘাতে কাহিনীর ভিতরকার গতি স্মরণীয় হয়ে ওঠে। যেমন ব্যক্তির জীবনে তেমনি পরিবারের ইতিহাসেও গতি ও বৈপরীত্য চোখে পড়ে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন রাজসিক প্রকৃতির মানুষ। দেবেন্দ্রনাথ ঝুঁকেছিলেন সাত্ত্বিকতার দিকে। দু'জনেই শ্রদ্ধার যোগ্য, তবে দুইভাবে। পিতা ও পিতামহের এই বৈপরীত্য কি ঐতিহাসিক সমন্বয় খুঁজেছিল রবীন্দ্রনাথে?

ভোগবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার কিছু বিপদ আছে। প্রতিক্রিয়ার শক্তিটা কখনো কখনো আত্মপীড়ন ও পরপীড়নের রূপ নিয়ে ফিরে আসে। শাহজাহান ছিলেন রাজসিক ও ভোগবাদী। ঔরঙ্গজেবের ভিতর দেখা দিল প্রতিক্রিয়া। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সরল, তাঁর বিশ্বাস ছিল ধর্মে। কিন্তু তাঁর ভিতর ঔদার্যের অভাব ছিল, অন্তত অনেক ঐতিহাসিকেরই এই রায়। নানা গুণ সত্ত্বেও তাঁকে সাত্ত্বিক বলা যাবে না। ঔরঙ্গজেবের পর অবশিষ্ট রইল এক ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য। অনেক রাজবংশেরই ইতিহাস এইরকম। আরম্ভে শৌর্যবীর্য। স্বর্ণযুগে দেখা যায় শিল্পশীলতার বর্ণাঢ্য বিকাশ। তারপর নেমে আসে অমিতব্যয়িতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবক্ষয়ের ভিতর দিয়ে বংশের অবসান। রাজসিকতার ভিতর যে দ্বন্দ্ব তাকে একটা সার্থক সমন্বয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই সহজ হয়নি। ইতিহাসের পথে পথে ধ্বংসের একের পর এক পড়ে আছে কত

বিগতমহিমা রাজবংশের ধ্বংসস্তূপ।

ব্যক্তি পরিবার রাজবংশ এইসব ছাড়িয়ে মানুষের সমাজের বৃহত্তর ইতিহাসের দিকে যখন তাকাই তখন কি সেখানে স্তর থেকে স্তরান্তরে উন্নতির কোনো ছবি চোখে পড়ে? সমাজের সংগঠন যে বদলে চলেছে তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা বলছি না শুধু বাইরের পরিবর্তনের কথা। এইসবের ভিতর দিয়ে মানুষের চেতনায় পরিবর্তনের কোনো দিগ্‌নির্দেশ কি পাওয়া যায়?

কোনো এক যুগে মানুষ ছিল প্রকৃতির বন্য সন্তান, ভীত মূঢ় অসহায়। ক্রমে বৃদ্ধি পেল প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের শক্তি। এই শক্তি সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে কাজে লাগেনি। তবু শুরু হয়ে গেল ইতিহাসের অন্য এক পর্ব। সমাজের ভিতর যে বিচিত্র ও বহুমুখী দ্বন্দ্ব তাকে বাদ দিয়ে এই পর্বের ইতিহাস বোঝা যায় না। আবার মানুষের ভিতর যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের যে বহুবিঘ্নিত প্রকাশ, শিল্প ও বিশ্বজনীনতায় যে অস্ফুট উচ্চারণ, তাকে অগ্রাহ্য করলেও ইতিহাস মানবিক হয়ে ওঠে না। যেমন ব্যক্তির এই মুহূর্তের কোনো চিন্তা কিংবা কর্মেই তার সমগ্র চেতনা অথবা সম্ভাবনা রূপলাভ করে না, তেমনি কোনো বিশেষ সমাজবিন্যাস অথবা কর্মকাণ্ডেও মনুষ্যজাতির চেতনার সম্পূর্ণ পরিচয় ও সম্ভাবনা জানা যায় না।

দ্বন্দ্বের প্রকারভেদ আছে। একদিকে দেখি বিভিন্ন বর্গ ও সম্প্রদায়ের ভিতর বিরোধ ও সমন্বয়। ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ছেড়ে দিয়ে যদি সমষ্টিগত বিরোধের বিচার করা যায় তবু তার কত নাম, কত রূপ—বর্ণবিদ্বেষ, ধর্মযুদ্ধ, শ্রেণীসংগ্রাম, জাতিতে জাতিতে সংঘাত। অন্য দিকে পাই ভিন্ন এক দ্বন্দ্ব, পরিস্থিতির দাবির সঙ্গে মানুষের তৎকালীন চেতনার স্তরের বিরোধ। এইসব নিয়ে আরো কিছু আলোচনা পরে করা যাবে। তার আগে সংক্ষেপে যোগ করব একটি কথা। সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে যে আদর্শ উঁকিঝুঁকি মারে তাকে শুধু ঘটনা থেকে পাওয়া যায় না। পরিস্থিতি সংকট সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সংকট থেকে উত্তীর্ণ হবার বুদ্ধি বাইরের পরিস্থিতি থেকে এককভাবে আসে না। অন্য এক তেজ বিশ্ব থেকেই মানুষ এসে পৌঁছেছে, আবার মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলিত হবার দিকে।

প্রগতির সংজ্ঞা নিয়ে সাধারণ স্তরে একটা তর্ক আছে। সেখানেও জটিলতা সহজেই চোখে পড়ে, সেজন্য বেশি গভীরেও যাবার প্রয়োজন হয় না। প্রগতি কাকে বলে, এই প্রশ্নের উত্তর শুধু ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে উদ্ধার করা সহজ নয়। আজকের জগতের উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির শক্তিতে অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে আছে। তবু প্রযুক্তির অগ্রগতিকেই মানুষের প্রগতির সঙ্গে সমার্থক বলে অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না। সাম্যের একটা বিশেষ মূল্য অনেকের কাছেই স্বীকার্য। অথচ যদি দেখি যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর সমাজের তুলনায় সরল আদিবাসী সমাজে অসাম্য কম, তবু তো আদিবাসী সমাজকে আমরা তুলনায় বেশি প্রগতিশীল বলি না। আবার এরকম একটি শ্রমশিবিরের কথা সহজেই ভাবা যায়, যেখানে উৎপাদনের বণ্টনে অনেকটা সাম্য আছে, প্রযুক্তির মানও কিছুটা উঁচু, কিন্তু যেখানে শৃঙ্খলারই জয়জয়কার, ব্যক্তিস্বাধীনতার পরাজয়। প্রগতির বিচারে ঐ ব্যবস্থাকে আমরা কোথায় স্থান দেব? ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রগতির সংজ্ঞা সম্বন্ধে যদি কেউ বিভ্রান্ত বোধ করে তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমরা যখন রাজসিকতা অথবা সাত্ত্বিকতাকে তামসিকতার ঊর্ধ্বে স্থান দিই তখনও

সেই প্রত্যয় কেবলমাত্র ঘটনা অথবা বর্হির্মুখী দৃষ্টি থেকে আসে না। বর্হির্দৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসাস্বাদন থেকে উদ্ভূত অন্য এক রসবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি। আর তখনই শ্রেয় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেন অন্য এক নিশ্চিতি লাভ করে। মানুষের যে-বাইরের ইতিহাস সর্বজনের দৃষ্টিগ্রাহ্য,'অতীতের কিছু কৃতি ও বহু ব্যর্থ সাধনার সেই চিত্রশালার সঙ্গে পরিচয় রক্ষা করা নিশ্চয়ই মূল্যবান। আরো আছে কিন্তু অন্য এক ইতিহাস, মানুষের চেতনার অন্তস্তলে যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এদের যদি আমরা যুক্ত করে না দেখি তবে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে মিলিতভাবে দেখা হয় না। মানুষের এই সভ্যতা তার নিজের অথচ নিজের নয়। মানুষ যখন জানবে যে একে সে নিজে সৃষ্টি করেছে, তখন সর্বশক্তি দিয়ে একে রক্ষা করতে চাইবে। মানুষের গভীরতম উৎকাঙ্ক্ষা এই যে, ইতিহাসের পথ ধরে এমন এক পৃথিবীর দিকে সে অগ্রসর হবে যাকে তার নিজেরই সৃষ্টি বলে সে মেনে নিতে পারবে।

আশাবাদীরা বলেন, তারায় তারায় ঘোষিত হচ্ছে মানুষের জয়ের বার্তা। এমন ভবিষ্যদ্‌বাণীর সপক্ষে যুক্তি নেই। নৈরাশ্যবাদীরা বলেন, মানুষের সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। এমন সার্বিক নৈরাশ্যেরও সদর্থ হয় না। ঐতিহাসিক জানাতে পারেন অতীতের কিছু তথ্য ও বিশ্লেষণ। সমাজবিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্যের পরিধির ভিতর তুলে ধরতে পারেন অন্য এক প্রশ্ন, কী সেই সমাজের বিন্যাস যাকে লক্ষ্য করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে? পূর্বনির্ধারিত বলে কিছুই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। শুধু বিবেচনা করা যায় কিছু বিকল্প, কিছু সম্ভাবনা। আমরা বুঝতে চেষ্টা করতে পারি, দ্বন্দ্বের জটিল বুনট, যার প্রতিটি সরল ভাষ্যেই আছে একদেশদর্শিতা। আমরা দাঁড়াতে পারি সেই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি, সংকটের স্বরূপ কী? একটি ভবিষ্যদ্‌বাণীই সম্ভব কারণ সেটা আসলে বিকল্পেরই পুনরুচ্চারণ। মানুষের ইতিহাসে বহু সভ্যতা লুপ্ত হয়ে গেছে, তারই পাশে গড়ে উঠেছে নতুন সভ্যতা। সেই অতীতে পৃথিবী ছিল প্রশস্ত। আজ এক ছোটো পৃথিবীতে আমরা বাস করি যেখানে সকলের সঙ্গে ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা। যদি ধ্বংস আসে তবেসেটা হবে মানুষের সভ্যতার সামগ্রিক ধ্বংস। যদি উত্তরণ ঘটে তবে মানবজাতির সেটা সার্বিক উত্তরণ।

মানুষজাতিকে আজ সমগ্রভাবে দেখা ছাড়া উপায় নেই। মানুষের এই সভ্যতা উচ্চতর স্তরে উন্নত হবে কি না আমরা জানি না। আমরা শুধু বুঝবার চেষ্টা করতে পারি, আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে? কী আমাদের চাই? আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তাতে সভ্যতার এক নতুন স্তরে উত্তরণ ছাড়া মানুষের বাঁচবার কোনো উপায় আছে কি না?

৩

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজে প্রাধান্য লাভ করেছে বিভিন্ন শ্রেণী। এই শ্রেণীসংগঠনের সঙ্গে মানুষের চেতনার বিবর্তনের কিছুটা সম্পর্ক প্রথম থেকেই লক্ষণীয়। মার্ক্সবাদীরা 'শ্রেণী' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। আমরা ঠিক সেইভাবে ব্যবহার করছি না। বিবাহাদি সামাজিক বন্ধনের দ্বারা এক মনুষ্যগোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে আলাদা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। এইরকম কোনো গোষ্ঠী যদি সমাজের উচ্চনীচ বিন্যাসেও অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাকে উচ্চ অথবা নীচ শ্রেণী বলে ধরা যেতে পারে। শিখ সম্প্রদায়কে শ্রেণী বলা যাবে না কারণ শুধু শিখ বলেই কেউ সমাজে উচ্চ অথবা নীচ গণ্য

হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র ঐভাবে গণ্য হয়।

কোনো এক যুগে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। বণিকের প্রাধান্যকে আর্থিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত শ্রেণীর সমাজে যে বিশেষ স্থান তার ব্যাখ্যা ঐভাবে হয় না। প্রাচীন যুগের মানুষের মনে ছিল প্রকৃতির প্রতি একই সঙ্গে একটা অন্ধ ভয় আর প্রবল আকর্ষণ। এটাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যোগ আছে সে-যুগের ধর্মের। ধর্মেরও আছে স্তর ও প্রকারভেদ। নীচের তলায় অনেকখানি তামসিকতা না থাকলে উপর তলায় পুরোহিততন্ত্র জাঁকিয়ে বসতে পারে না।

মানুষের একটা দিক যেমন বাধানিষেধ মেনে চলে, সীমার ভিতর সুরক্ষা খোঁজে, অচেনাকে ভয় করে, অন্য এক দিক তেমনি দুঃসাহসী, সীমা ডিঙানো তার স্বভাব। প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রের পাশে পাই ক্ষাত্রশক্তিকে।

অসি আর মসির ভিতর কে বেশি শক্তিশালী, এই রকম একটা তর্কের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। ক্ষত্রিয়ের প্রতিষ্ঠার মূলে আছে অসিশক্তি। কোনো এক যুগে অশ্বারোহী যোদ্ধারা ছিল প্রবল। এরা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, দলে দলে এসে দেশ জয় করেছে। কখনো এরা এসেছে দেশের বাইরে থেকে, যেমন ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের গিরিপথ ধরে। কখনো দেশের ভিতরই নানা দলে বিভক্ত হয়ে এদের যুদ্ধ করতে দেখা গেছে। অসিশক্তি হয়ে উঠেছে রাজশক্তি। বাহুবলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভূসম্পত্তির উপর অধিকার।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভিতর কখনো ঐক্য আবার কখনো বিরোধ, প্রাচীন ইতিহাসের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে এই কাহিনী। বণিকের স্থান ছিল প্রথমে সমাজের তলার দিকে। ক্রমে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। ইতিহাসের এক পর্যায়ে রাজশক্তির সঙ্গে বণিক শ্রেণীর সম্পর্কটাই প্রধান কথা। তবে এখানেও পাই দ্বন্দ্ব আর সহযোগ এই দুয়ের মিশ্রণ।

বণিকের শক্তির মূলে আছে অর্থ শক্তি। কিন্তু ঐ কথাটুকুতে ধরা পড়ে না সভ্যতার ইতিহাসে বাণিজ্যের অবদান। বিশ্বব্যাপী ঐক্যের ধারণা গড়ে উঠেছে নানা পথে। ধর্মে সেই ঐক্যের ধারণা পাওয়া গেছে একভাবে। ধর্মপ্রচারকেরা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছেন ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে। ক্ষত্রিয় অসির শক্তিতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে ; অগণিত উপজাতি মিলিত হয়েছে একই সাম্রাজ্যের মধ্যে। বাণিজ্য নানা দেশের ভিতর সৃষ্টি করেছে অন্য এক বন্ধন। এই তিনের যখন মিল হয়েছে তখন ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তি, এসেছে যুগবদলের পালা। তাতে ভালোমন্দ দুইই ঘটেছে। আধুনিক যুগে যুক্তিবাদী দৃষ্টি বলতে আমরা যা বুঝি তার গঠনে বাণিজ্যের বিস্তারের দান অনেকখানি। কোনো এককালে স্থানীয় আচারের প্রাবল্য সমাজ-জীবনে ছিল অপ্রতিহত। বণিক ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে। জানা গেল যে, বিভিন্ন দেশাচারের ভিতর ঐক্য নেই। বাণিজ্যিক কারণে প্রয়োজন হল এমন কিছু নিয়মকানুন যেটা দেশাচারের দ্বারা খণ্ডিত নয়, বরং বিভিন্ন দেশের কাছেই গ্রাহ্য। বাণিজ্যিক বিচারে এমন কিছু উপাদান আছে যা মানুষকে উপজাতীয় বদ্ধতার বাইরে নিয়ে যায়। মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বণিকের নয়, কিন্তু বাণিজ্যের অবদান উপেক্ষা করাটাও ভুল।

সংশয়বাদের সঙ্গে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর যে যোগ দেখা যায় সেটা আকস্মিক বা আপতিক নয়। তামসিকতা যখন সাত্ত্বিকতার মুখোশ পরে উপস্থিত হয় তখন সেই মুখোশ খুলে দেওয়া যুক্তিবাদের একটা প্রধান কাজ। এই কাজে কোনো শ্রেণীর একক ভূমিকা

নেই। বরং এক মিশ্র মধ্যশ্রেণীর অন্তর্বিরোধ ও বিতর্কের ভিতর একে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। চিন্তার ইতিহাস ও সমাজের ইতিহাস এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এরই ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে ভবিষ্যতের ছবি। সাম্প্রতিককালে যে মধ্যশ্রেণী প্রধান হয়ে উঠেছে তার গঠন পুরনো যুগের সঙ্গে মেলে না। ব্রাহ্মণ আর তেমন পূজিত নয়। উদ্ভব হয়েছে নতুন 'বুদ্ধিজীবী' শ্রেণীর। কোনো কোনো দেশে যদিও ক্ষত্রিয় অর্থাৎ সামরিকগোষ্ঠীর প্রাধান্য সুস্পষ্ট তবু আমলাতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধিই এ যুগের বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে আছে রাজনীতিবিদেরা। পুরনো বণিকশ্রেণীর স্থানে চোখে পড়ে শিল্প ও ব্যবসায়িক সংস্থার ডিরেক্টর ও পরিচালকগোষ্ঠী। যন্ত্রবিদ্ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও নতুন মধ্য শ্রেণীতে উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়ে আছে। সাবেকি উচ্চশ্রেণীর পরিবর্তিত রূপ এই নতুন মিশ্র শ্রেণী। মধ্যবিত্ত নামটারও বৈশিষ্ট্য আছে। আজকাল কেউ নিজেকে উচ্চ শ্রেণী বলে না। সবাই মধ্যম : কেউ উচ্চমধ্য, কেউ-বা নিম্নমধ্য। মার্ক্স বলেছিলেন যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশ ভেঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে এক হয়ে যাবে। কথাটা ক্রমে ক্রমে গ্রাহ্য হতে চলেছে উলটোভাবে। শ্রমিকশ্রেণীর একটা অতুচ্ছ অংশ মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

সমাজের ভিতর যে বিরোধ বার বার দেখা দেয় সেটা সর্বক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণী ও নিম্ন শ্রেণীর সংঘাত নয়। বরং বহুক্ষেত্রেই সেটা এক উচ্চবর্গের সঙ্গে অন্য উচ্চবর্গের দ্বন্দ্ব। অথবা, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মধ্যবিত্তেরই একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিরোধ। উচ্চনীচের দ্বন্দ্বও এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা নিষ্প্রয়োজন। যে বর্গ অথবা বংশ যখন আধিপত্য স্থাপন করে তারই একটা স্বাভাবিক চেষ্টা দেখা যায় সেই আধিপত্যের সমর্থনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরবার। এটাকে বলা যেতে পারে প্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যের পক্ষে যৌক্তিকতার ও নায্যতার সন্ধান। বিভিন্ন যুগে এই চেষ্টা হয়েছে বিভিন্ন রূপে। যুগের চেতনার স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই যৌক্তিকতার আকারপ্রকার নির্ধারিত হয়। কোনো এক যুগে জোর পড়েছিল বংশগৌরবের ওপর। রাজা যদি চন্দ্রবংশ অথবা সূর্যবংশের হন তবেই তাঁর সিংহাসনে অধিকার দৈবসিদ্ধ। পুরাণে তাই বংশতালিকার গুরুত্ব বিরাট। পরবর্তী যুগে বংশতালিকার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেল ধর্ম। কোনো রাজা হয়তো গ্রহণ করলেন বৌদ্ধধর্ম বা হিন্দুধর্ম। ইয়োরোপে সম্রাট হলেন খ্রীষ্টধর্মের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। প্রতিষ্ঠিত হল রাজকীয় অধিকারের ধর্মীয় ভিত্তি।

ক্রমে যৌক্তিকতার ভাষার আরো বদল হল। ইতিহাসে যাকে 'যুক্তির যুগ' বলা হয়েছে তার গোড়াতেই এই পরিবর্তন চোখে পড়ে। বলা হল, প্রকৃতি যেমন নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজও সেইরকম নিয়মের উপর স্থাপিত হওয়া চাই। এই নিয়মগুলি কী, এই নিয়ে চললো তর্ক ও অনুসন্ধান। বিশেষ সমাজব্যবস্থার সমর্থনে বলা হল, প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে অথবা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষার জন্যই এটা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক আর সামাজিক নিয়মকে একই ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টাও স্থায়ী হল না ; আবারও কিছু আপত্তির কারণ দেখা দিল। এবার সমাজনীতির যৌক্তিকতা খোঁজা হল উপযোগবাদে। আকাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তির ভিত্তি ও বিন্যাস এইভাবে বদলে চলেছে। উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীও শেষ কথা নয়।

দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করে পরিবর্তনকে বুঝবার চেষ্টা হয়েছে। দ্বন্দ্ব আর সহযোগ কিন্তু

একই সঙ্গে চলে।

শুধু দ্বন্দ্ব অথবা সহযোগিতা দিয়ে এককভাবে পরিবর্তনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বোঝা দরকার সহযোগিতাকে পূর্ণ করে তুলবার জন্য।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম চলছে। আবার প্রকৃতির কাছ থেকে শক্তি আহরণ করেই মানুষ ধাপে ধাপে এগিয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রে এর উদাহরণ সহজ। মাটিকে ভালো না বেসে কৃষক কৃষিকাজে সফলতা অর্জন করে না। অরণ্যকে ধ্বংস করবার মধ্যে দ্বন্দ্বের দিকটা বড় হয়ে ওঠে। পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করবার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় স্নিগ্ধ সান্নিধ্যের দিকটা।

শিল্পবিপ্লবের যুগ থেকে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির ওপর মানুষের কর্তৃত্ব স্থাপনের ওপর। প্রকৃতি যেন বিরুদ্ধ পক্ষ, মানুষকে তার ওপর জয়ী হতে হবে। অথচ বিজ্ঞানী নিজের মতো করে প্রকৃতিকে ভালোবেসেছে, প্রকৃতি তার কাছে প্রতিপক্ষ নয়। কর্তৃত্ব বিস্তারের চিন্তাকে বড় করে তুলেছে কিছু বিশেষ পরিস্থিতি ; যেমন, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বড় আকারে ব্যবহার করা হয়েছে যুদ্ধের স্বার্থে। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, প্রযুক্তির বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি ঘটেছে যুদ্ধসংক্রান্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে।

প্রযুক্তির অগ্রগতির ভিতর দিয়ে সমাজের গঠনবিন্যাস বদলে চলেছে। উৎপাদনের জন্য মানুষকে একরকমভাবে সংঘবদ্ধ হতে হয়। উৎপাদনের পদ্ধতি ও কৌশল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সংঘবদ্ধতার রূপেরও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে এটাও লক্ষ করা দরকার যে, প্রযুক্তির মোটামুটি একই স্তরে সমাজের বিভিন্ন বিন্যাসও সম্ভব। উৎপাদনের স্তর দিয়ে এককভাবে নির্ধারিত হয় না রাজনীতির কাঠামো, মানুষের মূল্যবোধ অথবা স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা।

অনেকখানি জোরজবরদস্তি ছাড়া শিল্পবিপ্লব হয়নি কোনো দেশেই। অর্থশক্তি আর রাষ্ট্র শক্তি মিলিতভাবে এই জবরদস্তি চালিয়েছে। ইতিহাসের এই পর্যায়টাকে রাজসিক বলা যাবে না, সাত্ত্বিক তো নয়ই। যদিও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শক্তিমত্তার ভাবটা লক্ষ না করে উপায় নেই, তবু সেই রাজসিকতার সঙ্গে এসে মিশেছে ধনতন্ত্রের হিসেবি ব্যবহারিক বুদ্ধি। শ্রমিক শ্রেণীর চেতনাতেও ক্রমে ক্রমে মিশেছে একদিকে সাহস অন্যদিকে সংঘবদ্ধ স্বার্থবুদ্ধি। বলা যেতে পারে, এর প্রয়োজন ছিল। তবু এখানে স্থিতি সম্ভব নয়। একটা কথা আজ স্পষ্ট। শিল্পোন্নত দেশগুলির ভিতর থেকেই এমন কিছু শক্তি বেড়ে উঠছে যাতে সমাজের আরো মৌল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

শিল্পবিপ্লব প্রাচীন আত্মীয় সমাজকে ভেঙে ফেলেছে। তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। নতুন সমাজেও সমস্যার অন্ত নেই। অনুন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্যের সমস্যা প্রধান। উন্নত দেশগুলিতেও কিন্তু মানুষ সুখে নেই। যুদ্ধের আশঙ্কা তো মনের ওপর বিভীষিকার মতো ঝুলছেই। তার বাইরেও কিছু গভীর চিন্তার বিষয় আছে। শিল্পোন্নত দেশে মানুষের এক বড় সমস্যা তার একাকিত্ব। 'উন্নয়নশীল' দেশগুলির নাগরিক জীবনে আজ সেই সমস্যা উপস্থিত। যে-সমাজবিন্যাস ও জীবনদর্শন নিয়ে মানুষ আজ বড় হচ্ছে তাতে একাকিত্ব থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার প্রধান উপায় কিছু ব্যয়সাপেক্ষ উত্তেজনা, পরিকল্পিত চাঞ্চল্য। এতে যে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। নেশাগ্রস্ততা, অপরাধ-উল্লাস ও পৃথিবীজোড়া বিক্ষিপ্ত সন্ত্রাসবাদ এরই প্রত্যক্ষ লক্ষণ। দারিদ্র্য যেখানে দূর হয়েছে, সেখানেও দুঃখ দূর হয়নি। এ সেই দুঃখ নয় যাতে হৃদয়

কোমল হয়। এক আত্মঘাতী কষ্ট শিল্পোন্নত সমাজকে ভিতর থেকে কুরে খাচ্ছে।

এইখানে অন্য এক দ্বন্দ্ব। সমাজসংগঠনের সঙ্গে উৎপাদনের সম্ভাবনার বিরোধ নিয়ে এর মূল কথা নয়। এতদিন প্রধান প্রশ্ন ছিল, সমাজব্যবস্থা কীভাবে বদলালে উৎপাদিকা শক্তি বাস্তবে বৃদ্ধি পাবে। সে-প্রশ্ন অন্তত দরিদ্র দেশগুলিতে এখনও গুরুত্ব হারায়নি। তবু নতুন সমাজ নিয়ে চিন্তার ভিত্তি ক্রমে বদলে যাচ্ছে। শান্তি কোন পথে? এটাই প্রধান প্রশ্ন হয়ে উঠছে।

মানুষ আবারও সমাজব্যবস্থার যৌক্তিকতার সন্ধানটাই করতে চলেছে নতুন ভাবে। যুগসন্ধিতে বারবার এইরকমই ঘটেছে।

৪

ইতিহাসের যাত্রাপথে এই-যে নবপর্যায়, এর বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত কিছু দ্বন্দ্বের প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করা যাক।

শিল্পবিপ্লবের দাপটে পৃথিবীটা হয়ে উঠছে নগরময়। আধুনিকতার প্রতীক নগর।

মানুষের সভ্যতার গঠনে নগরের কিছু দান আছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ বলতে আমরা যা বুঝি সেসব গঠিত হয়েছে প্রধানত নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য সম্বন্ধে নগর আমাদের সচেতন করেছে। বাস্তব অর্থে বিশ্বজনীনতা বলতে যা বোঝায় তার অনেকটাই নগরের দান। স্বাধীনতার অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায় নগরকে বাদ দিলে।

তবু পল্লীর মাটির স্পর্শ চাই। সেই স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে মানুষের সংস্কৃতি হয়ে ওঠে যেন ফুলদানিতে সাজানো কাগজের ফুল। পল্লীতে মানুষ দরিদ্র নিরক্ষর কুসংস্কারগ্রস্ত হতে পারে, তবু সে পাশের মানুষকে প্রতিবেশী বলে জানে। সেখানে মানুষ শুধুই মানুষ স্বার্থসাধনের যন্ত্র নয়। পুরনো পল্লী বিদায় নিচ্ছে। তবু মানুষের মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে সমাজের ভিত্তিতে চাই এমন এক পল্লীর আদর্শ যার আশ্রয়ে প্রতিবেশীবোধ, অন্তরের টান, সুখদুঃখে সংবেদনশীলতা রক্ষা পাবে, রসের অভাবে শুকিয়ে যাবে না। প্রশ্নটা শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়েই নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের কথাও একই সঙ্গে এসে যায়। নগরে আছে প্রমোদ, পল্লীতে আছে আত্মার বিশ্রাম।

এই সবই আদর্শের কথা। নগর তার আদর্শরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারক, আর পল্লী আত্মীয়তার আধার। এ দু'য়ের ভিতর কীভাবে সমন্বয় আনা যায়, এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কিন্তু প্রশ্নটা আমদের মনে পরিষ্কার হয়ে ওঠা চাই। নয় তো ভ্রান্ত উত্তরকেও সদুত্তর বলে মনে হতে পারে।

এইসঙ্গে এসে যায় জাতীয়তাবাদের কথা। জাতীয়তাবাদ আর দেশপ্রেম এক বস্তু নয়। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি—এটা দেশপ্রেমের কথা। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যোগ আছে আধুনিক রাষ্ট্রের, ক্ষমতা নিয়ে জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার। প্রকৃতিপ্রেম অথবা আত্মীয়তাবোধের পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয়তাবাদের দ্বারস্থ হবার অর্থ হয় না। আমাদের এ যুগে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমস্ত প্রধান প্রধান দেশেই জাতীয়তাবাদ প্রবল। তবু এ যুগের সমস্যার সমাধানের জন্য তার বেশি কিছু চাই। কেউ কেউ আশা স্থাপন করে এক ধরনের শ্রেণীতন্ত্রে। কিন্তু সেটাও দুর্বল

আশ্রয়। জাতীয়তাবাদের মতোই শ্রেণীবাদও ক্ষমতালাভের জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের মন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে জন্মলাভ করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে-আদর্শ নাগরিক সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য দান তার যতটুকু মূল্যবান তাকেও রক্ষা করা কঠিন হয় শ্রেণীতত্ত্বের ব্যূহবদ্ধ অসহিষ্ণুতার ভিতর।

শ্রেণীতত্ত্বকে কেউ কেউ মানবতাবাদের সঙ্গে কার্যত সমার্থক বলে দেখাতে চেয়েছেন। পার্থক্য তবু আছে। সেই পার্থক্য একই সঙ্গে দার্শনিক ও প্রায়োগিক। শ্রেণীতত্ত্বের পরিচিত ভাষ্য বলে যে, শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভই মানবমুক্তির অপরিহার্য শর্ত। জাতীয়তাবাদীর কাছে যেমন স্বজাতির জয়ের চেয়ে বড় উদ্দেশ্য আর নেই, শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী যোদ্ধার কাছে শ্রমিকশ্রেণীর জয়লাভও সেইরকম। আজ হিংসার ক্ষমতা এতই মারাত্মক হয়ে উঠেছে যে, জাতিবিশেষের জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা উগ্ররূপ ধারণ করলে মনুষ্যজাতিরই সামগ্রিক বিনাশের সম্ভাবনা। শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই সাবধান বাণী উপেক্ষা করা যায় না। সব হিংসাত্মক সংগ্রামের মতোই শ্রেণীসংগ্রামেরও একটা মাদকতা আছে। মানবতাবাদের সঙ্গে এখানেই শ্রেণীবাদের অসামঞ্জস্য।

জাতিতে জাতিতে সংগ্রামে কোনো পক্ষই স্বীকার করে না যে, আঘাতটা সে প্রথম করেছে। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, আত্মরক্ষার জন্যই কিংবা অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে তাকে বাধ্য হয়ে আঘাত করতে হয়েছে। একই রকমের যুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে, হিংসাকে সমর্থন করা হয় আত্মরক্ষার যুক্তিতে। এই পুরনো তর্ককে পিছনে ফেলে আসা সহজ নয়। অথচ অহিংসায় বিশ্বাস স্থাপন করতে হলে ঐ তর্ককে অতিক্রম করে যেতে হয়। ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অহিংস যোদ্ধা ঝুঁকি নেন শান্তির সপক্ষে।

এটা অবশ্য আনন্দের কথা যে, সোভিয়েত নেতা গর্বাচভ অহিংসার সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছেন। এতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, তার কিছুদিন পরেই তিনি পারমাণবিক বোমা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা নতুন করে শুরু করবার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। যে-কোনো রাষ্ট্রনেতার পক্ষেই এটা এক কঠিন পরিস্থিতি।

নতুন পৃথিবী গড়বার আন্দোলনে তবে নেতৃত্ব দেবে কারা ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। অথচ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। তার উচ্চারণ সব সময় স্পষ্ট নয়, পদক্ষেপ নির্ভুল নয়। তবু তাকে নবযুগের আন্দোলন বলে চেনা যায়।

নব আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা যায় যুবশক্তিকে, সেই যুবশক্তি উৎপাদনের যন্ত্রে যে স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়েনি। এর সংগঠন দুর্বল, স্থায়িত্ব কম, তবু ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো আন্দোলনের ধারা আছড়ে পড়ছে। আরো আছে নারীমুক্তির সংগ্রাম। কিছু আতিশয্য অতিক্রম করে সেই সংগ্রামও নতুন পৃথিবীর প্রতিশ্রুতি বহন করে চলেছে।

গ্রামে গ্রামে কিছু আদর্শবাদী মানুষের সাক্ষাৎ মেলে, যারা নিযুক্ত গঠনমূলক কাজে। এদের অনেকেরই মনের দিগন্ত প্রশস্ত নয়। কিন্তু এরই ভিতর কারো কারো দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন, কল্পনা সুদূরপ্রসারী। আরো আছে শান্তি আন্দোলনের কর্মীরা। আছে শিল্পী ও সাহিত্যিক। নতুন সমাজের ছোটো ছোটো প্রতিকৃতি, বিক্ষিপ্ত দ্বীপের মতো, সৃষ্টি করবার কাজে নিযুক্ত কিছু মানুষ। কত দুর্বল মনে হয় এদের প্রচেষ্টা ! তবু এদের ভিতর দিয়েই মানুষের প্রাণশক্তি নতুন জগৎ গড়বার পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিল্পবিপ্লব মানুষের ছোটো ছোটো জনপদের সীমানা ভেঙে, তাদের বৈচিত্র্য মুছে দিয়ে, পৃথিবীটাকে যেন একাকার করে দেবার দিকে ঠেলছিল। আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতিকে

জাতিচ্যুত করে, ধর্মকে বিদায় দিয়ে, পৃথিবীজোড়া এক বহুত্বহীন নাগরিকত্বের স্থাপনা হয়ে উঠেছিল আধুনিক প্রগতিবাদের আদর্শ।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদীরা দুর্বল দেশগুলিকে এক প্রবল শক্তির পদানত করবার চেষ্টায় মত্ত হয়েছিল। অন্যদিকে রব উঠেছিল, মেহনতী জনতার কোনো পিতৃভূমি নেই, দুনিয়ার মজদুর এক। লেনিন অবশ্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তবে লেনিনবাদীর কাছে বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যই প্রথম ও প্রধান নীতি, অতএব সেই নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে আত্মনিয়ন্ত্রণও চলবে না। সোভিয়েত শিবিরের অন্তর্ভুক্ত কোনো দেশ যদি আজ সেই শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে চায় তবে মহান বিপ্লবের বিরুদ্ধে শত্রুতা বলেই. তাকে সহজে মেনে নেওয়া যাবে না। বিপ্লব আর সোভিয়েত নেতৃত্ব সমার্থক হয়ে গেছে।

এইসবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অনিবার্য, প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিবিরবদ্ধ বিপ্লববাদও আর মানুষের মুক্তির আদর্শ নয়।

মানুষ এক, কিন্তু বহুত্বে চিহ্নিত। তার ঐক্য ও বৈচিত্র্য দুইই শ্রদ্ধেয়। স্বশাসিত বহু জনপদ নিয়ে এক যুক্তরাজ্য, প্রগতির পথ এই দিকে। একদিন সারা পৃথিবীই হবে এইরকম এক যুক্তরাজ্য, আজকের এই দুরাশা আগামী কালের লক্ষ্য। যে-যুগ অবসিত হতে চলেছে তার ঝোঁক ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে—আর্থিক, রাজনীতিক, সব ক্ষমতার ক্ষেত্রেই এইরকম। এবার অগ্রসর হতে হবে সাম্য ও বিকেন্দ্রীকরণের পথে।

সত্য এক, একথা আমরা শুনেছি। কিন্তু ব্যক্তির চেতনায় সত্য প্রতিফলিত হয় বহুরূপে। ব্যক্তির আনুগত্য সেই সত্যের প্রতি যাকে সে নিজের চেতনায় লাভ করে। একই কথা এসে যায় সংস্কৃতি সম্বন্ধেও। সত্যের যে খণ্ডিত ও বহুমুখী প্রকাশ তারই দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানের ভিতর দিয়ে মানুষের যাত্রা পূর্ণতার দিকে। দ্বন্দ্ব চাই, এ ছাড়া গতি নেই। দেখতে হবে সেটা অধোগতি না হয়। আমরা যখন যুক্তির কথা বলি, অহিংসার কথা বলি, তখন যুক্তি ও অহিংসাকেও মানতে হবে সংগ্রামের শক্তি বলে, এগিয়ে যাবার শক্তি বলে। অজ্ঞতা কুসংস্কার নিষ্প্রাণ আচার, এইসবের বিরুদ্ধে যুক্তি এসেছে সমালোচকের ভূমিকায়। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যুক্তিরও যাত্রা অনিবার্যভাবে স্তর থেকে স্তরান্তরে। শুধু সমালোচনা দিয়ে অন্ধকার দূর করা যায় না। যুক্তিকে যুক্ত হতে হয় অন্য এক আনন্দ ও জ্যোতির্ময়তার সঙ্গে, তবে সে জয়ী। রবীন্দ্রনাথের জীবনের ভিতর দিয়ে এই সত্যটি বাণীরূপ পেয়েছে। হিংসার ভিতরও একটা প্রাণের শক্তি আছে, সেটা নিষ্প্রাণতার চেয়ে ভালো। তবু সত্যকে অন্য এক তামসিকতায় আবৃত করে হিংসার শক্তি। সেই দ্বন্দ্ব তত সার্থক যত তাকে পাই অহিংসার সীমার মধ্যে। এইখানে ইঙ্গিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্য এক স্তরের দিকে। যদিও সত্যের প্রকাশে আছে বহুত্ব তবু শান্তি অবিভাজ্য।

৫

অহিংসা দিয়েই কথা শেষ করা যাক।

যে-বন্য প্রকৃতিতে আদিম মানুষকে জীবনধারণ করতে হয়েছে সেখানে অন্যান্য অনেক জীবের তুলনায় সে ছিল দুর্বল। দন্ত ও নখরের শক্তিতে প্রবলতর বহু হিংস্র প্রতিবেশীর মধ্যে সেদিন ভীত ও দুর্বল মানুষ নিজেকে কষ্টে রক্ষা করেছে অস্ত্রের সাহায্যে। এইখানে ছিল তার শ্রেষ্ঠত্ব। অন্য প্রাণী যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাই তার সম্বল। নিজেরই সৃষ্ট

হাতিয়ারের সাহায্য নিতে জানে মানুষ। আদিতে এটা ছিল দুর্বল মানুষের আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু অস্ত্রের ব্যবহার সেইখানে সীমাবদ্ধ রইল না। বাঘের যেটা ঘাতকশক্তি প্রকৃতিই তার সীমা টেনে দিয়েছে, তার আর বিশেষ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। মারণাস্ত্রের স্রষ্টা যেহেতু মানুষ নিজে অতএব প্রকৃতির উদ্দেশ্য নিয়ে তার সীমা টানা নেই, সেটা ক্রমাগত বেড়ে চলে। এর একটা উত্তেজনা আছে, নেশা আছে। একদিন অস্ত্র আর দুর্বল মানুষের আত্মরক্ষার সহায় রইল না, বরং দুর্বলের উপর প্রবলের আধিপত্যের উপায় হয়ে উঠল। শুরু হল এইভাবে মানুষের সভ্যতার রাজসিক পর্যায়।

এতেও বহুদিন পর্যন্ত তেমন বড় বিপদ দেখা দেয়নি। অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে একেবারে আধুনিক কালে পৌঁছে। মানুষের হাতে আজ যে ধ্বংসের শক্তি এসে পড়েছে তাতে যে শুধু দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারই সম্ভব তাই নয়; সংকট আজ আরো গভীর। মানুষ আজ নিজের গড়া শক্তিতে মনুষ্য জাতিটাকেই ধ্বংস করতে পারে। এই সম্ভাবনা আগে ছিল না। অতএব আজ প্রয়োজন হয়েছে হিংসার প্রশ্নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী।

শান্তির জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল আরো আগেই, প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষায়। কিন্তু প্রবল তাতে বড় বেশি কর্ণপাত করেনি। ক্রমে সমস্যা কঠিন হয়ে উঠেছে। আজ যখন ধ্বংসের শক্তিটা এমনই যে তাকে নিয়ন্ত্রণের ভিতর আনতে না পারলে দুর্বল ও প্রবল সহ গোটা মানুষের সমাজটাই বিনষ্ট হবে, তখন এই মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই আর নিতান্ত পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ইতিহাস যেন গভীর থেকে গভীরতর সংকট সৃষ্টি করে পরীক্ষা করতে চাইছে কবে মানুষ নতুন পথ বেছে নেবে। একদিন মানুষের আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে প্রয়োজন হয়েছিল হিংসার অস্ত্র। আজ মানুষের সামগ্রিক আত্মরক্ষার জন্যই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অহিংসার পথ।

চেতনার এক নতুন পদক্ষেপ ছাড়া সভ্যতার এই উত্তরণ সম্ভব নয়। যেমন মৃত্যুর চিন্তা দূরে ঠেলে রেখে প্রতিদিনের জীবনে মানুষ বাঁচে তেমনি বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্করতাকেই হয়তো মাঝে মাঝে ভুলে থাকা যায়। তবু ভোলা যায় না অন্য এক চিত্র। একদিন মানুষের আদর্শবাদী মনকে আকৃষ্ট করেছিল সর্বহারা শ্রমিক। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল দয়া নয়, সংগঠন ও সাহস। সংঘবদ্ধ শ্রমিক আজ সবদেশেই একটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করে নিয়েছে, নিচ্ছে। তারা আর সমাজের হতভাগ্যতমদের ভিতর গণ্য নয়। কিন্তু চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ছে অন্য এক নরক। এদের পাওয়া যায় সর্বত্র, সর্বস্তরে। সাম্যবাদী সমাজও আর নেশা ও মদ্যপতা থেকে মুক্ত নয়। সেই সঙ্গে সংক্রামিত হচ্ছে বিক্ষিপ্ত হিংসার আকর্ষণ।

এইসব বীভৎসতার ভিতর থেকেই মানুষের মনে এক নতুন আদর্শবাদের ডাক স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

কৌশল আর বীরত্বই যথেষ্ট নয়। আরো চাই সেই চেতনা যেখানে মিলিত হয়েছে অভয় ও করুণা। আমরা কি জয়ী হব উত্তরণের এই পরীক্ষায়? আমরা কি জয়ী হতে পারি এই উত্তরণ ছাড়া? এ-যুদ্ধে ও-যুদ্ধে কে জিতল কে হারল সেটা বড় কথা নয়; কোন পরিণতির দিকে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে সেটাই প্রধান কথা। দীর্ঘ সেই যাত্রা; তবু সেটাই পথ।

মানুষের মৌল দুরবস্থা—বন্ধন। শোষনের চেয়েও বন্ধন মৌল। মানুষ বাঁধা পড়ে অন্ধ কুসংস্কারের কাছে, অত্যাচারী শাসকের কাছে, অবশেষে নিজেরই ভয় লোভ

অহংকারের কাছে। বন্ধনের নানা রূপ, বিচিত্র পথে বন্ধনমুক্তির সন্ধান, এই নিয়ে ইতিহাস।

এ-আশা কি দুরাশা, যে, বহু ব্যর্থতা বহু মৃত্যুকে অতিক্রম করে শেষ অবধি মুক্তির পথেই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে যাবে ?

প্রেম ও পূজা

সেই প্রেম নিয়ে কথা বলছি যৌনতার সঙ্গে যার যোগ আছে। সমসাময়িক সমস্যা দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করা যাক, শেষ হবে চিরন্তন কথায়।

আমাদের এই আধুনিক সমাজে স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আর ভুল বোঝাবুঝি বেড়ে চলেছে। মৌলবাদীরা মেয়েদের অন্তঃপুরে ফেরত পাঠাচ্ছেন। মেয়েরা-যে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এইখানেই ওঁরা সমস্যার মূল কারণ দেখছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই চাকরীজীবী মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর একটা লক্ষ্য আর্থিক—পরিবারের আয়বৃদ্ধি। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। মহিলারা অন্তঃপুরের আবদ্ধতায় আর থাকতে চাইছেন না। বাইরের বড় পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ যতই বাড়ছে, তার বৈচিত্র্যে ও প্রাণচাঞ্চল্যে যতই তাঁরা অভ্যস্ত হচ্ছেন, ততই সেটা বাদ দিয়ে জীবন আর পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে না। যৌথ পরিবার টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। স্বামীস্ত্রীর ছোটো পরিবারের চার দেয়ালের মধ্যে স্ত্রী হাঁপিয়ে ওঠেন, বাইরের বিশ্বে তিনি মুক্তি খোঁজেন। সন্তানের সংখ্যা যতই কমছে, শুধু সন্তান প্রতিপালনে স্ত্রীকে আবদ্ধ রাখা ততই অযৌক্তিক হয়ে উঠছে। পৃথিবীজোড়া এই দিকে ঝোঁক।

এদেশেও ঘরের বাইরে নারীর বিচরণ ক্রমেই অবাধ হয়ে উঠেছে। এই বড় পরিবর্তনটা দ্রুত ঘটে গেছে গত অর্ধশতাব্দীতে। বহু শতাব্দীর ঐতিহ্য ভেঙে পড়েছে। পুরুষ এই ব্যাপারটা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। শাশুড়িরাও অনেকে পেরেছেন কি ? বাইরের পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর মেলামেশায় স্বামী অভ্যস্ত নন। এই অবস্থায় অনেক স্বামীই সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন। এটা আবার স্ত্রীর কাছে স্বাভাবিক কারণেই বিরক্তিকর। স্বামী বাইরের জগতের মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তাতে দোষ নেই, স্ত্রীর মেলামেশাতেই দোষ, এটা মেনে নেওয়া আজকের নারীর পক্ষে কঠিন। সন্দেহ মাত্রা মেনে চলে না, মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াটাই তার ধর্ম। অতিরিক্ত সন্দেহের শিকার হবার পর স্ত্রীর মনে একটা রোখ চেপে যায়। স্বামীও সন্দেহের শিকার হন, তখনও একই ব্যাপার ঘটে। এমনি করে গড়ে ওঠে একটা অবাধ্য চক্র। স্বামীস্ত্রীর ভিতর সম্পর্কে তিক্ততা বাড়তে থাকে। শ্রদ্ধাহীন সহাবস্থানের দণ্ড মাথায় নিয়ে উভয়ে বাস করেন।

পুরুষদের বহুগামিতা পুরনো ঐতিহ্যে মেনে নেওয়া হয়েছিল। অনেক স্ত্রীই সেটা সহ্য করতেন। অনেকেই ধরে নিতেন যে, পুরুষের পক্ষে ওটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্ত্রীর কাছ থেকে দাবি করা হত অনড় অটল একগামিতা। অধিকারের এই অসাম্য আজকের নারীর কাছে শ্রদ্ধেয় নয়, মান্যও নয়। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের কি কোনো পথ নেই ?

মৌলবাদীদের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা পরিত্রাণ খুঁজছেন নারীকে পুনর্বার অন্তঃপুরবাসিনী করবার পথে। কোনো কোনো দেশে এই নিয়ে জোরজুলুম চলেছে। কিন্তু এভাবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। পুরুষের স্থান বাইরের পৃথিবীতে, সেখানে সে হবে প্রায়শ বহুগামী, আর নারীর স্থান ঘরে, সেখানে বিরাজ করবে একগামিতা, এ বিধান চলবে না।

কেউ কেউ একটা সরল সমাধান দিচ্ছেন। ঘরে বাইরে সর্বত্রই নারীপুরুষ উভয়েরই স্থান থাকবে। আর উভয়েই হবেন একগামী। এই বিধানে উৎকট অসাম্য নেই। তাছাড়া স্বীকৃত নৈতিকতার সঙ্গে এর মিল আছে। স্বামীস্ত্রী উভয়েই যদি এটা মেনে চলেন তবে বাহ্যদৃষ্টিতে কোনো সমস্যা থাকে না।

কিছু দুঃখজনক জটিলতা তবু থেকেই যায়। এমন অনেক স্বামীস্ত্রী আছেন যাঁরা একগামী ঠিকই, কিন্তু যাঁদের যৌনসম্পর্কের ভিতর কোনো সৌন্দর্য নেই, কোমলতা নেই। স্বামী জান্তব তাড়না থেকে কাজটা করেন। স্ত্রী এ থেকে কোনো আনন্দ পান না। তিনি ব্যাপারটাকে ভয় করেন, এমন কি ঘৃণা করেন। কিন্তু তাঁর অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। ব্যাপারটা ঘটে তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা এমন কি প্রকট প্রতিরোধ সত্ত্বেও। একগামিতার সীমার ভিতরই চলে আইনসম্মত বলাৎকার। এই কদর্যতার উদাহরণ অসংখ্য। ঐতিহ্যের চোখে স্বামীর বলাৎকারে দোষ নেই, স্ত্রীর প্রতিরোধেই দোষ। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই একগামিতার স্বীকৃত বিধানে।

দীর্ঘকাল এই অভিশাপ বহন করেই সংসার চলেছে। অন্তত বাহ্যদৃষ্টিতে ভাঙন দেখা দেয়নি। এখন সময় বদলেছে, পুরনো ধারায় আর চলছে না। মনান্তরের ছিদ্রপথে নানা জটিলতা এসে যোগ হচ্ছে। অনেক সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে। চতুর্দিকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে অসহিষ্ণুতা ও নির্দয়তা। এটাই মূল সমস্যা। নৈতিকতার প্রচলিত পুরনো ধারণার ভিতর এর সমাধান নেই। পুরনো ধারণাকে আশ্রয় করেই পুষ্ট হচ্ছে নতুন মৌলবাদী আন্দোলন, আগেই যার উল্লেখ করেছি। এই আন্দোলনে অসহিষ্ণুতা আর নির্দয়তাই নীতির গৌরব পাচ্ছে। এই সব অতিক্রম করে যাবার পথ কোথায়?

বিবাহ নিয়ে নিয়ম ও ধারণা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিধান। আমদের পরিচিত ও প্রচলিত বিধানের মূলে সম্পত্তি ও সন্তানপালনের কথাটা বড়। কিন্তু আধুনিক মানুষকে ভিতরে ভিতরে কুরে খাচ্ছে অন্য এক যন্ত্রণা। সে যুক্ত হতে চায়, কিন্তু সে বিচ্ছিন্ন। যাকে নম্র হয়ে পেতে হয়, তাকে সে দখল করে নিতে চায়। না পেলে সব কিছু ভাঙবার রোখ চাপে। এ থেকে নিস্তার নেই কোনো বাহ্য বিধানে, সম্পত্তি নিয়ে চিন্তায় তো নিশ্চয়ই নেই। বিধান কিছু প্রয়োজন বটে। কিন্তু তার সঙ্গে চাই অন্য এক ঔদার্য ও মূল্যবোধ।

কী সেই মূল্যবোধ? তাকে উচ্চারণ করা যাবে কোন ভাষায়? মানুষের সমাজ ও চেতনার বর্তমান স্তরে স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বিধানকেই কি মূলবিধান বলে বিবেচনা করা যায়? এসব প্রশ্ন উপেক্ষণীয় নয়, তবু জবাব দিতে গিয়ে সতর্ক হতে হয়। যে-সব কথা একদিন তর্কাতীত ছিল তাও আজ তর্কসাপেক্ষ। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি স্ত্রীপুরুষের সহবাসের জন্য আবশ্যক কি না এ নিয়েও নতুন প্রজন্মের মনে গভীর সংশয় আছে। কী-যে মূল্যবান আর কী নয় এ নিয়ে আজ মতৈক্যে পৌঁছানো কঠিন কাজ। আমাদের নির্বাচন এমন হওয়া চাই যে, নতুন যুগের গভীরতর প্রতীতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকে, আবার কিছু স্থায়ী মূল্যেরও অন্তত স্বীকৃতি ঘটে। আমাদের

চিন্তার ভিতর মূল্যবোধের সঙ্গে আত্মা থাকা চাই সেই নম্রতা যাতে সাধারণ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন না করেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পথে মুক্তির সন্ধান করতে পারে। এইসব শর্ত মেনে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কি একেবারেই সম্ভব ?

॥ দুই ॥

এইসব প্রশ্ন কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রেখে বিষয়টার আরো একটু গভীরে যাওয়া যাক।

যৌনবিচার ও অনুভূতির স্তরভেদ আছে। এ নিয়ে এইবার কয়েকটি কথা বলে নেওয়া আবশ্যক।

একস্তরে যৌনতার সঙ্গে মিশে আছে ভয় ও পাপবোধ। মানুষকে সে লুব্ধ করে। চরিত্রের সংযম ভেঙে দেয়। মনের সেই অভিনিবেশ নষ্ট হয়, যাকে হারালে কোনো বড় কাজই সুসম্পন্ন করা যায় না। সেই অসংযত যৌনতা মুক্তির পথ নয়, বরং বন্ধন। বাধা পেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পীড়নের ভিতরই একরকম বিকৃত সুখ খোঁজে। যৌনতার এই এক ভয়ংকর রূপ। কামবোধ আর হিংসা এখানে মিলেমিশে গেছে।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, একরকমের নৈতিকবিধানে জোর পড়েছে সংযমের ওপর। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একসময়ে ব্রহ্মচর্যের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। বাড়ির বড় একটা শক্ত ভিত্তি দরকার, চরিত্রেরও সেইরকম। ভিত্তি দুর্বল হলে তার ওপর বড় কিছুই গড়ে তোলা যায় না। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, শিক্ষায় সংযম ও অনুশীলনের স্থান থাকা আবশ্যক।

যৌনতার অন্য এক স্তর এবং অন্য এক রূপ আছে যেখানে সে সুন্দর। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, যৌনতারই এক উদ্‌গতির ফলে কবির চোখে পৃথিবী সুন্দর। কথাটা কিন্তু অন্যভাবে বলাই ভালো। মানুষের চেতনায় একটা প্রীতির শক্তি আছে, আত্মাকে প্রসারিত করবার শক্তি আছে, যেটা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বকে আনন্দরূপ করে তোলে। সেই শক্তিই আবার যৌনতায়ও সঞ্চারিত হয়, তাকে সুন্দর করে তোলে। এখানে একটা আরোহণ অবরোহণের ব্যাপার আছে। শুদ্ধ চেতনার আনন্দময়তার যেমন একটা ভূমিস্পর্শী অবরোহণের স্রোত আছে, তেমনি যৌনতার তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে তার একটা আকাশবিহারী আরোহণের ধারাও আছে।

যৌনতাকে যখন আমরা পাপবোধের দ্বারা চিহ্নিত করি তখন মানুষের দেহ আমাদের চোখে পাপেরই প্রতীক হয়ে ওঠে। আবার যে-স্তরে যৌনশক্তি সুন্দরের ধারক সেখানে মানুষের দেহও সেই রূপ ধারণ করে। যুগে যুগে কবি ও শিল্পীরা মানুষের দেহকে, বিশেষত নারীদেহকে (অধিকাংশ কবি পুরুষ বলেই কি ?), মুগ্ধ দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন। যে-দৃষ্টি নিয়ে কবি প্রকৃতির রূপময়তায় অবগাহন করেছেন, সেই দৃষ্টির স্পর্শে নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গও রূপময় হয়ে উঠেছে। ভয় এবং পাপবোধের কদর্যতা থেকে মুক্ত করে যৌনতাকে ও মানুষের দেহকে সুন্দর বলে চিনে নেওয়ার জন্যও একরকমের শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

মূল কথাটা এখানে দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে বলতে হবে।

শুধু পাপবোধের দাপটে হিংসা ও কদর্যতাকে কখনই ঠেকানো যায়নি, সংযমশিক্ষাও সম্পূর্ণ হয়নি। বরং পাপবোধ অনেক সময় একরকমের নির্দয়তাকেই আশ্রয় দিয়েছে।

সৌন্দর্যশিক্ষার মধ্যেই সংযমশিক্ষারও স্থান আছে। আমরা যখন দৃষ্টি এবং স্পর্শকে লোভের তাড়না থেকে রক্ষা করতে শিখি তখনই সেই দৃষ্টিতে সুন্দরের চিত্ররেখা ধরা পড়ে, সেই স্পর্শে কোমলতার অনুভব রক্ষা পায়। সংযমের এটাই সদর্থ। এই হল প্রথম কথা।

এরপর একটা দ্বিতীয় কথা আছে। নেহাত নান্দনিকবৃত্তির ওপর যৌনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলেও বিপদ থেকে যায়। তাতে যৌনতা একরকমের বিলাস হয়ে ওঠে, অন্তত সেই সম্ভাবনা প্রবল। এর অকাট্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে অভিজাতশ্রেণীর ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে।

সুন্দরকে রক্ষা করবার জন্যও নিতান্ত সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে অতিক্রম করে যেতে হয়। এই থেকেই আসে যৌনতার ও প্রেমের একটা তৃতীয় স্তরের কথা। এখানে ভোগটা প্রধান কথা নয়, পুজোটাই প্রধান। এ যেন আরতির ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেবীর মুখ দর্শনের মতো। সঙ্গমও সেখানে হয়ে ওঠে অঙ্গ দিয়ে অঙ্গের পুজো। রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর যে বারবার প্রেম ও পূজার পার্থক্য মুছে যায় সেটা এইখানে অর্থবহ। প্রেমের স্পর্শে শুধু প্রেমাস্পদের নয়, বিশ্বেরই একটা রূপান্তর ঘটে। আলোরও রং বদলে যায়, সমস্ত আকাশ ঝুঁকে প'ড়ে আমাদের চোখে চোখ রাখে, হৃদয়ে প্রবেশ করে। সংযম, প্রেম, পুজো সবই সেখানে একাকার হয়ে যায়। তখন আর আলাদা করে সংযমরক্ষার ক্লেশে চরিত্র কঠিন হয়ে ওঠে না, বিচ্ছিন্ন ভোগতৃষ্ণায় মন ক্লান্ত হয় না। চেতনার এই অবস্থাকে আমরা স্থায়ীভাবে যদি-বা লাভ করতে না পারি তবু এটাকে সত্য বলে জানাতেই দিগ্‌ভ্রান্তি দূর হয়।

মানুষের চেতনার বিবর্তনের এই এক বৈশিষ্ট্য যে জড়তার ভিত্তি থেকে যাত্রা শুরু তারপর স্তর থেকে স্তরান্তরে গুণগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চেতনা অগ্রসর হয়ে চলে। কোনো স্তরকেই একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। তবু গতিরেখা সম্বন্ধে একটা বোধ চাই, তাকেই বলি দিগ্‌বোধ। দিগ্‌বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সব বিধানই শেষ অবধি তার সদর্থ হারায়।

॥ তিন ॥

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটি প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, সেইখানে আবার ফিরে যাওয়া যাক। স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্পর্ক বিষয়ে স্থানীয় আচারবিচারে বিস্তর পার্থক্য আছে, আমাদের মূল জিজ্ঞাসা সেইসব নিয়ে নয়। এমন কিছু সাধারণ বিধানই আমাদের অনুসন্ধানের বস্তু যার সঙ্গে এ-যুগের প্রাগ্রসর চেতনা ও মূল্যবোধের সামঞ্জস্য আছে।

তিনটি বিধানকে বোধ করি এইরকম মূল বিধান বলে চিহ্নিত করা সম্ভব। বিবাহ বলে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি নাও থাকে তবু এইসব বিধানের যৌক্তিকতার তারতম্য ঘটে না। বিধান তিনটি এইরকম :

নারী অথবা পুরুষ কেউই এমন কোনো অধিকার নিজের জন্য দাবি করবেন না অপরের জন্য যে-অধিকার তিনি মেনে নিতে রাজী নন :

পারস্পরিক প্রীতি ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে ছাড়া যৌনসম্পর্ক শ্রদ্ধেয় নয় ;

যৌনতার নেশা অন্যসব নেশাগ্রস্ততার মতোই বন্ধনবিশেষ, অতএব সে বিষয়ে সতর্কতা

আবশ্যক।

এই তিনটি শর্ত অথবা বিধান নিয়ে এবার সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

জনজীবনে আজ নারী ও পুরুষের সমান অধিকার অন্তত সংবিধানে স্বীকৃত। যৌনসম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই সাম্য এখনও মৌখিক স্বীকৃতিও লাভ করেনি। দীর্ঘ অভ্যাস ও ঐতিহ্য সাম্যের পথে বাধা হয়ে আছে। এইসব বাধা ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে। নতুন সংকটের সম্ভাবনা অস্বীকার না করেও বলা যায়, ইতিহাসের ঝোঁক সাম্যের দিকে।

প্রশ্ন উঠবে, স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিতে কি কোনো পার্থক্য নেই? কোনো ব্যক্তিই কিন্তু এক অবিমিশ্র ধাতুতে গঠিত নয়। প্রতিটি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দুই ভিন্ন ধাতুর মিশ্রণে গঠিত, যার একটিকে নারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যটিকে পুরুষ। অবশ্য এই মিশ্রণ ঘটে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে। সমান অধিকার লাভের পরও বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী আত্মপ্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন উপায় বেছে নেবে এইরকমই আশা করা যায়। নারীপ্রকৃতি বলে যে-কোমলতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটা মানবপ্রকৃতিরই একটা বিশেষ অঙ্গ, তার মূল্য অনেক। "পুরুষ" হয়ে উঠবার অস্বাভাবিক অতিচেষ্টায় সমাজের অকল্যাণের সম্ভাবনা আছে। অধিকারের অসাম্য কিন্তু এই অস্বাভাবিক চেষ্টাকেই আজ প্ররোচিত করছে। নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছায় পরস্পরকে কিছু বিশেষ সুবিধা ছেড়ে দিতে পারে, সেটা ভিন্ন কথা। বিশেষ অধিকার দাবি করতে গেলে এ-যুগে কলহই বাড়বে। সাম্যের বিধানই শ্রেয়।

মানুষে মানুষে সম্পর্ক যখন প্রীতি ও সদিচ্ছার আচ্ছাদনে আবৃত নয় তখন সেটা সুন্দর নয়, আনন্দবর্ধক নয়। এইরকম সম্পর্কও সংসারে কখনো কখনো রক্ষা করে যেতে হয়। অবস্থাবিশেষে সেটাই যুক্তিসঙ্গতও হতে পারে। যেমন, টাকা ধার নেবার পর প্রীতির সম্পর্ক না থাকলেও টাকা ফেরত দেবার কর্তব্যটা থেকেই যায়। কিন্তু প্রীতি ও সদিচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন যৌনসম্পর্ক না রাখাই ভালো।

এমনও হতে পারে যে, প্রীতি সদিচ্ছা সবই আছে, তবু স্ত্রী যৌনসম্পর্ক ইচ্ছা করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের ইচ্ছাটাই স্ত্রী মেনে নেন। তাতে অন্তত বাহ্যত সমস্যাটা থাকে না। তবে সব ক্ষেত্রে এমন হয় না। সাধারণ বিধান হিসেবে এটাই মান্য যে, অনিচ্ছুক স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক ত্যাগ করাই উচিত।

এর একটা বড় উদাহরণ লোকমুখে আমি শুনেছি। এদেশের একজন শ্রদ্ধেয় নেতার জীবনের কথা সেটা। তরুণ বয়সে তিনি বিবাহিত হন। বিবাহের পর বিদ্যাসংগ্রহের জন্য বিদেশে যান। স্ত্রী থেকে গেলেন গান্ধীজীর আশ্রমে। পুরুষটি ফিরে এসে দেখেন, স্ত্রী আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করবেন বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সব কথা শুনে স্বামী বললেন, তিনি নিজে যৌনসম্পর্কই ইচ্ছা করেন, সেটাই তাঁর চোখে সুন্দর ; কিন্তু স্ত্রীর যদি অনিচ্ছা থাকে তবে সেই অনিচ্ছাকেই তিনি মান্য করে চলবেন। তিনি তাই করেছিলেন। এই নায়কটির সামনে অবশ্য অন্য একটি পথও খোলা ছিল। তিনি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতেন, তাতে দোষ হত না, গান্ধীজীরও তাতে অমত ছিল না। তবে সেই পথ তিনি বেছে নেননি। এই স্বামীস্ত্রীকে আমি দেখেছি। এঁদের ভিতর প্রীতি অথবা সদিচ্ছার অভাব ছিল না।

প্রীতি ও শ্রদ্ধাটাই আসল কথা। এরপর যৌনসম্পর্কেও দোষ নেই, ব্রহ্মচর্যেও দোষ নেই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী পথ বেছে নেবেন। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে যৌনসম্পর্ক রক্ষা করাটাই স্বাভাবিক, সেটাই সুন্দর, মুক্তির পথে সহায়ক।

তবে সতর্কতা প্রয়োজন। যৌনতার ভিতর একটা নেশা আছে। সতর্কতার অভাবে সেটা বন্ধন হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ নেশারই ধর্ম এটা। আরম্ভে সে সুখদায়ক। সেই সুখ মানুষকে আকৃষ্ট করে। তারপর তৃষ্ণা বেড়ে চলে। শেষে এমন হয় যে, তৃষ্ণাটাই প্রধান। নেশা থেকে তখন সুখ কতটা পাওয়া গেল সেটা ভাবনার ভিতর থাকে না, তৃষ্ণা না মিটলে যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে এটাই জরুরী কথা। এটাই নেশাগ্রস্ত মানুষের বন্ধনের দশা।

যৌনতাকে মুক্তির পথ হিসেবে পেতে হলে তাই কিছুটা অনাসক্তি প্রয়োজন। এইখানেই সংযমের সঙ্গে আনন্দের যোগ। জীবনে যা কিছু আকর্ষণীয় সেই সবই মনে মনে ত্যাগ করে, "ঈশ্বরে"র পায়ে সমর্পণ করে, তবেই ভোগ করবার কথা বলেছেন আমাদের প্রাচীন ঋষিরা। একটা মূল্যবান অর্ন্তদৃষ্টিকে তাঁরা স্মরণীয় ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যাঁরা নিরীশ্বরবাদী তাঁরা কথাটা অন্যভাবে বলতে পারেন। মূল কথাটা বুঝতে পারলেই হল, তা নইলে বিপদ।

॥ চার ॥

আমাদের এই যুগটা যন্ত্রের যুগ। চারিদিকে যন্ত্র ও যান্ত্রিকতার জয়জয়কার। মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর এর প্রবল প্রভাব আজ প্রশ্নাতীত।

যৌনতার ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকতার প্রভাব এসে পৌঁছেছে। ক্রমেই দেখা যাচ্ছে যে, নতুন প্রজন্মের মানুষ যৌনসুখের জন্য বিপরীত লিঙ্গের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করতে আর রাজী নয়। আসলে মানুষ অথবা মনুষ্যত্বের ওপর নির্ভর করতেই সে অনিচ্ছুক। যন্ত্রের সাহায্যেই লাভ করা যায় যৌনসুখ অথবা তার প্রতিকল্প। "অশ্লীল" চিত্রও এইরকম যন্ত্রবিশেষ। আরো নানা উপায় আছে, কোনো কোনো নেশা যেমন। যন্ত্রের একটা বড় সুবিধা এই যে, সে মানুষের দাস, কর্তার ইচ্ছাধীন। তাকে যখন খুশি ডেকে আনা যায়, যখন খুশি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। বিপরীত লিঙ্গের মানুষের মন আছে, স্বাধীন ইচ্ছা আছে, অতএব তার ওপর নির্ভরতায় নানা অনিশ্চয়তার দুঃখের ঝুঁকিও আছে। যন্ত্রে অভ্যস্ত মানুষ দুঃখকে বড় ভয় করে।

কিন্তু যন্ত্রের একটা বিষম সীমাবদ্ধতা অগ্রাহ্য করা যায় না : যন্ত্রের আত্মা নেই। যন্ত্র আমাদের ভোগসুখ দিতে পারে, তার বেশি কিছু দিতে পারে না। যদি পারে তবে সে যন্ত্র নয়, যেমন সৃষ্টিধর্মী শিল্পসাহিত্য। ভোগসুখের বিপদ এই, সে তৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলে, শেষ অবধি সুখের চেয়ে তৃষ্ণাটাই বড় হয়ে ওঠে। ভোগের যন্ত্র তখন আর দাস থাকে না, মানুষই যন্ত্রের দাস হয়। আত্মিক যোগের আনন্দের সঙ্গে দুঃখবেদনা মিশে আছে, তাকে গ্রহণ করতে জানলে তাতে চেতনার গভীরতা বাড়ে। যান্ত্রিক ভোগবাদ এই গভীরতাকে ব্যঙ্গ করে। মানুষের চেতনাকে সে কিন্তু শেষ অবধি একটা ক্লান্ত হতাশার দিকে ঠেলে দেয়।

এই ভোগবাদকে কী দিয়ে ঠেকাবো? অতীত থেকে এসেছে পাপবোধ। এ-যুগের যৌনবিচারে পৃথিবীময় যে-সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে, প্রচণ্ড পাপবোধ আর তীব্র ভোগবাদের এক অস্থির সহাবস্থান। এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যে সংযমকে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পাপবোধ অথবা দেহ নিয়ে লজ্জাবোধের প্রাবল্য সেখানে ছিল না। এদেশের আকাশের নিচে দিগম্বর জৈন আর অজন্তার নারীরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছে।

মানুষ যে পাপী এই বিপরীত ভাবধারা এসেছে পরবর্তী কালে, বিশেষত আধুনিক যুগে। তারই পাশে পাশে ভোগবাদের জোয়ার ফেঁপে উঠেছে দুনিয়াজোড়া। নতুন ভোগবাদ আজ আর অভিজাতবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে আরো নিচের তলায় নিম্ন মধ্যবিত্তের ভিতরে, যেখানে মানুষ পাপবোধে অভ্যস্ত। এই দুই অসমঞ্জস ভাব পরস্পর পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করে চলেছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে লোভ ও হিংস্রতা।

ভোগবাদকে পাপবোধ দিয়ে ঠেকানো যাচ্ছে না। সেজন্য চাই অন্য এক সদর্থক জীবনদর্শন। করুণা, সংযম, প্রকৃতির কাছাকাছি আরো সরল জীবনযাপন, এইসব হতে পারে সেই সদর্থক দর্শনের মূল উপাদান। আমরা যারা এ-যুগে বাস করেছি, আমাদের ব্যর্থ সাধনের শিক্ষা এই। সেই প্রেমই উদ্ধার করে যে-প্রেম করুণা ও অনাসক্তিকে অন্তরে গ্রহণ করেছে। সংকটের ভিতর দিয়ে আশা করা যায় মানুষের সমাজ অবশেষে এই উপলব্ধির দিকেই যাবে। কিন্তু কতদিনে? আরো কত হতাশার শেষে?

আমাদের বাড়িতে শ্যামলী নামে মেয়ে কাজ করত। স্বামী তাকে ছেড়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে বাড়িতে যে-মহিলারা কাজ করেন তাঁদের অনেকেই স্বামীপরিত্যক্তা। তাঁদের অনেক কষ্ট। কিন্তু দুঃখ আছে শুধু গরিবের ঘরেই নয়। শ্যামলী একদিন বলেছিল, আমি অনেক বাড়িতে কাজ করেছি, দেখেছি বড়লোকের বাড়িতেও দুঃখ কম নয়, অশান্তি কম নয়। শ্যামলী নিজে দুঃখী। তাই ওর কথাটা আমার মনে থেকে গেছে। দুঃখের কারণটা যখন কেবলই আর্থিক তখন তার সমাধান খুঁজে পাওয়া তত কঠিন নয়, যদিও সমাধানটাকে কার্যকর করে তোলা সহজ নয়। দুঃখের কারণ যখন প্রধানত আর্থিক নয় তখনই তার সমাধানও জটিল। তাই এত কথা বলা।

এই আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল যৌনপ্রেমের কথা দিয়ে। ধাপে ধাপে আমরা পৌঁছে গেছি অনাসক্তি ও করুণার প্রসঙ্গে যাতে প্রেম দুর্গতি থেকে রক্ষা পায়। সেই শূন্যতায় প্রবেশলাভের প্রস্তাব এটা নয়, অধিকাংশের জন্য বিধান যেটা হতে পারে না। দেহাশ্রয়ী প্রেম ও দেহাতীতের ভিতর পুনঃপুনঃ আবর্তনপ্রত্যাবর্তনের পথের কথাই আমরা বলতে চেয়েছি, জীবনের গতিময়তাকে যা অর্থপূর্ণ করে তোলে, দান করে অশেষ মূল্য।

হে মহাজীবন! হে মহামরণ!

মাঝে মাঝে চিঠি পাই। বন্ধুদের চিঠি। কিছুই ফেলে দিতে ইচ্ছে করে না। চিঠি স্তূপীকৃত হতে থাকে। চিঠির স্তূপে লিখবার টেবিল ভরে যায়। কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে স্বচ্ছন্দে লিখবার জায়গা থাকে না। টেবিল থেকে সরিয়ে চিঠির জন্য স্থান করতে হয় বাক্সে। ক্রমে বাক্স ভরে ওঠে। এর পর কোথায় রাখি! কিছু চিঠিকে বিদায় না দিলেই আর নয়।

একটি ছোটো ছেলের মুখের কথায় সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। আমারই পুরনো ছাত্রের ছেলে। কিছুই বয়স হয়নি। পরিবারে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে, তিনি আমার ছাত্রের কাকা। বাড়িতে শোকের ছায়া। ছোটো ছেলেটি বলল, 'খুব দুঃখের কথা অবশ্য,

খারাপ লাগছে ঠিকই, তবে ওঁরা চলে না গেলে আমাদের জন্য জায়গা হবে কী করে ?' জানি না এই চিন্তা ওর মনে এলো কী ভাবে—আজকালকার ছেলেমেয়েরা হয়তো একটু তাড়াতাড়ি বড় হয় !

কিন্তু কথাটা তো ভুল নয়। এ জীবন শুধু রাতের রেলগাড়ি নয়। গাড়ি চলছে দিনরাত। স্টেশনে স্টেশনে লোক উঠছে নামছে। যদি কেউ না নামতো, যদি স্টেশনে স্টেশনে লোক শুধু উঠতেই চাইতো ! প্রথমে ধাক্কাধাক্কি বাড়তো। তারপর ধাক্কাধাক্কি করেও কিছুতেই জায়গা হতো না। ভাগ্যিস কিছু লোক নামে !

পৃথিবীটাও তো ঐরকমই। তার অন্তহীন সূর্য প্রদক্ষিণের পথে মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে। যদি শুধু জন্মাতো, যদি কেউ জায়গা ছেড়ে না দিতো ! অমরদের জন্য স্বর্গেই জায়গা ভালো। সেখানে সম্ভবত স্থানাভাব নেই। তা ছাড়া ওঁদের কি দেহ আছে ? দেহী মানুষদের আছে এই মাটির পৃথিবী, সীমাবদ্ধ পৃথিবী। এখানে জন্মমৃত্যু তাল রেখে চলছে। এক দরজা দিয়ে কেউ বেরোচ্ছে, অন্য দরজা দিয়ে ঢুকছে। সংসারের প্রদর্শনী চলছে নিরন্তর।

চিঠির বেলায় বাছবিচার করবার স্বাধীনতা ছিল। কোনটা রাখবো আর কোনটাকে বিদায় দেব, সেই নির্বাচনের ভার আমার হাতে, অন্তত খানিকটা স্বাধীনতা তো আছেই। সব চিঠির মূল্য সমান নয়। সংসারের খেলায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। কে থাকবে কে যাবে তার ওপর আমাদের ইচ্ছা কতটুকু খাটে ! মৃত পুত্রের শিয়রে বসে মা কেঁদে বলেন, 'ও কেন চলে গেল, আমার আয়ু কেন ফুরোয় না !'

তবু আমাদের মতামতের অপেক্ষা না রেখেই মৃত্যু আসে, এটাই হয়তো শেষ বিচারে ভালো। মনে করুন একটি অসহ্য দৃশ্য। মাঝ দরিয়ায় ডুবতে বসেছে সবাই, নৌকোতে মায়ের সঙ্গে দুই ছেলে। মাঝি বললো, 'একজনকে বিসর্জন দিতেই হবে। মা তুমি বলে দাও কোন ছেলেটি যাবে, কাকে তুমি রাখবে।' এর চেয়ে হৃদয়বিদারক অবস্থা আর কী হতে পারে ? কেউ যায়, অনিবার্য বলে সেটা মেনে নিই। কিন্তু আমরা যাদের ভালোবাসি তাদের ভিতর কে যাবে, কে থাকবে, এ যদি স্থির হতো আমাদেরই ইচ্ছায় তবে সেই ভয়ংকর ইচ্ছার স্বাধীনতার আঘাতেই কি আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হত না !

কেউ যায় আগে, কেউ পরে, যে-নিয়মে এই নির্বাচন ঘটে আমরা তা সম্পূর্ণ বুঝি না। সেটা যেহেতু বিশ্বের নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম তাই কঠিন জেনেও তাকে মেনে নেওয়া সহজ। মৃত্যুর এই এক শিক্ষা। এ বিশ্বসংসারের সঙ্গে আমাদের হৃদয় জড়িত, কিন্তু এ আমাদের ইচ্ছায় চলে না। যে নিয়মে চলছে এই বিশ্বজগৎ, গ্রহ নক্ষত্র যে নিয়মে বাঁধা, আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধীনতা থেকে সে মুক্ত, এই সত্য নম্রভাবে মেনে নিতে হবে। মৃত্যুর মতো ঘনিষ্ঠ ভাবে, অভ্রান্ত ভাবে আর কেউ কি দিতে পারে এই শিক্ষা ? মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে কবি বলেন, 'সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।'

আমরা সবাই কবির মতো করে ভাবতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুর একটা জাদু আছে। অতি সাধারণ জীবনে সেই জাদু বার বার দেখেছি। মৃত্যুর পটে ব্যক্তির ছবি হঠাৎ কেমন পালটে যায়। জীবনে যাকে নিয়ে কঠোর বিতর্কের ঝড় উঠেছে, মৃত্যুর পর শত্রুমিত্র সবাই তাকে দেখেছে অন্য এক স্নিগ্ধ আলোতে। অথবা ধরুন সেই বৃদ্ধের কথা, যার কথা আপনারা সবাই জানেন। অথর্ব হয়ে বেঁচে ছিল সে অনেক দিন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল কাছের মানুষদের প্রাত্যহিক সেবার একঘেয়েমিতে। বুড়ীর মুখেও শোনা যেত, 'বুড়ো গেলে বাঁচি।' মানুষটি অবশেষে যেদিন গেল সেদিন কিন্তু অনেকেরই চোখের কোণ চিক

ঠিক করছিল। এটা কি শুধুই কপটতা? কাপট্য থেকে কিন্তু কারো কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না সেদিন। কপট সহানুভূতিই বা কেন তবে?

যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন জনজীবনে, তাঁদের বেলায়ও মৃত্যুর জাদু কাজ করে অন্য এক ভাবে। নানা পথের নানা নেতা। যতদিন এঁরা জীবিত ছিলেন ততদিন এঁদের ভিতর দ্বন্দ্বটাই প্রধান ছিল। জনতাও বিভক্ত এ পক্ষে ও পক্ষে। পথেঘাটে লড়াই বাধে মাঝে মধ্যে। মৃত্যুর পর এঁদের বিরোধটা আর উত্তাপ সৃষ্টি করে না। মানুষের মনে বিচিত্র ছবির মতো এঁরা শ্রদ্ধার স্থান পেয়ে যান পাশাপাশি। মনে হয় যে কোনো খেলায় বিরোধী দুই দলের নেতা হয়ে এঁরা খেলতে নেমেছিলেন। খেলাটাই স্মরণীয়। অর্জুন ও কর্ণ উভয়েই বরেণ্য।

এইসব থেকে একটা মূল কথা বুঝি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটা গূঢ় রহস্য মৃত্যু অনাবৃত করে।

যে মানুষটা বেঁচে ছিল সে আমাদের সঙ্গী, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। সংসারের যে সব সম্পদ পরিমাণে সীমাবদ্ধ, যেমন খাদ্য অথবা অর্থ, সে সব তো একজন বেশি পেলে অন্যের জন্য অবশিষ্ট থাকে কম। অনটনের বস্তুর ওপর যে ভাগ বসায় সেই আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। দেহী মানুষের তাই দেহী মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব শুধু অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়েই নয়। ক্ষমতা নিয়ে, পদাধিকার নিয়ে, এমন কি সুনাম নিয়েও। জীবিত মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ভিতর এসে পড়ে এই সাংসারিক দ্বন্দ্বের জটিলতা, ঈর্ষা লোভ কুটিল চক্রান্ত।

কিন্তু মানুষটি যখন চলে গেল তার সঙ্গে তখন আর আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা রইল না। দেহমুক্ত স্মৃতির সঙ্গে আমাদের বিবাদের সাংসারিক কারণ নেই। সেই স্মৃতিকে আমরা তখন নতুন করে এক অমর সূক্ষ্ম দেহে প্রতিষ্ঠিত করি। নিরীশ্বরবাদীরাও তো শ্রদ্ধেয় পুরোগামীর ছবি সামনে রেখে জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। যে মানুষটিকে নিয়ে জীবনে আমাদের অভিযোগের অন্ত ছিল না, মৃত্যুর পর যে তার জন্য অশ্রুপাত করি, এইখানে পাওয়া যাবে সেই রহস্যের কিছুটা সমাধান।

এতেও কিন্তু সবটা বলা হল না। একদিন যে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আজ সে নেই। জীবন থেকে সে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানেই যদি কথা ফুরোতো তবে এর পর সেই মানুষটার প্রতি উদাসীন হয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক হত। তাকে স্মরণ করে তবে বিষণ্নতা কেন? আসলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আড়ালে সঙ্গী মানুষের প্রতি আমাদের একটা একাত্মতা থাকে। সাংসারিক বিবাদে, বৈষয়িক বাসনার ধুলায় সেটা ঢাকা পড়ে যায়।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রহস্যটা এইখানে। মানুষ ভালোবাসা চায়, ভালোবাসতে চায়। এই যে একাত্মতার আকাঙ্ক্ষা, এইটাই শুদ্ধ চৈতন্যের স্বভাব, এ জন্য অন্য কারণের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বী বাসনা, বহু আশংকা আর 'ভুল বোঝাবুঝি'র কালো মেঘে স্বচ্ছ প্রীতির আকাশ আবৃত হয়ে পড়ে। মৃত্যু এসে আবরণটা সরিয়ে দেয়। কদাচিত কেউ মৃতের প্রতিও দুর্মর বিরূপতা বহন করেই চলে। কিন্তু সেটাই অস্বাভাবিক। এতে মৃত্যুর সত্যকে অস্বীকার করা হয়। সেই সত্যকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার পর বিদ্বেষের আবরণ আর থাকে না। মৃত্যুর কাছে তাই কবির প্রার্থনা : "যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো, যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো—ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ ॥"

ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'মৃতের কাছে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, আছে শুধু সত্যের দেনা।' সত্য বলতে এখানে কী বোঝায়? কেউ বলবেন, মৃত ব্যক্তির বিষয়ে

তথ্যের পরিবেশনে যেন ভুল না থাকে এই চাই, এর বেশি নয়। মৃত্যুর শিক্ষা আরো উদার। তথ্য নির্ভুল হওয়া জরুরী। কিন্তু এটাই সব নয়। যে-দৃষ্টি নিয়ে আমরা প্রতিবেশীর দিকে তাকাই তথ্য তারই অনুগামী হয়। মৃতের প্রতি চাই শুদ্ধ সহানুভূতি। সত্যের সঙ্গে এই শুদ্ধতার বিরোধ নেই। কিন্তু ক্ষুদ্র সাংসারিক সত্যের চেয়ে এটা বড়। মৃত্যু বার বার আমাদের এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়।

আবারও কথাটাকে টেনে নিয়ে যেতে হয় সামনের দিকে। মৃত্যুর করুণায় আমরা যে-দৃষ্টি লাভ করি তাকে শুধু মৃতের কাছে দেনা হিসেবে বিবেচনা করলে ভুল হবে, তাকে জীবনের মূলধন বলে জানা চাই। অর্থাৎ, তাকে যদি আমরা জগতে ব্যাপ্ত না করি, কেবল মৃতের স্মৃতির জন্য চিহ্নিত একটা আলাদা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখি, তবে তার মূল্য দ্রুত ক্ষয় যায়।

বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর খাতায় তার প্রথম কৈশোরের রচনায় একটি আশ্চর্য বাক্য দেখেছিলাম, 'মৃত্যুর পর এত সমারোহ কেন!' বাক্যটি যদিও সূর্যাস্তের লগ্নে পশ্চিম আকাশকে স্মরণ করে লেখা তবু এর অর্থ এবং গূঢ় জিজ্ঞাসা অনিবার্যভাবে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের সমাজজীবনে আর মৃত্যুর আনুষঙ্গিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে। এ মেয়েটির জিজ্ঞাসার সাধারণ উত্তর আমাদের একেবারে অজানা নয়। জীবনের প্রয়োজনেই এই সমারোহ।

মৃত্যুর চিন্তাকে মন থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখেই পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই প্রাত্যহিক জীবন যাপন করি। পরিবারের সেই কৃত্রিম নিশ্চিন্ততার মধ্যে যখন মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে তখন কাছাকাছি সমস্ত মানুষের ভিতরই একটা আবেগাপ্লুত বিপন্নতার বোধ দেখা দেয়। সব কিছুই অনিত্য এই ভাবটা সাময়িকভাবে সবাইকে মুহ্যমান করে। বিধ্বস্ত আত্মপ্রত্যয়ের সেই ভগ্নস্তূপ থেকে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার সূত্র ধরে পরিবার ও সমাজকে সুস্থ আত্মবিশ্বাসের পথে আবার ফিরিয়ে আনবার আনুষ্ঠানিক প্রয়াসই শ্রাদ্ধের একটি মূল কথা। পিতৃপুরুষদের নাম উচ্চারণ করে আমরা মনের ভিতর এই উপলব্ধিটি জাগ্রত করি যে, আমাদের পরিবার ও সমাজের শিকড় দীর্ঘ অতীতের মাটিতে বিস্তৃত হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে স্থায়িত্ব দান করছে। আমরা স্মরণ করি যে, আমাদের পরিবারে এটাই মৃত্যুর প্রথম আবির্ভাব নয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবন এগিয়ে গেছে বার বার। মৃত্যু যেমন ধ্রুব সত্য জীবনও তেমনি, শ্রাদ্ধের মন্ত্র ও সঙ্গীতের সকরুণ গাম্ভীর্যের ভিতর দিয়ে এই প্রত্যয়টিকেই যৌথ জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

সামাজিক স্তরে শ্রাদ্ধের তাৎপর্য এই। কিন্তু যৌথ শোক আর ব্যক্তিগত বিরহবেদনা এক বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার মূলে যে বেদনার সন্ধান পাওয়া যায়, নৈরাশ্যকে অতিক্রম করবার যে সাধনা সেখানে প্রচ্ছন্ন, সেটা একান্ত ব্যক্তিগত। তাতে নিহিত আছে শিল্পসৃষ্টির একটি রহস্যময় তবু সামান্য সত্য। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতারও একটি মূল ভিত্তি এইখানে। মৃত্যুর শিক্ষাকে যেমন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন আছে তেমনি ব্যক্তির নিজস্ব চেতনার ভিতর দিয়ে তাকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করবারও একটা ব্যাপার আছে। রবীন্দ্রচিন্তায় মৃত্যু সেই সিংহদ্বার যেখান দিয়ে ব্যক্তিচেতনার প্রবেশ ঘটে শিল্পে ও ধর্মের জগতে, সেই শিল্প ও ধর্ম যার ব্যাপ্তি বিশ্বময়।

রবীন্দ্রনাথ মাতৃহীন হন অল্প বয়সে, ১৮৭৫ সালে। কিন্তু কবির জীবনে প্রথম দুঃসহ মৃত্যুশোক আসে আরো কয়েক বছর পরে, ১৮৮৪ সালে। 'বউঠাকুরাণী'র মৃত্যু কবির জীবনে সেই আদি শোক যার তাৎপর্য গভীর। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের পর তাঁর জীবনে পারিবারিক বিরহের আঘাত এসেছে দুঃসহ পৌনঃপুনিকতায়। ১৯০২ সালে

তিনি স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে হারান ; ১৯০৩ সালে মৃত্যু ঘটে প্রিয় কন্যা রেণুকার ; ১৯০৫ সালে কবি পিতৃহীন হন ; ১৯০৭ সালে বিদায় নেয় প্রিয় পুত্র শমীন্দ্রনাথ। ১৮৮৪ সালের সেই আদি শোকই কবিকে প্রস্তুত করেছে, পরবর্তী প্রতিটি বিরহবেদনার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।"

মৃত্যুশোক কবির জন্য শুধু অশ্রুর মালা গাঁথেনি, সংখ্যাহীন গৃহীর ঘরে প্রতিদিন যেমন সে গাঁথে। মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে চেতনার অন্য এক স্তরে। এই উত্তরণের মূল কথাটি এবার লক্ষ করা যাক। ১৮৮৪-র মৃত্যুর ভিতর দিয়ে কবি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেটা সামাজিক বিপন্নতার অভিজ্ঞতা নয়। ব্যক্তিগত নাস্তিত্বের বোধ সেটা, যার দৃষ্টিহীন কালো গহ্বর থেকে অস্তিত্বকেই পুনরুদ্ধার করতে হয়। মাত্র কিছুকাল আগে কবির চেতনায় সারা বিশ্ব ধরা দিয়েছিল একটি অখণ্ড আলোকিত শিহরিত আনন্দের মতো, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ যার প্রকাশ। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর আঘাতে নেমে এলো বিশ্বময় অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে রবীন্দ্রনাথের আবারও যাত্রা আলোর সন্ধানে। এরই ভিতর দিয়ে কবি লাভ করেন সেই নবজন্ম, তাঁর শিল্প ও ধর্মচিন্তার মূল সূত্রটি যেখানে বাঁধা।

অস্তিত্বের পুনরুদ্ধারের সেই অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাতেই একবার শুনে নেওয়া যাক। 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় তিনি লিখেছেন : "চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, তেমনি মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল।"

এই দুঃসাধ্য চেষ্টার ভিতর দিয়েই কবি অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হন। মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে কবি নবজন্মে প্রবেশ করেন।

বিশ্বকে আমরা যখন প্রথমবার আলোর মতো লাভ করি, সেটা শিশুর আলোকপ্রাপ্তির মতো। তাতে কোনো কঠিন সাধনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মৃত্যুশোক অতিক্রম করে বিশ্ব যদি আবারও ব্যক্তির দৃষ্টিতে 'আলোয় আলোকময়' হয় তবে সেটা সাধনলব্ধ ধন। প্রথম ভালোবাসায় থাকে চিরকাল পাবার আশা। মৃত্যু অন্য এক শিক্ষা দেয়।

ভালোবাসার মুহূর্তেই সমস্ত অধিকার মনে মনে ত্যাগ করে যেন ভালোবাসি, যমরাজের এই শিক্ষা। অথবা অন্যভাষায় বলা যায়, ভালোবাসার অধিকারই আমাদের আছে, সেই চিরস্বত্ব অধিকার। যদি তেমন করে দিতে পারি, সংসার আমাদের দান গ্রহণ করবে। কিন্তু গ্রহণ করবে না সেই ছোটো 'আমি'কে, যে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে দিতে রাজী নয়। আমাদের যে অহং সংসারকে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে, যে কিছুই ছাড়তে রাজী নয়, তাকে ত্যাগ করেই সংসারকে লাভ করতে হবে। এই চিন্তাকে কবি পেয়েছিলেন মৃত্যুর কাছ থেকে, রেখেছিলেন জীবনের ভিত্তিতে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা', উপনিষদের পরিচিত বাণী তাই রবীন্দ্রনাথের প্রিয়। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি কিন্তু তাঁকে কখনও সংসারবিরোধী করে তোলেনি।

সংসারকে প্রকৃতপক্ষে আমরা পাই দুই ভিন্ন রূপে। একটিকে বলব, অনিত্য সংসার ;

অন্যটি চিরন্তন সংসার। অসংখ্য 'আমি'র হাসিকান্না মান অভিমান নিয়ে অনিত্য সংসার। এই ছোটো ছোটো 'আমি'রা একে একে সব মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়ছে। চিরন্তন সংসারের গতি কিন্তু তাতে এক মুহূর্তের জন্যও থেমে যাচ্ছে না। জন্মমৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন ধারায় সে চিরপ্রবাহিনী। ব্যক্তির মৃত্যুতে রুদ্ধ হয় না যুগ যুগ ব্যাপী বিশ্বমানবের যাত্রা।

অর্থাৎ, সংসার, চিরন্তন সংসার, পদ্মপত্রে নীর নয়, মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন : "যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে, কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির লক্ষণই দেখি নে। ...: অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণ বেগেই চলেছে।

"আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিষকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাঁকেই ফাঁকি দেয় ; তখন সে মনের থেকে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।"

অতএব মৃত্যুর শিক্ষা এই নয় যে, সংসার মিথ্যা। বরং মৃত্যু আর সংসার পরস্পরের পরিপূরক। অনিত্য সংসারের যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফল, চিরন্তন সংসারে সবই জমা হয়ে থাকে। মৃত্যু আমাদের দৃষ্টিকে ডেকে নিয়ে যায় অনিত্য থেকে চিরন্তনের দিকে, যেখানে এই দুয়ের ভিতর নতুন করে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সংসারের সঙ্গে বিরোধ নেই আত্মার। তিনি বলছেন, "আত্মা...দিতে চায়...সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।"

আমাদের হিসেবী মনে এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। চিরন্তন সংসারে কী জমা রইল, কী রইল না, তাতে ব্যক্তি মানুষের কী এসে যায় ? আমরা তো একটি মাত্র জীবনের অধিকার নিয়েই এসেছি, এই জীবনে কী পেলাম ? সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে যা দেওয়া গেল তাতে আমার কী লাভ ? এই রকম কিছু সংশয় দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনই কি নয় এই সব সংশয়ের উত্তর ? যেমন বিজ্ঞানের সত্যকে আমাদের প্রয়োজন এই জগতেই, তেমনি আধ্যাত্মিকতার সত্য থেকেও প্রাপ্তি ঘটে ইহজন্মেই। সমস্ত মহৎ উপলব্ধির প্রভাব বিস্তৃত হয় এই জীবনেই। মৃত্যুর সত্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে যখন যতটা দেওয়া যায় আমাদের মন তখন ততটাই অসত্যের এবং ভয়ের শাসন থেকে মুক্ত হয়। 'অহং'কে ত্যাগ করে আমরা যে সংসার থেকে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়াই তাতে সংসারকে ফিরে পাই অন্য এক রূপে।

ব্যক্তিত্বের বিনাশে নয় বরং তার উন্মোচন ও উত্তরণেই মৃত্যুর শিক্ষারও পূর্ণতা। আমরা যখন ত্যাগ করতে প্রস্তুত, আমাদের গ্রহণটাও তখন ছোটো ছোটো আশঙ্কায় খণ্ডিত নয় বলেই সম্পূর্ণ। এরপরও আমরা সংসারেই থাকি, হাসিকান্না সবই থাকে ; তবু কান্নায় থাকে না করাতের ধার, হাসিতে থাকে না মিথ্যা অহঙ্কার। সংসার তার আপন গতিতে চলে, কিন্তু চিত্তের আকাশ থেকে একটা মেঘ কেটে যায়। অন্তত এই বোধ থাকে, মেঘের ওপারে নিষ্কম্প সুনীল আকাশ এখনও আছে। আবারও ভালোবাসার আলোতে পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'অলৌকিক ডাকপিওন' তারপর 'রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি' মাঝে মাঝেই আমাদের দুয়ারে পৌঁছে দেয়। আমরা খুশি হয়ে সেই চিঠি তুলে নিই, ভালোবেসে পড়ি। তবু জানি, এই মুহূর্তের আলো নিবে যেতে পারে পর মুহূর্তেই। আবারও আলো ফিরে আসবে এই বিশ্বে, আমার দৃষ্টির আলো হয়তো ততক্ষণে ফুরিয়ে গেছে। মৃত্যুর শাসন থেকে কিছুই মুক্ত নয়, নির্মোহ এই জানাতেই মুক্তি। মৃত্যুকে প্রণাম করে এবার আমরা জীবনের পথে চলি, অসংখ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে যে জীবন এগিয়ে চলেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। Reason and Religion: The Complete Works of Swami Vivekananda, Mayavati Memorial Edition, Volume I, Sixteenth Edition, p. 367.

২। The Autobiography of Bertrand Russell 1914-1944, p. 116, Bantam, New York.

৩। আইয়ুবের জন্মতিথির আশি বছর পূর্ণ হল সালে। একই বৈশাখে পূর্ণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশ বছর। কাব্য ও কাব্যচিন্তার সূত্রে দু'জনের যোগ, কাব্যচিন্তা তথা শিল্পচিন্তা।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—১

তৃতীয় চরণ
অথবা
মানবমন ও সমাজবিবর্তনের পর্বানুক্রম

ভূমিকা

এ আমার সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ তথা রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ জ্যোতিষ্মান পূর্বসূরী যে বক্তৃতামালায় গ্রথিত সেই কমলাবক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সম্মানিত করেছেন। এই ডাক যে আধুনিক ভারতীয় ভাবনাধারণাকে তুলনামূলক প্রেক্ষিতে স্থাপন করার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী সময়টিতেই আমার কাছে এল সেদিক থেকেও আমি ভাগ্যবান।

ইতিহাস ও ভূগোল দুইয়ে মিলে ভারতকে স্থান দিয়েছে দুই জগতের মাঝখানে, ভারতের উচ্চাশা সে এই দুইয়ের মাঝখানে সেতু বাঁধবে। যদিও আধুনিক ভারতীয় ভাবনার সারভাগের অনেকটাই বেড়ে উঠেছে জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রভাবচিহ্নিত আবহে, সর্বাপেক্ষা সৃজনধর্মী ভাবুকদের তবু ক্রমাগতই চেষ্টা করতে দেখা গেছে যাতে তাদের স্বীয় ভাবনাধারণাগুলি বিশ্বের বৃহত্তর ভাবনাধারণার সঙ্গে বিশ্বসমস্যার পটভূমিতে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। আমি যে ক'টি ভাষণ দেবো তার তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ভাষণে আমি দুই মহান ভারতীয় ভাবনাবিদের কিছু অবদানের কথা বিশেষভাবে আলাদা করেই বলবো, কিন্তু যে-সমস্যা নিয়ে প্রধানত আমার কথা সে সমস্যা সারা বিশ্বেই প্রাসঙ্গিক।

আমরা এমন এক যুগে বেঁচে আছি নৈতিক বিভ্রান্তি যার প্রধান লক্ষণ। আমি নৈতিক অবক্ষয়ের কথা বলছি না, বলছি নৈতিক বিভ্রান্তির কথা। যে-পৃথিবী প্রধানত মানুষেরই গড়া সেইখানেই যেন সে নিজের পথ হারিয়েছে।

কোনো সমাজদর্শনকে যদি আমাদের যুগের পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী হয়ে উঠতে হয় তাহলে কয়েকটি মূল শর্ত তাকে পূর্ণ করতে হবে। স্বাধীনতা, সাম্য, শান্তি, এইসব শব্দময় ভাবকে ঘিরে আজকের যুগের মর্মগত যে-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত, সেই গভীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এই সমাজদর্শনের সুর মেলা চাই। উল্লিখিত প্রতিটি শব্দেরই সংজ্ঞাতিরিক্ত দ্যোতনা লক্ষণীয়। যথা, শান্তির প্রাসঙ্গিকতা একদিকে যেমন রয়েছে ব্যক্তির অন্তরে অন্যদিকে তেমনি রয়েছে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীগুলির ভিতরে। মনের গভীরে অচঞ্চল শান্তির জন্য ব্যাকুলতা আগের চেয়ে এখন একটুও কম নয়, কিন্তু কোন পথে মিলবে এই অচঞ্চলতা তার নিশানা আগের তুলনায় যেন আমরা আরো কম জানি। একটি অখণ্ড পৃথিবী যার ভিতরে খণ্ডাংশগুলি নির্বিরোধে পরস্পর লগ্ন তার প্রয়োজন আজকেই সবচেয়ে বেশি জরুরি। অথচ এক্ষেত্রেও কিসের ভিত্তিতে এই অখণ্ড ঐক্যসাধন হবে সে বিষয়ে একমত তো আমরা নই-ই, কোনো পরিচ্ছন্ন ধারণাও আমাদের নেই।

মনুষ্যজাতি তাই আজ স্পষ্টতই এমন এক বিরুদ্ধতার সম্মুখীন যা অতীতের সমস্ত সমস্যার চেয়ে ভয়াবহ এবং দুর্মর। একদিকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বশান্তিই মনুষ্যজাতির সমূহ সর্বনাশের বিকল্প। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার যোগ্যতা যুগের প্রধান তত্ত্ববিশ্বাস এবং মতবাদগুলি অর্জন করে উঠতে পারেনি।

হিন্দুধর্মের মতো কোনো কোনো ধর্মমত কোনদিনই নিখিলবিশ্বধর্ম হয়ে উঠতে চায়নি। অন্যদের এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খৃস্টান ধর্মপ্রচারকগণ শুধু যে ভাবতেন যে, মুক্তির পথ তাঁদের জানা আছে তাই নয়, স্পষ্টতই তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে আজ হোক কাল হোক, পৃথিবীর সর্বত্র সকল মানুষকে তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে এবং এভাবেই এক নির্দ্বন্দ্ব অখণ্ড বিশ্বের ভিত্তি তৈরি হবে। আজ নিশ্চয় খুব অল্পসংখ্যক মানুষই যুক্তিসম্মতভাবে এ আশাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম যে ধর্মান্তিকরণের সাহায্যে মনুষ্যজাতি এক হবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত মার্ক্সবাদীদের উগ্র বিশ্বাস ছিল সারা বিশ্বে ধনতন্ত্রের অবসান ও সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সমাসন্ন। ইতিমধ্যে ছবি গেছে পালটে। ধনতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হতেই পারে কিন্তু যে-মার্ক্সবাদ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের ভিতরই ঐক্য ও শান্তি স্থাপনে ব্যর্থকাম, সেটি স্পষ্টতই বিশ্বচিন্তাধারার হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। বর্তমান দ্বিধা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি নেই ঐ পথে, দ্বিধা ও বিভ্রান্তির আরো একটি দৃষ্টান্ত বরং রয়েছে ওখানে।

চারিদিকেই চোখে পড়ে, ঘোষিত উদ্দেশ্যাদি যার যেমনই হোক না কেন প্রাচীনপন্থীদের পুনরাভ্যুত্থানকামী আন্দোলন এবং সামরিক মতাদর্শ আজকের দিনে বিভেদকারী শক্তি হিসেবেই জোরদার হয়ে উঠছে। যে দুরূহ বিপন্নতাকে এই সব গোষ্ঠী ডেকে আনতে সক্ষম তাকে পরাস্ত করার ক্ষমতা তাদের নেই। এই সমস্যাটির বিষয়ে ক্রমশই অধিকসংখ্যক মানুষ তীক্ষ্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠছেন। কিন্তু এখনো গোলকধাঁধা থেকে উদ্ধারের পন্থা মেলেনি। বর্তমানের অসহনীয় নৈতিক অনিশ্চিত এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিভ্রান্তি, এতেই জন্ম নেয় নানা উত্তেজক মতবাদ, আর কঠিন হতাশা থেকে বাঁচবার প্রলোভনে অনেক ক্ষতির মূল্যে ওই সব মতবাদের সাময়িক আশ্রয় নেয় মানুষ। কখনো আবার এর ফলে গড়ে ওঠে এক স্থূল রুচির সংস্কৃতি। ইচ্ছে করেই মানুষ আঁকড়ে ধরে অগভীর সাংস্কৃতিক মেজাজকে। নিজের কালের নীতি ও বুদ্ধির গভীরতর জটিল জাল থেকে উত্তরণ যখন অসাধ্য বোধ হয় তখন আত্মবিশ্বাসে মানুষ ভিতরের গভীরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উদ্ধার খোঁজে বাইরের মাতনে।

তবে এই সংকটের ফল তো সদর্থকও হতে পারে। এ আশা অসম্ভব নয় যে মানুষের মন এবং সমাজের ক্রমবিবর্তন বিষয়ে প্রাচীন সংহত ভাবনাগুলি নবসৃষ্টির উদ্যমে এগিয়ে যাবে এবং সেই প্রচেষ্টায় প্রকাশ্য হবে বহু প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা, সম্পৃক্ত হয়ে যাবে আবহমানের সঙ্গে সমকালীন মানুষ আর তার অভিজ্ঞতা। এখন প্রয়োজন বিকল্প চিন্তাধারা বা মতাদর্শের নয়। বরং মূল্যবোধ, প্রতিন্যাস ও উপযোগী প্রতিষ্ঠানের সমাহারে এমন এক প্রশস্ত কাঠামোর প্রয়োজন যাতে বহুবিচিত্র ভাবনাধারণা পরস্পর নির্বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে পারে এবং তারই সাহায্যে একে অন্যের পরিপূরক হয়ে মনুষ্যসমাজকে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করে দেয়।

॥ ১ ॥

প্রগতি ভাবনা

আমাদের এই লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রজন্মের পক্ষে মানবসংস্কৃতি ও সমাজবিবর্তন বিষয়ে অতীত ভাবনাচিন্তার কতকগুলি আদর্শ ধারা এবং গৃহীত তত্ত্বাবলীর পর্যালোচনায় কিছু লাভ হতে পারে। এগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের চক্রবৎ গতির তত্ত্ব প্রাচীনযুগে সমধিক প্রচলিত ছিল। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চার যুগের কথা আমরা সকলেই জানি। এই দূরকল্পনা শুধু প্রাচ্যে সীমাবদ্ধ এমনও নয়। স্বর্ণযুগের পর রৌপ্যযুগ তারপর ব্রোঞ্জ এবং শেষে লৌহযুগের এক চতুষ্কালিক পৌরাণিক কালবিভাজনের কথা প্রতীচ্যেও সবার জানা। এই কথানুসারে চার যুগ পূর্ণ আবর্তিত হয়ে গেলে ঘটে পৃথিবীর লয়, তারপর তার পুনরাবির্ভাবে পুনশ্চ শুরু হয় যুগের যাত্রা। মহাপ্লাবনের পর ঘটে আবারও চক্রাকারে ইতিহাসের নবপরিক্রম।

ইতিহাসের ঠিক এমনিতর বারংবার অমোঘ পুনরাবৃত্তির তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তি শিক্ষিত মানুষের ভিতরে আজ অল্পসংখ্যকই আছেন। প্রতীচ্যে "নবীন" বিজ্ঞানের আবির্ভাবে পরিপুষ্ট "প্রগতির"র তত্ত্ব, সম্মুখে প্রসারিত আশাবাদী ইতিহাসদৃষ্টি, অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই অধিকতর সমর্থনপুষ্ট।

সমাজের অনন্ত প্রগতির নবীন তত্ত্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাষা পেয়েছিল ফরাসী দেশে। জ্ঞানের প্রসার রয়েছে প্রতিটি অগ্রগতির মূলে। জ্ঞানের অগ্রগতির সীমা নেই অতএব সভ্যতার অগ্রগতিও অন্তহীন। এখানে বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে বৈপরীত্য লক্ষণীয়। সেখানে মানুষের পতনের কারণ হিসেবে পাওয়া যায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে নিষ্পাপ সারল্যচ্যুতির কথাই। মুক্তবুদ্ধিযুগের* মেজাজ একেবারেই ভিন্ন। কী ত্যুর্গো (১৭২৭-৮১) কী কোঁদরসে (১৭৪৩-৯৪) উভয়েই ছিলেন জ্ঞান এবং প্রগতির সদর্থক সম্পর্ক বিষয়ে প্রগাঢ় আস্থাশীল এবং তাঁরা যে কালে বেঁচেছিলেন সেই কাল অন্তত অনেকাংশে তাঁদের সে বাণী গ্রহণে প্রস্তুত ছিল।

"মানুষের স্বর্ণযুগ আমরা পিছনে ফেলে আসিনি, সে রয়েছে আমাদের সামনে" ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়েছিলেন স্যাঁ-সিমঁ (১৭৬০-১৮২৫)। স্যাঁ-সিমঁ অবশ্যই কোঁদরসের মতবাদকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এমন নয়, গুরুতর কতকগুলি বদলও তিনি ঘটিয়েছিলেন এ তত্ত্বের। কিন্তু সেই প্রভেদগুলির কথা আপাতত উহ্য থাক। প্রশ্ন এই, "মুক্তবুদ্ধি"র সঙ্গে সমাজে নৈতিক ও বাস্তব উন্নতির সম্পর্কটা কী ? একে অপরকে সাহায্য করে কী ভাবে ? এই সহায়তা আসে অন্তত দুই ভাবে।

নৈতিকতার মূলে রয়েছে ন্যায়ান্যায় প্রশ্ন। কেবলমাত্র গায়ের জোরে সামাজিক

অবিচারকে অংশত টিকিয়ে রাখা হলেও সম্পূর্ণ তা থাকে না। অজস্র ভ্রান্ত বিশ্বাস, আচার এবং কুসংস্কারের জালে অবিচার যে করে এবং যে সয় উভয়ের মন অনেকাংশে অধিকৃত বলেই অবিচার টিকে থাকতে পারে। দাসের মৌলিক হীনতা বিষয়ে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মতই সম্ভব করেছিল দাসত্বকে। রাজা শাসন করেছেন দৈবাধিকার বলে। অজ্ঞতা এবং আত্মছলনার সংযোগে সম্ভবপর হয় উৎপীড়ন, কিন্তু আত্মছলনাও অজ্ঞতার সহায় বিনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হতে পারে না। জ্ঞানের প্রসার ক্রমেই কমায় অজ্ঞতার ব্যাপ্তি এবং শক্তি। এমনি করে জ্ঞানের সহায় নিয়ে যুক্তি সক্ষম হয় নির্যাতন ও উৎপীড়নের ভিত্তি দুর্বল করে দিতে। কাজেই ন্যায়বিচার ও স্বাধনীতার প্রধান মিত্র হল যুক্তি।

বিতর্কের এই দিকের বক্তব্য গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে "মুক্তবুদ্ধি"র ফরাসী প্রবক্তারা ব্যক্ত করেছিলেন। অন্য একটি দিক ইতিমধ্যে ফরাসী দার্শনিকদের আবির্ভাবের এক শতাব্দী কাল পূর্বে যাঁর অসামান্য পরিচ্ছন্ন এবং জোরালো বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর নাম ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬)। জ্ঞান শুধু কুসংস্কারকে ছেদন করে তাই নয়, প্রকৃতির ওপরে মানসিক প্রভুত্বের বিস্তারও ঘটায়। জ্ঞান হচ্ছে ক্ষমতা, প্রকৃতি জয়ের ক্ষমতা। এটিকে ব্যবহার করে মানুষ তার সমাজ সমেত সমগ্র পরিবেশে পরিবর্তন আনতে পারে এবং এভাবেই সে নিজের পার্থিব উন্নতি ঘটাতে সক্ষম।

বিজ্ঞানকে অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে শক্তিতে আবিষ্কার সম্ভব হয়, ইতিহাসে নবরূপায়ণ ঘটে, সমাজে যার প্রবল প্রভাব পড়ে, তাকে বেকন খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এভাবে বেকন ইতিহাসের একটি নতুন দৃষ্টিপথ উন্মোচন করলেন যেখানে বিজ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে মানুষ একই সঙ্গে নিজের ইতিহাস সৃষ্টি করছে।

বেকন কিংবা স্যাঁ সিমঁ কেউই যুক্তিকে ধর্মের বিপরীতে স্থাপন করেননি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধরনে ধর্মকে এমন এক ভূমিকা দিয়েছিলেন যা বিজ্ঞানের পরিপূরক। বাইবেলের কাহিনী প্রসঙ্গে বেকন বলেছিলেন, "পতনের মধ্য দিয়ে মানুষ হারিয়েছে তার নিষ্পাপ সারল্য এবং সৃষ্ট চরাচরের উপর কর্তৃত্ব। দুটি ক্ষতিরই আংশিক পূরণ সম্ভব হতে পারে এই জীবনে, একটি পূর্ণ হবে ধর্ম ও ঈশ্বর ভরসায়, অন্যটি শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সহায়তায়।" অর্থাৎ তাঁর পরামর্শমত "নিষ্পাপ সারল্য" বা অন্তঃকরণের পবিত্রতা ও শান্তি ফিরে পাবার জন্য শরণ নিতে হবে ধর্মের, আর বিশ্বপ্রকৃতির ওপরে "কর্তৃত্ব" বা প্রাধান্য স্থাপনার্থে বিজ্ঞান, "শিল্পকলা" অথবা প্রযুক্তিবিদ্যার আন্তরিক চর্চা প্রয়োজন।

ধর্ম বিষয়ে স্যাঁ-সিমঁ যে যুক্তি দিয়েছিলেন তাতে জোর পড়েছিল সাধারণ মঙ্গলার্থে সমাজ সংগঠনের ওপরে। প্রত্যেক যুগেই বিজ্ঞান সামাজিক জীবনে যা আয়ত্তগম্য করে তোলে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধর্মবাক্যগুলির নতুন ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। বর্তমান যুগে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞান শিল্পোন্নতির এক অভূতপূর্ব ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই নতুন সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম লক্ষ্য তাহলে কী দাঁড়ায়? আজ দারিদ্র দূরীকরণের এক নতুন আশা দেখা যাচ্ছে। স্যাঁ-সিমঁ বললেন, সমাজকে একদেহ-একমন হয়ে দরিদ্রতম শ্রেণীর নৈতিক ও পার্থিব উন্নতিকল্পে চেষ্টা করে যেতে হবে॥ সমগ্র সমাজের ভিতরে দীনতম যে মানুষ তাকেই টেনে তুলবার জন্য কাজ করা চাই।

এইভাবে স্যাঁ-সিমঁ-প্রবর্তিত নবযুগের দর্শন একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ধর্মের সমালোচনা এবং নবীন এক ধর্মের প্রয়োজনের প্রতি তর্জনী নির্দেশ করেছিল। অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে যে অমঙ্গল তা দূর হয়ে যাবে মুক্তবুদ্ধির প্রসারে। কিন্তু এই কি সব? সদর্থক

কিছু তো প্রয়োজন। কোনো এক মহৎ আবেগ যা প্রতিটি ব্যক্তিকে ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সর্বজনকল্যাণার্থে কাজ করে যেতে অনুপ্রাণিত করে, সে-ও তো চাই। স্যাঁ-সিমঁ প্রকল্পিত নবীন সমাজে সবচেয়ে মূল্যবান সভ্য বলে স্বীকৃত হলেন বিজ্ঞানী, শিল্পপতি এবং কারিগর বা কর্মী। প্রাচীন পুরোহিত শ্রেণীর সেখানে কোনো স্থানই নেই। তবু ধর্মের স্থান আছে, খুবই প্রধান স্থান। স্যাঁ-সিমঁ প্রস্তাবিত "নবখৃষ্টধর্ম"র কাজ সেই নৈতিক ও দৈববল যুগিয়ে যাওয়া যাতে সমাজ আসঞ্জিত থাকে, সমাজের সম্মিলিত প্রাণশক্তি নিয়োজিত হয় সর্বজনলভ্য এক উদ্দেশ্যসাধনে। স্যাঁ-সিমঁ খেয়াল করেছিলেন যে উত্তরাধিকারের ধরন পাল্‌টে গেছে। সম্পত্তির উপরে জন্মগত অধিকারকে তিনি মানতেন না। কিন্তু তাঁর ভাবনার ভিতরে স্পষ্টতই এই কথাটা ছিল যে আদর্শ সমাজ সংরক্ষণের জন্য যতখানি নৈতিক বল প্রয়োজন সেটা শুধু উত্তরাধিকারের রীতিকে বদল করে পাওয়া যাবে না। এই প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ চাই ধর্মের।

স্যাঁ-সিমঁর এই মতকে একটু ব্যাপক ভাষ্য দিলে ইতিহাসের ক্ষেত্রে বড়ো মাপে এর প্রয়োগ সম্ভব। প্রতি নবযুগের ধর্মমতের অগ্রগতির সঙ্গে একরকম প্রতিষঙ্গ থাকে সেই যুগের বিজ্ঞানকৃতির স্তরের। যুগের রাজনীতি আবার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে ধর্মের সঙ্গে। সমাজের উপস্থিত পর্বোপযোগী সর্বজনলভ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য সকলকে কাজ করাতে পারে ধর্ম। সমাজের সকল শ্রেণী এবং অংশগুলিকেও একত্র ধরে রাখতে সক্ষম ধর্মই। সমাজের উন্নতিতে ধর্মের এমনই একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই কথাটা কোঁদরসে ঠিকমত ধরতে পারেননি। ফলে ধর্মের এবং য়ুরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগের তাৎপর্য বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন একেবারে নঞর্থক। এই মূল্যবিচার স্যাঁ-সিমঁ মেনে নেননি। মধ্যযুগেই মিলেছে সমাজসংগঠন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান। ইতিহাসে তার নিজস্ব স্থান তো রয়েছেই, ভবিষ্যতে ব্যবহার্য বার্তা আছে এই সংগঠনসূত্রে। ইতিহাসে স্যাঁ-সিমঁ দেখেছিলেন কেমন করে সুসংগঠিত একটি যুগের পিঠেই একটি করে সমালোচনা বা বিপ্লববাহী যুগ নকশা সাজায়। প্রগতি সহজ সরল রেখায় হয় না। চক্রবৎ ঘোরে ইতিহাস এমনও নয়। সংগঠন আর বিরোধপ্রধান যুগের পালাবদলেই তৈরি মানব সমাজের অনবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ইতিহাস।

স্যাঁ-সিমঁ থেকে মার্ক্স (১৮১৮-৮৩)-এ এসে আমরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মিল আর কিছু তফাৎ দেখতে পাই। স্যাঁ-সিমঁর মতো মার্ক্সের কাছেও ইতিহাসে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সদর্থক ভূমিকা স্পষ্ট। মার্ক্সের মতে উৎপাদনের কাজে মানুষ যে-সব সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে সেইগুলির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সমাজের সকল দিকেরই মূল বিধায়ক হিসেবে থাকে এই সব সম্পর্ক। ক্যাপিটাল (ভল্যুম ১) বইটিতে মার্ক্স লিখছেন, "মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে কী ভাবে সমঝোতা করছে, জীবনধারণার্থে কেমন তার উৎপাদন পদ্ধতি এ সবই প্রযুক্তিতে প্রকাশ্য। তার সমাজ সম্পর্ক গড়বার ধরন, এবং তা থেকে উদ্ভাবিত মানসিক ভাবনাধারাকেও খোলাখুলি দেখা যায় এ ভাবেই।" ইতিহাসের প্রধান প্রধান পর্বের সঙ্গে প্রতিষঙ্গ থাকে উৎপাদনী রীতিপদ্ধতির অগ্রগতির। এই প্রতিষঙ্গের ভিতরে উৎপাদনী শক্তি এবং উৎপাদনবিধায়ক সম্পর্ক দুই-ই বর্তমান। অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার তৎকালীন অবস্থা তথা সম্পত্তির মালিকানার পরিবর্তিত রীতিপদ্ধতিসমেত সেই সময়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠান মিলেমিশে ঐতিহাসিক পর্বান্তরকে বিশিষ্টতা দেয়। এর ভিতরে উৎপাদনী শক্তি গতিশীল এবং উন্নয়নমুখী। উৎপাদনব্যবস্থাসম্বন্ধী সমাজবন্ধন কিন্তু সমাজজীবনের যে-কোনো পর্বেই অপেক্ষাকৃত পরিবর্তনবিমুখ। ফলে এই দুইয়ের

ভিতরে থেকে থেকে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এই অসমন্বয় কাটিয়ে ইতিহাসের উন্নততর পর্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ কী? শ্রেণীসংগ্রামের মুখ্য ভূমিকা হচ্ছে এইখানে। ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কাল থেকেই সমাজ বিভক্ত হয়ে গেছে দুটি শ্রেণীতে। এদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। বর্তমান উৎপাদনব্যবস্থার সুফলভোগী সমাজের শক্তিমান শ্রেণীটি বড়ো কোনো পরিবর্তনের বিপক্ষে থাকে। উৎপাদনের হাতিয়ার তাদের হাতে। সেইখানে তাদের জোর। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থা আর উৎপাদনের উন্নয়নমুখী সম্ভাবনার ভিতরকার অসঙ্গতি ক্রমেই যত তীব্র হয়, শক্তিমান শ্রেণীর প্রগতিবিরোধিতা ততই ধরা পড়ে যায়।.বিত্তবান আর বিত্তহীনদের ভিতরে অনিবার্য সংঘর্ষে তখন বিত্তহীনই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে কেননা তারাই হচ্ছে প্রগতির পক্ষে। যে সামাজিক বিরোধিতা ঘনিয়েছিল উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে অসমঞ্জস সমাজসম্বন্ধের জটিলতায় মালিকশ্রেণী ও সর্বহারার পরস্পরবিরুদ্ধ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিশে, সেই বিরোধিতা দূর হয়ে যায় বিপ্লবে। বিপ্লবের এই উত্তরণের পরে উন্নত উৎপাদনী শক্তির সঙ্গে সুসমঞ্জস সমাজসম্বন্ধগুলি উচ্চতর স্তরে আবার সংগঠিত হয়। ইতিহাসের পরিবর্তনের এবং অগ্রগতির এই ভাষ্য ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা নামে পরিচিত।

মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে এখানে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করে রাখা যাক। প্রথমত মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে শুধু সমাজ সম্পর্ক দিয়েই মানুষকে বোঝা যায়। বিখ্যাত ফয়েরবাখ্ থীসিসে তিনি লেখেন "এক বিমূর্ত মানবসত্তা প্রতিটি পৃথক-পৃথক ব্যক্তিতে অন্তর্নিহিত এমন নয়। মানবসত্তা প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজসম্বন্ধাবলীর সমাহার।" দ্বিতীয়ত, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে আদিম সাম্যবাদের কাল শেষ হয়ে যাবার পরে সমাজে স্বার্থের সামঞ্জস্য আর নেই। পরবর্তী কোনো মনুষ্যসমাজের ক্ষেত্রেই আর "সর্বজনকল্যাণ" ধারণাটি ঠিক প্রযোজ্য নয়। এই সব সমাজের প্রতিটিই পরস্পরবিরুদ্ধ স্বার্থান্বেষী শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এই বিরুদ্ধতা বা শত্রুভাবের মূল বাস্তব অবস্থাতে নিহিত। উপস্থিত উৎপাদনী হাতিয়ারের মালিকানার ধরন থেকে এই অবস্থা বুঝে নেওয়া সম্ভব। তাছাড়া শুধু উৎপাদকদের পরস্পর সম্বন্ধই নয়, সবরকম সামাজিক সম্বন্ধেরই একটি ব্যবহারিক দিক থাকে। মার্ক্স লিখেছিলেন, "সমাজজীবন প্রধানত ব্যবহারিক জীবন।" কার্যকারিতা বা প্রয়োগের ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে কোনো কিছুর অর্থ বা মূল্য খুঁজতে যাওয়া ভুল। সব সামাজিক কাজ, সে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিল্পকলাগত বা ধর্মীয় যে রকমই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় বাস্তব কার্যকারণের বিধানে। এ কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ওই বাস্তব সূত্রগুলির সঙ্গে বস্তুতন্ত্রের অতিরিক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জগৎ সম্পৃক্ত হতে পারে না। সেটা সম্ভব। কিন্তু সংস্কৃতিকে মূল বাস্তব নিয়ন্ত্রকগুলি থেকে সরিয়ে নিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে এক ধরনের মোহাবিষ্টতার অনুকূল রহস্যবাদী অভিমত সৃষ্টি হতে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কাজ মোহাবেশ ভেদ করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ধর্মকে ঠিকমত বুঝতে হলে বুঝতে হবে উৎপাদনব্যবস্থা ও তজ্জনিত পরস্পরবিরোধী স্বার্থের নিরিখে। নইলে ধর্মকে যথার্থ বোঝা যাবে না।

যদিও মানবসমাজ একরেখ ভঙ্গিতে চলে না, চলে পাকদণ্ডী পথে, তবু প্রগতি যে একটি ঐতিহাসিক তথ্য এতে মার্ক্সবাদীদের কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু এ কথাটা এমন নিঃসন্দেহ জানা গেল কী করে? কেমন করে জানা যায় যে আমাদের আজকের সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা বা গুপ্তসাম্রাজ্যের ভারতের তুলনায় বেশি উন্নত? এদিকে ওদিকে নানারকম কথাই এখানে বলে দেওয়া যায়। তবে একটা কথা খুবই নিশ্চিত যে আগেকার

যে কোনও যুগের তুলনায় আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পৃথিবীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেক বেশি উন্নত হয়ে উঠেছে। বেকন এবং স্যাঁ-সিমঁর আশা ন্যস্ত হয়েছিল এই সম্ভাবনার ওপরেই। ইতিহাসের প্রগতির গতিকে চালু রাখার কাজে মার্ক্সও উৎপাদনী সচলতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যে ক'জন চিন্তাবিদের গভীর প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দীর্ঘকাল বিদ্যমান রয়েছে তাঁদের ভিতর এইখানে আমরা ভাবনাধারণার একরকম ধারাবাহিকতা পাচ্ছি।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানেই ওঠে। ঐতিহাসিক প্রগতির এই যে ব্যাখ্যা একে "বস্তুবাদী" বলা যায় কী ভাবে ? উৎপাদন শক্তির উন্নতি তো বরাবরই পরীক্ষণী ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এটাই স্বীকার্য যে জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে উৎপাদন শক্তির উন্নতিসাধন। তর্কের খাতিরে হয়ত কেউ বলবেন বস্তুগত প্রয়োজনেই জ্ঞান বেড়ে ওঠে। খানিকটা তাই। কিন্তু সত্যিই কি দেখা যায় যে মানুষের প্রয়োজনের সংকট মুহূর্ত এলেই বিজ্ঞানের প্রগতির বেগ দ্রুত হয়েছে ? তাঁর **ফ্রীডম অ্যাণ্ড অরগানাইজেশন** গ্রন্থে বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রশ্ন তুলেছিলেন, "আর্কিমিদিসের সময় থেকে লিওনার্দোর কাল পর্যন্ত প্রায় কোনোরকম পরীক্ষণী বিজ্ঞান হল না কেন ?" এবং তিনি এই সঙ্গে জানিয়েও দিয়েছিলেন, "আর্কিমিদিসের পরে ছয় শতাব্দীকাল জুড়ে আর্থিক অবস্থা এমনই ছিল যাতে বিজ্ঞানকৃত্য সহজ হতে পারে।" খৃষ্টান যুগের প্রথম কয়েক শ' বৎসর রোম সাম্রাজ্যে দূর পাল্লার বাণিজ্যের ঘাটতি ছিল না, যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য বাহ্য উদ্দীপনার অভাব ঘটার কথা নয় সেখানে। গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার তো শেষই ছিল না। তথাপি কোনো এক কারণে রোমান চিত্ত বিজ্ঞান এবং ব্যবহারিক আবিষ্কারের তুলনায় অধিকতর আকৃষ্ট হল ইতিহাস, আইনের তত্ত্ব এবং অলংকারশাস্ত্রের প্রতি। এ থেকে এ রকম সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে সাংস্কৃতিক সূত্রই প্রধান বা মৌলিক সূত্র। ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধ কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সূত্রের পরস্পর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করা। মৌলিক সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে কেবলি পিছোতে থাকলে এমন অন্তহীন অনুক্রমে জড়িয়ে যাওয়া সম্ভব যা একেবারে নিষ্ফল। মানবিক কর্মকাণ্ডে কোনো একটি সূত্রের মৌলতাই বড়ো প্রশ্ন নয়। কী ভাবে বস্তুজগৎ এবং মনোজগতের বিভিন্ন সূত্র পরস্পর গ্রথিত হয়ে শুধু সংস্কৃতিতে রূপ নেয় তাই নয়, বেঁচে থাকার প্রতি পর্বে সব কাজে জাল বুনে যায়, আকর্ষণীয় ব্যাপার সেটাই।

অনুরূপ কিছু মন্তব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিষয়েও করা সম্ভব। মার্ক্সবাদীদের মতে সমাজে প্রধান দ্বন্দ্ব শ্রেণীতে-শ্রেণীতে। ঐ দ্বন্দ্বের মূল আছে বস্তু জগতের বিন্যাসে, বিশেষত উৎপাদনী হাতিয়ারের মালিকানায়। এই সব কথাই আংশিক সত্য। সমাজে দ্বন্দ্ব কিন্তু রয়েছে অসংখ্য আকারে। এদের ভিতরে কোনটি কখন প্রবল হয়ে উঠবে তা অবস্থাবৈগুণ্যের উপর নির্ভর করে। এ ছাড়াও মনে রাখা দরকার যে দ্বন্দ্ব ঘটাবার উপযোগী বাস্তব কারণ উপস্থিত থাকলেই অতঃপর সেই কারণ থেকেই জোরদার বিরোধ বাধবে এমন নয়। ওই কারণগুলির দিকে ব্যক্তিগত ভাবে নজর দেবার একটা ব্যাপার রয়েছে। এই ব্যক্তিগত এবং অবস্থাগত দুটি দিকের কোনো একটিকে বেশি গুরুত্ব দিলে একদেশদর্শিতা দেখা দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে যেটা দেখবার মতো বিষয় সেটা হল এই যে দুটি দিক কী ভাবে একত্র সংযুক্ত হয়ে যায়, কেমন করে কোনো বিশেষ প্রশ্নে ব্যক্তিগত দেখার ধরন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির প্রবলতায় "বাস্তব" অবস্থা তৈরি হয়ে ওঠে।

বিগত অর্ধ শতাব্দীতে ভারত তথা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রধান যে সব সামাজিক দ্বন্দ্ব

চলছিল সেগুলিকে অনুধাবন করবার জন্য একটুখানি পিছন ফিরে তাকানো যাক। এ ভাবে তাকানো শক্তও তো নয়। এই সমস্ত বছরগুলিতে সারা ভারতভূমি জুড়ে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাই ছিল প্রধানতম সামাজিক সংঘর্ষ। জাতিপাঁতির বিভেদের হিংস্রতা সামান্য প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন, এখন তা-ই কিন্তু মস্তো বড়ো হয়ে উঠেছে। আমাদের নিজেদের সমাজে সমকালীন সামাজিক দ্বন্দ্বের এগুলি অন্যতম দৃষ্টান্ত। গোটা পৃথিবীকে ধরলে অন্য এক ধরনের হিংস্রতার ধারাবাহিকতা চোখে পড়বেই। এই যে গাত্রবর্ণের ভিন্নতা নিয়ে উত্তেজনা জমে ওঠার মতো দুঃখকর পরিস্থিতি, বিরোধের এই এক সূত্র। আর যুদ্ধ তো রয়েছেই। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের হানাহানির ঘটা দেশে-দেশে যুদ্ধ বেধে গেলেই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। মতবাদভিত্তিক কোনো প্রাগ্বিচার মনে না রেখে যদি আমরা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের এ সমস্ত সামাজিক সংঘর্ষগুলিকে সাজাই, গুরুত্ব বিচারে এগুলিকে শ্রেণীযুদ্ধের অন্তত সমতুল্য না ভেবে উপায় থাকে না।

মার্ক্সবাদীরা হয়ত তর্ক করতে চাইবেন যে এ সমস্ত বিরোধেই আসলে ছদ্মবেশী শ্রেণীযুদ্ধ। কিন্তু এ যুক্তি শেষ পর্যন্ত টেকে না। সন্দেহ কি যে বিভিন্ন সংঘাত পরস্পর সম্পৃক্ত। তা হলেও এরকম ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে এগুলি সবই মূলতঃ এক এবং এদের একটিকে অন্য কোনটিতে রূপান্তরিত করে দেখলেও ব্যাপারটা অর্থবহ হবে। দরিদ্র শ্বেতকায় আর ধনী শ্বেতকায়দের যে বিরোধ তা কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায় বর্ণসংঘাতের সঙ্গে এক হতে পারে না। মুসলমান বনাম ইহুদী যুদ্ধের সঙ্গে আরব অঞ্চলের শ্রেণীযুদ্ধ সমতুল্য নয়। এটাও লক্ষণীয় যে কোনো পূর্বনির্ধারিত অর্থনৈতিক বা বস্তুস্বার্থের বিচ্ছেদের রেখা ধরে কিছু মানুষ খৃষ্টান অন্যেরা মুসলিম হয়েছে এমন নয়; পরন্তু ধর্মবিশ্বাসের পূর্বনির্ধারিত বিভাগই তাদের মনে এই বোধ জাগিয়েছে যে তাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। অবশ্য অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অবধারিতভাবে এই শত্রুতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে বর্ণভেদ প্রথার প্রভাব সুবিদিত। নিম্নবর্ণের কিছু মানুষ এখন অর্থনৈতিক সোপান বেয়ে বেশ কিছুটা ওপরে দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার ফলে উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছাকাছি প্রতিষ্ঠিত। এখন এই অবস্থায় নিম্নবর্ণের দরিদ্র মানুষগুলি যখন নির্বাচনের দিনে দুটি প্রার্থীকে পান যাদের ভিতরে একজন তাঁদেরই নিজ বর্ণের তখন তুলনামূলক ধনসম্পদের হিসেব না নিয়েই তাঁরা প্রায়শ নির্বাচিত করে নেন স্ববর্ণের প্রার্থীকে। অর্থনৈতিক মর্যাদাগত মিলের চেয়ে স্ববর্ণের অভিন্নতাবোধ এখানে জোরালো হয়ে ওঠে।

তার মানে কি সামাজিক বিরোধের প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে পরিবর্তনশীল বাস্তব অবস্থার কোনোরকম ভূমিকাই নেই? ঠিক তা নয়। এই অবস্থার দ্বারা নিঃসন্দেহে স্পৃষ্ট হতে থাকে উপস্থিত "আত্মীয়" গোষ্ঠী এবং সম্প্রদায়গুলি আর সেই স্পর্শে প্রভাবিত হয়ে এই সব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, গড়ন, পরস্পর বন্ধুত্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছাঁদ প্রভৃতিও বদলে যেতে থাকে। এই যে মূল কাঠামো এরই সঙ্গে সহযোগে থেকেই শ্রেণীসংগ্রামের উপাদানগুলি ক্রিয়াশীল হয়। এই দিক থেকে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করলে অনেক সমস্যার এবং তাদের নানা সমাধানের একটি বিশেষ চরিত্রলক্ষণ ধরা পড়বে। ইতিহাসের মস্তো মস্তো যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে স্বজনবর্গীয় যূথে, গোষ্ঠীতে বা জাতিতে, এই মনুষ্যযূথ বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রায়তন যা-ই হোক। যে বিরোধ অর্থনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে মনে হচ্ছে তারও সমাধান অর্থনীতির স্তরেই খুঁজে নিতে গেলে দেখা গেছে যে নিষ্পত্তি

হচ্ছে সাময়িক এবং আংশিক। স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। বারবারই প্রমাণ হয়েছে যে সমাজ উন্নত স্তরের এক সামগ্রিক সামঞ্জস্য বিধানের ভিতর দিয়েই এই সব বিরোধের মৌলিক সমাধানে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই উত্তরণ একান্ত অর্থনৈতিক যুক্তির সাহায্যে লভ্য নয়। একদিকে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ আনুগত্যে যখন মানুষ নিজেকে আঁকড়ে ধরে রাখে সেই মূঢ় সংস্কারবদ্ধতা ও আত্মবিনাশ, অন্যদিকে কোনো নবীন স্বপ্নাদর্শে যখন তাকে টানে তখন সেই স্বপ্নের বিশিষ্টতা এবং বৃহত্তর ও মহত্তর আনুগত্যে উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্যম, এ সবই মানুষ পায় সচেতন, হিসেবী বিবেচনাবুদ্ধির চেয়ে ঢের বেশি গভীর কোনো উৎস থেকে।

বলা হয়েছে সামাজিক অস্তিত্ব মানুষের চেতনার নির্ধারক। খানিকদূর পর্যন্ত এই যুক্তি খুবই মনকে টানে ; মনে হয়, পরিষ্কার হয়ে গেল কথাটা। তার পরে কথাটাকে আর সঠিক ব্যাখ্যা বলে মনে হয় না। ওই যে "সামাজিক সম্বন্ধের সমাহার" যার ভিতরে ব্যক্তি বিধৃত, ওই সমাহার তো বর্তমান উৎপাদনী সম্বন্ধের উপরে এবং সম্পত্তির মালিকানার প্রচলিত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়া। অথচ মানুষের চেতনা শুধুমাত্র কি বর্তমানের দ্বারা নির্ধারিত ? তা নয়। অনাদিকালের প্রবাহ বেয়ে মানুষের অতীত আজকের মানব চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতীত গ্রথিত হয়ে থাকে বর্তমানের অন্তস্তলে। মানবচেতনার সমগ্রতার ভিতরে যদি অবচেতনাকেও হিসেবে রাখি তাহলে এই সমগ্রতার ওপরে সমকালীন সমাজসম্বন্ধের যেটুকু ছাপ থাকে তার তুলনায় আরো গভীর এবং পরিব্যাপ্ত প্রভাব পড়ে অতীতের।

মানুষের মনের কিংবা সমাজের যেটারই অংশ হয়ে থাকুক অতীতও কিন্তু অনড়, চিরস্থির নয়। অতীত হচ্ছে কতকগুলি ধারার সমষ্টি, বর্তমানের ভিতরে যে-ভাবে তা প্রবিষ্ট হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায় তার নিরিখেই অতীতের ভাষ্য করা সম্ভব। এর অর্থবহ ব্যাখ্যা প্রকাশ পায় ওই ক্রমান্বিত আত্মউত্তরণের ভঙ্গিতে। এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই মনুষ্যত্বও নতুন নতুন ব্যাখ্যা, ভিন্ন সংজ্ঞার্থ পেতে থাকে। বর্তমান যুগে বস্তুজাগতিক কীর্তি মত্ত হয়ে উঠে মানুষের আত্মপ্রতিকৃতিতে বিকৃতি এনেছে। সংশোধন চাই এই প্রতিকৃতির। আজকের দিনে প্রগতির তত্ত্বকে আবার শুরু করতে হবে একেবারে মূল থেকে। মনুষ্যস্বভাব, তার সঙ্গে সমাজ এবং ভবিষ্যতের যোগ এই সব মিলিয়ে এক প্রাণবান এবং যথার্থ কালোপযোগী ধারণা যে প্রগতি তত্ত্বে মিলবে ভাবীকালের নির্ভরযোগ্য পথ দেখাবে সে-ই।

॥২॥

প্রকৃতির রাজত্ব

সাধারণভাবে একটা অনেক দিনের বিশ্বাস রয়েছে যে মনুষ্যচরিত্রে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হলে "স্বাভাবিক" অথবা আদিম দশায় মানুষকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেওয়া দরকার। শুধু রোমান্টিকরাই এই বিশ্বাস চালু করেছেন তা নয়। কেবল এ ভাবে পর্যবেক্ষণই অবশ্য পর্যাপ্ত নয়, মানুষের চরিত্রের স্বাভাবী বৃদ্ধি এবং বিকাশ দেখাটাও জরুরি। কিন্তু মানবজাতির শৈশবকে অনুধাবন করতে পারলে কয়েকটা জিনিস বোঝার

ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য হয়।

প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কী সেটির মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে মানুষের নিজের প্রকৃতি। দ্য এসেন্স অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি বইতে ফয়েরবাথ অনুরূপ একটি ভাব বোঝাতে গিয়ে চিত্তাকর্ষী এক উপমা ব্যবহার করেছিলেন। সূর্যকে বিভিন্ন গ্রহ থেকে ভিন্ন রকম দেখায় অথচ সূর্য সেই একই। "অতঃপর নিজস্ব সূর্যই প্রতিটি গ্রহকে দিচ্ছে তার নিজ স্বরূপের মুকুর।" প্রকৃতিও নিশ্চয়ই তেমনই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর চোখে বিভিন্ন রূপে বিভাসিত। মানুষ তার শৈশবে প্রকৃতির যে রূপ দেখে তা মানুষেরই আদিম স্বভাবের প্রতিচ্ছবি।

"এই বিশ্বচরাচর বিষয়ে আধুনিক আর প্রাচীন মানুষের প্রতিন্যাসের মূল প্রভেদ হলো এই যে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক মানুষের কাছে বাহ্যজগৎ প্রধানত "ওটা", যে-বাহ্যজগৎ প্রাচীনদের কাছে, বন্যদের কাছে, ছিল "উনি"।"—এই কথা বলেছেন এইচ. এবং এইচ. এ. ফ্রাঙ্কফর্ট তাঁদের দ্য ইনটেলেকচুয়াল অ্যাডভেঞ্চার অফ এনশেন্ট ম্যান নামে ১৯৪৬-এ য়ুনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে। জানি না কথাটিকে এ ভাবে বললে পুরো বলা হয় কি না। শৈশবে প্রকৃতির সান্নিধ্য মানুষের মনে যে সম্ভ্রম এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করে এই বক্তব্যে সেই ভাব স্পষ্ট হয়নি। এর ভিতরে সম্ভবত একটা চেষ্টার জুলুম আছে, যেন আধুনিক ছকবাঁধা ধর্মভাবনার ছাঁচে ফেলেই আদিম এবং প্রাচীন মানুষকে সবটাই বোঝা গেল। তবুও এই বক্তব্য এক অর্থে মূল্যবান। আদিম এবং আধুনিককে একত্রে এনে ফেলার একটা সারবত্তা আছে।

আদিম মানুষ চতুর্দিকে প্রাণ নিষ্প্রাণ সকল পদার্থের ভিতরে এক প্রাণশক্তির অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করত এবং কোনো একভাবে তার মনে হয়েছিল সেই একই শক্তি তার ভিতরেও নিত্য উপস্থিত রয়েছে। আমাদের তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষের বাইরে মনস্তত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্বের সূত্রগুলি যে এক হয়ে আছে এই কথাটি এই প্রসঙ্গে নজরে পড়ে। মনুষ্যাকৃতি পাবার পূর্বে গর্ভের ভিতর মানুষের ভ্রূণ কী ভাবে বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে মাছ, সরীসৃপ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর রূপ ধরে আর ছাড়ে আমরা জানি। অল্প একটুখানি স্থানকালের ভিতরে বিচিত্রভাবে ঘটে এই বিজ্ঞানচিহ্নিত লক্ষাধিক বর্ষকালের ক্রমবিবর্তন। এইভাবে যেন আমরা মনুষ্য আবির্ভাবের বহু পূর্ব যুগের জৈব বিবর্তনের শারীরস্মৃতি ভরে রেখে দিতে পারি আমাদের এই দেহের অন্তস্থ কোষে। আরো পিছিয়ে গিয়ে জীবের এই বিচিত্র রূপের উৎসসন্ধানও সম্ভব, মাটি, সমুদ্র, আগুন থেকে এবং আরো দূরের আকাশ থেকে।

আমাদের এই দেহাবয়বে জন্মসূত্রাগত স্মৃতি প্রকৃতই আছে কি নেই তা নিয়ে দূরকল্পনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আদিম মানুষের নিজেকে এক প্রকার আর অবশিষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা রয়েছে তাকে অন্যপ্রকার পদার্থ বলে বোধ হয়নি। বরং সর্বব্যাপী অশরীরী এক শক্তিকে সে অনুভব করেছিল যা মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে কোন এক রহস্যময় যোগে যুক্ত করে রাখে। এই শক্তিকে সে নিজের চেয়ে বহুগুণে বড়ো বলেই জেনেছিল। তাই শুধু প্রকৃতির অনুরূপ শক্তিস্পৃষ্ট বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে সহাবস্থানের চেয়ে ঢের বড়ো কথা ছিল ওই দৈবশক্তির প্রতীক কোনো বস্তুর সান্নিধ্য। সেই সান্নিধ্য তথা সাযুজ্য তার আত্মশক্তিকে যেন বাড়িয়ে দিয়ে যেত। এই বোধকে সমাজজীবনে ব্যবহার করা যায়। ড্যুরখাইমের মতো কোনো কোনো খ্যাতিমান সমাজতাত্ত্বিক সেই সামাজিক উপযোগিতার নিরিখেই এই অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তদুত্তরে মালিনোভ্স্কি তাঁর ম্যাজিক, সায়েন্স এ্যাণ্ড রিলিজন (১৯৪৮) বইতে একটি সঙ্গত কথা তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য এমন-কি আদিম মনুষ্যসমাজেও নিবিড়তম ধর্মানুভবের মুহূর্তগুলি প্রায়ই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এটা লক্ষণীয়। এটা খুবই সম্ভব যে মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবণতাকে সমাজ জীইয়ে তুলে উৎসাহ নিয়ে নিজের কাজে লাগাবে।

প্রকৃতির রহস্যময় শক্তির যে দুই রূপ প্রাচীন কালের মানুষের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়ে গেছে মানুষের ধর্মের ওপরে। এক রূপে মূর্ত হয়েছে প্রাণশক্তি তথা এই জীবনের গুহ্য সূত্র। প্রকৃতিই মানুষকে দিয়েছে প্রতিদিনের আহার, তার জীবিকা। এটা খুবই স্বাভাবিক যে মায়ের প্রতি শিশুর আকর্ষণতুল্য অনুভব মানুষ বোধ করবে এই পৃথিবীর প্রতি। প্রকৃতির উর্বরতার প্রতীক দেবীমাতৃকার পূজা অসংখ্য প্রাচীন ধর্মে প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই দেবীর সঙ্গে থাকেন এক দেব যিনি তাঁর সহচরমাত্র যেমন উর্বরতাদায়ী সূর্য পৃথিবীর নিত্যসহচর। তেমনই উদাহরণ স্বরূপ মিশরের দেবী মাতৃকা আইসিস-এর সহচর ওসাইরিসের উল্লেখ করা যায়। এই যুগ্মতায় দেবী এবং তাঁর নিত্যসহচর উভয়ে মূলত একই সূত্রের বিধায়ক, ভিন্ন দুই সূত্রের সম্মেলক নন।

কিন্তু ধর্মের ভিতরে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিশিষ্ট একটি উপাদান সংযোজন করেছে প্রকৃতির দ্বিতীয় একটি রূপ। এই পৃথিবী যেমন নবনবরূপে মনোহারী, বর্ণবৈভবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রেখায় রেখায় মাতাল করে, উদ্দীপ্তও করে, তেমনি ঊর্ধ্বে মেঘের স্তর পেরিয়ে রয়েছে অপরিবর্তনীয় আকাশ, পবিত্র নিষ্কলঙ্ক যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আদর্শের প্রতীক। এই দৃষ্টিতে সূর্য তখন আর পৃথিবীর উর্বরতা বিধানের সহচরমাত্র থাকে না, সূর্য হয়ে যায় সর্বপাবক অগ্নির মূলাধার, বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রিয় আলোকের ভাণ্ডারী, প্রত্যহের যত ভয়াবহ প্রলোভন থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে উজ্জ্বল, সক্ষম সারথি। এই ভাবে দেখলে স্বর্গ ও পৃথিবীর বিবাহে দুটি বিপরীত অথচ পরিপূরক সূত্রের মিলন ঘটে। এই দুই সূত্র মানুষের ধর্মচেতনার দুটি মেরু প্রকৃতির আর পুরুষ-এর মতো নানা নামে ও ভাবে প্রাচীন কাল থেকেই চিত্রিত হয়ে আসছে। বিভিন্ন সময়ে নানা উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু আদিযুগ থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশ্ব ব্যাপারে মানুষের প্রতিক্রিয়ার যেটুকু দলিল যা মেলে তা থেকে আদিম মানবমনে অধ্যাত্ম প্রয়োজনের একটি ছবি দেখা যায়। এই ছবি হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেবার যোগ্য নয়। মানুষের দৈব-চেতনার দুটি উপাদানই প্রধান মনে হয়। একটি হলো প্রকৃতিপ্রেমে আসক্তি, মত্ততা, অন্যদিকে অন্তরের শান্তি সুষমা জন্য ও নিরাসক্তির জন্য ব্যাকুলতা যাতে সব মত্ততার নিবৃত্তি।

প্রকৃতি থেকে মানুষ যেমন পুষ্টি পেয়েছে তেমনি প্রকৃতির অসংখ্য কালো, অর্থহীন খেয়ালের ভয়াবহ নিষ্ঠুর কীর্তি, তার বিনাশী রূপও কম তাড়া করেনি মানুষকে। সাপে তাড়া করেছে তাকে, আক্রমণ করেছে মাংসাশী প্রাণী। ঝড় ঝঞ্ঝা বন্যায় তাকে গ্রাস করে নিয়েছে কিংবা কখনো আছড়ে ফেলে রেখে গিয়েছে, পীড়িত হয়েছে শুধু দেহের নয় মনেরও কঠিন ব্যাধিতে, বিনা অপরাধে কতবারই না মানুষকে সইতে হয়েছে আগুনে, ভূকম্পনে, কিংবা আগ্নেয়গিরির মুখে বিপর্যয়ের শাস্তি। আদিম মানুষের মনে প্রকৃতির প্রতি প্রচণ্ড মিশ্র অনুভূতি দেখা দিয়েছিল। প্রকৃতিপ্রণয়ে মিশেছিল অবোধ ভয়, ভৌত, উপাদানকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষায় মিশে গিয়েছিল তার সহজাত সাবধানতা আর অবিশ্বাস।

দুর্লক্ষণের উদ্বেগে বন্দী হয়েও অন্য সব প্রাণীর তুলনায় আদিম মানুষের ছিল সচল এক ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং অতুলনীয় বিস্ময়বোধ।

এই সব বৈশিষ্ট্যগুলির শারীর এবং জৈব ভিত্তি এখন সুবিদিত। মানুষের মস্তিষ্কের গড়ন তো এক গল্প কথা। এই গঠনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থ এক গবেষক এর নামকরণ করেছিলেন ত্রিমুখ। বিবর্তনের ভাষায় মস্তিষ্কের ক্রমান্বিত যে গঠন তার তিনটি স্তরের পার্থক্য ধরা সম্ভব। ম্যাকলীন যাকে সরীসৃপ-জট [সংক্ষেপে র-কমপ্লেক্স]* বলে চিহ্নিত করেছেন আদিতম স্তর সেটি, মানুষ আর সরীসৃপ উভয়ের ভিতরেই বর্তমান। দ্বিতীয় স্তরে আছে সাঙ্গিক বিন্যাস। এই বিন্যাস সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবের মতো মানব-মস্তিষ্কেও উপস্থিত। সর্বশেষ স্তরে, অবশিষ্ট সারা মস্তিষ্কের ওপরে বিরাজিত যে-নবমগজ মানুষকে তার বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, বিবর্তনের ধারায় মস্তিষ্কের সাম্প্রতিকতম সংযোজন এই গুরুমগজ।

এত জটিল বৃহৎ মস্তিষ্কাধারে মানুষের কী প্রয়োজন ছিল ? মানুষের বিবর্তনের দিকে চেয়ে বলতে হয় এর প্রয়োজন তার টিকে থাকার জন্যই। মানুষের পূর্বপুরুষ প্রথম যুগের বানর জাতির বাস ছিল অরণ্যে। ক্রমে এমন দিন এল যখন অরণ্য বিরল হয়ে আসছে। সেই কালের বানর জাতির ভিতরে যারা অরণ্যেই রয়ে যায় তাদের সংখ্যা আজ ক্ষীয়মাণ। যে প্রজাতি থেকে মানুষ এসেছিল তারা জঙ্গল ত্যাগ করে সমতলে এসে বাঁচার লড়াই শুরু করে। এই লড়াইয়ে অন্য যে-সব জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়েছে তারা নানা অর্থে এই বাঁচার লড়াইয়ে মানুষের চেয়ে বহুগুণে দক্ষতর ছিল। এই সব-জীবজন্তুর সঙ্গে দ্রুত দৌড়ে এঁটে ওঠা মানুষের সাধ্যাতীত, এদের দাঁত এবং থাবাও ঢের বেশি জোরালো। কিন্তু মানুষের একটা যে দুর্বলতা, সে দাঁড়ায় দুটো মাত্র পায়ে, ওতেই তাকে একটা বিশেষ বল আর সুযোগ এনে দিল, দুই পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ মুক্ত করে নিতে পারল তার দুই হাত। এর অর্থ দাঁড়াল এই যে মানুষ সামনে দেখে নিতে সক্ষম হয়ে উঠল, অন্য জন্তুর মতো শুঁকে, নাক ঘষে তাকে বুঝতে হয় না। ঋজু দণ্ডায়মান মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যায় বহু দূর দিগন্ত, অনেকখানি দেখে বুঝে সে অনেকটা কার্যকর পরিকল্পনা করতে পারে। সত্যি বলতে, গোড়াতে এই সুবিধেটুকু সামান্যই মনে হয় কিন্তু অল্প একটুখানি এই সুবিধের ভিতরে সম্ভাবনা ছিল প্রভূত। কালক্রমে সেই সম্ভাবনা সম্যক মহিমা পেয়েছে। মানুষ যে হাত দুটো ব্যবহার করে কিছু একটা, লাঠি বা পাথর, যাহোক ধরে তুলতে পারে প্রাথমিক সহায় হিসেবে এইটের গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। এতেই মানুষ শিকারী প্রাণী হয়ে উঠতে পারে। কুকুর, বনবিড়াল, নেকড়ে কিংবা বাঘ সকলের চেয়ে মানুষ দৌড়ের ক্ষমতায় খাটো, দুই পায়ের ওপর কোনমতে নিজেকে খাড়া-করে-রাখা মানুষ এক আশ্চর্য জোর পেয়েছিল তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে। ওই আঙুলটির বিন্যাসগুণে শুধু যে মানুষ শক্ত মুঠিতে জিনিস ধরতে পারলো তাই নয়, এরই সাহায্যে ক্রমে নানা হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি নির্মাণে দক্ষতা এসে গেল মানুষের যাতে সমস্ত শারীরিক দুর্বলতার ঘাটতি পুষিয়ে যায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার বাকশক্তি। বাক্যের বলে সম্ভব হয়েছে অনেকখানি জটিল সমাজ সংগঠন গড়ে তোলা, তাকে উত্তরাধিকার সূত্রে স্থায়ী রূপ দেওয়া। ভাষার সাহায্য ব্যতিরেক জটিল সাংগঠনিক ঐতিহ্যকে পুরুষানুক্রমে বহন করা সম্ভব হত না। এ সবের জন্যই প্রয়োজন ছিল ক্রমবিবর্তনের দায়িত্ব পালনের উপযোগী সুসংগঠিত মস্তিষ্ক। এইটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে গোটা মস্তিষ্কের পরিমাপের অনুপাতে বাকশক্তি এবং আঙুল বিশেষত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যবহারনিয়ন্ত্রক কেন্দ্র দুটি অনেকটাই বড়ো।

মানুষের আরো এক বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। মানুষ নামক জীবটির শৈশব বড়ো

দীর্ঘ এবং এর বোধভাষ্যকে শিক্ষিত করে তুলতে অনেকখানি সময় দিতে হয়। একটা শারীরতাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে এর। ডেসমণ্ড মরিস তাঁর দ্য নেকেড্ এপ (ম্যাকগ্রহিল, ১৯৬৭) নামক গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন যে বাঁদরের বাচ্চার জন্মকালেই "তার মগজে পূর্ণবয়স্ক জীবের মগজের সত্তর ভাগ মাপ এসে গেছে। অবশিষ্ট ত্রিশ ভাগ দ্রুত ভরে যায় জীবনের প্রথম ছয় মাসে।...আমাদের প্রজাতিতে বরং উল্টোটা হয়। পূর্ণবয়স্ক মানবমস্তিষ্কের মাত্রই তেইশ শতাংশ পরিমাণ নিয়ে জন্ম নেয় মানবশিশু। প্রথম ছয় বৎসর কাল জুড়ে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে তারও। কিন্তু তেইশ বৎসর বয়সে না পৌঁছনো পর্যন্ত এই বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্যক সম্পূর্ণ হয় না।" মানুষের কল্পনাশক্তির ক্ষেত্রে এর প্রাসঙ্গিকতা এবং মূল্য কী অপরিসীম বলে বোঝানো শক্ত। বাল্য ও কৈশোরের প্রথম দিকেই মানুষের কৌতূহল সজীব থাকে সবচেয়ে বেশি কেননা ভাবনাচিন্তা ও ব্যবহারকে তখনো অভ্যাসের জড়তায় আড়ষ্ট করেনি, পৃথিবী তখনো নমনীয় লাগে যেখানে আমাদের কল্পনার অবাধ বিহার সম্ভব। নতুন ভাবনা যাতে শিকড় নামিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে পারে এমনি করে তখন মানবচেতনার জমি তৈরি।

আদিমমানুষের পরিবারবদ্ধ হয়ে ওঠার মূলে ছিল মানুষের এই বিধিনির্দিষ্ট দীর্ঘায়িত বাল্য এবং সংশ্লিষ্ট নানা প্রয়োজন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে কী অবস্থায় মানুষশিকারী প্রাণীতে পর্যবসিত হলো। স্বভাবতই এই শিকারীরা অন্যান্য জীবজন্তুর মতো দলেবলে বেরোত। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে মানুষদের প্রভেদ ছিল এই যে মেয়েদের এই শিকারীদলের বাইরে রাখা হতো। মানবশিশু জন্মকালে শরীর অনুপাতে অনেকটা বড়ো মাথা নিয়ে জন্মায়। এতে গর্ভ থেকে নিষ্ক্রমণের প্রক্রিয়া অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কঠিন ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। জন্মের পরে শিশুর যত্নের জন্য সময়ও লাগে দীর্ঘ। এ জন্যে পুরুষেরা যখন শিকারে যায় তখন মা ও শিশুর সুরক্ষার আবশ্যকতা থাকে। সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃষ্ট আবাসেই গড়েছিল পরিবারের কেন্দ্র। মানব সমাজে অপরিসীম গুরুত্বশীল প্রতিষ্ঠান পরিবারের পত্তন এই ভাবে হয়।

অনেকের ধারণা সমাজের আদিযুগে একপ্রকার সাম্য বলবৎ ছিল। এটা সম্ভবত সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রথমত, বয়স-ভিত্তিক এক স্বাভাবিক অসাম্য তো ছিলই। এই-যে মনুষ্য-প্রজাতিতে শিশুর বড়ো হতে এতখানি সময় লাগে এটা লক্ষণীয়। হয়ত এখন যত দীর্ঘকাল লাগে প্রাচীন কালে ঠিক ততখানি লাগত না তবু সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলতে যে-সময়টা লাগে তাতে পিতামাতার ওপরে সন্তানদের কতখানি নির্ভরশীল করে তোলে সেটা অনুধাবনযোগ্য। অসমান পদমর্যাদার প্রাথমিক ছাঁচটি ঢালাই হয়েছে পিতাপুত্র সম্বন্ধে। স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধকে ঠিক লক্ষণ মিলিয়ে বর্ণনা করা সহজ নয়। একটু আগেই বলা হয়েছে শিকারী মানুষদের সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থায় পুরুষ বাইরে যেত খাদ্য সংগ্রহে, শিশুপালিকা জননীরা থাকত ভিতরে। আক্ষরিক অর্থে সাম্যের ধারণার পূর্বশর্ত এই যে দুজন সমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক অর্থেই একে অন্যের বিকল্প হতে সক্ষম। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সেই ভাবে একে অপরের বিকল্প নয়, হতে পারে না। প্রত্যেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষই তা জানে। তাই আদিকাল থেকেই স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ক এক 'অঙ্গাঙ্গি'তায় সংহত হয়েছিল। সাম্য-অসাম্য দিয়ে এই সম্পর্কের সামগ্রিক রূপকে বিবৃত করা অসম্ভব। তবু যে-পরিমাণে স্ত্রীলোককে 'আর্থিক' অধীনতায় পুরুষের কাছে আবদ্ধ হতে হয়েছে সেই পরিমাণেই তাকে পুরুষের সমকক্ষ জ্ঞান করা যাবে না, এ কথা ঠিক।

আদি পরিবারকে মানব সমাজের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ বলে ভাবা সম্ভব। রুসো একে

সমাজের "প্রাচীনতম" এবং "একমাত্র স্বাভাবিক রূপ" বলে বর্ণনা করেছিলেন। যখন তিনি বলেছিলেন যে "সর্বস্রষ্টার হাতে থামলো সবই তখন ভালো, নামলো এসে মানুষের হাতে সবই মান হারালো", তখন ফরাসী দার্শনিকের মনে ছিলো ওই 'স্বাভাবিক' সমাজ আর প্রতিতুলনায় মানুষের পরবর্তী ইতিহাসের কথা। রুসোর এই ইঙ্গিতটিকে নিয়ে আর একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

হবস্ আদিম সমাজের জীবনকে জঘন্য, জান্তব এবং ক্ষণস্থায়ী বলে বর্ণনা করেছিলেন। এটা সম্ভব যে জীবন তখন ঐ রকমই ছিলো। কিন্তু আদিম পরিবারে বিশেষভাবে আকর্ষক যা ছিলো তা ওই পরিবারকে ধরে রাখার মতো অপর্যাপ্ত স্বাভাবিক মমতা। সন্তানদের প্রতি জননীর যে যত্ন, নরনারীর পরস্পর আকর্ষণ, শিশুদের একের অন্যের প্রতি এবং জনকজননীর প্রতি স্নেহপ্রীতির বোধের যে বন্ধন এ সবই এসেছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে, কোনো বাধ্যবাধকতা থেকে নয়। ব্যতিক্রম হয়ত কোথাও-কোথাও ছিলো। কিন্তু প্রধানত যদি ঘটনা এমন না হতো তবে সাধারণ অর্থে প্রতিকূল এবং "জান্তব" পরিবেশে আদিম মানব পরিবার টিকে থাকতে পারত না।

রুসোর মতে "বিবেক" এক স্বর্গীয় প্রেরণা, সমাজের আদি স্তরে এর খোঁজ মেলে। আদিম পরিবারগুলি শুধু যে শিশুপালন কেন্দ্র ছিল তাই নয়, মানুষের নীতিবোধ একটা রূপ পরিগ্রহ করে বেড়ে উঠেছিল ঐ পরিবারের ছাঁচ পাওয়া গিয়েছিল বলে। আজও দেখা যায় উঁচুদরের নীতিকথা বোঝাবার প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে সহজ পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতে এনে কথাগুলিকে বোঝানো। "স্বাভাবিক" সহানুভূতির সাহায্যে খুব বড়ো মানবগোষ্ঠীকে একত্র রাখা যায় না। এই জন্যই বেশ কয়েকটি পরিবার মিলে যেই উপজাতি হলো, উপজাতিসমূহ মিলে হলো বৃহত্তর মানব সম্প্রদায়, তখন সমস্যাটা জটিল হয়ে উঠল। একটি পরিবারের ভিতরকার "সার্বিক কল্যাণ" প্রত্যক্ষ করা সম্ভব এবং সাধারণত সকলেই সেই কল্যাণবোধকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে ব্যাপারটি তেমন পরিচ্ছন্ন থাকে না। আমাদের বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়, মুখে বলি হরি কাজে অন্য করি, ভণ্ডামি দেখা দেয়। রুসোর ধ্যানের যে প্রাচীন সমাজ, সেখানে বিবেক সহজাত প্রত্যক্ষে পায় সার্বিক কল্যাণবোধ, স্বাভাবিক ভাবেই তাই স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বিবেক। আজকের সমাজ যে ভাবে তৈরী তাতে এ সব কিছুই আর তেমন নেই। আদি সমাজের এই বিবরণ অবশ্য এক অর্থে আদর্শের মাপে-মাপে সাজিয়ে তোলা ছবি এবং খুঁজলে মানসিক দ্বন্দ্ববিরোধের মূল প্রকৃতির রাজত্বেও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আসল প্রশ্ন তো সত্যিই এটা নয় যে রুসোর আদিম সমাজ বিষয়ে এই স্বপ্নকল্পনার ঐতিহাসিক যাথার্থ্য আছে কি না। আদত কথা হচ্ছে এক আদর্শ সমাজের মূল শর্তগুলিকে তিনি এমন অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে বিবৃত করেছিলেন যাতে তার সাহায্যেই আধুনিক সমাজের মৌলিক সমস্যার চেহারাটা ফুটে ওঠে।

কোঁদরসে থেকে স্যাঁ-সিমঁ হয়ে মার্ক্স পর্যন্ত যত সারি সারি দর্শনবেত্তা প্রগতির ভাবনা-ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, বেকন যাঁদের বিখ্যাত পূর্বসূরী, এঁরা সকলেই মূলত নাগরিক যুক্তিবাদী সংস্কৃতির বুদ্ধিজীবী আবহের মানুষ। ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াতে গড়ে-ওঠা এই যুক্তিবাদী মেজাজের ভিতরে ঐতিহ্যবিরোধী সমালোচনা নিহিত ছিল। কী অর্থনীতিতে, কী সংস্কৃতিতে, শিল্পোদ্যোগ যে প্রগতিই নিয়ে আসছে এ বিষয়ে স্যাঁ-সিমঁ এবং মার্ক্স উভয়েরই পরিচ্ছন্ন প্রত্যয় ছিল। এরই পাশাপাশি ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি নানা ভাবনাবিদদের ধ্যানধারণায় গড়ে উঠেছিল। এর দৃষ্টান্ত মেলে রুসো বা

রাস্কিনের মতো সম্পূর্ণ ভিন্‌ভাবনার চিন্তাবিদের বক্তব্যে। রুসো আদর্শ সমাজের রূপ দেখতে পেয়েছিলেন প্রকৃতির রাজত্বে। এইরকম ভাবা যায় যে মার্ক্সও তা-ই দেখেছিলেন শুধু রূপায়ণে "প্রকৃতির রাজত্বের" বিকল্প হয়ে যায় "আদিম সাম্যবাদ"। কিন্তু একটা গুরুতর প্রভেদ লক্ষণীয়। "আদিম সাম্যবাদে" মার্ক্স সেই আদর্শ সমাজের কাঠামোটি পেয়েছিলেন যা ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রেণী বিভাজন এবং শোষণ থেকে মুক্ত। অপরদিকে আদিম সমাজ রুসোর কাছে এনেছিল অন্য এক মূল্যবান বার্তা। মানুষের প্রকৃতির আর মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনপ্রণালীর ভিতরে এক মৌল সামঞ্জস্যের প্রতীক রূপে তিনি আদিম সমাজকে দেখেছিলেন।

এই প্রভেদ অনেকের কাছে নিরর্থক মনে হবে। কেননা তাঁদের মতে চিরন্তন মানবস্বভাব বলে কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপারটা ওভাবে দেখা স্পষ্টতই ভুল। মানসিক অসুস্থতা বলে একটা জিনিস আছে যা দেখা দেয় মন এবং পরিবেশের গরমিলে। মানবস্বভাবের শিকড় ছড়িয়েছে হাজার হাজার বৎসর জুড়ে। কতকগুলি মনের ঝোঁক এবং "মৌলিক প্রয়োজন" রয়েছে সমাজ এবং মানুষের সুখের দুরপনেয় ক্ষতি না ঘটিয়ে যাদের উপেক্ষা করা যায় না। মনের গভীরে স্পন্দিত প্রতিটি স্থায়ী ক্লেশের ভিতর দিয়ে একটুখানি সহনীয়, যেন বা খানিকটা উন্নত স্তরের সামঞ্জস্যের জন্য আত্মিক আর্তিই প্রকাশ পায়। এমনি ভাবে বিবর্তনের নিরন্তর সংগ্রামের পথেই মানব মনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। যাঁরা শিল্পোদ্যোগী এবং যুক্তিবাদী সংস্কৃতির মুখপাত্র আর যাঁরা শুদ্ধ প্রকৃতির জয়গান গাইছেন এই উভয় তরফের কাছেই খানিক খানিক সত্য আছে, এখন প্রয়োজন মানব মন ও সমাজের ঊর্ধ্বতন স্তরে এই দুইয়ের মিলন ঘটানো।

॥ ৩ ॥

যুক্তির বিকাশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান

কোনো কোনো ইতিহাসদার্শনিক মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের ভিতরে যুক্তির ক্রমবিকাশের লক্ষণ দেখতে পান। এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই যে ইতিহাসে অনেক কিছুতেই যুক্তির উপস্থিতি সূচিত, নিজের সৃষ্টির সঙ্গে নিজেই যুদ্ধরত আংশিক যুক্তি কখনো-কখনো সাময়িক হার মেনেও বাধা ঠেলে এগিয়েছে। মনুষ্যসমাজ নিয়ে চর্চা যে বিদ্যার্থীর সে অবশ্য জানে যে যুক্তি বলে যে গণ রয়েছে তার প্রজাতি অনেকগুলি। প্রতিটি প্রজাতিই নিজস্ব সমস্যা সৃষ্টি করতে পটু। সে সমস্যার উত্তরণ কেবল উচ্চতর যুক্তির সাহায্যেই সম্ভব। আধুনিক যুগের মেজাজ যুক্তিবাদী বলে খ্যাত। এই যুক্তিধর্মিতা এক বিশেষ ধরনের। এ দিয়ে কী গড়া গেছে বা গড়তে সাহায্য হয়েছে তা বিচার করে দেখলে এর ধরনটি ঠিক বোঝা যাবে।

ইতিহাসের দিকে ফিরে চাইলে এই বিষয়ে আমরা সঠিক পরিপ্রেক্ষিত পেতে পারি। আমাদের মুখ্য আগ্রহ এইটা দেখার যে বৃহৎ সামাজিক সংগঠনের এবং সাংগঠনিকতার ভিতর দিয়ে যুক্তি কী ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু সাংগঠনিক প্রকাশের ক্ষেত্র পেরিয়েও যাতে আধুনিক যুগের যুক্তির আন্তরবৈশিষ্ট্যগুলি কী সেটা ধরতে পারি তার জন্য

আমাদের সচেষ্ট থাকা চাই।

প্রথমেই, মূল ধরনের ভিত্তিতে সামাজিক সংগঠনকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যায়। এর ভিতরে কয়েকটির সাংগঠনিক ধরন বা ছাঁচ এসেছে পরিবারের আদর্শ থেকে। এগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বৈপরীত্য লক্ষণীয়। এই দুই ছাঁদের মূল বৈসাদৃশ্য এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ভিতরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন প্রতিটি ব্যক্তিই স্বার্থ এবং আগ্রহ নিয়ে স্বতন্ত্র, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে আছে। পরিবারধর্মী সংগঠনে কিন্তু তা হয় না। গোটা পরিবার বা আত্মীয় গোষ্ঠীর গভীরতর স্বার্থ একই। তাই পরিবারের একজন সম্মানিত বলে সবাই যেন সম্মানিত হয়, একজনের ক্ষতিতে গোটা পরিবার ক্ষতি অনুভব করে। বাণিজ্যিক সংগঠনে ব্যাপারটা অনেকটা অন্যরকম। একজনের লাভ সেখানে সকলের লাভ বলে পরিগণিত নয়, একজনের ক্ষতিতে সকলের ক্ষতিবোধ নেই। বরং কতকটা উল্টো ; একজনের লাভে অন্যদের যেন খানিক ক্ষতি হলো মনে করা হয়। কেননা বাকিরা যদি একেবারে পূর্বের অবস্থাতেই রয়ে যায় তবু যে-লাভবান হলো তার তুলনায় এরা দীন বোধ করে। এই দুই ভিন্ন ধারার সংগঠনের সঙ্গে এখনকার দিনের প্রধান যে প্রতিষ্ঠানিকতার রূপ, আমলাতন্ত্র, এইটের কথাও খেয়াল রাখা দরকার। একটু পরে তার আলোচনায় আসছি। সর্বশেষে চতুর্থ এক ধরনের সংগঠনের কথা বলা যায়। যথার্থ উপযোগী নামের অভাবে একে বান্ধবসমাজ বা সমবায়সমিতি নামে অভিহিত করতে পারি। যাই হোক, আপাতত আমরা প্রথম তিনটি ধরনকে নিয়েই আলোচনা করবো। এখানে এই কথাটা বলে নেওয়া ভালো যে এই ধরনগুলি প্রায়ই বিশুদ্ধ রূপে থাকে না, মিশ্র ধাঁচে দাঁড়িয়ে যায়। তা ছাড়াও, একটা ধরনে শুরু হয়ে পরে অন্য ধরন এসে গেল এমন ঘটনাও দুর্লভ নয়।

পরিবার বা আত্মীয় গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যথার্থ অথবা কাল্পনিক রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে। আমরা যাকে "পরিবারধর্মী সংগঠন" বলছি তার ভিত্তিতে কিন্তু এরকম বন্ধন অনাবশ্যক। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জাতিকে তাই পরিবারধর্মী গোষ্ঠী বলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন, পরিবারের কোনো সদস্যের সম্মানে সমগ্র পরিবার যেমন সম্মানিত হয় গোটা জাতি তেমনি ভাবেই সম্মানিত বোধ করেছিল। এই সব ক্ষেত্রে সার্থকতা বা ব্যর্থতা, জয়-পরাজয়, সম্মিলিত উল্লাস বা শোকের দ্বারা চিহ্নিত হয়। এই যে মনের মিলের ফলে সংহতি, এটি নানা উপাদানে তৈরি হতে পারে। একটি উপাদান হলো এক ভাষা ; এক ধর্ম তেমনি আরেক উপাদান। সাধারণভাবে দেখা যায় এক সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ওয়ারিশ হলেই এই বোধ আসা সম্ভব।

প্রথম রাজ্যবিস্তার এবং প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলি সংগঠিত করে তোলবার সময়ে পরিবারধর্মী এই ধাঁচটির সাহসিক বিস্তারের প্রয়াস চলে। এই সব রাজ্য ও সাম্রাজ্য অগণিত ছোট ছোট গোষ্ঠীকে একত্র করছিল। বৃহত্তর এই সমাজের তলে খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে একত্র করে বিরাজিত ছিল সামরিক শক্তির লৌহকাঠামো। কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে যে-সংহতি আবশ্যক, শুধু গায়ের জোরে বিজয়ের সম্যক ফল সেভাবে সংহত করা যায় না। কতকটা ভিন্ন ধরনের বল-ও লাগে। সম্রাটকে তাই অবতীর্ণ হতে হতো বৃহৎ পরিবারের কর্তার ভূমিকায়।

ইতিহাসের গতিতে এই যে নতুন দায়িত্ব এলো একে বইবার জন্য ধর্মকে বিশেষভাবে সংগঠিত করা হলো। প্রয়োজন যে-রকম ছিল তা কেবল বহু দেবতার পূজাপ্রার্থনা থেকে একেশ্বরবাদে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার আন্দোলনে মিটিয়ে দেবার মতো নয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে তাই এর রকমফের হলো। প্রধানত প্রয়োজন যা ছিল তা কতকটা এই যে, কেন্দ্রে বিরাজমান অখণ্ড ঐক্যবোধের সঙ্গেই নীচের তলার ধারে কাছে বহু বৈচিত্র্যের নির্বিরোধ সহাবস্থান স্বীকৃতি পাক। কী ঈশ্বর, কী সামাজিক রীতিনীতিবোধ সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত শর্ত ছিল এই-ই এবং এই প্রয়োজন নানা রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। একটা স্তরে সাম্রাজ্যের পক্ষে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ঐক্যের প্রতীক খুবই আবশ্যক। কিন্তু অন্যান্য স্তরের বৈচিত্র্য ও ঐতিহাসিক ভিন্নতার সঙ্গে এই অখণ্ডতা বোধের একটা সমঝোতাও কম আবশ্যক নয়। পরিবেশের নানা আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার ফলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই দুইয়ের পরস্পর সঙ্গতির আকার ও মাত্রায় প্রভেদ ঘটেছে।

মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যে যে ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় সাধারণ ভাবে সকলে সামন্ততন্ত্র বলে একে অভিহিত করে থাকেন। এর ভিতরে কিন্তু ঠিক কী প্রকরণে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকারান্তে অনুগত শাসকেরা স্বাধিকার এবং দাপটের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন চালাবার অনুমতি পাবেন তার নানারকম স্থানীয় রূপ ছিল। এই ভিন্নতার মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির ছিল নিজস্ব রীতিনীতি ও সংস্কৃতি, ছিল স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তি ও অভঙ্গুর আত্মস্বাতন্ত্র্য বোধ। এদের তুলনায়, যতই কেন না অঙ্গরাজ্যগুলিকে মিলিয়ে পরিবারতন্ত্রী সামগ্রিকতায় তাদের গ্রথিত করার চেষ্টা চলুক, সাম্রাজ্য এক কৃত্রিম রাজনৈতিক নির্মিতি মাত্র। সামগ্রিক অবয়ব হিসেবে যে সীমারেখা দ্বারা সাম্রাজ্য চিহ্নিত সেটি তো ক্ষণভঙ্গুর ; ভবিষ্যদ্বাণীর পরোয়াবিহীন কোনো পরিবর্তন সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানে এসে ক্ষমতার রদবদল ঘটালেই এই সীমানা রেখার পরিবর্তন ঘটে যায়। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসকরা অকারণে সাম্রাজ্যের ছোট ছোট স্থানীয় সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর ভিতরে শত্রুতা তৈরি করবেন কেন ? প্রকৃত প্রস্তাবে সম্রাট এবং তাঁর শাসকবর্গের প্রধান কাজ ছিল স্থানীয় অঙ্গরাজ্য থেকে করসংগ্রহ। সেই কাজ যতক্ষণ নির্বিবাদে চলছে ততক্ষণ সকলের কাছেই সদাশয় অপ্রতিবন্ধকতার নীতি বাঞ্ছনীয় হওয়ার কথা।

অতঃপর আলোচ্য রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যদি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ঝোঁককে সামান্য লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় তার ব্যাখ্যা সহজবোধ্য। কিন্তু আত্যন্তিক কেন্দ্রীকরণের দিকে বিপরীত একরকম ঝোঁকও এই ব্যবস্থায় দেখা গিয়েছিল, বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে। সাধারণত উল্লিখিত সামন্ততন্ত্র বা "অধিরাজ"তন্ত্র ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণাধীন শাসকদের শুধু যে আইন সংরক্ষণ শাসন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কৃত্যে প্রভূত ক্ষমতার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তাই নয়, এই ক্ষমতাগুলি বংশানুক্রমে শাসকেরা ভোগ করতে পারতেন। এর ফলে নিজের ক্ষমতাকে এই সব শাসক এতদূর অপ্রতিহত করে তুলতে পারতেন যে এমনকি, বিশেষ করে সম্রাট যখন বিপন্ন তখন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করারও শক্তি পেয়ে যেতেন। এতে একটা উভয় সংকট দেখা দেয়। একদিকে স্থানীয় শাসকদের ভিতরে ক্ষমতার বিস্তার আবশ্যক। অন্যদিকে স্থানীয় শাসকেরা যার যার এলাকায় প্রভাব বিস্তার করুন এই অনুমোদন দিলে সম্রাট নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনেন। সমস্যাটি কঠিন। কেন্দ্রীয় শক্তিবৃদ্ধির ঝোঁক অংশত এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়েই বেড়ে যায়। সমস্যার একটা চরম সমাধান খুঁজে নিয়ে তার ফলাফল কী দাঁড়াতে পারে সেটা এইখানে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

সম্রাটের দিক থেকে তাঁর অধীনস্থ শাসক (রাজা কিংবা সামন্ত প্রভু নামে যাঁর পরিচয়) হচ্ছেন মুখ্যত একজন করসংগ্রাহক। বিচার ব্যবস্থা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভারও তাঁকেই দিয়ে দেওয়া গেছে। সমস্যাটা যদি এই হয়ে থাকে যে, কী করে তাঁকে এ সমস্ত

কাজই করতে দেওয়া যায় অথচ নির্দিষ্ট কর্মস্থলে গভীর শিকড় চালিয়ে যাতে তিনি বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী না হয়ে ওঠেন সে বিষয়েও রাশ টেনে রাখা যায়, তাহলে এর সবচেয়ে সোজা সমাধান হচ্ছে এই শাসককে এক গণ্যমান্য কিন্তু যাঁকে বদলি করা চলে এইরকম পদাধিকারিকে পরিণত করা। এর সরল অর্থ দাঁড়ায় কোনো এক নামে এবং পদ্ধতিতে উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক পদের সৃষ্টি যাঁদের নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের হাতেই থাকবে। অর্থাৎ, এই হলো আমলাতন্ত্রের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভিক পর্ব। একবার এই পন্থা নিলেই আনুষঙ্গিক বহু ব্যবস্থা নৈয়ায়িক অনিবার্যতায় চলে আসে। যেমন, কেন্দ্রীয় প্রশাসনে নিয়োগ কী ভাবে হবে? চীনাদের প্রাচীন ব্যবস্থামতে যে পরীক্ষাবিধির প্রবর্তন হয়েছিল সেটাই নিয়োগবিধির সবচেয়ে যুক্তিসম্মত বন্দোবস্ত বলে মনে হয়। এই ব্যবস্থায় শুধু যে দেশের আইন এবং ঐতিহ্য বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান বা প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত পদস্থ ব্যক্তিদের রীতিতরিবৎ বিষয়ে চেতনা এবং তদনুযায়ী আচরণ ইত্যাদি বাঞ্ছনীয় যোগ্যতাকে ঠিকমত পরখ করে পুরস্কৃত করার বা এগুলিতে উৎসাহ দান করার সুযোগ ছিল তাই নয়। এই বিধির বলে বহু পরিমাণে জাতি বা সম্প্রদায় জনিত ভেদাভেদ নিরপেক্ষ হতো এই বাছাই। এটা বড়ো কম সুবিধা নয়। অগণিত উপজাতির সমাহারে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি। সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থেই দেখা দরকার যে এইসব "উপজাতি" বা জাতি কোনোভাবে উচ্চতম প্রশাসনের সঙ্গে সমার্থক না হয়ে ওঠে। ওরকম এক বিশেষ গোষ্ঠীর একান্ত প্রাধান্যই সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশে বিরূপতা জাগিয়ে শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের ভাঙন ডেকে আনে। যে-সব জায়গায় সাম্রাজ্যের ভিতরে পূর্বোল্লিখিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হয়নি সেখানে প্রাজ্ঞ সম্রাট মাত্রেই সংযুক্ত প্রভুগোষ্ঠী গড়ে তুলতে এবং ব্যাপ্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন যাতে জনসাধারণের কাছে, বৃহত্তর সমাজের কাছে, সেই প্রভুগোষ্ঠী গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

এর কতকগুলি ফল দেখা দিয়েছিল। বহু বৈচিত্র্য ছিল স্থানীয় সংস্কৃতিগুলির স্বভাবী বৈশিষ্ট্য। উদাহরণত বহু ভাষা এবং অসংখ্য বাক্‌রীতির উল্লেখ করা যায়। দেশের বিভিন্ন অংশে বর্ণ থেকে বর্ণে এবং প্রদেশ থেকে প্রদেশে আচরণীয় রীতিতরিবতের প্রভেদও ছিল বিস্তর। কেন্দ্রীয় প্রশাসকেরা কিন্তু মোটামুটি একভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারের বাহক হয়ে ওঠেন। নিপুণ কর্মনির্বাহের স্বার্থে অপেক্ষাকৃত সমভাবের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজনও ছিল। এখন এই ভাষা এবং সংস্কৃতিই যেহেতু প্রশাসনের উচ্চতম মর্যাদাবান মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উদ্যমী মানুষ সামাজিক সম্মানের প্রত্যাশায় এইগুলি আয়ত্ত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। প্রশাসন ও সংস্কৃতিতে কেন্দ্রীয়করণের ঝোঁক এলো এইভাবে। আজ পর্যন্ত সমাজে অন্যতম মূল সমস্যা হচ্ছে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে রাজসভা ও মহানগরীর পরিশীলিত সংস্কৃতির সম্যক সম্বন্ধবিধান।

উপরে বিবৃত হয়েছে আমলাতন্ত্রের সূত্রপাত এবং প্রাথমিক পরিবেশের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ঐতিহ্যসম্মত স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় আমলাতন্ত্র যুক্তিবাদের সূত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী। ঐতিহ্যবাদী সমাজে মানুষের মর্যাদার বনিয়াদ বহুলাংশে নির্ধারিত ছিল দৈববৎ জন্মসূত্রে পাওয়া গোষ্ঠী পরিচয়ের ভিত্তিতে। বর্ণভেদ প্রথায় এই ভিত্তি বিন্যাস প্রশ্নাতীতভাবে স্পষ্ট। ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বিশেষভাবে এই প্রথা সংযুক্ত থাকলেও পৃথিবীর সর্বত্রই প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত। আমলাতন্ত্রে ব্যক্তির অধিকার নির্দিষ্ট হলো শাসন ব্যবস্থায় তার পদাধিকার এবং সেখানে তাকে কী কাজ করতে হয় তার দ্বারা। অর্থাৎ

প্রকৃত অধিকারগুলি গিয়ে বর্তাল ব্যক্তিতে নয় পদে। যে কেউ, 'লর্ড' কিংবা 'কমনার', ব্রাহ্মণ বা শূদ্র যেই হোক, কোনো সংগঠনে সচিব পদ পেলে সেই কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ক'টি অধিকারেই তার দাবি জন্মাবে। তা ছাড়া, আমলাতন্ত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা নিয়ম অনুসারে, খামখেয়ালে নয়। কার্যক্ষেত্রে এই নিয়ম থেকে অবশ্য ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে কিন্তু তত্ত্বগত চেহারাটা অন্তত এই। এ জন্য ব্যতিক্রম ঘটলে যে বিশেষ নিয়ম ভঙ্গ করে ঘটনাটি হয়েছে তার ভিত্তিতে ওই ব্যতিক্রমের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলাও সম্ভব। সর্বশেষে, এই সব পদ-সংশ্লিষ্ট অধিকার এবং সংস্থাপিত রীতি-নিয়ন্ত্রক আইনকানুনের বৈধতা দৈবশক্তি-নির্ভর নয়, যুক্তিবিচারের উপরই এদের বনিয়াদ এবং প্রায়োগিক উপযোগিতার খাতিরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনাদি সম্ভব বলে মনে করা হয়। আমলাতন্ত্রের কেঠো এবং বেঢপ চালচলন আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু ওইরকম চালচলনেই প্রতিষ্ঠা করা গেছে সর্বশক্তিমান সম্রাটের খেয়ালখুশির বদলে আইনের রাজত্ব। ঠিকমত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সংগঠিত যৌক্তিকতা এবং আমলাতন্ত্রের যোগ লক্ষে না-পড়েই যায় না।

আজকের দিনে বৃহৎ সমাজে গণতন্ত্র বলতে আমরা যা বুঝি তা আমলাতন্ত্র ছাড়া কার্যকর হতো না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত এবং তার সাময়িক রদবদলকে প্রতিফলিত করে রাজনৈতিক দলগুলি, এইরকমই করার কথা। সাধারণ নীতি প্রণীত হবে পরিবর্তনশীল জনমতের সঙ্গে তাল রেখে, নীতি প্রণয়নের কাঠামো অনড় কিংবা খামখেয়ালী হলে চলবে না। পরিবর্তনের সঙ্গে প্রবহমানতার যোগ-সম্পাদক-যন্ত্রের কাজটুকু করে দেয় আমলাযন্ত্র। দৃশ্যত তুল্যমূল্য আনুগত্য সহকারে আমলারা পুরোনো কানুন বলবৎ থাকাকালীন সেগুলিকে মান্য করেন আবার আইনত সমুপযুক্ত আধিকারিক নতুন নিয়মরীতি প্রণয় করা মাত্র সেগুলিকে চালু করে দেন। আদর্শ আমলাতন্ত্র হচ্ছে নিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক, দক্ষ অথচ নিয়মকানুন বিষয়ে সতর্ক। এতে প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের সৃষ্ট যন্ত্রের চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য, সৃজনধর্মী মানুষ স্বয়ং এখানে নেই। যন্ত্রের মতই এখানে মূর্ত যৌক্তিকতা। কার্যক্ষেত্রে যে এই যন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু একেবারে ব্যাপক পুনর্গঠন না হলে আজকের সংগঠিত সমাজে আমলাতন্ত্র ব্যতিরেকে কাজ চালানোর বিপদ আছে। চালাতে গেলে হয় বিশৃঙ্খলা এসে ভাঙচুর ঘটিয়ে দেবে আর নয়তো এক স্বেচ্ছাচারী শাসক সর্বেসর্বা হয়ে বসবে এর মাথায়। এই সর্বেসর্বা শাসক কিন্তু আবারও আমলাতন্ত্র তৈরি করতে বাধ্য হবে তবে সেটা হবে আদর্শ ধরনের চেয়ে ভিন্ন ছাঁচে।

আধুনিক যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে ধর্ম থেকে রাজনীতির মুক্তিতে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় রাজারা নির্ভর করতেন পুরাণ কথার উপরে যাতে জনমানসে ঐশীবলে তাঁদের শাসন এবং বৈধতাকে কায়েম করে তোলা যায়। এর দৃষ্টান্ত পাই ভারত এবং অন্যত্র পৌরাণিক বংশতালিকার ব্যাপক ব্যবহারে। এ কথা বলা হচ্ছে না যে এই বংশতালিকা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। বরং উল্টোই, কিন্তু ইতিহাসে যেটুকু ঘাটতি তা পূরণ করার ভার ছিলো ঐতিহ্যের দোহাইটানা কল্পনা দিয়ে। ঐহিকতা বোধের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো প্রথায় এইভাবে আর কাজ চলছিল না কেননা লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। প্লেটোর পরামর্শ ছিল, অনৃত জেনেও কিছু পৌরাণিক কল্পকাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করো। কিন্তু সে ছিল একদিন যখন লোকের বিশ্বাস ছিল এ সব পুরাণ কথায়।

রাজনীতির ঐহিকতাবিধানের কিছু কিছু পূর্বাভাস প্রাচীন কালেও মেলে। যথা কৌটিল্যে অনেকখানি ঐহিকবোধ রয়েছে। কিন্তু আমানের কথা হচ্ছে যুগের মেজাজ নিয়ে। য়ুরোপে মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) পরিচিত সকল তাত্ত্বিকদের ভিতরে এই নতুন মেজাজের প্রারম্ভ প্রতীক হিসেবে বিশেষভাবে গণ্য। নবযুগের প্রবক্তা ফ্রান্সিস বেকন স্বয়ং তাঁর **দি অ্যাডভানসমেন্ট অব লার্নিং** বইতে লিখেছিলেন : "মেকিয়াভেলি এবং অন্যান্য যাঁরা মানুষের কী করা উচিত তা নিয়ে মানুষ কী করে তাই লিখেছেন তাঁদের কাছে আমরা ঋণী।" মেকিয়াভেলি নিজে কিন্তু ওঁর মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলেন যুবরাজ অথবা সাধারণ রাজপুরুষদের কী করা উচিত। **দ্য প্রিন্স** গ্রন্থে মেকিয়াভেলি বললেন, "বিশ্বাস রক্ষা করা যদি নিজ স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে বিচক্ষণ শাসকের তেমন বিশ্বাস রক্ষা করা উচিত নয়।... সকল মানুষ যদি সৎ হতো এই অনুশাসন সদানুশাসন হতো না। কিন্তু মানুষ মন্দ, তারা তোমার বিশ্বাস রাখবে না কাজেই তাদের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে তুমি বাধ্য নও।" এই শিক্ষা নিজের প্রতিবেশীর প্রতি উচিত ব্যবহার বিষয়ে খ্রীষ্টীয় নির্দেশের পরিপন্থী। কিন্তু নবযুগে একেই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল। বিস্তারিত প্রমাণপত্র না দিয়েও নির্ভয়েই বলা যায় যে কূটনীতি ও দলীয় রাজনীতি, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার যুগে, মেকিয়াভেলির বদনের সঙ্গে মিল রেখেই চলেছে।

এইবারে রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রশ্ন ছেড়ে সমাজের আর্থনীতিক এবং বিশেষত বাণিজ্যিক সংগঠন এবং এ-সবের পরিণাম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে দেখা যাক।

এটি তুচ্ছ ব্যাপার নয় যে 'ওইকনমিক' গ্রীক মূল থেকে ইকনমিকস্ কথাটি এসেছে আর ওই গ্রীক মূলের অর্থ গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা। প্রাচীনকালে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিক ভিত্তিভূমি ছিল ঘরগৃহস্থালী। পরিবারের ব্যবহারের জন্য এবং পরিবারের চৌহদ্দির ভিতরেই প্রধানত উৎপাদন হতো। প্রান্তিক, অবশিষ্ট প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা ছিল অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাকার ব্যবহার ছিল নিষ্প্রয়োজন। শহর গড়ে ওঠার এবং বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জগতের এই বিন্যাস বদলে যায় বটে, পুরোনো প্রতিন্যাস কিন্তু অপরিবর্তিত রয়ে গেল। জিনিস কিনে নিয়ে লাভের উদ্দেশ্যে আবার সেই দ্রব্যসামগ্রী ফিরে বেচে দেওয়ার কাজে টাকার ব্যবহার কিংবা টাকা বাড়ানোর জন্য টাকার ব্যবহার অ্যারিস্টট্‌ল্-তুল্য মহৎ গ্রীক দার্শনিকদের কাছে "অস্বাভাবিক" এবং নিন্দনীয় কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছিল।

কালক্রমে এই "অস্বাভাবিক" কর্মই প্রাধান্য পেয়ে যায় সবচেয়ে বেশী। পুরোনো কালের গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য উৎপাদন এখন বাজারমুখী হয়েছে কেননা বাণিজ্য এখন সম্প্রসারিত। বাণিজ্যিক বিস্তারের বহু সুদূরপ্রসারী ফল দেখা গেছে যার অল্প কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। বাজারের জন্য উৎপন্ন কথাটির অর্থ এই যে পণ্যের উৎপাদন হচ্ছে সেই সব ভোক্তাদের জন্য যাদের সঙ্গে প্রায় ক্ষেত্রেই উৎপাদকের কোনো যোগ প্রত্যক্ষ ভাবে নেই। ভোক্তা তথা ক্রেতা এবং উৎপাদকের ভিতরে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে বলে কোন পণ্যের কদর বা চাহিদা কেমন সে কথা বণিকেরা যতখানি জানে, উৎপাদক নিজে ততখানি জানে না। এতে দ্রব্যসামগ্রী যোগান যারা দেয় সেই কারিগরেরা নিজ রুচি এবং প্রবণতা অনুসারে শিল্পীর মতো দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত না করে বণিকদের ফরমায়েসী মালের যোগান দিতে উত্তরোত্তর মনোযোগী হলো। বণিকদের ওপর তাদের নির্ভরতা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল।

প্রথম সংযোগ ও সংগ্রহের আকারে "যোগানদারী ব্যবস্থা"য় এই যে নির্ভরতা ছিল, পরে কারখানার আবির্ভাবে তা জোরালো হয়ে ওঠে। বাজারমুখী উৎপাদনের একটা বড়ো সুবিধা আছে। পরিবার ছোট এবং তার ভোগ্যসামগ্রীর চাহিদা সীমাবদ্ধ। বাজার বেড়ে উঠবার সম্ভাবনা অপরিসীম। বৃহদায়তন শিল্পের বনিয়াদ গড়ে দিলো বাজারেই। কারখানা আসায় দুটো ব্যাপারে নিশ্চয়তা আসে : উৎপন্ন ভোগ্যসামগ্রীর একই সমমান নির্ধারণ হবে আরো বেশী ; উৎপাদনের কাজে শ্রমবিভাজনও আরো বেশী হবে। "যোগানদারী ব্যবস্থা"র সময় থেকেই কারিগরেরা বণিকদের উপরে নির্ভরশীল, তবু এতদিন তারা একটা গোটা জিনিস গড়ে তুলছিল। কারখানার ক্রমবর্ধিত শ্রমবিভাজনে কারিগর এখন দ্রব্যসামগ্রীর খণ্ডাংশমাত্র উৎপাদনে রত রইল। কথাটাকে এভাবে বলা যায় যে যত ছোট ছোট কাজের সমাহারে উৎপন্ন হয় একটি সামগ্রী, তার একটিমাত্র কাজ হলো এখন একজন শ্রমিকের কৃত্য। এই খুচরো কাজটুকু যান্ত্রিক। কাজেই কালক্রমে যন্ত্র এসে শ্রমিকের স্থান নেবে এ সম্ভাবনাও দেখা দিলো। উৎপাদনকে যান্ত্রিক করে তুলতে সাহায্য করেছে শ্রমবিভাজন এই কথা অ্যাডাম স্মিথ জানতেন। উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধির নিরিখে একে এক বিরাট অগ্রগতি বলতে হয়। আবার অন্য দিক থেকে মানুষের শ্রমের অ-মানবিকীকরণ ঘটে গেল এভাবেই।

দূরের বাজারের সঙ্গে উৎপাদন যুক্ত হয়ে যাওয়ার পরবর্তী প্রক্রিয়া এক আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ শৃঙ্খলায় নিজ পথে এগোতে থাকে। এখানে একটিমাত্র সামগ্রী তথা পণ্য কিংবা একটিমাত্র বাজারের উপর নির্ভরতা কিছু দূর যাওয়ার পরে কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যে-কোনো একটিমাত্র সামগ্রীর জন্য একটি বাজারের চাহিদা সীমাবদ্ধ হবেই। সেই নির্ধারিত সীমার পরে একই সামগ্রী অধিক পরিমাণে বিপণনের জন্য গেলে বাজারে দর পড়ে যায়। প্রস্তুতকারককে তখন লাভে ওই সামগ্রী বিক্রয় করবার জন্য নতুন বাজার খুঁজতে হয়। অন্যদিকে বৃহদায়তন শিল্পে আয়তন-আনুপাতিক-ব্যয় বিষয়ে নির্দিষ্ট সীমার কথাও সকলেই জানেন। উৎপাদনী ব্যয়কে একটা সীমা পর্যন্ত "সর্বোত্তম" সীমা হিসেবে ধরা যায় যখন প্রতি খেপে একই হারে কিংবা ক্রমান্বিত স্বল্পতর হারে ব্যয়কে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে, যার পরে আর সেটি সম্ভব হয় না। সাদা কথায় এর নির্গলিতার্থ এই যে কোনো একটি শিল্পের মাত্রাহীন বিস্তার লাভজনক নয়। শিল্পোদ্যোগে বৈচিত্র্য থাকায় আরো নানা সুবিধা রয়েছে। এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখলে ঝুঁকি বাড়ে। তাছাড়া বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ অর্থনীতিতে প্রতিটি উৎপাদনের ধারা অন্যগুলিকে পুষ্টি যোগায়। এই আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছু "বাহ্য" আয়তনানুপাতিক ব্যয়সংকোচ সম্ভব হয়। কেননা কতকগুলি কৃত্যক আছে নানা শিল্পের যৌথ সেবায় লাগতে যারা সক্ষম। এই সব কৃত্যক কিছু-বা চোখে দেখা যায়, কিছু থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু এদেরই কাজে লাগাতে পারে বলে দূর বাজারে নিবদ্ধদৃষ্টি আর্থনীতক ব্যবস্থা ক্রমাগত শিল্পপণ্যের বৈচিত্র্যসাধনে এবং বিদেশী বিপণির ব্যাপ্তি ও সংখ্যা বিস্তারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে যে পথের শুরু সেটি এইভাবে বাজারের অর্থনীতির পথ বেয়ে গিয়ে পৌঁছয় আন্তর্জাতিক

এই বেগবান অগ্রগতির প্রক্রিয়ার এক বিশেষ পরিণামের কথা এই আলোচনারয় ছেদ টানবার পূর্বে বলে নেওয়া দরকার। কোনো অঞ্চলে যখন অগ্রগতি শুরু হয় তখন এরই ফলে সঞ্জাত 'বাহ্য' আয়তনানুপাতিক ব্যয়সংকোচ সমেত অজস্র উপাদান এই অগ্রগমনে সহায়ক হয় যাতে ওই অঞ্চল কোনো-না-কোনো কারণে পিছিয়ে পড়া সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় ক্রমাগতই এগিয়ে যেতে সমর্থ হয়। বলা বাহুল্য এই বৃদ্ধিরও কোথাও একটা

সীমা রয়েছে। অন্যথায় পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলির কোনো কোনোটি যে কখনো কখনো অগ্রণী অঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দেয়, এমনকি উন্নয়নে টেক্কা দিয়ে যায় এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যাই মিলত না। শিল্পোন্নয়নের স্বাভাবিক নিয়ম কিন্তু এই-ই যে সাফল্য আরো সাফল্য আনে এবং অগ্রণীদের অগ্রবর্তিতার মাত্রা প্রায়ই আরো বৃদ্ধি পায়। গত দুই শতাব্দী কাল খুব চমকপ্রদভাবে এই ব্যাপার পৃথিবীর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ঘটতে দেখা গেছে। গত শতকে মার্কিনী গৃহযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিলো উত্তর দক্ষিণে আর্থনীতিক উন্নয়নে অসঙ্গতি। আজ 'উত্তর' আর 'দক্ষিণে'র সম্মুখসমর এক পৃথিবীরব্যাপী ঘটনা। উনবিংশ শতকী ঔপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদ এখন অপসৃয়মান কিন্তু নতুন "আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিন্যাস" কোনো ছাঁদই পায়নি এখনও। স্পষ্টতই আগামীকালের ইতিহাসের কার্যসূচীতে এইটা একটা বড়ো জায়গা নেবে।

ধরনে যদিও প্রভেদ ছিলো তবু বাণিজ্য ও তৎসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে যুক্তিবাদী মেজাজের প্রধান বাহন হয়ে ওঠে। গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে উৎপাদন এবং ভোগ দুই-ই বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ছিলো রীতির দ্বারা। ঐতিহ্যসম্মতভাবে সমগ্র পরিবার ওই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় এ কথাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। বর্ণ বা জাত নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে পারিবারিক জীবিকা, সেখানে মানমর্যাদা লঘুগুরু সম্পর্কের ভিতরে বশ্যতা এবং জীবনশৈলী দৃঢ় উচ্চবাচ সোপানবিন্যাসে নির্ধারিত। এই কথা অবশ্য সত্যি হতে পারে যে এই ব্যবস্থার দার্ঢ্য নিয়ে একটু বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় একটা বদল আনা যে বেশ শক্ত ছিলো এতে সন্দেহ নেই।

এই প্রথাসম্মত ব্যবস্থায় বণিকদেরও একটি স্থান ছিলো। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে তাদের জীবিকাকে হেয়জ্ঞান করা হতো এবং সমাজ সোপানের যে পৈঠাটিতে তাদের স্থান ছিলো সেটি রীতিমত নীচে। তাদের বিষয়সম্পদের আপেক্ষিক প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সামাজিক অসম্মানের ভিতরে একটা অসঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়। শুধু ভারতেই যদি এরকম হতো, পৃথক আলোচনা করতে হতো এটা নিয়ে। কিন্তু অন্যান্য সমাজেও খুবই চোখে পড়ে এর ব্যাপক উপস্থিতি। মধ্যযুগীয় জাপানে শি-নো-কো-শো প্রথায় শো নামে যাদের পাই সেই বণিকদের স্থান যথাক্রমে 'নো' এবং 'কো' অর্থাৎ চাষী এবং কারিগরদের চেয়েও নীচে। এ-ও লক্ষ্য করতে হবে যে অ্যারিস্টট্‌ল বাণিজ্যিক কাজকর্ম এবং টাকা-কামানোকে খেলো কাজের ভিতরে গণ্য করেছিলেন। বণিকশ্রেণীর প্রতি এই রকম প্রতিন্যাস এতখানি পরিব্যাপ্ত হলো কী কারণে? কেবলমাত্র ইচ্ছের জোরে তাদের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না কাজেই সমাজ-সোপানে একটা স্থান বণিকদের জন্যও রাখা হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় নৈতিকতা বোধের সঙ্গে এই শ্রেণীটির স্বধর্মে এমন গভীর গরমিল ছিলো যে তাদের নিঃসন্দেহ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও কিছুতেই তাদের প্রভুগোষ্ঠীর অন্যতম হিসেবে নেওয়া বা সমাজের উচ্চমার্গে স্থান নির্দেশ করা সম্ভব হয়নি।

এই গরমিল কোনখানে? গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে উৎপাদন ছিলো প্রত্যক্ষ ভোগ ব্যবহারের জন্য, বণিক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য মুনাফা। অর্থাৎ সমাজের অন্য সবার তুলনায় তারা যেন স্পষ্টতই আত্মসচেতন হিসেবী বুদ্ধির প্রতীক হয়ে উঠেছিল, তাদের সাফল্যও এসেছিল এই হিসেবিয়ানার জোরেই। যদিও বর্ণগত নিয়মরীতির কিছু-কিছু এদেরও মেনে চলতে হতো তবু এই সম্প্রদায়ের গোনাগাঁথা কেজো বাস্তববোধের ভিত যুক্তির যে-চেহারা পরিদৃশ্যমান এবং ক্রমশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে সেই যুক্তিধর্মিতার মুখে প্রাচীন ব্যবস্থার ভিতর দুর্বল হয়ে

যেতে বাধ্য। ঐতিহ্যবাহী সমাজের তার আভ্যন্তরীণ কোনো অংশ, যে-অংশ অপরিহার্যভাবে এই সমাজে সংলগ্ন, ধনতান্ত্রিকতায় যেমন অঙ্গাঙ্গী সর্বহারা শ্রেণী, সেই রকম কোনো অংশের ক্রিয়ায় ভাঙতে শুরু করেনি। বরং বলা যায় মূলতই বহিরাগত একটি উপাদানের বৃদ্ধি রোধে অক্ষম হওয়াতে এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার ভিতরে এই বাড়বাড়ন্ত উপাদানটিকে সমন্বিত করে নিতে না পারার দরুন ঐতিহ্যবাহী সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে গেল।

বাণিজ্যের প্রসার এক রকম নতুন নগরজীবনের সূত্রপাত করল। নবযুগকে স্বাগত জানিয়ে নগরে দেখা দিল নতুন ব্যক্তি স্বাধীনতার মেজাজ। জার্মান প্রবচনে বলে, 'শহুরে হাওয়ায় স্বাধীনতার নিঃশ্বাস।' ভূমিদাসেরা পালিয়ে গিয়ে শহরে ঢুকে পড়তে পারলে ভিড়ে হারিয়ে থাকত এবং কিছুকাল পরে মুক্ত হয়ে যেত। এইভাবে পুরোনো সমাজ যা দেয়নি, নতুন সমাজ মানুষকে একটা নতুন চলাফেরার স্বাধীনতা দিল। দিল নিজের বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা। সেই সময়ে কাজের কিছু সুযোগও বেড়ে যাওয়ায় এই স্বাধীনতা খুবই অর্থবহ হলো। শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমবর্ধমান। কিছুটা ভাগ্যের আনুকূল্য পেলে যে কোনো উদ্যমশীল মানুষ সমাজের সঙ্কীর্ণ সীমায় ইতিপূর্বে যেটুকু সুযোগ পেতে পারত তার তুলনায় বহু বিচিত্র বৃত্তি থেকে নিজস্ব কাজটি বেছে নেবার অবকাশ পেয়েছে। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের নতুন ধ্যানরূপ গড়ে দেওয়ার বাস্তব ভিত্তি দিয়েছে। এলো সেই ব্যক্তি মানুষ, সমাজে যার পূর্বনির্ধারিত স্থান নেই, নিজেকে নিয়ে অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিজের অপরিসীম সম্ভাবনাকে বিকশিত করবার জন্য যার জন্ম।

ব্যক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গে একভাবে বিশ্ববোধেরও জন্মদাতা বাণিজ্য। কোনো অনড় এবং আত্মস্থিত গোষ্ঠী নিজেদের বিশিষ্ট নিজস্ব রীতিনীতি নিয়ে কাল কাটিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নানা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদানে প্রদানে লিপ্ত বণিকদের স্বভাবতই বারোয়ারী আইনের বন্দোবস্ত খুঁজতে হয় একটু বেশি যাতে আঞ্চলিক রীতিনীতির প্রভূত ভিন্নতা সত্ত্বেও চুক্তিবদ্ধ হওয়া কিংবা বাদ বিসংবাদ মেটানোর একটা ভিত্তি থাকে। আইনকে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তির প্রকাশ হিসেবে ভাবার প্রথম সূত্র এইখানে রয়েছে। এর সঙ্গে এক নতুন সাম্যভাবও যুক্ত হয়েছে। পসারীর কাছে সব ক্রেতাই তো সমান। জাতিধর্মনির্বিশেষে কী কিনছে, কতটা কিনছে খদ্দেরের পরিচয় এইটা দিয়ে। জাত পাত বিচার করে যদি পসারী খদ্দের বাছতে যায় তাহলে বলতে হবে সে স্বধর্মচ্যুত, মূল করণীয় কাজটি সে করছে না।

একটু থেমে খতিয়ে দেখলে কী পাই? শিল্প আর বাণিজ্য যৌথভাবে গড়ে তুললো অদ্ভুত, মর্মান্তিক স্ববিরোধে দীর্ণ এক পৃথিবী। একদিকে এই যৌথ ক্রিয়া প্রবলবেগে ক্রমবিবর্তিত যুক্তির এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে সমাজকে। ব্যক্তিত্ব সম্ভাবনার বহুরূপী বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বোধ জেগেছে এই আবহে, জানা গেছে মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশে স্বাধীনতার মূল্য কী। আর, ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধের সঙ্গে ঐহিক পরিপ্রেক্ষিতে ন্যস্ত বিশ্ববোধকেও মেলানো গেছে এই সময়েই। তবু অন্যদিকে একই সময়ে এসে গেল শিল্পের যে-সংগঠন আর শ্রম বিভাজন তাতে অধিকাংশ মানুষ কর্মসূত্রে এমন কাজে নিরত থাকতে বাধ্য যাতে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির চাপে সে জন্তু হয়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবেই বিবর্তিত হলো যাতে এক স্ববিরোধিতায় সমাজের পক্ষে অনুকূল শ্রমিক এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সৃজন সম্ভাবনা বাবদে প্রায় অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। এই স্ববিরোধকে অ্যাডাম স্মিথের চেয়ে স্পষ্ট করে আর কেউ দেখতে বা বর্ণনা করতে পারেননি। শ্রম

বিভাজনের ফলে আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধার বিখ্যাত বিবরণ লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন অ্যাডাম স্মিথ। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিক তার যথানির্দিষ্ট কৃত্যে যে অসামান্য পরিমাণ নিপুণতা আনতে পেরেছে তা যে সম্ভব হয়েছে কেবল পুরো মানুষ হিসেবে তার গুণ এবং মূল্যকে খেসারত দিয়ে এই কথাটা বলতে বলতে অ্যাডাম স্মিথ তাঁর দ্য ওয়েলথ্ অব্ নেশনস্ বইয়ের পঞ্চম খণ্ডে এই মর্মভেদী মন্তব্য যোগ করেছেন : "এমন (ভাগ্যহত) ছিল না সেই সমাজ, যদিও অসভ্য বলেই বর্ণনা করা হয় বিদেশী বাণিজ্য পণ্যসামগ্রী প্রস্তুতির উন্নতিবিধানের পূর্বকালীন কৃষিকাজের অদক্ষ দশাকে। সেই সব সমাজে…নিম্নশ্রেণীর সকল মানুষের বোধভাষ্য যে-আচ্ছন্নতায় সুসভ্য সমাজে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয় তেমন মূঢ়তার আবেশে মনকে ঠেলে দেওয়া হয়নি।" অ্যাডাম স্মিথের এই সব ভাবনা ধারণার সঙ্গে মার্কস্ পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর প্রথম দিকের কিছু লেখায় এসব ভাবনার প্রতিধ্বনি মেলে।

আভ্যন্তরীণ এই স্ববিরোধ সত্ত্বেও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কিংবা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির চমকপ্রদ অগ্রগতির প্রতীক এবং দৃষ্টান্ত হলো আধুনিক শিল্প। সত্যি বলতে কি এই শিল্প এবং উন্নত প্রয়োগবিদ্যাকে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব সার্থকতার নিদর্শন ধরে নিয়েই এই দৃষ্টিভঙ্গির উৎকর্ষ বিষয়ে জনমানসে সমীহ ভাবটি যেমন জেগেছে তেমন আর কোনোভাবে জাগত না। যুক্তিবাদী মন জানে বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজত্ব। প্রাচীনকালে এই বিশ্বাস কঠিন সাহসের সঙ্গে জীবনকে মেনে নেবার বল যুগিয়েছে। আধুনিক যুগে সম্পদ ও শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত জাতি ও গোষ্ঠীপ্রভাবিত পৃথিবীতে নতুন করে এই আস্থা জেগে ওঠার মূলে রয়েছে এর প্রয়োগিক সুফল।

আধুনিক সমাজে নামহীন এক আইন চলছে, একে নাম দেওয়া যাক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বিধি। ব্যক্তিগত-মালিকানা-ভিত্তিক পুঁজিবাদী সমাজের প্রেক্ষিতে এই আইনের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণান্তে মার্কস্-এর নাম দিয়েছিলেন পুঁজির আঁটুনি ও কেন্দ্রীকরণ বিধি। তিনি ভেবেছিলেন উৎপাদনের হাতিয়ার কয়েকজনের মুঠোর ভিতরে মালিকীস্বত্বে এঁটে গেলেই সমাজ দুই শত্রুশিবিরে সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে যাবে। অথচ আধুনিক সমাজে আমলা এবং নানা বৃত্তিধারী মানুষের জোট মিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছে, এঁরা অর্থনীতির "রাষ্ট্রকৃত" অংশে যেমন "ব্যক্তিগত উদ্যোগ"-এর ভাগটিতেও তেমন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকছেন। মনে হয় মার্কসের বিধিতে যা বিবৃত হয়েছে তা মূলত আরো সামান্য একটি প্রবণতার বিশিষ্ট এক দৃষ্টান্ত মাত্র। আমাদের যুগে নানারকম সামাজিক বিন্যাসের ভিতরেও আমলাতন্ত্র যেভাবে বেড়ে উঠেছে তাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বিধি বিষয়ে বেশ শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাওয়া সম্ভব। লক্ষণীয় যে উন্নত প্রয়োগবিদ্যার যুগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এই কেন্দ্রীকরণকে বেশ জোরালো যৌক্তিক এবং নৈতিক সমর্থন যুগিয়েছে।

পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উৎপাদন এবং বিপণনের সিদ্ধান্ত নেয় পৃথক পৃথক ব্যবসায় সংস্থা। শিল্প যেখানে এমন বেশ ক'টি ব্যবসায় সংস্থার সমাহারে রচিত যার কোনোটিই মাপে ছোট নয় অথচ তেমন বৃহদায়তন বা জোরালো নয় যে সমগ্র শিল্পকে একেবারে কব্জার ভিতরে রাখবে, সংক্ষেপে বলতে গেলে মেজকর্তাদের রাজত্ব যেখানে, সেখানে অন্যান্য অনুরূপ সংস্থার সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনতিপর্যাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যবসায় সংস্থাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় অথচ অন্যান্য সব ক'টি সংস্থার নিজ নিজ মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি বাজারকে প্রভাবিত করে দারুণভাবে। এ অবস্থাকে সন্তোষজনক বলা যায়

না, অনেক অসুবিধা হয় এতে। প্রায় একই কথা বিভিন্ন শিল্পের পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে বলা সম্ভব। সেখানেও একটি শিল্প অন্যগুলির খবরাখবরের ভগ্নাংশমাত্র পায়, নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের কাছে সমান্যই জানতে পারে। কাজেই সমবেত সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযোগী কোনো ব্যবস্থা করে নিতে পারলে সেটা ব্যবসায় সংস্থাগুলির স্বার্থের অনুকূলই হতো। বিশেষত যেখানে অনেকগুলি শিল্প একই ধরনের পরিসেবাগ্রহণে কিংবা একই অথবা সমজাতীয় দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয়ে কোনোভাবে যুক্ত হয়েই রয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাকে কোনো না কোনো আকারে চালু করবার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। শিল্পের সম্মিলিত সংগঠন বা শিল্পজোটের নানারকম আন্দোলনের ভিতরে যুক্তির দিকটা হলো এই। অবশ্য অ্যাডাম স্মিথ যেমন বলে গিয়েছিলেন এই ধরনের চেষ্টাকে একদিক থেকে জনসাধারণ তথা ভোগ্যপণ্য ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখা সম্ভব। কিন্তু অন্যদিক থেকে ব্যবসায়সংস্থার ভিতরে এবং শিল্পে-শিল্পে এই জোটবদ্ধতা উৎপাদনকে যুক্তিসহ করবার অনুকূল পরিবেশ গড়ে। যাকে "ব্যক্তিগত উৎপাদনের বিশৃঙ্খলা" বলা হয়েছে সেই অরাজকতা থেকে মুক্তি পাবার এই একটা উপায়।

এক ধরনের যুক্তিবাদিতার কাছে অখণ্ড পরিকল্পনার স্পষ্ট আবেদন রয়েছে। লক্ষ্যের সঙ্গে উপায়কে মিলিয়ে দেবার নাম হচ্ছে যুক্তি। আয়ত্তগম্য উপায় সম্বল কোথায় কী কতটুকু আছে তার সম্পূর্ণ খতিয়ান নিয়ে কাজে হাত দিলে এই মিলিয়ে দেওয়া সার্থক হতে পারে। এইভাবে দেখলে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা আংশিক পরিকল্পনার চেয়ে উঁচুদরের হতে বাধ্য। এই ধরনের প্রাপ্য সহায়সম্পদ গুণে গেঁথে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সপক্ষে রায় সবচেয়ে জোরালো হয় যখন পরিকল্পনার লক্ষ্য একেবারে খুবই পরিচ্ছন্ন এবং বিকল্পহীন। দৃষ্টান্ত যুদ্ধকালীন পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনানুগ জাতীয় অর্থনীতির যে জোরদার আদর্শটি প্রথম মেলে তার উদ্ভব প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মানীতে। উল্লেখযোগ্য এপ্রিল ১৯১৫তে পেট্রোগ্রাডের এক পত্রিকায় লারিন লিখছেন : "সমকালীন জার্মানী পৃথিবীকে এই যে কেন্দ্রাভিগ জাতীয় অর্থনীতির রূপরেখাটি দিল, এটি যেন পরিকল্পনানুসারে সক্রিয় একটি যন্ত্র।" দ্য বলশেভিক রেভল্যুশন বইতে এডোয়ার্ড হ্যালেট কার দেখিয়েছেন যে গৃহযুদ্ধের যুগে সাম্যবাদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল ওই জার্মান রূপরেখা। কেন্দ্রীয় শক্তি গুটিকয়েক ছকে বাঁধা লক্ষ্য সমাজের উপরে চাপিয়ে দিলে মুক্ত সমাজের আদর্শের সঙ্গে তার গরমিল ঘটে যায় কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন কথা। বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক অর্থে আঞ্চলিক অথবা আংশিক পরিকল্পনার সমাহারের চেয়ে একটা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিতরে যুক্তি মূর্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ঢের বেশী। কার্যক্ষেত্রে আমরা জানি এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার উপযুক্ত জোরালো এবং মাপসই আমলাতন্ত্র যেই গড়ে তোলা হয় অমনি পরিকল্পনা মূর্ত হওয়ার সঙ্গে অনিবার্য নানা বিকৃতিও মূর্ত হতে থাকে। আমলাতন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরস্পরনির্ভর। উভয়ের যৌথকর্মের ভিতর দিয়েই আমাদের যুগের বিশেষ ধরনের যুক্তির বিস্তারের ঐতিহাসিক হাতিয়ার হিসেবে এরা চিহ্নিত হয়ে রইল।

পূর্বেই বলেছি যুক্তি একটি গণ যার অগণ্য প্রজাতি। এ-ও বলা যায় যুক্তি একটি ভাব যা বহু রূপ ধরে। একটা যুগের মুখ্য যুক্তি হচ্ছে সেটাই যা সেই যুগের মুখ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে, জীবনযাপনের ভঙ্গিতে এবং কর্মে আকার পায়। মধ্যযুগের যুক্তির চারিত্র্য ছিলো বিভাজন। কী তার ব্যাকরণ কিংবা আইনতত্ত্ব, কী-ই বা তার বর্ণাশ্রম প্রথা

সব কিছুর ভিতরেই বিভাজনের ধারা আকৃত। আধুনিক যুগের বিশিষ্ট যুক্তির চরিত্র আমাদের জীবন ও সমাজে প্রভাববিস্তারী বাণিজ্যিক এবং আমলাতান্ত্রিক ধাঁচের ভিতরে কাজ করে যাচ্ছে। এই যুক্তি আসলে প্রয়োগবাদী এবং যান্ত্রিক যুক্তি। ভৌত জগৎ কিংবা সমাজ থেকে শুরু করে মনুষ্যদেহ এমনকি মন পর্যন্ত যেটাকেই এই যুক্তি বুঝবার চেষ্টা করেঁ সেটাকে যন্ত্রবৎ দেখে। অনেক কাজের কাজ এর দ্বারা হয়েছে। কিন্তু গুরুতর সমস্যাও তেমনি এর রয়েছে অনেক। সে সমস্যা যেন ইতিহাসের সূত্রে গড়ে ওঠা এর বাহ্য আঙ্গিকে আছে তেমনি আছে সেই আঙ্গিক সম্পৃক্ত মেজাজেও।

বিমূর্তভাবে বিবেচনা করলে বিশুদ্ধ যুক্তি সর্বতঃ সত্যের বাহক। কিন্তু প্রয়োগের দাস্যে নিযুক্ত যুক্তির সীমাবদ্ধতা এবং গর্হিত বহুচারিতা সর্বজনবিদিত। কে না জানে, কার পক্ষ নিচ্ছেন তার উপরে নির্ভর করে আইনজ্ঞরা যুক্তিকে কেমন সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তের অভিমুখে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম। এর উদাহরণ আন্তর্জাতিক আইনের বেলায় যেমন দেখা যায় তেমনটি আর কোথাও নয়। এও দেখা যায়, ধনী ও দরিদ্র, যতই-না আপাতদৃষ্টিতে যুক্তির চোখ মেলে থাকুক, নিজ নিজ জীবনের পরিস্থিতি দ্বারা কেমন প্রভাবিত হয়েই সমাজকে দেখে। আধুনিক যুগে যুক্তির অন্যতম প্রধান রূপ, প্রয়োগবাদ, সামাজিক বিরোধে ও যুদ্ধে ক্ষমতার অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, শান্তির প্রতিশ্রুতি আনতে ব্যর্থ হয়। ক্ষমতা এবং ভোগকে আনন্দের চেয়ে ঢের সহজে গুছিয়ে তোলা সম্ভব, যান্ত্রিক যুক্তির লক্ষ্যও হয়ে উঠেছে সেটাই। এই যুক্তি নিজের সীমাবদ্ধতা দেখতে সক্ষম কিন্তু উন্নততর কোনো কিছুর সহায় ব্যতিরেকে সে সীমা পার হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এর ভিতরে নেই। যারা ন্যায়নীতির জন্য লড়াই করে এমনকি তাদেরও চাই উচ্চতর বোধির আলোক যাতে পথ দেখা যায়। অন্যথায় তাদের লড়াই এক অন্যায়কে সরাতে অন্য এক অন্যায়কে ডেকে আনবে।

মানুষের ভিতরে রয়েছে এক সৃজনী শক্তি ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যার বিকাশ আর বিবর্তন ঘটছে। এর অন্তর্নিহিত প্রবণতা এবং উপস্থিত কালের প্রতিকূলতা ও আনুকূল্যের যোগসাজসে যৌথভাবে এই সৃষ্টিশীল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। যুক্তি যখন প্রতিষ্ঠানিকতা, প্রয়োগিক নিয়মকানুন, অভ্যাস ইত্যাদির ভিতরে বিধৃত তখন ওই সব বহিরঙ্গের দুর্গে যুক্তি বন্দী হয়ে যায়। কিন্তু চঞ্চল যুক্তির চিরস্থায়ী বাস তো সেখানে নয় কেননা যুক্তি রয়েছে প্রধানত ভাবরূপে, বহিরঙ্গে নয়, বিবর্তমান মানুষরে সৃজনী উদ্যমের অন্যতম প্রকাশই যুক্তি।

আমাদের যুগের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিক ক্রিয়াকর্মে জাগতিক স্বার্থের জোরটাকে বাড়িয়ে দেখাই। অনেক সময়েই আসলে এইসব স্বার্থের ফাঁদে সাময়িকভাবে জড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধে মনের খেদ প্রকাশের জন্যই এরকম করা হয়। তেমনি আরেক যুগবৈশিষ্ট্য হলো যে শ্রমকে মানবেতিহাসে অগ্রগতির শক্তি বলে আমরা গণ্য করি। গণতন্ত্রের যুগে মানুষের সৃজনী শক্তিতে আমাদের আস্থা জানানোর ধরন হলো এইটা। বৃহদায়তন শিল্প ও আমলাতন্ত্রের ক্রমবিকাশ, একদিকে ক্রমান্বিত শ্রমবিভাজন আর অন্যদিকে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন, তার ভিতরে এই জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবের যুক্তি হিসেবে "দক্ষতা"র এক যান্ত্রিক ধারণা, এই সব মিলেমিশে জীবন এবং উৎপাদন ব্যবস্থার যে প্রধান ধরনটি তৈরি হয়েছে তারই আবহে আধুনিক শ্রমিক কাজ করতে বাধ্য। ইতিহাসের একটা পর্বে এ সবেরই হয়ত প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এখন এর বাইরে দৃষ্টিদ্ম মেলবার সময় এসেছে।

তবু বর্তমানকে পেরিয়ে চোখ মেলার সময়েও আমাদের মনে রাখা দরকার আজ যে

যুগের অন্তকাল উপস্থিত সেখানে ইতিবাচক আমরা কী কী পেয়েছি। সম্প্রতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পুনরভ্যুদয়ী আন্দোলনের ঢেউ এসেছে। ইরাণে খোমেইনি এবং তাঁর অনুচরবর্গের ইসলামের পুনরভ্যুদয়িক প্রচেষ্টা বহুর ভিতরে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য। মানব সংস্কৃতির বর্তমান পর্যায়ে সাফল্যের ঘরে কোথায় কী জমা পড়লো, সীমাবদ্ধতা রয়ে গেল কোনখানে কতখানি, এর যুক্তিসহ সদ্বিচারী মূল্যায়ন ব্যতিরেকে এই সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আত্মঘাতী, উদ্ভট ও পশ্চাদগামী হতে বাধ্য। ওই সব বিদ্রোহী-আন্দোলন উন্নততর যুক্তি বা মনুষ্যস্বভাব বিষয়ে সেই গভীরতর বোধে উদ্বুদ্ধ নয় যার বলে ভবিষ্যৎ সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন যোগানো যায়, সত্যই যাতে আজকের সংকট পার হওয়া সম্ভব হয়।

॥ ৪ ॥

তৃতীয় চরণ

ভবিষ্যৎ সমাজের বহিরঙ্গ রূপ এবং অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি কী হবে? এই প্রশ্নে আধুনিক ভারতের মনস্বিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর খুবই তুলনীয়। এর অর্থ এই নয় যে তাঁদের মতামত এক ছিলো। দুজন সৃষ্টিশীল ভাবুকের ভিতরে খানিকটা প্রভেদ এমনকি তীব্র মতভেদ অনিবার্য। লক্ষণীয় যে জীবনের বাহ্য পরিস্থিতির এবং নিজস্ব মেজাজের পার্থক্য সত্ত্বেও কতখানি মিল তাঁদের মতের ভিতরে ছিলো।

১৯০৯-এ গান্ধীজি লেখেন **হিন্দ্ স্বরাজ**। এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত **স্বদেশী সমাজ** (১৯০৪) নামক প্রবন্ধে গভীর ভবিষ্যসম্ভাবী কিছু ভাবনাধারণা প্রকাশ করেন। গান্ধীজির মতই রবীন্দ্রনাথেও ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ হিসেবে গ্রামের প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। স্পষ্টতই গান্ধী কিংবা রবীন্দ্রনাথ শুধু এই তথ্য বিবৃত করতে চাননি যে অধিকাংশ ভারতীয়ের বাস গ্রামে। সোজাসুজি তাঁরা একটি আদর্শের উপস্থাপনায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিলো, উভয়েই তৎকালীন গ্রামজীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিষয়ে সচেতনও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁদের রচনা থেকে সহজেই উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যাকে "গ্রাম্যতা" বলেছেন তার খোলাখুলি বিরুদ্ধাচরণই ছিলো তাঁর অভিপ্রেত, তাঁর বিশ্ববোধ কিংবা প্রতিনিয়ত নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে যাবার মানবিক প্রচেষ্টার একান্ত পরিপন্থী এই গ্রাম্যতা তাঁর কাছে ছিলো অগ্রহণীয়। অনুরূপভাবে গান্ধীজিও বলেছিলেন, তিনি তাঁর স্বপ্নের গ্রামকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান, গ্রাম বলতে যা দেখা যায় তা থেকে সেটি অনেকখানি ভিন্ন। তাহলে কোন সূত্র বা কী আদর্শের প্রতীক স্বরূপ গ্রাম এসে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর চিন্তায় স্থান নিল? এই আদর্শ আমাদের নিয়ে যাবে কত দূরে? এই সব প্রশ্ন এখন আমাদের বিবেচ্য।

গ্রামকে যদি আদর্শ-নির্মিতি হিসেবে নিই তাহলে মুখোমুখি-যোগযুক্ত-মানব-গোষ্ঠীর আরেক নাম হলো গ্রাম। এর বিপরীতে আছে নগরের নামহীন জনতা। মুখোমুখি-যোগযুক্ত-মানবসম্প্রদায়ে প্রতিবেশীকে মনে হয় নিজের সত্তার সম্প্রসারণ যাকে বাদ দিলে নিজে অসম্পূর্ণ। সাধনা (১৯১৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "কোনো কিছুকে বোঝবার অর্থ তার ভিতরে আমাদের নিজস্ব যেটুকু আছে সেটুকুকে আবিষ্কার করা

এবং আপনার সীমার বাইরে আপনাকে আবিষ্কারের এই অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দিত করে। বোঝার এই সম্বন্ধ আংশিক, ভালবাসার সম্বন্ধটিতে আছে সম্পূর্ণতা। ভালবাসায় ভেদবোধ ঘুচে যায় এবং এক সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতায় মানবাত্মার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়।" মানবগোষ্ঠীর আদর্শ প্রতীকরূপে গ্রামের বৈশিষ্ট্য এই যে পল্লীকে একটি সম্প্রসারিত মনুষ্যপরিবার বলে বোধ হয়, সদস্যরা যেখানে কেবলমাত্র স্বার্থকেন্দ্রী প্রয়োজনে পরস্পরসম্পৃক্ত নয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আত্মীয়সম্বন্ধ বরং ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে। অর্থাৎ রুসো যাকে মানবসমাজের আদিমতম, স্বাভাবিক রূপ বলে বর্ণনা করেছিলেন সেই আদি পরিবারের ভাবনির্যাসটুকু যেন ভিন্ন নামে হয়ত বা একটু পরিবর্ধিত আকারে এখানে 'পল্লী" হয়ে উঠল। জাতিকেও পরিবারধর্মী ভাষায় ধ্যানধারণায় আনা চলে কিন্তু বিমূর্ত "জাতি" ভাবটি যে বিশাল মানবগোষ্ঠীর প্রতীক, বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই গোষ্ঠীর ভিতরে এই ভাব যৌথ উত্তেজনা এবং আবেগের জন্ম দিলেও মানুষের পরস্পর সান্নিধ্যজাত প্রতিবেশীসুলভ উষ্ণতা ও তাৎক্ষণিক নৈকট্যানুভব এই ভাবনার দ্বারা সহজে জাগানো যায় না। রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন কী ভাবে সংগঠিত ক্ষমতার দুরাগ্রহে সামরিক সংহতির জন্ম দিয়েছে জাতীয়তাবাদ এবং একে তিনি অপদেবতা বলে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করেছিলেন। মানুষের ভালবাসা ও সেবার ব্যাকুলতা স্বাভাবিক নির্গমনে ব্যর্থ হলে ভ্রান্ত পথে চলে যেতে চায় আর তখন তাদের মূর্তি হয়ে ওঠে সংহারক। রবীন্দ্রনাথ সমাজকে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন এমনভাবে যাতে ব্যক্তি হয়ে ওঠে সমাজের মৌল সংস্থার অঙ্গাঙ্গী অংশ, ব্যক্তিগত সেবার ব্যাকুলতার সার্থক প্রকাশ ঘটে নিকটতম প্রতিবেশীর জন্য গঠনমূলক কর্মে। গান্ধীও "আমাদের প্রত্যক্ষ নিকটতম প্রতিবেশের সেবায় ও ব্যবহারে লাগবার প্রেরণা" অর্থেই "স্বদেশী" শব্দটিকে গ্রহণ করেছিলেন। সকল মানুষ বিষয়ে আমাদের ব্যগ্রতার সমানুপাতে নিকট প্রতিবেশী "পল্লী"র প্রতি সকর্মক প্রীতির সামঞ্জস্যবিধান একান্ত আবশ্যক।

এই আলোচনাকে বিস্তারিত করবার পূর্বে এখানে কিছু সম্ভাব্য আপত্তির প্রসঙ্গ সেরে নেওয়া যাক। আদর্শকল্প পল্লী অথবা নবরূপায়িত পুনরুজ্জীবিত গ্রামের স্বপ্নের বিপরীতে রয়েছে প্রকৃত রূঢ় বাস্তব, সেখানে প্রতিবেশীরা পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরায়ণ, কুসংস্কার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং মোড়লেরা অজ্ঞ স্বজাতীয়দের উৎপীড়ন করেই চলেছে। আম্বেডকর ভারতীয় গ্রাম বিষয়ে লিখেছিলেন, "কূপমণ্ডূকতার একটি ডোবা, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা আর মূর্খতার খোঁয়াড়, একেই তো বলে গ্রাম ?" রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী এই বর্ণনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন না। কিন্তু এর জবাবে তাঁদের দুটি কথা বলবার থাকবে।

প্রথমত গান্ধী অহিংসা এবং ভালবাসার নিয়মের কথাটা বলবেন। অসূয়া এবং ঘৃণা সংবাদ হয়ে ওঠে, তাদের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব বিচলন এবং নিষ্ঠুরতার অন্তরালে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে অহিংসার শক্তি। অন্যথায় সমাজ বহু পূর্বে ধ্বংস হয়ে যেত। গান্ধী লিখেছিলেন, "পরিবারের সুনিয়ন্ত্রণের প্রধান ভার নেয় ভালবাসার এই নিঃশব্দ কিন্তু অমোঘ নিয়ম।" অসূয়াই নয়, প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতিও গ্রামের সমাজকে বেঁধে রেখেছে।

আদর্শবাদীর পক্ষে দ্বিতীয় বক্তব্যটি আরো জোরালো। আমাদের গ্রামগুলিতে খুঁত রয়েছে বহু। কিন্তু সেই যুক্তিতে আমরা গ্রাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি না কেননা গ্রামনির্ভরতা ব্যতিরেকে গত্যন্তর নেই আমাদের। আমাদের গ্রামগুলি অস্বাস্থ্যকর হয়ে থাকলে বরং আমাদের পক্ষে যুক্তিসহ কাজ হবে তাদের সাহায্য করে রোগমুক্ত সুস্থ করে

তোলা। গভীরতর প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সৎ সমাজ কি ছোট-ছোট মুখোমুখি-যোগযুক্ত-সম্প্রদায়-বিনির্ভরভাবে গড়ে তোলা সম্ভব ? অন্তত অধিকাংশ সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুখের পূর্বশর্ত হিসেবে ওইরকম মুখোমুখি গোষ্ঠীসদস্যতা আবশ্যিক মনে হয়। সে অবস্থায় সৎ সমাজের আদর্শ ত্যাগ না করলে পূর্বোল্লিখিত অর্থে "পল্লী"র বিকল্প নেই বলেই পল্লীর ভাবনা আমরা পরিত্যাগ করতে পারব না।

এখানেও কিন্তু দুটো ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার। এমনকি আদশ হিসেবেও আমরা রুসোর বর্ণনাধন্য আদিপরিবারিক ছাঁদের সতেজ এবং স্বভাবী প্রবণতার বনিয়াদে গড়ে ওঠা পল্লীতে আজ ফিরে যেতে পারি না। মনুষ্য মনও সমাজবিবর্তনের দ্বিতীয় পর্ব আমরা ইতিমধ্যে পার হয়ে এসেছি। এই পর্বের মূল্যবান যে সব সংগ্রহ এবং অন্তর্দৃষ্টি তার রক্ষা এবং সমন্বয়সাধনের প্রয়াস করতে হবে ভবিষ্যতের গ্রহণযোগ্য আদর্শকে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যেটুকু সারভাগ সেটুকুকে রক্ষা করা চাই। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছিলেন এই বিষয়ে। লিওনার্ড এলমহার্স্টকে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লেখেন, "আমাদের দেশের মানুষের যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হলো যথার্থ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা...শ্রীনিকেতন [যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লী পুনর্গঠনের পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্র গড়তে চেয়েছিলেন] যেন ছাত্রদের যুক্তিসঙ্গত ভাবনার আবহ তৈরী করে তোলে নইলে মূঢ় অন্ধ বিশ্বাস আর নৈতিক ভীরুতা কিছুতে ঘুচবে না।" তেমনি জরুরী ব্যক্তিসত্তার সেই ইতিবাচক দিকগুলির মূল্য বিষয়ে ধারণা যে সব ইতিবাচক দিককে রবীন্দ্রনাথ বলবেন ব্যক্তিত্ব। সচেতন চেষ্টায় ভবিষ্যৎ সমাজে এটিকে গ্রহণ করবার মনস্কতা গড়ে নিতে না পারলে ব্যক্তিসত্তা অনাদৃত ব্যাহত হওয়ার ভয় রয়ে যায়।

এই শেষ কথাটা একটু পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া দরকার। "ভালবাসায় প্রভেদ মুছে যায়।" ওতেই কিন্তু বিপদ আছে। কেননা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কিছু প্রভেদ থাকারই কথা। কাজেই যা প্রার্থনীয় তা হলো এমন ভালবাসা যা ভিন্নতা সইতে পারে। অপরকে নিজের সত্তার সম্প্রসারণ ভাবাই যথেষ্ট নয়। আত্মীয় ছাঁদে সৃষ্ট আদর্শে আমরা ভিন্নতা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট মন দিতে পারি না। সেই দিক থেকে এবং আরো কিছু কিছু বিষয়ে ভেবে দেখলে মনে হয় যে-সম্পর্ক আমরা চাইছি তাকে আত্মীয়তা বলার চাইতে সৎপ্রতিবেশী সম্বন্ধ নাম দেওয়াই অধিকতর সঙ্গত। সে-ই আমাদের প্রতিবেশী যে আমাদের কাছে বাইরের লোক অথচ ঠিক যেন পুরো বাইরের লোক নয়। আমরা তার কুশল চাই আবার সেই সঙ্গে তার স্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকার করি। তার সঙ্গে আমরা যুক্ত হই শুভইচ্ছার মাধ্যমে, ভালবাসার টানে নয়, যদি না ভালবাসা কথাটাকে খুব ব্যাপ্ত সামান্যার্থে ব্যবহার করা হয়। সমাজের মৌল সংস্থাগুলির ভিতরে প্রভেদসহিষ্ণু শুভেচ্ছার বন্ধন আবশ্যক।

পল্লীর সঙ্গে সঙ্গে নগরকেও চাই। গান্ধীজি বলেছিলেন, "আমার গ্রামীণ অর্থনীতিচিত্রে নগরসমূহ স্বাভাবিক স্থানই পাবে।" কী সেই স্বাভাবিক স্থান যা নগর পাবে ?

নগরের বিরুদ্ধে গান্ধীর নালিশ ছিলো এই যে পল্লীকে শুষে নগর বাঁচে। সম্পদ সামর্থ্য এবং প্রতিভা সবই গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে পুঞ্জীভূত হয়। মহানগরে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে ক্ষমতা, বিজ্ঞানের সাধনা সব কিছু। আধুনিক প্রয়োগবিদ্যা এই প্রবণতাকে

বাড়িয়ে তুলেছে। এটি নগরের পক্ষে তো বটেই সমগ্র দেশের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর। গান্ধী লিখেছিলেন, "আমি চাই যে-রক্ত এখন নগরের ধমনীকে অতিস্ফীত করে দিচ্ছে তা আবার প্রবাহিত হোক পল্লীর রক্তবাহী শিরায়-শিরায়।"

এই আলোচনাসূত্র থেকে আমরা শহর ও গ্রামদেশের সম্বন্ধ বিনির্ণয়ে এগোতে পারি। নগরের পক্ষে পল্লী এবং বিশ্বজগতের মাঝখানে সেতুস্বরূপ হয়ে ওঠা সম্ভব। নানা অঞ্চল থেকে জ্ঞান আহরণ করে নগরগুলি পল্লীতে পল্লীতে তা সম্প্রচার করে দিতে পারে। নিঃসন্দেহে এরকম একটি সম্প্রচারণ বেষ্টনীর প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামকে গ্রামের মনে থাকতে দিলেই সেগুলি সহজেই "গ্রাম্যতা" নামে রবীন্দ্রনাথ যাকে অভিহিত করেছেন সেই প্রকার কুসংস্কার এবং ক্ষুদ্র স্বার্থে দলাদলির গর্তে পড়ে যায়। কিন্তু কেবলমাত্র জ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্প্রচারেই শহরগুলির কাজ সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। পল্লীসংস্কৃতি থেকে রস এবং পুষ্টি সংগ্রহ করে নেওয়ার কাজও শহরের পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা অবশ্য প্রয়োজন তা হলো লোকসংস্কৃতি এবং নাগরিক সংস্কৃতির নিত্য সঞ্জীবনী, সজীব পরস্পর নির্ভরতা। গণজীবন ও লোকসংস্কৃতির জমিন থেকে নিরন্তর রস সংগ্রহে বিরত হলে নগরের শিল্পসৃষ্টি হবে ফুলদানিতে সাজিয়ে তোলা ফুলের মতো, কিছুক্ষণ দেখতে ভালো কিন্তু প্রকৃত প্রাণশক্তি না থাকায় কিছু পরেই শুকিয়ে যায়।

জাগতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও পল্লীর পরস্পর সহায়ক ব্যতিহারী সম্বন্ধ প্রয়োজন। কিছু কিছু আর্থনীতিক কর্মকৃত্য গ্রামে বসে, গ্রামের জন্য, গ্রামগুলিকে দিয়েই সংগঠিত করে তোলা সহজ ও সম্ভব। এ কথা শুধু ভোজ্যপণ্য উৎপাদনের বেলাতে খাটে তাই নয়। উপযুক্ত গবেষণা এবং সাংগঠনিকতার সাহায্যে সম্প্রসারণযোগ্য কয়েকটি শিল্প এবং পরিসেবা বিষয়েও এই কথা খাটে। কোনো কোনো উৎপাদনী এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ব্যাপারে বর্তমানে গ্রামকে যে অনুপযুক্ত বলে মনে হয় তার সোজা কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের গবেষণা, শিক্ষা, কিংবা ধরা যাক ব্যাঙ্কের ঋণদানের ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত পক্ষপাত এ সমস্তই শহরমুখী। এই ধরনের রীতিবদ্ধ পক্ষপাতকে শুধরে নেবার সমস্ত বন্দোবস্ত করে নিলেও কিছু-কিছু দ্রব্যসামগ্রী এবং পরিসেবা থাকবে যা প্রধান কেন্দ্র থেকেই যোগান দেওয়া প্রয়োজন। বাড়ির উঠোনে ইস্পাত উৎপাদন প্রচেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয়নি এবং প্রত্যেক পল্লীতে অথবা উপজিলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার ভাবনাকে সদ্‌বুদ্ধির নিদর্শন বলা যায় না।

আমাদের চাই নানা মাপের এবং ধাপের কয়েকটি সদরশহর এবং নগর যারা পরস্পরকে এবং গ্রামকে সাহায্য করতে সক্ষম। গুটিকয়েক পরস্পরসম্পৃক্ত পল্লীর কেন্দ্রে একটি বাজার থাকলেই সেখানে ওই সব গ্রামের পণ্যসামগ্রী বিক্রি হতে পারে আবার সেখান থেকে গ্রামের মানুষ নিজেদের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী এবং পরিসেবাও সংগ্রহ করে নিতে পারে। এ ছাড়াও অবশ্য এমন অনেক জিনিস থাকবে যার জন্য লোককে সদর বাজারের উপর নির্ভর করতে হবে। সেই সদর বাজারের আওতায় পড়বে আরো অনেক পল্লীবৃন্দের বেষ্টনী। অর্থাৎ কিনা সদর শহর ও নগরের এক ধরনের সোপানবিন্যাস অথবা কর্মকৃত্যের যুক্তিসঙ্গত বিভাজনের ভিত্তিতে সংগঠিত বেষ্টনীকেন্দ্র চাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব কেন্দ্র ঠিকই গড়ে ওঠে কিন্তু সেই গড়ার কাজ একটু এলোমেলো ফলে ত্রুটিযুক্ত হয়। ভারতে কয়েকটি বৃহৎ নগর আর অযুত-অযুত গ্রাম রয়েছে। সংখ্যায় আরো অনেক বেশি এবং তেজী ছোট আর মাঝারি দরের শহর আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তৃতীয় তথা উন্নতিশীল বিশ্বের অন্যান্য বহু দেশ সম্পর্কেও নিশ্চয় এই কথাই খাটে।

এখানে পল্লী ও বেষ্টনী কেন্দ্রগুলি নিয়ে কী ধরনের সাংগঠনিক পরিকল্পনার ছক দেওয়া হলো সেটা ঔষধ তথা স্বাস্থ্য পরিসেবার দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক। এই দৃষ্টান্তে বর্তমান অবস্থার দুর্বলতাও কতকটা ধরা পড়বে। ভারতে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যা এবং শিক্ষণ ব্যবস্থার সরকারী প্রথামাফিক বনিয়াদ হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োগবিদ্যা। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের চিকিৎসকদের চাহিদা আছে এবং শিল্পোন্নত সমাজে নিজ নিজ বৃত্তিতে কাজ করবার উপযুক্ত যোগ্যতা তাঁরা রাখেন। কিন্তু যেখানে আমাদের অধিকাংশ দেশবাসীর বাস এবং যেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রায় কোথাও নেই বললেই হয় ভারতের সেই সব গ্রামে গিয়ে কাজ করবার যোগ্য মেজাজ কিংবা শিক্ষা কোনোটাই এঁদের তৈরি হয় না। সাবেকী ঐতিহ্যসম্মত ভেষজাদির ভিত্তিতে নেই সংগঠিত এবং তত্ত্বমূলক বিজ্ঞান। আধুনিক দৃষ্টিতে ওসব তাই একরকম স্থূল অভিজ্ঞতায় পাওয়া টোটকা। কিন্তু ওই অভিজ্ঞতার মূলে আঞ্চলিক নিত্যনৈমিত্তিক আধিব্যাধি নিবারণে স্থানীয় শিকড়-বাকড় গাছ-গাছড়ার ব্যবহারে জ্ঞান সঞ্চিত আছে, সেই জ্ঞান মূল্যবান। তবে সাবেকী ঐতিহ্যের এইসব ঔষধবিধির সীমাবদ্ধতা কিছুটা রয়েছে।

এক্ষেত্রে দুটো কাজ স্পষ্টত করণীয়। ঐতিহ্যসম্মত জ্ঞান থাকলে ঔষধপত্রের ব্যাপারে এইটুকু লাভ হয় যে দেশজ সহায় সম্বল অর্থাৎ ধারে কাছে যা মিলছে তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে দেওয়ার উপায়টুকু আয়ত্তে থাকে। কিন্তু এই জ্ঞানের দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। নীতি হিসেবেই অতঃপর এই সব ঐতিহ্যসম্মত জ্ঞানকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বনিয়াদে ন্যস্ত করার উপযোগী সূক্ষ্মতাদানের উদ্দেশ্যে গবেষণার প্রকল্প নেওয়া আবশ্যক। আজ সরকারী ব্যবস্থাপনা যদি খুব ভালো ভাবে চলে তবু তার ফলে চিকিৎসাবিদ্যায় সুশিক্ষিত চিকিৎসক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নিয়মরীতি সাপেক্ষেই স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের জন্য কাজ দিতে পারেন। সমাজের "উঁচু" তলাতেই তাঁদের কাজ প্রধানত। আমাদের কিন্তু ধাপে ধাপে নানা স্তরের মানুষের সাহায্যার্থে চিকিৎসাবিদ্যার সযত্ন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা চাই। এমন কাঠামো গড়ে তুলতে পারা উচিত যাতে স্বল্পকালীন শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু জনস্বাস্থ্যকর্মী নিত্য যে সব রোগজ্বালায় গ্রামাঞ্চলে মানুষ ভোগে সেইগুলির বিষয়ে আঞ্চলিক প্রয়োজন বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা ও সেবার কাজে লেগে যান। যাঁরা এই কাঠামোর ভিতরে কর্মরত তাঁরা নিজ নিজ অর্জিত জ্ঞানের সীমা মেনে নিতে শিখবেন যাতে যে-রোগের উপশমের উপায় তাঁরা জানেন না সেই সব জটিল পীড়াগ্রস্তদের জেলা হাসপাতাল জাতীয় একটুখানি বড়ো মাপের কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। তেমনি আবার কোনো-কোনো রোগীকে হয়ত আরো উঁচুস্তরের কোথাও, ধরা যাক রাজধানী শহরেই পাঠাতে হবে রোগনির্ণয় এবং নিরাময়ের জন্য। এতে করে নগরীর অতিভারাক্রান্ত চিকিৎসাগারগুলিতে সর্বপ্রকার রোগীর অপ্রয়োজনীয় ভিড় করে আসার প্রবণতা রোধ করা যাবে এবং লোকবল বা ঔষধপথ্যাদির যোগান বাবদে আমাদের যতটুকু সীমিত সাধ্যসামর্থ্য তার সার্থকতর ব্যবহার সম্ভবপর হবে।

এই স্বাস্থ্যপরিসেবার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে আমরা একটি অধিকতর ব্যাপ্ত সাধারণ সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করছি। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যপরিসেবার ক্ষেত্রে সাবেক রীতি এবং আধুনিক প্রয়োগবিদ্যার এই যে-ব্যবধান, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সহ শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে নগরমুখী পক্ষপাত, দেশগ্রামের প্রয়োজন ও অভাব মেটাবার জন্য উপযুক্ত সোপানবিন্যস্ত পরিসেবার অভাব, এ সব কিছুই চিকিৎসা তথা শল্যশাস্ত্রের সীমা

পেরিয়ে সমগ্র শিল্পপণ্যোৎপাদী সমাজে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ বিষয়ে, বৃহত্তর প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। কাজে কাজেই ওই তথ্যাদি থেকে দূরপ্রসারী শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব যাতে শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশাসনিক পুনর্গঠনে এবং এক নতুন সমাজ বিন্যাসের জন্য যথাযথ প্রয়োগবিদ্যার বিকাশে সাহায্য মেলে।

সমকালীন ভারতের সর্বাধিক সৃজনশীল চিন্তাবিদদের ভাবধারায় আরো একটি যে অসামান্য মিল নজরে পড়ে সে হলো উৎপাদনী হাতিয়ারের মালিকানা এবং উৎপাদনকর্মে সংগঠন প্রশ্নে। "যতদূর সম্ভব" গান্ধী লিখছেন, "সমস্ত কাজই করা হবে সমবায় ভিত্তিতে।" রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের সপক্ষে অতি পরিচ্ছন্ন ভাষায় অক্লান্ত বক্তব্য সাজিয়ে রেখে গেছেন তাঁর পল্লী পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীতে। বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় জীবনের শেষ পর্বে মানবতাবাদআশ্রয়ী সমবায়িক আন্দোলনের এক মুখপাত্র হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। এই সব মতের মিলের কারণ খুঁজতে বেগ পেতে হয় না। আমাদের সমাজে জমি এবং অন্যান্য সম্পদের বণ্টনে আছে প্রভূত অসাম্য। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়েও সাম্য আনার পন্থা নিয়েই ওঠে প্রশ্ন। সমবায় হচ্ছে যথার্থ স্বাধীনতা এবং সাংগঠনিকতাকে আপোসে মিলিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনবণ্টনে অসাম্য এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমেত আধুনিক সকল সমাজ ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, এই দুইয়ের মধ্যপথ দিয়ে পথ কেটে চলবার উপায় সমবায়।

সমবায়ের আকারে-প্রকারে বৈচিত্র্য সম্ভব। এই রকমের হওয়াই স্বাভাবিক কেননা যে-বিশেষ কাজকে সমবায় নিজ আয়ত্তে রাখতে চায় তার উপর নির্ভর করে সমবায়িক সংগঠনের ধরন। যেমন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ছোট খামারের পরিবার-ভিত্তিক কাজের সঙ্গে বিপুল শ্রমশক্তিনির্ভর বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের অনেকটাই প্রভেদ থাকতে বাধ্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগে লেখনী ধারণ করে জন স্টুয়ার্ট মিল বৃহদায়তন শিল্পোদ্যোগের জন্য পরামর্শ দেন এমন এক "সাম্যভিত্তিক শ্রমিক সমিতি স্থাপনের যার সাহায্যে শ্রমিকেরা কর্মোদ্যোগে আবশ্যক পুঁজির মালিকানা নিজেদের যৌথ নিয়ন্ত্রণে রেখে, যৌথকর্তৃত্বে নির্বাচিত এবং অপসারণযোগ্য অধিনায়কের কর্তৃত্বাধীনে কাজ চালাবেন।" সমবায়কে স্বাধীনতা ও সাম্যের সমাহারী প্রতীক মেনে নিয়েও তিনি কিন্তু ভেবেছিলেন যে সমাজে সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মানের যথোচিত উন্নতিবিধানকল্পে পর্যাপ্ত শিক্ষাপ্রকল্প না নিলে এই সহযোগিতা সার্থকভাবে কাজ করতে পারবে না। এই সাবধানতার কিছুটা ভিত্তি ছিলো। সমাজোন্নতির স্তরসাপেক্ষে শিল্প পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি বাধ্যবাধকতা থাকে। সেই বাধ্যবাধকতা পেরিয়ে শিল্প পরিচালনার ধরনকে ভয়ানক বেশি উন্নত মানে পৌঁছে দেওয়া যায় না। বৃহদায়তন শিল্পে দক্ষ কর্মিষ্ঠতার অনুকূল যে সব অভ্যাস সেগুলি দেশে যথেষ্ট সুগঠিত হয়নি এবং নতুন অভ্যাস গড়ার প্রথম পর্বে অনেক সময়ে খানিকটা জোরজবরদস্তির দরকার পড়ে। যৌথ আত্মসংযম কার্যকর করার ব্যাপারে সমবায়ের উপর নির্ভর করা যাবে কি ? তাছাড়াও এ রকম প্রশ্ন ওঠে যে প্রয়োজন হলে বেতনবৃদ্ধি স্থগিত রেখে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় গড়ে তোলা বনাম তাৎক্ষণিক ভোগ এ দুটি বিকল্পের ভিতরে কোনটি গ্রহণীয় ? এ জাতীয় বহু প্রশ্নে যদি না সমাজ সজাগ থাকে এবং সুষ্ঠু পরিচালনাকে পর্যাপ্ত উৎসাহ দেওয়া যায় তাহলে পরিচালকদের মধ্যে নিয়মনীতির ধার না ধেরে কাজ করা বা সবচেয়ে কম বাদ-প্রতিবাদে যেতে হয় যাতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝোঁক এসে যাওয়াই সম্ভব। সমবায়ের দ্বারা এই সব শর্ত পূর্ণ হওয়া সহজ নয়। যে-দেশ যত কম অগ্রসর সে দেশে এসব বাধা ততই পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে।

তবু সহযোগিতার নীতি হিসেবে সমবায় এক মহৎ আদর্শ। আমাদের ভবিষ্যতের গতিপথ নির্দেশিত রয়েছে এর ভিতরেই। শেষ পর্যন্ত সমাজকে এই পথেই যেতে হবে। আজ না হোক কাল বাণিজ্যিক এবং আমলাতান্ত্রিক সমস্ত সাংগঠনিক গড়ন পালটাবেই। খুব সীমাবদ্ধ স্তরের কথা বাদ দিলে আমরা গার্হস্থ্য অর্থনীতিতেও ফিরতে পারি না। প্রতিবেশিকতার ভাবরূপকে সবল করবার যোগ্য আর্থনীতিক কৃত্যকের সুপরিকল্পিত নব-জোট, নানাবিধ সমবায় এবং বান্ধব-সমিতির সঙ্গে সংযুক্ত করে নিম্নতর স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ—আসন্নোদ্ভাব নতুন সমাজের সাংগঠনিক রূপরেখাটি হচ্ছে এই ছাঁদের। পূর্ব য়ুরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসকে যদি পূর্বাভাষ হিসেবে গণ্য করি তবে এই সব স্বশাসিত সমবায়ে সংগঠিত মৌলিক উৎপাদনী উদ্যোগগুলিকে অতীত সোভিয়েট কাঠামোর তুলনায় বহুগুণে খোলামেলাভাবে ভবিষ্যতে বাজারী অর্থনীতির পরিবেশে কাজ করতে দিতে হবে। কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের অমিতাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এটা দরকার।

এতক্ষণ সমাজ আর অর্থনীতির যে ছবি সাজানো হলো এর সঙ্গে রাজনৈতিক সংগঠনের কোন চেহারাটি ঠিক খাপ খায়? সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলনির্ভর। একদিকে একটি ক্ষমতাসীন দল আর উল্টোদিকে সাবেকী প্রথা এবং দেশের সংবিধানের সাহায্যে সুরক্ষিত বিবিধ অধিকারের ভাগীদার বিরোধীপক্ষ হচ্ছে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার তথাকথিত রক্ষাকবচ। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই ব্যবস্থার দ্বারা বহু দেশেই প্রতিষ্ঠিত প্রভুগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অনেকখানি স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দলনির্ভর এই ব্যবস্থার নিজস্ব কতকগুলি সীমাবদ্ধতা এবং সমস্যা রয়েছে। আধুনিক রাজনীতি মেকিয়াভেলি পন্থায় বিশ্বাসী। ক্ষমতা নিয়ে লড়াইয়ের উত্তেজনায় মত্ত হয়ে প্রতিটি দল নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিতাহিতবিবেচনাহীন পন্থা নিতে চায়। যে-সব দেশে বিবদমান অথবা পরমতঅসহিষ্ণু বহুজাতিক গোষ্ঠী অথবা নানা ধর্মসম্প্রদায় বর্তমান সেই সব দেশে রাজনৈতিক দলগুলিরও অনুরূপ গোষ্ঠীবিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে যায়। তখন দলাদলি প্রায়ই প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধের আকার নেয়। সে অবস্থায় মুখ্য সমস্যাগুলির সুস্থ সমাধানকল্পে দলগুলিকে দলস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতেই হয় নইলে কোনো শোভন সমাধান আদৌ মেলে না। এই অবস্থার উদাহরণ দেওয়া খুবই সহজ, দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত কিংবা আজকের আয়াল্যান্ডি এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতটা চরমে না পৌঁছলেও রাজনীতিতে নীতি ব্যাপারটি ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে দলীয় রাজনীতিব্যবস্থা যে কী গুরুতর সমস্যাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে তা আজকের ভারতীয় নাগরিক খুব ভালোই জানেন।

উপস্থিত রাজনৈতিক বন্দোবস্ত যেটা না-পবিত্র না-অপরিবর্তনীয় আর গভীরতর অতুচ্ছ মূল্য এই দুইয়ের ভিতরে একটা পার্থক্য করে নেওয়া ভালো। যেমন, মূল্যের কাছাকাছি যদি রাজনীতির জগতে কিছু থাকে তা হলো বাক্য ও বিবেকের স্বাধীনতা। অন্যদিকে দলীয় ব্যবস্থা যতই কাজের হোক সে হচ্ছে একটা পরিবর্তনসহ ক্রমবিবর্তনী বন্দোবস্ত। ভালো একটা পরিবারের ভিতরে কিংবা বন্ধু সমাজে সমালোচনার স্বাধীনতা থাকে কিন্তু দ্বন্দ্বের রেখা তো সেখানে নির্দিষ্ট দলের সীমায় সীমায় মিলিয়ে অনড়ভাবে টানা হয় না। দলীয় ব্যবস্থাকেও যদি সেই ধরনের সমাজে চালানো হয় যে সমাজে ঐতিহ্যের দরুনই হোক কিংবা দশজনের কাণ্ডজ্ঞান সুশিক্ষিত বলেই হোক স্বাধীন সমালোচনার মনোবৃত্তিকে শ্রদ্ধেয় জ্ঞান করা হয়েছে, তাহলে দলীয় ব্যবস্থাও হয়ত কতকটা ভালোই চলবে। দলীয় ব্যবস্থার ত্রুটি আছে এর অর্থ কি এই যে একদলীয় ব্যবস্থায় উন্নততর রাজনৈতিক সংগঠন

তৈরি হবে ? তা নয় কেননা এতে প্রতিবাদের অধিকারই প্রায় অস্বীকৃত যার ফলে এ ব্যবস্থা মানবিক স্বাধীনতার অন্যতম মৌল শর্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে যায়। মার্কসের আশ্বাস ছিলো রাষ্ট্র ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। আজ কোনো-কোনো দেশে দলই হয়ে উঠেছে রাষ্ট্র। আশা রাখতে পারলে বলা যায় দল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে তারপরে দেখা দেবে দলহীন গণতন্ত্র। এই নির্দলীয় গণতন্ত্রের কোনোপ্রকার অভ্যুদয়িক প্রচেষ্টা করতে চাইলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ছোট-ছোট কেন্দ্রগুলি তার উপযুক্ত পরীক্ষাগার হতে পারে। গান্ধীজির শেষজীবনের সিদ্ধান্ত স্মরণীয় : জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে দিলেই সেটা জাতির পক্ষে ভালো হবে। ওই সিদ্ধান্তে প্রোথিত ছিলো ভবিষ্যতের নতুন রাজনৈতিক আদর্শের বীজ। নতুন আদর্শের কাঠামোকে সহসা স্থাপিত করা যায় না কিন্তু মৌলিক পুনর্ভাবনা যদি কিছু করতে চাই তার এই সময়। কোনো একরেখ দল কিংবা রাষ্ট্র নিজের মুঠোয় সার্বভৌম ক্ষমতা নিয়ে মেকিয়াভেলি-নির্দিষ্ট পথে চলে মানব স্বাধীনতার পরম বাহক হয়ে উঠবে এমন হয় না।

আদর্শ মানব ধারক ও সমাজের মূল সংস্থা যদি হয় ব্যক্তি অথবা পল্লীতুল্য মুখোমুখি-যোগযুক্ত-মানবগোষ্ঠী, মানুষের অন্তিম আনুগত্যকে অবশ্য ন্যস্ত রাখতে হবে সমগ্র মানবতায়। আরো যা প্রয়োজন তা কেবলমাত্র সাংগঠনিক বহিরঙ্গের পুনর্বিন্যাসে সীমাবদ্ধ নয় অনুরূপ অন্তরঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। উপস্থিত যে অবস্থাগতিকে এই অন্তরের দিকের কথাটা ধরা যাচ্ছে সে বিষয়ে অল্প একটুখানি উল্লেখ করি।

গত ত্রিশ বৎসরে শিল্পোন্নত দেশে সমৃদ্ধির এক অতি উচ্চস্তরে একটি প্রজন্ম বড়ো হয়ে উঠেছে, এমন উচ্চমানের সমৃদ্ধির ভিতরে তুলনীয় সংখ্যক মানুষ ইতিহাসের পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অন্য কোনো প্রজন্মে এ-ভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি। এই প্রথম আমরা পেলাম যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত, প্রাণবন্ত বহু লক্ষ যুবক-যুবতী পৃথিবীব্যাপী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে যারা পূর্বে যা ছিলো সে তুলনায় ঢের বেশি পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যে এসেও অস্থির এবং অসুখী অথচ দারিদ্র্য তাদের দুঃখের প্রধান কারণ নয়।

এরই পাশাপাশি জনসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে দারিদ্রপীড়িত দেশগুলিতে ; পূর্বাপেক্ষা বৈষম্য-চেতনা যে-পৃথিবীতে শতগুণে তীব্র হয়ে উঠেছে সেখানেই জাতিতে-জাতিতে আর্থনীতিক বৈষম্য উঠেছে বেড়ে। অনুচ্চারিত এমন আশা কখনও থাকলেও থাকতে পারতো যে শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষম্য আনুপাতিকভাবে কমে আসবে। এখন তেমন আশা পোষণ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যার মোটামুটি কুড়িভাগের একভাগের বসতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে দেশের জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে পৃথিবীর মৌল সম্পদের প্রায় অর্ধেক নিজেদের প্রয়োজনে টেনে নিচ্ছে। দৃষ্টিগোচর সময়সীমার ভিতরে ওইরকম মানের কাছাকাছিও পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে পৌঁছে দেবার ভাবনাকে সম্ভাবনার বাইরে রাখাই বিধেয়। সাম্প্রতিক তৈল সংকটের ফলে সবাই খেয়াল করে আয়ত্তগম্য শক্তির উৎসের খতিয়ান নিতে বাধ্য হয়েছেন। এটা খুবই স্পষ্ট যে কয়লা বা পেট্রলিয়ামের মতো যে-সব শক্তির পুননবীকরণের পথ নেই সেগুলি শীঘ্রই ফুরিয়ে যাবে। পারমাণবিক শক্তি যেমন নতুন আশা জাগিয়েছে নতুন সমস্যাও তেমনি এনেছে অনেক। ই. এফ. শুমাখর তাঁর **স্মল ইজ বিউটিফুল** গ্রন্থে "তথাকথিত শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তির ব্যবহারে মানবিক বিপর্যয় সম্ভাবনা সৃষ্টির" কথা বলেছেন। তিনি বিবৃত করেছেন কী ভাবে পারমাণবিক চুল্লী থেকে তেজস্ক্রিয়-আবর্জনা বিপুল পরিমাণে ছড়িয়ে যায়। তেজস্ক্রিয়তায় বাতাস জল এবং

মাটিকে যে-রকম বিপজ্জনকভাবে দূষিত করে সেই বিপদকে বহু গুণে বাড়িয়ে না তুলে আমরা পারমাণবিক শক্তির উপরে নির্ভরতা তেমন কিছু বাড়াতে পারব না। মস্তো বড়ো এক উভয় সংকটে পড়েছি আমরা। এই অবস্থায় শুমাখর আশা দেখতে পান শুধু "যে…প্রকৃতির আমরা অচ্ছেদ্য অংশ সেই প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগের অপেক্ষাকৃত অহিংস, সুসমঞ্জস, অঙ্গাঙ্গিক পন্থা যতগুলি মেলে সবগুলির অনুসন্ধান ও অনুশীলনে"। এতে ধরা পড়ে প্রয়োগবিদ্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট জীবনযাপনের যে ভঙ্গি পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তাকে ঢেলে সাজানো দরকার। সমর পরিকল্পনায় চাই অত্যন্ত কৃতসংকল্প কেন্দ্রীয় অর্থনীতি, জাতীয় সীমানার ভিতর অতি কঠিনভাবে আবদ্ধ সেটা : অহিংস পরিকল্পনার বেলায় কাজের আরম্ভ হলো গ্রামে কিন্তু সারা পৃথিবীকে না-ছুঁয়ে এর ক্ষান্তি নেই।

হিরোশিমা স্মৃতির তাড়না যেন অন্য সব সমস্যার নিত্য পটভূমি। অস্ত্রধারণে সক্ষম দুখানি হাত নিয়ে শিকারী লাঙ্গুলবিহীন-বানর রূপে যখন মঞ্চে মানুষ অবতীর্ণ তারপর দীর্ঘ পথ পার হয়ে এলাম। একদিন এটাই তাকে দিয়েছিল অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় অপরিমিত সুযোগ এবং শক্তি। আজ মানুষই একমাত্র সেই ভয়ংকর বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত জীব যে উপযুক্ত সংহারশক্তি ক্ষেপণ করে স্বীয় প্রজাতিকে কয়েক ঘণ্টার ভিতরে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। মানবপ্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার এক নতুন পূর্বশর্তের পরিপ্রেক্ষিতে অহিংসার বার্তা আজ সবিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আণবিক বোমার ফলে মানবদশায় এতখানি নাট্যসম্ভাবনা না হলেও নবীন ভাবের উদয় সম্ভবত মানবেতিহাসের এই পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী ছিলো। কেননা নবীন এই-যে ভাবটি মাঝে মাঝে অভিনব চরমপন্থার আকার নিয়েছে এর জন্ম হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও চেতনার সীমাবদ্ধতার তিক্ত বোধ থেকে। এটা লক্ষণীয় যে পৃথিবীর সর্বত্র এর প্রতিধ্বনি জাগলেও যে-সব সমাজে প্রতিষ্ঠিত সাবেকী প্রথার একদা সর্বৈব জিত ধরে নেওয়া হয়েছিল সেই সব জায়গাতেই এই ভাব আত্মপ্রচার করেছে সবচেয়ে বেশী।

দার্শনিকেরা পৃথিবীকে শুধু ব্যাখ্যা করেছেন, মার্কস্ বলেছিলেন, আসলে যা করতে হবে তা হলো এর পরিবর্তন। এবং তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সমাজের পরবর্তী উন্নতির স্তরে যাবার বেলায় সর্বহারারাই হবে পরিবর্তনের বাহন, বিশ্ববিপ্লবের পথপ্রদর্শক। কিন্তু যুগের মেজাজে বদল এসে গেছে এর ভিতরেই। ১৯৬৮-তে বিপ্লবী আন্দোলনের পুরোভাগে এলো ছাত্র এবং যুবসমাজ। সারা পৃথিবীতেই ঘটল এটা। কী ফ্রান্স, কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কী পোলাণ্ড, কী-ই বা চীন সর্বত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিলো ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের হাতে। একে অতঃপর পুরোনো অর্থে শ্রেণীসংগ্রাম বলা যায় না কেননা মার্কস্ শ্রেণীকে সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন উপস্থিত উৎপাদনী সম্পর্কের নিরিখে। ছাত্রদের ছাত্র হিসেবে বৈশিষ্ট্য দেয় এই তথ্য যে তারা এখনো উৎপাদনী সম্বন্ধের বাঁধাবাঁধিতে প্রবেশ করেনি এবং সে সম্বন্ধ জালে জড়িয়ে যায়নি। বাকি সমাজ থেকে তারা ভিন্ন, উৎপাদনী সম্পর্কজাল থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। এতেই তাদের আদর্শবাদ এক অর্থে যেমন পবিত্রতর, অন্যদিকে অনেকটাই অরাজকতাপন্থী। ফরাসী দেশ থেকে চীন পর্যন্ত এক অসামান্য অথচ অপরিকল্পিত ঐক্যতানিক আন্দোলনে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিল যুবশক্তি। এরকমটি প্রায় হয়ে থাকে যে পুরোনো বুলি কপচাতে কপচাতেই মানুষ নতুন উদ্দেশ্যে নতুন লড়াইয়ে নামে। ভাবের নিঃশব্দ অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ভাষা পিছিয়ে থাকে। যে সব তরুণ পৃথিবীকে পালটে দিতে চাইছিল তারা পুরোনো ভাবাদর্শের ছাঁচ দূরে ফেলে দিয়ে এসেছিল অথচ অনেকের মুখেই ধরতাই বুলি ছিলো সাবেকী।

নিজস্ব ভাবরূপের অনুরূপ ভাষা তাদের এখনো আবিষ্কার করে নিতে বাকি আছে।

১৯৪২-এ প্রদত্ত কমলা বক্তৃতামালার ভিত্তিতে গ্রথিত রিলিজন এ্যান্ড সোসাইটি বইতে রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন : "পূর্বকালে সভ্যতাকে যে বাধার সম্মুখীন হতে হতো তা ছিল বস্তুজগতের এবং বাইরের বিরোধ, পরবর্তীকালে যা আসবে তা ভিতরের এবং আত্মিক।" তিনি এ-ও বলেছিলেন, "বাস্তবিকের কাছে মানবিকের পরাজয়—আমাদের সমাজের প্রধান দুর্বলতা এই।" বাস্তব এবং আত্মিক ভাবের এই নিঃশর্ত বিচ্ছেদ ইতিহাসের পরখে টেকে কি না সন্দেহ আছে। মানবসভ্যতায় ভাব এবং বস্তু ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ানিরত, একটিকে ধরতে গেলেই দেখা যায় অন্যটি এসে পড়েছে। তা সত্ত্বেও রাধাকৃষ্ণণ যা বলেছেন তার ভিতরে কিছু সত্য রয়েছে। "জীবনের বস্তুময় যন্ত্র"টির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই যন্ত্রের বাহ্য উন্নতি সাধনেই মানুষের সর্বৈব সুখ চিরকালের মতো পাওয়া যাবে এরকম ভাবাও ভুল। দারিদ্র্য দূর করা জরুরি। তেমনি আবার দরিদ্রই শুধু এই মোহের স্বাদটুকু পায় যে দারিদ্র্য গেলেই পথের শেষে ওইখানে সর্বসুখ সেজে রয়েছে। নতুন যে প্রজন্ম বিশেষ করে প্রতীচ্যে বড়ো হয়েছে তাদের কাছে বাস্তব অভাব তো কোনো মুখ্য সমস্যা নয়। তবু তাদের কতজন কী অসম্ভব দুঃখী। ব্যক্তিকে মুখোমুখি-মানবসম্প্রদায়ের সদস্যতায় ঠিকমত ফিরিয়ে দিতে পারলে হয়ত এ সমস্যার কতকটা নিরসন হবে। কিন্তু সমাজ স্থাপত্যের কোন নিয়ম কানুন মেনে কেমন করে সেটা করা যাবে তার সরল নিদান কারুর হাতেই নেই। জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনীতে একটি চমকপ্রদ উক্তি পাওয়া যায়। মিল লিখছেন, "নিজেকে একবার সোজাসুজি এই প্রশ্নটা করে দেখেছিলাম 'ধরো জীবনের সব উদ্দেশ্য সার্থক হলো, প্রতিষ্ঠানে এবং জনমতে যত পরিবর্তন আশা করেছিলে সে সব বাঞ্ছাই পূর্ণ হলো এই মুহূর্তে। তবে এই মুহূর্তে বিপুল আনন্দ এবং সুখের ভরা পূর্ণ হয়ে যাবে তো?' এক অদম্য আত্মসচেতনতা তক্ষুণি বলে উঠল, 'না'।" মিলের এই সংজ্ঞা যথার্থ খাঁটি। শুধু আইন বা প্রাতিষ্ঠানিক আকারে-প্রকারে পরিবর্তন এনে মানুষকে সুখী কিংবা সমাজকে ত্রুটিহীন করা যাবে এই ধারণার গোড়াতেই গলদ রয়েছে।

মানুষের নিজের সঙ্গে নিজের একটা লড়াই লড়ে যেতে হয়। চারিপাশে বানানো হাসির নানা মুখোশে ঢাকা কত মুখ আমরা দেখি। নিঃশব্দে কী অপরিসীম দুঃখ মানুষ সহ্য করে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমার এক বন্ধুর ভাষায় যাবজ্জীবন কারাবাসের মেয়াদ কাটে এই বিশ্বদুনিয়ার গারদঘরে। এই কারাগারের আগল ভাঙা যায় কেমন করে?

এই পৃথিবীকে কী করে পালটে দেওয়া যায়—প্রশ্ন কেবল এইটা নয় যদিও সেটা খুব জরুরি প্রশ্ন। কিন্তু ওরই সঙ্গে ফিরে শিখতে হবে চোখ মেলে চেয়ে থাকা যেমন করে শিশু অবাক চোখে তাকায় আর 'উদ্দেশ্যহীন" খেলাচ্ছলে মন পরিপুষ্ট হয়, সঞ্জীবিত করে তোলে বস্তুকে, নতুন নতুন আকারে রূপায়িত হয় বস্তু, সেই রূপায়ণে আছে বিশুদ্ধ শিল্পের সার। আমাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কতকগুলি কেজো উদ্দেশ্যের ভিতরে বাঁধা পড়ি এবং সেই সব উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে এই পৃথিবীকে দেখি, জিনিসপত্রের মাপজোখ দামদর কষি। বয়স্করা এই ভাবেই কাজের লোক প্রতিপন্ন হয়। উদ্দেশ্য সাধনে তৎপরতা এতে নিঃসন্দেহে বেড়ে যায় কিন্তু বিশ্বসংসার থেকে একটা আলোর আভা অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা বিস্ময় বোধ করতে ভুলে যাই। পৃথিবী আর আমাদের চিত্তকে পরিপুষ্টি যোগাতে পারে না।

দ্য স্কুল মাস্টার নামক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বয়ঃপ্রাপ্তির পরে আমরা জীবনকে কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের বোঝাবিশেষে পরিণত করি এবং ওই বাঁধাছাঁদা বোঝাটির বাইরে যা কিছু তথ্য রয়েছে সবই বাদ দিই। এই ভাবে আমাদের লক্ষ্যসচেতন চিত্তে একটি সঙ্কীর্ণ এলাকা প্রস্তুত হয় যার ভিতর দিয়ে উদ্দেশ্য সরু একটি পথ ধরে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে পারে। বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো আর কোনো সচেতন উদ্দেশ্য যেহেতু তাদের জীবনে তৈরি হয়নি ছোটরা আশেপাশে সব কিছুই দেখতে পায় সমস্ত কিছু শুনতে পায়, তাদের মনোযোগের স্বাধীনতা অখণ্ড।" নিজের বিষয়ে কবি লিখেছিলেন তিনি যে জগতে জন্মেছিলেন সেটি জীর্ণ ছিল না, বৈচিত্র্যপরিপূর্ণ সেই জগতে বিস্ময়বোধ তাঁকে কখনো পরিত্যাগ করেনি। সকল প্রাণীর ভিতরে মানুষই জৈব অর্থে দীর্ঘতম বাল্যের অধিকারী। মহৎ জীবনশিল্পের বড়ো কথাটা হচ্ছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাল্যের এই মনের একটুখানি রক্ষা করতে পারা। সহজ নয় এ কাজ। পৃথিবী বড়ো শীঘ্র আমাদের হাঁপ ধরিয়ে দেয়। যত আঘাত বাজে তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের চেতনার চতুর্দিকে শুক্তির মতো কঠিন আবরণ গড়ে ওঠে। কেবল জাগতিক স্বার্থের নিরিখে চিনি বলে পৃথিবীর সব কিছুই বড় অতিচেনা হয়ে যায়। এই অতিপরিচয়ে পৃথিবীর প্রতি যে তাচ্ছিল্য আসে গভীরতর অর্থে সেই অশ্রদ্ধা আমাদের নিজেদের প্রতিই উদ্দিষ্ট। জগতে আমরা যা পাই তার ভিতরে আমাদের অভ্যন্তর প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। সব বিরুদ্ধতার মাঝখানে তাজা ভাবটি ধরে রাখা বাল্যের বিস্ময়বোধকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই আসলে এক আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব। বাইরের কোনো বস্তু বিন্যাসের দ্বারা এই দ্বন্দ্বের জয় পরাজয় নিশ্চিত নির্ধারিত হওয়ার নয়। এই লড়াইয়ে অল্প সংখ্যক মানুষই জয়ী হয় কিন্তু হেরে যেতে যেতেও যে বঞ্চনার বোধ পাওয়া যায় তার মূল্য কম নয়। অন্তত "প্রাপ্তবয়স্ক" স্পর্শরোমাঞ্চরহিত জড়তাগ্রস্ততার চেয়ে এই বোধ পাওয়া ভালো।

একটা কথা বুঝতে যেন ভুল না হয়। মানুষের স্বভাবী বাল্যকে দীর্ঘতর করবার প্রশ্ন নিয়ে আমরা ভাবিত নই। ছোটরা, জৈব প্রাণবস্তুতায় ভরপুর, এই মুহূর্তে যেমন আনন্দে অস্থির পরমুহূর্তে আবার তেমনি অবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে। কোন্‌টা মূল্যবান আর কোন্‌টা নয় তা তো তাদের জানা নেই। স্বাভাবিক বাল্যকাল স্বাভাবিক ভাবেই এসে পৌঁছয় বয়ঃপ্রাপ্তির সমে। এই পরিণত সমের পরে তৃতীয় চরণের ব্যাপ্তিতে আমরা আত্মিক উপহারের মতো পুনরায় ফিরে পেতে পারি বাল্যকে। পরিণতির পূর্ণতা ব্যতিরেকে অভিজ্ঞতার ফলের পক্বতাকে প্রথম ফুলের সৌগন্ধের সঙ্গে যুক্ত করবে কিসে? সেই পরিণতি চাই কিন্তু পরিণতি লাভের নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। তা সত্ত্বেও এর সম্ভাবনা আছে। অন্তত এই ভাবটুকুকে মনের ভিতরে রাখা চাই। সেটুকুও যদি মরে যায় তার চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছুতে হতে পারে না।

সভ্যতার বাল্যদশায় প্রায়োগিক বুদ্ধির প্রাথমিক উন্মেষের সঙ্গে মানবচেতনায় মিশে গিয়েছিল আবছায়া মরমী অভিজ্ঞতা। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষেরা বিশ্বের দিকে চেয়ে সর্বত্র অশরীরী উপস্থিতি দেখেছিল। যুক্তিবুদ্ধিতে তারা ছিলেন খাটো কিন্তু সেই খর্বতার জন্য কিছুটা এরকম হলেও সবটাই শুধুমাত্রই সেই কারণে হয়েছিল এমন নয়। এই জগতের সঙ্গে নিজেদের তারা জড়িয়েছিল আদিম প্রেমের কৃষ্ণকালো শক্তিতে। সাম্প্রতিক কালে আমরা অনেকটা কার্যকর পন্থা ধরেছি। পৃথিবীকে আমরা দেখতে শিখে গেছি একটা যন্ত্রের মতো। জানি এর ভিতরকার নানা অংশ কী ভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে, কেমন করে এর কাজ চলে। এভাবে দেখতে গিয়ে পৃথিবীটাকে আমরা একেবারে

আমাদের বাইরের জিনিস করে ফেলেছি। কিন্তু সত্যি কি সবটা তাই ? বস্তুবাদী প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমার বাড়ি ইটচুনসুরকিতে তৈরি। বাস্তুকারের কাছে ওইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আমার সমগ্র দেখাকে ওই বর্ণনায় পুরোপুরি ধরা যায় না তো। আমার বাড়ি যদি সত্যি-সত্যিই ওইটুকুর বেশি আর কিছুই না হয় তাহলে সে তো একটা গারদ তাকে আমি আর আমার আপন ঘর ভাবছি না।

এই বিশ্ব আমাদের আপন ঘর। একে আমরা পুরোপুরি যথার্থ বর্ণনা দিই কেমন করে ? আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের যা শিখিয়েছে সব শিক্ষাই খুব কাজের, অনেকের কাছেই এই জ্ঞানের উপযোগিতা আছে, থাকবে। এই শিক্ষা আমাদের মনকে বহু অযৌক্তিক ভয় থেকে মুক্ত করেছে যে ভয় শুধু বাস্তব জীবনের সমস্যা বাড়াত তাই নয় আমাদের ভালবাসার স্বাদ নষ্ট করে করে দিত। এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে বিশ্বের প্রতি যে আমাদের প্রেম সম্যক স্ফূর্তি এবং দীপ্তি পায়নি তার অন্যতম কারণ রাসেল যাকে "আধিদৈবিক" নামে অভিহিত করেছিলেন সেই অনতিস্পষ্ট ভয়। এই সঙ্গে অবশ্য মনে রাখতে হবে যে অতি আত্মপ্রত্যয়ী অধিযন্ত্রবাদ যে-ধরনের বীক্ষা এবং বিশ্বদৃষ্টির প্রসার ঘটায় তারও সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। এই দেখার খণ্ডতাকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারলে তবেই আমরা যেভাবে দেখায় যেটুকু সত্য রয়েছে তার শ্রেষ্ঠ ফল পাবো। বুদ্ধিতে বিবিক্ত করে, বোধে পুনরায় যুক্ত করে ; বিভাজন ও পুনর্যোজনার এই অন্তহীন দ্বন্দ্বে আমরা এই বিশ্বকে বারংবার সৃষ্টি করি, গড়ে তুলি আপনার ঘর।

পৃথিবীর যে-মুখখানি উন্মোচন করে দেবার ক্ষমতা মানুষের সৃজনীশক্তির ভিতরে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন সংসারকর্মে প্রায়োগিক বুদ্ধির কাছে প্রকাশ্য বিশ্বের মুখ থেকে সেটি এতই ভিন্ন যে একে রহস্য বলাই সঙ্গত। রহস্যের এই উপাদানকে পরিত্যাজ্য জ্ঞান করে রহস্যকে অস্বীকার করার জন্য জিদ ধরে থাকাকেই যদি সম্যক জ্ঞানের একেবারে আবশ্যিক পূর্বশর্তের সঙ্গে সমার্থক করা হয় তাহলে আগাম ধরে নেওয়া হবে যে সত্যের একটা দিক নেই বা আয়ত্তের বাইরে থাকবেই। শেষ পর্যন্ত হিসেব খতিয়ে দেখলে এই রকম আত্মনিগ্রহী একটা ফরমান জারি করার ফলে মানুষের জ্ঞান থেকে এমন কিছু বাদ পড়ে যেতে পারে যার মূল্য অনেক। যুক্তির সীমাকে কিন্তু স্বেচ্ছাচারী ভাবে বেঁধে দিতে যাওয়ার প্রশ্ন এখানে ওঠাই উচিত নয়। প্রত্যেক যুক্তিকেই মুক্ত থাকতে দিতে হবে যাতে সে তার নিজের সীমা খুঁজে পায়। মানুষ যখন নিজের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে অন্যের সঙ্গে মমতার ব্যাপ্তিতে যুক্ত বোধ করে তখন এমন কোনো বোধের প্রেরণায় সে কাজ করে যাকে তর্কনীয় বলা যায় না, কিন্তু এই বোধই যুক্তিকেও উন্নীত করে নিয়ে যায় এবং সেই পরিবর্তিত যুক্তিযুক্ততার সঙ্গে এ বোধের কোনো অসামঞ্জস্য থাকে না।

পূর্বানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নানা ভাবাদর্শের বিরোধ আজ মানব মন ও সমাজের অগ্রগমনের পথে অকারণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন এসেছে গঠনমূলক পন্থা গ্রহণের কাল। তর্কবিতর্ক নিঃসন্দেহে চলবে, কিন্তু শান্তির প্রয়োজন যে আজ কী মর্মান্তিক এই বোধ যেন তর্কের সুরকে নরম করে আনে। আশার কথা এই যে দিগন্তে এক নতুন পরিপ্রেক্ষিত ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। পূর্বকালের দিগন্ত যেখানে সীমারেখা টেনে দিয়ে গিয়েছিল তার থেকে ভিন্ন নতুন এই দিগ্বলয়। *

বর্তমান সংকটে কর্তব্য

যে চীনের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ সে-চীন দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অভ্যস্ত। গত ৩৫ বছর যাবৎ এরা ক্রমাগত যুদ্ধের ভেতর দিয়েই চলেছে। ১৯২৭-এ গৃহযুদ্ধের শুরু। তারপর চীন জাপানের লড়াই চললো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এলো। গৃহযুদ্ধের যদি অবসান হলো ১৯৪৯-এ, ১৯৫০-এ আবার কোরিয়ায় যুদ্ধ। তারপর তিব্বতে। তারপর ভারতের সীমান্তে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে যারা আমাদের সীমান্তে আজ যুদ্ধ করছে, সারাজীবন ধরে যুদ্ধ করা এদের অভ্যেস। আরো ৩৫ বৎসর যদি এদের যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে সেটা তাদের কাছে অন্তত অভ্যাসের ব্যতিক্রম হবে না। এই কথা জেনেই আমাদের তৈরি হওয়া দরকার। চীনের আশা এত ছোট নয় যা ছ' মাসের যুদ্ধে পরিপূর্ণ হতে পারে। যুদ্ধের কায়দা, যে-কায়দা ওদের নেতা মাও সে তুং বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে রপ্ত করেছেন, সেটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। লেনিন বলেছিলেন, দুপা এগিয়ে এক পা পিছোবে। মাও সে তুং এই কথাটাকে আরো অনেকখানি চালাকি দিয়ে ভরেছেন। শান্তিকে যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। যুদ্ধে দুপা এগোবে। শান্তির কথা বলে একপা পেছুবে। শান্তির কথা বলে প্রতিপক্ষকে ঘুম পাড়াবে। তারপর আবার এগোবে। এই নীতি নিয়ে চীন চলবে। যদি তাই-ই হয় আমাদের তা মনে রাখা দরকার। এই আমার প্রথম বলবার কথা।

দ্বিতীয় কথা এই, আমাদের মনে রাখতে হবে যুদ্ধ যদি করতেই হয়, আমরা নানা দেশের কাছ থেকে সাহায্য নেব। কিন্তু এমন মোহ যেন মনে আমরা স্থান না দিই যে, আমাদের যুদ্ধ অন্য কেউ এসে করে দিয়ে যাবে। একথা যেন আমরা মনে না করি যে, মার্কিন দেশের সৈন্য, ইংরেজ সৈন্য বা অন্য কোন দেশের সৈন্য এসে চীনের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করে যাবে। অস্ত্র অন্যদেশ থেকে আমরা হয়ত পাব, এবং পেলে নিশ্চয়ই নেব। জনবল আমাদের আছে এবং সেই জনবলের যাতে ব্যবহার হয়, এদেশের সৈন্যবাহিনী যাতে যথেষ্ট বড় আকারের হয়, সে চেষ্টা এদেশে দাঁড়িয়েই করতে হবে। কোনো দেশ নিজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে না অন্যদেশের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। যে স্বাধীনতা চায় সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। আমাদের তাই একথাই মনে রাখতে হবে যে আমাদের যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ। আমাদের যা শক্তি আছে, সেই শক্তি নিয়েই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া শুধু সৈন্য জোগাড়ের প্রশ্নও নয়। সারা দেশকে এই সৈন্যদের রসদ জোগাতে হবে। ক্ষেতে খামারে কলে কারখানায় যাঁরা কাজ করছেন তারাও দেশকে যুদ্ধের উপযুক্ত অবস্থায় রাখবার সহায়তা করছেন। একথা সকলেরই জানা। তবু বারবার মনে রাখতে হয়। আমরা সবাই যুদ্ধ করতে যাব এমন নয়। কিন্তু যে যেখানেই আমরা আছি সেখানে দুজনের কাজ যদি একজন করতে পারি তাহলে একটি লোক ছাড়া পায় যে অন্য কাজ এগিয়ে দিতে পারে। আমরা যে যেখানে আছি সেখানে আমাদের যথাসাধ্য শক্তি অনুযায়ী যদি চেষ্টা করি, তাহলে সে চেষ্টার ফলে দেশের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আমার দ্বিতীয় কথা তাই এই, আবারও বলছি এ বিশ্বাস আমাদের মনে যেন স্থান না পায় যে, অন্য কোনো দেশ এসে আমাদের যুদ্ধে জয়ী করিয়ে দিয়ে যাবে। আমাদের যুদ্ধ আমাদেরই চালাতে হবে। অন্যের সাহায্য পেতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রধান নির্ভর নিজেরই শক্তিতে। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে

যখন জার্মানীর যুদ্ধ হচ্ছিল তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন লেন্ড লীজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন দেশের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছিল ; কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের যুদ্ধ সোভিয়েট ইউনিয়নই চালিয়েছে। আমরাও যা পাব নেব ; কিন্তু সব নেবার পরেও যদি আমাদের স্বাধীনতা রাখতে হয়, আমাদের দাঁড়াতে হবে আমাদের শক্তি নিয়ে একথাটা যেন আমরা মনে রাখি।

আমার তৃতীয় কথা এই, আজকে আমাদের সীমান্তে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে যুদ্ধ শুধু দুই দেশের ভিতর যুদ্ধ নয়, সে যুদ্ধ দুই আদর্শের ভিতর যুদ্ধ। এই কথাটা বিশেষভাবে বলবার প্রয়োজন এই সভায়। কারণ আজকের সভায় যাঁরা উপস্থিত—সাহিত্যিক শিল্পী মননশীল মানুষ, এঁদের অনেকেই আদর্শ নিয়েই চিন্তা করবেন, আদর্শ নিয়েই লিখবেন, কাজ করবেন। আমাদের ভিতর কেউ হয়ত সৈন্য হয়েও রণাঙ্গনে যেতে পারেন, কিন্তু সবাই যাবেন না। কেউ হয়ত ক্ষেতে খামারে কলকারখানায় কাজ করবেন, কিন্তু অনেকেই করবেন না। এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই হয়ত কাজ করবেন চিন্তার ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে। সেই জন্যই এ যুদ্ধ যে দুই আদর্শের লড়াই, সেই কথাটা আজকে এখানে বিশেষভাবে মনে রাখবার প্রয়োজন। কথাটা আর একটু বিস্তারিত করে বলা যাক।

ভারতবর্ষ এবং চীন এই দুই দেশই আজ অর্থনৈতিক গঠনের কাজে, শিল্প উন্নয়নের কাজে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে লেগেছে। একথাটা মনে রাখাই ভাল যে, এমন কোন ব্যবস্থা নেই যে-ব্যবস্থার ফলে কোনোরকম কষ্ট ছাড়াই অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়। এমন কোন পথ আমেরিকা বা সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইংরেজ বা জাপান বের করতে পারেনি যে-পথে দুঃখ কষ্ট ছাড়াই শিল্পোন্নতি সম্ভব হয়। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, অর্থনৈতিক গঠনের এই যুগে যত কষ্টের ভিতর দিয়েই আমাদের যেতে হোক না কেন তবু মানুষের কয়েকটা বড় আদর্শকে আমরা বাঁচিয়েই পথ চলতে পারব। আমরা বিশ্বাস করি যে, মানুষের স্বাধীনতার যে-আদর্শ নিজের চিন্তা এবং বিবেক অনুযায়ী মানুষের পথ বেছে নেওয়ার যে আদর্শ, সে আদর্শকে রক্ষা করেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে চলা সম্ভব। এই আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস নয় আজকের চীনের। এই দুই বিপরীত বিশ্বাসের মধ্যে আজ সংগ্রাম।

মনে রাখা দরকার যে এই দুই আদর্শের ভিতর যে সংগ্রাম সে শুধু ভারত নামক একটা ভূখণ্ডেরই স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয়। কম্যুনিস্টরা বিশ্বাস করেন যে, যদি পৃথিবী জোড়া গণতন্ত্রকে আজ শেষ করতে হয়, তাহলে প্রথম ধ্বংসের কাজ শুরু করতে হবে এশিয়ায়, বিশেষত ভারতবর্ষে। সোভিয়েট ইউনিয়নের লালফৌজ পশ্চিম দিকে যতখানি এগোতে পেরেছে এগিয়েছে, চেকোশ্লোভেকিয়া পর্যন্ত। এবার যদি লালফৌজকে এগোতে হয় তবে তার গতি হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং প্রধানত ভারতবর্ষে। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেবারের সেই চারণ কবির কথা বলেছেন, যিনি রাণা প্রতাপকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি মেবারের শেষ স্বাধীনতার শৃঙ্গ। আজকে এশিয়ায় ভারতবর্ষ শেষ স্বাধীনতার শৃঙ্গ। ভারতবর্ষকে তাই দাঁড়াতে হবে। যদি ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে এশিয়ায় এবং পৃথিবীর একটা বড় অংশে স্বাধীনতা বিপন্ন এমন কি ধ্বংস হতে পারে। আমাদের সংগ্রাম শুধু আমাদেরই সংগ্রাম নয়, আমাদের সংগ্রাম আজ বিশ্বজোড়া স্বাধীনতার সংগ্রামের এক বিশেষ অংশ। একথা আজ আমাদের বারবার স্মরণ করতে হবে।

আমাদের দেশের ভিতর এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা আমাদের এই আদর্শে বিশ্বাস করেন না। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা নানাভাবে তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। আমিও অল্প কয়েকটি কথা বলছি। কম্যুনিস্টরা চীনের আক্রমণে সবাই অখুশি হয়েছেন এ মনে করবার কোন কারণ নেই। নিজেকে কম্যুনিস্টদের জায়গায় বসিয়ে কথাটা একবার বিচার করে দেখুন। ওঁদের সামনে এদেশে ক্ষমতায় আসবার আর কোন পথ খোলা আছে! ওঁরা ১৯৪৮-৪৯এ চেষ্টা করেছিলেন। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে ক্ষমতায় আসতে ; সেদিন তেলেঙ্গানার পথ ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর চেষ্টা করেছেন যাকে পার্লামেন্টারী পথ বলা হয়, সেই পথে ক্ষমতায় আসতে। আবারও ব্যর্থ হয়েছেন। যদি দেশের ভিতর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ এবং পার্লামেন্টারী পথ দুই-ই ওঁদের সামনে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ওঁরা, অন্তত ওঁদের অনেকে, কেন মনে করবেন না যে, একমাত্র যা খোলা আছে আজকেও তা হল পূর্ব ইউরোপের পথের এক নতুন চীনা সংস্করণ ? পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েটের লালফৌজ এসে কম্যুনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। এখানেও তাই হতে পারে। চীনের লালফৌজ আসামে এসে, আসাম থেকে ভারতীয় ফৌজকে তাড়িয়ে সেখানে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির এক সরকার গঠন করিয়ে দিতে পারেন। এবং তারই ফলে আজকেও ভারতবর্ষে কম্যুনিস্টদের এক নতুন ইয়েনাম তৈরী হতে পারে। সেখান থেকে কম্যুনিস্ট আন্দোলন (কেন নয় ?) আরও ২৫ বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং ক্রমশ এগুবে। চীনের আক্রমণে কম্যুনিস্ট দল অখুশী হবেন একথা মনে করার কী কারণ আছে ? বহু কষ্টে উচ্চারিত ওঁদের মুখের কথা ? ওঁরা চীনের আক্রমণে যদি অখুশী না হন, মনে মনে যদি এ আশাটুকুই জেগে থাকে যে লক্ষ্যে পৌঁছবার এই একটা তৃতীয় দরজা খুলে গেল, তাহলেই কী ওঁরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলবেন ? আমাদের কি ধরেই নিতে হবে যে, কম্যুনিস্টদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি নেই ? যদি বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে তাহলে কি ওঁরা চীনের আজকের এই প্রসারে আনন্দিত হয়েও রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করবার জন্যই বাইরে থেকে যাঁরা ক্ষমতা নিয়ে আসছেন তাঁদের হাত থেকে ক্ষমতা পাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মনের আসল কথাটা গোপন করবেন না ? ওঁরা কি এতবড় সত্যবাদী ! ওঁরা কি এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বেরিয়েছিলেন যে, বিপ্লবে জয়ী হবার জন্যে ওঁরা কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না ? ওঁরা কি অহিংস ? আমরা যদি ওঁদের মন বুঝবার সামান্য চেষ্টা করি তাহলে আমাদের বোঝা কঠিন হওয়া উচিত নয় যে, কম্যুনিস্ট দলের অন্তত একটা বড় অংশ একথাই ভাবছেন যে, যেহেতু ভারতবর্ষে ক্ষমতায় আসবার অন্য পথ বন্ধ, অতএব লালফৌজের হাত থেকে ক্ষমতালাভের পথেই ওঁদের আজ প্রধান ভরসা। আমি কম্যুনিস্টদের একথা বলে দোষ দিচ্ছি না যে ওঁরা নিজেদের আদর্শে বিশ্বাস করেন না ; বরং একথাই বলছি যে, ওঁরা নিজেদের আদর্শে বিশ্বাস করেন বলেই আজকে মিথ্যাচরণ ওঁদের ধর্ম।

আজকে শিল্পী, সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল লোক যাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁদের সামনে আরও একটি কথা আমি বিশেষভাবে জানাতে চাই। কম্যুনিস্টরা দেশের শত্রুতা করবেন এটাই আজ স্বাভাবিক। তাঁদের বাধা দেওয়া কিছুটা পুলিশের কাজ। কিন্তু পুলিশের কাজ ছাড়াও যাঁরা চিন্তাশীল লোক এবং গণতন্ত্রে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের নিজেদের আর একটি কাজ আছে। পুলিশ তার নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কিন্তু চিন্তাশীল লোকদের চিন্তনের যে ধর্ম সে ধর্মে তাঁরাও যেন প্রতিষ্ঠিত থাকেন। মনে রাখতে হবে যে, আদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আর একটি আদর্শকে তুলে ধরতে হয়। এমন এক একটা সময়

আসে যখন কোন মিথ্যা আদর্শের পিছে শত সহস্র আদর্শবাদী যুবক ছুটে যায়। বারবার তাই হয়েছে। ইতিহাস শেখায়, জীবন শেখায়, কিন্তু অনেক মূল্যে শেখায়। অনেক ব্যর্থ সন্ধানের পর, অনেক মূল্য দিয়ে তবে সমাজ শেখে, এটা ভুল পথ। মিথ্যা ছলনার জালে ইতিহাসের সৃষ্টির পথ বিকীর্ণ। আমাদের দেশে কম্যুনিস্টদের আমরা যেন আদর্শবাদী বলেই স্বীকার করি ; ভুল আদর্শ এই যা বিপদের কথা। আরো কত মূল্য দিতে হবে, আরো কত রক্ত বইবে, তারপর ওঁরা ওঁদের আদর্শের ভ্রান্তি বুঝতে পারবেন, জানি না।

ইতিমধ্যে আমাদের যুগে অনেক অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত হয়েছে। কম্যুনিস্টরা কৃষক মজুরদের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে, চীন দেশে, জোর জবরদস্তি করে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠার নামে লক্ষ লক্ষ চাষীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে সাইবেরিয়ায় সিংকিয়াং-এ পাথর ভাঙতে বসিয়ে স্বল্পাহারে রেখে পলে পলে তিলে তিলে মারা হয়েছে। আদর্শের অপলাপের আরো কত প্রমাণ চাই ? চীনের সেই শতপুষ্প সমাচার আপনারা জানেন, তবু আর একবার বলি। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলা যাক। আজকের চীন তার নাম পেয়েছিল বহু বছর আছে চীন বংশের নাম থেকে। সেই বংশ যখন রাজত্বে এলেন তার আগে চীনের একটা গৌরবময় অধ্যায় কেটে গেছে। কনফুসিয়াস লাওৎসে আরো অনেক বড় বড় দার্শনিক তাঁদের বাণী প্রচার করে গেছেন। চিন্তা এবং সংস্কৃতির নেতারা চারাদিকে ফুল ফোটালেন নতুন দর্শনের এবং নতুন শিল্পের ; সেই যুগকে চীনে শতপুষ্পের যুগ বলা হয়েছে। তারপর এলেন ঐ প্রতাপশালী চীন বংশ। সেটা খ্রীস্টের জন্মের প্রায় আড়াই শ' বছর আগে। ঐক্যের নামে চীনকে একাকার করা হল। চীনে এত দার্শনিক এত ভাষায় এত কথা বলেছেন ! হুকুম এলো সব বই এক সঙ্গে পুড়িয়ে দাও। তারপর বহু যুগ কেটেছে। আজ এসেছেন মাও সে তুং। তিনি সেই চীন বংশের সম্রাটের চেয়ে আরও চতুর। ভিন্ন মতাবলম্বীদের বহুভাবে উৎপীড়ন করবার পর চীনের এই নতুন যুগের নেতাটি ভাবলেন, এবার কিছু প্রতিবাদ শোনা যাক ! ১৯৫৭ সালে বললেন, আবার শতপুষ্প ফুটুক ! আবার শতপুষ্প ফুটুক আশ্বাস পেয়ে কিছু বুদ্ধিজীবি কম্যুনিস্ট-দর্শনের এবং কম্যুনিস্ট শাসনের প্রতিবাদে সাহস করে নিজেদের বক্তব্য বললেন। ফলে হাতে হাতে এঁরা ধরা পড়ে গেলেন ! তারপর এঁদের দিয়ে দোষ স্বীকার করাবার পালা। এঁরা কবুল করলেন, আমরা ক্যাপিটালিস্টদের অনুচর, আমরা দোষ করেছি ! নানারকম অকথ্য শাস্তিবিধান হল এঁদের জন্য। স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, এই হলো নতুন চীনের মত ও পথ। ওঁরা বিশ্বাস করেন না যে, মানুষকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে দেওয়ার ভিতরে কোন গৌরব আছে। আমরা বিশ্বাস করি।

আমাদের বিশ্বাস নিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এদেশে নতুন যুগের তরুণ তরুণীরা আবারও যাতে একটা মিথ্যা আদর্শের পিছনে গিয়ে জীবন নষ্ট না করেন সেজন্য নতুন আদর্শের কথা বলে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ইতিহাসে এমন মুহূর্ত সব সময় আসে না—মাঝে মাঝে শুধু আসে—যখন একটা জাতি, একটা দেশ, নিজের সামনে এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায়, যে উদ্দেশ্যে সারা জীবন সমর্পণ করে ধন্য হওয়া যায়। যদি আজ ইতিহাস আমাদের সম্মুখে সেই সুযোগ এনে দিয়ে থাকে, আমরা যেন সেই মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে ধন্য হতে পারি !

বাংলার সংকট ও সমাধানের পথ

প্রিয়বরেষু,

আপনার আহ্বান যখন এলো তখন আমার হাতে সময় অল্প। আপনি 'বাংলার সংকটে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' এবং 'সম্ভাব্য প্রতিকার' সম্বন্ধে সুচিন্তিত একটি প্রবন্ধ চেয়েছেন। যদি অনুমতি দেন তো আমার বক্তব্য নাতিদীর্ঘ একটি পত্রেই নিবেদন করি। প্রবন্ধে একটা সম্পূর্ণতার অঙ্গীকার থাকে, যেটা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

নগর কলকাতা ও পল্লী বাংলার ভিতর অসামঞ্জস্য আমাদের সংকটের প্রধান কারণ। নাগরিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রাম্যতার যোগে আমরা এক উদ্ভট সংস্কৃতি ও রাজনীতির অধিকারী হয়েছি। এর পরিবর্তন ছাড়া বাংলার অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

কলকাতাকে আমরা ভালবাসি। কলকাতা আমাদের গর্বের বস্তু। আজ যে-চিন্তার উদয় বাংলায় কাল তারই প্রকাশ ভারতে, এই বহু উদ্ধৃত পুরাতন বাক্যটি যতবার শুনেছি ততবারই মনে মনে জেনেছি যে, বাংলা বলতে এখানে কলকাতা মহানগরীকেই স্মরণ করা হয়েছে। যে-নবজাগরণ ভারতের উনিশ শতকের ইতিহাসে বাঙালীকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে, এই কলকাতায় তার উদ্ভব ও উন্মেষ অথচ এই কলকাতাই আবার বাংলাদেশের সামাজিক ও আর্থিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে ভয়ংকর একটা সংকটের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাংলার সুদূর প্রান্ত থেকে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উপাসকের দল কলকাতায় ভিড় করেছেন। কলকাতার জ্ঞান ও সম্পদ কিন্তু বাংলার দিকে দিকে অজস্র চরিতার্থতায় ছড়িয়ে পড়েনি। ফলে মহানগরী ও অবশিষ্ট বাংলার ভিতর অতি দ্রুত একটি বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিচ্ছিন্নতা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত ও শঙ্কিত করেছিল। তাই মহানগরী ত্যাগ করে তিনি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করলেন পল্লীবাংলার প্রান্তরে, গ্রামোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রে স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতন।

এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, তাঁর বিরাট প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় তিনি সেই একক প্রচেষ্টায় ঘোরাতে পারেননি। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কলকাতা ও গ্রামবাংলার ভিতর বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষেই অতি বড় দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে।

শহর ও গ্রামের ভিতর কিছুটা অসামঞ্জস্য অনিবার্য ; কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা মাত্রা অতিক্রম করে গেছে কথাটা আরও একটু ব্যাখ্যা করেই বলি। পাশ্চাত্য অর্থশাস্ত্রের একজন আদি গুরু ছিলেন অ্যাডম স্মিথ। স্মিথ সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল, নগর কি করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতিতে সহায়ক হয়ে থাকে সেই কথা। পণ্ডিত লেখকের নিজ দেশ স্কটল্যান্ড। ইংল্যান্ডের আর্থিক ইতিহাসের সঙ্গে তিনি স্বভাবতই সুপরিচিত ছিলেন। ও-দেশে বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির ভিতর পারস্পরিক সহায়তার সম্পর্ক দেখা গেছে। স্মিথ সাহেবের গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তার কিছুকাল আগেই স্কটল্যান্ডের অপেক্ষাকৃত জনবহুল নিম্নাঞ্চলে শুধু বাণিজ্যেরই নয়, কৃষিরও দ্রুত উন্নতি শুরু হয়ে গেছে। এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লিখেছেন : '১৭৬০ থেকে

১৮২০ এই সময়টাতে ইংল্যান্ডে কৃষির উন্নতি ছিল দ্রুত ; কিন্তু স্কটল্যান্ডে দ্রুততর। গ্ল্যাসগোর তামাক আর জাহাজের ব্যবসায়ীরা এবং ভারত থেকে প্রত্যাগত কিছু উদ্যোগী জমি কিনে উন্নয়নের কাছে অগ্রণী হয়েছিলেন।'

এই উদ্ধৃতিটি এখানে টেনে আনবার একটা বিশেষ কারণ আছে। বৈপরীত্যের উদাহরণ তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য। বাংলা দেশেও প্রায় ঐ সময়টাতেই, অথবা সামান্য পরে রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ নেতাদের আমরা পাই। সেদিন কলকাতায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। নববঙ্গের নেতারা অনেকেই প্রতিভাবান ছিলেন। কিন্তু বাংলার নানা অংশ থেকে রাজধানীতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা যেন দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিন্ন করেই এখানে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। নগর ও পল্লী, বাণিজ্য ও কৃষির ভিতর পারস্পরিক সহায়তার অভাবে বাংলাদেশের সামাজিক ও আর্থিক ভারসাম্য ভেঙ্গে গেল।

এটা বাংলার দুর্ভাগ্য ; আবার এটাই কলকাতারও সংকটের কারণ। পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে কর্ম ও শিক্ষার অভাবে যে-সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে কলকাতা নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্লিষ্ট ভাগ্যান্বেষীর দল কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন। ক্রমে মহানগরীর সঙ্গতি অতিক্রম করেই ভিড় বেড়েছে। এমনই ভাবে শহর ও দেহাত একই দুষ্ট চক্রে জড়িয়ে পড়েছে। কলকাতা যেমন বাংলাকে উপেক্ষা করেছে, বাংলার দুর্দশাও তেমনি মহানগরীকে এক দুরারোগ্য ব্যাধির দিকে ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে। দেশ বিভাগের পর অগণিত উদ্বাস্তুর জন্য গ্রামবাংলা অথবা মহানগরী কোথাও আর সুস্থ স্থান সংকুলান হয়নি।

কোনো জাতির জীবনে আর্থিক ব্যাধি দুরারোগ্য হয় না, যদি তার সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ে সাংস্কৃতিক ব্যাধি ও অন্যান্য জটিলতা।

আমাদের অভ্যাস ও সংস্কৃতিতে কয়েকটি বড় দোষ আছে। আমরা কিছুতেই নিজে দায়িত্ব নিতে চাই না। যদি কোনো বস্তুর অভাব ঘটে তবে কারও শরণাপন্ন হয়ে সেটা লাভ করা যায় কিনা সেটাই প্রথমে আমাদের চিন্তার বিষয় হয়। কারণ আমরা অত্যন্ত চালাক ; অন্যের কৃপায় যা লাভ করা যায় নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করা আমাদের মূর্খতা বোধ হয়। যদি কোনো দায়িত্ব আমাদের ওপর এসে পড়ে তবে কী উপায়ে সেটা অন্য কারও ওপর চালনা করা সম্ভব, আমাদের ভাবনা স্বভাবতই সেদিকে যেতে চায়। এদেশে যাঁরা ক্ষমতালিপ্সু তারাই সাধারণত নিজ দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, আর সবাই দায়িত্ব এড়াতে ব্যস্ত।

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আরও একটি স্পষ্ট। এদেশে যুক্তি অথবা অধিকারবোধের ভিত্তিতে কিছু লাভ করা কঠিন। যদি কিছু পেতে হয় তো অপর ব্যক্তিকে 'দাদা' সম্বোধন করে অনুনয়ের ভাষায় কথা বলা ভালো। নয় তো ভয় দেখালে কাজ হয়। আমরা দয়া করি অথবা গোলমাল এড়াবার জন্য অপর পক্ষের দাবি মেনে নিই : কিন্তু ব্যক্তির অধিকার বলে কিছু আমরা সচরাচর স্বীকার করি না। এর ফল অনেক সময় যেমন শোচনীয় তেমনই হাস্যকর। যে-দাবিতে আমরা পূর্ব মুহূর্ত অবধি কোনো যুক্তি লক্ষ করিনি, হঠাৎ যখন তার সমর্থনে পেশীবলের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন আমাদের ভিতর কপট ঔদার্যের উদ্রেক হয় এবং সেই দাবি মেনে নিতে আর কোনো আপত্তি থাকে না। যাঁরা যুক্তি, নিয়ম ইত্যাদির ভিত্তিতে আলোচনা দাবি করেন, তাঁদের সেই উৎপাত কিন্তু আমাদের বড়ই অসহ্য বোধ হয়।

অর্থাৎ, একদিকে আমরা দায়িত্ব গ্রহণে অনভ্যস্ত, অপরদিকে আমাদের যুক্তিসঙ্গত অধিকারও অস্বীকৃত। মহানগরী আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সীমানাকে বিস্তৃত করেছে; অথচ নাগরিক সভ্যতার গুণ আমাদের জীবনে প্রবেশ করেনি। এটাই হয়ে উঠেছে আমাদের সামাজিক সংকটের অপর একটি মূল কারণ। সাধ যখন সাধ্যকে অতিক্রম করে যায় তখন পরিণামে অক্ষম ক্রোধ অনিবার্য। আমরা যেমন ব্যক্তিবিশেষের কাছে ছোট ছোট চাওয়া ও পাওয়ার জন্য কখনও হাতজোড় করি আবার কখনও করি আস্ফালন তেমনই বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে এই মুহূর্তে ঠাকুর অথবা নিয়তির শরণাপন্ন হই, আবার পর মুহূর্তে সমাজকে হিংসার আঘাতে ভাঙতে চাই। এই অস্থিরতাকে আমরা যতই বৈপ্লবিক আখ্যা দিই না কেন, আমাদের একটি প্রাচীন মানসিকতার সঙ্গেই এর নাড়ীর যোগ। যে-ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং আত্মনির্ভর হয়নি, মায়ের প্রতি তার আবদার ও আক্ষেপে আমাদের আচরণের উপমা মেলে। বাংলাদেশে আন্দোলনকে যতদিন না আমরা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করছি, ততদিন এই আক্ষেপ-বিক্ষোভের রাজনীতি কাটবে না।

সমাজ ও সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখ করতে হয়। যে আত্মনির্ভরতার অভাব আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, এখানেও আছে তারই প্রতিফলন। আমাদের শিক্ষা স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে না, সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাধানের পথ খুঁজতে শেখায় না। আমাদের যেন ধারণা এই যে, কিছু বাঁধাধরা বাখ্য অভ্যক্ত ভুলসহ মোটামুটি মুখস্থ করার যে-শক্তি তারই নাম বিদ্যা। এই বিদ্যায় আমরা আজ আর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি না, আবার একে অতিক্রম করে কোনো নতুন প্রত্যয়েও আমরা পৌঁছতে পারিনি। বলা বাহুল্য, এই বিদ্যার সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের যোগ যৎসামান্য।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর। এই নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজে কোনো প্রবল চেষ্টা নেই। অথচ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াবার জন্য আন্দোলন শক্তিশালী। একদিকে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কোন মূল্য নেই, একটা ধিক্কার ছাত্রদের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে; অন্যদিকে সকল প্রকার অসদুপায়ে এই ডিগ্রীলাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও চলেছে।

শিক্ষার প্রসারে আমরা ভুল নীতি অনুসরণ করছি। প্রাথমিক শিক্ষাকে সারা দেশে যথাসম্ভব শীঘ্র ছড়িয়ে দেবার প্রতি আমাদের প্রধান লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষিত বেকারের সমস্যা কিছুটা লাঘব না হওয়া পর্যন্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা দ্রুত বাড়ানো নিরর্থক; তাতে ছাত্র ও বৃহত্তর সমাজ কারোরই কোনো লাভ হবে না। শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই, এ কথাটা আজ সবাই বলছেন; কিন্তু কার্যত অনেকে কোনো পরিবর্তনেই সম্মত নন। জ্ঞানচর্চায় শ্রবণ ও স্মৃতির তুলনায় আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া এবং বৎসরান্তে একটি বড় পরীক্ষার বদলে সারা বছর ধরে ছোট ছোট পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষার নাম আজ যে-প্রহসন চলেছে তার সমাপ্তি ঘটাবার এই একমাত্র পথ। এরই সাথে চাই নানা প্রকার প্রযুক্তি বিদ্যা ও ব্যবহারিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার।

এসব কিছুই ব্যর্থ হবে যদি না বাংলার অর্থনীতিকে আমরা সেই সঙ্গে ঢেলে সাজাতে পারি।

এজন্য প্রথম প্রয়োজন পশ্চিম বাংলার ওপর কলকাতার একাধিপত্যের অবসান। বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র দেশময় এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, কৃষির সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যের যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথা আগে বলেছি সেটা বেড়ে ওঠে। এই নতুন শিল্পকেন্দ্রগুলি ভেবে-চিন্তে স্থাপন করতে হবে সেই সব স্থানে যেখানে আছে একাধিক বড় রাস্তা অথবা রেলপথের সংযোগস্থল, স্থানীয় কাঁচামাল ও কৃষিজাতদ্রব্য সংগ্রহ ও কেনাবেচার সুবিধা, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবস্থা, ইত্যাদি। যেখানে এসব নেই সেখানে প্রয়োজন মতো নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে। এজন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে রাজ্যব্যাপী পরিকল্পনার ব্যবস্থা চাই।

ভারতের কোনো কোনো অংশে ইতিমধ্যে কৃষির দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানার উন্নয়ন এশিয়ার কোনো দেশের তুলনায়ই নগণ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কি করে ফসল বাড়ানো যায় এটাই আগামী কয়েক বছরে আমাদের কৃষিচিন্তার প্রধান কথা হওয়া উচিত। যদি বলি যে গ্রামে গ্রামে চাই নলকূপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি, স্কুল, সমবায় সমিতি ও বিজ্ঞান আলোচনার কেন্দ্র, তবে কেউ হয়তো বলবেন যে এ সবই কল্পনা। অথচ এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব, তার ইঙ্গিত এ দেশেই আছে এই মুহূর্তেই।

এটা সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনার রূপরেখা নয় ; কোন্ পথে চলতে হবে তার দিগ্‌নির্দেশের চেষ্টা মাত্র। বাংলার রাজনীতি কি আমাদের এ পথে এগোতে দেবে ? দলীয় রাজনীতির চেয়ে দেশ যদি আমাদের কাছে প্রিয়তর হয় তো চলবার শ্রেয় পথ তৈরী করে নেওয়া সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। এই পরিবর্তন রাজনীতিক দলগুলির ভিতর প্রথমে আশা করা যায় না ; বরং দলের বাইরে থেকে যাঁরা দেশ গড়বার কাজে আগ্রহী অথবা দলের ভিতর থেকেও যাঁরা নিজের চিন্তাকে দলীয়তার উর্ধ্বে তুলতে সক্ষম, তাঁদের ভিতরই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর উজ্জ্বল প্রকাশ আগে সম্ভব।

আমাদের অভ্যস্ত রাজনীতিতে 'বামপন্থী', 'দক্ষিণপন্থী', এই দুটি শব্দের অর্থহীন প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আপনি হিংসায় বিশ্বাসী, তবে আপনি বামপন্থী। সেই সঙ্গে আপনি হয়তো কালীর কাছে মানত করতে অভ্যস্ত, বাড়ির হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে বিয়ে করলে আপনার ক্রোধের সীমা থাকে না, পরিবার পরিকল্পনার আপনি প্রচণ্ড বিরোধী, অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অর্থে আপনি রক্ষণশীল ; কিন্তু তাতে আপনার বামপন্থী পরিচয় ম্লান হবে না। অপরপক্ষে, আপনি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থেকে যতই মুক্ত থাকুন না কেন, যুক্তিবাদে আপনার বিশ্বাস যতই দ্ব্যর্থহীন হোক না কেন, আপনি যদি না হিংসার রাজনীতিকে হাততালি দিতে রাজী থাকেন তবে আপনি দক্ষিণপন্থী। আমাদের রাজনীতিতে যদি শব্দার্থের এই বিকার ঘটে থাকে তবে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের কাজে অভ্যস্ত ধ্বনিগুলি বিভ্রান্তিকর মাত্র। এই সব ধ্বনিগত বিড়ম্বনার উর্ধ্বে উঠেই আমাদের দেশের জন্য নতুন পথ বেছে নিতে হবে।